## 'বীক্ষণে'র উদ্দেশ্য

কিশোর ও যুব-ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করা ; বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালানো ও বিকল্প সুস্থ সংস্কৃতির রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করা এবং সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে কিশোর ও যুব-ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করাই হবে 'বীক্ষণে'র লক্ষ্য ও আদর্শ।

—**আমাদের কথা ; বীক্ষণ ;**
**১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩**

## সূচী

বীক্ষণ / প্রথম বর্ষ / তৃতীয় সংখ্যা / মে, '৭৩

# 'বীক্ষণে'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে
# একটি আবেদন

প্রিয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা,

'বীক্ষণে'র মত একটি হাতিয়ারকে অব্যাহতভাবে চালনা করার ক্ষেত্রে অর্থের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, একথা বলাই বাহুল্য। আর 'বীক্ষণে'র ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই এই ভূমিকা খুব স্বাভাবিক কারণেই সংকটের চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে। 'বীক্ষণে'র ধরণের পত্রিকাগুলি যে, হয় 'সূতিকাগৃহে'ই মারা যায়, নয়তো তাদের ঘোষিত সময়-সীমার বহুপরে, মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা দিয়ে 'আমি বেঁচে আছি', কেবল এই কথাটি পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়ে দেয়, তার একটি বড় কারণ এই আর্থিক সংকট। 'বীক্ষণে'র শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন 'বীক্ষণে'র আর্থিক সমস্যাটিকে নিজেদের সমস্যা হিসাবে দেখেন এবং এই কথাটি মনে রাখেন যে 'বীক্ষণে'র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, কোন সাহায্যই অতি সামান্য নয় বা কোন সাহায্যই প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়।

॥ সম্পাদকমণ্ডলী—'বীক্ষণ' ॥

সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে, অর্থাৎ যা কিছু তাঁদের জীবনকে
আলোচনা চলেনি। কিশোর ও ছাত্র-যুবদের সংগঠিত করার
দের মানসিক বা সাংস্কৃতিক বিকাশে সাহায্য করা এবং তারই
করার দিকেই বেশী মনযোগ দিয়েছেন। হতাশার হাত
র যে তীব্র আকুলতা সমাজের অন্য সমস্ত অংশের মানুষের
ফলে অনুগামীরও অভাব ঘটেনি। বিভিন্ন মতের এসব
অন্ধ ব ...... স্বভাবতঃই আবেগের ঘন কুয়াশা ভেদ করে পরস্পরের অভিন্ন স্বার্থকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন সেই অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে পরস্পরের কাছাকাছি হতে। ফলে প্রায় সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে, প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই আমরা দেখেছি সেই চূড়ান্ত বেদনাময় দৃশ্য—যাঁদের বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত হাত ধরাধরি করে চলার কথা ছিল, মত বিনিময়ের মধ্যদিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি আসার কথা ছিল, তাঁরা ধর্মযুদ্ধের অন্ধ উন্মাদনা নিয়ে, পরস্পরের প্রতি প্রবল ঘৃণা নিয়ে পরস্পরের গলা চেপে ধরেছেন, পরস্পরকে আঘাত করেছেন, পরস্পরের রক্তে হাত রাঙিয়েছেন। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কুৎসিত কোলাহলের মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একেবারেই মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এক বিরাট অন্ধকার সমস্ত কিশোর-ছাত্র-যুব সমাজকে পঙ্গু করে ফেলেছে।

এই সর্বগ্রাসী অন্ধকার যে নিতান্তই সাময়িক, এ আমরা সবাই জানি। আর তার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ সারা দেশ জুড়েই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলি যাতে দিকচিহ্নহীন কোন আবর্তে আবার পড়ে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ না করে ফেলে, যাতে তা সমগ্র কিশোর-ছাত্র-যুব সমাজকে এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভিত্তি রচনা করতে পারে, তার জন্য আজ সবচেয়ে বেশী দরকার যুক্তিহীন আবেগসর্বস্বতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

এই কাজ 'বীক্ষণ' সম্পূর্ণ সততার সাথে চালিয়ে যাবে। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অর্থ ও সেই লক্ষ্যে পৌছনোর ক্ষেত্রে কিশোর-যুব-ছাত্রসমাজের ভূমিকা—এর উপর সমস্ত ধরণের মতামতের জন্য 'বীক্ষণে'র পাতা খোলা থাকবে। রচনার তথ্যনির্ভরতা ও যুক্তিগুলির পারস্পরিক সঙ্গতিই এখানে একমাত্র বিবেচ্য হবে। এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্কে 'বীক্ষণ'ও সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করবে কোন গোঁড়ামী নিয়ে নয়, যা ঠিক তাকে জানার আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে। অন্য সবাইও একইরকম ভাবে পরস্পরকে বুঝবেন, পরস্পরের কাছ থেকে শিখবেন।

এর অর্থ কোন কেতাবী বিতর্কের সূত্রপাত করা নয়। বাস্তব জীবনের সমস্যা ও সংগ্রাম থেকে উঠে আসা তথ্য, সেই সমস্যাগুলির বাস্তব সমাধান, সেই সংগ্রামের বাস্তব কার্যক্রম খোঁজার চেষ্টা—এরই ভিত্তিতে চলবে এই বিতর্ক। ন্যায়বিচারের পথের সন্ধান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় না। তাই দেশ ও বিদেশের সর্বত্রই যেখানেই ছাত্র-যুবদের এই সংগ্রাম চলছে তার সমস্ত সংবাদের জন্যই 'বীক্ষণে'র পাতা খোলা। কোন মত বা দলের "নেতৃত্বে" সেগুলি চলছে, সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার প্রকাশযোগ্যতা বিবেচিত হবে না।

আমরা জানি এ কাজ করার চেয়ে বলা সহজ। অনেকদিন ধরে এ পথে না চলে, এ পথের রেখা খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। সেজন্যই উপরের সমস্ত কথাগুলিই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। এ ইচ্ছা সফল হ'তে পারে একমাত্র যদি, যাঁদের জন্য এই পত্রিকা, সেই কিশোর-ছাত্র-যুব ও তাঁদের ভালোমন্দের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে থেকে আমরা সাড়া পাই। আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে এ দেখেই যে, খুব সীমিতভাবে হলেও এই সাড়া আমরা ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছি।

## কবিতাই শেষ অস্ত্র নয়

দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতাই শেষ অস্ত্র নয়। শুধু অস্ত্রের ঝংকার
মহাযুদ্ধের আগে অর্জুনের গাণ্ডীব টংকার
পার্থসারথীর পাঞ্চজন্যের বজ্র নির্ঘোষ
অথবা পাশুপতের দৃপ্ত অসন্তোষ।
প্রতিবাদই শেষ অস্ত্র। কবিতা তার বাণীরূপ
মহাকালের মহাকাব্য অগ্নিময় কবিতাস্তূপ।
প্রতিবাদই বীর অর্জুন, কবি শুধু বেদব্যাস
রণাঙ্গনের ইতিহাসে কবিতা জয়ের উচ্ছ্বাস।
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের কাছে কবির কলম
দুর্নিবার
কবিতাই শেষে যুদ্ধ করে, প্রতিবাদ তার হাতিয়ার॥

## অনেক ক'টা দিন কেটে গেছে

পলাশ দাশ

অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল
কামানের ক্রুদ্ধ গর্জন
আর রুগ্ন শিশু বক্ষে দুঃখিণী মায়ের
অস্ফুট আর্তনাদ।

হাজার তরুণের বুকের রক্তে
একটা নতুন ঝর্ণা তৈরী হয়েছিল।
মরুভূমির মাঝে জলের ছায়া দেখে একদিন
ভ্রম হয়েছিল:
সেই ঝর্ণায় শোণিত সমাধি হয়েছে
সাদা দস্যুর শাশ্বত দুর্গ গড়ার
দুঃসহ প্রচেষ্টা।

পুবাকাশে রক্তস্নাত সূর্য উঠেছিল
অনেক প্রতিজ্ঞা অনেক আশার প্রতীক হয়ে।
আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম।

তারপর একটি একটি করে
অনেকদিন কেটে গেছে,
কিন্তু সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে
আহুতি দিয়ে
সমাধি গর্ভ থেকে উত্থিত হয়েছে
শত্রু-সংস্কৃতিরই রূপান্তর।

তাই এই মুহূর্তেও
সেই পুরোনো দৃশ্যের অবতারণা হয়—
দুঃখিণী মায়ের কপালে চিন্তার সহস্র বলিরেখা
রুগ্ন শিশুটি একটুকরো রুটির জন্য
কেঁদে কেঁদে শেষবারের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে।
প্রতিদিনের সূর্য আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা
মনে করিয়ে দেয়
আর আমরা স্বনির্ভরতার দোহাই দিয়ে
আমাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি।
আমাদের মেকী সান্ত্বনা আঁচড় কাটেনা—
জননীর তৃষিত হৃদয়ে,
যুবকের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ চিন্তায়।
মায়ের শেষ সম্বলটুকুও বিলীন হয়
সন্তানের পর্যাপ্ত শিক্ষার সংস্থানে,
গভীর প্রত্যয়ে স্নেহাস্পদকে ঘিরে
অলীক কল্পনার জাল বোনেন।
ডিগ্রীর বোঝা কাঁধে নিয়ে
অবসন্ন ক্লান্ত দেহগুলো নুয়ে পড়ে
সামান্য একটি চাকরীর সন্ধানে।
বৃথা হয় আলেয়ার পেছনে ঘুরে মরা।

মায়ের বিষণ্ণ মুখ ভায়ের রোগক্লিষ্ট দেহটি
তাদের ব্যঙ্গ করে
অসহ্য শোক যন্ত্রণা তাদের কুরে কুরে খায়।

সময় ভুলিয়ে দিয়ে যায় সবকিছু।
তারপর আবার সেই স্মরণীয় দিনটিতে
পার্কে, মাঠে, রাস্তায় সর্বত্রই
আমরা অন্তঃসারশূন্য চিৎকার করে বলি—
আমরা শৃঙ্খলমুক্ত, আমরা স্বাধীন।
তখন কিছুটা আত্মগতভাবেই উচ্চারিত হয়—
আমরা অমানুষ, আমাদের জন্ম মিথ্যা
আমরা হৃদয়হীন, আমরা পরাধীন।

গল্প

# পাশাপাশি

ময়ূরবাহন দেব

নিউমার্কেটের হোটেল রেস্তোরাঁয় 'হ্যাপি খ্রীষ্টমাস' লেখা রঙচঙে সান্টাক্লজ বুড়োটার ছবির উপর ক'দিনের ধুলো জমেছে। সাহেব-পাড়াতে কাগজের তারাগুলো জলজল করছে, তবে একটু নতুন ভাষায়—হ্যাপি নিউইয়ার্স্ ডে, হ্যাপি নাইন্টিন সেভেন্টিথ্রী।

ময়দানের সামনের বড়ো হোটেলটায় অর্ডার আসতে আরম্ভ করে, নানান স্বাদের নানান সাজে সাজানো কেক পেষ্ট্রির।

পাঁচটা দিন তো! ঠিক কেটে যায়। গীর্জের ঘড়িতে বেজে ওঠে রাত বারোটার ঘণ্টা, ঢং ঢং করে বাজে। জাহাজের ভোঁ ডাক দেয়—ওয়েলকাম সেভেন্টিথ্রী... ওয়েলকাম......ওয়েলকাম সেভেন্টিথ্রী ওয়েল——আর বকতে পারে না বুড়ো হেনরি সাহেব। কাশির দমকটা আবার আরম্ভ হয়েছে। অন্ধকার ঘরের কোণটায় একমনে এটুকরো সিগারেট ফুঁকছিলো হেনরী সাহেবের তেরো চোদ্দ বছরের মা বাপ মরা নাতিটা। বিরক্ত মুখে একটা মাটির ভাঁড় এগিয়ে দেয় ছোঁড়াটা। বিরক্ত হবে না! কত ভালো ভালো কথা চিন্তায় এসেছিল তার। সেও অমন করে একদিন একত্রিশে ডিসেম্বরের রাত্রে ঝলমলে পোষাক পরে গীর্জেতে যাবে। ডিনার টেবিলে সাজানো থাকবে কেক, পুডিং, মাংসের বাটি। একবার মনে তার উঁকি দিয়েছিলো সন্দেহটা—হবে কিভাবে? পরক্ষণেই দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে সে ভাবনাটাকে। কেমন করে তা জানে না; জানে সব ঠিক হয়ে যাবেই।

বুড়োটা মরেও মরেনা। একটা বিশ্রী গালাগাল এসে যায় মুখে। অমন সুন্দর চিন্তাটাই মাটি হোলো জর্জের।

খক্ খক্ খক্ খক্। বুক চেপে কাশে বুড়োটা। ওদিকে দূরের কান গীর্জে থেকে ভেসে আসছে নতুন বছরের প্রার্থনা সংগীত.......।

একটু থামে কাশিটা। একদলা রক্ত ফাটধরা ঠোঁটের কাছে যাওয়া চামড়াটার কাছে এসে ছড়িয়ে পড়ে। কস বেয়ে আসে রক্ত। ফোঁটা ফোঁটা করে জমে। মাছি ভনভন্ করে ভাঁড়ে।

শুকনো ভাঁড়টা তাড়াতাড়ি শুষে নেয় রক্তটা।

ভাঁড়টা ভাবে বোধহয়—সবাই বুড়োকে শুষছে, আমি ছাড়ি কেন?

ওদিকে বুড়ো হেনরীর এগারো বছরের নাতিটা ঘরের বসে ভাবে—বছরের শুরুতেই এমন! সম্বচ্ছরটা টিকবে বুড়োটা।

গীর্জের গানটা তখনও ভেসে আসছে। গলির মোড়ে রঙীন আলোয় ঝকঝক করছে লেখাটা—ওয়েলকাম সেভেন্টিথ্রী।

আবার মিষ্টি স্বপ্নে মশগুল হয়ে যায় ছেলেটা। চোখ তার জানলার ফাঁক দিয়ে চলে গেছে শীতের আকাশে।

তারা ভরা আকাশে একরাশ রূপোলী ফুল ছড়াতে ছড়াতে মিলিয়ে যায় একটা উড়নতুবড়ি।

তুবড়ির হিস্ হিস্ শব্দ। বুড়ো বুজে থাকা চোখটা খুলে ঘুরে যায় এদিকে ওদিকে, ভুলে যায় চোখদুটো তার একদিন ছিল আর নেই।

খট্ খট্ খট্ খট্। আধভাঙ্গা দরজায় ঘা পড়ে।

এত রাত্তিরে কে এলো আবার? গল্পের সান্টাক্লজ নাকি? রগড়ে নিয়ে জর্জ প্রশ্ন করে—"হু ইজ দেয়ার?"

জর্জের শেষ আশাটুকু গুঁড়িয়ে উত্তর আসে—"উই রিপোর্টারস।"

একঝলক ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানো শীত হুড়মুড়িয়ে ঢুকে

ঘরে, ওদের ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই। আসবার সময় পুরোনো আমলের কব্জাটাকে জানিয়ে আসে—হ্যাপি নিউইয়ার।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ কটর্ কটর্......শুভ নববর্ষ, শুভ নববর্ষ। জানাতে ভোলে না কব্জাটাও। বুড়ো হেনরি সাহেব ছেঁড়া ব্যাগটাকে আরো জড়িয়ে ধরে। দাঁতে দাঁতে কনসার্ট বাজে জর্জের। দাঁতগুলোও জানাচ্ছে—হ্যাপি নিউইয়ার। ফ্যাকাশে ঠোঁটগুলোই শুধু বলতে চাইছে না, বলতে দিচ্ছে না। জবাব চাইছে তারা। হিসাব চাইছে গত-বছরের দিনগুলোর। কটা রাত্তির তাদের কেটেছে ভরা পেট নিয়ে? তারাও তো গতবছর ঠিক এমনভাবে বলেছিলো—"হ্যাপি নিউইয়ার, হ্যাপি নিউইয়ার, ওয়েলকাম নাইন্টিন সেভেন্টি-টু।"

কি ফল হয়েছিলো তাদের কথাগুলো বলে?

সাদা পাতার বুকে কালোশিষের ডগাটা ছুঁইয়ে প্রশ্ন করেন সাংবাদিক—

"গত বছরটা কেমন কাটলো সাহেব?"

"ভেরী স্লোলি মিষ্টার, ভেরী স্লোলি; অন্লি এ সেকেণ্ড ওয়াক্ড লাইক এ্যান ইয়ার, মিষ্টার রিপোর্টার। ডেজ আর পাসিং ভেরী স্লোলি, ভেরী ভেরী স্লোলি।"

নিস্তব্ধ ঘরে পেন্সিলের খস্‌খস্ আওয়াজ ওঠে। জানলা দিয়ে আনন্দের, উৎসবের, তুব্ড়ির ফুলকিগুলো একঝলক রূপোলী আলো ছিটিয়ে যায় ঘরে।

ওরা বুঝি উঁকি দিয়ে দেখে যায় সাদা পাতার বুকে কালো পেন্সিলে লেখা হাজার হাজার হেনরী সাহেবদের প্রাণের কথাটা—"দ্য লাইফ্ ইজ সো বোরিং।"

রিপোর্টার চলে যাওয়ার সময় 'শুভ নববর্ষ' জানাতে ভোলে না। বুড়ো হেনরীর কানে বিদ্রূপ ছড়িয়ে যায় শব্দগুলো। বাইরের থেকে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে ঢুকে পড়ে হোটেলের কনসার্ট, বলরুমের উন্মত্ত জাজসেটের আওয়াজ।

ছোট্ট জর্জের দাঁতগুলো আবার অবাধ্যতা শুরু করেছে। ফ্যাকাশে ঠোঁটদুটো একে অপরের ওপর চেপে বসে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। ওরা উচ্চারণ করতে দেবে না শব্দটা, আগে হিসেব চায়।

রাত শেষ হয়ে আসছে।

ময়দানের গাছগুলোতে বসা কাকগুলো নড়ে চড়ে বসে।

সামনের অতবড়ো হোটেলটা থেকে একটা দুটো করে, বড়ো গাড়ীগুলো বেরিয়ে আসতে থাকে।

এমনই এক গাড়ীর সামনে রিপোর্টার হাত তুলে দাঁড়ায়। সোফার থামে।

হল্ সাহেব বেশ কিছুটা বেহুঁশ। তবুও চিনতে অসুবিধা হয় নি রিপোর্টারকে।

—"কেমন কাটলো সাহেব বছরটা?"

—"দ্য ডেজ আর পাসিং সো আরলি রিপোর্টার। দ্য ইয়ারস্ অফ লাইফ অলসো পাসিং সো আরলি।"

—"থ্যাঙ্ক ইউ।" মাথা নোয়ায় রিপোর্টার।

—"হ্যাপি নিউইয়ার।" উত্তর আসে জড়ানো গলায় গাড়ীটা থেকে। ততক্ষণে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়েছে গাড়ীটা—ফরেন ইম-পোর্টেড, দেড় লাখ টাকার গাড়ী।

বড় হোটেলের শো-কেসের সান্তাক্লজের ছবিটা, গলির মোড়টার "হ্যাপি নিউইয়ার" লেখা তারাটার আলো ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে এসেছে। একটু বাদেই, নতুন বছরের ভোরে কোটি কোটি বছরের পুরোনো সূর্যটা উঠবে।

রিপোর্টার রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে। তার হাতের খাতার পাতায় লেখা হয়ে থাকে দুটো মানুষের জবানবন্দী। পাশাপাশি।

★ **গত সংখ্যায়** চিঠিপত্র বিভাগের শেষ চিঠিটির (পৃ—চল্লিশ) শিরোনামাটি, অসাবধানতাবশতঃ "একটি বিজ্ঞান সম্মেলনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে"র জায়গায় ছাপা হয়েছে "একটি বিজ্ঞান কলেজের রিপোর্ট প্রসঙ্গে"।

★ **এই সংখ্যায়** "স্কুলের পাঠক্রমে শারীরবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে একটি আলোচনা সভার রিপোর্ট" লেখাটির শিরোনামার উপরে বন্ধনীর মধ্যে "বিজ্ঞান ও এদেশ" কথাটির জায়গায় ছাপা হয়েছে "রিপোর্ট"।

॥ এই ত্রুটির জন্য আমরা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী—সঃ মঃ বঃ ॥

> ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে ছেলেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে—পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।
>
> কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্ন-দৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। —রবীন্দ্রনাথ

# সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঃ

## ভারতের গণবিদ্রোহের শংখধ্বনি*/নীলাদ্রি ঘোষ

আমাদের একটা ইতিহাস আছে—বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরবময় ইতিহাস, অথচ প্রচলিত ইতিহাস বলে আমরা যা জেনে আসছি, আমরা যা জানছি স্কুল-কলেজের চত্বরে, আসলে তাকে বলা উচিত ইতিহাসের বিকৃতি। বিদ্রোহী জননায়কদের আমরা দেখে আসছি "লুণ্ঠনকারী দস্যুসর্দার হিসাবে"। বঞ্চিত নিপীড়িত কৃষকের বিদ্রোহবহ্নি দাসত্বের দর্শনব্যবসায়ীদের হাতে হয়ে উঠেছে স্রেফ ডাকাতি। আজ যারা 'ম্যানড্রেক্স' খেয়ে অপসংস্কৃতির অবসাদে হতাশার অতল গহ্বরে মুক্তির স্বাদ পেতে চাইছে, তারা যদি একবার পিছনে ফিরে তাকায়, তারা যদি দু'শ বছরের প্রাচীন বাংলাকে একবার জানতে চায়, তাহ'লে দেখতে পাবে মন্বন্তর মহামারীর শ্মশানে দাঁড়িয়ে এদেশের বুভুক্ষু, অর্ধভুক্ত মানুষ কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে বৃটিশ বেনিয়াদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

**'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড'** হয়ে দেখা দেওয়ার পরে বৃটিশ যে ব্যাপক অত্যাচার ও অবাধ লুণ্ঠনের স্টীমরোলার এদেশের কৃষকের উপর চালিয়েছিল তার আশু ফলশ্রুতি ঘটেছিল বাংলা-দেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে। যতদিন পৃথিবীর বুকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বেঁচে থাকবে ততদিন বাংলার মানুষ এই মহাদুর্ভিক্ষের কথা ভুলতে পারবে না—পারবে না, কারণ বৃটিশ লক্ষ লক্ষ মানুষকে না খেয়ে মরতে বাধ্য করেছিল, কিন্তু না—**'ছিয়াত্তরেও আমরা মরিনি'**। এই মন্বন্তরের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়েই বৃটিশের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ-প্রতিরোধ প্রথম দানা বেঁধে উঠল।

সালটা ছিল ১৭৬৩। হঠাৎ এক রাত্রে ঢাকার ইংরেজ ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেল। অতর্কিত আক্রমণে সাহেবরা ফেলে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। যে দেশের কেবল আক্রান্ত হয়ে এসেছে তাদের এই প্রথম পাল্টা আক্রমণে থমকে দাঁড়ালে। বৃটিশের দোর্দণ্ড প্রতাপকে কারা সে'রাত্রে জানিয়েছিল? সুরক্ষিত ইংরেজ কুঠিকে কারা সেদিন অসহ তুলেছিল? ইংরেজের খয়েরখাঁ ঐতিহাসিকের দল একে করেছে লুণ্ঠনকারীদের দুষ্কৃতি হিসাবে। কিন্তু কেবলমাত্র কুঠিই নয়, একে একে আরও বহু ইংরেজ কুঠি আক্রান্ত হল। আক্রমণ হল রাজসাহী জেলার রামপুর-বোয়ালিয়ার ইংরেজ উপর। এর পর আক্রমণের ব্যাপকতা কেবলমাত্র ছোটখা উপরই সীমাবদ্ধ রইল না। ইতিহাস বলছে সাঁইত্রিশ বৎসরে অধিককাল সময়ব্যাপী বৃটিশের সশস্ত্র বাহিনী সমগ্র বাংলা ও হিমসিম খাচ্ছে এই ধরণের আক্রমণের মোকাবিলা করতে খণ্ডযুদ্ধে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, গোরাসৈন্যের শোচনীয় তাদের গর্বের ইমারতকে ধূলিসাৎ করে দিল। নদীমাতৃক বাংল নদীপথ তখন বৃটিশ আর তার পেটোয়া জমিদারদের কাছে হয়ে উঠল।

ওয়ারেন হেস্টিংস্ আর তার পোষ্যবর্গ এইসব আক্রমণকে বা যাযাবর দস্যুদের কার্যকলাপ বলে চালাবার চেষ্টা করলেও মানুষ তা' বিশ্বাস করেনি। জনৈক যামিনী ঘোষ বাংলা-বি এই বিদ্রোহীদের **"বহিরাগত যাযাবর প্রকৃতির নাগাস ও ভোজপুরী দস্যু ডাকাতদের উৎপাত হিসাবে বি করেছেন।"** ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজ ভজনা—Daw New India-তে যামিনী ঘোষের কথারই পুনরাবৃত্তি। বাস্তবে হেস্টিংসের ভাবমূর্তি রক্ষা করেছেন সুন্দরভাবে।

---

*সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ব্যাপ্তি, বিস্তার, তার ব্যাপকতা ও তাৎপর্য স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা অসম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে মাত্র। —

বাংলার সাধারণ মানুষ এইসব আক্রমণ-সংগঠনকারীদের আদৌ দস্যু হিসাবে দেখেনি। দেখেনি নাগা-ভোজপুরী ডাকাত হিসাবে। দেখেছে বিদ্রোহী বীর হিসাবে। তারা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ জানিয়েছে এই বিদ্রোহকে। তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের স্বপক্ষে বিজয়লাভের জন্য সমস্তরকম সহায়তাই করেছে। জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধকে 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামে অভিনন্দন জানিয়েছে।

যারা এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিল তারা সকলেই ছিল সংসারের সংগে সম্পর্কিত সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থ ফকির। বৃটিশের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অসির ঝংকার লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষণ-জর্জরিত বাংলার জনজীবনে 'মঙ্গল শংখধ্বনি স্বরের' মতই এসেছিল। বৃটিশ সামরিক শক্তি যে অপরাজেয় নয়, এই চেতনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলা-বিহারের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

কিন্তু কারা এই সন্ন্যাসী? কারাই বা এই বিদ্রোহী ফকির? এরা কেউ হঠাৎ জন্ম নেয় নি। এরা কোন ভুঁইফোড় বীরের দল নয় — নয় কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুকর। বৃটিশের অংগলশাসন আর অবাধলুণ্ঠনের ফলে তৎকালে যে জটিল সামাজিক বিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল—এরা সেখান থেকেই উঠে এসেছিল। এই সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায় আসলে ছিল ভূমিহীন কৃষকের দল এবং বৃটিশের দেশীয় কুটীরশিল্প বিধ্বংসের শিকারে হাজার হাজার বেকার কারিগর। এরা এতদিন যেভাবে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিল ইংরেজ তার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল। কৃষকের উপর শোষণ চরম পর্যায়ে উঠল। বাংলার মসলিন উৎপাদনকারী দক্ষ কারিগররা বৃটিশের শারীরিক উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেল। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের তীর্থযাত্রায় কর বসিয়ে ইংরেজ তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে তুলল। নতুন নতুন আইন করে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধক গড়ে তুলল। বহু ছোটখাট জমিদারও সময়মত খাজনা দিতে না পেরে ইংরেজদের অত্যাচারের ভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর বাংলার জনগণের সামনে দুটি রাস্তাই খোলা ছিল—হয় এই অসহনীয় অবস্থা মেনে নিয়ে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া, মন্বন্তরকে দুর্ভাগ্য হিসাবে মেনে নেওয়া, বৃটিশ-রাজের পায়ে নতিস্বীকার করা নতুবা বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, ইংরেজ-কুঠির যাবতীয় ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া এবং জনজীবনে বৃটিশ হুকুমনামা চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া। সন্ন্যাসী আর ফকির সম্প্রদায় দ্বিতীয় পথই বেছে নিল। ব্যাপক উৎপীড়িত কৃষক জনতা তাদের নির্দেশিত পথে সামিল হল। আলখাল্লা আর গৈরিক বসনের ভেতর ঠাঁই পেল তরবারি।

যে মহান আদর্শ ও চেতনা নিয়ে এই ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন হয়েছিল সে সম্পর্কে জনৈক ইংরেজের স্বীকারোক্তি প্রণিধানযোগ্য: **"সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ সংগ্রামী কৃষক ও কারিগরদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল বিদেশীদের কবল হইতে দেশের মুক্তিসাধন ও ধর্মরক্ষার আদর্শ; সর্বস্বত্যাগ, দেশমাতৃকার প্রতি অচলা ভক্তি, অন্যায়ের বিনাশ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ এবং প্রবল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীর 'ঐক্যগঠন'— এই সকল হইল সেই পরমধর্ম পালনের শ্রেষ্ঠতম পন্থা।"**

কোন ব্যাপক গণবিদ্রোহের সাফল্যের জন্য যে লক্ষ্য ও আদর্শ, যে নেতৃত্ব, যে সংগঠন ও সংগ্রামী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে তার অভাব ছিল প্রচণ্ড। কখনই কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরিচালনায় সুসংগঠিত বিক্ষোভ ব্যাপক এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। কোটি কোটি অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, মৃতপ্রায় কৃষকের মধ্যে বছরের পর বছর পুঞ্জীভূত অসন্তোষ অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই বিদ্রোহের আকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে বাংলা বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে ফেটে পড়ে। এই খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের সংগে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা যুক্ত করে সন্ন্যাসী ও ফকিররা একে সার্বজনীন আবেদনগ্রাহ্য করে তুলবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। আর এই প্রচেষ্টার কর্ণধার হিসাবে আমরা যাঁকে দেখতে পাই, তাঁর নাম মজনুশাহ বা ফকির মজনু।

মজনু তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহী দলগুলিকে নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক সংগঠন গড়ে তুলবার পথে যথেষ্ট এগিয়ে যান। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সামরিক নৈপুণ্য সমস্ত বিদ্রোহীদের মনে প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি করত। তাঁকে আমরা কখনও দেখছি উত্তরবঙ্গের ব্যাপক এলাকায় কার্যতঃ শাসনকর্তা হিসাবে। কখনও দেখছি বৃটিশ বাহিনী অবিরাম তাঁর পিছু ধাওয়া করে চলেছে। মজনুশাহকে কখনও দেখা যায় বাংলা সীমান্ত ছাড়িয়ে বিহারে পরবর্তী আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। ফকির মজনু আবার কখনও সিলেটের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আত্মকলহ মেটাবার জন্য। ১৭৮৬-র ডিসেম্বর অবধি মজনু ফকির একদিনের জন্যও বৃটিশকে শান্তিতে থাকতে দেন নি।

আমাদের দুর্ভাগ্য—দুর্ভাগ্য এই আত্মবিস্মৃত জাতির যে বাংলার বৃটিশ-বিরোধী প্রথম গণবিদ্রোহের এই মহানায়ক সম্পর্কে কেউ কখনও কোন প্রামাণ্য ইতিহাস লেখেনি। আজ থেকে দু'শ বছর আগে যাঁর নামে বৃটিশের বুকে ত্রাসের ঝড় বইত, যাঁর গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের কাছে বৃটিশের সামরিক শক্তি অসহায় হয়ে পড়েছিল; যাঁর আহ্বানে হাজার হাজার যুবক দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল—লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী যাঁর মঙ্গল কামনা করত, ভারতের প্রথম

[ এরপর ৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন

# সভ্যতার উদ্দেশ্যে

বিমল মুখোপাধ্যায়

● বিমল মুখোপাধ্যায়ের গল্পের স্বাদ 'বীক্ষণে'র পাঠক-পাঠিকারা এই প্রথম পাবেন। 'বীক্ষণে' তাঁর গল্প ছাপতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। ধরেই নিচ্ছি, এই গর্ব ও আনন্দের কারণ আপনাদের জানা নেই। কারণ তাঁর লেখা রসজ্ঞ ও সমঝদার পাঠকের সামান্যতম একটি অংশের বাইরে ব্যাপক সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবার আগেই অতর্কিত নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁকে সে সুযোগ ও অবসর থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই তাঁর গল্পে প্রবেশ করার আগে তাঁর সম্পর্কে দু'চার কথা বলার তাগিদ বোধ করছি।

১৯৪৫'র ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের মাটিতে বিমল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। জন্মলগ্নের যন্ত্রণা, যুগের যন্ত্রণা, আর উত্তরণের সন্ধানে তাঁর তেইশটা দুরন্ত বসন্ত কাটে।

ক্রীক রো মেট্রোপলিটান স্কুলকে দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচাতে ছাত্রদের সাথে এবং অন্যান্য শিক্ষকদের একত্রিত করে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছেন। তাঁর এই সংগ্রামী মেজাজের স্বাক্ষর, তাঁর প্রতিটি গল্পে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর **'অন্নদা'**, **'পাহাড়ের সিঁড়ি'**, **'বর্ষামঙ্গল'**, এই তিনটি মুদ্রিত গল্পই রসিক মহলে আলোড়ন আনে। অন্নদা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নারী—চাল ব্ল্যাক করে, তাদের দল আছে। তারা জানে কাজটা অন্যায়। বিভিন্ন উৎপাদনশীল বৃত্তি থেকে ছাঁটাই হতে হতে তারা এই পাপ কাজে ঢুকেছে। আর এই পাপের লাভটা গিয়ে ওঠে মহাজনের গদিতে। শেষে পুলিশ অন্নদাকে ধর্ষণ করে। আর গোটা দলটা ফেটে পড়ে বিক্ষোভে সংগ্রামে। কিন্তু পঙ্গু জীবনের সংগ্রামের শেষে নামে পরাজয়, যা তাদের জীবনের মতোই অবশ্যম্ভাবী। সমরেশ বসুর 'এসমালগার' গল্প একই বিষয় নিয়ে রচিত হলেও, দৃষ্টিভঙ্গীর একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। বিমল মুখোপাধ্যায়ের অন্নদারা, কোথা থেকে এসেছে তা' স্পষ্ট—এই ছ্যাঁচড়াবৃত্তি আসলে যে সমাজপতিরাই চালাচ্ছেন তা পরিষ্কার দেখিয়ে দেয়। অন্নদারা বাঁচতে চায়। বাঁচতে চায়, আরেকটা শক্তিকে ভরসা করে—"দস্যু রত্নাকরের ......বাল্মীকিত্ব লাভের বুকচাপা যন্ত্রণায়"......যখন "অন্নদার শরীরটা রাতারাতি বাংলাদেশ হয়ে" উঠবে।

পাহাড়ের সিঁড়িতে আমরা পাই একটি নিরতিশয় মধ্যবিত্ত পরিবার, তার যন্ত্রণা এবং শেষহীন মুক্তি আহ্বান। এই মুক্তির সুরই বিমল মুখোপাধ্যায়ের সুর। কোথায় যেন আমরা স্বাধীন নই। কি যেন আমাদের মাথাটা বারবার ঠুকে দিচ্ছে। কিন্তু মানুষতো বাঁচবে। 'বর্ষামঙ্গল'ও সমাজসচেতন আর যন্ত্রণাপ্রধান শিল্পকর্ম। **'প্রভাত সাইকেল ষ্টোর'** বিমল মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র মুদ্রিত উপন্যাস। ১৩৬৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর এই শক্তিশালী গল্পকার অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে জলে ডুবে মারা যান।

বর্তমান গল্পটি তাঁর স্কুলের ছাত্রাবস্থায় লেখা। অন্যান্য গল্পগুলির তুলনায় গল্পটি তেমন পরিণত নয় বলে, জীবিত অবস্থায় কখনো গল্পটি ছাপতে তিনি রাজী হননি। কিন্তু তাঁর নিজের মত যাই হোক না কেন, কৈশোরে লেখা তাঁর এই গল্পটিতে প্রকাশভঙ্গীর ঋজুতা আশ্চর্যভাবে লক্ষ্যণীয়। গল্পটির মধ্যেই আমরা দেখতে পাই, পরিণত বিমল মুখোপাধ্যায়ের জন্মের ইঙ্গিত।

উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা তাঁর প্রায় সবক'টি গল্পই অধুনালুপ্ত 'হিন্দোল' পত্রিকার পুরোন সংখ্যাগুলো খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। সঃ বীঃ ●

॥ ১ ॥

নিবারণ স্যাকরা কিছুক্ষণ তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে নিকুঞ্জ বাউরীর তাকিয়ে, তারপর তার দোকানের মালপত্রের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উত্তর দিল—"কেনে তোর খোকাকে মিলিক পাউডার খাওরা না; সে জিনিসটা ত' মন্দ নয়।"

নিকুঞ্জ বাউরী 'মিলিক পাউডার' অর্থাৎ মিল্ক পাউডারের নাম ও

কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে কিছু ভাবল; পরক্ষণেই বলল, "ও, সেই গুঁড়া গুঁড়া দুধগলার কথা বইলছ?"

—"হঁহঁ! গুঁড়া গুঁড়া দুধ! জল দিয়ে গুলে খাওয়াইন্দিবি।" নিবারণ সাধুখাঁর নির্দ্দেশ।

নিকুঞ্জ বাউরী তার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। সারা মুখে ওর বিতৃষ্ণার তিতিক্ষা। তারপর হাঁটুর উপর থুঁতনি দিয়ে চিন্তা করতে লাগল আবার। গত পাঁচদিন হল সে তার স্ত্রীকে হারিয়েছে। সারা গাঁয়ে কলেরা তার করাল ছায়া নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিন তার বউ 'পদ্ম' ঘাট থেকে এসেই ভেদবমি শুরু করল। ডাক্তার ডেকে পাঁচ টাকা দিয়ে সে দুটো সুই দিইয়েছিল। বলাই বাহুল্য কোন ফল হয়নি। মরে গেছে। ডাক্তার বলেছিল আরও দুটো সুই-এর দরকার। কিন্তু নিকুঞ্জ নগদ দাম দিতে না পারায় তার স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। তাই নিকুঞ্জ এখন বড্ড বেশী শোকাতুর। কিন্তু এবার আবার 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' হয়ে দাঁড়িয়েছে তার শিশুপুত্রটি। সদ্য মাতৃহীন রুগ্ন ছেলেটা। তার দুধ যোগানো একটা ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে। নিকুঞ্জর পয়সা নেই। বিনা চিকিৎসায় তার স্ত্রী মারা গেছে। তাই এই কলেরায় আক্রান্ত গ্রামে দুর্মূল্য দুধ কেনার সামর্থ্য তার নেই। চেয়ে চিন্তে ধার করে সে দাম দিয়ে দুধ কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু দুধের বড্ড বেশী টানাটানি। গ্রামে যে দু-ঘর গোয়ালা আছে তাদের সমস্ত দুধ যায় জমিদার এবং অন্যান্য বাবুদের দুধের যোগা দিতে। তাই এই বিংশ শতাব্দীর কৃষক নিকুঞ্জের রুগ্ন-মুমূর্ষু শিশুপুত্রের ভাগ্যে সামান্য একটু গরুর দুধ জোটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওলাওঠা—কলেরা; সারা গ্রাম জুড়ে একটা আতঙ্কের ভয়াল ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। সন্ধ্যে হয় হয়। বাঁশঝাড়ের ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দ—ডোবার জলে মশার ভনভনানি—জোনাকির মিটমিট, ভীত গতিবেগ—সমস্ত কিছু মিলে যেন কেমন একটা গা ছমছম ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। আবার মাঝে মাঝে আশ্বিনের পাগলা কুকুরগুলোর কেঁউ কেঁউ আর্তনাদ একটা তেতো চেতনা জাগিয়ে দেয়।

"নাঃ উঠি! কই দাও গো"—বলে নিকুঞ্জ খুঁট থেকে কয়েকটা পয়সা বের করে নিবারণের দিকে বাড়িয়ে একহাত দিয়ে কাগজে মোড়া দুধ নেয়, আর একহাত দিয়ে পয়সাক'টা দিয়ে দেয়। নিবারণ মিল্ক পাউডার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল। সেটাকে দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে মুখ বিকৃত করে তার মেদবহুল দেহখানিকে কোনক্রমে তুলে তারপর বলে, "দশ নয়া দিলে, দু'নয়া পাব খেয়াল রাইখবি। নাঃ যাই। আবার ধূপধুনা দিতে হবেক অখন।"

নিবারণ সাধুখাঁর সবসময় হাঁটু অবধি কাপড় থাকে, আর গায়ে একটা ফতুয়া। সেটাকে ভেদ করে যেন তার স্ফীত দেহখানি বেরিয়ে আসতে চায়—ফতুয়ার ভেতরে থাকতে অসহ্য লাগে তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিবারণের অধ্যবসায় জয়ী হয়ে জোর করে বোতাম আটকে তাকে ভেতরেই রেখে দেয়। ঠিক যেমন তার অগাধ সম্পত্তির কথা গোপনীয় হলেও এ'গাঁয়ের সবাই জানে।

মহামারীতে আক্রান্ত গ্রামটাতে একটা বিস্ময়ের রোল তুলে এই ভর সন্ধ্যেবেলায় একটা ছোট্ট জীপগাড়িতে করে আসেন পাশের শহর থেকে এক শেঠজী—মাড়োয়ারী, নিবারণের মুদিখানার সামনে সেটা থামলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে নিবারণ। এ গাড়ীর শব্দ তার চেনা যে। শেঠজীও নিবারণের মতো মুখ বিকৃত করে কোনক্রমে তাঁর ভুঁড়িওয়ালা শরীরটাকে নামান গাড়ী থেকে। তারপর "হেঁ হেঁ—ভালো আসেন তো"……বলে পরস্পরের নমস্কার বিনিময় চলে। বিনয়ে ও শ্রদ্ধায় নিবারণের ঘাড়টা হেট হয়ে আসে। "আসুন, আসুন"……বলে নিবারণ তাঁকে সাদর সম্ভাষণ করে নিয়ে যায় ভেতরে। নানারকম চোরাকারবারে সিদ্ধহস্ত এই শেঠজী। জগতের সবরকম জোচ্চুরি যেন জড়িয়ে আছে এই শেঠজীর সর্বাঙ্গে, চরিত্রে। নিবারণের মহাজন এই শেঠজী, তার মা-বাপ।

ছোট ছোট উলঙ্গ শীর্ণ শিশু আর কিশোর কিশোরীরা মাছির মতো ছেঁকে ধরে এই শেঠজীর গাড়ীখানিকে। অবাক বিস্ময় ওদের চোখে—পৃথিবীর জিজ্ঞাসা। কেউ কেউ আবার তাদের মধ্যে গাড়ীর টায়ারে, পেছনের ত্রিপল দেওয়া শেডে, লাইটে হাত দিয়ে অনুভব করতে চায় এক অনাস্বাদিত আস্বাদ। আবার পরক্ষণেই ড্রাইভারের ধমকের ভয়ে হাত সরিয়ে নেয়। অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে—যদিও এটা নতুন নয়; গাড়িটা মাঝে মাঝেই আসে এ'গাঁয়ে মাল নিয়ে। তবুও!

কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে আসেন শেঠজী। তাঁর সহচরেরা তাঁর নির্দেশমতো গাড়ীর পিছন থেকে বের করে গামছা, কাপড় ও কয়েকটা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য। সবশেষে বের হয় এক ড্রাম মিল্ক পাউডার—সেই 'মিলিক পাউডার' যা একটু আগেই নিকুঞ্জ কিনে নিয়ে গেল।

ওই সব শীর্ণ পঙ্গু লোক আর ছেলেমেয়েগুলো কৃতজ্ঞতায় ঘাড় বেকিয়ে নিয়ে যায় শেঠজীর দান; উলঙ্গ শিশুগুলো ঘটি ভরে নিয়ে যায় মিল্ক পাউডার গোলা দুধ—ওদের জীবনীশক্তি—প্রাণ—কৃত্রিম প্রাণ।

যাবার সময় শেঠজীর সাথে নিবারণের কি সব কথা হয়। শেঠজী হাত পা নেড়ে গুজ গুজ করে অনেক কথা বলে তারপর বলেন—"আরে বাবা, এ টাইম তো বোড়ো ভালো আসে; মেট্রিক ওজনের টাইম আসছে; এক কিলোকে বলবেন ডের সের আসে; ব্যস, সোব ঠিক হোয়ে যাবে। ইলেকশন আসিয়ে গেলো, একটু দানটান করতে হোবে বৈকি!"

॥ ২ ॥

পরদিন সকালবেলা নিকুঞ্জ ছুটতে ছুটতে আসে নিবারণ সাধুখাঁর দোকানে। হঠাৎ নিবারণের পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে।—"নিবারণ। তুমি আমার ছিলাবেলাকার বন্ধু, আমায় বাঁচাও।"

—ব্যাপারটা কি বল না?

—আমায় বাঁচাও।

—আরে! বল পরিষ্কার করে।

—আমায় পাঁচটি টাকা দাও। খোকাটা কেমন কইরছে। ও বোধহয় আর বাঁইচবে না।

—কেন কি হ'ল আবার?

—ডাক্তারবাবুর কাছে গেইছলাম। বইললেন—"সুই ত' দিতেই হবে, আবার দুধও লাইগবে।" আমায় পাঁচটা টাকা দাও তুমি ভাই। তুমি আমার মা-বাপ-ভাই-বন্ধু-দ্যাবতা সব।

বিরক্তি ধরে নিবারণের মনে। কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে কৃত্রিম ব্যথাতুর নয়নে সে তার দোকানের বাক্স থেকে পাঁচটা টাকা বের করে দেয়—"এই নে। তুই আমার বন্ধু। শত হোক তুয়াদের দুখে আমার পরানডা কাঁদে, বুইঝলি।"

এইবার নিকুঞ্জ ভীতকণ্ঠে বলে, "আর একটা কথা আছে। খানিকটা সেই মিলিক পাউডার দাওনা গো। কাইলের দুধটা সব ফুরাইঙ্ গেছে।"

কি মনে করে নিবারণ কাগজে মুড়ে কালকের শেঠজীর দেওয়া খানিকটা দুধ দিয়ে দেয়।

ডাক্তারবাবুর সুই এর জালায় নিকুঞ্জর খোকা আর্তনাদ করে উঠল। কারণ ওষুধ তো নেই। শুধু সুই আর তার জালা। ডাক্তারবাবু বলেন, "ওর গায়ে একটুও শক্তি নেই। গরুর দুধ খাওয়াবে। শুধু ওষুধে কোন কাজ হবে না।"

নিকুঞ্জ সব জেনেও গোয়ালার কাছে গিয়ে 'অরণ্যে রোদন' করে একটু দুধের জন্য। আড়াই টাকা তার গিয়েছে সুই-এর দাম দিতে। আর আড়াই গেছে ভিজিটে। ব্যস। সব শেষ। তবুও নিকুঞ্জ অনেক মিনতি জড়ানো গলায় বলে একটু দুধের জন্য। গোয়ালা বড় বড় চোখ পাকিয়ে বলে "বাবারে বাবা, বাবুদের বাড়ীতেও ওলাওঠা লেইগেছে; সবদুধ বায়না হইঙ্ গেছে। দুধ দেওয়া হবেক নাই।"

অনন্তোপায় নিকুঞ্জ বাড়ী গিয়ে তার বহু পুরোন সম্বল কাঁসার বাটিতে করে দুধটুকু গোলে—'মিলিক পাউডার' যাতে তার খোকার প্রাণ আছে, যা খেয়ে তার খোকা বেঁচে উঠবে—সেই 'মিলিক পাউডার'।

তার খোকার মুখে যখন দুধ ঢালতে যায় তখন দেখে যে তার খোকার চোখ যেন সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি ছাড়িয়ে কোথায় চলে যেতে চাইছে। দেখলে ভয় লাগে। বুকে হাত দিয়ে ঐ অস্ফুট আওয়াজ অনুভব করে সে সম্বিৎ ফিরে পায়। যাক, বেঁচে আছে তাহ'লে।

এইবার কাঁসার বাটিতে গোলা দুধ ঝিনুকে করে খাওয়াতে যায় —মিলিক পাউডার। কিছুটা তার খোকার মুখে যায়, কিছুটা বাইরে গড়িয়ে যায় দু'গাল বেয়ে। আবার চেষ্টা করে সে। এবারও সেইরকম হয়। এবার তার খোকা একটু নড়ে চড়ে ওঠে, হাত পা নাড়ে, মাথাটাকে বাঁকায়, মুখটাকে বিকৃত করে কেঁদে ওঠে। নিকুঞ্জ ভাবে এইতো তার খোকা বেঁচে উঠেছে। এবার নিকুঞ্জ জোর করে তার খোকার হাতদুটো চেপে আর একটু দুধ খাওয়াতে যায়। এবার যেন তার খোকা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। বলতে চায়—"না ও আমি খাব না—ওতে আমার প্রাণ নেই।" তার আর্তনাদ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। হাত পা আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে, দাঁতে দাঁত লেগে যায়। নিকুঞ্জ তার দুইহাতে ডানায় চাপ দিয়ে বলে ওঠে "খোকা, খোকা, খোকা।" হাতের সেই সুই ফোটানো ব্যথার জায়গায় চাপ লাগায় তার খোকা একবার শেষ আর্তনাদ করে। কিন্তু জোরে নয়—অস্ফুটে। অনেক চেষ্টা করে যেন হাত দুটোকে তুলতে চায় ওপরে—চোখদুটোকে মেলতে চায়——বলতে চায়, "আমি বাঁচব—আমি বাঁচতে চাই।" কিন্তু তার চোখের ওপরে সভ্যতার ছাদ আছে; চারিপাশে আছে সভ্যতার সংকীর্ণ দেওয়াল। সেই দেওয়াল ভেদ করে তার দৃষ্টি বাইরে যেতে পারে না—তার বলবার কথা আটকে যায় ধাক্কা লেগে—তার আবেদন আর পৌঁছাতে পারে না। যে একটু চেতনা ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে যায় 'মিলিক পাউডারের' দৌলতে। সব অবলুপ্ত হয়ে যায়। আর নিকুঞ্জর এই বিরামহীন কণ্ঠ উদ্দেশ্যহীন পাগলের প্রলাপের মতো চেঁচিয়ে যায়—"খোকা, খোকা, খোকা আমার"। তার ছোট্ট কুঁড়ের চার দেওয়ালের মাঝেই আবার তা প্রতিধ্বনিত হয় "খোকা—খোকা—খোকা আমার।"

পরদিন ভোরবেলা নিকুঞ্জ শুনতে পায় যে শেঠজীর দেওয়া 'মিলিক পাউডার'—যা সে নিবারণের দোকান থেকে এনেছিল, আর যা সবাই খাঁটি ভেবে গুলে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে খানিক ভেজাল আছে। আর তা খেয়ে এ গ্রামের মুচিপাড়ার দুটো মেয়ে আর বাউরী পাড়ার পাঁচটি ছেলে কালই মারা গেছে—আর দশ বারোজন নাকি মরমর।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নিকুঞ্জ তার ছোট্ট টিনের বাক্স আর কয়েকটা ছেঁড়া কাঁথা আর জামাকাপড়ের পুঁটুলী নিয়ে রওনা হয় শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে। আর সঙ্গে নেয় তার মৃত পুত্রকে কাঁথায় জড়িয়ে। বাঁশঝাড়ের সামনে একবার থমকে

দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করে। এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে তার।

তারপর অজয়নদীর বালির চরে তার মৃত পুত্রকে পুঁতে রেখে নদীর জলে হাত ধুয়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, বলে, "ভগবান, তোমার যুগে রেলগাড়ী চলে, জাহাজ চলে, মটর চলে (মহাকাশ যানের কথা তার অজানা); কিন্তু আমার খোকা এই যুগের হয়ে একটু দুধের জন্য মইল কেন—ইয়ার উত্তরটা তুমি দাও দেখি?

দূর থেকে সভ্য বিংশ শতাব্দীর বিরাট রেল ইঞ্জিনের কার থেকে হামার পেটার একটা চাপা-চাপা আওয়াজ ভেসে আ হন্-হন্-হন্ হঁ হঁ হঁ।



স্কুলের পাঠক্রমে শারীরবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে

# একটি আলোচনা সভার রিপোর্ট

জনৈক ছাত্র

গত ১৮শে মার্চ ১৯৭৩ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানকলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগে 'স্কুলের পাঠক্রমে শারীরবিদ্যা চালু করার' বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের এক আলোচনা সভা ডাকা হয়। সভার ব্যবস্থাপকরা তাঁদের ঘোষণাপত্রে আরো অনেক কথার সঙ্গে আমাদের জানান যে, স্কুলে শারীরবিদ্যা চালু করার কথা তাঁরা বলেছেন, কারণ তাঁদের মতে—(১) "স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রধানতঃ স্বল্প আয়ের পরিবারগুলি থেকে আসে, যাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান এবং ফলতঃ পৌষ্টিক মান অত্যন্ত নীচু। সুতরাং শারীরবিদ্যা মারফত তাদের খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে করে তারা একই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় থেকেও গড়ে তুলতে পারে সুস্থ দেহ ও মন, সুন্দর স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র।" (ঘোষণাপত্রে ২নং বক্তব্য)

(২) "ভারত একটি বিশাল দেশ যার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জনসংখ্যাধিক্য। এই সমস্যার সমাধানে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ করছেন। তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি এই সমস্যার সমাধান হয়নি। যদি স্কুলের পর্যায় থেকেই প্রজনন বিজ্ঞান (physiology of reproduction) সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যায় তা'হলে এই সমস্যার সমাধান সহজতর হবে।" (ঐ ৩নং)

আজকাল কোন কোন মহল থেকে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে আমাদের দেশের সমস্যাগুলোর যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে যার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। সভায় এক বক্তা এই বিষয়টি তুলে ধরেন। উদ্যোক্তারা তখন তাঁদের মূল আলোচনা ভুলে গিয়ে উক্ত বক্তার বক্তব্যগুলোকে মিথ্যা এবং অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করার চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগে যান। তাঁরা বারবার বলতে থাকেন যে, তাঁরা নাকি খাঁটি বিদ্যা প্রচারের পক্ষে এবং সামাজিক সমস্যার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। 'ইচ্ছা থাকলে না খেয়েও বিজ্ঞান প্রচার করা যায়'- একথাও শোনা গেল একজনের মুখে। তাঁরা এত আবোলতাবোল বকছিলেন যে শুনে মনে হচ্ছিল "মাছিগুলো যতই ভন্‌ভন্ করুক মেঘের গর্জন তাতে চাপা পড়ে না।"

বক্তা যে বিষয়টি তুলে ধরেন, তা নীচে দেওয়া হল।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও আমাদের বন্ধুরা,

স্কুলে শারীরবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন ও সাধারণভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানের এ শাখাটির প্রসারের যে পরিকল্পনা নিয়ে আজকের সভার উদ্যোক্তারা এগিয়ে এসেছেন, একে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। কিন্তু ঘোষণাপত্রে তাঁরা এই কাজের দ্বারা যে সব লক্ষ্য পূরণের ক বলেছেন, বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে ঐ বিষয়ে একটা ভু বোঝাবুঝি হতে পারে বলে আমার ধারণা। তাই আমার মতে লক্ষ

ও উপলক্ষ্যগুলি নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। আমার মতামত আপনাদের বিচারের জন্য সভার সামনে রাখছি।

**খাদ্য সমস্যা, পৌষ্টিকমান ও খাদ্যতত্ত্ব :**

প্রথমে আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলবো। আমাদের বন্ধুরা যা বলেছেন তার সোজা মানে করলে এই দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে যদি জানা থাকে, তাহ'লে আমাদের দেশের খাদ্যাভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যেও আমরা নিজেদের সুস্থ রাখতে পারি। তাই খাদ্যতত্ত্বেও জ্ঞান বিতরণের জন্য তাঁরা স্কুলে শারীরবিদ্যা শিক্ষার কার্য্যক্রম নিচ্ছেন। উদ্যোক্তারা কি খাদ্যাভাবের প্রশ্নটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন? আমাদের খাদ্যসমস্যা কি খাদ্যতত্ত্বের জ্ঞানের অভাবেই? বাস্তবে কি ঘটছে?

খাদ্যাভাব ও খাদ্যতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রথম ফরাসী বিদ্রোহের সময় (১৭৮৯ সালে) ভুখা মানুষের মিছিল দেখে রানী মেরী আঁতোয়ানেত জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"লোকগুলো চিৎকার করছে কেন?" উত্তর হলো—"ওদের খাবার রুটি নেই।" শুনে রাণী বলেছিলেন, "কেন ওরা কেক্ খাচ্ছে না?" রুটির বদলে যে কেক্ খাওয়া যায় খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধীয় এই ধারণা রাণীর নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেটা কোনও কাজে আসেনি। গত কয়েক মাস ধরে দৈনিক খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোয় যাঁরা চোখ বুলিয়েছেন, সারা দেশে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, ত্রিপুরা এবং এই রাজ্যের পঃ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদের ব্যাপক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের খবর আশাকরি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। পঃ দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদে অনাহারে মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। এখন, যে লোকটি খেতে না পেয়ে মরতে যাচ্ছে তাকে যদি আমি বলি, "ভাই, আলুসেদ্ধর চেয়ে কাঁচকলাসেদ্ধ বেশী উপাদেয় খাবার"—এবং শুনে সে যদি আমার গালে কষে একটা চড় মারে তাতে ন্যায্যতঃ আমার কিছু বলার থাকে কি?

খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিশ্চয়ই আমাদের থাকা দরকার এবং স্কুলে শারীরবিদ্যা চালু করলে সেই জ্ঞান বিতরণ সহজতর হতে পারে। কিন্তু খাদ্যসঙ্কটের বর্তমান পরিস্থিতিতে আংশিক সমাধানও তা' দিতে পারে—একথা বলা যায় কি? এর আরো একটা দিক আছে। সেটা হল বেকার সমস্যা; এ রাজ্যে আধাবেকারদের বাদ দিয়েই বেকার লোকের সংখ্যা হলো ২,৮০০,০০০—তার মধ্যে ২০০,০০০ শিক্ষিত। আবার শিক্ষিতদের মধ্যে ৮০,০০০ গ্র্যাজুয়েট। এটা সরকারী তথ্য। ("Approach to the fifth five year plan"—Govt. of West Bengal.)

এখন কথা হল, আপনি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরবিদ্যা পড়ে খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাজ্ঞানী হলেন। বাজারের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, পাশ করার পরে আপনাও বেকারীর খপ্পরে পড়তে পারেন। তখন আপনার সেই জ্ঞান কি আপনার পক্ষে বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াবে না? সরষের তেলের বদলে শেয়ালকাঁটার তেল, বাসমতি চালের বদলে আমেরিক থেকে আনা 'ধুতুরার বীজ মেশানো মাইলো' যখন আপনাকে খেতেই হবে, তখন খাদ্যতত্ত্বের জ্ঞান থেকে জাত ঐ সব খাবারের বিষক্রিয়ার চিন্তা কি আপনাকে আধমরা করে ফেলবে না? এই 'উপাদেয়' জিনিসগুলো শুধু বেকাররাই নয়, আজকাল বেশীর ভাগ লোকই খেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই বলছিলাম, স্কুলে শারীরবিদ্যা চালু করতে চান ভালো কথা, কিন্তু সেই উপলক্ষে কাউকে যেন আমরা মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে না ফেলি।

**শিক্ষা, সামাজিক সমস্যা বাস্তব জ্ঞান :**

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হল, আপনাদের তিন নম্বর আশ্বাস নিয়ে। আমাদের দেশের কোন সমস্যার সমাধানে জন্মনিয়ন্ত্রণ আদৌ দরকারী কিনা সেই বিতর্কিত প্রশ্নে আমি যাচ্ছিনা। আমি এর থেকে প্রতিফলিত একটা বিষয়ে আলোচনা করব—আপাতদৃষ্টিতে যা কারো' কারো কাছে কষ্টকল্পিত মনে হতে পারে। তাঁদের আমি অনুরোধ করব একটু ভেবে দেখতে। আমার মনে হচ্ছে যে, উদ্যোক্তারা আশা করছেন, স্কুলে শারীরবিদ্যা চালু করে দিলেই ছাত্রছাত্রীরা কোন সামাজিক সমস্যা ও শরীর সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে। ঠিক এই ব্যাপারেই আমি একটু ভিন্ন মত পোষণ করি।

প্রায়ই একটি কথা শোনা যায় যে, আজকাল ছাত্ররা পড়তে এসে জ্ঞান বাড়ানোর চেয়ে পরীক্ষা পাশের জন্য নোটের কথাই আগে ভাবেন এবং সাম্প্রতিককালে পরীক্ষার্থীদের দ্বারা ব্যাপক হারে 'অসদ-উপায়' অবলম্বনের কথা খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়! এ থেকে কি মনে হচ্ছে আপনাদের? ব্যাপারটা কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে, পড়াশুনো করার প্রশ্নটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাস্তব জ্ঞানের 'তেপান্তরের মাঠের' দিকে না গিয়ে পাশ-ফেলের 'একটা ছোট্ট নালার' এপাশ ওপাশ করছে! কেন এরকম ঘটছে? ছাত্রছাত্রীদের এ'নিয়ে দোষ দেওয়া যায় না—এটা তাঁরা করতে বাধ্য হচ্ছেন। আমরা অনেকেই জানি যে, এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের স্বঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল এমন একদল লোক তৈরী করা, যারা গায়ের চামড়ায় ও চেহারায় হবে ভারতীয়, অথচ চিন্তা ও রুচিতে হবে বৃটিশ—যারা বৃটিশ রাজমুকুটের সেবা উত্তমরূপেই করতে পারবে। এই বিদেশী ছাঁচে বিদ্যা ঢালাই-এর কারখানা থেকে যে মাল বেরুবে, সেটা যে আমাদের দেশের জনসাধারণের কোনও কাজে লাগবে না, বরং ক্ষতিই করবে—এতে সন্দেহ আছে কি?

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসব কিছুদিন আগেই পালন করা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যা ঢালাই কারখানার সেই বিলিতি ছাঁচটা কি বদলে গেছে? দেশের সামাজিক সমস্যা ও বাস্তব জ্ঞানের কোনও স্থান কি এ'তে আছে?

দেশের আরো অনেক সামাজিক সমস্যা আছে যা উদ্যোক্তাদের চোখে পড়েনি, কিন্তু যার সমাধানে প্রকৃতিবিজ্ঞানের এই শাখার প্রচার ও প্রসার অত্যন্ত জরুরী। দিন কয়েক আগে কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিক একটি খবর ও মন্তব্য প্রকাশ করেছে। খবরটি হলো—কলকাতার গার্ডেনরিচ অঞ্চলের এক বস্তি থেকে একজন বসন্ত রোগীকে নিয়ে আসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স যায়, কিন্তু বস্তিবাসীরা রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে অস্বীকার করে এবং অ্যাম্বুলেন্স চালক ও তার সহকারীকে মারধোর করে। ঐ কাগজের সংবাদদাতা আমাদের জানাচ্ছেন যে, বস্তিবাসীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেই একাজ করেছে এবং এদের জন্যেই কলকাতায় বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দিচ্ছে। গত মার্চমাসেই এই শহরে ৪৩৫ জন লোক বসন্তরোগে মারা গেছেন। বস্তিবাসীদের কুসংস্কারের ব্যাপারটা সত্যি বলে ধরলেও বলা যায় যে, সংবাদদাতা মহামারীর জন্য ঐ গরীব লোকগুলোকে দোষী করে তাঁদের প্রতি অবিচারই করছেন। এঁদেরই ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করা 'সরকারী তহবিল' থেকে যদি এঁদের জন্য কিছু খরচা করা হতো তাহলে এটা ঘটতো না। রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে একটা বিরাট অঙ্কের টাকা, যা উদ্যোক্তাদের মতেই, সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য খরচা করছেন তার একটা অংশও এঁদের কুসংস্কার কাটাতে আলোক বিতরণের জন্য খরচ করলে কিছুটা কাজ হতো। অবশ্য, আমরা জানি না সরকার এই মহামারীটাকে জনসংখ্যা কমানোর কাজে লাগাচ্ছেন কিনা—তাহলেও এর জন্যে কিন্তু বস্তিবাসীদের দোষ দেওয়া যায় না।

আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে কুসংস্কার সত্যিই ভয়াবহ রূপে রয়েছে! বিজ্ঞানের যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে তা দেশে বেশীর ভাগ লোক জানতেই পারেননি। অর্থনৈতিকভাবে যাঁ নিপীড়িত, প্রাকৃতিক শক্তির যাঁরা অসহায় শিকার, কুসংস্কার তাঁদে জীবনের অঙ্গীভূত। অবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে কুসংস্কা যাবে না। এই অবস্থায়, আমরা কি কাউকে এই আশ্বাস দিতে প যে, স্কুলে শারীরবিদ্যা চালু করেই আমরা কোন সামাজিক সমস্য সমাধানে সাহায্য করতে পারবো? আর একদিক থেকেও ে অসম্ভব। দেশের কতজন লোক স্কুলে পড়তে পাচ্ছেন? এদে শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, শতক ৮০ ভাগ লোক এখনও নিরক্ষর। মোটামুটি শিক্ষা যাঁরা পেয়ে তাঁদের সংখ্যা শতকরা সাতভাগের বেশী নয়। সুতরাং 'জল অ গভীর এবং ছোট্ট হালে এর থৈ পাবেন না।'

এতো গেল অশিক্ষিতদের কথা, এবার শিক্ষিতদের কথায় আসু আমাদের বর্তমান শিক্ষাধারা তাঁদের কতদূর সংস্কারমুক্ত ক পেরেছে? আজো শারীরবিদ্যার 'মহাপণ্ডিতেরা' ছেলের পেটের অ জলপড়ার জন্য ছোটেন। আজ থেকে পাঁচশ' বছর আগে কো নিকাস সূর্যমণ্ডল ও জ্যোতিষ্কের পরিক্রমার ব্যাখ্যা করেছিলে কিভাবে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় তা আমরা মুখস্থ বলে দিতে পা তবু গ্রহণের দিনে তথাকথিত শিক্ষিতদের গঙ্গাস্নানের ধুম দেখে হয় যে, ঐসব শিক্ষা আমাদের জীবনে আদৌ রেখাপাত ক পারেনি। আমাদের এই শিক্ষাধারা কুসংস্কারের রাহুগ্রাস ( আমাদের মুক্ত করতে পারেনি।

তাই বন্ধুগণ, আমার মতে সমস্যাগুলোর একটা সাধারণ রূপ ব এবং ভাসাভাসা ভাবে সমাধানের আশ্বাস দিলে ভুল বোঝা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। ঐ বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব ভাবা দরকার। ধন্যবাদ ॥

---

## বেকারীর জ্বালায় পুত্র হত্যার চেষ্টা : অবশেষে গ্রেপ্তার

বোম্বাই, ১৫ই জানুয়ারী– একজন বেকার এবং অসুস্থ লোককে পুলিশ এখানে গ্রেপ্তার করেছে নিজের ছেলেকে খুন করতে যাওয়ার অপরাধে। সংসার চালাতে না পারার জ্বালায় সে এমন কাজ করতে গিয়েছিল।

যোশেফ এণ্টনী ক্যাস্টেল নামে যক্ষা রোগাক্রান্ত ৪৬ বছরের এই লোকটি তার আট বছরের ছেলে জ্যাকবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেঁধে ফেলে এবং তার গলা চেপে ধরে। তারপর তার ঘাড়ের ওপর একটা পাথর চাপিয়ে হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করে। যাই হোক, জ্যাকব বেঁচে যায়, কেননা হাতুড়ী শুধু পাথরটিকেই আঘাত করে।

এরপর যোশেফ ছুরি দিয়ে তলপেটে আঘাত করে। কিছুক্ষণ পরেই যোশেফের ভাই টমাস বাড়ি ফিরে জ্যাকবকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠায় এবং পুলিশকে খবর দেয়।

যোশেফ পুলিশের কাছে বলে যে বেকারত্ব, যক্ষা রোগভোগ এবং সংসার চালানোর অক্ষমতায় সে জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে বলে সে জানায়।

[ সত্যযুগ—১৬ই জানুয়ারী/৭৩ ]

---

# "অপারেশন ফ্লাড"

প্রণব রায়

বছরের পর বছর ট্যাক্সের বোঝা আরও ভারি হয়ে জনসাধারণের মাথায় চাপছে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই দুরবস্থা কেন? কোন বাস্তব কারণের ফলে ব্রিটিশরা চলে যাবার পঁচিশ বছর পরেও আমাদের দুঃখকষ্ট একতিলও কমেনি? এই অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্নটির উত্তর পেতে হ'লে জানতে হবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে। বুঝতে হবে—'জাতীয় উদ্যোগ', 'উন্নয়নমূলক' প্রকল্প—এগুলির স্বরূপকে। খুঁজে বার করতে হবে বৃহৎ সামাজিক পটভূমিকায় এগুলির ভূমিকাকে। কেবলমাত্র এই ভাবেই আমরা আমাদের দেশের সঠিক অবস্থাটিকে বিশ্লেষণ করতে পারবো।

'অপারেশন ফ্লাড' এ'রকমই একটি রচনা যার ভেতর দিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাস্তব চেহারার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে। —সম্পাদক 'বীক্ষণ' ]

যা'ক; এতদিনে তা'হলে বন্যার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হ'ল! কি বলছেন,—অজয়-দামোদর-ব্রহ্মপুত্র কোশী এদের কথা? আরে না না, ওসব বন্যা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? ও সমস্ত 'প্রাকৃতিক' ব্যাপার তো থাকবেই, তা না হ'লে ঋতু পরিবর্তনের কোন মানেই থাকে না। তার চেয়ে শুধু একটিবার চোখ বন্ধ ক'রে ভাবুন তো, সমাজের ওপরতলা নিচুতলা সব কিছু ছাপিয়ে দুধের বন্যা ছুটেছে! অট্টালিকার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, এমন কি বস্তির ঘরে ঘরে ঢুকছে দুধ, মাখন, পনীর, আইসক্রীম! বিশ্বাস হচ্ছে না ত? হবে, হবে। আর বিশ্বাস যাতে তাড়াতাড়ি হয়, তার জন্যেই তো ব্যাপক প্রচারের দরকার।

* * *

তাহ'লে, মোদ্দা ব্যাপারটা হ'ল এই যে—সারা ভারত জুড়ে কিছু-দিনের মধ্যেই দুধের বান ডাকবে।

কিন্তু খরা-বন্যা-দুর্ভিক্ষ-বেকারীর কায়েমী রাজত্বের সঙ্গে 'দুগ্ধ গঙ্গার' চিত্রটিকে জোড়া লাগাতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা 'হাঁসজারু' (=হাঁস+সজারু) হ'য়ে যা'চ্ছে না কি? আর হলেই বা কি যায় আসে; অসঙ্গতির বৈচিত্র্যই তো আমাদের গর্ব! মধ্যযুগীয় কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বৃহৎ শিল্প প্রসারের গাঁটছড়া বাঁধার সঙ্গে প্রতি বছর হাজার হাজার ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কি নেই সেটা পরে ভাবলেও চলবে, তবে আপাতঃ চিত্তাকর্ষক যে ব্যাপারটা—তা হ'ল এই গাঁটছড়ার 'বৈচিত্র্য'। আর এই 'বৈচিত্র্যসমূহের' মাঝেই তো আমাদের জাতীয় ঐক্য!

কিন্তু বৈচিত্র্য সৃষ্টি তো সরকারের কোন 'পলিসি' (Policy) হ'তে পারে না? তাহ'লে তো ভেজালের কারবারে অন্ততঃ কিছু মাত্রায় মন্দা আসার সম্ভাবনা থাকতো! তাহলে বরং প্রশ্নটা এই ভাবে রাখা যাক: কোন বাস্তব প্রয়োজন 'দুগ্ধ বন্যা' প্রকল্পের জন্ম দিয়েছে? এর সঠিক উত্তরটি জানতে হ'লে—আসুন, আমরা প্রকল্পটির জন্ম-বৃত্তান্ত গোড়া থেকে অনুধাবন করি।

* * *

অপারেশনটি সুরু হয়েছে ১৯৭০ সালে। 'ন্যাশনাল ডেয়ারী ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন' (National Dairy Developement Corporation)-এর উদ্যোগে ১০০ কোটি টাকার এই 'কামধেনু' প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হয় 'ওয়ার্লড্ ফুড্ এড্ প্রোগাম' (World Food Aid Programme)-এর সৌজন্যে। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির সরকারের বদান্যতায় হাজার হাজার টন গুঁড়া দুধ ইত্যাদি ভারতে পাঠানো হ'ল; যাতে এই 'দুগ্ধ গঙ্গার' 'মানস সরোবর' শুকিয়ে না যায়। শিশু প্রকল্পটি যাতে যত্নের অভাবে স্বল্পায়ু না হয়, তার জন্য 'আন্তর্জাতিক পিতৃত্ব বোধে' অনুপ্রাণিত হয়ে অভিভাবকের ভূমিকা পালনে এগিয়ে এল UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)-এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থা। জোর গলায় ঘোষণা করা হোল: এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ, ১৯৮০ সালের মধ্যে ভারতকে দুধে আত্ম-নির্ভরশীল ক'রে তুলবে।

কিন্তু যারা ভিয়েৎনামে ফসলের মাঠ পুড়িয়ে ফেলে, নিরপরাধ

শিশুদের ওপর 'নাপাম' ফেলতে যারা দ্বিধা বোধ করে না, তারা হঠাৎ ভারতে অপুষ্টি রোধ করার জন্য দুধের বন্যা বহাতে যাবে কেন? এর ব্যাখ্যা পেতে গেলে একটু পিছিয়ে গিয়ে ষষ্ঠ দশকের ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাক।—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তখন দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, অথচ সদাশয় আমেরিকান সরকার কৃষকদের জমি চাষ না করার জন্য অনুদান দিচ্ছেন! আরো একটু পিছিয়ে, দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের ইতিহাস খুঁজলে এই আপাতঃ অসঙ্গতির পিছনে যে নিষ্ঠুর বীভৎসতা লুকিয়ে আছে, আমরা তার আংশিক পরিচয় পেতে পারবো। এই সময় পৃথিবী জুড়ে দুর্ভিক্ষ। এসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ-আমেরিকার দরিদ্র লোকেরা না খেতে পেয়ে মরছে, অথচ আমেরিকাতে খাদ্যশস্য পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে; টন টন খাবার সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কি অদ্ভুত স্ব-বিরোধ! নৈরাজ্যের কি আদর্শ নিদর্শন! এটা কি নিছক পাগলামি? না; আমেরিকার পুঁজিপতিরা যথেষ্ট মাথা ঠাণ্ডা রেখেই এটা করেছে।

'বেশী লাভ', 'আরও বেশী লাভ' করতে গিয়ে দেশে যা বিক্রি হতে পারত তার থেকে বেশী পণ্য উৎপাদন করা হয়ে গেছে! বাজারে যদি সবটাই তারা ছাড়ে তবে গম, যব এসবের দাম ভয়ানক কমে যাবে। (বাজারে চাহিদার তুলনায় কম জিনিষ পাঠাতে পারলেই তো খুশীমত দাম চড়ানো যায়!) বেশী পরিমাণে পণ্য থাকলে সবাই নিজেরটা বিক্রি করতে চাইবে এবং প্রতিযোগিতার ফলে দাম পড়ে যেতে বাধ্য। এই সমস্ত ব্যাপারটাকেই ওরা নাম দিয়েছে—'অতি উৎপাদনের সঙ্কট'।

'অতি উৎপাদন' স্বাভাবিক ভাবেই লাভের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। অতএব হয় পণ্য গুদামজাত কর, নইলে নষ্ট করে ফেল। গুদামে রাখতে গেলে ভাড়া গুনতে হবে—তার থেকে নষ্ট করে ফেললে লোকসান কম।

তৃতীয় দশকের সঙ্কটের পর আমেরিকান পুঁজিপতিরা ভেবে বার করল, কি ভাবে এই সঙ্কটকে মূলধন করে দুপয়সা কামানো যেতে পারে—এমন কি ফাউ হিসেবে 'মহানুভবতার' স্তুতিও পাওয়া যাবে। তাই পঞ্চম দশকের গোড়াতেই আমেরিকান সরকার দরিদ্র দেশগুলোতে উদ্বৃত্ত এই সমস্ত খাদ্যশস্য পাঠাতে লাগলেন। বিনিময়ে তাঁরা বিদেশী মুদ্রা নিতেন না, দামটা দেশীয় মুদ্রায় দিলেই চলত—জাহাজগুলোর ভাড়াটাই শুধু বিদেশী মুদ্রায় (ডলার) দিতে হ'ত। 'পরোপকারী' আমেরিকান সরকার এই সব অতিকায় জাহাজগুলি নিজের দেশ থেকেই দিতেন!

কিন্তু এতো গেল মানুষের খাদ্যের জায়গায় পশুখাদ্যের এবং ধুতুরার বীজ মেশান 'পরিশুদ্ধ' মাইলোর সাহায্য। ধনতন্ত্রের বাজারে দুগ্ধ শিল্পের অতি উৎপাদন সঞ্জাত বাড়তি জিনিষগুলোর কি হবে? কিন্তু মুশকিল! অনুন্নত, গরীব দেশগুলোতে আবার দুধের অভাবটা ( অভাবই নয়—মানে যেখানে ভাতেরই সংস্থান নেই সেখানে ( প্রয়োজনটা স্বভাবতঃই অনুভূতির বাইরে। তাহলে উপায়?—আছে; দুধের প্রয়োজনটা লোকের মাথায় নেই ঠিকই, তবে 'অপ ধুয়া তুলে প্রয়োজনটাকে হাজারগুণ বাড়িয়ে তুলতে কতক্ষণ—উপযুক্ত দালাল পাওয়া যায়? এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে UNICEF থেকে যোগ্যতর আর কে আছে? পরম সম্মানীয় আন্তর্জাতিক স সব রাষ্ট্রের প্রতি সমান দৃষ্টি, শিশুদের কল্যাণ চিন্তায় সদা চিন্তি এহেন UNICEF যদি একটি বার জোর গলায় বলেন: ভার কোটি-কোটি অপুষ্টিকবলিত মানুষের দুধ চাই—তবে আর পায় ( দুধের বন্যা না ব'য়ে যায় না। সুতরাং যথা সময়ে UNICEF ' প্রকল্পের' ঢক্কানিনাদ করতে সুরু করল। আধুনিক প্রযুক্তিবি প্রয়োগ এবং কাজে কাজেই বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের নতুন খুলে গেল। 'অপারেশন ফ্লাড'—এই গালভরা নামের অন্তরালে এ গরীব দেশের জনগণকে শোষণ করার, এই আন্তর্জাতিক চক্রা প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি অভিনীত হলো ব্যাঙ্গালোরে; কাল ১: সাল।

[কি বলছেন,—'Operation Pop Eye' (১), 'Operat Sugar Cane' (২)-এর মতো 'অপারেশন ফ্লাড্' কথাটার মে মার্কিনী গন্ধটা আগেই পেয়েছিলেন?]

'অপারেশন'-র সুরুতেই সহরের, আটপৌরে নোংরা খাটালগুলো ঝেঁটিয়ে গ্রামের দিকে পাঠান হল এবং আধুনিকীকরণের উদ্দে একটি ডেয়ারীকে (Dairy) বেছে নেওয়া হল! এই ডেয়ারীটি অ যে দুধ সংগ্রহ করত তার একাংশকে দই বানিয়ে বোতলে বন্ধ-ক বিক্রি করা হোত। মাঝে মাঝে দইয়ের অর্ডার সাপ্লাই করা ছা রোজ ৮০০ কিলোগ্রাম মাখন তৈরী হত। এর অর্ধেকটা বি হ'ত, বাকিটা থেকে ঘি তৈরী হতো। ঘি আর মাখন থেকে ল হত যৎসামান্যই।

দুগ্ধবন্যার প্রথম জোয়ারেই, দুধের দৈনিক সংগ্রহ ৪৬০,০০০ লিট পর্য্যন্ত বেড়ে গেল। গ্রামের দুধ, অসংখ্য খাটালের ছোট বড় 'খা দিয়ে সহরের দুগ্ধগঙ্গার 'উৎস সরোবরে' হু হু করে এসে পড়তে লাগল দামী দামী যন্ত্রপাতির কল্যাণে এই সরোবরে দুধ সহজে টকে ন সুতরাং সহরের লোকেরা সীমিত ক্রয়ক্ষমতার জন্য যখন দৈনিক ম ৪৩,০০০ লিটার (অর্থাৎ ১০%) কিনলেন, তখন ডেয়ারীর কর্মকর্তা

(১) কৃত্রিম অতিবৃষ্টির সৃষ্টি করে উত্তর ভিয়েতনামকে প্লাবিত করার মার্কিনী কৌশলটি সাঙ্কেতিক নাম।

(২) কিউবা (Cuba)তে একটি অন্তর্ঘাতমূলক C. I. A. চক্রান্তের সাঙ্কেতিক নাম

কটা দই বানাবার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হলেন না (যেটা হলে সাধারণের কপালে অন্ততঃ মোটামুটি আয়ত্বাধীন মূল্যে দইটা তো!) দু-হাজার লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন একটা থার্মোকুলার তো াছেই! খুব শিগ্রী আর একখানা 'কুলার' আসবে। ৪০ টন তা যুক্ত একটা কোল্ড্ স্টোরেজ (Cold storage) হচ্ছে, টা কি? সুতরাং বাকি দুধটাকে আরো 'সুসংস্কৃত' করে পনীর, ান এবং জীবাণু-নিরুদ্ধ টিনে ঘি ইত্যাদি করে বাজারে ছাড়া ক। বলা যায় না,—ভবিষ্যতে বিদেশে রপ্তানীর দুর্লভ সৌভাগ্যও । আসতে পারে!

কিন্তু দুধের বন্যাকে তো শুধু বাঙ্গালোরে আটকে রাখলে চলবেনা। ই অনুরূপ প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রে। গুজরাটের বরোদা সহরে এমন একটি স্বয়ংচালিত যন্ত্র বসানো য়েছে যা'তে পয়সা ফেললে দুধের বোতল বেরিয়ে আসে! [কাদের তে বোতলগুলো আসছে?—তা জেনে কি হবে; তার চেয়ে নুন—বিজ্ঞানকে কি সুন্দর ভাবে মানুষের সেবায় লাগানো য়েছে!] বিহারের পাটনা সহরও এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। ানে আধুনিকতম ডেয়ারী তো থাকবেই, অধিকন্তু পশুদের জন্য ন্তুলিত' (balanced) খাদ্য উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হবে। [পশুরা ভাগ্যবান!]

আর ঈর্ষা করার কিছু নেই, অদূর ভবিষ্যতে কলকাতাও এই বন্যা কে রেহাই পাবে না!

এ তো গেল 'দুগ্ধ বন্যা' প্রকল্পের স্বপ্নিল সীমারেখা! এখন ধ-সায়রের স্বপ্নে বিভোর চোখ দুটো কচলে একবার ভালো করে বে দেখা যাক, এই বন্যা থেকে উপকৃত হচ্ছে কারা? বাঙ্গালোরের না থেকে আমরা দেখেছি—দৈনিক সংগৃহীত দুধের শতকরা দশ গ মাত্র (দুধ হিসেবে) বিক্রি হচ্ছে। এর কারণ কি এই যে নসংখ্যা কম বলে বিক্রি কম হচ্ছে? না, তা নয়। আসল কারণটা লা—ক্রেতার অভাব; কেননা দুধের বোতল অধিকাংশ লোকেরই য়-ক্ষমতার বাইরে। সুতরাং উদ্বৃত্ত দুধকে যখন আরো মহার্ঘ রূতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, তখন তার বিক্রয় আরো সীমাবদ্ধ হচ্ছে। র্থাৎ রূপান্তরিত বস্তুটি, আরো সীমিত সংখ্যক ধনবান অংশের াগে লাগছে। এই প্রকল্পের আগে দুধ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত ল, স্থানীয়ভাবে দুধ ও দুধ থেকে তৈরী অন্যান্য জিনিষ বিক্রয় করে আবশ্যিক ছিল। দুধ থেকে ঘি তৈরী করে বাজারে ছাড়ার ঙ্গ সঙ্গেই প্রোটিনে ভরা ঘোল এবং দই সাধারণ লোকে অপেক্ষাকৃত লভে পেতে পারতেন। দুধ না হোক, সহর-গ্রামের দিকে অন্ততঃ ঘোলের বন্যা বইত! চটকদার নামের আড়ালে ঢাকা নয়া প্রকল্পটি এই সুবিধা থেকে সাধারণ লোককে শুধু বঞ্চিতই করেনি, অধিকন্তু দেশজুড়ে বিদেশী শোষণের নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে।

সুরুতেই আমরা রাষ্ট্রসংঘের UNICEF সংস্থাটির ভূমিকার কথা বলেছি; এখন এর চরিত্রটিকে আরো খুঁটিয়ে দেখা যাক।

UNICEF দুধ বিক্রি করার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিয়েছে। এটি এমন একটি জটিল যন্ত্র যা কিনা হল্যাণ্ড-এর মতো উন্নত দেশের পক্ষেও দুগ্ধশিল্প ও ডেয়ারীতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। UNICEF এর এই 'করুণার' ফলে এই রকম উন্নতধর্ম বাইরের দেশ থেকে আমদানী করতে হবে। তাছাড়া ব্যয়বহুল স্বয়ংক্রিয় জটিল যন্ত্রগুলিকে প্রয়োজনমত সারানোর ব্যাপারে বিদেশী কারিগরীর ওপর নির্ভর করতে হবে। এর ফলে বিদেশের ওপর নির্ভরতা তো বাড়ছেই, —তার সঙ্গে আর একটি জিনিষও বাড়ছে,—বেকারী। বিশ্বের অপুষ্ট শিশুদের জন্য দরদে যে UNICEF-এর মন ভরা বুলির শেষ নেই, তার এই দালাল, শিশুহন্তার রূপ, সংস্থাটির স্ব-বিরোধিতার একটি আশ্চর্য প্রমাণ নয় কি?

এবারে আমরা আলোচনার সিদ্ধান্তে যেতে পারি। এই দুগ্ধ-বন্যা প্রকল্পটিতে যাঁরা উপকৃত হচ্ছেন, তাঁরা হলেন :—

(১) ইউরোপ, আমেরিকার মত শিল্পোন্নত দেশের কিছু এক-চেটিয়া পুঁজিপতি। এঁরা খ্যাতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যস্থতায় 'সাহায্য' তথা 'পরামর্শের' ভান করে, নিজেদের 'উদ্বৃত্ত' উৎপাদন এবং যন্ত্রপাতির জন্য বাজার তৈরী করেন। পরে স্থানীয় সস্তা শ্রমশক্তির দ্বারা কম খরচে উৎপাদিত পণ্য নিজেদের দেশে লুটে নিয়ে যাবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

(২) স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং কিছু ব্যক্তি যারা বিদেশী পুঁজিপতিদের নিহিত স্বার্থের সেবা করেন এবং এই দেশজোড়া লুটের অংশ পান।

(৩) সমাজের উপরতলার ক্ষুদ্র অংশটি, যারা আর্থিক সচ্ছলতার জন্য এই রকম জনস্বার্থ বিরোধী প্রকল্পের উৎপাদনকে নিজেদের ভোগে লাগাতে পারেন। এবং বলাই বাহুল্য, এই ধরণের রঙচঙে প্রকল্পগুলোকে, এঁরা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি হিসেবে নিয়ে থাকেন!

* * * *

অপারেশন ফ্লাড্! বন্যাই বটে। লোভের বন্যা! ঘৃণ্য স্বার্থের বন্যা! ঘাম-অশ্রু ও ক্রোধের বন্যা! যে ক্রোধ সমস্ত ধরণের শোষণকে আগামী দিনে কবরে পাঠানোর জন্য পাহাড়ের মতো জমছে!

---

এই প্রবন্ধটির রচনায় হিন্দি 'ফিলহাল' পত্রিকার, ২০শে ফেব্রুয়ারী '৭৩ সংখ্যা থেকে প্রভূত সাহায্য নেওয়া হয়েছে—লেখক।

দেখা যাচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির দুটি মূল ক্ষেত্র—কৃষি এবং শিল্প, উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের হার শোচনীয় আকার ধারণ করেছে এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে এক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর বেড়ে চলার সংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সামান্য হারে বেড়েছে, নীচের তথ্য থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সুসংবদ্ধ শিল্প উদ্যোগগুলিতে ১৯৭১-৭২ আর্থিক বছরে, কর্মসংস্থানের হার ২.৮শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্পগুলিতে ১৯৭১-৭২ সালে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার হলো ৩.৯ শতাংশ। আধাসরকারী সংস্থায়, ঐ বছরে এই হারের পরিমাণ ৯ শতাংশ, রাজ্যসরকারী সংস্থাগুলোতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কিন্তু ১৯৭০-৭১ সালের ৩.৯ শতাংশের তুলনায় কমে ১৯৭১-৭২ সালে ৩.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে—সম্প্রতি প্রকাশিত কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থানের প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি যে, এদেশে বেসরকারী শিল্পের আধিপত্য অনেক বেশী। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে মাত্র ০.১ শতাংশ। কিন্তু যোজনা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহন ধাড়িয়ার মতে, "পশ্চিমবাংলাতেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রতি বছর ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।" (অমৃতবাজার পত্রিকা ২৫. ৪. ৭৩)। শ্রী ধাড়িয়া আরও বলেছেন, "দেশে এখন ৩৩ লাখ শিক্ষিত বেকার রয়েছেন। এদের মধ্যে ২২৪৭৯ জন ইনজিনীয়ার, ৫৩৭১ জন ডাক্তার, ৫৩,০০০ জন স্নাতকোত্তর, ৫,৫৫০০০ জন স্নাতক, ১৬৩৬ জন আইনে স্নাতক এবং ৯৩৩২ জন কৃষি বিষয়ে স্নাতক। এ হিসাব গত বছরের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি" (আনন্দবাজার ১৭-৪-৭৩)। কিছুদিন আগে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "এম. এ., এম. এস. সি. পাশ করা বেকারের সমস্যা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।"

**আমাদের দেশের বর্তমান পরিচালকরা ক্রমবর্ধমান "শিক্ষিত" বেকার সমস্যার কোনরকম সমাধান করতে না পেরে এখন এক অদ্ভুত ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করেছেন। সে কৌশলটি হ'ল পরীক্ষায় পাশের হার সঙ্কোচন করা।** এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারদের তাঁরা চাকরী দিতে পারছেননা। কিন্তু কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা কমালে সহজেই ছাত্রগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন, তা বুঝেই তাঁরা এই "সূক্ষ্ম" পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। নতুবা গত বছরেই হঠাৎ সমস্ত পরীক্ষার ফলগুলো এরকম শোচনীয় আকার ধারণ করলো কেন? (লক্ষণীয় যে, গত বছরেই কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন কম হয়েছে)।

১৯৭২ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় শতকরা ৪০ জনকেও পাশ করানো হয়নি। হায়ার সেকেণ্ডারীতে পাশের হার ছিল ৪৬%। এতো গেল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পি. ইউ. পরীক্ষায় গত বছর শতকরা ২৬ জন পাশ করেছেন। ১৯৭২ সালের বি. এস. সি. এবং বি. কম. পরীক্ষায় শতকরা ২৭ জন মাত্র পাশ করেছেন। বি. এ. পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় এই হার ছিল মাত্র ২৩.৬%। দুরাত্মার যেমন ছলের অভাব হয় না, কর্তৃপক্ষও তেমনি এরূপ শোচনীয় ফলাফলের কারণ হিসাবে কতগুলো বস্তাপচা যুক্তি খাড়া করেছেন। তাঁদের মতে, (১) গত বছর ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করেনি, (২) এবছর ইনভিজিলেশনে কড়াকড়ি হওয়ায় পরীক্ষার্থীরা গণটোকাটুকির সুযোগ পায়নি, (৩) সন্দেহজনক উত্তরপত্রে "শূন্য" দেবার জন্যে পরীক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেশতো, হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে, কলেজের অনার্সের ছাঁটাই (elimination) পরীক্ষাগুলোয় ভাল ফল দেখিয়েও বহু ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছেন কেন? এঁরা কি পড়াশুনা না করেই, যাদুমন্ত্রের সাহায্যে অনার্সের ছাঁটাই পরীক্ষাগুলোয় ভাল ফল করেছিলেন? কলকাতার বহু নামী দামী কলেজের (যেখানে, কেবলমাত্র ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করা ছাত্রগণই ভর্তির সুযোগ পান) শতকরা ৭০/৮০ জন পরীক্ষার্থী ফেল করেছেন কেন?

আবার সচেতন ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, সাহস এবং তেজে ভরপুর ছাত্রসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবার জন্য, তাঁদেরকে চোরাবালির পাঁকে ডুবিয়ে রাখার জন্য গণটোকাটুকির একটা টোপ তাদের সামনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বেশীরভাগ ছাত্রই এ পথ ঘৃণার সাথে ত্যাগ করেন। মুষ্টিমেয় ছাত্র একাজ করবেনই, যেমন মুষ্টিমেয় ছাত্র অশ্লীল সিনেমা উপভোগ করা এবং জুল্‌ফি রাখাটাকে প্রগতির চিহ্ন হিসাবে দেখেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান শিক্ষাকর্তৃপক্ষ এই গণ-টোকাটুকিতে মদৎ দেবে। তাই গত বছর পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ইন্‌ভিজিলেশন কড়াকড়ির নামে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষের পেটোয়া গুণ্ডাবদ্‌মাসদের কিছু আয়ের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ছেঁদো যুক্তি ক্রমশঃই ছাত্রগণ বুঝতে পারছেন। প্রভুদের নির্দেশে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে পাশের হার সংকোচন করেছেন ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা রোধ করবার জন্য। প্রভুরা যে সন্তুষ্ট হবেন তা অঙ্কের হিসাবেই বলা যায়!···ধরা যাক, ১৯৭০ সালে ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী হায়ার সেকেণ্ডারীতে আর্টস বিভাগে পাশ করে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। ১৯৭২ সালে ঐ এক হাজার ছাত্রছাত্রী পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিলেন। ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে, মাত্র ২৩৬ জন (২৩.৬%) পাশ করেছেন। ঐ ২৩৬ জন আবার ১৯৭৩ সালে পার্ট টু পরীক্ষা দিলেন। ফলাফলে হয়তো (শতকরা ২৫%) ৬০ জন মাত্র পাশ করলেন। অর্থাৎ এক হাজার. বি এ.,ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৬০ জন বা শতকরা ৬ জন গ্র্যাজুয়েট হিসাবে চিহ্নিত হলেন। এ এক নোংরা, জঘন্য পরিকল্পনা।

**পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন :**

কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশের হার কমিয়েই বেড়ে চলা শিক্ষিত বেকার কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে না, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশেও দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করা হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্সের পার্ট-টু পরীক্ষা সাধারণতঃ প্রতিবছর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের পার্ট-টু পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নভেম্বর মাসে এবং তার ফল প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের মে মাসে। ১৯৭২ সালের পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হ'লেও, ফলাফল ১৯৭৩ সালের এপ্রিলেও প্রকাশিত হ'লোনা। অর্থাৎ ১৯৭১ এবং ১৯৭২ এই দু'বছরে দু'দল গ্র্যাজুয়েটের পরিবর্তে একদল গ্র্যাজুয়েট বাজারে ছাড়া হলো। এ এক নোংরা ঘৃণ্য পরিকল্পনা। শুধু ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৭১ সালের অর্থনীতি বিভাগের এম. এ. পরীক্ষা ১৯৭৩ সালের জানুয়ারীতে গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম. এ. পরীক্ষা ১৯৭৩ সালের ১০ই মে শুরু হবে। ১৯৭১ সালের এম. বি. বি. এস. ফাইন্যাল পরীক্ষা ২রা মে (১৯৭৩) থেকে শুরু হবে। ১৯৭১ সালের জুন মাসে যে ফাইন্যাল আইন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, আজও তার ফল প্রকাশিত হয়নি। ১৯৭২ সালের আইন পরীক্ষাগুলি আজও শুরু হয়নি। অর্থাৎ, ১৯৭১ এবং ১৯৭২ এই দু'বছরে দুটো গ্রুপের পরিবর্তে একদল ল' গ্র্যাজুয়েটও বার হ'লেন না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭২ সালের ডিগ্রী কোর্সের পার্ট ওয়ান এবং পার্ট-টু পরীক্ষার ফল আজও প্রকাশিত হয়নি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তথৈবচ। জানা গেছে যে, বর্ধমানের পরীক্ষা দুটির এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ট-টু'র ফলাফল খুবই শোচনীয় হয়েছে। হাঁ, এখন প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফলই শোচনীয় আকার ধারণ করবে।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে, "কষ্ট করলে কেষ্ট পাবে।" কিন্তু আজ সারাবছর অধ্যয়ন তপস্বী হলেও ফলাফল অনুকূল নাও হ'তে পারে। সারাবছর অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও "কেষ্ট" পাবার সম্ভাবনা কম। এই পরিস্থিতিতে, স্বাভাবিকভাবে উত্তরপত্রের মর্য্যাদা হ্রাস পায় এবং পরীক্ষা কনট্রোল দফ্‌তরের সাথে উৎকোচের যোগসাজসে উত্তীর্ণ হবার বাস্তব সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ইচ্ছা তীব্র হয়ে ওঠে। এরকম নোংরা খেলা বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকহারে চলছে। "শিক্ষিত" বেকারের সমস্যা একটি ভারত জোড়া সমস্যা। কিন্তু নানা কারণে পশ্চিমবঙ্গেই এর তীব্রতা এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী। শ্রীমোহন ধাড়িয়া বলেছেন, "সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৬,৪৭,৫০২ জন।" (অমৃত বাজার পত্রিকা ২৫-৪-৭৩)। অর্থাৎ সমগ্রের শতকরা ২০ অংশেরও বেশী। সেইজন্য "নতুন" কৌশলের আমদানী সবার আগে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই পথে ক্রমশঃই পা বাড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা স্বর্গত গোখেলের সেই বাণী, "বাংলা যা আজ ভাবে সারা ভারত ভাবে কাল"—অনুসরণ করছে।

পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশে সুদীর্ঘ বিলম্ব এবং পাশের হার সঙ্কোচনের ফলে বহু বেসরকারী কলেজে ভয়াবহ আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। বহু কলেজেই অধ্যাপকরা বেতন পাচ্ছেন না। ৭২-এর পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় শোচনীয় ফলাফলে বেশ কিছু কলেজের থার্ড ইয়ার ক্লাস, ১৯৭৩ সালে চালু করা যায়নি। অধ্যক্ষ সমিতির সম্পাদক ডঃ অরুণ কুমার বসু কয়েকদিন আগে বলেছিলেন : "বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে, যে কোন মুহূর্তে রাজ্যের কয়েকশত কলেজ বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।" অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে, শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এক অনিশ্চিত অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

**আশু কর্তব্য :**

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে আঘাত হানার ব্যাপারটিকে সামগ্রিকভাবে ছাত্রসমাজের উপর একটি আক্রমণ হিসাবে দেখা উচিৎ এবং দেখতে হবে। আজ কেবলমাত্র ছাত্রগণের উপরই আক্রমণের খড়্গ নেমে আসেনি, শিক্ষক মহাশয়দের উপরও আক্রমণ শুরু হয়েছে। কামারপুকুর কলেজের পনেরজন অধ্যাপককে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এসপ্লানেড ইষ্টে অবস্থান ধর্মঘট করেছিলেন এবং দাবীও আদায় করেছেন। গত ১৮ই এপ্রিল থেকে পশ্চিমবাংলার প্রায় ৩০০টি কলেজের সাড়ে সাত হাজার অধ্যাপক ১৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট করছেন। ছাত্ররা যেমন সারাবছর কষ্ট করেও কেষ্ট পাচ্ছেন না, তেমন অধ্যাপক, মাধ্যমিক শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষকগণও পরিশ্রমের মর্য্যাদালাভে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ রাজ্যের আড়াই হাজার অধ্যাপক মাসে মাত্র ১৭০ টাকা বেতন পান অথচ এ রাজ্যের রাজ্যপাল বিনা পরিশ্রমে, কয়েকটি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে লাল ফিতে কেটে মাস পয়লা ৫,৫০০ টাকা পান। গত ৩০শে এপ্রিল, দেশের পাঁচ হাজার অধ্যাপক নয় দফা দাবীর ভিত্তিতে নয়া দিল্লীতে বিরাট বিক্ষোভ দেখান। যে দেশের জনৈক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির জন্মদিবস "শিক্ষক দিবস" হিসাবে পালিত হয়, সেই দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, মাধ্যমিক শিক্ষক অথবা প্রাথমিক শিক্ষকগণকে, পারিশ্রমিকের জন্য রাস্তার ফুটপাতে অবস্থানরত দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়। ছাত্রদের শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান অরাজকতা বন্ধের জন্য আন্দোলন করতে হবে, এবং সাথে সাথে শিক্ষক মহাশয়দের ন্যায়সঙ্গত ধর্মঘটের পাশে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, গুরুকুল এবং শিষ্যকুলকে, হাতে হাত মিলিয়ে যৌথ মোর্চা গড়ে তুলে আন্দোলন চালাতে হবে—শিক্ষাক্ষেত্রের ভবিষ্যতকে অন্ধকার মুক্ত করার জন্য।

# বিচিত্র উইল

এন্তোয়েন দ্য লা সেল

ফরাসী ঔপন্যাসিক এন্তোয়েন দ্য লা সেল-এর জন্ম হয় ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে। প্রভাঁসের অধিবাসী ছিলেন তিনি। ইতালীতে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ডিউক অব বারগাণ্ডির রাজদরবারে প্রবেশ করেন। তাঁর ছোট গল্প তখনকার দিনের অধঃপতিত ফরাসী সমাজের পরিচয় বহন করে। 'বিচিত্র উইল' তখনকার দিনের অধঃপতিত ফরাসী বিশপ জীবনের উপরে একটি বিদ্রূপাত্মক কশাঘাত। গল্পটি আমরা সংগ্রহ করেছি, অনিলেন্দু চক্রবর্তী নির্বাচিত ও অনুদিত 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প ; তৃতীয় খণ্ড ; ফরাসী' নামক বই থেকে। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে সেলের মৃত্যু হয়। —সঃ মণ্ডলী 'বীক্ষণ'

তাহ'লে শুনুন, অবশ্যি যদি ভালো লাগে,—ব্যাপারটা ঘটেছে কয়েকদিন আগেই। আমাদের গাঁয়ে এক পাদ্রী ছিলেন, বেশ সাদাসিধে ভাল মানুষটি। এই ভালমানুষির জন্যেই কিন্তু বিশপ তাকে জরিমানা করেছিলেন পাঁচ শ' স্বর্ণমুদ্রা। পাদ্রীর একটা কুকুর ছিল, বাচ্চাকাল থেকেই সেটাকে তিনি লালনপালন করে তুলেছিলেন। কখনও তিনি তাঁর লাঠি জলে ছুঁড়ে ফেল্‌লে, কোথাও টুপি ফেলে এলে, বা ইচ্ছে করেই রেখে এলে—তা তুলে আনতে তার জুড়ি মিলত না কোথাও ; এক কথায় সত্যিকার সৎপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান কুকুরের যা যা জ্ঞাতব্য এবং কর্তব্য সবই ছিল তার নখাগ্রে! সবকিছুতেই সে ছিল অদ্বিতীয়! সেজন্য তার মনিব তাকে এত ভালোবাসতেন যে কুকুর বলতে তিনি ছিলেন অজ্ঞান!

কিন্তু তারপর যা ঘটল আমার পক্ষে তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। এই বিশিষ্ট জীবটি হঠাৎ বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা লাগার জন্যে অথবা অনিষ্টকর কিছু উদরসাৎ করার ফলে—তা যে জন্যেই হোক, অসুখে পড়ে মারা গেল। অর্থাৎ ইহসংসার ছেড়ে চলে গেল সোজা স্বর্গধামে —সৎ কুকুরেরা যেখানে গিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এই সৎ পাদ্রীটি করলেন কি তখন? তাঁর গির্জাবাসের পাশেই ছিল অভিজাত কবর-ভূমি! কুকুরটি ইহধাম ত্যাগ করে চলে গেলে তিনি ভেবেচিন্তে স্থির করলেন—এহেন সৎ ও বিজ্ঞ জীব যথোচিত সমাধিকৃত্য পাওয়ার সম্পূর্ণই উপযুক্ত। তাই ঘরের পাশেই মাটি খুঁড়ে কুকুরটিকে তিনি কবর দিলেন,—ঠিক একজন ধার্মিক খৃষ্টানের মতোই! তিনি তার কবরদেশে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করিয়ে সেখানে কোনো স্মৃতিলেখাও খোদাই করে দিয়েছিলেন কিনা—সেকথা আমি বলতে পারবো না, কাজেই এ প্রসংগে নীরব থাকব। তবে আমি ছাড়া আরও কত লোক রয়েছে এই যা ভরসা। শিগগিরি এই মহানব্রত কুকুরের মৃত্যুসংবাদ চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো এবং ক্রমে ক্রমে পৌছল গিয়ে বড়কর্তা বিশপের কানে। ধার্মিক খৃষ্টানের মতোই একটি কুকুরকে কবর দেবার কাহিনীটা শুনতেও তাঁর বাকী রইল না। কাজেই বিশপ তাঁর সামনে হাজির হবার জন্য পাদ্রীটিকে শমন পাঠালেন।

শমনের সংবাদ নিয়ে এল এক পিওন। পাদ্রী তাকে দেখে বললেন—"সেকি! আমি এমন কি অপরাধটা করলাম যে বিশপের বিচারালয়ে আমাকে হাজির হতে হবে। শমন দেখে সত্যি আমি ঘাবড়ে গেছি। কি অন্যায়টা হ'ল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

লোকটি বলল—"তা দেখুন, আপনাকে কি জন্যে ডেকেছেন, তার আমি কি বলব? তবে, খৃষ্টানদের কবরভূমিতেই যে কুকুরটাকে আপনি কবর দিয়েছেন হয়ত বা সেজন্যেই—"

পাদ্রী ভাবলেন—"হায়রে, তবে তো তাই!"

হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো, হয়ত তিনি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছেন! এবারে চরম পরিণামের জন্যেই প্রস্তুত থাকা ভালো।

বিশপটি ছিলেন একটি লোভী জীব বিশেষ,—এদিক দিয়ে সারাটি দেশে তাঁর জুড়ি ছিল না।

তাঁকে হাতে রাখতে হলে যে কি পরিমাণ তেলমসলা খরচা করা দরকার—সেকথা স্থানীয় লোকজনের বেশ ভালো করেই জানা ছিল। পাদ্রীটিও বেশ ভালো করেই জানতেন, শুধু জেলভোগ হ'লেই নিষ্কৃতি নেই, সংগে সংগে জরিমানাও দিতে হবে প্রচুর!

"টাকাই যখন খরচ হবে, এই বিপদ থেকে গাঁ বাঁচাবার ফিকিরও বের করতে হবে"—ভাবলেন তিনি।

কাজেই শমনের জবাবে তিনি সশরীরে এসে উপস্থিত হলেন ধর্মাত্মা বিশপের সামনে। বিশপ কুকুরের কবর প্রসংগে কটু মন্তব্য করে সুদীর্ঘ এক ধর্মোদ্দীপিত বক্তৃতা দান করলেন। তাঁর কথা শুনে

মনে হ'ল—ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করার মত অপরাধও এর তুলনায় হালকা ও তুচ্ছ। সুদীর্ঘ ধর্মবাণীর শেষে পাদ্রীকে তিনি জেলে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন।

একটা অন্ধকার পাষাণ কুঠুরীর মধ্যে আটক রাখা হবে শুনে, পাদ্রী তো ভয়ে আধমরা! বিশপকে তিনি পায়ে ধরে অনুরোধ করতে লাগলেন তাঁর কথা অনুগ্রহ করে শুনবার জন্যে। প্রার্থনা মঞ্জুর হ'লো। আর তখন,—সেই বিচারালয়ে ভীড় করে এলো দলে দলে লোক, হাজার হাজার লোক: অফিসার, ব্যারিষ্টার, এটর্নি, সেরেস্তাদার, কেরানী, উকীল, মোক্তার এবং আরো কত। কুকুরের কবরের এই মোকদ্দমায় সবাই বেশ মজা লুটছিলো! পাদ্রী তাঁর জবানিতে একটা কথা বললেন শুধু,—

"প্রভু, ধর্মাবতার! আমার মতো আপনিও যদি আমার কুকুরটিকে জানতেন, তবে তাকে ওরকম কবর দেওয়ায় মোটেই বিস্মিত হতেন না। কারণ, এর জুড়ি কখনো হয়নি, হবে না এবং হতে পারে না!"

এরপর তিনি তাঁর কুকুরের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন,—"আজীবন সে বুদ্ধিমান ছিল বলেই মৃত্যুকালে সে আরো বেশী বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে গেছে, সে রেখে গেছে বিশিষ্ট এক উইল; আপনার প্রয়োজন এবং অভাবের কথা সে জানত বলেই, আপনার নামে দান করে গেছে এই পাঁচ শ' স্বর্ণমুদ্রা। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।"

পকেট থেকে থলিটা তুলে গুনে গুনে বিশপকে দান করলেন। ধর্মাবতার তাঁর এই ন্যায্য 'উত্তরাধিকার' পরম তৃপ্তিতে গ্রহণ করলেন। এবারে এই মহান কুকুরটির আশ্চর্য সৎবুদ্ধি, তৎকৃত উইল ও তাকে কবর দেওয়াকে যথার্থই প্রশংসা করলেন তিনি এবং এ বিষয়ে তাঁর একান্ত অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

# ছাত্র আন্দোলনের দলিল

আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্নস্তরে, শিক্ষাপরিচালনার দায়িত্বে শিক্ষাবিদের ছদ্মবেশে যেসব আমলারা বসে আছেন, কথায় কথায় যাঁরা ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃংখলতার অভিযোগ আনেন এবং সুশৃংখল ও বিনয়ী হতে উপদেশ দেন—ছাত্রছাত্রীদের এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সেইসব শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ধরণের, নীচের দলিল দুটি (যদিও তার একটিতে—প্রথমটিতে আমরা দেখতে পাবো যে, দলিল রচয়িতাদের আমলাতন্ত্রের প্রতি মারাত্মক দুর্বলতা রয়েছে) তার জলন্ত উদাহরণ। যে বিশেষ প্রতিভাধরের কীর্তিকাহিনীর উল্লেখ দলিল দু'টিতে রয়েছে, সেই পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একটি বিভাগের শিক্ষাপরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে, যে বিভাগে পরীক্ষার হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রছাত্রীরাই একমাত্র পড়ার সুযোগ পান—অর্থাৎ বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগ। "বহুমুখী" এক প্রতিভার অধিকারী তিনি—একাধারে বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার বিভাগ-প্রধান, খয়রা অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. কমিটির চেয়ারম্যান ইত্যাদি আরো কত কি! "বহুমুখী" এই প্রতিভার পুরুষের কিছু শিক্ষকোচিত মহান গুণাবলীর একটি ফর্দ—যা তাঁর বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই তৈরী করেছিলেন—নীচের দলিল দুটিতে আমরা পাবো।

এইসব গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোঝা কঠিন হয় না, যে কেন তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা বিস্ফোরণের আকার নিয়ে ফেটে পড়েছিল ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। শুরু হয়েছিল, পরেশবাবুর অপসারণের দাবীতে দলমত নির্বিশেষে বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন। দলিল দু'টি এই আন্দোলনের সময়েই প্রকাশিত হয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, একসময় ছাত্রছাত্রীদের রোষবহ্নিকে প্রশমিত করার মানসে পরেশবাবুকে এক বছরের জন্য সবেতন ছুটি দেন এবং ঐ বিভাগেরই একজন অধ্যাপক, এন, এন, ভট্টাচার্য্যকে বিভাগ প্রধানের পদে নিয়োগ করে। আর ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দেন যে—পরেশবাবুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির তদন্তের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি, শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হবে। সেই

আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা শান্ত হয়ে গেলেও, সেই তদন্তের ফলাফল কি হ'ল, কিম্বা আদৌ কোন তদন্ত হয়েছিল কিনা আজো তা জানা যায়নি। ইতিমধ্যে একবছর কেটে গেছে। এবং পরেশবাবুও যে আবার বহাল তবিয়তে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগে ফিরে এসেছেন তাই নয়, কর্তৃপক্ষ পুনরায় তাঁকে বিভাগ প্রধানের পদেই বহাল করেছেন! প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এহেন ঘৃণ্য ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনর্বহাল করলেন কোন যুক্তিতে? করলেন, তার কারণ—এই পরেশবাবুরা সংখ্যায় একজন নন—একাধিক, অসংখ্য। নানারূপে, নানাবেশে তাঁরাই আজ ছাত্রছাত্রীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! তফাৎ শুধু এই যে কোথাও এরা কম নয়, কোথাও বেশী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা তাঁদের স্বগোত্রীয়কে রক্ষা করেছেন, এতে আর অবাক হবার কি আছে? এইসব 'ছাত্রদরদী' শিক্ষাবিদেরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কি গভীর ঘৃণা পোষণ করেন, নীচের দলিল দু'টিতে তা আমরা দেখতে পাবো। এইসব শিক্ষাবিদদের হাতেই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সঁপে দেওয়া, হিতোপদেশের গল্পের কুমীরের কাছে শিয়ালছানা রাখতে দেওয়ার মতই ভয়ঙ্কর। এক বছর আগের হলেও দলিল দু'টি তাদের প্রাসঙ্গিকতা যে এতটুকুও হারায়নি, তা শুধু এই কারণেই নয় যে, শ্রীযুক্ত পরেশবাবু আবার স্বপদে পুনর্বহাল হয়েছেন—সাথে সাথে এই কারণেও বটে যে, দেশজুড়ে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন চূড়ান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত এইসব "শিক্ষাবিদদের" হাতে শিক্ষাজগতের তদারকীর ভার দেওয়া আজও অব্যাহত রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আজ শুধু ছাত্রছাত্রীরা নন, তাঁদের প্রতি স্নেহশীল শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্মচারীদেরও এগিয়ে আসা দরকার।

সঃ "বীক্ষণ"

# বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের বক্তব্য

সুধী,

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা, পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্ররা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক, ছাত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যসকলকে জানাচ্ছি যে বিভাগীয় প্রধানের অপসারণের দাবীতে আমরা আজ এক আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছি। যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি শিক্ষকের সঙ্গে প্রতিটি ছাত্রের এক সুস্থ সম্পর্ক থাকা উচিত তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত এবং একথা বলতেও আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে এর পূর্ণ দায়িত্ব বিভাগীয় প্রধান শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের। বিগত বহুবছর ধরে ঐ প্রধানের খামখেয়ালীপনায় ছাত্ররা ভুগে এসেছে, কিন্তু নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কোন চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বন করা থেকে ছাত্ররা বিরত থেকেছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি (১৮-২-৭২) পরেশবাবু ছাত্রদের বাবা-মাকে পর্যন্ত টেনে আনতে শুরু করেছেন। আমাদের এক সহপাঠী তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, "স্যার, আমাদের পরীক্ষা কবে হবে?" তার জবাবে তিনি বলেছেন, **"তোমরা তো University-র আদরের দুলাল,** তোমরা V. C.-র কাছে যাও, Pro V.C.-র কাছে যাও, Secretary-র কাছে যাও, তাদের জিজ্ঞাসা করো তোমাদের পরীক্ষা হবে কিনা। **তোমরা এক একটা ছেলে হচ্ছ সমাজের পাপ। তোমার বাবা-মা তোমাকে জন্ম দিয়ে পাপ করেছেন, তোমাদের বন্ধুদের বাবা-মা তাদের জন্ম দিয়ে পাপ করেছেন; যাও তোমার বাবাকে বলো যে আমি একথা বলেছি। আমার কাছে যদি একটা রিভলভার থাকতো তবে তোমাদের প্রত্যেককে আমি দাঁড় করিয়ে কুকুরের মতো গুলি করে মারতাম। আমি দেখে নেব তোমরা কি করে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বের হও।"** এই যদি কোন বিভাগীয় প্রধানের মনোভাব হয় তবে তাঁর প্রতি ছাত্রদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকতে পারে না। এই ঘটনা যদি তাঁর কোনও দুর্বল মুহূর্তের উত্তেজনা-প্রসূত হত তাহলে তাঁকে ক্ষমা করার মত সুযোগ আমাদের থাকত। কিন্তু তাঁর এই ধরণের অসদাচরণ এবং ছাত্রস্বার্থবিরোধী মনোভাবের অভিযোগ বহুদিনের সঞ্চিত। এই কারণে আমরা তাঁকে আর একদিনও আমাদের অধ্যাপক হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের আরও বহুবিধ অভিযোগ:

১। দ্বিবার্ষিক এম. এস. সি. কোর্সে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের তৃতীয় বর্ষের বেশ কয়েকমাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরীক্ষা গ্রহণের চেষ্টার সর্বাঙ্গীন বিরোধিতা করে তাঁর অকারণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। অসহায় ছাত্রদের আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করলে তিনি সেই প্রচেষ্টাকেও বানচাল করার চেষ্টা করেন ও ছাত্রদের 'V. C., Pro V. C.-র আলালের ঘরের দুলাল' অভিহিত করে মাননীয় V. C., Pro V. C. কেই অপমান করেন। এছাড়াও পরীক্ষা গ্রহণের দিন ঘোষিত হলে ছাত্রপরিষদের নামে ভুয়ো চিঠি

প্রচার করে পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য পরিকল্পনা করেন।

২। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজনে অথবা জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য হওয়ার মানসে ছাত্ররা তাঁর কাছে পরিচয় পত্র চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন, উপরন্তু ছাত্রদের অপমান করে ঘর থেকে বের করে দেন।

৩। পরীক্ষায় নম্বর দানের ব্যাপারে নিজের উচ্চক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অনেক ছাত্রের ভবিষ্যত নষ্ট করেছেন বলে দাবী করেন এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ করবার হুমকি দেন; বলেন, "তোমরা কি করে পরীক্ষায় পাশ করো, কি করে চাকরি পাও, কি করে রিসার্চ করো, আমি দেখে নেবো।"

৪। বিভাগীয় অধ্যাপকগণ সিলেবাস আধুনিকী-করণের এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের যে প্রস্তাব করেছিলেন পরেশবাবুর সর্বাঙ্গীণ বিরোধিতার ফলেই তা কার্যকরী করা হয়নি।

৫। Physics Interviewing Committee (U. S. A.) বিভাগীয় ছাত্রদের Interview-তে আহ্বান করলে সেই চিঠি পরেশবাবু ছাত্রদের কাছ থেকে গোপন করে রাখেন।

৬। তিনি নিরপরাধ ছাত্রদের অকারণে বারংবার খুনী বলে অভিহিত করে ছাত্রদের অপদস্থ এবং নিজের বিকৃত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন।

বিভাগীয় প্রধানের পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার সকলপ্রকার অপচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মার্চ মাসে আমাদের পরীক্ষা হবে বলে আশ্বাস পেয়েছি। কিন্তু আজ আমরা উপলব্ধি করছি যে পরেশবাবু বিভাগে থাকলে পরীক্ষা দিলেও আমরা তাঁর ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হবো। তাই আজ আমরা তাঁর অপসারণের দাবী তুলতে বাধ্য হয়েছি। উপরন্তু উপরোক্ত সমস্ত ঘটনার পটভূমিকায় বিচার করলে এ সন্দেহ স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে, পরেশবাবু কি মানসিকভাবে সুস্থ? মানসিক সুস্থতা যার নেই এমন একজন ব্যক্তিকে বিভাগীয় অধ্যাপক হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া শুধু অস্বাভাবিক নয়, অন্যায়ও বটে।

আমাদের এই আন্দোলন বিজ্ঞান কংগ্রেসের মধ্যে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করতে আমরা চাইনি। তাই বিজ্ঞান কংগ্রেস শেষ হবার পর প্রথম সুযোগেই এই দাবী আমরা তুলে ধরছি। আমরা এ কথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে আমাদের **এই আন্দোলন শিক্ষক সমাজের বিরুদ্ধে নয়।** কোন শিক্ষককে তাঁর উচ্চপদ থেকে নামিয়ে আনার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই একথাও আমরা জানি। শিক্ষকের পবিত্র আসনের মর্য্যাদা অমলিন রাখাই আমাদের আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই শুরুতেই শিক্ষক সমাজের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণাম জানাই।

পরিশেষে, এই আন্দোলনে আপনাদের সক্রিয় সমর্থন আমরা আশাকরি এবং সকলের সমর্থনপুষ্ট এই যুক্তিসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত দাবী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে মেনে নেবেন এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

বিনীত—

**বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগের**
**ছাত্রছাত্রীবৃন্দ**

# যে কারণে পরেশবাবুর অপসারণ

আমাদের সহ্যেরও যে একটা সীমা আছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার সময় বোধহয় এতদিনে এসেছে। বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান, অতি পরিচিত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বিস্ময়কর খামখেয়ালীপনা গত পাঁচ-ছ' বছরে এই Department কে ভগ্নদশার শেষ সীমায় এনে দিয়েছে। শুধু একটিমাত্র লোকের নির্লজ্জ স্বেচ্ছাচারিতায় ছাত্রদের তীব্র অসন্তোষ জমা হতে হতে এখন পাহাড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু ধৈর্য্যের পরীক্ষা হয়েছে। আর নয়, যিনি ছাত্রদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু ভাবেন না, তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিক্ষোভের পথছাড়া আমাদের বিভাগকে পরিচ্ছন্ন করার আর কোন পথ আজ আর খোলা নেই। এই বিক্ষোভ **মাত্র একজনের বিরুদ্ধে** প্রাক্তন, বর্তমান এবং আগামী ছাত্রর মিলিত প্রতিবাদ।

পরেশ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় ডিপার্টমেন্টের অবস্থা অবনতির সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত নামছে, অথচ তিনি দিনের পর দিন উন্মাদের মত ছাত্রস্বার্থবিরোধী কাজ করে যাচ্ছেন। এর সত্যতা সরাসরি যাচাই করতে নীচের বিষয়গুলির আলোচনাই যথেষ্ট—

১। **সিলেবাস আধুনিকীকরণ:** প্রাক্তন ছাত্র এবং অন্যান্য সূত্রে জানা যায় সিলেবাসের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের কথা শুনলেই এই ভদ্রলোক আঁতকে ওঠেন। কারণ অজানা। বিশ্বের প্রগতিকে অগ্রাহ্য করে, সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতাকে মূল্য না দিয়ে "মান্ধাতার" আমলের সিলেবাস ও পড়ানোর পদ্ধতি এখানে এখনো চলছে। ২০ বছর আগের নোট ক্লাশে যান্ত্রিকভাবে লিখিয়ে কাজ সারা হচ্ছে। ১৯৭০-৭১ এ একটি নতুন সিলেবাস তৈরী হয় এবং পরীক্ষা পদ্ধতিরও পরিবর্তনের

সুপারিশ করা হয়। দীর্ঘ ছুটি উপভোগের পর ফিরে এসে পরেশবাবুর প্রথম কাজ হয় এই সমস্ত সুপারিশকে সম্পূর্ণ বাতিল করা।

২। **উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ:** বিজ্ঞান শাখার এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে শিক্ষকসংখ্যা অত্যন্ত কম। **শিক্ষক হিসাবে তাঁর অযোগ্যতা** কোন তর্কের অপেক্ষাই রাখে না অথচ তাঁরই কারসাজিতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বহু brilliant শিক্ষককে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হতে হয়েছে। এরকম উদাহরণ বহু আছে। এহেন দুর্নীতির কোন বিচার হয় না। এছাড়া বর্তমান অধ্যাপকদের অনেককেই নিজের "Specialised" বিষয়ে পড়াতে দেওয়া হয় না, ফলে প্রকৃতপক্ষে কিছু শেখাও হয় না, শেখানোও হয় না।

৩। **লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন:** লাইব্রেরীর চেহারা অতি করুণ। অধিকাংশ ক্লাশের দুর্বোধ্যতায় ছাত্রদের নিজেদের চেষ্টায় পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। প্রয়োজনের তুলনায় বই এত কম যে, দরকার অনুযায়ী বই না পাওয়াটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪। **লেবোরেটারী সংস্কার ও উন্নতি:** লেবোরেটারীর দশা ততোধিক কলঙ্কজনক। ডিফেকটিভ যন্ত্রপাতি দিব্যি বহাল আছে। আজো আমাদের বহু B. Sc. practial করতে হয়। এইরকম ভগ্নপ্রায় লেবোরেটারীতে কাজ করতে বাধ্য হয়ে ছাত্রদের সমস্ত মেধাই যে নষ্ট হতে পারে, সেটুকু বোঝার মত মেধাও পরেশবাবুর নেই।

৫। **বৃহত্তর স্বার্থে বিভাগের কলেবর বৃদ্ধি:** ছাত্রদের পড়ার সুযোগ বন্ধ করার ব্রত নিয়েই যেন তিনি তাঁর চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে আছেন তার কয়েকটি প্রমাণ—Pure physics-এ প্রাতঃকালীন বিভাগ খোলার ব্যাপারে (যেটা অন্যান্য বহু department-এ হয়েছে) তিনি মরিয়া হয়ে বিরোধিতা করে যাচ্ছেন ক্রমাগত। ৭০০/৮০০ ফিজিক্স স্নাতকের মধ্যে মাত্র ৯০ জন M. Sc. পড়ার সুযোগ পায়। শুধু একজনের নির্লজ্জ গাফিলতিতে বিরাট সংখ্যক পাশ-করা ছাত্র তাদের ভবিষ্যৎ তৈরী করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই ঘৃণ্য কাজের কি জবাব পরেশবাবু দেবেন? এই বিভাগের পাশের পর গবেষণার সুযোগ অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় লজ্জাজনক। ভয়াবহ বেকারত্বের যুগে আমাদের বিভাগ-প্রধান চারটি গবেষণার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন—নতুন সুযোগ তৈরীর পরিবর্তে। অদ্ভুত চাতুরীবলে একটিমাত্র গবেষণাগারে প্রধানতঃ অর্থব্যয় করে থাকেন, এবং অত্যন্ত কলঙ্কজনকভাবে তাঁর এই সাধের বিভাগ থেকে প্রকাশিত পেপারের সংখ্যা উল্লেখের অযোগ্য। তাঁর অধীনে একটিও Ph. D. হয়নি কেন তিনি বলতে পারেন?

৬। **Staff Committee তে ছাত্র প্রতিনিধিত্ব:** ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা ব্যক্ত করার সুযোগ নেই। অবশ্য ছাত্রদের সামনে দেখলেই যাঁর গাত্রদাহ শুরু হয়, মানসিক স্থিতি হারিয়ে যায়, সেই পরেশবাবু ছাত্র প্রতিনিধিত্বকে সমূলে বিনাশ করবেন—সেটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। কিন্তু বিভাগীয় Staff Committee-র সুপারিশ, এমন কি ভাইস-চ্যান্সেলারের নির্দেশও তিনি কৌশলে অগ্রাহ্য করার মত নোংরামি করেছেন। পরীক্ষা যথেচ্ছভাবে পিছিয়ে যাচ্ছেন শুধু ছাত্রদের অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে।

৭। **পাশের পর কর্মসংস্থানের সহায়তা:** আমাদের মহানুভব বিভাগ-প্রধানের কল্যাণে নিজেদের বিভাগে আমাদের কোন স্থান নেই। অত্যন্ত দুঃখের হলেও এটি চূড়ান্ত সত্য। ছাত্রদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা তো দূরের কথা ছাত্র-শত্রুতা ছাড়া পরেশ ভট্টাচার্য্যের ইতিহাসে আর কিছু আজ অবধি লেখা হয়নি। অন্যায়ভাবে first class-এর সংখ্যা ইচ্ছা মতো কমিয়ে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের তিনি সবার নীচে স্থান করে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। বাইরের কোন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার ব্যাপারে বা অন্য কোন প্রয়োজনে ছাত্রদের অনুমোদন করায় তাঁর প্রবল অনীহা। আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ Physics Interview Committee-র খবর বিভাগের অন্য অধ্যাপকের কাছে জানতে হয়—এই তাঁর ছাত্রপ্রীতির নমুনা।

৮। **ছাত্র সম্পর্কে সুস্থ মানসিকতার পরিচয়:** অনেকে অনেক ব্যাপারে আনন্দ পায়। পরেশবাবুর একমাত্র আনন্দ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করায়। বিভাগের সামান্যতম ত্রুটির সমালোচনা তাঁকে হিংস্র করে তোলে। আপ্রাণ চেষ্টায় অন্ততঃ একটি ভালো ছাত্রেরও ভবিষ্যত নষ্ট করতে পারলে তাঁর গর্বের সীমা থাকে না। বহু ছাত্রের সর্বনাশ তিনি করেছেন। আর সেই "সুকীর্ত্তির" উল্লেখ করে অন্যান্য ছাত্রদের ভীতিপ্রদর্শন করে তিনি প্রচুর মজা উপভোগ করেন। সভ্যজগতের বাইরে জংলী অধিবাসীরা নরহত্যা করে উল্লাস করে থাকে, পরেশবাবুর আচরণ সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ছাত্রদের সাথে উন্মাদ-সদৃশ ব্যবহার আজকাল আরো বেড়েছে, "তোমাদের গুলি করে মারতাম" ইত্যাদি হুমকীতে তৃপ্ত না হয়ে তিনি ছাত্রদের জন্মদাতা সম্পর্কে অশ্লীল বাক্য অসংকোচে উচ্চারণ করেছেন। ....অসুস্থ লোককে দিয়ে সুষ্ঠু কাজ হয় না। এইরকম একজন বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে বিভাগ-প্রধানের চেয়ার কলুষিত করার সুযোগ আর কতদিন দেওয়া উচিৎ?

এই প্রশ্নের বিচারের ভার আজ ছাত্রদের ওপর এসেছে। শিক্ষাজগতে পরেশ ভট্টাচার্য নামধারী একজন ক্ষতিকারক প্রশাসক ও শিক্ষককে (?) মেনে নেওয়ার কোন যুক্তি আর নেই। বর্তমান ও আগামী-ছাত্রের স্বার্থে, অন্যান্য অধ্যাপকদের স্বার্থে, বিভাগের বিষাক্ত আবহাওয়াকে পরিশুদ্ধ করা দরকার। তার জন্য একটি জিনিসেরই

আজ প্রয়োজন—পরেশবাবুর সম্পূর্ণ অপসারণ। নিরঙ্কুশ একতা নিয়ে ন্যায় ও সঙ্গত দাবী যদি সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে বাধ্য।

ষষ্ঠ বার্ষিকের পরীক্ষা নিয়ে পরেশবাবু অনেক ছেলেখেলা আর ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন। এ আক্রমণ, স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের ওপরেও আসবে। শুধু বাঁচার তাগিদে এই একমাত্র পথ—মিলিত আন্দোলনের পথ—বেছে নিতে হয়েছে। ষষ্ঠ বার্ষিক ছাত্রদের ন্যায়-সঙ্গত দাবী ও আন্দোলনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থনের সম্মিলিত হাত প্রসারিত করছি। জয় আমাদের হবেই।

বিশুদ্ধ পদার্থ বিদ্যার পঞ্চ বার্ষিক
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।



# পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের সাম্প্রতিক আন্দোলন

জনৈক অধ্যাপক

বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে গত ১৮ই এপ্রিল থেকে লাগাতার কর্মবিরতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়—শিক্ষকদের যে আন্দোলন চলছিল, তার সমাপ্তি ঘটলো ২৮শে এপ্রিল। শিক্ষকদের যে সমস্ত দাবীর ফলে পাঞ্জাব, বিহার, হরিয়ানার বুকে ঝড় উঠেছিল, অনেকাংশে সেই সমস্ত দাবী পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপকদের থাকা সত্ত্বেও এখানে শিক্ষকদের রক্তে রাজপথ রাঙা হয়নি, ছাত্ররা শিক্ষকদের হাত শক্ত করার জন্য জংগী আন্দোলন গড়ে তোলেননি; আন্দোলনটি অত্যন্ত 'শান্তিপূর্ণ'ভাবে 'নির্বিঘ্নে' শেষ হয়েছে। এই ম্যাজিক কি করে সম্ভব হলো? এর উত্তরে আমাদের জানাতে লজ্জা নেই—আমরা সরকারের কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারিনি; আন্দোলন যে পর্য্যায়ে নিয়ে গেলে সরকার তার কালো পাঞ্জা দেখাতো, আমরা সে পর্য্যন্ত যাইনি। খালি হাতে আমরা ফিরে এসেছি সত্যি, তবে কান আমাদের ভরেছে চিরাচরিত সরকারী আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি ও স্তোক-বাক্যের বোঝায়। ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপকরা এর জন্য দায়ী নন। এই পরাজয়ের মূলে রয়েছে সাংগঠনিক দুর্বলতা। এই কথাটির সত্যতার ব্যাপারে দুটি প্রমাণই যথেষ্ট।

বর্তমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের কাছ থেকে ৭৩৭২টি ব্যালটের মধ্যে যে ৪৩৫৮টি সংগৃহীত হয়েছিল, তার মধ্যে আন্দোলনের বিভিন্ন কৌশল প্রসঙ্গে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

| | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|
| অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতি— | ৩,৭১৬ | ৪৮৭ |
| গণ আইন-অমান্যকরণ— | ৩,৩২৪ | ৫৬৫ |
| শিক্ষকদের একটি গ্রুপের দ্বারা আমরণ অনশন— | ২,৪৯৯ | ১,১৪৩ |

দ্বিতীয় প্রমাণটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে তুলে ধরছি। আন্দোলনের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্য্যালোচনার জন্য ২৮শে এপ্রিল তারিখে হেরম্বচন্দ্র কলেজে শিক্ষকদের যে সাধারণ সভাটি আহূত হয়েছিল, তার ভেতরের দৃশ্যটি বর্ণনা করছি।

সভা আরম্ভ হবার আগে যে প্রস্তাবপত্রটি বিতরণ করা হয়, তার মধ্যেই আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত ছিল। প্রস্তাবপত্রটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হৈ-চৈ শুরু হয় এবং সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষের ধ্বনি উঠতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (W B C U T A) সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী যখন আসল বক্তব্যে না গিয়ে সরকারের কাছে পাঠানো অসংখ্য চিঠি ও তার উত্তর পড়তে থাকেন, তখন উপস্থিত শিক্ষকদের এই অসন্তোষ, সোচ্চার প্রতিবাদ ও স্লোগানে পরিণত হয়। পরবর্তী বক্তাও একই পন্থা অনুসরণ করলে সভার ভেতরে বিক্ষোভের ঝড় বইতে শুরু করে। 'আন্দোলন চলছে চলবে', 'শিক্ষক ঐক্য জিন্দাবাদ'

# শিক্ষক-শিক্ষিকাদের "জাতীয়" সম্মান !

নয়াদিল্লী—১৮ই ফেব্রুয়ারী '৭৩—প্রায় ৫০,০০০ হরিয়ানা সরকারী স্কুল-শিক্ষক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বাসভবনের সামনে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে 'অবমাননাকর ব্যবহারের' অভিযোগ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে তাঁরা বলেন যে, শিক্ষকদের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মন্ত্রী এবং এম. এল. এ.'রা কিছুই করতে পারেননি, কারণ মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা 'ব্যক্তিগত মর্য্যাদা'র প্রশ্ন হিসেবে দেখছেন। এবং কম মাইনে পাওয়া শিক্ষকদের নির্য্যাতন করাটাকে তাঁর 'পবিত্র কর্তব্য' হিসেবে নিয়েছেন।

তাঁরা বলেন, বাড়ীর থেকে ২০ কিঃ মিঃ দূরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মে নিয়োগ করার এই সরকারী নীতির তাঁরা সম্পূর্ণ বিরোধী। ১৯৬৮ সালে সমস্ত শিক্ষকদের এই নীতি অনুযায়ী বদলী করা হয়েছিল। তাঁরা আরও বলেন, যদিও এই নীতিটিকে পাঞ্জাব সরকার বাতিল করেছেন, কিন্তু হরিয়ানা সরকার শিক্ষার সমূহ ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, ছোট শহর ও গ্রামগুলিতে শিক্ষকদের বাসস্থানের কোন প্রকার সুবিধা না দিয়ে এই নীতিটিকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

এই স্মারকলিপিতে রাজ্যের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষকদের মহার্ঘভাতার বৈষম্যের উল্লেখ করা হয় এবং দিল্লীতে প্রচলিত বেতনক্রম দাবী করা হয়।

দু-মাস ব্যাপী বিক্ষোভের কথা স্মরণ করে হরিয়ানার শিক্ষকরা বলেন যে, তাঁদের প্রেসিডেণ্ট, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রঃ নুরুল হাসানের আশ্বাস অনুযায়ী গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী অনশন ভঙ্গ করেছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এই আশ্বাসের কোন ফল তাঁরা দেখতে পাননি।

তাঁরা বলেন, সভাপতি শ্রীসোহনলাল চণ্ডীগড়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য অনশন আরম্ভ করেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শিক্ষকরা আরও অভিযোগ করেন যে, স্কুলের সীমানার মধ্যেই ছাত্রদের সামনে পুলিশ তাঁদের প্রহার করেছে এবং শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের তৈরী একটি বক্তব্যে এই মর্মে সই করতে বাধ্য করেছে যে, তাঁরা ধর্মঘট করছেন না। শিক্ষিকাদের চুল ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে তাঁদের অপমান করা হয়েছে। —স্টেটস্‌ম্যান ১৯।২।৭৩

ইত্যাদি শ্লোগান চলতে থাকে। আন্দোলন প্রত্যাহার করার বিরুদ্ধে নিজেদের বক্তব্য রাখার জন্য বহু শিক্ষক বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। মঞ্চারোহীদের সঙ্গে অগ্রসরমান শিক্ষকদের প্রাথমিক বাক্‌যুদ্ধ পরে মল্লযুদ্ধে পরিণত হয়। চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলার মধ্যে সভা শেষ হলেও প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষে বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে, সাধারণ শিক্ষকরা আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ছিলেন। সবাই একসাথে গলা মিলিয়েছেন—'সমস্ত দাবী না মেটা পর্য্যন্ত আন্দোলন চলছে, চলবে।'

## কেন এই আন্দোলন ?

যে কোন সভ্যদেশেই শিক্ষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অংশ বলে গণ্য করা হয়। কারণ তাঁরাই সমস্ত সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে জীবন্ত যোগসূত্র। তাঁদের মাধ্যমেই লব্ধ সামাজিক জ্ঞান অতীত থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পরিবাহিত হয়। যে কয়েকটি দেশ এই ধারাটির বহির্ভূত—ভারতবর্ষ তাদের অন্যতম। এখানে শিক্ষকদের না আছে সামাজিক সম্মান, না আছে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। অথচ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর জন্য জবাবদিহি তাঁদেরকেই করতে হবে! শিক্ষায়তনের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার, যার শিকার শিক্ষক নিজেই,—কর্তৃপক্ষের চোখে তার পেছনে তাঁর অদৃশ্য হাত রয়েছে! অভিভাবকদের চোখে ফেলের সংখ্যা বাড়ার কারণ, তাঁর শিক্ষাদানে অযোগ্যতা অথবা এক 'বিশেষ' আনন্দ পাওয়ার মনোবিকার! রাজনৈতিক "নেতাদের" চোখে (বক্তৃতা দেওয়ার সময়) ছাত্রদের 'অধঃপতনের' মূল কারণ তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি! অর্থাৎ ভাবটা এমন, যেন শিক্ষকরাই সমাজের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন! অথচ শিক্ষক সম্প্রদায়ের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখুন—সমাজের অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলির সাথে তাঁরাও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। শিক্ষক-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের ওপর আজ ছাঁটাইয়ের খড়্গ উদ্যত। কামারপুকুর কলেজ—যেখানে ১৪ জন অধ্যাপক ও একজন লাইব্রেরিয়ানকে বিনা কারণে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সামান্যতম ন্যায্য সুযোগটুকু পর্য্যন্ত না দিয়ে কাজ থেকে জোর করে সরানো হয়েছে, এখনও এই ব্যাপারের নজির হয়ে আছে। প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনে কর্তাব্যক্তিদের দুর্নীতি আর অনাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কোনও শিক্ষক এর প্রতিবাদের চেষ্টা করলেই তাঁর ওপর হাজার কায়দায় অত্যাচার চলে। অনিয়মিত বেতন পাওয়ায় শিক্ষকদের জীবনযাপন আরও দুরূহ হয়ে পড়ছে। কর্তৃপক্ষ মহার্ঘভাতা কাটার দরুণ বহু শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একের পর এক কলেজ 'আর্থিক সংকটের' মুখে পড়ছে আর মাসের পর মাস সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের যৎসামান্য মাইনে দিয়ে (কোন কোন ক্ষেত্রে ১১০

টাকা) বিদায় করা হচ্ছে—দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, চারুচন্দ্র কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, রামানন্দ কলেজ (বিষ্ণুপুর), দাঁতন কলেজ ইত্যাদি কলেজের কথা উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে। ক্রমশঃ বেশী বেশী শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কিছু হয়নি। হয় আবেদনগুলি সরাসরি উপেক্ষিত হয়েছে অথবা ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি-বাক্যের আড়ালে টালবাহানার বিশেষ কায়দায় দাবীগুলিকে 'ত্রিশঙ্কু' করে রাখা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, বর্তমান আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এই পুরনো কৌশলটির কোন হেরফের হয় নি।

## এই ব্যর্থতা কেন ?

আমাদের প্রত্যেকটি আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতার অন্যতম মূল কারণটি হলো—আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা। যে সমস্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের সূত্রে আমাদের সাংগঠনিক ভিত্তি দৃঢ় ও ব্যাপক হতে পারতো তার কণামাত্রও আমরা পালন করিনি। প্রাথমিক ও ও মাধ্যমিক স্কুল-শিক্ষক এবং পাঞ্জাব, বিহার, দিল্লী, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আরও অন্যান্য জায়গায় শিক্ষকদের আন্দোলনে বিন্দুমাত্র কার্যকরী সহায়তা করিনি আমরা। আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির ব্যাপারেও নিশ্চেষ্ট। কলেজগুলোর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ, বেতনবৈষম্য, বিভেদমূলক পন্থায় মহার্ঘভাতা কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অসংখ্য উপায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার কোনও রকম বিরোধিতাই করিনি আমরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্রদের ন্যায়-সঙ্গত আন্দোলনগুলির কোনও রকম সহযোগিতা বা ছাত্র ও শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান ব্যবধান ঘোচাবার কোনও কার্যকরী কর্মসূচীই আমাদের নেই—এমনকি আমাদের চোখের সামনে অসংখ্য ছাত্রের নির্য্যাতন দেখেও আমরা কোনও রকম সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ উচ্চারণ করিনি। সর্বোপরি, আমরা সমাজের অন্যান্য নির্য্যাতিত ও আন্দোলনকারী অংশগুলি থেকে দূরে সরে রয়েছি। এই ঐক্যের প্রতি ন্যূনতম পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অর্থাৎ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্মচারী, যেমন অফিস ও লাইব্রেরীর কর্মচারী, ল্যাবরেটরীর কর্মচারী, ঠিকে কর্মচারী এঁদের আন্দোলনে সহায়তা করাও আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমের মধ্যে নেই।

শিক্ষক সম্প্রদায়ের সাধারণ সভ্যরা আজ সামাজিক বাস্তবতা সম্বন্ধে ক্রমশঃ বেশী সচেতন হচ্ছেন। একথা আমরা ক্রমশঃ বেশী বুঝতে পারছি যে, যতদিন না অন্যের ঘরে যাঁরা, রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে আলো জ্বালান তাঁদের ঘরে আলো আসছে, ততদিন এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত অর্থে কোন পুনর্জীবন সম্ভব নয় এবং যতদিন দেশের মানুষের সৃজনীশক্তি দারিদ্রের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকবে ততদিন সমাজের এবং বিশেষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের কোন সংকটই স্থায়ীভাবে ঘুচবে না।

ছাত্র বন্ধুরা,

আপনারা যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশুনো করছেন তার আভ্যন্তরীণ চেহারা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ চিঠি-পত্র পাঠান। আমাদের দেশের বেশীরভাগ সাধারণ মানুষই এইসব 'জ্ঞানের মন্দির'-গুলির ভিতরের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাণহীন অবস্থার কথাটা জানেন না। আপনাদের এই ধরণের চিঠি-পত্র প্রকাশিত হলে, তাঁদেরই কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরই সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনেদের কেমন আবহাওয়ার মধ্যে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন। এর ফলে তাঁদেরই স্নেহাস্পদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে তাঁদেরকে উত্তেজিত করার যে অপচেষ্টা চলে, তার বিরুদ্ধেও এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ হবে। তাছাড়া এতেই আপনাদের পারস্পরিক খবর আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম হয়ে উঠে, 'বীক্ষণ' ছাত্র হিসেবে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার কাজেও সাহায্য করতে পারবে। ॥ সঃ মণ্ডলী—বীক্ষণ ॥

# প্রকৃতিবিজ্ঞানে নবযুগের অগ্রদূত : নিকোলাস কোপারনিকাস*

পার্থসারথি ভৌমিক

"জ্যোতিষ্কের পরিক্রমার বিষয়ে কোপারনিকাসের অমর গ্রন্থটির প্রকাশের ভিতর দিয়েই প্রকৃতিবিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।"

"পৃথিবী স্থির অনড় নয়, বিশ্বের কেন্দ্রও নয়। সমস্ত গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীও ঘুরছে সূর্য্যের চারিদিকে, সুতরাং সূর্য্যই এই বিশ্বজগতের কেন্দ্র!"

বিশ্বের গঠন সম্বন্ধে এই সত্যটি প্রথম প্রমাণ করেন নিকোলাস কোপারনিকাস। ইউরোপ জুড়ে তখন বইতে শুরু করেছিল রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ঝড়। সেই ঝড়ের তাড়নায় উড়ে যাচ্ছিল মধ্যযুগীয় অন্ধকার আর কুসংস্কারের জঞ্জাল। কেঁপে কেঁপে উঠছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার টুঁটি চেপে বসে থাকা রাজা ও গীর্জার একছত্র শাসনের ভিত। সেই সময়েই, দেড় হাজার বছরের ধর্মীয় কুসংস্কারের শেকল ছিঁড়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেন এই মহান বিজ্ঞানী। মানব সভ্যতার বিকাশে স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসর্ত। কিন্তু এই সর্ত কিছু বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা বারবার পদদলিত করেছে। এবং এর পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল এক বৈপ্লবিক কাজ। ঐতিহাসিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত আলোচনা তাঁর কাজের তাৎপর্য্য বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

সভ্যতার প্রাথমিক যুগে জ্যোতিষ্কের চরিত্র ও গতিবিধি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল ধর্মীয় কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাকে সেদিনের অজ্ঞ ও অসহায় মানুষ দেবত্ব আরোপ করে তার ব্যাখ্যা করত। যেমন প্রাচীন মিশরীয়রা মনে করত—ঝিকমিক্ তারাপুঞ্জ হল রাতের আকাশের বুকে পথচলা দেবতাদের হাতের লণ্ঠন। আগুনের থালার মতো দেবতা-"রা" (সূর্য) আকাশ নদী দিয়ে নৌকা বেয়ে পূব থেকে পশ্চিমে যান। পৃথিবীটা সেই বিশাল নদীতে একখণ্ড কাঠের মতো ভাসমান। পূব আকাশে 'ওঠা' আর পশ্চিম আকাশে 'ডুবে যাওয়া' - জ্যোতিষ্কদের খেয়ালখুশির ব্যাপার। একমাত্র স্থায়ীভাবে কৃষিকার্য শুরু করার সময় থেকেই মানুষ সচেতনভাবে আকাশের দিকে তাকাতে শুরু করে। চাষে জল দরকার, আর বছরের একটা বিশেষ ঋতুতেই আকাশ থেকে জল পড়ে। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ জানতে চাইল, জানতে শুরু করল প্রকৃতির নিয়মকানুন! ঠিক তেমনি, খৃষ্টপূর্ব সাতশ'অব্দের কাছাকাছি সময়ে গড়ে ওঠা গ্রীক উপনিবেশগুলির অধিবাসীরা তাদের সমুদ্রযাত্রার ফলেই বুঝতে পেরেছিলো তাদের দেশ ছাড়াও পৃথিবীতে দেশ আছে, বুঝতে পেরেছিলো পৃথিবীটা গোল, আর কোন অবলম্বন ছাড়াই সেটা শূণ্যে ঝুলছে। প্লেটোর সময় (খৃঃ পূঃ ৫২৭ সাল) থেকেই 'পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র আর চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তার চারদিকে ঘুরছে'—এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে যে সব তথ্য জমা হচ্ছিল তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল যে, বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের গতির মধ্যে রয়েছে প্রচুর অসাম্য ও আপাত অনিয়ম। তার মধ্যে গ্রহগুলি বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশী বিপদে ফেলেছিল। কখনও তারা আসে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি, কখনও চলে যায় বহুদূরে। কখনও উজ্জ্বল, কখনও নিষ্প্রভ, কখনও স্থির, কখনও পুবেপশ্চিমে এগিয়ে চলে আবার পিছিয়ে যায়—বুধ আর শুক্র সবসময়েই থাকে সূর্য্যের কাছাকাছি—ইত্যাদি। যদি এরা সবাই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তবে এই অনিয়ম কেন? গ্রীকবিজ্ঞানী ইউডিক্সাসই প্রথম এইসব ঘটনার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তনশীল অনেকগুলি স্বচ্ছ গোলকের, যাদের গায়ে জ্যোতিষ্কগুলো আটকানো আছে। কিন্তু, একটি গোলককে ঘিরে আরো একটি—এইভাবে সাতাশটি গোলক দিয়েও তিনি গ্রহদের গতির ব্যাখ্যা করতে পারেননি। অ্যারিষ্টটলও বেরোতে পারেননি স্বচ্ছ গোলকের এই গোলকধাঁধা থেকে। তাঁর সময়ে গোলকের সংখ্যা বেড়ে হয় পঞ্চান্ন। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত দার্শনিক টলেমী (খৃষ্টীয় ২য় শতকের) হলেন

* প্রকৃতিবিজ্ঞানে নবযুগের অগ্রদূত পোলিশ বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাসের পঞ্চশত জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'লো – সঃ মণ্ডলী বীক্ষণ।

প্রাচীন গ্রীক-জ্যোতির্বিদ্যার শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। বিশ্বজগত সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও পূর্বসূরীদের মতো—জগতের কেন্দ্র পৃথিবী আর তার চারদিকে ঘুরছে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র। স্বচ্ছ গোলকের তত্ত্ব বাতিল করে তিনি দাঁড় করালেন বৃত্ত ও পরিবৃত্তের কাঠামো। তাঁর মতে—পৃথিবীর চারদিকে অনেকগুলি বৃত্ত ঘুরছে, প্রতিটি বৃত্তের পরিধির ওপর কেন্দ্র করে ঘুরছে একটি ছোট্ট বৃত্ত বা পরিবৃত্ত, আর ঐ পরিবৃত্তের পরিসীমায় রয়েছে নির্দিষ্ট জ্যোতিক। বৃত্ত ও পরিবৃত্তের আপেক্ষিক গতি বিভিন্নভাবে সাজিয়ে টলেমী জ্যোতিষ্কের গতিবিধির অনিয়ম ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এরিস্টার্কাস নামে অ্যারিষ্টটলের সমসাময়িক একজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর আবর্তনের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল নিছকই অনুমানের স্তরে।

পরবর্তী প্রায় চোদ্দ'শ বছরেরও বেশী সময় ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টলেমীর তত্ত্ব দাঁড়িয়েছিল প্রশ্নাতীত নিশ্চয়তা নিয়ে। ছোটখাট গবেষণা যা হয়েছিল তা টলেমীর মতবাদকে টলাতে পারেনি। তৃতীয় দশকের শেষ ভাগে, বিশেষ করে রোমের সম্রাট কনস্তান্তিন্ প্রাচীন খৃষ্ট ধর্মকে বিকৃত করে রাষ্ট্রিয় ধর্মরূপে গ্রহণ করার পর থেকেই, বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর ধর্মীয় বর্বরতার আঘাত শুরু হয়ে যায়। বিশাল সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষকে লুণ্ঠন করে যে সম্পদ জমা হচ্ছিল, তার অপব্যয় করে রাজা আর গীর্জার পাদ্রীরা যে অভাবনীয় ভোগবিলাস ও ব্যভিচারের মধ্যে দিন কাটাত, জনতার চোখে তা ক্রমশঃ ধরা পড়ে যাচ্ছিল। শয়তানদের তাই দরকার হয়ে পড়ল—অন্যায় ব্যবস্থাটার একটা 'স্বর্গীয় অনুমোদন' পাবার, সাধারণ মানুষকে, তাদের অজ্ঞতা আর অসহায়তার সুযোগে কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে ফেলার। গীর্জার সুদখোর ও লম্পট পাদ্রীরা প্রচুর আয় করতে লাগল টাকার বিনিময়ে 'পুণ্য' বেচে। সাধারণ মানুষকে তারা বোঝাতে লাগল 'ঈশ্বর ও রাজার প্রতি অনুগত হও।' প্রকৃতি বিজ্ঞান তাদের এই মিথ্যা প্রচারের মুখোশ খুলে দিতে পারে, সেই ভয়েই রাজা ও গীর্জার 'পবিত্র জোট' বিজ্ঞানের ওপর হামলা চালালো তীব্রভাবে। গ্রীক দার্শনিকদের গৌরবময় আবিষ্কারগুলিকে তারা কবর দিল। বাইবেলের "সৃষ্টিতত্ত্ব" থেকে লাইন তুলে তারা চেঁচিয়ে বেড়াত, ঈশ্বর কোন দিনে কি সৃষ্টি করেছেন? পৃথিবী যে গোল, ইউরোপের বাইরেও যে দেশ আছে, মানুষ আছে, এই সত্যকে তারা অস্বীকার করল। ৩৮৯ সালে আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার খৃষ্টানরা পুড়িয়ে ধ্বংস করল। বিজ্ঞানী থোন্ এর বিদুষী কন্যা হিপাতিকাকে ৪১৫ সালে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল। জ্যোতির্বিজ্ঞানী সিমপ্লিসিয়াস্ পালিয়ে এলেন পারস্যে, কিন্তু সেখানেও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না পেয়ে হতাশ হয়ে ইউরোপে ফিরে গেলেন। বিজ্ঞানের উপর নেমে এল মধ্যযুগীয় অন্ধকার।

ইউরোপ আক্রমণের কালে গ্রীক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই আরবদের হাতে আসে এবং তাঁরা সেগুলি রক্ষা করেন। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে গ্রীক দার্শনিকরা আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। ভূকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বও স্বীকৃতি পায়। ততদিনে শহরগুলিতে গজিয়ে উঠছিল বণিকেরা, আর এই বণিকদের সাথে রাজা-জমিদার-গীর্জার শত্রুতা লেগেই থাকত—অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাতের কারণে। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও সমুদ্র-যাত্রা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার উপরেও নতুন করে গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ১৫০০ সালে ভিনসেন্তে পিনৎসন আবিষ্কার করেন ব্রাজিল। বণিকদের সঙ্গে রাজা-জমিদার-পাদ্রীদের স্বার্থ সংঘাতের পরিণতি হিসাবে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে শুরু হয় লুথার কালভাঁর ধর্মসংস্কার আন্দোলন। ইউরোপ জুড়ে বইতে থাকে নবজাগরণের ঝড়।

এই ঝড়ের শুরুতে, ১৪৭৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভিসচুলা নদীর তীরে থোরুণ শহরে নিকোলাস কোপারনিকাসের জন্ম হয়। তখন থোরুণ ও পশ্চিম প্রুশিয়া ছিল পোলাণ্ডের রাজার অধীনে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী এবং পুরাণো হান্‌সা শহরের মিউনিসিপ্যালিটির একজন শাসক। নিকোলাসের বয়স যখন দশ, তখন তাঁর বাবা মারা যান। তারপর থেকে তিনি তাঁর মামা লুকাস্ ভাৎসেল্‌রোডের কাছেই লালিত পালিত হন। স্কুলের পড়া শেষ করে ১৪৯১ সালে কোপারনিকাস ক্রাকাও-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। লুকাস ১৪৮৯ সালে এর্মল্যাণ্ডের বিশপ নিযুক্ত হন। তিনি চাইছিলেন প্রথম সুযোগেই ভাগ্নেকে ফ্রাউয়েন বুর্গের ক্যাননের পদে বসাতে। তাই ক্রাকাও থেকে ফিরে মামার ইচ্ছানুযায়ী ১৪৯৬ সালে নিকোলাস উচ্চশিক্ষার্থে ইটালি যাত্রা করলেন। ইটালিতে তিনি ছিলেন প্রায় ন' বছর। মাঝে একবার (১৫০১ সালে) কয়েকমাসের জন্য ঘরে ফিরেছিলেন ক্যাননের দায়িত্ব নিতে। এই ন'বছরের মধ্যেই তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষা, চিরায়ত সাহিত্য, প্লেটোর দর্শন, গণিত, চিত্রকলা, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, রাজকীয় ও ক্যানন আইন ইত্যাদি বিষয়গুলি এবং বিশেষতঃ জ্যোতির্বিদ্যা গভীরভাবে আয়ত্ত করেন। তৎকালীন ইটালিতে জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন দোমেনিকো মারিয়া দ্য নোভারা। তাঁর সঙ্গে কোপারনিকাস যুক্ত হ'তে পেরেছিলেন শুধু ছাত্র হিসাবে নয়, বন্ধু এবং সহকর্মী হিসাবেও। এই অধ্যাপকের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েই ১৪৯৭ সালের মার্চ মাসে তিনি তাঁর প্রথম নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। তবে জ্যোতির্বিদ্যায় নোভারা তাঁকে টলেমীর তত্ত্বের চেয়ে বেশী কিছু শেখাতে পারেন নি।

১৫০৬ সালে এর্মল্যাণ্ডে ফিরে আসার পর কোপারনিকাস আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন—আর পেয়েছিলেন প্রচুর সময়, যা তিনি বিজ্ঞানের কাজে ব্যয় করেছিলেন। সম্ভবতঃ পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মারফতই জ্যোতির্বিদ্যার এই একনিষ্ঠ ছাত্রটির খ্যাতি আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিল মধ্য ইউরোপে। ১৫১৪ সালে তাঁকে ডাকা হয় বর্ষপঞ্জী সংশোধনের কাজে সাহায্য করতে। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করে জানান যে, জ্যোতিষ্কের পরিক্রমার উপর এখনও যথেষ্ট গবেষণা হয়নি—কাজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব।

১৫২৯ সালে কোপারনিকাস তাঁর সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের তত্ত্বের উপর রচিত বই 'স্বর্গীয় গোলকদের আবর্তন প্রসঙ্গে' ( De Revolutionibus Orbium Caelestium )-এর পাণ্ডুলিপি রচনা শেষ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বইটি প্রকাশ করতে তিনি সাহসী হ'লেন না। বিজ্ঞানের উপর পুরোনো আঘাত তো ছিলই, এদিকে বণিকদের প্রতিনিধি, নবজাগরণের প্রবক্তারাও কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানকে ভালো চোখে দেখেনি। পুরাণো ব্যবস্থাকে তারা আঘাত করেছিলো ততটুকুই, যতটুকু তাদের দরকার। পোপের অনুশাসন পুড়িয়ে ১৫১৭ সালে প্রোটেষ্টাণ্ট মতবাদের প্রবর্তক লুথার হুংকার ছেড়েছিলেন —"রোম নামক পাপ নগরীকে অস্ত্র হাতে নিশ্চিহ্ন করতে হবে"। কিন্তু যখন শহর-গাঁয়ের নিপীড়িত মানুষ অস্ত্র হাতে তাঁর আদেশ পালনে এগিয়ে এলেন, তিনি পিছু হঠলেন এবং বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করতে রাজা আর জমিদারের সাহায্য চাইলেন। অস্ত্রের উপাসকের মুখে শোনা গেল নতুন বাণী—"ক্যাথলিকরা আচারের ব্যাপারে বড় গোঁড়া, তাই উপোসের দিনে তাদের সামনে মাংস খেয়ে বিদ্রোহ করো"। জ্যোতির্বিদ্যায় কোপারনিকাসের নতুন মতবাদের কথা শুনে এই লুথারই বললেন, "নির্বোধটা দেখছি সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রকেই ধ্বংস করবে ···কিন্তু পবিত্র বাইবেলে যেমন আছে—সূর্য্য নয়, পৃথিবীকেই যোহুয়া আদেশ করেছেন স্থির হয়ে থাকতে।" সম্ভবতঃ এইসব দেখেশুনেই কোপারনিকাস তাঁর বই প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছিলেন। তবে বন্ধুদের অনুরোধে তিনি তাঁর তত্ত্বের এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেছিলেন, যা বিশ্বস্ত পণ্ডিতদের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল। এই ভাষ্যে নতুন মতবাটি খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। প্রথমেই লেখক সাতটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন—

(১) সমস্ত জ্যোতিষ্কের একটিমাত্র কেন্দ্র নেই।

(২) পৃথিবী শুধু চাঁদের কক্ষের কেন্দ্র, সৌরজগতের কেন্দ্র নয়।

(৩) সমস্ত গোলকই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে সুতরাং সূর্য্যই সৌরজগতের কেন্দ্র।

(৪) স্থির নক্ষত্রমণ্ডলের থেকে দূরত্বের তুলনায় পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব খুবই সামান্য।

(৫) আকাশের প্রাত্যহিক আপাত আবর্তন পৃথিবীর নিজ মেরু[illegible] আবর্তনের ফলেই হচ্ছে।

(৬) তারই ফলে হচ্ছে দিনরাত। অন্যান্য গ্রহের মত পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে—সেটাই বার্ষিক গতি।

(৭) গ্রহদের গতির আপাত অনিয়ম পৃথিবীর গতির ফলে ঘটছে।

মূল বইতে এই সিদ্ধান্তগুলিই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বিস্তারি[illegible] তথ্য ও অঙ্কের সাহায্যে। ভাষ্যটি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ছা[illegible] হয়।

বন্ধুদের অনেকেই বইটি প্রকাশ করতে কোপারনিকাসকে অনুরো[illegible] করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কুল্‌ম এর বিশপ টিডেমান গীজের ন[illegible] সবার আগে উল্লেখ করতে হয়। উদার মনের এই মানুষটি দীর্ঘ[illegible] ধরে বিজ্ঞানীকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। আরও যে একজন বই প্রকাশের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন—তিনি হলেন ভিত্তেন[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক গেওর্গ ইওয়াখিম রেটিকাস। নতু[illegible] মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর জানার খুবই আগ্রহ ছিল। কিন্তু কোপারনিক[illegible] তখনও পর্য্যন্ত কিছু প্রকাশ না করায় পঁচিশ বছর বয়স্ক এই ধীম[illegible] জ্যোতির্বিদ ১৫৩৯ সালের বসন্ত কালে প্রুশিয়া যাত্রা করলে[illegible] রেটিকাস ছিলেন প্রোটেষ্টাণ্ট, আর ভিত্তেনবের্গ ছিল ঐ মত[illegible] চর্চার বৃহত্তম কেন্দ্র। কিন্তু তাঁদের জীবনী প্রমাণ করে যে, এই মহ[illegible] বিজ্ঞানী ও তাঁর গুরু দুজনেই ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে স[illegible] মুক্ত। রোমান ক্যাথলিক কোপারনিকাস তাঁকে সাদর অভ্য[illegible] জানান। রেটিকাস ফাউয়েনবুর্গে দুবছরের বেশী সময় ছিলেন [illegible] গভীর মনোযোগ ও যত্নের সঙ্গে তিনি কোপারনিকাসের মত[illegible] আয়ত্ত করেন। গুরুর প্রতিভাদীপ্ত আবিষ্কারে তিনি মুগ্ধ হ'ন [illegible] ঐ যুগান্তকারী রচনা প্রকাশের জন্য উঠেপড়ে লাগেন। জন[illegible] পরীক্ষার জন্য তিনি নতুন মতবাদের প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে এক[illegible] প্রাথমিক বিবরণ বা "ন্যারেশিও প্রাইমা" রচনা করেন ১৫৩৯ সা[illegible] সেপ্টেম্বরে। তাঁর পূর্বতন শিক্ষক জন শোয়নার-এর কাছে চি[illegible] আকারে লেখা এই প্রাথমিক বিবরণ ১৫৪০ সালের ফেব্রুয়ারী ম[illegible] ডানজিগ থেকে ছেপে বেরোয়।

'ন্যারিশিও প্রাইমা'তে রেটিকাস কোপারনিকাসের নাম না [illegible] সবসময় 'আমার গুরু' বলে উল্লেখ করেন এবং ধাপে ধাপে জ্যো[illegible] বিদ্যার জটিল সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে তিনি মন্তব্য করেন, "[illegible] যদি টলেমী আমাদের মধ্যে ফিরে আসতেন এবং দেখতেন যে, '[illegible] শত বছরের আবর্জনা জমে রাজপথ বন্ধ ও চলাচলের অযোগ্য' পড়েছে—তিনি নিজেই নিখুঁত বৈজ্ঞানিক-জ্যোতির্বিদ্যা প্রতি[illegible] জন্য অন্য পথে চলতেন।"

'ন্যারেশিও প্রাইমা' বিদ্বান ও বিজ্ঞানী মহলের অন্ততঃ একাংশের কাছে সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিল। ১৫৪১ সালে বাসেল থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই রচনার প্রভাব দেখেই সম্ভবতঃ কোপারনিকাস শেষ পর্যন্ত তাঁর বই প্রকাশ করতে রাজী হন। তাছাড়া তাঁর বয়সও হয়েছিল—শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। তবু সাবধান হলেন তিনি—ধর্মীয় গোঁড়াদের হাত থেকে তাঁর আবিষ্কারকে বাঁচাবার জন্য। তিনি বই-এর প্রথমেই জুড়ে দিলেন কার্ডিনাল শোয়নবের্গ-এর এক প্রশংসাপত্র,—তারপর পোপ তৃতীয় পলের প্রতি উৎসর্গলিপি। এই লিপিতে তিনি শোয়নবের্গ ও গীজের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় ছাত্র প্রোটেষ্টাণ্ট রেটিকাসের নাম দেন নি। মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি কোপারনিকাস ছাপতে দিলেন টিডেমান গীজের হাতে। গীজে সেটাকে পাঠিয়ে দিলেন রেটিকাসের কাছে।

১৫৪১ সালের সেপ্টেম্বরে রেটিকাস শীতকালীন পাঠ্যসূচীতে অংশ নেবার জন্য ভিত্তেনবের্গ যান। ১৫৪২ সালের বসন্তকালে ছুটি নিয়ে চলে আসেন নুরেমবুর্গে, যেখানে বইটি ছাপা হচ্ছিল। কিন্তু ছাপার কাজ শেষ হবার আগেই তিনি লাইপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে যান। ১৫৫১ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। যাবার আগে তিনি আন্দ্রিয়াস ওসিয়ান্দার নামে লুথার পন্থী একজন ধর্মজ্ঞ লোকের হাতে বাকী অংশটি ছাপার দায়িত্ব দিয়ে যান। ওসিয়ান্দার যদিও কোপারনিকাসের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন, তবুও নতুন মতবাদের বেপরোয়া চেহারা দেখে এবং ধর্মীয় গোঁড়াদের কাছ থেকে একটা প্রবল বাধার সম্মুখীন হবার আশঙ্কায় তিনি হয়ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ঝামেলা এড়ানোর জন্য তিনি বইটিতে কোপারনিকাসের লেখা মুখবন্ধটি সরিয়ে রেখে একটি বেনামী ভূমিকা জুড়ে দেন। যাতে তিনি বলেছেন যে, এই মতবাদের সত্যতা বা সম্ভাবনা কিছুই নেই ; সুতরাং এনিয়ে বেশী মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এই ভূমিকা পরবর্তীকালে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। বইটি হাতে পাবার পর গীজে ভীষণ রেগে গিয়ে রেটিকাসকে লিখেছিলেন যে, এটা হোল "প্রকাশক আর কিছু ঈর্ষান্বিত লোকের বিশ্বাসঘাতকতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়"। অনিকদিন পর ১৬০৯ সালে কেপলার প্রথম এই বেনামী লোকটির পরিচয় প্রকাশ করেন।

১৫৪৩ সালে বইটির ছাপা শেষ হয়। মে মাসের ২৪ তারিখে যখন তার এক কপি কোপারনিকাসের হাতে আসে, তখন মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তিনি শয্যাগত। বই হাতে পাবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়ার যুগ শুরু হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের উপর অত্যাচারে প্রোটেষ্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের ছাড়িয়ে গেল। বিজ্ঞানী সের্ভেৎ যখন রক্তচলাচল আবিষ্কারের পথে, তখন কালভাঁ তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেন। জ্যোতির্বিদ জিওর্দানো ব্রুনোকেও ক্যাথলিক গীর্জার বিচারকমণ্ডলীর আদেশে পুড়িয়ে মারা হয়। ফলে কোপারনিকাসের মতবাদের স্বীকৃতি পেতে লেগেছিল আরও ১০০ বছরের বেশী।

কোপারনিকাসের মতবাদে অনেক দুর্বলতা ছিল। তিনি টলেমীর পরিবৃত্তের কাঠামোটা বজায় রেখেছিলেন। পুরানো তথ্যের উপর বেশী নির্ভর করায় পুরানো ভুলের অনেক কিছু তাঁর লেখাতেও থেকে যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপারনিকাস ছিলেন নবযুগের অগ্রদূত। ঈশ্বরের তথাকথিত মহান সৃষ্টি এই পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে হটে যেতে হোল, ফলে বিজ্ঞানচিন্তার গীর্জার একাধিপত্যের উপর এলো এক বিরাট আঘাত। যদিও একান্ত ভয়ে ভয়ে, তবুও, কোপারনিকাসের অমর গ্রন্থটির প্রকাশের ভিতর দিয়েই প্রকৃতি বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

---

**কোপারনিকাস সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকরা যে বইগুলিতে আরো বিশদভাবে জানতে পারবেন :**


1. **Dreyer, J. L. E.—** A history of astronomy from Thale to Kepter —Dover ( 1958 )
2. **Rosen, E.—** "3—Copernican Treatises" —Dover ( 1959 )
3. **Kuhn, T. S. —** "The Copernican Revolution" —Harvard University Press. ( 1957 )
4. **Luther Martin—** Harvard Classics. Vol. 36.
5. **দত্ত, উৎপল—সেক্সপীয়ারের সমাজচেতনা।**

# বিক্ষুব্ধ শিক্ষা-জগৎ

**দেশ :**

জব্বলপুর শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গত দশই মার্চ স্তব্ধ ছিল। ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক দুর্নীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে

**ছাত্র**

সরকারী ব্যর্থতার ও শিক্ষিত বেকারদের চাকরীর দাবীতে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই বন্ধের ডাক দেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব বিবৃতিতে এই হরতালকে সমর্থন জানান। এই বন্ধ পুরোপুরি সফল হয়।

● ছাত্র অসন্তোষ ও শান্তিশৃঙ্খলা অবনতির অজুহাতে পাঁচই এপ্রিল থেকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে, গত নয়ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভাপতি, সহঃ সভাপতি, সম্পাদক ও আরো তিনজন ছাত্রসংসদ সদস্য প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে চব্বিশ ঘণ্টা অবস্থান করেন। তাঁরা বলেন—বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। আঠারোই এপ্রিল লোকসভায় বিরোধী দলের নেতারা অবিলম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয় খোলার দাবী জানান। বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের এক যুক্ত বৈঠকের পর জানানো হয় যে কোন ছাত্র বা শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা নিলে, অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে। বিনা কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখাকে তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে চিহ্নিত করেন। পরে তেইশে এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক নোটিশ মারফৎ ছাত্রসংসদ ভেঙ্গে দেন।

● অবিলম্বে সংক্ষিপ্ত এম. বি. বি. এস. কোর্স চালু করার দাবীতে ডাঃ আর. আহমেদ ডেন্টাল কলেজের ছাত্ররা পাঁচই মার্চ থেকে ধর্মঘট পালন করছেন। দাবীপূরণের উদ্দেশ্যে, দশই মার্চ তাঁরা মহাকরণ অভিমুখে অভিযান চালান। পনেরোই মার্চ থেকে দুদিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট চলে। ছাত্রদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার ছাত্রপ্রতিনিধিরা আলোচনা করা সত্ত্বেও, কোন সুফল আদায় করা যায়নি। তেইশে মার্চ কলেজের প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। ছাত্রসংসদের সভাপতি বলেন —এরপরেও সরকারের টনক না নড়লে, তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন।

● গত চব্বিশে এপ্রিল দুপুর তিনটে থেকে পরেরদিন ভোর বেলা অবধি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উপাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহ সমিতির সদস্যদের ঘেরাও করে রাখেন। গত বি. এ., বি. এস পার্ট ওয়ান পরীক্ষায়, একটি বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্রদের পাশ করানো ও ছাত্রদের উপর থেকে আর. এ. আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে ছাত্র বিক্ষোভ দেখান। কর্তৃপক্ষ দাবী মানতে অসম্মত হলে, ছাত্ররা পঁচি এপ্রিল সকাল থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

● গত চোদ্দই মার্চ থেকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ ছাত্রআন্দোলন ঠেকাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দে গত আটাশে এপ্রিল উত্তর বিহারের সমস্তিপুর কলেজ কেন্দ্রে "মারমুখী পরীক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টায় পুলিশ প্রথমে লাঠি ও পরে গু চালায়। [ সংবাদপত্রে, পরীক্ষার্থীদের মারমুখী হবার কারণ সম্প কিছু বলা হয়নি ]। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে কয়েকজন পুলিশ ও তিনজ ছাত্র আহত হন। তবে পুলিশের মতে, গুলীতে কেউ আহত হয়নি

**বিদেশ :**

● জর্ডনের রাজা হোসেন প্যালেস্তাইনের গেরিলা নেতা আ দাউদ ও অন্যান্য গেরিলা নেতাদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার যে আদেশ জা করেন, তার বিরুদ্ধে প্যারিসের প্রায় চল্লিশ জন বিক্ষোভরত আর ছাত্র, আরবলীগের অফিসটি দখল করে নেন। সাতই মার্চ এই ঘটনা ঘটে। তখন আরবদেশগুলির রাষ্ট্রদূতরা একটি বৈঠকে মিলি হয়েছিলেন। তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করাই ছিল—এই বিক্ষোভে একমাত্র উদ্দেশ্য।

● কায়রোতে গত ৯ই এপ্রিল ইয়েমেনের ছাত্ররা উত্তর ই মেনের দূতাবাস দখল করেন। প্রায় পাঁচ'শ ছাত্র উত্তর ইয়েমে সরকারের সৌদী আরবের কাছে জমি বিক্রি ও বিরোধী নেতাদে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদস্বরূপ রাষ্ট্রদূতকে ঘেরাও করে রাখেন। কায়রো পুলিশ দূতাবাস ঘিরে রাখলেও, তার ভেতরে প্রবেশ করেনি ছাত্ররা জানিয়ে দেন—"এটা আমাদের জায়গা, এখানে কাউকে ঢুক দেওয়া হবে না," ইজরাইল অধিকৃত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে উত্ত ইয়েমেন সরকারের নীরবতাকেও, তাঁরা ধিক্কার দেন।

● পয়লা মার্চ বিক্ষোভে উত্তাল রাওয়ালপিণ্ডির ছাত্ররা ব্রিটি কাউন্সিল্ লাইব্রেরীর বই ও আসবাবপত্রে "আগুন লাগিয়ে দেন লন্ডনস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনে দু'জন পাকিস্তানী নিহত হওয়া

াত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। নিহতদের শবাধার পিণ্ডিতে পৌঁছানোর য়েক ঘণ্টা পরেই, ছাত্ররা উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। মৃতদেহ দুটি য়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলি পরিক্রমা করা হয়।

* * * *

## শিক্ষক

গত বারোই মার্চ নয়াদিল্লীতে, হরিয়ানা ও দিল্লীর চারশো সত্তর ন শিক্ষককে দশ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। ার্লামেন্ট হাউসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর "অপরাধে" তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। দণ্ডিতদের মধ্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কুড়িজন অধ্যাপকসহ, দিল্লীর পঁয়ত্রিশ জন ক্ষক আছেন। তাঁরা, তাঁদের ধর্মঘটরত হরিয়ানার সাথীদের প্রতি মর্থন দেখানোর সময় আটক হন। গত পনেরোই মার্চ হরিয়ানার রকারী-স্কুল শিক্ষক ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। সরকারী-স্কুল শিক্ষক উনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাম দত্ত শর্মা, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর াশ্বাসে সন্তুষ্ট হয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। প্রায় চল্লিশ াজার শিক্ষক একমাস ধরে বেতনসীমা ও বদলি সম্পর্কে সরকারী ীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন করছিলেন। ২৭৭০টি সরকারী স্কুলের ক্ষকরা ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে এই আন্দোলনে সামিল হন। রকার এই আন্দোলনের উপর বল্গাহীন আক্রমণ চালায়—অস্থায়ী শক্ষকদের চাকুরী থেকে ছাঁটাই করে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করে। ই আন্দোলনে প্রায় একহাজারেরও বেশী শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। ারা, "আন্দোলন করব না' বলে মুচলেকা দেন, শুধু তাঁদেরই ফব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের মাইনে দেওয়া হয়। বাকী হাজার হাজার ক্ষক বিনা মাইনেতে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার সম্মুখীন হন। প্রায় একাজারেরও বেশী অস্থায়ী শিক্ষকের চাকুরী ফিরে পাবার আশা নেই। প্রতিটি শিক্ষকের পদ, আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অনুযায়ী নতুন রে স্থির করা হবে। তবে যে সব শিক্ষক আন্দোলনে বাধা য়েছিলেন, তাঁদের পদোন্নতি করা হবে।"

★ গত পঁচিশে মার্চ, বেসরকারী ও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় একহাজারেরও বেশী শিক্ষক, নিখিল উড়িষ্যা শিক্ষক ফেডারেশন র আহ্বানে রাজ্য সেক্রেটারিয়েট্ অফিসের সামনে বিক্ষোভ খান। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবীদাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার দ্দেশ্যে এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। পরে ংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅবনী কুমার বড়াল—রাজ্যপালের সঙ্গে ালোচনাকে 'সন্তোষজনক' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন দিও রাজ্যপাল নীতিগতভাবে শিক্ষকদের দাবীদাওয়ার ন্যায্যতা নে নিয়েছেন, তবু তিনি কোন আশ্বাস দিতে নারাজ। আন্দোনের পরের ধাপ হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন হবে বলে স্থির হয়েছে।

★ গত ১০ই এপ্রিল, এসপ্লানেড্ ইষ্টে প্রায় পাঁচ'শ কলেজ শিক্ষক দিবারাত্র অবস্থান ধর্মঘট করেন। নিয়মিত বেতন দেওয়া, বেসরকারী কলেজে মহার্ঘভাতা প্রদান, কামারপুকুর কলেজের ১৪ জন ছাঁটাই শিক্ষকের পুনর্বহাল ইত্যাদি দাবীতে তাঁরা এই ধর্মঘট শুরু করেন। এর আগে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক সমিতি (WBCUTA) আয়োজিত এক সভায় বিভিন্ন বক্তা দাবীগুলির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা জানান যে বেহালাতে অবস্থিত অগ্রগামী প্রকাশচন্দ্র কলেজের শিক্ষকরা গত দশমাসে কোন মাইনেই পাননি। আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে, গত ১৮ই এপ্রিল থেকে সমস্ত বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করেন। আন্দোলনের চতুর্থদিনে WBCUTA-র সম্পাদক জানান যে সরকার শিক্ষকদের পনেরোটি দাবীর মধ্যে মাত্র তিন-চারটি ছোটখাট দাবী মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। ২৭৫টি বেসরকারী কলেজের ৭৫০০জন শিক্ষক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ২৯শে এপ্রিলের সর্বশেষ খবর—WBCUTA-র কর্মনির্বাহ সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছে।

★ গত ৬ই মার্চ, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে স্কুল শিক্ষকরা সারাদিন ধরে এসপ্লানেড্ অঞ্চলে অবস্থান ধর্মঘট করেন। তাঁরা সরকারের কাছে তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবীদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ঐদিনই কয়েকশ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে রাজভবনের কাছে বিক্ষোভ দেখান। পে-কমিশনের রিপোর্ট মেনে নেওয়া, অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ইত্যাদি দাবী নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

★ গত ৫ই এপ্রিল দুপুর দুটো থেকে বঙ্গবাসী কলেজের প্রায় এক'শ জন অধ্যাপক অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁরা মার্চ মাসে মাইনে পাননি। এমনকি কলেজ কর্তৃপক্ষ, মাইনে দেবার কোন সম্ভাব্য তারিখ দিতেও অস্বীকৃত হয়েছেন। ১৯৬৪ সাল থেকেই এই কলেজের অধ্যাপকরা অনিয়মিতভাবে বেতন পেয়ে আসছেন। গত ২রা মার্চ গড়িয়া দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজের সত্তরজন শিক্ষক অনশন ও কর্মবিরতি পালন করেন। দীর্ঘদিন ধরে মাইনে না পাওয়ায়, তাঁরা এই আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হন।

* * * *

## কর্মচারী

গত ২১শে মার্চ জলপাইগুড়ি স্পনসরড কলেজ ও পলিটেক্নিকের প্রায় দু'শ জন কর্মচারী ন'ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেন। স্পনসরড কলেজ ও

পলিটেক্‌নিক জাতীয়করণ, নতুন বেতনসীমা, মহার্ঘভাতা, বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও গ্র্যাচুয়িটীর দাবীতে তাঁরা এই আন্দোলনে সামিল হন।

★ পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে গত ১১ই এপ্রিল পশ্চিমবাংলার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা হরতাল পালন করেন। তাঁরা নতুন বেতনসীমা নির্ধারণ, মহার্ঘভাতাকে মূল বেতনের সঙ্গে অন্তর্ভূক্তির দাবী জানান।

★ ২৫শে এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীরা বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়ার সমর্থনে প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

[ সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার, ষ্টেটসম্যান, যুগান্তর ]

## পত্র-পত্রিকার দর্পণে

### "সরকারী আমলার মুখে শুনুন

# জোতদার-পুলিশের চক্রান্তে ইন্দ্র লোহারের উচ্ছেদ কাহিনী

বর্গাদারের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের অনেক আইন আছে এবং তার কার্যকারিতা দেখার জন্য প্রশাসনযন্ত্রও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্গাদারের স্বার্থ ও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে কত বাধা তার প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত বাঁকুড়ার এক হতভাগ্য বর্গাদার ইন্দ্র লোহার।

এই ইন্দ্র লোহারের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক মর্মন্তুদ বিবরণ পরিকল্পনা কমিশনের ভূমি বিষয়ক টাস্ক ফোর্স লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইন্দ্র লোহার সেই দলের লোক যাঁরা ৫৩ সালের জমিদার বিলোপ আইনে ও ৫৫ সালের ভূমিসংস্কার আইনে উল্লসিত হননি। ইন্দ্র লোহার সেই মূল্যবোধের মানুষ, যাঁকে নকশাল আন্দোলন উদ্দীপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবু এমন ইন্দ্র লোহাররা সংবাদে উপেক্ষিত থেকেও প্রমাণ করেন যে তাঁরা আছেন।

'৫৩ ও '৫৫ সালের দুটি আইনের পর দীর্ঘদিন অতীত হয়েছে। '৬৭ সালের নকশালবাড়ী আন্দোলনের পত্তন থেকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল অনেক পরতপ্ত দিন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু আইন যে অধিকার দিয়েছে, সেই অধিকার বর্গাদারী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে কিনা তা জানবার কোন নিয়মমাফিক চেষ্টা সরকারী তরফ থেকে এখনও হয়নি। কখনও কখনও ফসল তোলার বা জমি দখলের সংঘর্ষে বর্গাদাররা পাদপ্রদীপের আলোতে এসেছেন। কিন্তু হিংসা ও রক্তের তরঙ্গের মধ্যে আসল প্রশ্নটি সব সময়েই হারিয়ে গেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের ভূমি বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সদস্য শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বর্গাদারের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বাঁকুড়া জেলায় অনুসন্ধান চালিয়ে বর্গাদারের অধিকার সংরক্ষণ আইন রূপায়ণে ব্যর্থতার একটি প্রদীপ্ত নমুনা কমিশনের কাছে পেশ করেছেন।

ইন্দ্র লোহার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার ভোরা গ্রামের একজন বর্গাদার। তিনি ঐ গ্রামের ৯ নম্বর টালা মৌজার ৪ একরের কিছু বেশী জমির বর্গা করছেন কয়েক যুগ ধরে। ইন্দ্র লোহারের বর্গার জমির মালিক হলেন বিভূতিভূষণ মণ্ডল। ৫৫ থেকে ৬২ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিম বাংলায় যে রিভিশনাল সেটেলমেন্ট হয়েছে তাতে ইন্দ্র নিজের নাম বর্গাদার হিসাবে রেকর্ড করাননি। এই ভয়ে যে তাঁর মনিব বিভূতি মণ্ডল ক্রুদ্ধ হবেন। বিভূতি মণ্ডল এক বন্ধকী ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে এই জমির মালিক হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মেয়ে অন্নপূর্ণার নামে ঐ জমি রেকর্ড করিয়ে নেন। আইনতঃ এই জমি বেনামী। ইন্দ্র এই বেনামী জমির পুরো ব্যাপারটি জানতেন। কিন্তু কখনই তিনি এই গোপন কথা কাউকে বলেননি। ৬৭ সাল থেকে দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর যখন এ রাজ্যে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বেনামী জমির সন্ধানে হানা দিয়েছেন, যখন বেনামা চিঠিতে ভূমি-রাজস্ব দপ্তর ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রীর টেবিল স্তূপীকৃত হয়েছে, তখনও ইন্দ্র

কিন্তু তাঁর মনিবের গোপন তথ্য গোপনই রেখেছেন। কিন্তু সেদিন যদি ইন্দ্র রেভিনিউ অফিসারের কাছে গিয়ে ঐ জমির কথা এবং তাঁর বর্গার কথা বলতেন, তাহলে দু'একর জমি বিনামূল্যে তাঁর নামে চিরদিনের জন্য বন্দোবস্ত হয়ে থাকত। যাহোক ইন্দ্র ঐ জমির উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৫৫ ভাগ তাঁর মনিবের খামারে প্রতি মরশুমে দিয়ে আসতেন। অথচ বর্গার আইন অনুযায়ী জোতের মালিকের প্রাপ্য শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র।

## 'বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার ইতিহাস'

ইতিমধ্যে বিভূতি মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছে। বিভূতি মণ্ডলের পুত্র শচীনন্দন তাঁর জমি দেখাশোনার জন্য বাদল কর্মকার নামে একজনকে নায়েব রাখলেন। ৭১-৭২ সালের শীতের ফসল ইন্দ্র সবে ঘরে তুলেছেন, এমন সময় নতুন নায়েব তাঁকে ডেকে পাঠালেন। নায়েব তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, মনিব শচীনন্দন ইন্দ্রকে আর বর্গাদার হিসাবে রাখবেন না এবং ইন্দ্র যে ফসল ঘরে তুলেছেন তা যেন এখুনি শচীনন্দনের খামারে জমা দিয়ে দেওয়া হয়। ইন্দ্রের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল, তাঁর সকল বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কারণ লোকের মুখের সাক্ষ্য ছাড়া নিজেকে বর্গাদার হিসাবে প্রমাণ করার আর কোন দলিল ইন্দ্রর নেই। এতদিন ইন্দ্র যাঁদের সঙ্গ, এমনকি সহানুভূতি পর্যন্ত সতর্কভাবে পরিহার করে চলেছেন, এমন একটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন কর্মী ইন্দ্রর ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা জানতে পারলেন। ইন্দ্র তাঁদের পরামর্শমত বিষ্ণুপুরের এস. ডি. ও-এর কাছে একটি আবেদন করলেন।

২৯-১-৭২ তারিখে ইন্দ্র ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী বিষ্ণুপুরের সাব-ডিভিশনাল একসিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই মর্মে আবেদন করলেন যে, তিনি টালা মৌজার ৯ নম্বর প্লটের বর্গাদার। কিন্তু তাঁকে বর্গা থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা হচ্ছে এবং তিনি বর্গা করে যে ফসল ঘরে তুলেছেন, তা তিনি তাঁর মনিব ও মনিবের নায়েবের মারের ভয়ে ঝাড়াই করতে পারছেন না। ম্যাজিস্ট্রেট এ সম্পর্কে বিষ্ণুপুরের জে. এল. আর. ও.-কে তদন্তের এবং সংশ্লিষ্টজমিতে স্থিতাবস্থা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য বিষ্ণুপুর থানার পুলিশকে নির্দেশ দেন। কয়েকদিন পরে জে. এল. আর. ও. তাঁর তদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে ইন্দ্র লোহারের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আপোষ দলিল জমা দেন! ঐ দলিলে ইন্দ্র সংশ্লিষ্ট জমির বর্গাদার হিসাবে তাঁর সমুদয় দাবী অস্বীকার করেছেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্র ঐ তথাকথিত আপোষ দলিলের চ্যালেঞ্জ করে আর একটি আবেদন পেশ করলেন। এই আবেদনে তিনি অভিযোগ করলেন যে, জে. এল. আর. ও-অফিসের একজন অফিসার যখন সংশ্লিষ্ট জমিতে তদন্ত করতে যান, তখন জোতদারের লোকেরা ইন্দ্রকে ঘিরে ফেলে ও একখানা সাদা কাগজে তাঁর টিপ সহি নিয়ে নেয় এবং এটাকেই আপোষ দলিল হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট বিষ্ণুপুর ব্লকের এগ্রিকালচারাল এক্সটেনসন অফিসারকে এ-ব্যাপারে বিশদ তদন্ত করার নির্দেশ দেন।

এগ্রিকালচারাল এক্সটেনসন অফিসার তাঁর রিপোর্টে জানান, যদিও জরিপের সময় দলিলে ইন্দ্রর নাম বর্গাদার হিসাবে লিখিত হয়নি, তাহলেও ইন্দ্র যে ঐ জমির দীর্ঘকালের বর্গাদার, এ দাবীর সমর্থনে অসংখ্য স্থানীয় সাক্ষী রয়েছে। কিন্তু নায়েব বাদল কর্মকার সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক পাল্টা আবেদন পেশ করে ইন্দ্র এবং তাঁর ভাই গৌর লোহারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী শান্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ১৪।২।৭২ তারিখে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশকে এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করতে বললেন। পুলিশ অতিদ্রুত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সুপারিশ করলেন যে, ইন্দ্র লোহারের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭।১১৭ (৩) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু কেন দরকার তার কোন কারণ পুলিশ দেখায়নি। ঠিক তখনই ১৭।২।৭২ তারিখে মনিব শচীনন্দন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন পেশ করে এই আর্জি করলেন যে, ইন্দ্র কে যেন তাঁর কাটাধান মাড়াই করতে না দেওয়া হয়। সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট দেখলেন যে, এই মামলাগুলি একই ব্যাপার থেকে উদ্ভূত এবং একে অপরের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তিনি ২২।২।৭২ তারিখে সবগুলি মামলার শুনানীর দিন দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণ নির্বাচনের কাজ এসে গেল এবং ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন পর্যন্ত সকল মামলার শুনানী মুলতুবী রাখলেন। কিন্তু যখনই ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি জমি থেকে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে প্রসারিত হল, তখনই মনিব শচীনন্দন ও পুলিশ ইন্দ্রকে আঘাত করল! ন্যায় ও আইন শৃঙ্খলার বিচারবোধ নিপীড়নের কাছে আত্মসমর্পন করল বিনা প্রতিবাদে।

## 'ইন্দ্রর বাড়িতে পুলিশী হানা'

১৮।৪।৭২ তারিখে পুলিশ ইন্দ্র লোহারের বাড়ীতে হানা দিয়ে ২১ বস্তা ধান, ৩ কাহন খড় এবং মাড়াই হয়নি এমন কিছু পরিমান ধান বাজেয়াপ্ত করে। এই বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্র নায়েবের একজন আত্মীয়কে দিয়ে দেওয়া হল। পরবর্তী তদন্তে দেখা গেছে যে পুলিশ কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ কিংবা আদালতের কোন নির্দেশ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত কাজটি সম্পন্ন করেছে। থানার ডায়েরী তল্লাসী করে দেখা গেছে যে, বাজেয়াপ্তের বিষয় সেখানে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। পুলিশের এই কাজে এটা স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয়েছে যে, পুলিশ জোতদারের স্বার্থরক্ষার জন্য ইন্দ্রকে নাজেহাল করেছে। সাব-ডিভিশনাল একসিকিউটিভ

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ইন্দ্রর জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টি রিপোর্ট করা হলে তিনি এই বে-আইনী বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে পুলিশের কৈফিয়ত তলব করেন এবং এ সম্পর্কে একটি পৃথক মামলা রুজু করেন। অবশেষে এই সংক্রান্ত সমুদয় মামলা ২২।৫।৭২ তারিখে বিষ্ণুপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি ২৭।৫।৭২ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করেন।

কিন্তু একসিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে শচীনন্দন তাঁর বাঞ্ছিত ফল পাবেন না আশঙ্কা করে বিষ্ণুপুরের মুন্সেফ আদালতে গিয়ে ২৩।৫।৭২ তারিখে তাঁর বোন অন্নপূর্ণার (যাঁর নামে জমির স্বত্ব রেকর্ড করা হয়েছে) হয়ে জমির স্বত্ব সংক্রান্ত (টাইটেল স্যুট) একটি মামলা দায়ের করেন। মুন্সেফ বিষয়টি জরুরী বিধায় আবেদনকারীর প্রার্থনা অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশান জারী করলেন। ঐ ইনজাংশানে ইন্দ্রকে বিষ্ণুপুরের এস-ডি-ওর আদালতে মামলা চালিয়ে যেতে বিরত করা হল। এর পরের ঘটনা খুব দ্রুততার সঙ্গে ঘটতে লাগল। ২৭।৫।৭২ তারিখ ভোরে একদল সশস্ত্র লোক ইন্দ্রর বাড়ী আক্রমণ করল। ইন্দ্রকে দেহের তিন জায়গায় কোপান হল। তাঁর বাড়ীতে অবশিষ্ট যা ধান ছিল, তা লুণ্ঠিত হল। তাঁর ভাই ও বাড়ীর মেয়েদের প্রহার করা হল। ইন্দ্র বিষ্ণুপুর হাসপাতালে ভর্তি হলেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এল এবং নায়েবের বাড়ীতে গিয়ে ইন্দ্রর বাড়ী থেকে লুঠ করা ধানের গাদা দেখতে পেল ও নায়েব গ্রেপ্তার হলেন।

### 'দুই আদালতের যুদ্ধ : শিকার ইন্দ্র'

এরপর আরম্ভ হল দুই আদালতের যুদ্ধ। ইন্দ্র যখন হাসপাতালে তখন পূর্ব নির্ধারিত ২৭।৫।৭২ তারিখে একসিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ইন্দ্রর দায়ের করা মামলার শুনানী আরম্ভ হল। ইন্দ্র অনুপস্থিত; কিন্তু জোতদার শচীনন্দন হাজির হয়ে মুন্সেফের নির্দেশ নামার নকল ম্যাজিস্ট্রেটকে দিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করলেন 'মুন্সেফের আদেশ অসঙ্গতিপূর্ণ। আমি মনে করি যে, এই আদালতের ক্ষমতা ও এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।' ইন্দ্র হাসপাতাল থেকে ৩১।৫।৭২ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর একটি আবেদন পাঠিয়ে এই অভিযোগ করলেন যে, মুন্সেফ তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা ইনজাংশান দিয়ে যথার্থ কাজ করেননি এবং ঐ ইনজাংশান ছিল বলেই তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁর বাড়ী আক্রমণ করে তাঁর ধান লুঠ করতে সাহস পেয়েছে।

এরপর একসিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ একে অপরের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে গিয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনলেন। মুন্সেফ ইন্দ্র এবং তার উকিলের বিরুদ্ধেও আদালত অবমাননার অভিযোগ আনলেন। হাইকোর্ট মুন্সেফের আবেদন বহাল রেখে ম্যাজিস্ট্রেট ও ইন্দ্রকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করলেন। ইন্দ্র সশরীরে কাঁপতে কাঁপতে কলকাতা হাইকোর্টে এলেন এবং মহামান্য ধর্মাবতারের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে, আদালত অবমাননার দায় থেকে মুক্তি পেলেন।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, একজন বর্গাদার তাঁর অধিকার আদায় করতে গিয়ে প্রথমতঃ নিজে দু'টি মামলা করলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বিরুদ্ধে দু'টি মামলা করা হল। তৃতীয়তঃ পুলিশ তাঁর বাড়ীতে হানা দিল এবং বেআইনীভাবে তাঁর ধান বাজেয়াপ্ত করল। চতুর্থবারে মুন্সেফ আদালত থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ইনজাংশান এল। পঞ্চমবারে একদল সশস্ত্র লোক তাঁর বাড়ী আক্রমণ করে তাঁকে কোপালো, বাড়ীর মেয়েদের লাঞ্ছিত করা হল। ষষ্ঠবারে তিনি আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলেন। সুতরাং এরপর আর বর্গাদারের কতটুকু মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে যার জোরে তিনি তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন? ইন্দ্রর অবস্থাও ঠিক তাই। তিনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আইনের হাতে, শৃঙ্খলার হাতে এবং সশস্ত্র হামলাবাজদের হাতে যেভাবে নাজেহাল হয়েছেন, তাতে তিনি আর দ্বিতীয়বার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি।"

[যুগান্তর—৪ | ২ | ৭৩]

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে যে সব ছাত্র বা যুব আন্দোলন চলছে সেগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'বীক্ষণে' প্রকাশের জন্য পাঠান। এই পরস্পরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন-গুলির অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়েই কিশোর-যুব-ছাত্ররা সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের একটি বৈজ্ঞানিক পথ খুঁজে বের করতে পারবেন।

# পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ

## ॥ বিশ্বে প্রথম ॥

বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার মাসিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিশ্বের মধ্যে ভারতেই ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বিশ্বে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৩১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৯০। তার মধ্যে একমাত্র ভারতেই এই রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ১০ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৬১। —যুগান্তর, ২৫-১-৭২

## ॥ সমস্যা ও সমাধান ॥

প্রতি ৩,৫০০ জনের জন্য একজন ডাক্তার, এই অনুমোদিত অনুপাতের ভিত্তিতে ভারতে এখনো ৪০,৩৪০ জন ডাক্তারের ঘাটতি আছে। —অমৃতবাজার, ২২-৪-৭৩

প্রায় বিশ হাজার চিকিৎসক আমাদের দেশে বেকার। সাংবাদিকদের কাছে এ তথ্য পরিবেশন করেছেন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোঃ সভাপতি ডঃ এ, কে, এন সিংহ। —অমৃতবাজার, ২-৯-৭২

## জাতির ভবিষ্যত ॥

ইঞ্জিনিয়ারীং, মেডিসিন, বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিষয়ে ডিগ্রী/ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে বেকার রয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার জন। —টেক্‌নিক্যাল ম্যান পাওয়ার, এপ্রিল '৭২

কোলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন কলেজের প্রায় ৪,০০০ এরও বেশী ছাত্র শহরে এবং ট্রেনে হকারী করে নিজেদের সংসার চালান। এই তথ্যটি জানান বেঙ্গল হকার্স এসোসিয়েশনের অ্যাক্‌টিং প্রেসিডেণ্ট শ্রীঅজয় দে। ২,০০০ এর বেশী শিক্ষিত তরুণ, যার মধ্যে ৫৫ জন স্নাতক রয়েছেন, সংসার চালানোর জন্য এই পেশা নিতে বাধ্য হয়েছেন। —অমৃতবাজার, ২৭-৪-৭৩

## ॥ সেরা মগজশিকারী ॥

সোভিয়েত সংবাদ ভাষ্যকার ভ্লাদিমির সিমোলোক বলেছেন যে, আমেরিকা হচ্ছে দুনিয়ার সেরা মগজশিকারী রাষ্ট্র। এই শিকার সে সবচেয়ে বেশী চালায় উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। তিনি আরো বলেছেন যে, মার্কিন মুলুকে সবচেয়ে বেশী মগজ চালান যায় ভারত থেকে।

১৯৭০-এ ভারত ২৯০০ জন বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার এভাবে আমেরিকায় হারিয়েছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭-৭-৭২

## ॥ পৃথিবীর বৃহত্তম ধনি রাষ্ট্রে ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৩ সালে শহরগুলিতে প্রতি ৫০০ জনের পেছনে একজন করে ডাক্তার ছিলেন। ১৯৭১ সালে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে, প্রতি বিশহাজারে একজন। —সায়েন্স্ ফর দি পিপল্, মে '৭১

## ॥ নিঃস্বার্থ সহায়তা ॥

আমেরিকান ফরেন এইড্ ( American Foreign Aid )-এর সহায়তা অনুগৃহিত দেশগুলির মধ্যে মাথাপিছু ডলার সব থেকে বেশী পায় লাওস। এই লাওসে ১৯৬৬-৬৭ সালে মাথাপিছু নিহতের হার ছিল পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বেশী। এবং এর প্রতি বর্গমাইলে যে পরিমাণ বোমা পড়েছে তা বিশ্ব ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। —ঐ

# চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নয়

## শিক্ষায়তনে সন্ত্রাসমূলক আবহাওয়া ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

[ ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রের চিঠি ]

গত চব্বিশে এপ্রিল ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটি ঘটনা ঘটে।

এই কলেজেরই দ্বিতীয় বর্ষের জনৈক ছাত্র, যিনি কিনা এক হোমরা-চোমরা মেডিকেল অফিসারের ছেলে, সামান্য একটি ঘটনার সূত্রে একই ক্লাসের আর একজন নির্বিরোধ ছাত্রের উপর লোহার রড এবং তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায়। ফলে আক্রান্ত ছাত্রটিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়।

ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছাত্ররা অধ্যক্ষের কাছে অবিলম্বে ঘটনার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান। কিন্তু কোন এক 'অজ্ঞাত' কারণে তিনি, সংজ্ঞাহীন ছাত্রটিকে দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, সম্পূর্ণ ঘটনাটি সম্পর্কে চরম ঔদাসিন্যের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাখেন।

প্রসঙ্গতঃ, দোষী ছাত্রটির এই ধরণের কার্যকলাপ এই প্রথম নয়। এই শিক্ষায়তনে তার ভর্তির দিন থেকেই এই ধরণের ঘটনা একের পর এক সে ঘটিয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান ঘটনাটির তাৎপর্য, অতীতের সব ঘটনার গুরুত্বকেই ছাড়িয়ে গেছে। তাই পরদিন (২৫।৪।৭৩) দ্বিতীয় বর্ষের সমস্ত ছাত্রছাত্রী এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দোষী ছাত্রটিকে কলেজ থেকে বহিষ্কারের দাবী জানান এবং দাবী না মেটা পর্যন্ত ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। লিখিতভাবে তাঁরা তাঁদের দাবী অধ্যক্ষের কাছে পেশ করেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরও, অধ্যক্ষ মহাশয়ের নির্লিপ্ত মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। পরদিন প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাও এই দাবীর সমর্থনে ক্লাস বর্জন করেন এবং ক্লাসের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর স্বাক্ষরসহ একটি স্মারকলিপি অধ্যক্ষ মহাশয়কে দেন। এছাড়া দ্বিতীয় বর্ষ (বিদায়ী)'র ছাত্রছাত্রীরাও, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের এই দাবীর প্রতি আন্তরিক সমর্থনসূচক একটি স্মারকলিপি অধ্যক্ষের কাছে জমা দেন।

তাঁদের সমস্ত দাবীকে অধ্যক্ষ প্রথমে নানা অজুহাতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত চাপের কাছে নতিস্বীকার করে 'কলেজ কাউন্সিল'এর সভা ডাকতে বাধ্য হন এবং দোষী ছাত্রটির বহিঃষ্কারের আদেশ জারী করেন। কি 'ট্রান্সফার অর্ডার' জারীর ব্যাপারে 'ডিরেকটোরেট অফ হেল্ সার্ভিসেস'এর কাছে পেশ করার জন্য যে ফাইল তৈরী করেন, তাে ঘটনাগুলিকে এমনভাবে বিকৃত করা হয়, যাতে দোষীর অপরাধগুি আদৌ স্পষ্ট নয় এবং দোষীকে শাস্তি দেওয়ার কারণ মোটেই পরিষ্কা করে দেখান হয়নি। ফলে এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই য কোন বিচার হয়, তবে দোষীর শাস্তি না হওয়ার বা কোন লঘু শাি হওয়ার অথবা দোষী ও আক্রান্ত উভয়েরই সমান শাস্তি হওয়া আশঙ্কা থেকে যায়। ছাত্রছাত্রীরা এই রিপোর্ট সংশোধনের দাি জানান এবং অন্যথায় তাঁরা এই রিপোর্ট কোনক্রমেই পাঠাতে দেবে না বলে অধ্যক্ষকে জানিয়ে দেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহাশয় রিপো পরিবর্তন না করার স্বপক্ষে নানারকম 'ছেলেমানুষি' যুক্তির অবতারণ করতে থাকেন। ফলে বিক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পায় এবং অধ্যক্ষ মহাশ দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রের প্রামাণ্যতথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট সংশো ধনের প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু পরমুহূর্তেই ছাত্র দু'জনকে আলাদা পেয়ে অধ্যক্ষ তাঁদেরকে এই বলে শাসান যে, তাঁরা তাঁদে বিপদ বাড়াচ্ছে! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়। সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই অধ্যক্ষবিরোধী ঘৃণায় ফেটে পড়েন। অধ্যক্ষবিরোধী নানারকম শ্লোগান উঠতে থাকে।

ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ হাসপাতালের এমারজেন্সিতে ফোন করে এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে চাপ দিয়ে অভিযুক্ত ছাত্রের স্বপক্ষে একটি পুলিশ রিপোর্ট বের করার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যান ফলে ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাঁর ছাত্রস্বার্থ-বিরোধী চেহারা একেবারে না হয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে 'গুণ্ডাবাজির প্রশ্রয়দাতা' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

পরদিন কলেজের প্রায় সমস্ত ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাই কর্তৃপক্ষে এই চক্রান্তের প্রতিবাদে অধ্যক্ষকে ঘিরে ধরেন এবং একে একে তাঁর নোংরা কীর্তিকাহিনীর ছবিগুলি সবার সামনে তুলে ধরেন, ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে রিপোর্ট সংশোধন করতে হয় এবং দোষী ছাত্রটিকে সাময়িকভাবে সাসপেণ্ড করে, নোটিশ দিতে হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি প্রশ্ন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কাছে রাখছি :

(১) কর্তৃপক্ষের ছাত্রস্বার্থবিরোধী এই কার্যকলাপের কারণ কি এই যে—দোষী ছাত্রটি আমলাতন্ত্রের এক প্রতিভূর সন্তান ?

(২) কর্তৃপক্ষের এই টালবাহানা থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে যেতে পারিনা যে-কর্তৃপক্ষ কলেজপ্রাঙ্গণে সন্ত্রাসমূলক আবহাওয়াকে টিকিয়ে রাখতেই চান ?

(৩) চরিত্রগতভাবেই কি কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের যে কোন ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়ার বিরোধী ?

---

**'বীক্ষণ' প্রসঙ্গে**

'বীক্ষণে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (এপ্রিল '৭৩), 'বীক্ষণ' সম্পর্কে, উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় ও শান্তনু ভট্টাচার্য্যের মতামত পড়লাম। 'বীক্ষণে'র একজন পাঠক হিসেবেই, তাঁদের 'মতামতের' কয়েকটি দিক সম্পর্কে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি।

উজ্জ্বলবাবুরা বলেছেন : "সমস্ত লেখাই পড়লাম মনযোগ দিয়ে কেবলমাত্র ছাত্রআন্দোলনের খুঁটিনাটিগুলো ছাড়া। কারণ আমি সাহিত্যরসপিপাসু মানুষ। তাই ওগুলো নেহাৎই জলন্ত বাস্তব চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বলে মনে হ'ল। দৈনিক পত্রিকার পাতায় প্রায়শই ওগুলি দেখা যায়।" "নেহাৎই জলন্ত বাস্তব চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি" ছাত্রআন্দোলনের এই "খুঁটিনাটিগুলি" "দৈনিক পত্রিকার পাতায় প্রায়শই" জায়গা পায় ঠিকই—কিন্তু এমনই একটা জায়গায় এতই সংক্ষিপ্ত আকারে জায়গা পায় যে, তা প্রায় চোখেই পড়ে না। অথচ আমাদের কাছে অর্থাৎ দেশের ছাত্র-যুবকদের কাছে এগুলির মূল্য অসীম। বিশেষ করে আজকে, যেখানে ব্যাপক ছাত্র-যুবকদের মধ্যে পরাজিতের মনোভাব প্রাধান্য পাচ্ছে, চারদিকেই ব্যাপক হতাশা আর অন্ধকার, কেউ যেখানে আজ কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না—সেখানে এই খবরগুলো, তা যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন, আমাদেরকে এই পরাজিতের মনোভাব কাটাতে এবং মন খারাপ করা এই অন্ধকারের রাজত্বে আশা ও আলোর সন্ধান দিতে অনেকখানি সাহায্য করে বৈকি। সেই দিক থেকে এই "খুঁটিনাটি"গুলো, আমার মতে, 'বীক্ষণ' পত্রিকার একটি মৌলিক উপাদান। এবং এই "সংক্ষিপ্ত পরিচিতিগুলোকে" এক জায়গায় সংকলন করে পরিবেশন করার জন্য, আমাদের অর্থাৎ ছাত্র-যুবকদের কাছে, 'বীক্ষণে'র সম্পাদকমণ্ডলীর অভিনন্দন প্রাপ্য।

তাঁরা বলেছেন : "আপনি বা আপনারা [ অর্থাৎ 'বীক্ষণে'র সম্পাদক বা সম্পাদকমণ্ডলী—পত্রলেখক ] সাহিত্যের মাধ্যমে অন্যায়, অবিচার, শোষণ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্রমতকে গঠন করতে গিয়ে এমন কতকগুলো কলমের অবতারণা করেছেন যা নিছক কোন বিশেষ মতবাদকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সাহিত্য আর বাস্তব সম্পূর্ণতঃ এক নয়। বাস্তবের কিছুটা ওপরেই তার স্থান। আর সমাজসচেতনতা ও Ism প্রচার করাও সম্পূর্ণতঃ এক নয়। পত্রিকার এই দিকটা আমার কেমন ঝাপসা লেগেছে।" 'বীক্ষণ' পত্রিকার, এ যাবৎ প্রকাশিত, সংখ্যা দু'টোই খুব মনযোগের সাথেই আমি পড়েছি। আমার কিন্তু "ছাত্রমতকে গঠন করতে গিয়ে" যেসব "কলমের অবতারণা" 'বীক্ষণে'র সম্পাদকমণ্ডলী "করেছেন" সেগুলি আদৌ কোন "বিশেষ মতবাদ"-প্রসূত কিম্বা "সমাজসচেতনতা" প্রচার করতে গিয়ে কোন Ism তাঁরা প্রচার করেছেন বলে মনে হয়নি। বরং যা মনে হয়েছে তা একবারেই বিপরীত। পত্রিকার কোথাও কোন বিশেষ মতবাদ বা Ism অর্থাৎ কোন দলীয় মতবাদের গন্ধ আমি পাইনি। 'বীক্ষণে'র ধরণের পত্রিকাগুলির মধ্যে, যেগুলি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তার মধ্যে সম্ভবতঃ 'বীক্ষণ'ই একমাত্র পত্রিকা, যা তার ঘোষিত উদ্দেশ্যের সাথে এখনও পর্যন্ত সঙ্গতি বজায় রাখতে পেরেছে। 'বীক্ষণ' পত্রিকার বিভিন্ন লেখাগুলি, আমাদের জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত সত্যগুলোকে নিরাবরণ করার মধ্য দিয়ে, সে ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন হতে সাহায্য করেছে মাত্র। অবশ্য এই সচেতন করাটাকেই যদি উজ্জ্বলবাবুরা "বিশেষ মতবাদ" কিম্বা "Ism" বলে মনে করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমার কিছু বলবার থাকে না। কেননা এটা তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। আমার মনে হয়, উজ্জ্বলবাবুরা 'বীক্ষণ'কে, তা যা, ঠিক তাই হিসাবে অর্থাৎ 'কিশোর ও যুব-ছাত্রদের মুখপত্র' হিসাবে না দেখে একটি সাধারণ সাহিত্যপত্রিকা হিসাবে দেখেছেন—আর এইভাবে দেখার জন্যই "পত্রিকার এই দিকটা" তাঁদের "কেমন ঝাপসা লেগেছে।"

॥ শমীক দাশগুপ্ত, বেহালা ॥

**'লাল সবুজের দেশে' প্রসঙ্গে**

'বীক্ষণ' পত্রিকার ২-য় সংখ্যার "লাল সবুজের দেশে" শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হবে (অন্ততঃ আমার তো তাই হয়েছে) 'সবুজ বিপ্লব' দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের কাছে এক পরম আর্শীবাদ হিসেবে এসেছে এবং তাদের দুঃখদুর্দশা ও দারিদ্র্যের অবসান এর মধ্যেই নিহিত আছে। গভর্ণমেন্ট সবুজ বিপ্লব করে কৃষকের জীবন-মান উন্নত করতে চাইছে, কিন্তু প্রতিবন্ধক হচ্ছে বড়ো বড়ো জমির মালিক জমিদারেরা।

'সবুজ বিপ্লবে'র অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে—ব্যাপক সামাজিক সংঘর্ষ ও কৃষক অভ্যুত্থান ব্যতিরেকেই এবং ভূমি সম্পর্কের মৌল পরিবর্তন না ঘটিয়েই শুধুমাত্র বিজ্ঞান, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত ধরণের সার, সেচ ও বীজ দিয়েই ভারতীয় কৃষিতে "বিপ্লব" আনা যায় এবং কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভব—এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা ও

কার্যকর করা। লাল-বিপ্লবের "সার্থক" বিকল্প হচ্ছে 'সবুজ বিপ্লব'।

বাস্তবক্ষেত্রে হাতে কলমে 'সবুজ বিপ্লবে'র কাজ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরণের উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন ( High বা Yeilding Varieties HYV ) এবং অল্প সময়ে বিভিন্ন ধরণের ফসলের প্রচুর উৎপাদন ( Short Duration Varieties বা SDV )।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ও পরিচালনায়, রকফেলার ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে ভারতীয় কৃষিতে আধুনিকীকরণের নতুন যে কৃষি রণনীতি ( New Agricultural Strategy NAS ) ১৯৬৮ সালে ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রক প্রবর্তন করে, তারই ফলশ্রুতি এই 'সবুজ বিপ্লব'।

'সবুজ বিপ্লবে'র বিশদ আলোচনায় আমরা এখন যাব না। ভারতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য মিশনের ( US Aid Mission ) একজন পরামর্শদাতৃ হলেন মিস্ ফ্রাঙ্কেল। 'সবুজ বিপ্লবে'র অঞ্চলগুলি সরেজমিনে তদন্ত করে তিনি **'ভারতের সবুজ বিপ্লব'** ( India's Green Revolution ) নামে একখানা বই লিখেছেন। 'সবুজ বিপ্লবে'র পীঠস্থান হচ্ছে লুধিয়ানা। লেখিকা সেই লুধিয়ানার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে লিখেছেন : "সামগ্রিকভাবে যদি কেউ লুধিয়ানার অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করে, তবে দেখা যাবে সবুজ বিপ্লবের ফলে অধিকাংশশ্রেণীর কৃষকেরাই কিছু কিছু লাভবান হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এই উপকার বৃহৎ কৃষকদের ( ২৫ থেকে ৩০ একর বা তার বেশী জমির মালিক ) অনুকূলেই সর্বাধিক পরিমাণে হয়েছে, যারা নতুন যন্ত্রবিদ্যার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকেই কাজে লাগাতে পেরেছে। যদিও ১৫ থেকে ২৫ একর জমির মালিক কৃষকেরাও তাদের উৎপাদন ও আয় নিরংকুশভাবে বৃদ্ধি করতে পেরেছে, কিন্তু বৃহৎ ও মধ্যম কৃষকদের মধ্যে ফারাকটা নিঃসন্দেহভাবেই প্রশস্ততর হয়েছে। ১০ থেকে ১৫ একরের মালিক ছোট কৃষকেরা এখন পর্যন্ত যেটুকু লাভবান হয়েছে তা হচ্ছে প্রান্তিকমাত্র এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো, তাদের কৃষিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজি হয়ে যাবে এবং ফলে তাদের পুঁজির অনুপাতে আয় কমে যাবে। ১০ একরের নীচে যে সব জমির কৃষক, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিরংকুশভাবে অধঃপতন ঘটেছে এবং ন্যায্য শর্তে ভূমি বন্দোবস্ত নেওয়াও তাদের কাছে ক্রমবর্ধমানভাবে কঠিন হয়ে উঠছে। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিন্তু জমির মালিকদের তুলনায় তার মাত্রা খুবই কম এবং পরিপূর্ণভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষবাস হওয়ায় আশঙ্কায় তাদের এই উন্নতিও বিনষ্ট হতে চলেছে।" 'বীক্ষণে'র চিত্রটি কিন্তু ফ্রাঙ্কেলের চিত্রটি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

॥ 'বীক্ষণে'র জনৈক বন্ধু ॥

## সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

( ৮ম পৃষ্ঠার পর )

গণমুক্তির মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে যে বঙ্গবীর শহীদ হয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। জানি না তাঁর মহান আদর্শের বংশধর হাজারো ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, চেরাগআলি মুসা ফকির, শোভান আলির খবর। আমরা যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে বাস্তবের সংগে সম্পর্কহীন অবাস্তব নাটক-নভেলের রোমাঞ্চকর কাহিনী। ফকির মজনুর কর্মকেন্দ্র উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড় আজ কিম্বদন্তী মাত্র।

মজনু ফকিরের মৃত্যুর সাথে সাথে বিদ্রোহ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে। নেতৃত্ব ও ধর্মকে কেন্দ্র করে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিদ্রোহের শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে ইংরেজ শাসনের উদ্ধত সামরিক শক্তির কাছে বাংলা-বিহার তথা ভারতের এই প্রথম কৃষক বিদ্রোহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। শত শহীদ সন্ন্যাসীর রক্তে রঞ্জিত বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভারতের এই প্রথম কৃষক-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘ ৩৭ বৎসর যাবৎ পরাক্রান্ত বৃটিশের পরাক্রম খর্ব করে এই বিদ্রোহ টিকে ছিল সমগ্র পূর্ব-ভারতে। প্রথম গণবিদ্রোহ হিসাবে আগামী দিনের স্বাধীনতা ও শোষণ মুক্তি-সংগ্রামীদের কাছে "সন্ন্যাসী" বিদ্রোহ, সংগ্রামের মূল্যবান অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তৈরী করে গেছে। সন্ন্যাসীরা স্থাপন করে গেছে আত্ম-সম্মান, আত্ম-বিশ্বাস আর আত্ম-ত্যাগের এক জলন্ত উদাহরণ।

এই কৃষক-বিদ্রোহ ইংরেজ যেমন একদিকে ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে স্তব্ধ করে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, অন্যদিকে এই প্রথম তারা শাসনকার্যের সংস্কার করে কৃষি—অর্থ নীতির উপর নতুন আক্রমণ শুরু করে। এই "সন্ন্যাসী" বিদ্রোহের অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখতে পাই ১৭৯৩ সালের **চির কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।** সে এক অন্য ইতিহাস। বৃটিশের দেশীয় দালাল আর আমলা তৈরীর এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র।

'সন্ন্যাসী' বিদ্রোহ শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। মজনু ফকিরের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে এই বিদ্রোহ বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। যুগে যুগে মজনুর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা জন্ম নিয়েছে মূর্তিমান প্রতিবাদ হিসাবে। এই বিদ্রোহের ঠিক শ'খানেক বছর বাদে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় আবার আমরা দেখতে পাই মজনুশাহের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা নতুন নামে নতুন ভাবে বৃটিশের মোকাবিলা করছে। শৃংখলিত দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তারা বেছে নিয়েছিল **"সন্ন্যাস"**। "সন্ন্যাসী" বিদ্রোহ এদের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত নিঃসন্দেহে।

## সংকলন কেন?

'সংখ্যা'র বদলে 'সংকলন' হিসাবে 'বীক্ষণে'র চতুর্থ আত্মপ্রকাশ ঘটলো। কারণ আমাদের দেশের পত্রিকা-আইন অনুযায়ী, 'রেজিস্ট্রেশান নাম্বার' পাওয়ার আগে কোন পত্রিকাই 'সংখ্যা' হিসাবে তিনটির বেশী প্রকাশ করা যায় না। আর আমরা এখনও রেজিস্ট্রেশান পাইনি। এর মধ্যে চারবার আমরা রেজিস্ট্রেশানের জন্য আবেদন করেছি এবং চারবারই তা বাতিল হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে আমরা যেসব নাম দিয়েছিলাম, সেই নামে নাকি পত্রিকা আছে। আমরা আবার আবেদন করেছি—মঞ্জুর হবে কিনা জানি না। তাই 'বীক্ষণে'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমরা নামের জন্য আবেদন রাখছি। যতদিন রেজিস্ট্রেশান পাওয়া না যাচ্ছে, ততদিন পত্রিকা 'সংকলন' হিসাবে বার হবে।

## জুন-জুলাই একসাথে কেন?

প্রথম সংখ্যার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহেই 'বীক্ষণ' বেরুবার কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ও অন্যান্য ত্রুটির জন্য দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে এবং এই দেরীর প্রতিক্রিয়া, আমাদের আশঙ্কা অনুযায়ী, পরের সংখ্যাগুলিতেও গিয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও এই দেরীকে আমরা কমাতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে জুন-জুলাই একসাথে বের করতে হ'লো। আশা রাখি, এরপর থেকে ঘোষিত সময়-সীমার মধ্যেই আমরা 'বীক্ষণ' বের করতে পারবো।

॥ সম্পাদকমণ্ডলী, বীক্ষণ ॥

## : সূচী

বীক্ষণ / প্রথম বর্ষ / ৪র্থ সংকলন / জুন-জুলাই, '৭৩

বীক্ষণ, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংকলন
জুন-জুলাই (৭৩)

# আমাদের কথা

গত সংখ্যায় আমরা বলেছিলাম যে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কিশোর-যুব-ছাত্র সমাজকে তাঁদের নিজেদের ভূমিকা যদি ঠিক করে বুঝতে হয়, তবে তার জন্য আজ সবচেয়ে বেশী দরকার যুক্তিহীন আবেগসর্বস্বতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। গত দিনগুলির অভিজ্ঞতার আলোতে, এই প্রয়োজনটি যে কেবলমাত্র একটি আপ্তবাক্য নয়, একথা অত্যন্ত গভীরভাবে আমাদের সবারই উপলব্ধি করা দরকার। এই প্রয়োজনের প্রতি যদি আমরা ঠিকমত সচেতন থাকতাম এবং তা পুরণের চেষ্টা করে যেতে পারতাম, তবে কিশোর-ছাত্র-যুব সমাজের মনোবল এরকম ব্যাপকভাবে ভেঙ্গে পড়তে পারত না।

যুক্তিহীন আবেগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, একদিকে যেমন আমাদের সঠিক পথ আবিষ্কারে সাহায্য করে, তেমনি সেই পথে পৌছাবার জন্য প্রয়োজনীয় একটি সঠিক প্রক্রিয়ার বা অন্য কথায় সঠিক পথে পৌছান'র পথেরও জন্ম দেয়। প্রথমটি সবারই কাছে পরিষ্কার। মুখে একথা অধিকাংশই স্বীকার করেন যে, যুক্তিহীন আবেগ দিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। কিন্তু মুখে স্বীকার করলেও কার্যতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যুক্তির চেয়ে ভক্তিই যে আমাদের মধ্যে প্রাধান্য পায়, তা বোঝা যায় আমাদের বিশ্বাসগুলি নিয়ে, যখন আমরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের মুখোমুখি হই তখন। যুক্তিবাদী মানসিক গঠন থাকলে, এই সমাজ প্রতিমুহূর্তে যে অসংখ্য সমস্যাগুলিকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে, তার জটিল চরিত্রগুলিকে আমরা বুঝতে পারি। এতে একদিকে যেমন একথা বোঝা সহজ হয় যে, আমাদের খণ্ডিত জ্ঞান, সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার বোঝায় বহুক্ষেত্রেই ভুল থেকে যেতে পারে, অন্যদিকে তেমনি ভিন্ন মতাবলম্বী সাধারণ মানুষের সম্ভাব্য ভুলগুলির কারণও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে একদিকে আমরা নূতন নূতন অভিজ্ঞতার আলোতে আমাদের ধারণাগুলিকে প্রয়োজনমত সংশোধন করতে পারি, সমৃদ্ধতর করতে পারি ও তার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারি এবং অন্যদিকে সহানুভূতির সাথে, শ্রদ্ধার সাথে অন্যদেরও ভুলগুলি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারি। ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান তখন তিক্ত কলহের বদলে পারস্পরিক সহযোগিতার চেহারা নেয় এবং সঠিক পথের সন্ধান তখন একটা বিরাট মহৎ গভীর অর্থপূর্ণ যৌথ সংগ্রামের চেহারা নেয়। অন্যদিকে যুক্তিহীন আবেগ-আশ্রিত মন—যাকে এককথায় বলে ভক্তি—না পারে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজের বিশ্বাসগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করতে, না থাকে তার সেই বলিষ্ঠ ঔদার্য যার জোরে এমনকি বিরোধী মতাবলম্বীদের মতামতও একাগ্রতা দিয়ে সে শুনবে ও যুক্তির আলোতেই সেগুলির ভুল দিকগুলিকে দেখিয়ে দিতে পারবে। ভক্তিবাদী মন সেই গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডের মত একই "মন্ত্র" একইভাবে আউড়ে যায়—এই অচলা বিশ্বাস থেকে যে, যত জোরে এবং যতবার একই মন্ত্র উচ্চারণ করা যাবে, ততই তার জোর বাড়বে, ততই তা মানুষকে আকর্ষণ করবে। কিন্তু তাতে যখন কাজ হয় না তখন সে তার জন্য মানুষকেই দায়ী করে, নিজেকে নয়। এবং 'গজাল মেরে ঢোকাবার' নীতি অনুসরণ করে। এই পথে সত্যে তো পৌছান যায়ই না, এই পথ সহযোগীদের শত্রু করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত তা ফিরে এসে নিজেকেই আঘাত করে, হতাশ করে তোলে—এক সামগ্রিক বিশ্বাসহীন শূন্যতায় আমাদের পৌছে দেয়। এমনকি মূলগত কোন সঠিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্যও যদি এই পথে আমরা এগুবার চেষ্টা করি, তাহলেও ব্যর্থতা অনিবার্য্য। ইতিমধ্যেই এর জন্য সমগ্র কিশোর-ছাত্র-যুব সমাজকে অনেক দাম দিতে হয়েছে ও হচ্ছে। আজ আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালান দরকার যাতে এই দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে ভবিষ্যতে আমাদের আর পড়তে না হয়।

# ছড়া

সুজয় সেন

## ওলোট

হামলা নাকী লাল
রুখতে গিয়ে কাল।
আমলা সকল ছাপোষ
করে টুকলি সাথে আপোষ
তাই,
এপাশ ওপাশ ধপাস
পাশের ঠ্যালায় হাঁপাস
ফোঁপাস সবাই। সাবাস্।
চাকরি চেয়ে আঙুল খালি চাবাস।

## পালোট

নতুন রাজার আব্দার
একশো ভাগের তিন কি চার,
যাই লেখোনা, পাশের হার।
শিক্ষা হবে সমস্কার।
ওরাং ওটাং জাম্বুবান
বেকার তবু বর্ধমান
ঘুমাস সবাই, ঘুমাস।
( সমাজবাদে ) একই দর ফেল কিম্বা পাশ।

# উত্তরপুরুষকে

সব্যসাচী দেব

দাঁড়াও পথিকবর, একবার—এইখানে,
তোমার পায়ের নীচে, মাটিতে শুকিয়ে আসে
রক্তধারা, ভোরের শিশির ঝরে যায় অবিরল।
এইখানে সবুজ বৃক্ষের কাছে, স্বপ্ন নিয়ে কথামালা
কিছু, উচ্চারণ করেছিলো বলে, আততায়ী বন্দুকের নল
মুহূর্তেই ঝলসেছিল, সেই স্বর ছিঁড়ে।

এইখানে, প্রকাশ্য আলোতে বাদুড়েরা ডানা
মেলে উড়ে আসে—খেলা করে শব্দ নিয়ে
পরিচিত অভিধান পাল্টে যায়; শান্তি, নিরাপত্তা আর
শৃঙ্খলার প্রতিশব্দ লাঞ্ছনা, মৃত্যু কিম্বা
নির্বিরোধ আত্মহননের সাধ।

দাঁড়াও পথিকবর, এইখানে, এ মাটিতে
তোমার পোষাক খুলে একবার দেখে নাও
চতুর্দিক, ঘ্রাণ নাও বিগত দিনের—
জেনে নাও কার কাছে কতটুকু ঋণ।

একবার মুঠো কর হাত, একবার
উত্তরপুরুষ, শুধু মনে রেখো, তোমাদেরও আছে দায়—
সূর্যের শিখাকে শাণিত আয়ুধ করে তোলা।

---

## 'বীক্ষণ'-এর কিশোর-কিশোরী ভাই-বোনদের কাছে আবেদন

প্রিয়বন্ধুরা,

তোমরা তোমাদের বাড়ীতে, বাড়ীর বাইরে যা কিছু দেখছ, দেখে যা মনে হচ্ছে ; স্কুলে তোমাদের পাঠ্যবস্তু পড়তে বা শিখতে গিয়ে কি কি অসুবিধা হচ্ছে ; পড়াশুনা করার যদি সুযোগ না পেয়ে থাক, তো কেন পেলে না ;—এ সমস্ত কিছুই 'বীক্ষণ'-এর জন্য নিজের ভাষায় লিখে পাঠাও। সাথে সাথেই গল্প, কবিতা এ সব কিছুই পাঠাও। তোমাদের লেখাপত্তর 'বীক্ষণ'-এর 'কিশোর-কিশোরী বিভাগে' প্রকাশিত হবে। ঐ বিভাগের জন্য লেখার খামের উপর "কিশোর-কিশোরী বিভাগ" কথাটি লিখে দেবে। ঐ বিভাগে প্রকাশের জন্য তোমাদের বয়স ১৪ বছরের বেশী হলে চলবে না।

সম্পাদকমণ্ডলী 'বীক্ষণ'

# চোয়াড় বিদ্রোহ ঃ

## ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গণবিদ্রোহ

নীলাদ্রি ঘোষ

চলন্তিকা অভিধান বলছে 'চোয়াড়' শব্দের অর্থ 'দুর্বৃত্ত ও নীচ-জাতি'। অভিধানকার বেমালুম ভুলে গেলেন যে চোয়াড় নামে একটা সম্প্রদায় ছিল—যারা এই দেশেরই সন্তান। লাল মাটির দেশ, বনজঙ্গল ঘেরা বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশকে আগে বলত জঙ্গলমহল। এই জঙ্গলমহলের কৃষকরাই হচ্ছে **চোয়াড়**। ভদ্রবাবুদের কথিত এইসব **"ছোট নীচ জাতিরাই"** ইতিহাস তৈরী করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। আর এই চোয়াড়দের ইতিহাস হচ্ছে বিদ্রোহের ইতিহাস। সাম্রাজ্যবাদী টিবৃশের শোষণের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস। অধিকার-হীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক জলন্ত আলেখ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি—১৭৯৮-৯৯ সাল। বৃটিশের "চিরস্থায়ী" বন্দোবস্ত চালু হল জঙ্গলমহলে। বছরের পর বছর ধরে যে সমস্ত কৃষক প্রায় স্বাধীনভাবে জমি ভোগদখল করে আসছিল—এক ধাক্কায় তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হল। হারিয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রথম সুযোগেই চোয়াড়রা হাতে অস্ত্র তুলে নিল। বৃটিশের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও অত্যাচার থেকে বাঁচবার এছাড়া আর কোন রাস্তাই তাদের সামনে খোলা ছিল না।

চোয়াড়দের এই বিদ্রোহ ছিল না আকস্মিক কোন ঘটনা। দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ফেটে পড়েছিল ১৭৯৮-৯৯তে। ব্যাপকতায় আদিম ভূমিজ চোয়াড় কৃষক বিদ্রোহের ব্যাপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পাইকদের সক্রিয় সমর্থন। পাইকরা ছিল এক ধরণের পুলিশ। বৃটিশ আসার বহুপূর্ব থেকেই তারা বংশপরম্পরায় এই পুলিশী কাজকর্ম করে আসছিল এবং এর বদলে তারা নিষ্কর জমি ভোগদখল করত। ইংরেজ এদের জমিও কেড়ে নিল। স্বাভাবিক কারণেই চোয়াড় ও পাইকদের ভাগ্য এক জায়গায় এসে মিলল। বাঁচবার জন্যই পাইকরা চোয়াড়দের সাথে সামিল হয়ে তাদের সামরিক দক্ষতা দিয়ে বিদ্রোহের প্রচণ্ডতা বাড়িয়ে তুলল। বৃটিশরা এই বিদ্রোহের সংগঠকদের 'নৃশংস', 'খুনী', 'ডাকাত', 'ভয়ংকর প্রকৃতির' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করলেও কিছু যায় আসে না। কারণ খুনী যদি কাউকে বলতেই হয় তবে সে বৃটিশ। চরমতম নৃশংস যদি কেউ হতে পারে তবে সে বৃটিশ। ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের মৃত্যুর কারণ বৃটিশ। অবাধ লুণ্ঠন আর হত্যার একচেটিয়া কারবার যদি কেউ করে থাকে তবে সে বৃটিশ। চোয়াড় বিদ্রোহীরা বৃটিশের এই হত্যা লীলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল মাত্র। বৃটিশের উদ্ধত অস্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষকের এই দুর্জয় প্রতিরোধ এক অমর ইতিহাস তৈরী করেছে। এই বিদ্রোহের প্রচণ্ডতায় বৃটিশ হতাশ হয়ে পড়ে। "বৃটিশ শার্দুলদের" মনের অবস্থাটা বুঝতে পারা যায় মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টর প্রাইসের এই খেদোক্তি থেকে—

"...... আমাদের আর একটি সৈন্যদল বিদ্রোহীদের বেষ্টনী হইতে পলায়ণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমার সুনাম ও মানসিক বল নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমার অবস্থা এতই শোচনীয় যে, চোয়াড়দের এই অসহনীয় দৌরাত্ম্য আমাকে নীরব দর্শকের মত চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে হইতেছে।" জঙ্গলমহলের সর্বত্র বৃটিশ তনয়দের এই ছিল অবস্থা।

বৃটিশ তনয়দের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হবার কারণ ছিল যথেষ্ট। ১৭৯৮-৯৯তে এমন একটা মাসও যায় নি, যে মাসে চোয়াড়দের বিদ্রোহবহ্নি বৃটিশের সামরিক শক্তিকে বেপরোয়া চ্যালেঞ্জ করেনি।

প্রথম ঘটনা ঘটল এপ্রিল মাসে ১৭৯৮তে। বিদ্রোহীদের হাতে

বৃটিশের সহযোগী দু'টি গ্রাম ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং দু'জন বৃটিশ কর্মচারী নিহত হয়। মে' মাসে আমরা দেখছি রায়পুরের প্রাক্তন জমিদার জমিদারী হারিয়ে বিদ্রোহীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং বৃটিশের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। রায়পুরের জমিদারের সংগে ছিল ৪০০/৫০০ বিদ্রোহীদের একটা দল। বৃটিশ সেনাবাহিনীর সংগে তারা পুরো একটা দিনের বেশী সময় ধরে যুদ্ধ করে সাময়িকভাবে পিছু হটে যায় এবং জুলাই মাসে বিরাট সংখ্যায় ফিরে এসে দীর্ঘদিন রায়পুর অবরোধ করে রাখে। জুলাই মাসে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে হুগলী জেলা অব্দি পৌছে গেল। গোবর্ধন দিগ্‌পতির নেতৃত্বে ৪০০'র মত বিদ্রোহীদের একটি দল চন্দ্রকোণায় বৃটিশ হুকুমনামা অচল করে দিল। ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে এইসব অঞ্চলে বৃটিশ শাসনের কোন চিহ্নই ছিল না।

বৃটিশের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বাহাদুরপুরের অত্যাচারী ইজারাদার কিশেন ভুঁইয়াকে বিদ্রোহীরা টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে। সমস্ত রাজকর্মচারীরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এ অঞ্চলে সমস্ত রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এরপর একে একে শালবনী, বলরামপুর, কর্ণগড়, ঝালহারি এবং আরও বহু জায়গায় বৃটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত কেঁপে উঠল। সবচাইতে বড় রকমের ঘটনা ঘটেছিল আনন্দপুরে।

আনন্দপুর ছিল মেদিনীপুর শহরের খুব কাছেই, আর এর আয়তন ছিল মেদিনীপুরের চাইতেও বিশাল। এই গ্রামটা সেই সময় খুবই সমৃদ্ধশালী বলে পরিচিত ছিল। বিদ্রোহীরা অনায়াসে এই গ্রামটি দখল করে নেয়। এতদ্‌অঞ্চলের বিদ্রোহের নেতা হিসাবে আমরা দেখছি মোহনলালকে। মোহনলালের নির্দেশে এই গ্রামে বিদ্রোহীরা সভা করে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে এবং বৃটিশের বিরোধিতা করতে আহ্বান জানায়। গ্রামের ব্যাপক জনমত যায় বিদ্রোহীদের পক্ষে।

আনন্দপুর গ্রাম বৃটিশের হাতছাড়া হয়ে যাবার পর বিদ্রোহীরা মেদিনীপুর শহরের অবস্থাই বিপন্ন করে তুলল। চারিদিকে খবর রটে গেল বিদ্রোহীরা আসছে। তারা আসছে হাজারে হাজারে। গোটা মেদিনীপুর শহরটাই তারা জালিয়ে দেবে। এই রটনা যে কেবলমাত্র রটনা থাকছে না বৃটিশের এটা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল, এই জন্যেই যে ১৮ই এপ্রিল মেদিনীপুর শহরের ছ'ক্রোশ উত্তর-পূর্বে দলহারা বাজারটা বিদ্রোহীরা পুরোপুরি জালিয়ে দেয়। নায়েব, গোমস্তা, ইজারাদার, আমিন, বৃটিশের অনুগৃহীত জমিদার—যারা মেদিনীপুর শহরে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মেদিনীপুরের কালেক্টরের আক্ষেপটা একবার শোনা যাক—

"এখন বেলা বারোটা। আর ঠিক এই সময়ই চোয়াড় দস্যুগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসস্থান হইতে মাত্র দুই ক্রোশ দূরবর্তী একটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেছে। উক্ত গ্রামের অধিবাসীগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এখন একটি সিপাহি দল যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—ইহাই জিলার প্রকৃত অবস্থা।"

বৃটিশ শাসকদের হতাশা তাদের এই সময়কার প্রতিটি চিঠি-পত্রে বেশ ভালভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। মেদিনীপুরের কালেক্টর জেলার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কী বলছেন সেটা একটুখানি শোনা যাক। "আমি জেলার অবস্থা বর্ণনা করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। মেদিনীপুর পরগণার অবস্থা সবচাইতে শোচনীয় হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহীরা অবাধে লুণ্ঠন করে বেড়াচ্ছে। এখানে বসে আমার পক্ষে এসব দেখা সম্ভব নয়।"

এমনি বহু চিঠিপত্রের নজির হাজির করা যেতে পারে যার মধ্য দিয়ে বৃটিশের আর্তচীৎকার বেরিয়ে এসেছে। চোয়াড়দের সমর-নৈপুণ্যের কাছে বৃটিশের দম্ভ খর্ব হয়ে যায়। তাদের রণকৌশল কেবলমাত্র সম্মুখ সমরে সীমাবদ্ধ ছিল না। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে তারা ছিল যথেষ্ট পারদর্শী। শক্তিশালী উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর সংগে তারা গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাত। সরকারী সামরিক বাহিনীর রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তারা বহু জায়গায় তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছিল। যে সমস্ত বানিয়া বৃটিশ সিপাহীদের খাদ্য সরবরাহ করত তাদের প্রতি বিদ্রোহীরা মৃত্যুপরোয়ানা জারি করে। এর ফলে বানিয়ারা বৃটিশদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ইতিহাস যতদূর খবর দিচ্ছে তাতে দেখা যায় ১৭৯৯-র শেষাশেষি এই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে আসে। মেদিনীপুর জেলায় এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে এই বিদ্রোহ-বহ্নি ছড়িয়ে পড়েনি। জুন মাস নাগাদ বিদ্রোহের ব্যাপকতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যার মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলের পাইকদের এই বিদ্রোহে যোগদান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এতবড় কৃষক বিদ্রোহ আর ঘটেনি। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকেও এই বিদ্রোহের জের চলেছিল। বিচ্ছিন্নভাবে তখনও টিকে ছিল বিদ্রোহের অগ্নিশিখা।

শুরুতেই এই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে কিছুটা বলার চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজ নন্দন, সেট্‌লমেন্ট্‌ অফিসার প্রাইসের জবানবন্দীটাই একবার শোনা যাক—"অনেকের মতে, অন্য সকল আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন প্রায়ই জঙ্গল ও পাহাড় হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে লুণ্ঠন ও অরাজকতা সৃষ্টি করে, চোয়াড় বিদ্রোহও সেইরূপ একটি ঘটনা। কিন্তু আমি মনে করি এবং ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মেদিনীপুরের রাণীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত পাইকদের জাগীর জমি

দখলের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে যে আদেশ জারি করা হইয়াছিল এবং যাহা পরে আংশিকভাবে কার্যকর করা হইয়াছিল, আর ইহার ফলে জমিদার ও পাইকদের মধ্যে যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল, তাহাই বিক্ষুব্ধ পাইকদের একটা অংশকে বিদ্রোহী চোয়াড়দের সহিত যোগদান করিতে চূড়ান্তভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। পাইকগণ ইহা ব্যতীত জীবন রক্ষার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। লুণ্ঠন ও দস্যুতাকেই তাহারা জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা এই সময় অবশ্যই সরকারের প্রতি আনুগত্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা যখন দেখিল যে তাহাদের ভাইদের (চোয়াড়দের) জীবনে একটা ভয়ঙ্কর দুর্যোগ দেখা দিয়াছে তখন তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, এই দুর্যোগ তাহাদের জীবনেও শীঘ্র দেখা দিবে।"

কিন্তু চোয়াড়দের এই মারমুখী সংগ্রাম ১৭৯৯ সালের পর আর বেশী দিন চলে নি। অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের মত চোয়াড়-বিদ্রোহও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। বৃটিশের সামরিক শক্তি এই বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলেও তার divide & rule policy শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়। চোয়াড় সর্দারদের তারা কিনে নিতে সমর্থ হয়। পাইকদের তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চোয়াড়দের থেকে আলাদা করে ফেলে আর জমিদারদের লুণ্ঠনের কিছু বখরা দেবার ব্যবস্থা করে বৃটিশের আজ্ঞাবহ দাস করে তোলে। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট যে কৌশল অবলম্বন করেছিল তার মর্মবস্তু হচ্ছে নিম্নরূপ—

"......জমিদারগণ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন লইয়া থানাদার, সর্দার (চোয়াড়-সর্দার) ও পাইকদিগকে পুলিশের কার্যে নিযুক্ত করিবে। প্রতি গ্রামের হাড়ি, বাগ্‌দি ও অন্যান্য যে সকল অনুন্নত সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সর্দারদের অধীনে রাখিতে হইবে। এই সর্দারগণকে তাহাদের অধীনস্থদের ক্রিয়াকলাপের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাহাকেও বিনা অনুমতিতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিতে দেওয়া হইবে না। ইহা ব্যতীত জঙ্গল অঞ্চলে একটি পৃথক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করিতে হইবে।"

চোয়াড়গণ আত্মবিক্রয়কারী সর্দারদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ইংরেজ শাসন-শৃংখলের মধ্যে থেকে ক্রমশ বিদ্রোহ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাদের আগেকার সে মারমুখী মনোভাব ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে যায়। এইভাবে আস্তে আস্তে চোয়াড়দের গৌরবময় বিদ্রোহের অবসান ঘটে—জমি তারা ফিরে পায় না—পায় শৃংখল।

কৃষক চায় জমি। জমির উপর অধিকার হারিয়ে চোয়াড়-কৃষকরা বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। আমাদের সমাজ বিকাশের ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চোয়াড় বিদ্রোহের পর আজ প্রায় একশ' আশি বছর বাদেও বাংলা তথা ভারতের কৃষকের সংগ্রাম করবার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। চোয়াড়-কৃষকদের যে দাবী ছিল সে দাবী আজও কৃষক আদায় করে নিতে পারে নি। আজও কোটি কোটি নিরন্ন ভূমিহীন কৃষক সেই দাবীর পতাকা বহন করে চলেছে। দিন যত যাচ্ছে কৃষকের উপর উৎপীড়নের মাত্রা তত বাড়ছে। বৃটিশের সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। নিত্যনূতন নাম পাল্টে শোষক তার মুখোশ পাল্টাচ্ছে মাত্র। তাই আমাদের ভদ্রবাবুরা চান বা না চান কোটি কোটি কিষাণের চোয়াড় হয়ে আত্মপ্রকাশ করবার সম্ভাবনাটা থেকেই যাচ্ছে।

## ঃ শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ঃ

'বীক্ষণ'-এ প্রকাশিত রচনাগুলির ব্যাপারে সমস্ত ধরণের সমালোচনা, পত্রিকাকে কিভাবে আরও বেশী ত্রুটিমুক্ত ও সমৃদ্ধ করে তোলা যায়—এ ব্যাপারে সমস্ত ধরণের পরামর্শ—এগুলি 'বীক্ষণ'-এর বেঁচে থাকা ও শক্তিশালী হয়ে ওঠার পক্ষে জল-হাওয়ার মতো। বিনা-দ্বিধায় আপনার সমালোচনা ও পরামর্শ পাঠান—

॥ সম্পাদকমণ্ডলী—বীক্ষণ ॥

# আমার মাথা ঠেকেছে অনন্ত আকাশে

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

ঝড়ের গভীর উৎসমুখে ডুব দিয়ে জেনেছি এখন
সব হবে, আজ কিংবা কাল—
বিদ্যুতের অপূর্ব লতায় সজাগ চোখ মেলে দেখেছি
সংগ্রামের চাবুক সমান গালে।
অরণ্যের শরীরের ভাজে ভাজে দেখেছি ফেটে পড়তে
সবুজ প্রাণের অনিবার্য উল্লাস
দুরন্ত সমুদ্রের নীল অক্ষরের আকাবাঁকা ভাষা
সহজেই পড়ে নিতে শিখেছি।

এবার আমাকে কেউ ঘুমপাড়ানিয়া গানের অলৌকিক সুরে
ভোলাতে পারবে না —এবার আমাকে কেউ
রঙীন ইচ্ছার বশে নিলাম ক'রে দিতে পারবে না
নিষ্ফলা ধ্বংসের হাতে—
সকলকে জানাবো এবার :
সৃষ্টির গর্ভবিন্দুতে আমি জন্ম-জন্মান্তরের নবীন সন্তান
মৃত্যুঞ্জয়ী অহংকারে সদা উল্লসিত চঞ্চল অগ্রদূত।

ঝড়ের গভীর উৎসমুখে ডুব দিয়েছি আমি।
কে থমকে দেবে আমায়? বাস্তবের লাল কাকর ছড়ানো পথে
অনেক বিশ্বস্ত বিপ্লবী আমি এখন। অনায়াসে চিনে নিতে পারি
পোশাকের আড়ালে লুকোনো শয়তানের খাটো শরীর—
এখন শুধু
আমার কণ্ঠের অনাহত ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি খেলা করে
নদী-বন পাহাড়-পর্বতের সীমায় সীমায়।

আজকের কালো রাত্রির অতিদূর ওই নির্জন ধ্রুবতারাও জানে :
কেন আমি দিয়েছি ডুব ঝড়ের গভীর উৎসমুখে?

কেন আমি পড়তে শিখেছি সমুদ্রের নীল অক্ষরের ভাষা ?
কালকের প্রভাতের প্রথম সূর্যও নিবিড়ভাবে জানে :
কেন আমি অরণ্যের শরীরের ভাঁজে দেখেছি অনিবার্য উল্লাস
কেন আমি বাঁচতে শিখেছি মৃত্যুর ধূসরতারও আগে ?

তবে কার এত দুঃসাহস আমায় নিলাম ক'রে দেবে আজ ?
আমি যে এখন
একহাতে মহীরূহ
আর অন্যহাতে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।
আমার মাথা ঠেকেছে অনন্ত আকাশে।

বিজ্ঞান ও এদেশ

# টি. আই. এফ. আর. : বিজ্ঞান বিলাসিতার গবেষণাগার

জনৈক গবেষক

টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ (সংক্ষেপে—টি. আই. এফ. আর.) আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান-গবেষণাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। টাটা ধনিকগোষ্ঠীর অর্থানুকুল্যে পুষ্ট এই গবেষণাগারটির সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যাপকদের কাছে আমরা অনেক কথাই শুনেছি—জেনেছি যে টি. আই. এফ. আর. আমাদের, প্রায় নিরক্ষর দেশের মধ্যে জ্ঞানের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, এবং নিরন্ন ভারতবাসীর দারিদ্র্য দূর করার এক বৈজ্ঞানিক যাদু-দণ্ড বিশেষ। গতবছরে তাই যখন কয়েকদিনের জন্য টি. আই. এফ. আর. ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন ভেবেছিলাম যে এই "বিজ্ঞান-মন্দির"টি দেখে চোখ সার্থক করবো, কিছুটা আশার প্রলেপ দিতে পারবো, আমাদের অচরিতার্থ বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসায়।

বোম্বাই-এর অভিজাত পল্লী কোলাবায়, সমুদ্রের ধারে টি. আই. এফ. আর. বানানো হয়েছে। টি. আই. এফ. আর.-এর নিজস্ব বাস আমাদের নিয়ে যখন গবেষণাগারে ঢুকলো, তখন নিরাপত্তা সংক্রান্ত অফিসারদের তৎপরতা দেখে মনে একটা খটকা লেগেছিল—ভেবেছিলাম, মূল্যবান গবেষণা সম্বন্ধেই কি ভারত সরকারের এই কড়াকড়ি ? এতো বড় গবেষণাগারও আগে কখনও দেখিনি, বলতে কি পাঁচতলা বড়ো একটা প্রাসাদ যে সম্পূর্ণ শীততাপনিয়ন্ত্রিত করে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানচর্চার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে, এটা দেখে ওখানকার বিজ্ঞানীদের অবস্থা সম্বন্ধে বেশ একটা উঁচু ধারণা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলাম! আমার এক বন্ধু ওখানে গবেষণা করেন, তিনি জানালেন যে টি. আই. এফ. আর.-এ সেইসব মৌলিক গবেষণাই হয়, যেসব গবেষণা কেবল বড়ো বড়ো পাশ্চাত্য দেশগুলি করে থাকে। অর্থাৎ আধুনিক মাইক্রোবায়োলজি, পরমাণু কেন্দ্রীয় তত্ত্ব থেকে শুরু করে চাঁদের শিলা বিশ্লেষণ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সমস্ত "মূল" সমস্যাগুলি নিয়েই সেখানে গবেষণা হয়। আমাদের দেশের পক্ষে "অত্যন্ত জরুরী" এইসব "গুরুত্বপূর্ণ" গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের যে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, তা বুঝেই টি. আই. এফ. আর. কর্তৃপক্ষ তাঁদের জন্য খাওয়ার ক্যান্টিনের এলাহী ব্যবস্থা করেছেন—যেখানে খাবার পাওয়া যায় আমাদের দেশের মূল্যমান অনুযায়ী বেশ সুলভেই। দুপুরের গুরুভোজনের পরে বিজ্ঞানীরা রোদ পোহান সমুদ্রের ধারে, কিম্বা বসে থাকেন কৃত্রিমভাবে তৈরী ঝাউবনের ছায়ায় ছায়ায়। আমার বন্ধুটি জানালেন যে, ঐ বন এবং তার পাশের বাগান তৈরী করতে তৎকালীন ডিরেক্টর ডঃ ভাবা বহু অর্থব্যয়ে অনেক গাছ আনিয়েছিলেন দূরদূরান্ত থেকে। শোনা যায় যে ডঃ ভাবা ছিলেন কবিমনস্ক। তা হতে পারে, তবে মনে রাখতে হবে যে তাঁর এই

উত্থান-কাব্য রচনার খরচটা যুগিয়েছেন সাধারণ মানুষ—যাঁদের কাছে টি. আই. এফ. আর.-এর দরজাটা একেবারেই বন্ধ।

ওখানকার বিজ্ঞানীদের গুরুগম্ভীর কথাবার্তা, হিপিমার্কা চুল, ইয়াংকী চালচলন, পাইপ কিম্বা চুরুট মুখে ঘন ঘন "ইয়াঃ" ( Yes ) কিম্বা "হাই" ( Hi ) বলা—এ থেকেই মালুম হচ্ছিল যে যদিও তাঁরা ভারতের মাটিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবু মনে মনে ভাবছেন যে তাঁরা বিদেশেই আছেন। এই "মৌলিক" বিজ্ঞানের শেকড় যে ভারতের মাটিতে গাঁথা নেই, এটা এঁদের প্রায় কেউই ভাবেন না। পরে একটি সেমিনারে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব নিয়ে একটি বক্তৃতা শুনতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, টি. আই. এফ. আর.-এর বিজ্ঞানীদের নিরালম্ব আকাশ-চারিতা (অন্তত ব্যবহারে) আসলে এসেছে তাঁদের "আন্তর্জাতিকতাবোধ" থেকে। বক্তা ছিলেন টি. আই. এফ. আর.-এ আমন্ত্রিত মাদ্রাজের গণিতসংস্থার এক বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীরা তাঁদের আন্তর্জাতিক আদব-কায়দা অনুযায়ী অনেকেই চেয়ারে পা তুলে বসলেন ( শুনেছি ইয়াংকীরা আদবকায়দা সম্বন্ধে বেশ উদাসীন ), মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন ( আমার বন্ধুটি জানালেন যে নিজেদের অপরিসীম পাণ্ডিত্য ফুটিয়ে তোলবার এই কায়দাটি টি. আই. এফ. আর.-এর প্রায় সব বিজ্ঞানীদেরই আয়ত্তে ), এবং প্রায়ই এমন সব প্রশ্ন করতে লাগলেন যেগুলো নিজেদের বিদ্যে জাহির করা কিম্বা বক্তাকে স্রেফ বিব্রত করার মনোভাবসঞ্জাত। অপর একটি ঘরোয়া সেমিনারে বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে ল্যাং মারামারির যে রকম প্রতিযোগিতা লাগিয়েছিলেন, এবং নানা বন্ধ্যা আলোচনায় আবহাওয়া উত্তপ্ত করছিলেন তা চমকপ্রদ! বিভিন্ন বই-এ পুরোন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের বিষয় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে বিজ্ঞান আলো-চনার যে ঘটনা আমরা পড়ে থাকি, তার সঙ্গে আমাদের এই নয়া গবেষণাগারটির বিজ্ঞানীদের ব্যবহারের কোন মিলই পেলাম না। আর একটি সেমিনারে জানতে পারলাম মহাকাশ-বিজ্ঞানে ভারতের "রোমাঞ্চকর অগ্রগতির" কথা। বক্তা ছিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা আই. এস. আর. ও.*-র একজন পদস্থ বিজ্ঞানী। ইনি খুবই দক্ষতার সঙ্গে শ্রোতাদের প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে জানালেন ভারতে বর্তমানে কতগুলো পরস্পরনির্ভর মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র আছে, তাদের নামের আদ্যক্ষরগুলিই বা কি কি, এবং তারা কোথায় কোথায় আছে। ভাবলাম, এরপরে নিশ্চয়ই বক্তা সত্যিকারের কি কি গবেষণা এগুলিতে হচ্ছে সেগুলো জানাবেন। কিন্তু না। এরপরে বক্তা ভারতে মহাকাশ গবেষণাসংক্রান্ত কয়েকটি মূল্যবান "স্লাইড" দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—এই 'স্লাইড'গুলিতে ভারতের পরমাণু-বিজ্ঞানে গবেষণার পথিকৃত ভাবা এবং সরাভাই—কে কোথায় কবে বিভিন্ন সংস্থার দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন, তা দেখানো হয়েছে। রোমাঞ্চকর অগ্রগতি সন্দেহ কি ?

টি. আই. এফ. আর.-এ একটি বড়ো যন্ত্রগণক ( Computer ) আছে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগণনক্ষম যন্ত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। শোনা যায় এটিকে স্থাপনার সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ব্যবসায়িক স্বার্থে এটিকে কাজে লাগানো হবে না। কিন্তু মৌলিক গবেষণার জন্য যন্ত্রটিকে দিনে দশঘণ্টার বেশী কাজে লাগানো হয় না। বাকী সময়টুকু সেটা "বিশেষ কার্যক্রমের" অন্তর্ভুক্ত মূলতঃ ব্যবসায়িক কাজই করে থাকে। কোন সাধারণ বিজ্ঞান-গবেষণা সংস্থা এই "বিশেষ কার্যক্রমের" সুযোগ নেহাত অর্থনৈতিক কারণেই নিতে পারবেন না, কেননা এই কার্যক্রমে যন্ত্রগণকের প্রতি মিনিট গণনার সময় পিছু প্রায় চল্লিশটাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়। মৌলিক গবেষণাগারের এই যন্ত্রগণকটি আমাদের দেশের কত লোকের ভাত মেরেছে, এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের পথ গিলে খেয়েছে তা নির্ণয় করলে মাথা গরম হয়ে যাবে।

পাছে আমলাতান্ত্রিক ফাঁস কোন বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানচর্চায় বাধা দেয়, সেই জন্য টি. আই. এফ. আর.-এ বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পদের ক্রমবিন্যাসের সমান্তরালে আমলা পদও গড়ে রাখা হয়েছে। প্রচুর আমলাসমন্বিত টি. আই. এফ. আর.-এ পরিচালনা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মাথা-ভারী ব্যবস্থা। অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রতি ব্যবহারে এই আমলাদের মনোভঙ্গী ঠিক সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আমলাদেরই অনুরূপ, এবং চালচলনে এঁরাও "আন্তর্জাতিক।" এঁদেরই একজন টি. আই. এফ. আর. পরিদর্শনরত বাইরের একজন গবেষককে ধমকে বললেন যে টি. আই. এফ. আর.-এর টেবিলগুলি সবে পালিশ করা হয়েছে, এগুলিতে তিনি যেন তাঁর ব্যাগ ইত্যাদি না রাখেন। ব্রিটিশ আমলে 'অকৃত্রিম সাহেব' ও এদেশী 'কালা সাহেব'দের মধ্যে সামাজিক সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে যে রকম একটি প্রকাশ্য ব্যবধান ছিল, মূলতঃ যার উৎস ছিল শাসিত জনগণের প্রতি শাসকদের ঘৃণা, টি. আই. এফ. আর.-এর সাংগঠনিক বিন্যাসের মধ্যেও অনুরূপ একটি ব্যবস্থা স্পষ্টতঃই চোখে পড়ে। আলোচ্য জাতীয় গবেষণাগারটির বিজ্ঞানী-আমলাতন্ত্রের শীর্ষে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যে সমস্ত বিশেষ সুবিধাগুলি ভোগ করে থাকেন, সেগুলির মধ্যেই অধস্তনদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় জ্ঞাপিত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যই যথেষ্ট। সুরম্য এই বিজ্ঞানগবেষণার সৌধটির মধ্যে একটি সুসজ্জিত বিশেষ-লাউঞ্জ আছে, যেখানে প্রফেসর-পদস্থ না হলে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। বলে রাখা প্রয়োজন, টি. আই. এফ. আর-এ প্রফেসররা সংখ্যার ভিত্তিতে খুব সুলভ নন।

* আই. এস আর. ও.—ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন।

এই লাউঞ্জে প্রফেসররা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হন। বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, এই সম্মেলনের মূল আকর্ষণ হলো 'রসনাতত্ত্বের' ব্যবহারিক দিকটি। এই 'সম্মানিত' ব্যক্তিদের খিদমদকারদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, দুর্লভ খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য বিলাসিতার জন্য কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে এই বিশেষ 'বিজ্ঞান অধিবেশন'গুলিতে।

আমরা থাকার সময়ে অনুষ্ঠিত হলো টি. আই. এফ. আর.-এর বার্ষিক প্রীতিসম্মেলন। বিজ্ঞানের নামে আমাদের দরিদ্র দেশের কতো অর্থের যে অপচয় হয়, এই অনুষ্ঠানটি না দেখলে তার একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে হতো। টি. আই. এফ. আর.-এর নিজস্ব বিলাস-বহুল বিরাট প্রেক্ষাগৃহ থাকতেও খোলা জায়গায় অক্সি-অ্যাসিটিলীন শিখা দিয়ে জোড়া লাগানো এক বিরাট ধাতু-নির্মিত মঞ্চ তৈরী হলো, তার সামনে রইল ছাঁটা ঘাস ঢাকা এক মনোরম লন। বো-করা টাই, এবং স্যুট পরিহিত আমলা এবং বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন ডিরেক্টর ডঃ মেনন—যিনি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উড়ে এসেছিলেন সুদূর আমেরিকা থেকে, এবং অনুষ্ঠানের শেষে ফিরে গেলেন আবার আমেরিকাতেই। জনৈক বিজ্ঞানী গর্ববোধ করলেন এটার উল্লেখ প্রসঙ্গে এবং মন্তব্য করলেন টি. আই. এফ. আর.-এর এমনই হচ্ছে 'প্রেস্টিজ'। প্রসঙ্গত বলে রাখি, কয়েক হাজার টাকা দিয়ে তৈরী মঞ্চটি খুলে ফেলা হয়েছিলো অনুষ্ঠানের শেষে। জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থের আনুকূল্যে পরিচালিত এই জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে কি অবিশ্বাস্য আর্থিক অপচয় হয়ে থাকে তার একটি বাস্তব তথ্য পরিবেশন করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শুনেছি, অতীতে রাজ-অনুগৃহীত শিল্পীদের পুরস্কার স্বরূপ পুরুষানুক্রমিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হতো। ঐতিহাসিক-ভাবে এই প্রথাটি বিগত হলেও তার পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে টি. আই. এফ. আর. রাজকীয় বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাতাদের ক্ষেত্রে (আসল নির্মাতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই নয়)। এর নির্মাতা ছিলেন একটি পার্শী ফার্ম ( farm )। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবার পরে পাছে এটি বেকার হয়ে পড়ে তাই বিভিন্ন পরিকল্পনার অজুহাতে ফার্মটির নতুন নতুন কাজের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রথম যে অজুহাতটি খাড়া করা হয় তাহলো এই যে, যেহেতু টি. আই. এফ. আর.-এর ভিত্তি সমুদ্রকে আংশিক বুজিয়ে তার ওপর করা হয়েছে, সুতরাং এর স্থায়িত্বের জন্য সংলগ্ন সমুদ্রতলকে আরো দৃঢ় করা দরকার। সমস্যাটির সমাধানের ভার দেওয়া হলো ফার্মটিকে। বিশেষ আকারের গ্রানাইট পাথর কেটে ফেলা হলো উপকূলবর্তী সমুদ্রে। সমস্যার সমাধান হলো বটে, তবে নতুন সমস্যার উদ্ভব হলো, এর-পর ফার্মটিকে কি কাজ দেওয়া যায়? এই সমস্যার সমাধানের জন্য আর একটি নবতর সমস্যার সৃষ্টি না করলে নয়। বহু গবেষণার পর ঠিক হলো, বিক্ষিপ্ত গ্রানাইটগুলির মধ্যের ফাঁকগুলিকে বুজিয়ে না ফেললে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাবে না। বলাই বাহুল্য—এই সমস্যাটিরও সমাধানের ভার দেওয়া হলো পূর্বোক্ত ফার্মটিকে। আশা করা যায়, এই কাজ শেষ হলে আবার সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং 'প্রত্যেক সমস্যার সমাধান নতুন সমস্যার দ্বার খুলে দেয়'—এই মূল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে টি. আই. এফ. আর.-এর প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি হবে না। বিজ্ঞানের প্রগতির সূত্রটিকে টি. আই. এফ. আর.-এর মত বিজ্ঞান-কেন্দ্রই যদি অনুসরণ না করে তবে আর কে করবে?

টি. আই. এফ. আর. থেকে প্রকাশিত গবেষণাপত্রগুলির বৈজ্ঞানিক মান সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে নেহাতই বাইরে থেকে আমদানী করা কৃত্রিম "মৌলিক" বিজ্ঞান, এবং তৎসংক্রান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত আত্মম্ভরী সমাজ-বিমুখ বিজ্ঞানী এবং এসব ঘিরে গড়ে ওঠা আপাতগম্ভীর পরিমণ্ডলের যে ছবি দেখা মাত্র নজরে পড়ে, তা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে একটা অসুস্থ ঝোঁক এই গবেষণাগারটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, এবং ধারণা করে নেওয়া যায় সাধারণভাবে ওখানে কেমন গবেষণা হচ্ছে। (বিশেষ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কিছু নিশ্চয়ই সেখানে আছেন, তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম)। আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া এক বন্ধু প্রশ্ন করলেন ওখানকার একজন পদস্থ বিজ্ঞানীকে—"আপনাদের গবেষণাগারে নিয়োজিত অর্থের সঙ্গে গবেষণার মান এবং মূল্যের অনুপাত কেমন?" এই প্রশ্নের উত্তরে সেই ভদ্রলোক বিরক্ত ও কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে যে ফাঁপানো জবাব দিলেন, তার সারমর্ম এই : টি আই. এফ. আর. এমনই একটি গবেষণাসংস্থা যার প্রয়োজন কেবল মাত্র গবেষণা-পত্রের সংখ্যা বা মান দিয়ে ধার্য করা যাবে না। দেখতে হবে এর সঙ্গে ভাবা পরমাণু সংস্থা (B. A. R. C) এবং অন্যান্য শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রগুলির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ককে ( its total involvement with B. A. R. C. and other power projects)। দেখতে হবে টি. আই. এফ. আর. দেশের ব্যবসার বুনিয়াদ এবং অর্থনীতির উজ্জীবনে কি বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। সত্যিই তো! ব্যবসার বুনিয়াদ এবং অর্থনীতির উজ্জীবনে টি. আই. এফ. আর.-এর বিরাট ভূমিকা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি ব্যবসায়ে ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বিনিয়োগে, এবং হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি একদিকে শক্তি-উৎপাদনের সংকট আর অন্য দিকে ইঞ্জিনীয়ারদের অপ্রতুল নিয়োগে, ক্রমবর্ধমান বেকারদের সংখ্যায় এবং দারিদ্র্যরেখার বহু নীচে নেমে থাকা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। টি. আই. এফ আর.-এর নিরাপত্তাসংক্রান্ত কড়াকড়ির কথা তখন আর একবার মনে পড়ে গেল।

ার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলে আমার বলা শেষ করছি। ন বিকেলে টি. আই. এফ আর. থেকে ফিরে যাবো বলে াই. এফ. আর.-এর বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। খুব উঁচুর আমলা-বিজ্ঞানীরা অনেকেই বিদেশী বিলাসবহুল গাড়ীতে নিজেদের বাড়ী ফিরে যান। অপেক্ষাকৃত কম পদের বিজ্ঞানীরা সাধারণ কর্মচারীরা টি. আই. এফ. আর.-এর বাসে ফেরেন। হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা বাসে না উঠে পরের বাসটি আসার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। খালি বাস দেখে সেটিতে উঠে পড়লাম ছুটে, এবং দেখলাম যে নীরা খুব কৌতুকের সঙ্গে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছেন। বুঝলাম, যেহেতু বাসটির যাত্রীরা ছিলেন সাধারণ কর্মচারী—নীকুলের কেউ নয়—সেইজন্য বিজ্ঞানীরা তাঁদের কৌলিন্য অক্ষুণ্ণ জন্য বাসটিকে পরিত্যাগ করলেন। অর্থাৎ মুখে যাই বলুন, হিপিচুলো, বেলবটম পরা এই সব শিক্ষাভিমানীরা কৌলিন্যপ্রথা, জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি পুরোন মূল্যবোধ সূক্ষ্মভাবে টেনে এনেছেন টি. আই. এফ. আর.-এর শীততাপনিয়ন্ত্রিত 'বৈজ্ঞানিক' পরিবেশে। বুঝলাম এই সব বিজ্ঞানীরা বিদেশের বাগ্‌ভঙ্গী ইত্যাদি রপ্ত করলেও ধরতে পারেননি যে, তাঁদের মনের গভীরে তাঁরা লালন করছেন সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের সমস্ত কদর্য অভ্যেসগুলোকে। বুঝলাম যে এমনকি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের কতকগুলি সহজ গণতান্ত্রিক চেতনা ভারতের মাটিতে নকল করেও আমদানী করা যায় নি। বুঝলাম যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার মূল এখনও অনেক গভীরে, এবং টি. আই. এফ. আর.-এর বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের দেশ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে যতোই গবেষণা চালিয়ে যান না কেন, সাধারণ মানুষের চোখে তাঁরা ঠকবেন ডাকিনীতন্ত্র কিম্বা ঝাড়ফুঁক নিয়ে মাথাঘামানো কিছু 'দারুণ' লোক হিসাবে।

শিক্ষা

# ছাত্র-শিক্ষক ঐক্য—সময়ের দাবী

অধ্যাপক বি. এন. সিংহ

আমাদের দেশ এক চরম সংকটের ভেতর দিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা নড়বড় করছে। মূল্য-বোধগুলো নষ্ট, সমাজব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছে এবং সাধারণ মানুষ আজকে ণ পাচ্ছেন না কিভাবে এই সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ বে।

র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে তাঁরা নিজেরাই ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছেন; সুতরাং সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে অক্ষম। অতীতে আমরা ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ে মিলে এই সমস্যাগুলোর ব্যাখ্যা করা থেকে সমাধানে আসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শিক্ষক এবং শের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ। বুদ্ধিজীবী, ং শিক্ষক সম্মিলিত ভাবেই একটি সম্পূর্ণ শক্তি, বিচ্ছিন্নভাবে

### ক্ষক সম্পর্কের সংকট

খুব দুঃখের কথা যে, বর্তমানে ছাত্র এবং শিক্ষকের পারস্পরিক বিভিন্ন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া এই দুই শ্রেণীর পরস্পরবিরোধী ভাবনা চিন্তায় বোঝাই। যার ফলে এই অন্তর্বিরোধ আরো প্রসারিত হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয় সহানুভূতিতে ভরা সহমর্মিতার ভাবটি নষ্ট হয়ে গেছে। বাস্তব অবস্থা এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যে বহু শিক্ষক, যাঁরা একসময়ে শিক্ষকতার কাজটিকে একটি মহৎ আদর্শ হিসাবে নিয়েছিলেন, তাঁরা আজকে শিক্ষকতা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। শিক্ষাব্যবস্থার একটা মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া যে এই সমস্যার অন্য কোন সমাধান নেই—এটা আজকে ছাত্র-শিক্ষকদের সচেতন অংশটি ক্রমশঃ বেশী করে বুঝতে পারছেন। অধিকাংশ ছাত্র এই শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা পরীক্ষাতে বসছেন এবং পাশও করছেন, তবুও এটাকে অস্বীকার করা যায় না যে তাঁদের মোহভঙ্গ হয়েছে এবং তাঁরা প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে কোন প্রেরণা খুঁজে পাচ্ছেন না।

### ছাত্ররা যে প্রশ্নটি তুলেছেন

ছাত্ররা পরোক্ষভাবে যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হলো, "কতদিন পর্যন্ত শিক্ষার নামে প্রহসনটি চলতে থাকবে এবং কতদিন ধরে আমরা

এই যন্ত্রণাটি ভোগ করবো ?"

যতদিন পর্যন্ত এই প্রশ্নটির সঠিক জবাব তাঁরা না পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত ছাত্রশিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যদি আমরা এই সমস্যাটির জন্য শুধুমাত্র ছাত্রদেরই দায়ী করি, তাহলে আমরা তাঁদের প্রতি অন্যায় করবো এবং বাস্তবিক সমস্যাটির সাথে ছলনা করবো।

### সংকটের কারণ

এই সমস্যাটির মূল কারণটিকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে খুঁজতে হবে এবং এর গৌণ কারণটিকে পুরাতন অক্ষম শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দেখতে হবে।

এই প্রাণহীন এবং যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার উত্তরাধিকার হিসেবে এসেছে। পরাধীন ভারতের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার চেহারা অল্পস্বল্প পাল্টে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটা সেইসব 'বিদ্বান' এবং অফিসার-বর্গের 'মানসপুত্র', যাঁরা বিদেশী স্বার্থের এদেশী দালাল।

এই বিস্তৃত পাঠ্যসূচী, যাতে দুনিয়ার সব প্রকারের জ্ঞানের (জ্ঞানের জঞ্জাল!) জগাখিচুড়িকে অত্যন্ত যান্ত্রিক ঢঙে এক সঙ্গে জড়ো করা হয়েছে—এতো স্বল্প সময়ে ছাত্রদের সামনে যথেষ্ট মনোযোগের সাথে কি কখনো রাখা সম্ভব? শুধু তাই নয়, ক্লাস-রুম অত্যধিক সংখ্যায় ভর্তি থাকার জন্য, শিক্ষক আলাদা আলাদাভাবে ছাত্রদের গুণ ও যোগ্যতার হিসাব রাখতে পারেন না। এর ফলে ছাত্রদের যে বিশেষ সহযোগিতা ও সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অনেক যুক্তিযুক্ত কারণে পাঠ্যপুস্তকের থেকে তাঁদের সমস্ত রুচি অন্তর্হিত হয়। পরিণামে তাঁরা সংক্ষিপ্ত বাজারী নোটের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন এবং ক্লাসের মধ্যে শিক্ষকের বক্তৃতাতে কম মনযোগ দেন। এই সমস্ত বাজারী নোটে বহু 'বিদ্বান' ব্যক্তি বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখে থাকেন এবং এর মাধ্যমে বেশ কিছু আর্থিক লাভও তাঁরা উঠিয়ে থাকেন। সব মিলিয়ে—বাস্তবের সাথে বিস্তৃত পাঠ্যক্রমের কোন সম্বন্ধ থাকে না, বেচারা শিক্ষক ক্লাস-রুম ভর্তি ছাত্রদের মাঝখানে নাজেহাল হন, ছাত্ররা নোটের ওপর নির্ভরশীল থাকেন, নোট ভণ্ড পণ্ডিতদের দ্বারা লাভের জন্য লেখা হয়ে থাকে—এইসব কারণেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই নৈরাজ্য।

শিক্ষাব্যবস্থার এই ভণ্ডামীর মুখোশ ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়শ্রেণীর কাছে সম্পূর্ণভাবে নগ্ন হয়ে পড়ছে। যদিও এর জন্যে শিক্ষক বেচারী দায়ী নন, তথাপি তাঁকে এই সমস্যাটির মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে। আর যেহেতু তাঁকে ছাত্রদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসতে হচ্ছে, তাই ছাত্ররা কখনো কখনো নিজেদের শিক্ষকদের দোষী ভেবে বসেন।

### শক্তিশালী ছাত্র-শিক্ষক ঐক্যের আবশ্যিকতা

বর্তমান অবস্থায় বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং শিক্ষকদের মধ্যের : অত্যন্ত ঢিলেঢালা ভাবে রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যের অন্তর্বি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা এই অন্তর্বিরো পছন্দ করে এবং ছাত্রশিক্ষক ঐক্যকে বিভিন্নভাবে ভাঙার চেষ্টা সরকারী শিক্ষাবিদেরা ও শিক্ষাক্ষেত্রের প্রশাসনিক অধিক চারদিক থেকে ছাত্রদের ওপর তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নৈর দোষ চাপিয়ে থাকেন এবং এসব কিছুরই মূল দায়িত্ব চাপান শিক্ষ ঘাড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদের বিরোধ রয়েছে শিক্ষা অধিক সঙ্গে। তৃতীয়তঃ, প্রচলিত ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষ জবাবদিহি করতে হয় অধিকর্তাদের কাছে। ফলতঃ, শিক্ষক f চাকরী বাঁচানোর জন্য সেই ব্যবস্থারই আশ্রয় নেন, যার সঙ্গে ছা বিরোধ রয়েছে। ছাত্র নিজের শিক্ষককে বিরোধীপক্ষের f দেখতে পান। এইভাবেই শিক্ষক এবং ছাত্রদের পরস্পরের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে পার বিরোধ তীব্র হয়। এটা এমনই একটা কৌশল যা ব্যবস্থা ( blishment ), নিজেরই স্থাপিত ভুল শিক্ষাব্যবস্থার পরিণাম নিজেকে বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করে।

যেহেতু ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়শ্রেণীই একই ব্যবস্থা দ্বারা শে তাই তাঁদের এমন একটি প্রভাবশালী একতা অর্জন করতে হবে দ্বারা বুদ্ধিজীবী অংশের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির এই জঘন্য অপ ব্যর্থ করতে পারা যায়। যতদিন পর্যন্ত তাঁরা এই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একসাথে না দাঁড়াচ্ছেন, ততদিন অধ্যয়ন ও অধ্য জন্য প্রয়োজনীয় সহমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না।

### কিভাবে একতা অর্জন করা যাবে?

শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে একটি মজবুত সংযুক্ত মোর্চা করার ব্যাপারে ওপরের বিষয়গুলিকে স্মরণ রাখা অত্যন্ত প্রয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগোষ্ঠী একই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অংশ হওয়া তাঁদের মধ্যকার অন্তর্বিরোধকে কিভাবে তীব্রতর করার চে হয়ে থাকে—এই প্রশ্নটিকে সঠিকভাবে না বুঝলে কোন প্র একতা অর্জন করা যেতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকদে সরণীয় কিছু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নীচে দেওয়া হল—

(১) শিক্ষককে নিজের সামন্ততান্ত্রিক দম্ভের গজদন্তমিনার নীচে নেমে আসতে হবে।

(২) তাঁকে পাণ্ডিত্যের সামন্ততান্ত্রিক ধারণাটিকে ধ্বংস করে ছ বন্ধু হতে হবে এবং ছাত্রদের কাছ থেকে নতুন কিছু আগ্রহী হতে হবে।

(৩) শিক্ষককে ছাত্রদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতে হবে

ছাত্রদের মনে এই অনুভূতির সৃষ্টি করতে হবে, যে তাঁরা উভয়েই বর্তমান সমাজব্যবস্থায় একই নিপীড়িত সম্প্রদায়ের অংশ।

এই শিক্ষাব্যবস্থার দেউলিয়াপনার ঘটনাটি শিক্ষকদেরই স্বয়ং ছাত্রদের কাছে উত্থাপিত করতে হবে।

ছাত্রদের সামনে শিক্ষকের সমস্যাগুলিকে রাখা দরকার যাতে তাঁরা সম্মিলিত ভাবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।

পরিশেষে, শিক্ষকদের শুধুমাত্র নিজেদের বর্গের স্বার্থেই নয়,—দেশের গরীব জনতার দৃষ্টিকোণ থেকেও চিন্তা করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে তবেই একটি ব্যাপক একতা অর্জিত হতে পারে।

### ...র জন্য

... ছাত্রদের প্রথমে আত্মমর্যাদাবোধ এবং গভীরতার পরিচয় ... বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে হবে।

... এই ব্যাপক একতার অতিআবশ্যিকতা এবং অপরিহার্যতাকে ...র খুব ভাল করে বুঝতে হবে। তাঁদেরকে শুধুমাত্র নিজেদের ...র শিক্ষকদের স্বার্থই নয়, সমস্ত শিক্ষকদের এবং শিক্ষা-...নের অশিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থও মনোযোগের সঙ্গে দেখতে ...শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানবিক পরিবেশকে একটি সুস্থ ও প্রগতিশীল ...ত হবে।

### ...কতার উদ্দেশ্য

...ক এবং ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কটিকে আমরা নিশ্চিতরূপে ...তন করতে পারি এবং এটিকে একটি উঁচুস্তরে নিয়ে যেতেও ...; কিন্তু এই সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া কি বর্তমান ...-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব? না, সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোটির ...তিক (physical) পরিবর্তন ছাড়া আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে ...তে পারি না। শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটি ওপর কাঠামো ...pper structure), যা কিনা তার সামাজিক অর্থ নৈতিক ...মোর ভিত্তিটিকে শুধুমাত্র ব্যক্তই করে না, সেই ভিত্তিটির পোষণ ... বিকাশও করে থাকে। এই শিক্ষা এমন একটি মঞ্চ তৈরী করার ... করে, যা মূল সামাজিক ব্যবস্থাটিকে নির্বাধে চলতে সাহায্য ...ব। আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত লাভের প্রবৃত্তিই সমস্ত কর্মের ...াত্র চালিকাশক্তি। তাই আমাদের সামাজিক মানদণ্ড এবং ...তেও কেবলমাত্র সেই সমস্ত শিক্ষার স্থান রয়েছে, যা ব্যক্তিগত মুনাফার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। শিক্ষার এই সামগ্রিক ব্যবস্থাটি এমন ভাবে যোজনাবদ্ধ, যা সেইধরণের ব্যক্তি সমুদয়ের জন্ম দেয় যারা অত্যধিক মুনাফা করার দর্শন প্রচার করতে পারবে এবং মুনাফাখোরদের পক্ষ থেকে তাদের অনুকূলে শাসনকার্য চালাতে পারবে।

সুতরাং, যে সামাজিক ভিত্তির ওপর এই শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে না ভেঙ্গে আমরা এই শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি বাস্তব প্রগতিশীল ব্যবস্থাতে রূপান্তরিত করতে পারি না। এই জন্য ছাত্র-শিক্ষক ঐক্যের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হবে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে বদলে দেবার ন্যায়পূর্ণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা, যাতে এক নতুন সমাজ এবং সেই সমাজের এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

### বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

ভারতবর্ষে অতীতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষতঃ ছাত্রসম্প্রদায় একটি মহত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে দুঃখের আগুনে ঝলসে যাওয়া এবং দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় অধীর ভারতীয় জনগণের কাছে আজ এই নিপীড়নকারী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক নেতৃত্ব, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সঠিক কার্যক্রমের আবশ্যিকতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সচেতন বুদ্ধিজীবীদের এই কাজে একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। দুনিয়াতে কোন পরিবর্তনই ততক্ষণ পর্যন্ত হয়নি যতক্ষণ না বুদ্ধিজীবীরা তাতে ভাগ নিয়েছেন।

বর্তমানে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাজ হবে সমাজ পরিবর্তনের এই আবশ্যিকতার বার্তাটিকে জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া। শিক্ষক এবং ছাত্রসম্প্রদায়কে সাধারণ মানুষের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে, এমনকি নিজেদের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যও সাধারণ মানুষের উপর নির্ভর করে নিজের কাজ আরম্ভ করা উচিত। কারণ তাঁদের এই কাজ অন্য সমস্ত সাধারণ মানুষের সেই সংগ্রামের একটি অংশ যা এই পৃথিবীর মাটিতেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করতে বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। কেবলমাত্র বর্তমান সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদী পরিবর্তনের দ্বারাই একটি নতুন সমাজ এবং নতুন প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা রচনা সম্ভব। এই লক্ষ্যে পৌছানোর একটি অন্যতম পূর্বশর্ত হল ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করা, সমস্ত বুদ্ধিজীবী মিলে এক হওয়া এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে একই সারিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো।

ধারাবাহিক উপন্যাস

# শৈশব

শংকর বসু

॥ ১ ॥

আগুনের শক্ত ডেলা সূর্য ক্যাওড়া পাড়ার হাড্ডিসার উলঙ্গ ছেলেটার শিরদাঁড়ার গাঁট বেয়ে বেয়ে একসময় পশ্চিম আকাশটাকে ছোঁয়।

ঢালাই কারখানার ঢেউ জাগানো টিনের শেড ফুঁড়ে হাতুড়ী পেটার গম্ভীর বুক চাপা আর্তনাদ হঠাৎ থেমে গেল। ততক্ষণে পচা ডোবা আর বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে করাতকলের মাথার ওপর দিয়ে ধনুষ্টংকারের রুগীর মতো সূর্যটা বেঁকতে বেঁকতে রেললাইনে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। ওয়াক দিয়ে দিয়ে রক্ত তোলে সন্তুর দেড় বছরের বোনটার মতো। পচা ডোবার সবুজ জলে সেই তরল রক্তের একটা ঢেউ একবার জেগেই মিলিয়ে যায়। তখন আর সূর্যটাকে মালুম হয় না। তখন মোষের চামড়ার মতো অন্ধকার পা টিপে টিপে যজ্ঞবাবুর বাজার, রেললাইন আর ক্যাওড়া পটির ভিতর দিয়ে গুটিগুটি এসে টালীগঞ্জ সুলতান আলম ষ্ট্রীটের ঘেয়ো পাড়াটাকে ঢেকে ফেলে। তার আগেই করাতকলের ঘ্যাস ঘ্যাস ঘিস ঘিস শব্দে গোটা আকাশ ফালা ফালা করে, রণ'র বাবা আর চার-পাঁচজন মজুরের ছোট্ট দলটা তাতে পোড়া রুক্ষ চোখমুখে মৃত্যুর মতো গাম্ভীর্য্য নিয়ে ফিরে গেছে।

সন্তু সামনের জলামাঠে দাঁড়িয়ে রোজ সূর্যাস্ত দেখে। রণ'র বাবাকে ফিরতে দেখে। আর রণ'র জন্যে ওর বুকটা টাটায়। ওর বাবা রাগলেই বেল্ট দিয়ে মারে। আর ডিউটি থেকে ফিরলেই রাগে। কেন যে রাগে? সন্তু জানেনা। রণ এ্যাতো মার খায় অথচ রণও জানেনা। রণ'র বাবা সাঁকোর বাঁশটা ধরে ধীরে ধীরে ডোবা পার হয়। আসলে ডোবা নয় বড় পুকুর। সন্তু আগে আগে ভাবত সমুদ্র। শেষে মা বলল: ক্ষ্যাপচোদ! সমুদ্র কত বড়! অথচ মাও কখনও সমুদ্র দেখেনি। আজ দুপুর থেকে মা বাড়ী নেই। মা চোখের মধ্যে না থাকলে ওর কেমন কষ্ট হয়। বুকের ভেতর অস্পষ্ট সব কথা নিয়ে দম আটকে আসে। মার ফ্যাকাসে মোচার মতো সরু মুখটা মনে পড়ে যায়। আর কষ্ট হয়। এমন একটা কষ্ট যা আগুন পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারে। তখন সন্তুর পৃথিবীটাই অজানা অচেনা ঠেকে। অসংখ্য কেন'র ফাঁস গলায় লটকে ছেলেটা হাসফাঁস করে।

থেকে থেকেই সন্তু ঘর'বার করছিল। সূর্য অস্ত যেতে দে একটু থির হয়েছিল। জলামাটিতে সন্তু ডান পায়ের পাতার চা দিল। ধীরে ধীরে মাটির বুকে স্পষ্ট খুদি খুদি পায়ের ছাপ জাগল আর হঠাৎ পৃথিবী শব্দটা মনে পড়ে যেতে ছেলেটা চঞ্চল হয়ে উঠল ওর হাসি পেল। মা কাল কিছুতেই শব্দটার মানে বলতে পারছি না। অথচ মার মুখের আকুল-ব্যাকুল ভাব দেখে সন্তু বুঝে পেরেছিল মা ঠিক জানে। অথচ কিছুতেই পারছিল না। শে মার মুখটা কেমন কান্নার মতো হয়ে এলো—জা····নি····না। না না····। মনে পড়ছে পিথিবী মানে হইল····তর····মাটি···হ···মাটি আর আকাশ।

চন্নুর মা ডাক দিল: সন্তু চা রুটি খাবি। সন্তুর সাড়াশব্দ নেই এরকম ও মাঝে মধ্যে ডুব দেয়। চেয়ে আছে তবু দেখছে না; এ হাত দূরের কথা, তখন ও কানে শুনতে পায় না। তখন সন্তুর সাড়া পাওয়া যায় না। আবার ডাকল চন্নুর মা। সন্তু তখনও পায়ের ছাপের ওপর চোখ বিঁধিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে। আর মাটি মানে তো পৃথিবী। সন্তু পৃথিবীর বুকের ওপর আবছা কচি পায়ের ছাপ তন্ময় হয়ে দেখছিল। চন্নু এসে ওর ইজের ধরে টানল: কিরে চ।

—নাহ্।

—না····চ।

—না, না, না।

—মার জন্যে মন খারাপ?

—জানি না। ভাগ!

সন্তুর মুখ ঝামটা খেয়ে মেয়েটা একটু দমে যায়। তখনও সন্তু মাটির বুকে পা গাঁথতে চেষ্টা করছে। চোখ বড় বড় করে চন্নু দেখছিল সন্তুর লিকলিকে পা, আর পায়ের ছাপ। বাড়ীর ভেতর থেকে দাদুর গীতা পড়ার গম্ভীর সুর শোনা যাচ্ছে। চন্নুর দাদু রোজ সকাল সন্ধ্যে গীতা পড়ে। চন্নুর দিকে অবহেলায় একবার ঝট করে তাকাল সন্তু। চন্নু সন্তুর চেয়ে বছর দু'য়েকের বড়। কিন্তু হাবভাবে সন্তুকেই বড় লাগে। চন্নুর সাথে সন্তু পেয়ারা গাছের তলায় রান্নাবাটি খেলে আবার পান থেকে চুণ খসলে, লুচিগাছের পাতা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে সংসার ভেঙে দেয়। কাঁটার কুটিকুটি রেখা গায়ে

ফুটিয়ে ফুল পাড়ে। কখনও বিন বিন করে রক্ত ফোটে কুলকাঁটার আঁচড়ে। আর চাতালের পেছনের ওষুধ ফ্যাকটারীর লাগোয়া হলুদ ডোবার ধারে এ্যাম্পল খোঁজে। তবু চন্নকে সদুর এখন ভাল লাগছে না। কনুই দিয়ে ধাক্কা মারল। চন্ন চলে যেতেই সদু দেখল সাদা থান পরা মার ক্ষীণ দেহ বড় নর্দমার ওপর কাঠের নড়বড়ে গুঁড়ির ওপর দিয়ে টালমাটাল হয়ে এগোচ্ছে। মাকে আসতে দেখেই সদু একছুটে ঘরে ঢুকে বর্ণপরিচয় খুলে বসল লম্প'র আলোয়।

লম্প'র কালচে শিষ আর ধোঁয়া আর কেরোসিনের উৎকট গন্ধের ভেতর চোখা নাকটা জাগিয়ে 'অ এ অজগর আসছে তেড়ে' পড়তে পড়তে হাই উঠল। ঘুম তাড়াতে সদু দুলতে লাগল। দুলে দুলে পড়তে লাগল। পড়ার সুর আর শরীরের দুলুনির মধ্যে কেমন একটা তাল আছে। টিনের গোল চাকতিটা উনুনে চাপিয়ে রুটি সেঁকতে সেঁকতে চন্নর মার সাথে কথা বলছে অন্ন: আইজও কোন কাম হইল না। শুধাশুধি গেলাম। কেবল ঘুরায়। যেমন আগে ঘরের বাইরে হই নাই ত্যামনই ভগবান কয় খাড়া তরে জব্দ করতাছি।

আঁটা সেঁকার গন্ধ নাকে এসে লাগে। আর সদু উচপিচ করে। পেটের খিদে চিগির দিয়ে ওঠে। সদু তলপেটের মোচড় সামলাতেই মার অদ্ভুত গলাটা শুনতে পেল। যখনই অন্ন এরকম গলায় কথা বলে তখনই সদুর বুকে পোড়ানি জাগে। কে যেন লোহার একটা শিক আগুনে লাল করে ওর বুকে ছ্যাঁকা দেয়। সদু ছ্যাঁক শব্দটা অব্দি টের পায়।. তারপরই শোকের মতো কেমন একটা অনুভূতি সদুকে গাঁক করে গিলে ফেলে। সদু ভাবে, হায়রে কেন যে মার কাজটা হাসিল হয়না। ও অবশ্য খুঁটিনাটি কিছুই জানেনা। কেবল আবছা আবছা একটা ধারনা হয়েছে মার টুকরোটাকরা কথা থেকে। এরপর নাকি মাস গেলে চারটে রেশনের টাকা নিশ্চিন্তি হবে। তবু কাজটা কিছুতেই হাসিল হয়না। মা বিলাপ করে করে সেই কথা বলছে। আর গলার সুরটা যেন বুকের গভীর থেকে পাঁজরার একেকটা হাড়ের ব্যথা নিয়ে উঠে আসছে। সদু গন্ধে গন্ধে টের পায়। শোকদুঃখের কেমন একটা গন্ধ আছে। সদু টের পায়। আর পোড়ানি জাগে। পেটের টান হজম করে ছেলেটা গলা ছেড়ে পড়তে লাগল—'অ এ অজগর আসছে তেড়ে।' পড়তে পড়তে হঠাৎ ওর গুটিপোকার মতো চোখ দুটো যেন প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলে উড়ে গেল ক্যাওড়াপট্টি ছাড়িয়ে রেললাইনের পাকা হলুদ সিগন্যালটার দিকে। তারপর জোনাক পোকার মতো ইতিউতি দপ্‌দপ্‌ করে আবার বর্ণ পরিচয়ের গোলাপী মলাটে ঈশ্বরচন্দ্রের গম্ভীর মুখের ওপর ফিরে এল। মলাট ওল্টাতেই হঠাৎ ওর 'অ' এর অজগরটাকে জ্যান্ত মনে হল। অথচ সদু ভয় পেল না। সদুর ভয়ডর কম। ওর ফ্যালফ্যাল চোখের সামনে অজগরটা আপনিই ছবি হয়ে গেল। আর সদু ভাবল—অ এ অজগর কেন হয়? মাকে জিজ্ঞেসও করেছিল একবার। অন্ন ছেলের পিঠে আলগোছে হাত রেখে বলেছিল: আরও পড়াশুনা করলে, শ্যাষে বুঝতে পারবি।

আজ আর সদুর, মাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না। আজ অন্ন বড্ড কাহিল। মার কানের লতির তলায় পরপর লালতিলগুলোর দিকে চেয়ে সদুর মনে হল। সর্ষের দানার মতো তিল। ফিরে এসে ছর ছর করে হাতপায়ে জল দিয়ে অন্ন, তোলা উনুনটা নিভলা পেয়ারা গাছটার তলায় চাতালে রেখেই, আঁচলের তলায় কাঁসার বাটিটা নিয়ে চন্নর মার কাছে গেছিল। বাটিটা আঁচলে ঢেকে হুট করে অন্ন চলে গেছিল। দেখেই সদু বুঝতে পারে মা আটা ধার করতে গেল। মাসকাবারে জেঠুর বরাদ্দ পাঁচটা টাকা পেলে তবে শোধ হবে। তবু অন্ন যে কেন আঁচলের তলায় বাটিটা লুকিয়ে নিয়ে যায়, সদু বুঝতে পারে না। অজগরের ছবিটার দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি আসে। চন্নদের দাওয়ার থামে ঠেস দিয়ে, অন্ন চিৎকার করেছিল: কিরে আওয়াজ নাই ক্যান? আঁচলের তলায় বাটিটা লুকিয়ে নিয়ে অন্ন ফিরল। বাটিটা রেখেই চাতালের দিকে ছুটল উনুনটা আনতে। উনুনটা আনতে আনতে আবার কথাটা বলল। সদু দুলতে দুলতে উত্তর দিল: তুমি থাকোনা কেন?

—ওমা! যার লাইগা চুরি করি, সেই কয় চোর!

কথাটা শুনলেই সদুর বুকের ভেতর সেই পোড়ানিটা জাগে। আর অন্ন আকছার কথাটা বলে। সেদিন দিদির সাথে ঝগড়ার সময়েও কথাটা বলেছে। ক্যাওড়াপাড়ায় পিলপিলে চেহারার একটা চোরকে গ্যাস্‌পোষ্টে বেঁধে মারতে দেখেছিল সদু। কাঠগোলার মালিক ভুলুদা হাঁড়ের মতো মুখে বিদিকিচ্ছির শব্দ করে গয়ের আর থুতু ছিটিয়ে দিয়েছিল চোরটার মুখে। গ্যাস্‌পোষ্টের গায়ে জড়ানো তার-কাঁটায় ওর পুতনি কেটে, রক্ত গড়ান দিল। 'জল জল' করে ওর জিভ, থেঁতলা ঠোঁটে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সদু থাকতে পারেনি। একটু ফাঁকা হতেই চুপিসাড়ে একগ্লাস জল নিয়ে গেল। ভুলুদা যেন মাটি ফুঁড়ে হাঁড়ির মতো মুখখানা নিয়ে সামনে দু হাত আগলে দাঁড়াল।

—কি রে?

—জল চাইল যে!

—মুতে দে।

—কেন!

—বলছি মুতে খাওয়া।

—নাহ্।

— না?

—নাহ্।

—ঠিক আছে ফুলকি নিতে যাবিনা, বেঁধে রেখে দেবো।

সদুর হাত থেকে কাচের গ্লাসটা কেড়ে নিল ভুলুদা। গ্যাস্‌পোষ্টে আছড়ে ভেঙে ফেলল। গ্যাস্‌পোষ্টে বাঁধামানুষটা গোঙাচ্ছিল। সদু এক পা দু পা করে পিছু হঠে। তারপর অনেকদিন সদু কাঠগোলায় যায়নি। দিদি একা যেত। দিদিরও ভয় করে। দিদির যে কেন ভয় করে, সদু জানেনা। ভুলুদা দিদি গেলে কত্‌তো ফুলকি দেয়। তবু দিদির ভয় করে। কিন্তু যায় ঠিক। না গেলে যে উনুনই ধরবে না।

—দিদি! অ দিদি! অ অন্নদা!

—কন্‌।

—টাকা পাওয়া যাইবোতো না কি?

—ঘুরতাছি তো কমনা। এহণ কপাল!

সদুর পড়া চুলোয় উঠেছে। ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ চোখে রেল-লাইন বিঁধে সদু থির হয়ে বসেছিল। রুটি সেঁকার খিদেজাগানো গন্ধটাও আর ওকে ছুঁতে পারছে না। মার মুখে বহুবার শুনেছে, ঐ রেললাইন ধরে সবুজবর্ণ ঢাকা মেলে বাবা ফিরবে। জন্ম থেকে ও কথাটা শুনে আসছে। আর বাবার ফিরে আসাটা স্বপ্নের মতো। সদুকে উষ্ণ করে তোলে। ওর বিশ্বাস হয়। সদু আচ্ছন্নের মতো বিড়বিড় করে: বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমাদের কষ্ট হচ্ছে। ওর গা আপনি ছম্‌ছম্‌ করে, হাতের লোমগুলো রোঁয়া রোঁয়া হয়ে ওঠে। কদিন আগে বারোয়ারী তলায় 'নদের নিমাই' দেখতে গেছিল সদু। সরি ওকে কোলে নিয়ে বসেছিল। নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলে, সদু হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। সরি আঁতকে উঠেছিল: এই ভাই⋯ভাই, কান্দোস ক্যান সোনা⋯কান্দোস ক্যান। সদু শুধু ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে। ফিরে এসে মার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞস করেছিল: মা বাবু সন্ন্যাসী হয়েছে? বলোনা মা। ওমা! অন্ন কোন জবাব দেয়নি। থাবড়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করেছে: ঘুমা হারামজাদা⋯হাড়মাস কালি কইরা দিল⋯ঘুমা অখন⋯।

অন্ন রুটি সেঁকতে সেঁকতেই সরস্বতী ফিরল। চটের থলের ভেতর থেকে কাঠের ফুলকি বের করে, উনুনের পাশে ঢালতে ঢালতে বলল: কখন ফিরলা? বুঝলা মা, র‍্যাল লাইনের সামনের ডোবাটায় মেলা কলমি শাক হইছে, কাইল নাওনের সময় আনুম অনে। আর⋯হ⋯কানাইদা কইছে কাইল সদুরে লইয়া যাইতে। ভর্তি কইরা নিব।

কথা বলতে বলতে সরি চাতালে গেছে। ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে জল ঢালার শব্দের সাথে সরির গলা শোনা যায়। সরির গলা বড্ড চিকন। ছুঁচের মতো বেঁধে। সদু লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে, অন্নর পিঠের কাছে দাঁড়াল। আঁচলের খুঁট নিয়ে আঙুলে জড়াতে থাকে: আমি কানাইদার ইস্কুলে পড়ব না মা। অন্ন সদুর ঘ্যানঘ্যানে আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকল: সরি রাইত হইছে, খাইয়া ল।

এনামেলের থালার কানায় আঙুল পুঁছে অন্ন একছিটে গুড় দিল। সদু রুটি ছিঁড়ে থালার কানায় ঠেকিয়েই মুখে পুরে দিচ্ছিল। খেতে খেতে সদু হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। ঢিলেভাবে হাতটা থালায় পড়ে থাকে। পানাপুকুরের ওপর নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো বেয়ে দুলতে দুলতে, দিদির বই বগলে নিয়ে কানাই মাষ্টারের পাঠশালায় যাওয়ার দৃশ্যটা ওর চোখে জলজ্বল করছে। আর কানাই মাষ্টারের গরুর মতো ড্যাবড়া চোখ। সদুর কেমন ভয় ভয় করে। এইতো গেলবার যখন সবাইকে বোঁদে খাওয়াল, সেদিন কি মারটাই না মারল। কি যেন ছিল, সদুর ঠিক মনে পড়ে না⋯স্বাধীনতা বা নেতাজী কিম্বা গান্ধীর জন্মদিন হবে। কানাই মাষ্টার নিজেই তেরাঙ্গা ঝাণ্ডা তুলল বাগ্দীপাড়ার বুকে। ক্যাওড়া বাগ্দী আর কাঠগোলা আর পাইপের ভেতর থেকে সব ছানা পোনার দল, ইজেরের দড়ি টানতে টানতে এসে বোঁদের ঠোঙাটা ঘিরে দাঁড়াল। সদুর তখন হঠাৎ কোমরে ন্যাতা জড়ানো ছেলেটাকে আঁকপাক করতে দেখে মনে হয়েছিল: কেড়ে না নেয়। ছেলেটাকে সদু আগেও দেখেছে, লেকের ধারে বড় বড় পাইপগুলোর ভেতর ওরা থাকে। বাপ মা ভাই বোন সবাই। সবাই মিলে বাজার থেকে তরকারির খোসা টোসা কুড়িয়ে কাচিয়ে আনলে ওর মা তাই ফুটিয়ে দেয়। ছেলেটা বোঁদে খেয়ে গলাফাটিয়ে বন্দেমাতরম দিল, তিনবার চারবার। শেষে কানাইদার হাতটা ধরে বলেছিল: বাবু এবার থেকে রোজ হবে তো?

—কি?

—স্বাধীনতা⋯।

হঠাৎ কি যে হল কানাইদা দম বন্ধ করে ছেলেটাকে মারতে লাগল। বোঁদের হলুদ ছোপ, রক্তের দাগ আর সর্দিলালায় মাথামাখি ছেলেটাকে হিক্কা তুলে কাঁপতে দেখে, সদুর অসহ্য রাগ হচ্ছিল। গা ঘিন ঘিন করছিল। চলে যেতে যেতে ঝাঁকড়া চুলের ফাঁক দিয়ে ছেলেটা ফিরে ফিরে কানাইদাকে দেখছিল। আর হিক্কা তুলছিল।

কানাই মাষ্টারের গরুর মতো চোখ, সদু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। আর পাইপ পাড়ার ছেলেটার আমসির মতো মুখখানা। মুখে রক্তের ক্ষীন রেখা। এইসব সাতসতেরো ভাবনায় সদু ডুবে গেছিল। হঠাৎ রুটিতে কামড় দিতে গিয়ে খট্‌ করে একটা শব্দ হল। সাথে সাথে মাড়িতে বেদনা জাগল। মাড়ি থেকে বেদনাটা ফাল দিয়ে মাথায় উঠল। সদু বাঁ হাতে গাল চেপে ধরল: উঃ।

—কি হইল? জল খা।

সরির খাওয়া শিকেয় উঠল। একগ্লাস জল গড়িয়ে সদুর মুখের কাছে ধরল। বার দুই-তিন ঢোঁক গিলতে চেষ্টা করে সদু আঁৎকে উঠল: নড়ছে!

—কি ?

—দাঁত।

অন্ন আঙুল দিয়ে টিপেটুপে দাঁতটা পরখ করল: সরি এক নাল সূতা আন দেখি। সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দাঁতটা বেঁধে দিল অন্ন। সদু একটু একটু করে টানতে লাগল। টানে আর চড়াক্ চড়াক্ করে বেদনাটা মাথায় ওঠে। সদু বেদনা সহ্য করতে পারে। এইতো গেল বছর, মা উনুন ধরিয়ে চান করতে গেছিল। সদু একটা পা উনুনে ধরে রেখেছিল, তখনও ধোঁয়া উঠছে, পাতলা ফিকে ধোঁয়া। অন্ন ফিরে এসে পায়ের ফোস্কা দেখে তার ওপরই দুমদাম বসিয়ে দিয়েছিল: হারামজাদা····বোধাবোধ নাই····। ধীরে সুস্থে টানতে টানতে দাঁতটা খসিয়ে ফেলল। দেদার রক্ত পড়ছে। পিচ কেটে রক্ত লালা ফেলে সদু দেখতে লাগল মাটি লাল হয় কিনা।

—চল গর্তে দিয়া আসি।

সরির হাত ধরে সদু চাতালের পেয়ারাগাছটার তলায় গেল। গাছটার ছালবাকল বলতে নেই। কোন কালে মরে হেজে গেছে। পাশে মাটির একটা ঢিঁবি। ঢিঁবির গায়ে থানকুনি পাতা। চন্নুর মা রোজই থানকুনি পাতার ঝোল খায়। পেয়ারা গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে লম্বা একটা সুরঙ্গ করেছে ইঁদুরের ঝাড়। সরি সদুর হাতটা সুরঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে কি যেন বিড়বিড় করে বলল। সদু দিদির শ্যামলা মুখের দিকে ঠায় তাকিয়েছিল। থামতেই জিজ্ঞেস করল: কি বললি রে ?

—তোর ইঁদুরের মতো দাঁত হবে, কুট কুট করে খাবি।

—কেন বললি ?

—বেশ করেছি।

—আমি কি ইঁদুর !

—তবে কি ?

—মানুষ।

—ওরে আমার মানুষরে !

সরি পাঁজাকোলা করে সদুকে নিয়ে এসে খাটের ওপর ঝুপকরে বসিয়ে দিল। সদু তখনও সমানে গজরাচ্ছে। হাত পা ছুঁড়ছে।

অন্ন জলে ভিজিয়ে গলিয়ে নিল একখানা রুটি। চোয়ালের একপাশে রুটির টুকরো গুঁজে দিয়ে অলস ক্লান্তভাবে অন্ন চিবাতে লাগল। দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের ছবিটার দিকে চোখের ডিম ভাসিয়ে রেখেছে। সরি গজ গজ করছে: তোমারে না কইছি জল দিয়া রুটি খাবা না। অখনই তো অম্বল হইল বইলা।

—চুপ কর।

—ক্যান ?

—কথা বাড়াইস না কইলাম।

সরি এনামেলের থালাটা নিয়ে চলে গেল। ততক্ষণে অন্নর খাওয়া হয়ে গেছে। ন্যাতা দিয়ে জায়গাটা পুঁছে নিয়ে, সরি খাটের ওপর চট বিছিয়ে বিছানা পাতল। আর অন্ন ঘটিটা শূন্যে তুলে ঢক ঢক করে জল খেল। তারপর একটা উদগার তুলে একহাতে পিড়িটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখতে রাখতে বিড়বিড় করল: কোন আথার ছাই আছে যে তাই দিয়া খামু ? কি রাইখ্যা গ্যাছে তর বাপে ? বলে ধন বাইর কর, ধন বাইর কর, তিনডা খুঁদের হাঁড়ি—জন বাইর কর, জন বাইর কর, তিনজন রাঁঢ়ী।

মরা হাজা পেয়ারাগাছের একটা ডাল সদুদের চালাঘর ছুঁয়ে ফাঁসের মতো ঝুলছে। আগে আগে গাছটায় গাঢ় সবুজ পাতা গজাত। ফুটকির মতো ফুল ফুটত। পেয়ারা ফুল। তারপর হঠাৎ ফুলগুলো ঝুরঝুর করে, তামার বর্ণ হয়ে চাতালের বিচ্ছিরি খাঁজের মধ্যে পড়ে থাকত। এখন আর ফুলও ফোটে না। চন্নুর মা বলেছে গাছটা শিগ্গিরই কাটাবে। সদুর গাছটার জন্য কেমন টন টন করে বুকটা। আহা কেন যে গাছটায় পেয়ারা হয় না! নিঃসাড়ে রাত বাড়ছে। গাঢ় রাত। আর রাত হলেই চাটগাইয়া বিশুদের পাশের ঘর থেকে শুঁটকি মাছের গন্ধ আসে। রাত হলেই সদুদের চালছোঁওয়া ডালটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ফাঁসটা ধীরে ধীরে দোলে।

অন্ন ছেলেমেয়ে দুটোকে দুপাশে নিয়ে শোয়। আর শুলেই সমস্ত দিনের ধকল ভুলে অন্ন কেমন নরম হয়ে যায়। তখন সদু মার বুকের কাছে মাথা ঠেকিয়ে কান দুটো খাড়া করে রাখে। আজ শুয়েই মার গলা জড়িয়ে ধরে কাননা কাননা গলায় বলল: আমি দেশপ্রিয় ইস্কুলে ভর্তি হব মা।

—ওমা অত দূর একা যাবি ক্যামনে।

—কেন তুলু যায় না বুঝি।

—মেলা টাকা পয়সার কাম, আমরা গরীব মানুষ কষ্ট পামু।

—কেন ? আমরা গরীব কেন ?

—জানি না।

—বলোনা মা ?

—জ্বালাইস না কইলাম।

—বলোনা মা আমরা গরীব কেন ? বলোনা ?

সরি সদুর মাথার চুলে আঙুল খেলাতে থাকে। আর ঠোঁট কেটে ওয়ার হয়ে গেলেও যে ছেলে কাঁদে না, সামান্য একটা জবাবের প্রত্যাশায় সে আকুল কান্নার মধ্যে তলিয়ে গেল। অন্ন দরমার খোপকাটা জানলার ভেতর দিয়ে রেললাইনের দিকে জলকাটা চোখ মেলে বিড়বিড় করল: তোমার বাবায় নাই কিনা তাই। বাবায় আসলে সব ঠিক হইয়া যাইব।

বাবার কথা শুনলেই সদুর ভরসা হয়। মনে মনে বাবার একটা

ছবি এঁকেছে সদু। শক্ত সমথ একটা মানুষ। ছবিটা ভেসে উঠতেই সদুর ঢেউ তোলা ঠোঁটে হাসি খেলল। অন্নকে আঁকড়ে ধরল সদু। আর তখনই পাইপ পাড়ার সেই হাড় জিরজিরে ছেলেটার কথা মনে হল। সদু দেখেছে বাবা মা ভাই বোন গুষ্টিশুদ্ধ ওরা পাইপের ভেতরে থাকে। পাইপের ভেতরটা থিকথিক অন্ধকার। সদু আর দুলু একবার একটা পাইপের দু মুখ দিয়ে ঢুকে পরস্পরকে ছোঁওয়া যায় নাকি দেখেছিল। দুলু সাথে সাথে বেরিয়ে যায়। আর সদু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, বাতাসের জন্য আঁকপাক করে মরতে মরতে উল্টো-মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। বাইরে এসে আকাশটাকে দেখেছিল।

সদু এখন মনে মনে ভাবে—আচ্ছা ওদের তো বাবা আছে, তবে ওরা পাইপে থাকে কেন? ওদের তো বাবা আছে, তবে ওরা গরীব কেন?

সদু অন্নকে ঠেলল। অন্নর সাড় নেই। সারাদিনের ধকলে অন্ন এখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। প্রশ্নটা বুকের ভেতর নিয়ে সদু এপাশ ওপাশ করে। সরি এমনিতেই ঘুমকাতুরে। আজ আর কথাই নেই। রাতের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে চোখ দুটো চিরে রেখে ছেলেটা আর বেশীক্ষণ একা একা জাগান দিতে পারে না। অসাড় হয়ে যায়। [ক্রমশঃ]

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও সমাজ

# জনৈক শারীরতত্ত্ববিদের কিছু এ্যাডভেঞ্চার

জে. বি. এস. হলডেন

[ আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে যে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাটি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলো : বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি মূলতঃ কিছুসংখ্যক অত্যন্ত প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিকের কীর্তি। এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেরণা—মানুষের সহজাত কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা।

কিন্তু বিজ্ঞানেরও ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসকে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাবো, এই প্রতিভাধরদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটার পথটি প্রশস্ত করেছেন তাঁদের পূর্বসূরী অখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত অগণিত বিজ্ঞানী। এবং বিজ্ঞানীর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা সমাজ-নিরপেক্ষ ভাবে আসে না; অনুসন্ধানের বাস্তব প্রেরণা সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধটিকে ব্রিটেনের তৎকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকায় দেখলে এই কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

ডঃ জে. এস. ( জন স্কট ) হলডেন যে সময়ে বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, ব্রিটেনে তখন চলছে দ্রুত শিল্প-প্রসারণ। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রসারে খনির ভূমিকার কথা বলাই বাহুল্য। যে পুরাতন পদ্ধতিতে খনিজ পদার্থগুলোর উৎপাদন হতো, নতুন সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে সেগুলো খাপ খাওয়াতে পারছিল না। সামাজিক প্রয়োজন বাড়ার সাথে সাথে এই বিরোধও বাড়তে থাকলো এবং প্রাচীন পদ্ধতিকে সরিয়ে নতুন পদ্ধতির আসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো। এরই প্রতিফলন ঘটলো তৎকালীন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। খনিগুলোর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য খনিগুলোকে বৈজ্ঞানিক ভাবে জানা দরকার, তাই বিজ্ঞান মঞ্চে আমরা আসতে দেখলাম ডঃ জন স্কট হলডেনের মতো আরও অনেক বিজ্ঞানীকে, যাঁরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা পালন করলেন, প্রশস্ত করে গেলেন পরবর্তীকালের বিজ্ঞান গবেষণার পথকে। একটি সমস্যার সমাধান জন্ম দিল আর একটি নতুন সমস্যার এবং এইভাবে এগিয়ে চললো বিজ্ঞান।

এঁদের সমান্তরালে আর একশ্রেণীর বিজ্ঞানীদের আমরা দেখতে পাই যাঁদের একমাত্র 'অনুসন্ধিৎসা,' কিভাবে বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে লাগানো যায়? এঁদের 'প্রতিভা' ও 'উদ্ভাবনী শক্তি'র দৌরাত্ম্যে হিরোসিমা-নাগাসাকীর লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ

লোক প্রাণ হারায়, ভিয়েতনামের মাঠের ফসল পুড়ে ছাই হয় ; অগণিত দেশপ্রেমিক ভিয়েতনামী মা-ভাই-বোনেদের রক্তে এইসব 'ভাড়াটে' বিজ্ঞানীদের প্রভুদের ঘৃণ্য লালসার নিবৃত্তি হয়।

আসুন, আমরা এই কথাটি ভাবতে শিখি : 'সমাজ-নিরপেক্ষ,' 'সত্যের সেবক' বিমূর্ত বিজ্ঞান বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানের ধারা, প্রগতি ও প্রয়োগ সমাজের সেই অংশটির আদর্শ ও চরিত্র অনুযায়ী হয়ে থাকে, যে অংশটি সমাজের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করে।—সঃ মঃ 'বীক্ষণ' ]

লেখক পরিচিতি ॥

১৮৯২ সালের ৫ই নভেম্বর অক্সফোর্ডের চারওয়েলে জে বি. এস. ডেন জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জন স্কট হলডেন ছিলেন বিখ্যাত রীরতত্ত্ববিদ্। ১৯১৪ সালে অক্সফোর্ডের নিউকলেজ থেকে গ্রীক লাতিনে ডিগ্রী লাভ করলেন হলডেন। সেই বছরেই শুরু হল ম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের উন্মাদনা এড়াতে পারলেন না তরুণ হলডেন ; দলে যোগ দিয়ে গেলেন ফ্রান্সের রণাঙ্গনে। পরে মেসোপোটে-র যুদ্ধে আহত হয়ে চিকিৎসার জন্য আসেন ভারতের পুণা রিক হাসপাতালে। যুদ্ধের পর শারীর-বিজ্ঞানের গবেষণা ও াপনার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি, যদিও বিজ্ঞানে তাঁর ন ডিগ্রী ছিল না।

হলডেন ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীদের একজন, যাঁরা একাধারে তভাবান গবেষক, সার্থক শিক্ষক ও সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানী। রন্ত জ্ঞানের তৃষ্ণা ছিল তাঁর। দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান—'টি বিষয়েই বিদগ্ধ ছিলেন তিনি, কিন্তু এই বৈদগ্ধ্য শুষ্ক, বন্ধ্যা ত্যের নামান্তর ছিল না। জনসাধারণের কাছ থেকে বিজ্ঞানকে য়ে নিয়ে 'বিজ্ঞান-মন্দির' গড়ে তুলে রহস্যময় 'ঐন্দ্রজালিক' নী-পুরোহিত' শ্রেণীর জন্ম দেওয়ার হীন চক্রান্তকে প্রতিহত ত, আপোষহীন সংগ্রাম আজীবন চালিয়েছেন তিনি—বিজ্ঞানীর াজিক দায়ীত্ববোধ থেকে। বিজ্ঞানের প্রতিটি অগ্রগতিকে সাধারণের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে পৌঁছে দেওয়া ছিল, তাঁর কাছে ানীর ন্যূনতম সামাজিক কর্তব্য।

বিজ্ঞানী হলডেন ছিলেন সেই দুর্লভ বিজ্ঞানীদের একজন, বিজ্ঞান-সাধনাকে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করে সামাজিক ত্ববোধকে এড়িয়ে যান না বা সবকিছু ভুলে থাকার জন্য বিজ্ঞানকে কন্তব্য হিসাবে ব্যবহার করেন না। তাই ১৯৫৬ সালে ব্রিটীশ ার সুয়েজ আক্রমণ করলে, হলডেন এটাকে 'পোর্ট সৈয়দে ত্যা' বলে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন এবং চিরদিনের মতো ভূমি ত্যাগ করলেন। ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ বলপূর্বক ভারতীয় জাতিকে হীন করার জন্য, লজ্জার সীমা ছিল না তাঁর, তাই দেশত্যাগ করার স্থায়ী নাগরিকত্ব নিয়ে এদেশের সেবা করে আত্মগ্লানী থেকে মুক্তি পেতে হলডেন এলেন ভারতে। তিনি ভেবেছিলেন, ব্রিটীশ শাসনমুক্ত ভারতে সত্য ও ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনগ্রসর ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, বিজ্ঞান তার স্বাধীনতা পেয়েছে, ধনী গোষ্ঠীর আনুকুল্যের সামনে নতজানু হতে হচ্ছে না ভারতীয় বিজ্ঞানকে ; বিজ্ঞান-সাধনার আদর্শ পীঠস্থান হয়ে গড়ে উঠছে সাতচল্লিশোত্তর ভারত। কিন্তু হলডেনের মোহভঙ্গ হতে দেরী হলো না ; অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, বিজ্ঞান এখানে অনাদৃত, অবহেলিত, সমাজ-বিমুখ ; বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন বর্ণাশ্রম প্রথা, এদেশী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান-চেতনার থেকে বেশী আহরণ করছেন নোংরা 'কৌলিন্য বোধ' এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের এই ভয়ংকর ব্যাধিটিকে নিরাময়ের পরিবর্তে সযত্নে লালন করা হচ্ছে। এই দূষিত পরিবেশের সঙ্গে আপোষ করতে পারলেন না হলডেন। প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটুট (I.S.I —যেখানে তিনি প্রথমে যোগদান করেছিলেন)-এর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে উঠলো। I.S.I. ছেড়ে ভুবনেশ্বরে Genetics and Biochemistry গবেষণাগারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে হলডেন গেলেন উড়িষ্যায়। যোগদান করার দু'বছর পরেই ১৯৬৪ সালের পয়লা ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে ক্যান্সার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু এই ভয়ানক রোগ তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। বৈজ্ঞানিকের যথার্থ নির্লিপ্ততার সাথে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দুরা-রোগ্য ব্যাধিকে। জনৈক বন্ধুর কাছে চিঠিতে লিখেছিলেন—"ক্যান্সার আমারই হয়েছে বলে আমি খুশী।" ক্যান্সার রোগের নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির সংবাদ দেওয়াতে খুশী মনে বলেছিলেন, "যদি কিছু ফলাফল না হয় তাহলেই বা দোষ কি? আমি ডঃ এস.-এর 'গিনিপিগ' হতে রাজী আছি। (I am willing to be Dr. S's Guineapig.)"

হলডেনের মৃত্যুর সঙ্গে আমরা হারিয়েছি একজন সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানীকে, হারিয়েছি আমাদের একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধুকে এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের একজন সদা-সতর্ক প্রহরী ও সমালোচককে !

—অনুবাদক

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সবসময় গবেষকদের কাছে উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে থাকে, বিশেষ করে গবেষণার থেকে যদি নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায়। এর বাইরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা অবশ্য এই উত্তেজনা অনুভব করতে পারেন না। আর বুদ্ধির জগতে এ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রে তো বাইরের কারো পক্ষে এই উত্তেজনার ভাগ পাওয়া সব চাইতে কঠিন ব্যাপার। তবুও কিছু বৈজ্ঞানিক রয়েছেন যাঁরা দেহের ও বুদ্ধির এ্যাডভেঞ্চারকে কায়দা করে একসাথে মিলিয়ে নিতে পারেন। আমার বাবা (ডঃ জে. এস. হলডেন, যিনি ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে মারা যান) ছিলেন এই জাতের একজন বৈজ্ঞানিক। যেহেতু বেশ কিছু বছর ধরে আমি তাঁর কাজে সাহায্য করেছি (মানে বোতল ধোওয়া আর কিছু হিসেব করে দেওয়া —এই আর কি?) তাই নিজের কথা না বলে প্রধানতঃ তাঁর কাজের কথাই বলবো।

প্রায় ৫০ বছর আগে তিনি একটা সোজাসুজি সমস্যার ওপর কাজ শুরু করলেন: নোংরা বা দূষিত বাতাস জিনিসটা কি? কিসের জন্য এই বাতাস নিশ্বাস নেওয়ার পক্ষে বিপজ্জনক? এবং এর খারাপ প্রভাবগুলোর প্রতিকার কি ভাবে করা যেতে পারে?

ডাণ্ডি (Dundee)-তে কাজ শুরু করলেন বাবা। নাগালের মধ্যে সব থেকে বদ যেসব বাতাস পাওয়া গেল—সংগ্রহ করলেন। রাত সাড়ে বারোটা থেকে সকাল সাড়ে চারটের মধ্যে সবচাইতে নোংরা বস্তিগুলোতে গিয়ে ঘুপচিগুলোর থেকে, যেখানে একটা বিছানায় আটজন শোয়, বাতাসের 'নমুনা' নিয়ে আসতেন। রাস্তার তলার নর্দমাগুলোতেও যেতে হতো তাঁকে। ভূ-গর্ভস্থ রাস্তাগুলো এতো বেশী চেনা হয়ে গিয়েছিল যে ওপরের রাস্তাগুলো মনে রাখার জন্য তাঁকে তলার নর্দমাগুলো কল্পনা করতে হতো।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলটা নাস্তিবাচক হলো। দেখা গেল বাইরের বাতাসের তুলনায়, এই নোংরা বাতাসের অক্সিজেন (Oxygen)-এর পরিমাণ একটুখানি কমেছে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide) বেড়েছে খুব অল্প মাত্রায়। কিন্তু এই হেরফেরটুকুর জন্য শরীরের ওপর কোনরকম প্রতিক্রিয়া পড়ে না। নর্দমার বাতাসে জীবাণুর সংখ্যা বাইরের বাতাসের তুলনায় সাধারণতঃ কম। কোন বিষাক্ত উদ্বায়ী (Volatile) বস্তুরও খোঁজ পাওয়া গেল না। এর থেকে বোঝা গেল, স্নান-না-করা অনেক লোকের ভীড় বা খোলা নর্দমার থেকে যে বদগন্ধ হয় সেটা এমনিতে ক্ষতিকর নয়, কিন্তু সতর্ক হবার জন্য খুব মূল্যবান সংকেত। অপরিষ্কার থাকলে উকুন হবার সম্ভাবনা থাকে এবং উকুন টাইফাস (Typhus)-জ্বরের বাহন। খোলা নর্দমা থেকে মাছিরা নানা ধরণের জীবাণু বয়ে নিয়ে খাদ্যে মেশায়।

বাবা ছিলেন খুব গোঁয়ার। ব্যর্থতা তাঁকে দমাতে পারতো না। কাঠের একটা ঘর তৈরী করে ফেললেন তিনি যার মেঝেটা ৩'×৪' এবং উচ্চতা ৬'। দেয়াল আর ছাদ পিচে দিয়ে মুড়ে দরজায় এমনভাবে রবার লাগানো হল যাতে বাতাস একদম না ঢুকতে পারে।

ঘরটার ভেতরের লোককে বাইরে থেকে দেখার জন্য একটা জানলার ব্যবস্থা করা হলো। যে গ্যাসটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সেটি পাওয়ার জন্য ঘরের মধ্যে একটা ছোট নলের ব্যবস্থা থাকলো। এই ঘরটাতে বাবা আর তাঁর সহযোগী স্মিথকে অনেকক্ষন ধরে বন্ধ করে রাখা হলো—প্রায় সাত-আট ঘণ্টা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘরের বাতাস 'যথেষ্ট দূষিত' হয়ে পড়ছে। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে ভয়ানক ভাবে হাঁফাতে শুরু করলেন তাঁরা এবং অবস্থাটা বেশ খারাপের দিকে চললো। এর পরে দেখা দিল মাথার যন্ত্রনা এবং বমি।

কিসের জন্য বাতাস দূষিত হয়ে পড়লো? উষ্ণতা বা আর্দ্রতার থেকে হয়নি। অক্সিজেনের পরিমান শতকরা ২১ থেকে ১৩ ভাগে নেমে গিয়েছিল আর কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়েছিল শতকরা ৬২ ভাগ। কিছু কিছু উদ্বায়ী (volatile) বস্তুরও খোঁজ পাওয়া গেল যাদের কয়েকটি গন্ধযুক্ত। হাঁফানি ও মাথা ব্যথা কিসের জন্য হয়েছে? কার্বন ডাই অক্সাইড তাড়াবার জন্য বাবা একটা ট্রে-ভর্তি কলিচুন (slaked lime) ও কষ্টিক সোডা (caustic soda) নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। দু-তিন ঘণ্টা পরে অক্সিজেনের মাত্রা এতো কমে গেল যে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বললো না। কিন্তু সাত ঘণ্টার মধ্যেও হাঁফানি বা অন্য কোন শারীরিক কষ্ট হলো না। দেখা গেল অক্সিজেন সাধারণ বাতাসের স্বাভাবিক পরিমানের ওপরে রাখলেও কার্বন-ডাই অক্সাইড যদি জমতে থাকে তবে হাঁফানি হয়। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্ট হলো, তবে খুব কম। বাবা নীল হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কার্বন-ডাই-অক্সাইড যদি ক্রমাগত সরানো হয় এবং অক্সিজেন জোগান দেওয়া হয় তাহ'লে খুব অল্প জায়গার মধ্যেও অনির্দিষ্টকাল থাকা যেতে পারে। এই নিয়মটি এখন জাগতিক ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং খনির উদ্ধার যন্ত্র (mine rescue apparatus), ডুবোজাহাজ ইত্যাদিতে এটির প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এখন এই কথাগুলো খুব সহজ মনে হলেও যে সময়ের কথা বলছি, তখন এগুলো মোটেই সহজ ছিল না। কয়েকজন শারীরতত্ত্ববিদ দাবী করেছিলেন যে তাঁরা শতকরা কুড়ি ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইডযুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন কিন্তু কোন রকম ক্ষতি হয়নি। অন্যরা শতকরা এক ভাগেই অসুস্থ বোধ করেছিলেন। সম্ভবতঃ কেউই ঠিক মতো বাতাসের মিশ্রণের বিশ্লেষণ করতে পারেননি সে সময়। এই ধরনের পরীক্ষা করা অর্থহীন যদি ব্যবহার করার মতো নির্ভুল যন্ত্র না থাকে। আমার বাবা অনেক বছর খেটে এই রকম একটা যন্ত্র তৈরী করতে পেরেছিলেন। কাজটা খুব কঠিন ছিল তখন। হয়তো পুরো

দিনই কেটে যেতো একটা ছিদ্র খুঁজে বার করতে। কয়েক কেটে গেল বিভিন্ন শক্তির ( strength ) পটাশ পাইরোগ্যালল ash Pyrogallol )-এর দ্রবণ পরীক্ষা করে। শেষ পর্য্যন্ত শক্তির দ্রবণটি খুঁজে পাওয়া গেল যা অক্সিজেনকে সব চাইতে গাড়ি শুষে নিতে পারে।

যে পর্য্যন্ত যন্ত্রটা খুব বড় আর জটিল হয়ে উঠলো ; পরীক্ষাগারের র পক্ষে খুব ভালো কিন্তু খনির ভেতরে বয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে ারী। যাই হোক, খনির বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করা খুব সহজ ং তাই দিয়ে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা গেল। অবশ্য সত্যি- । খারাপ বাতাস পেতে তাঁকে খনির যে সমস্ত জায়গাগুলোতে হাওয়া ঢোকার কোন ব্যবস্থাই নেই সেগুলিতে গিয়ে 'নমুনা' করতে হতো। পরের দিকে বাবা, বয়ে নিয়ে যাবার মতো যন্ত্র বানাতে পেরেছিলেন।

আমার মনে আছে, আমি একবার বাবার সঙ্গে নর্থ স্ট্যাফোর্ড- ( North Staffordshire )-এর একটা পুরনো খনিতে ছিলাম। খাঁচার মতো লিফট্ ( lift )-এ নয়, একটা শেকলে ন বড় বালতিতে বসে আমরা নিচে নামলাম। বাতাসটা । ছিল না কারণ খনির অন্য যে সমস্ত জায়গাগুলোতে কাজ ল, সেগুলো দিয়ে হাওয়া আসছিল ভেতরে।

আমরা কিছুদূর হাঁটলাম। একটা পরিত্যক্ত 'রাস্তা' দিয়ে হড়ি দিয়ে এগোলাম। ঢোকার গর্তকে যে টানেলগুলো খনির সঙ্গে—( যেখান কাজ হচ্ছে ) যুক্ত করে, কয়লাখনিতে গুলোকে 'রাস্তা' বলা হয়। যদিও সেগুলোর সর্বোত্তমটিকেও ার রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না। কিছুক্ষণ পরে । এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌছলাম যেখানে ছাদটা ছিল ় উঁচু এবং একজন মানুষ খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের একজন তাঁর 'সেফ্‌টি ল্যাম্প' ( Safety lamp )-টা তুলে ন। ল্যাম্পটা নীলাভ আলোতে ভরে গিয়ে দপ করে নিভে । ওটা যদি মোমবাতি হতো তাহলে আর রক্ষা ছিল না, রণ হয়ে সবাই আমরা মারা যেতাম। 'সেফ্‌টি ল্যাম্প'-এর টা তারের জালে ঢাকা থাকে বলে বিস্ফোরণ হয় না।*

াদের কাছের বাতাস মিথেন ( Methane—যে গ্যাস আলেয়াতে )-গ্যাসে ভরা ছিল যা বাতাসের চেয়ে হাল্কা।† তাই র বাতাস বিপজ্জনক ছিল না।

---

ধাতুনির্মিত তারের জাল তাপের সুপরিবাহি হবার জন্য তাপ জালের সবদিকে ছড়িয়ে ার তাই কোন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটাবার মত যথেষ্ট তাপ সঞ্চিত হতে পারে না।

মিথেন বাতাসের চেয়ে হাল্কা বলে ওপরে উঠে যায়। যেমন জলে তেল গুলে ঝাঁকিয়ে থিতোতে দিলে তেলটা জলের উপরে ভেসে উঠে। কারণ জল ভারী বলে নিচে থাকে এবং তেল হাল্কা হওয়ার জন্য ওপরে চলে আসে। —অনুবাদক

মিথেন গ্যাসে নিঃশ্বাস নিলে, কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য বাবা আমাকে উঠে দাঁড়িয়ে শেকসপিয়ারের লেখা 'জুলিয়াস সিজার' বইটার থেকে মার্ক এন্টনির বক্তৃতাটা আবৃত্তি করতে বললেন। আমিও বাবার কথা মতো শুরু করে দিলাম : 'Friends, Romans, Countrymen' । খুব তাড়াতাড়ি আমি হাঁফাতে লাগলাম আর 'the noble Brutus' এর কাছাকাছি এসেই আমার হাঁটু ভেঙে পড়লো, মেঝেতে পড়ে গেলাম আমি। অবশ্য বাতাসটা স্বাভাবিক ছিল সেখানে। এই ভাবেই আমি শিখলাম যে মিথেন বাতাসের থেকে হালকা আর নিঃশ্বাসের পক্ষে বিপজ্জনক নয়।

আর এক ধরণের অনেকবেশী বিপজ্জনক বাতাস আছে যাকে 'ব্ল্যাক ড্যাম্প' ( Black damp ) বা 'তলার বাতাস' ( bottom gas ) বলা হয়। 'ব্ল্যাক ড্যাম্প' হলো সেই বাতাস যার থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অক্সিজেনকে অপসারিত করেছে। এটা সাধারণ বাতাস থেকে ভারী হওয়ার দরুন খনি-গর্তের এবং অন্যান্য গর্তের তলায় জমা হয় এবং যারা এটাকে নিঃশ্বাস নেয় তারা সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে মারা যায়, যদি না তৎক্ষণাৎ তাদের উদ্ধার করা হয়। অনেক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই তথ্যগুলো পাওয়া গিয়েছিল, আর এর থেকেই কল্পনা করা যেতে পারে, আমার বাবা এবং খনির ইঞ্জিনীয়ার ও পরিদর্শকরা কতখানি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এইসব বিপজ্জনক 'নমুনা'র নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন!

কয়লা খনিতে পাওয়া যায় তৃতীয় ধরণের এমন আর একটি গ্যাস আছে যা, আমি যে দুটো গ্যাসের কথা বলছি, তাদের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক, খনি-মজুরদের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এটাকে বলা হয় 'আফ্‌টার ড্যাম্প' ( after damp )। এই গ্যাস-মিশ্রণটি বিস্ফোরণের পরে পাওয়া যায়। আগে মনে করা হতো, কয়লাখনিতে বিস্ফোরণের ধাক্কার ফলেই মৃত্যু ঘটে। বিস্ফোরণের বিবরণ পড়ে এবং বিশেষতঃ উদ্ধারকারীদের মধ্যে বিষক্রিয়া দেখে আমার বাবা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে তাঁদের মৃত্যুর কারণ হলো কার্বন-মনক্সাইড্ ( Carbon monoxid )। সুতরাং সম্প্রতি যে খনিগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটেছে সেগুলোতে যাওয়ার আগে তিনি দু-বছর ধরে এই বিষাক্ত গ্যাসের ধর্মগুলোর ওপর গবেষণা করলেন।

আগেই জানা গিয়েছিল যে এই গ্যাস রক্তের হিমোগ্লোবিন ( যার জন্য রক্তের রঙ লাল হয় )-এর সঙ্গে মিশে অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু বাতাসের মধ্যে কার্বন-মনক্সাইডের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা কত তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটাতে পারে, সেটা জানা ছিল না। বাতাসের মধ্যে এই গ্যাস কতখানি থাকলে একটা ইঁদুরের মৃত্যু হতে পারে,—এই পরীক্ষা থেকেই আমার বাবা কাজ শুরু করলেন। তিনি দেখলেন ৫০০ আয়তন বাতাসের মধ্যে এক আয়তন

কার্বন-মনক্সাইড্ থাকলে এটা ঘটতে পারে। অন্যদিকে, যেহেতু কার্বন-মনক্সাইড্ কার্যতঃ অক্সিজেনের সরবরাহ কমিয়ে দেয় তাই এর প্রতিষেধক হলো অক্সিজেন এবং একটা ইঁদুর এক আয়তন কার্বন-মনক্সাইড ও ৩০ আয়তন অক্সিজেনের মিশ্রণে বেঁচে থাকতে পারে। কীট-পতঙ্গদের হিমোগ্লোবিন নেই। তারা টিস্যুর ( Tissue ) ভেতর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছোট ছোট নলের মাধ্যমে নিঃশ্বাস নেয়। সুতরাং কার্বন-মনক্সাইড তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। আমার বাবা দেখলেন যে একটা আরসোলা ৮ ভাগ কার্বন-মনক্সাইড্ ও একভাগ অক্সিজেনের মিশ্রণে এক সপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে।

তারপর তিনি নিজের ওপর পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। তিনি দেখলেন—১০০০ ভাগে এক ভাগ কার্বন-মনক্সাইড্ যুক্ত বাতাসে অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকা যেতে পারে। ৫০০ ভাগে এক ভাগ ( কার্বন-মনক্সাইড )-বাতাসে, যার মধ্যে একটা ইঁদুর ৪-মিনিটে মারা যায়, প্রথম ঘন্টায় তিনি কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলেন না। কিন্তু ৭১ মিনিট পরে পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হলো। তাঁর খাতাতে লেখা ছিল : দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল। উঠে দাঁড়াতে বা সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে। চলাফেরার মধ্যে অনির্দিষ্ট ভাব থাকছে।

এই পরীক্ষাগুলোর থেকে ক্রমশঃ একটা সরল নিয়ম বেরিয়ে এলো। কার্বন-মনক্সাইডের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানুষের তুলনায় ইঁদুরকে শেষ পর্য্যন্ত অনেক বেশী সংবেদনশীল থাকতে দেখা যায়। কিন্তু ইঁদুর খুব তাড়াতাড়ি আক্রান্ত হয়। কারণটা খুব সোজা। যে সমস্ত প্রাণীর রক্ত গরম, তাদের সবাই শরীরের একক ক্ষেত্রফলে একই পরিমান তাপ উৎপন্ন করে। তিন হাজার ইঁদুরের ওজন একজন মানুষের ওজনের সমান কিন্তু মোট ক্ষেত্রফল মানুষের তুলনায় ২০ গুণ বেশী। সুতরাং প্রতি মিনিটে মানুষের তুলনায় ২০ গুণ তাপ উৎপন্ন করবে এবং ২০ গুণ বেশী অক্সিজেন দরকার হবে তাদের।* অনুরূপ ভাবে তারা প্রতি মিনিটে মানুষের তুলনায় ২০গুণ বেশী কার্বন-মনক্সাইড গ্রহণ করবে।

এই কারণে কার্বন-মনক্সাইড-এর উপস্থিতি বোঝার জন্য ইঁদুর বা একটা ছোট পাখীকে সূচক ( indicator ) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের একটা সূচক খুব দরকার, কারণ কার্বন-মনক্সাইডের কোন গন্ধ নেই, যুদ্ধে ব্যবহৃত অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের মতো এতে কোন অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়াও হয় না। তাই মানুষ বা অনুরূপ অবস্থায় কোন পাখী ধরাশায়ী না হবার আগে কিছুই বুঝতে পারে না।

এই আবিষ্কারগুলো এবং বাতাস ও রক্তে কার্বন-মনক্সাই-এর পরিমাপ বার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার পর, আমার বাবা একটা খনিতে নামলেন, যেখানে সদ্য-সদ্য একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তাঁকে খুব বেশী সময় প্রতীক্ষা করতে হয়নি। ১৮৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে Tylorstown-এর একটা কয়লা খনিতে বিস্ফোরণের ফলে ৫৭ জন মানুষ ও ৩০টি ঘোড়া মারা গিয়েছিল। বিস্ফোরণের পরের দিনই বাবা খনিতে নামলেন। তিনি দেখলেন, বিস্ফোরণের ধাক্কাতেই ৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। অন্যদের মৃত্যুর কারণ কার্বন-মনক্সাইডের বিষক্রিয়া। অন্যান্য বিস্ফোরণগুলোতেও একই ব্যাপার ঘটেছিল।

পরবর্ত্তী ৩০ বছর ধরে আমার বাবা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকারের খনির ভেতরে ঢুকেছেন, খনিতে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতি করার পদ্ধতি, বিস্ফোরণ প্রতিরোধের কৌশল এবং বিস্ফোরণ হলে মানুষদের উদ্ধার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

বাবা ঠিক করলেন, 'কেন আমরা নিঃশ্বাস নিই' এই প্রশ্নটার সমাধান করা দরকার। জীব-বিজ্ঞানে "কেন?"র দুটো উত্তর আছে। তিনি আগেই জানতেন যে অক্সিজেন নেওয়া এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড বার করে দেবার জন্য আমরা নিঃশ্বাস নিই। এটাকে চূড়ান্ত কারণ বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন কারণের ফলে আমরা নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হই অর্থাৎ নিঃশ্বাস নেবার প্রক্রিয়া কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, এটা জানা ছিল না। মস্তিষ্ক কেন স্নায়ুর মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশীগুলোতে প্রতিমিনিটে ২০ বার খবর পাঠায়?—এটা হলো আগের বিরাট প্রশ্নটি "কেন?"-র দ্বিতীয় ধরণের উত্তর, যেটাকে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্যকরী কারণ বলা যেতে পারে।

ব্যাপারটাকে অনুসন্ধান করার জন্য, বিভিন্ন গ্যাস শুঁকলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় তার সঠিক তথ্য জানা দরকার। সুতরাং বাবা শবাধারের ( কফিন ) মতো দেখতে একটা কাঠের বাক্স তৈরী করে ফেললেন—যেটার প্রসংগে সত্যি সত্যিই আমরা 'কফিন' শব্দটা ব্যবহার করতাম। বাক্সটা বায়ু-নিরোধক ( air-tight ) করে একজন মানুষকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো; শুধু একটা রবারের কলারের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে থাকলো তার মাথাটা। বাক্স থেকে একটা নল একটা ড্রামের ( Drum ) সঙ্গে যোগ করা ছিল। নিঃশ্বাস নেবার সময় লোকটার বুক প্রসারিত হলে 'কফিন' থেকে বাতাস বেরিয়ে আসতো নল দিয়ে এবং ড্রামটা ওপরে উঠে যেতো। নিঃশ্বাস ছাড়লে বাইরের বাতাস 'কফিনের' মধ্যে গিয়ে ঢুকতো আর ড্রামটাও নিচে নেমে যেতো। ড্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিল একটা

* প্রাণীদেহে গ্লুকোজের সঙ্গে অক্সিজেনের মৃদুদহন থেকেই তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে।
—অনুবাদক

লিভার ( Lever ) যার দ্বারা ড্রামটা ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে একটা ধোঁয়া মাখানো কাগজে লেখা হয়ে যেতো।

এর থেকে বোঝা যেতো সঠিক কতটা পরিমাণ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছে মানুষটা। তারপর লোকটাকে অনেকগুলো গ্যাস পর পর শুঁকতে দেওয়া হলো এবং তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হলো। আমি এই "কফিনটাতে" কিছুটা সময় কাটিয়ে ছিলাম কারণ আমার চার বছর বয়স থেকেই বাবা আমাকে পরীক্ষার কাজে লাগাতেন। দেখা গেল, বাতাসের সঙ্গে একটুখানি কার্বন-ডাই-অক্সাইড যোগ করলেও নিঃশ্বাসের গভীরতা অনেকখানি বেড়ে যায়। যার ওপর পরীক্ষা করা হচ্ছে, সে হয়তো ব্যাপারটা লক্ষ্যই করবেনা কিন্তু যন্ত্রের সংকেত থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। অন্যদিকে অক্সিজেনের অভাব হলে ( অবশ্য খুব বেশী যদি না হয় ) যে প্রভাব পড়ে সেটা খুবই নগণ্য। এর থেকে বোঝা গেল,— শ্বাস প্রশ্বাস অক্সিজেন দিয়ে নয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরে প্রিস্টলে ( Priestley ) নামের একজন সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করে বাবা প্রমাণ করলেন, যদি খুব তাড়াতাড়ি গভীর নিঃশ্বাস ফেলা হয় যাতে কি ফুসফুসের নিচে যে বাতাসটা রক্তের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় রয়েছে সেটা সঙ্কোচনের চাপে বেরিয়ে যায়, তাহলে সেই বাতাসটাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রার পরিবর্তন হবে না, যদিও অক্সিজেনের পরিমাণ পাল্টাতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে ফুসফুসের বায়ু-কোষগুলোতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা সব সময় একই থাকে। এই বাতাসটাকে alveolar air বলা হয়। প্রিস্টলের সঙ্গে বাবা বেন নেভিস ( Ben Nevis ) পাহাড়ের চূড়াতে উঠে এবং ইংলণ্ডের গভীরতম খনির ভেতরে ঢুকে পরীক্ষা করে দেখলেন যে alveolar বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ পাহাড়ে বেশী কিন্তু খনিতে কম। তাঁরা হিসেব করে দেখলেন,—একটা নির্দিষ্ট আয়তনের alveolar বাতাসে যে পরিমাণ ওজনের কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে তা চাপের সঙ্গে পাল্টায় না, যদিও পাহাড়ের হাল্কা বাতাসে এর শতকরা মান ভূ-গর্ভের ভারী বাতাসের তুলনায় বেশী। এর থেকে বোঝা যায়,— যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্তে মিশে থাকে তা সব সময় একই থাকে। এখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে রক্তে মিশে থাকা কার্বন-ডাই-অক্সাইড শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশীগুলোতে নির্দেশ পাঠাতে মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে। কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড রক্তে মেশার দরুণ রক্তের অম্লতা ( acidity ) বাড়ার জন্য, নাকি অন্য কোন কারণের ফলে উপরোক্ত ব্যাপারটা হচ্ছে,— এ সম্বন্ধে তখনো স্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায়নি। সুতরাং আমি আমার সহকর্মী ডেভিস্ ( Davis )-এর সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দিলাম যাতে সঠিক উত্তরটা জানা যায়।

প্রথমেই যে জিনিষটা আমাদের শেখার দরকার ছিল তাহলো রক্তে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ( Sodium bicarbonate )-এর পরিমাণ কিভাবে স্থির করা যায়। এ ব্যাপারটা খুব সোজা ছিল না। অন্য ধরণের বিশ্লেষণ করে উত্তরটা মেলাবার আগে তিনমাস খাটতে হয়েছিল আমাদের। তারপর এইভাবে আমরা যুক্তি দিলাম: যদি রক্তের অম্লতার ( acidity ) ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয় তবে রক্তের মধ্যে ক্ষারীয় ( alkaline ) বাই-কার্বনেট-এর মাত্রা বাড়ালে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিশ্চয়ই মন্দীভূত হবে যাতে বেশী কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ধরে রেখে ওটাকে সমতুলিত ( balance ) করা যায়। আর বাই-কার্বনেটের পরিমাণ যদি আমরা কমিয়ে দিই তবে ঠিক অনুরূপ কারণের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ বেড়ে যাবে।

রক্তে বাই-কার্বনেট বাড়ানো খুব সোজা। আমরা প্রায় ১½ আউন্স বাই-কার্বনেট ( সোডা ) খেয়ে নিলাম এবং সত্যি সত্যিই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ কমে গেল। কিন্তু বাই-কার্বনেট কমানোর ব্যাপারটা অত সোজা নয়। সহজতম পদ্ধতি ছিল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ( Hydrochloric acid ) খেয়ে নেওয়া। কিন্তু মুশকিল হলো—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্ যদি গাঢ় ( strong ) হয় তাহলে গলা ও মুখ পুড়ে গিয়ে ঘা হতে পারে। সুতরাং আমি ওটাকে পাতলা ( dilute ) করে নিলাম। কিন্তু তবুও প্রতিক্রিয়া হবার মতো বেশী খাওয়া গেল না।

আমি কয়েক রকমের রাসায়নিক কায়দা বার করলাম যাতে আমার রক্তে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্,—যাকে বলা যেতে পারে—'ছদ্মবেশে' নিয়ে যেতে পারি। এই কায়দাগুলোর সব থেকে ভালোটি হলো, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্ ( Ammonium chloride )-এর দ্রবণ খেয়ে নেওয়া। কিন্তু এটা খুব শক্তিশালী হলে চলবে না; বমি হয়ে যেতে পারে। আবার খুব বেশী খেয়ে নিলে মৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক নয়।

অন্ত্র ( intestine ) থেকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্ শোষিত হয়ে যকৃতে ( liver ) যায় এবং যকৃৎ অ্যামোনিয়াকে অ্যাসিড্‌টা ফেলে রেখে ইউরিয়াতে ( urea ) পরিণত করে দেয়, যা মোটেই ক্ষতিকর নয়। এক আউন্স পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্ থেকে এতো বেশী অ্যাসিড্ বেরুল যে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে যথেষ্ট কষ্ট হতে লাগলো। এক নাগাড়ে কয়েকদিন ধরে আমাকে হাঁফাতে হলো এবং আরো কিছু বেশ মজার ব্যাপার শরীরে ঘটতে লাগলো, যেগুলো বলে আপনাদের ধাঁধায় ফেলতে চাই না।

আমি নিজেই খুব অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম, আমার আবিষ্কার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজে লাগছে।

GYORGY নামের একজন জার্মান ডাক্তার, যিনি এখন ইংলণ্ডে

আশ্রয় নিয়েছেন, দেখেছিলেন যে রক্তে ক্ষারের পরিমাণ খুব বেশী বেড়ে যাওয়ার ফলে কিছু কিছু বাচ্চাদের এক বিশেষ ধরণের মূর্চ্ছারোগ (fit) হয়। তিনি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড্ দিয়ে তাদের সারিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। পরে অবশ্য অনেক ভালো চিকিৎসা বেরিয়েছে কিন্তু একমাত্র তিনিই সে সময় কিছু মূল্যবান জীবনকে মৃত্যু ও যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন।

তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ডাক্তির বস্তির বাতাসের বিশ্লেষণ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা। কিন্তু একটা ধাপ তার আগের ধাপ থেকে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ভাবেই এসেছে। এবং প্রত্যেকটি ধাপ সম্ভব হতে পেরেছিল বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর মাপ-জোকের ফলে। "কিভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়?" এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা খুব সোজা। কিন্তু এর সঠিক উত্তরটা যদি প্রকৃতির কাছ থেকে পেতে হয় তবে আমাদের প্রশ্নটা 'কথার' মাধ্যমে নয়, 'কাজের' মাধ্যমে উপস্থিত করতে হবে।

কাজগুলো আমাদের বিচিত্র সব জায়গাগুলোতে নিয়ে যেতে পারে। কিছু সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর আমরা পেতে পারি পরীক্ষাগারে, অন্যগুলো খনিতে কিংবা হাসপাতালে, আর কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে, রকি পাহাড়ের চূড়ায় এবং হয়তো বা বাকি উত্তরগুলো পাওয়া যাবে সমুদ্রের তলায়, ডুবুরীর পোশাকের মধ্যে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই জিনিসটি আমার খুব ভালো লাগে—পরের মুহূর্তে কোথায় যে আপনাকে নিয়ে যাবে, আপনি নিজেই জানেন না! *

* এই রচনাটি জে. বি. এস. হলডেনের লেখা Some Adventure Of A Physiologist—প্রবন্ধটির ভাষান্তর। —অনুবাদক : মৃণাল রাহা

শিক্ষা

# প্রস্তাবিত "প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়" : একটি হীন চক্রান্ত

প্রেসিডেন্সী কলেজের জনৈক ছাত্র

গত একবছর ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষতঃ আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একটা দাবীর কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে—প্রেসিডেন্সী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হোক। এই ধরণের পরিকল্পনা এর আগেও হয়েছিল, ১৯৬৬ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ এই মর্মে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তা' মঞ্জুর করেনি। এবারে কলেজের অধ্যক্ষ (যিনি প্রস্তাব রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম একজন) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে স্বয়ংশাসিত কলেজের দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। একে সমর্থন জানিয়েছেন 'নামজাদা' সরকারী কলেজের অধ্যাপক, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্তাব্যক্তিরা এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের একটি সামান্য অংশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অন্যায়ের ছোঁয়াচ থেকে "মেধাবী" ছাত্র-ছাত্রীদের বাঁচানোর তাগিদেই নাকি এই প্রস্তাব উঠেছে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এই প্রস্তাবকে বিচার করলেই আমরা দেখতে পাবো এই পরিকল্পনার পেছনে কাজ করছে আসলে একটি আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০টি কলেজের প্রায় ২২৫,০০০ ছাত্রছাত্রীকে বঞ্চিত করে, মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রছাত্রীকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির দর্পনে "উচ্চ-শিক্ষিত" করে তোলা এবং করের ভারে নুইয়ে পড়া জনসাধারণের পয়সায় সরকারের 'শ্বেতহস্তী' প্রেসিডেন্সী কলেজকে আরো দুধ-সর খাওয়ানোর নোংরা অভিসন্ধি।

## কেন এই প্রস্তাব ?

প্রেসিডেন্সী কলেজের অতীত অনুধাবন করলেই আমরা দেখতে পাবো, যে প্রধানতঃ ধনীর ঘরের "দুলাল"দেরই শিক্ষাক্ষেত্র এই প্রেসিডেন্সী কলেজ। [ অবশ্যই দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও যে এই কলেজে নেই এমন নয়। কিন্তু ধনীর "দুলাল"দের তুলনায় তারা একেবারেই নগণ্য বলা যায় ]। সরকারী, বেসরকারী আমলাদের সত্তরভাগই এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে চরম অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছে তার ফলে এই আমলা-উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটছে। আর তাই এই আমলা তৈরীর কারখানার সুষম বিকাশের প্রয়োজনে, তারা সামগ্রিক শিক্ষা জগৎ থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজকে আলাদা করতে চাইছে। যাতে আমলা তৈরী অব্যাহত রাখা যায়, শাসনযন্ত্রের ভিতকে আরো মজবুত বানানো যায়। এই ধরণের কুমতলব অবশ্যই প্রেসিডেন্সী কর্তৃপক্ষের কোন অভিনব আবিষ্কার নয়। ১৯৬৭ সালে ফ্রান্সেও কিছু লোক

"মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়"—এই শ্লোগানটি তুলেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ছাত্রআন্দোলনের জোয়ারে এই শ্লোগানটি তলিয়ে যায়।

তাছাড়া, ছাত্রঅসন্তোষের ঢেউ প্রেসিডেন্সীর চত্বরেও এসে পৌঁছেছে। অন্যায়, অসত্য আর অসাধুতার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা এখানে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। একের পর এক বলিষ্ঠ ছাত্রআন্দোলন অসাধু কর্তৃপক্ষকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আমলাতন্ত্র ভীত, সন্ত্রস্ত, কম্পিত হয়ে উঠছে। আর তাই আনন্দ হাইত—নুরুল ইসলামের সংগ্রামী ঐতিহ্যবহনকারী সমগ্র বাঙলার ছাত্রসমাজ থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের "মেধাবী"র মুকুট পরিয়ে দিয়ে আলাদা করে দেবার চক্রান্ত চলেছে। যাতে সারা বাঙলার ছাত্রছাত্রীদের দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙ্খা থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে ফেলা যায়, গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে।

আর ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাঁদের এই আপাতমহান প্রস্তাবটির গোপন অভিসন্ধিকে বুঝতে না পারেন সেজন্য তাঁরা নানা ধরণের গালভরা "যুক্তিতর্কে"র অবতারণা করেছেন। যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের আলোকে তাঁদের "যুক্তি"গুলিকে আলোচনা করা যাক।

(১) তাঁদের প্রধান বক্তব্য—সকলপ্রকার দুর্নীতি ও শৈথিল্যের অবস্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। এই দূষিত আবহাওয়া থেকে "মেধাবী" ছাত্রছাত্রীদের "মুক্তি" চাই। "ভগবানের" কিঞ্চিৎ বেশী আশীর্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের উপযুক্ত তদারকীর জন্য দরকার আলাদা পড়াশুনার ক্ষেত্র—আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়—প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়। আর এই পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ে কী হবে? ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৈজ্ঞানিক পাঠক্রম চালু হবে—বিজ্ঞানসম্মত পড়াশুনার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে—যাতে ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা লাভ করবেন!

এটা অনেকটা কারবাইড দিয়ে আম পাকাবার চেষ্টা। কারণ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাটাই আজ যেখানে পচে গিয়েছে, সেখানে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দিকে নজর না দিয়ে এবং যে সামাজিক কারণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় এই পচন ধরেছে তাকে দূর করার চেষ্টা না করে, তারই মাঝে একটি "আদর্শ" স্বর্গোদ্যান তৈরী করা গেলেও তা হবে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। শিক্ষাব্যবস্থা তথা সমাজব্যবস্থার ক্ষত-বিক্ষত অসুস্থ শরীরের ছাপ অচিরেই এই স্বর্গোদ্যানেও গিয়ে পড়তে বাধ্য। কাজেই দুর্নীতির ছোঁয়াচ থেকে "মেধাবী" ছাত্রছাত্রীদের "বাঁচানো"র অজুহাতে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় তথা "প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ে"র প্রস্তাব একটা ভোঁতা হাতিয়ার, ধাপ্পাবাজীরই নামান্তর।

(২) প্রস্তাবকদের আর একটি বক্তব্য হোল—"উচ্চশিক্ষা" নাকি সবার জন্য নয়। কেবলমাত্র "মেধাবী" ছাত্রছাত্রীদেরই "উচ্চশিক্ষা" লাভের অধিকার আছে। "স্পেশালাইজড্ এডুকেশন" পাবার যোগ্যতা ভালো ছাত্রছাত্রীদের জন্মগত পাওনা।

এর জবাবে প্রথমেই বলা যেতে পারে যে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল যদি "মেধার" মাপকাঠি হয়, তা'হলে বর্তমানে যে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ নিচ্ছেন তাঁরা নিশ্চয়ই "মেধাবী"। [অবশ্য ওঁদের মতে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই যদি শুধু "মেধাবী" হন তা'হলে অন্য কথা]। দ্বিতীয়তঃ, জনশিক্ষার প্রসার প্রতিটি সুস্থ ব্যক্তিরই কাম্য। সমাজে "শিক্ষিত" বা "উচ্চশিক্ষিতের" হার বাড়ছে—এটা সমাজের সুস্থতারই লক্ষণ। কিন্তু আমাদের সমাজে "শিক্ষিত" বা "উচ্চশিক্ষিত"রা আজ একটা সমস্যাস্বরূপ। তাই বলে, এই সমস্যার কারণ হিসাবে "উচ্চশিক্ষা"কে দায়ী করা চলে না। "উচ্চশিক্ষিত"রা তাঁদের লব্ধ জ্ঞান দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন না—এর জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তথা সমাজব্যবস্থার চরিত্র। কিন্তু বেকার সমস্যা আছে বলে "উচ্চশিক্ষা"কে সীমাবদ্ধ করো—এ দাবীর অর্থ বর্তমান শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকদের নির্লজ্জ দালালী করা।

(৩) প্রস্তাবকদের দাবী নাকি এমন কিছু অন্যায় আবদার নয়। কারণ প্রেসিডেন্সী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা রাজ্যসরকার আর সামান্য অর্থসাহায্য দিলেই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা যায়।

হ্যাঁ, তা যেতে পারে। কারণ সারা ভারতবর্ষে না হোক, পশ্চিমবাঙলার সবচেয়ে অর্থপুষ্ট কলেজ হল প্রেসিডেন্সী কলেজ। যদিও এই বিপুলায়তন আর্থিক অনুদানের তুলনায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিতান্তঃই সীমিত। যেখানে পশ্চিমবাঙলার অন্যান্য কলেজগুলিতে ক্লাশ উপচে পড়া ছাত্রছাত্রীদের "লালন-পালন" করা হচ্ছে, সেখানে উপযুক্ত লাইব্রেরী, ল্যাবোরেটরী ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও প্রেসিডেন্সী কলেজে পাসকোর্স চালু করা হয়নি। যেটা হ'লে, অন্ততঃ আরো কিছু ছাত্রছাত্রী "উচ্চশিক্ষার" মুখ দেখতে পেতেন। এমন কি, ইউ. জি. সি. কর্তৃক অনুমোদিত সাম্মানিক কোর্সের নির্দিষ্ট আসনগুলিও প্রতি বছর নানা ছল-ছুতোয় পুরোপুরি ভর্তি করা হয় না। সর্বোপরি একাত্তর সাল থেকে পি, ইউ এবং প্রি, মেড কোর্সও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ক্রমশঃ কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হচ্ছে। যার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে শিক্ষাখাতে থেকে এই কলেজের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। আর তারই সাথে সংগতি রেখে কলেজের বহিরাবরণেও চাকচিক্য বাড়ছে—বাইরের রেলিং ভেঙ্গে দিয়ে ইটের উঁচু দেওয়াল উঠেছে; দেওয়ালে, জানলায় পড়ছে

নানা রঙের আস্তরণ! আর এই প্রাচুর্যের পাশাপাশি বিরাজ করছে একটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র—কলকাতা ও মফঃস্বলের অন্যান্য কলেজগুলির চিত্র। ছাত্রছাত্রীরা সেখানে বইয়ের অভাবে পড়তে পারছেন না; প্রাকটিক্যাল ক্লাশে যন্ত্রপাতি জুটছে না; স্থানাভাব এবং ছাত্রছাত্রীদের জনসমুদ্রে অধ্যাপকরা খুব স্বাভাবিকভাবেই ঠিকমত পড়াতে পারছেন না; সর্বোপরি শিক্ষকদের মাইনে জুটছে না। বৈপরীত্যের এক আদর্শ উদাহরণ! একদিকে প্রেসিডেন্সীর সীমিত সংখ্যক "পোষ্যবর্গে"র জন্য যোগানের প্রাচুর্য উপচে পড়ছে আর অন্যদিকে বেশীর ভাগ কলেজের ছাত্রছাত্রী-অধ্যাপকদের এক দুঃসহ করুণ অবস্থা।

যেদেশে অধিকাংশের ভাগ্যে "কলাপাতা"ই জুটছে না, সেখানে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর জন্য "রূপোর থালার" জায়গায় "সোনার থালা" দাবী করাটা—ক্ষুদ্রমনা, চরম স্বার্থপরতারই পরিচয় বহন করে না কি? ঠিক কারণেই দেশের অর্ধনগ্ন, বুভুক্ষু, নিপীড়িতদের রক্তজল করা অর্থের ভাঁড়ার থেকে আরো কিছু আদায় করে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পরিকল্পনা সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়।

### কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা:

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কি এই প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছেন?—না, তাঁরা মানেন নি। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই ঘৃণার সঙ্গে দূরে ঠেলে দিয়েছেন এই জঘন্য প্রস্তাবকে। অবশ্য প্রস্তাবকরা প্রচার চালাচ্ছেন যে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীরই তাঁদের এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন আছে। এই প্রচারের উদ্দেশ্য, পশ্চিমবাঙলার সমগ্র ছাত্রসমাজের কাছে প্রেসিডেন্সীর ছাত্রছাত্রীদের এক 'জঘন্য স্বার্থপরতার ছবি' তুলে ধরা। বাস্তবে ছাত্রছাত্রীদের একটি নগণ্য অংশই তাঁদের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। আর অধিকাংশই এই নোংরা ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার কঠিন প্রত্যয়ে ঐক্যবদ্ধ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা "প্রস্তাবিত প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক এক আলোচনাসভার আয়োজনে উদ্যোগী হন। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছাত্রমতকে সংঘবদ্ধ করা হচ্ছে এই সন্দেহে অধ্যক্ষ, তাঁর বংশবদ কিছু ছাত্রের সহায়তায় সভার উদ্যোক্তাদের উপর আক্রমণ চালান। সামান্য একটা আলোচনাসভার আয়োজনের "অপরাধে" উদ্যোক্তারা প্রহৃত হন, এমন কি তাঁদেরকে পুলিশের সামনে হাজিরা দিতে পর্যন্ত বাধ্য করা হয়। কিন্তু সমগ্র ছাত্রছাত্রীদের প্রবল ইচ্ছা ও উদ্যমের কাছে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন এবং আলোচনা সভাটিও অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেশীর ভাগ ছাত্রবক্তাই এই প্রস্তাবের অসারতাকে তুলে ধরেন এবং দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দেন—এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা চলবে না।

### সমাধান কোথায়?

বর্তমানে শিক্ষাজগতে যে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে—তা আমাদের প্রচলিত সমাজকাঠামোর দেউলিয়া চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। তাই, এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অস্তিত্বের সাথে যাদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে—তারা রঙবেরঙের মেকী ছাত্রদরদী শ্লোগান তুলে ছাত্রসমাজকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, বিভিন্ন উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনৈক্য, বিভেদ ইত্যাদির বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক হয়ে এগুতে হবে, প্রাত্যহিক সমস্যাবলীর মুখোমুখি হয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। আজ আর শিক্ষাসংস্কারের মিথ্যে ছিঁচকাঁদুনী গেয়ে কোন লাভ নেই। শিক্ষাসমস্যার একমাত্র সমাধান নিহিত আছে—শিক্ষাকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মধ্যে—আরও দু-একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টিতে নয়।

ছাত্র বন্ধুরা,

আপনারা যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশুনো করছেন সেগুলির আভ্যন্তরীণ চেহারা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ চিঠি-পত্র পাঠান। আমাদের দেশের বেশীরভাগ সাধারণ মানুষই এইসব 'জ্ঞানের মন্দির'-গুলির ভিতরের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাণহীন অবস্থার কথাটা জানেন না। আপনাদের এই ধরণের চিঠি-পত্র প্রকাশিত হলে, তাঁদেরই কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরই সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনেদের কেমন আবহাওয়ার মধ্যে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন। এর ফলে তাঁদেরই স্নেহাস্পদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে তাঁদেরকে উত্তেজিত করার যে অপচেষ্টা চলে, তার বিরুদ্ধেও এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ হবে। তাছাড়া এতেই আপনাদের পারস্পরিক খবর আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম হয়ে উঠে, 'বীক্ষণ' ছাত্র হিসেবে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার কাজেও সাহায্য করতে পারবে। ॥ সঃ মণ্ডলী—বীক্ষণ ॥

# বহুরূপী

আন্তন্‌ পি. চেখভ

পুলিশ ইনস্পেক্টার অকুমেলভ বাজার দিয়ে যাচ্ছিলো, গায়ে তার নতুন গ্রেটকোট আর হাতে একটা বাণ্ডিল। পেছন পেছন বাজেয়াপ্ত করা বেরীফলে কানায় কানায় ভরা চালুনী হাতে নিয়ে চলছিলো এক লালচুলো কনেষ্টবল। চারধার চুপচাপ....বাজারের আশেপাশে কোনো জনপ্রাণীরও দেখা নেই... শুধু ছোট ছোট দোকান আর টাভার্ণের বাইরের দিকের দরজাগুলো বিষণ্ণভাবে হাঁ করে রয়েছে দুনিয়ার দিকে যেন সব ক্ষুধায় কাতর জন্তুদের চোয়াল। কোনো ভিখারীও তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নেই।

একদম হঠাৎ, একজনের গলা কানে এলো ইনস্পেক্টার অকুমেলভের: "কামড়াবি? হুঁ কামড়াবি, ব্যাটা খেঁকী কুত্তা কোথাকার! এ্যাই ছেলেরা ছাড়িস না ব্যাটাকে! আজকাল আর কামড়ানো মোটেই আইনী নয়। ধর....ধর! কেঁ-উ!"

একটা কুকুরের প্যানপ্যানানি শোনা গ্যালো। যেদিক থেকে শব্দ আসছে সেদিকে তাকিয়ে ইনস্পেক্টার দেখলো: ব্যবসায়ী পিচুগিনের কাঠের গোলা থেকে একটা কুকুর তিনপায়ে দৌড়ে বেরোচ্ছে, পেছনে সমস্ত শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে একটা লোক তাড়া করে আসছে, গায়ে তার কড়া মাড় দেওয়া ছিটের সার্ট আর তার'উপর বোতাম খোলা ওয়েষ্টকোট; লোকটা হঠাৎ ক'রে আরও ঝুঁকে পড়ে, কুকুরটার পিছনের একটা ঠ্যাং পাকড়ায়... কুকুরটা ককিয়ে ওঠে, সাথে সাথে চীৎকার "যেতে দিয়ো না ব্যাটাকে।" গোলমালের আওয়াজে দোকানের থেকে বেরিয়ে আসে কতকগুলো ঘুমজড়ানো মুখ, দেখতে দেখতে ছোটখাটো একটা ভীড় জমে যায় গোলার চারপাশে, যেন সব মাটি ফুঁড়েই বেরিয়ে পড়লো।

কনেষ্টবল ইনস্পেক্টারকে বলে: গুরুতর আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে, হুজুর!

অকুমেলভ ঘুরে গিয়ে জোর কদমে এগিয়ে গেলো জটলার দিকে। উপরোক্ত বোতাম খোলা ওয়েষ্টকোট গায়ে লোকটিকে সে দেখতে পেলো একেবারে ঠিক গোলার গেটের সামনে, মহাআড়ম্বরে জমায়েতের কাছে একটা রক্তমাখা আঙুল উচিয়ে ডান হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। "শয়তান, এটা তোকেই দেবো" এই কথাক'টি যেন তার এলোমেলো চেহারার মধ্যেই লেখা ছিলো আর তার আঙুলটা মনে হচ্ছিলো বুঝিবা বিজয় পতাকা। অকুমেলভ দেখেই চিনলো যে লোকটি আর কেউ নয়, স্যাকরা ক্রাউইকিন্‌। ওপাশে জমায়েতের ঠিক মাঝখানটিতে বসে রয়েছে আসামী, সামনের পা'দুটি ছড়িয়ে একটা সাদা 'বোরজই' কুকুরছানা, নাকটা চোখা আর পিঠে একটা হলদে দাগ, সারা শরীরটা তার তখনও কাঁপছে। আতঙ্ক আর যন্ত্রণার প্রকাশ ছিলো তার জলভরা চোখে।

ইনস্পেক্টার অকুমেলভ কাঁধের ধাক্কা দিয়ে ভীড় কাটাতে কাটাতে আওয়াজ ছাড়ে "ব্যাপারটি কি? কি হচ্ছে এখানে? এ্যাই যে, আঙুল তুলে দাঁড়িয়ে আছো কেন? চেঁচাচ্ছিলো কে?"

ক্রাউইকিন গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করে, "হুজুর, নিতান্তই গোবেচারীর মত আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হেথায় মিত্রি মিত্রিচের সাথে কাঠের ব্যবসায়ের প্রয়োজনে আর কি....আর হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, একেবারেই বিনাকারণে ঐ জঞ্জালটি আমার আঙুলে কামড় বসালো। মাপ করবেন, আমি একজন খাটিয়ে লোক....আমার পেশাটাও একটু জটিল কিনা। হয়ত আঙুলটা হপ্তাখানেক নাড়তেই পারবো না, আর তাই ক্ষতিপূরণ আদায়ের বন্দোবস্ত করুন, হুজুর। ভয়ানক জন্তুজানোয়ারের সাথে বাস করতে হবে এমন কথাতো আইনে লেখা নেই। আর তাছাড়া সকলেই যদি কামড়াতে শুরু করে তা'হলে জীবনটাই তো বরবাদ হয়ে যাবে..."

"হুঁ ম্‌... ঠিক ঠিক" ইনস্পেক্টার ফৌজী মেজাজে ভ্রূ কুঁচকে কাশতে কাশতে বলে "ঠিক ঠিক.... কুকুরটা কার হ্যা? ব্যাপারটাতো এখানেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। রাস্তায় কুকুর ছাড়ার মজা আমি লোকদের টের পাওয়াবো। যে সমস্ত ভদ্রলোকেরা নিয়ম কানুন মানে না, তাদের শায়েস্তা করা দরকার হয়ে পড়েছে। গাড়োল কোথাকার। এমন মোটা জরিমানা করব... ব্যাটাকে বোঝাবো রাস্তায় হরেক কিসিমের কুকুর আর গরু ছাড়ার মজাটা কি!... ব্যাটাকে বোঝানো দরকার কত ধানে কত চাল।" কনেষ্টবলের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে চলে "এলডিরিন, ভাখোতো কুকুরটা কার এবং একটা জবানবন্দী লিখে নাও, আর কুত্তাটাকে দেরী না করে এক্ষুণি নিকেশ করতে হবে।

পাগলা কুকুর বলে মনে হচ্ছে…বলি কুকুরটা কার হে?"

"মনে হয় জেনারেল ঝিগালভ্-ই কুকুরটার মালিক"—ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে।

"জেনারেল ঝিগালভ্! হুঁম্!…এলডিরিন, ধরোতো কোটটা একটু খুলে ফেলি, কি গরমই না পড়েছে, নিশ্চয় বৃষ্টি হবে।" ইনস্পেক্টর ক্রাউইকিনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়: "একটা জিনিস ঠিক বুঝছি না…বলি কুকুরটা তোমায় কামড়ালো কি করে? হাতের আঙুলের নাগালই বা পায় কি করে…এরকম একটা ছোট্ট কুকুর আর তুমি'ত একটা দশাসই মানুষ? নিজেই হয়তো কোথাও পেরেকে খোঁচা লাগিয়েছে আর মাথায় ঢুকেছে কি করে এই তালে কিছু ক্ষতিপুরণ আদায় করা যায়। ভেবেছো তোমাদের আমি চিনি না! সব শয়তানের দল।"

"হুজুর! ওই তামাসা করে কুত্তাটার নাকে সিগারেটের ছ্যাকা দিলে, ও খ্যাক্ করে আঙুলে দাঁত বসিয়েছে, দোষ ত' ওরই! ঐ ক্রাউইকিন সদাই কিছু গণ্ডোগোল পাকাবার ধান্ধায় থাকে, হুজুর।"

"এ্যাই—ট্যারা! তোর ধাপ্পামারা বন্ধ করতো। তুইতো আমাকে করতে দেখিস্ নি, শুধু শুধু মিছে বলছিস্ কেন? উনি একজন জ্ঞানী মানুষ, কে সত্য বলছে আর কে ধাপ্পা দিচ্ছে, তা উনি ভালো করেই বুঝছেন। আমি যদি মিছে কথা বলে থাকিতো, আমার বিচার করা হোক। আইনে বলে……সব মানুষই সমান। পুলিশে আমার নিজের ভাইও কাজ করে, যদি জানতে চাও……"

"তর্ক কোরো না!" কনেষ্টবল বলে ওঠে গম্ভীরভাবে, "না এটা জেনেরালের কুকুর তো নয়। ওঁনার এরকম কোনো কুকুর নেই। ওঁনার সবই শিকারী কুকুর।"

"তুমি ঠিক জানো?"

"বিলকুল ঠিক্ হুজুর।"

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো! জেনেরালের কুকুররা হয় দামী কুকুর, ভালো জাতের কুকুর,……আর এটার দিকে একবার তাকাও…কি কদাকার দেখো, একেবারে খেঁকী কুত্তা। এমন কুকুর লোকে পুষবে কেন……মাথা খারাপ? এটা যদি মস্কো, পিটার্সবুর্গ হ'তো তাহলে কি হ'তো জানো? আইনের কেউ ধার ধারতো না, মুহূর্তের মধ্যে খতম করা হ'তো। ক্রাউইকিন, তুমি একজন ভুক্তভোগী, খেয়াল রেখো কোনোভাবেই ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। কুকুরের মালিককে শিক্ষা দেওয়া দরকার। অনেক সহ্য করা গেছে……"

সেপাই নিজের মনেই জোরে জোরে ব'লে ওঠে "মনে হচ্ছে, এটা জেনেরালের কুকুরই হবে। শুধু দেখেতো কিছু বোঝার উপায় নেই। এই রকম একটা কুকুরই দেখেছিলাম একদিন জেনেরালের বাড়ীর উঠানে।"

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে যেন গলা চড়ায়, "অবশ্যই এটা জেনেরালের কুকুর।"

"হুঁম্! এলডিরিন,………কোট্টা একটু ধরোত'……ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে যেন। বেশ শীত করছে। কুকুরটা নিয়ে যাও জেনেরালের কাছে। বলো যে আমিই পেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। হয়ত বা এটা খুবই দামী কুকুরছানা। ওঁনাদের বলো যেন কুকুরটাকে রাস্তায় না ছেড়ে দেন, এরকমভাবে সব বদমাইসই যদি একবার করে কুকুরটার নাকে ছ্যাকা দেয়, তাহলে তো কুকুরটা যে কোনোদিনই খতম হয়ে যাবে। কুকুরত' এমনিতেই হ'ল গিয়ে খুব দুর্বল জন্তু। আর এ্যাই মাথামোটা, হাত নামা, সকলের কাছে তোর কাটা আঙুল দেখানো বন্ধ করত'। এ হ'লো গিয়ে তোরই দোষ……"

"আরে ঐ ত জেনারেলের বড় রাঁধুনী এধারেই আসছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক……ওহে……প্রখোর বুড়ো, এধারে এ'সো ত। আখোত', কুকুরটা তোমাদের বুঝি?"

"হায় ভগবান, কোনো জন্মেও আমাদের এরকম কুকুর ছিলো না।" ইনস্পেক্টার অকুমেলভ বলে ও'ঠে—"আর কুকুরের মালিককে খোঁজাখুঁজি করার দরকার নেই। ওটা রাস্তার কুকুর। এখানে দাঁড়িয়ে জটলা করে আর লাভ কি? জানাই গেলো ত—বেওয়ারিশ কুকুর, ব্যাস্; কুকুরটাকে মেরে ফ্যালো, ব্যাপারটাও চুকিয়ে দাও।"

প্রখোর ব'লে চলে "এটা আমাদের নয়। এটা হ'লো গিয়ে জেনেরালের ভাই দিন কয়েক হ'লো এসেছেন, তাঁরই কুকুর। 'বোরজই' কুকুরে আমাদের জেনেরালের কোনো আগ্রহ নেই। ব্যাপারটা হলো ওঁনার ভাই-এর……উনি খুব পছন্দ করেন……"

"কি বলে? জেনেরালের ভাই মানে ভ্লাদিমির ইভানিচ্ এখানে এসেছেন?" অকুমেলভ গদগদ হ'য়ে বলে আর তার সারা শরীরে যেন শিহরণ লাগে "বোঝো ব্যাপারটা, আর আমিই কি না জানিনা। থাকবেন বুঝি এখানে?"

"আজ্ঞে ঠিকই ধরেছেন।"

"কি আশ্চর্য্য! ভাই-এর সাথে দেখা করতে এসেছেন আর আমিই কি না ব্যাপারটার খোঁজ রাখি নি। তাহলে এটা ওঁনারই কুকুর? খুবই আনন্দের কথা। চমৎকার কুকুর ছানাটি; নিয়ে যাওতো এটাকে। বলে কি ও'র আঙুল কামড়েছে? হাঃ—হাঃ হাঃ। কাঁপিস না………আয়, আয়।……গরর্ গরর্……আখো আখো ব্যাটা আবার রাগ আখাচ্ছে! কি সুন্দর কুকুরছানা!"

প্রখোর কুকুরছানাটিকে ডেকে নিয়ে কাঠের গোলা থেকে বেরিয়ে যায়। লোকেরা ক্রাউইকিনকেই ব্যংগ করে।

ইনস্পেক্টার অকুমেলভ তাকে শাসিয়ে যায়, "তোমাকে মজা দেখানো বাকী রইল" এবং একথা বলে ভালো করে গ্রেটকোটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে নিজের রাস্তা ধরে।

—অনুবাদক: উমাশঙ্কর চ্যাটার্জী

# বিক্ষুব্ধ শিক্ষাজগৎ

**দেশ :**

## ছাত্র

গত চোদ্দই মে মধ্য হাওড়ার নেতাজী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দুশোজন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে জেলা শাসকের বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরে পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। তাঁদের দাবী ছিল—স্কুলবাড়ীটা সারিয়ে দিতে হবে ও খেলাধূলোর জন্য এক টুকরো জমি দিতে হবে।

● গত একুশে মে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ আগুন লেগে পুড়ে যায়। গণ্ডগোল শুরু হয়, যখন ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে এসে দেখেন যে নিকটবর্তী এক মন্দিরে মেলা বসার জন্য পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। আগের দিন রাত্রি দশটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মোতায়েন করা প্রাদেশিক সশস্ত্র কনস্টেবুলারি (PAC)-র কর্মী ও ছাত্ররা একটি মিছিলে সামিল হন, ধ্বনি তোলেন "পি. এ. সি.-ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ", "ছাত্রদের উপর নির্যাতন চালানো চলবে না"। পরের দিন ভোর ছ'টা নাগাদ পি. এ. সি.-কে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আটটার সময় মিলিটারী আসে। দুটি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। গত পাঁচই মে পরীক্ষা শুরু থেকেই অসন্তোষের সূত্রপাত। নয়ই মে, "সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের" প্রয়োজনে একহাজার পুলিশ ও পি. এ. সি. প্রহরার বন্দোবস্ত করা হয়। ছাত্ররা সবসময়ই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশ ঢোকার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা আন্দোলন শুরু করেন। এগারো তারিখ থেকে পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়। পরে ষোলই মে "আগুন লাগানোর অভিযোগে" পঁয়ত্রিশ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে ছাত্র-সংসদের সভাপতি শ্রীরাভিন্দ্র সিং ও সম্পাদক শ্রীবলদেও চোধ্‌রী আছেন। উপাধ্যক্ষ পুলিশ মোতায়েনের ব্যাপারে শিক্ষকরা দোষী বলে অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে বেশ কিছু শিক্ষক এই হাঙ্গামার জন্য উপাধ্যক্ষকে দায়ী করেছেন।

● আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মনির্বাহক সমিতি গত পাঁচই মে ছ'জন ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। আরো চারজন ছাত্রকে দু'বছর ও তিনজন ছাত্রকে একবছরের জন্য সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে। বহিষ্কৃত ছাত্রদের মধ্যে ছাত্রসংসদের সভাপতি ও সহঃ সভাপতি আছেন। এই সব ছাত্রদের "অপরাধ"—তাঁরা কর্মনির্বাহক সমিতির সদস্যদের 'ঘেরাও' করেছিলেন ও উপাধ্যক্ষর বাড়ীর সামনে ধর্ণা দিয়েছিলেন।

● গত নয়ই মে, বি. এ., বি. এস্‌সি পার্ট-টুর ছাত্রছাত্রীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলারকে 'ঘেরাও' করেন। তাঁরা 'অসম্পূর্ণ ফল' প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট তারিখ দাবী করেন। পরে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (অ্যাকাডেমিক) ছাত্রছাত্রীদের প্রতিশ্রুতি দিলে, তাঁরা ঘেরাও তুলে নেন। ছয়ই জুনের সর্বশেষ খবর—বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও 'অসম্পূর্ণ ফল' প্রকাশ করেন নি। ফলে শত শত ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

● গত দশই মে বেলা বারোটা থেকে নবদ্বীপ কলেজের ছাত্ররা অধ্যক্ষকে 'ঘেরাও' করেন। পনেরো টাকা ল্যাবরেটারী ফি মকুবের দাবীতে ছাত্ররা আন্দোলনের এই পথ বেছে নেন। অন্যান্য দাবী-গুলির মধ্যে বিল্ডিং কমিটিতে ছাত্রপ্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির দাবীটি, অধ্যক্ষ মেনে নিয়েছেন। বারোই মে অবধি ঘেরাও চলে।

● শিক্ষাসংস্কারের দাবীতে গত সাতই মে পশ্চিমবাঙলার ছ'টা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল।

**বিদেশ :**

● থাইল্যাণ্ডের ছাত্রনেতারা তাঁদের মাতৃভূমিতে বিদেশী মার্কিনী সৈন্যদলের উপস্থিতির প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী প্রচার অভিযানের এক কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা করেছেন। থাই সরকারের সম্মতি-ক্রমে, বর্তমানে ৪৫০০০ মার্কিন সৈন্য সেদেশে আছে। ছাত্রনেতারা ঘোষণা করেন যে—থাইল্যাণ্ডকে মার্কিনীদের হাত থেকে মুক্ত করতেই

হবে ও লাওসের উপর মার্কিনীদের বেপরোয়া বোমাবর্ষণ আরেকটা 'ভিয়েতনাম' সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য বর্তমানে থাইল্যাণ্ডের সামরিক ঘাঁটিগুলি থেকেই লাওস ও কম্বোডিয়ার উপর বিমান আক্রমণ চালানো হয়ে থাকে। গত সাতই মে, থাইল্যাণ্ড জাতীয় ছাত্র কেন্দ্র (NSCT)-র সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীটিরায়ুথ বুমি দাবী করেছেন যে তাঁদের সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের সংখ্যা ১০০,০০০। ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, তিনি প্রচার আন্দোলনের খুঁটিনাটি প্রকাশ করতে অস্বীকৃত হন। মার্কিনী সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদ সম্ভবতঃ ছাত্র ও সরকারের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের সৃষ্টি করবে।

● গত নয়ই মে ইসলামাবাদে, প্রায় একশো জন আরবছাত্র লেবাননের দূতাবাসটি দখল করে নিয়ে, প্যালেস্তাইনের পতাকা উড়িয়ে দেন। তাঁরা, বেরুটের গেরিলা ঘাঁটিগুলির উপর লেবানন সরকারের সামরিক তৎপরতার প্রতিবাদে এই অভিযান চালান। পাকিস্তানের পুলিশ দূতাবাসের ভেতর প্রবেশ করে পঞ্চাশ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে। বেশ কিছু ছাত্র মাথায় আঘাত পান। এর আগে ছাত্ররা দাবী করেন যে লেবাননের রাষ্ট্রদূতকে দূতাবাস প্রাঙ্গণে একটি সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করতে হবে। বৈঠক আহূত হলে, ছাত্ররা সাংবাদিকদের বলেন: প্রতিক্রিয়াশীল লেবানন সরকার প্যালেস্তিনীয় বিপ্লবকে হত্যা করতে চাইছে। পরে পুলিশ সাংবাদিক বৈঠক ভেঙ্গে দিলে, ছাত্ররা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন।

● সাতই মে, পাকিস্তানের বামপন্থী ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে প্রায় পঁচিশজন সমানসংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী, রাওয়ালপিণ্ডির আমেরিকান সেন্টারের কাছে নিক্সনের একটা রঙীন ছবি দাহ করেন। তাঁদের পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্যাপী এই বিক্ষোভের উপর পুলিশ কড়া নজর রেখেছিল। কম্বোডিয়ার উপর মার্কিনীদের বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে তাঁরা এই বিক্ষোভ দেখান, স্লোগান দেন—"নিক্সন নিপাত যাক", "মার্কিনী কুকুর এশিয়া ছাড়ো।"

## শিক্ষক

**দেশ:**

গত পনেরোই মে বিকেল পাঁচটা থেকে প্রায় আড়াইশো মাধ্যমিক শিক্ষক চব্বিশ ঘণ্টার প্রতীক অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ধর্মঘটের শেষে ছ'জন শিক্ষকের এক প্রতিনিধিদল শিক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকের শেষে মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মী এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই আলোচনাকে 'অসন্তোষজনক' বলে অভিহিত করা হয়।

**বিদেশ:**

বাঙলাদেশের পাঁচশোটি বেসরকারী কলেজের শিক্ষকরা, সমস্ত কলেজ জাতীয়করণের দাবীতে, বারোই মে থেকে ধর্মঘট শুরু করেছেন। আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে, সরকারী মুখপাত্র জানান দাবীগুলি "পরীক্ষা করা হচ্ছে"। সরকার ও অধ্যাপকদের মধ্যে কোন আলোচনা শুরু হয়নি।

### ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবী

গত সাতই মে ইনডিয়ান আর্ট কলেজের তিনশ' ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী এবং কলকাতার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা মিছিল করে বিধানসভা অভিমুখে যান। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি দেন। কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনায় এই কলেজটি প্রায় আঠারো মাস যাবৎ বন্ধ আছে। তিনশোরও বেশী ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-কর্মচারী এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন। গত উনত্রিশে মে, কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত এক সভায়, তাঁরা ন্যায়সংগত আন্দোলনের সমর্থনে জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনতিবিলম্বে কলেজটি চালু করার ও সরকার কর্তৃক ওই কলেজ-এর পরিচালনভার গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়।

[সূত্র: আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, স্টেটস্‌ম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডারড্]

# খাদ্যসঙ্কটের কিছু "অপ্রকাশিত" তথ্য

[ বৈচিত্র্যে ভরা ভারতবর্ষের অন্যতম একটি বৈচিত্র্য হোল জোতদার-মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে যাঁরা ঘন ঘন রণহুঙ্কার দেন তাঁরা নিজেরাই সেই পাপচক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সক্রিয় অংশীদার। মহারাষ্ট্র প্রদেশে এই বেশরম, ঘৃণ্য কার্যকলাপের কয়েকটি নিদর্শন আমরা নীচে তুলে দিলাম। বলা বাহুল্য খোঁজ করলে এ ধরণের কাহিনী সমস্ত প্রদেশেই হাজারে হাজারে পাওয়া যাবে। কাগজে না বেরুলেও সাধারণ মানুষের অধিকাংশই নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এসব সত্যি বলে জানেন এবং বলেন। তবু সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার সরকারী নীতির সাফাই গাওয়াই যাদের কাজ, সে ধরণের সংবাদপত্রও এই সব কাহিনী প্রকাশ করতে বাধ্য হয়, তখন আর এগুলিকে "দেশদ্রোহীদের" উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচার বলে বর্ণনা করার কোন "সুযোগ" থাকে না। আর এসব সত্যি হলে উপদেষ্টা এইসব মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সমস্ত ধরণের বিদ্রোহই কি ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ হয় না? —সঃ মঃ বীক্ষণ ]

২৮শে এপ্রিল—মেলগাঁও, সিনার ও নাগপুরে ভুখা ও বেকার ...ষদের ( যাদের অধিকাংশই তাঁতশিল্পী ) যে হাঙ্গামার উপর পুলিশের ...লিচালনার ফলে ছ'জন নিহত ও শতশত আহত হন, সেটাই হয়তো রাজ্যে ( মহারাষ্ট্র—সঃ মঃ বীঃ ) এ ধরণের একের পর এক আরও ...রও অনেক গোলমালের শুরু।

শোনা যাচ্ছে নয়টি অভাব-পীড়িত জেলা ফেটে পড়ার অবস্থায় ...য়েছে এবং এটা হয়তো শুধু আরও একটু সময়ের ব্যাপার যখন ক্ষুধার্ত বেকার মানুষরা খাদ্যশস্যের গুদাম ও ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে ...মলা চালাবে এবং মেলগাঁও, সিনার ও নাগপুরে যেমন ঘটেছে সেই ...মভাবে খাদ্য ও কাজের দাবী নিয়ে হাজারে হাজারে তহশীলের সদর ...র ও কালেক্টরীগুলির দিকে অভিযান চালাবে।......

সূতার অভাবই ছিল মেলগাঁও ও নাগপুরে এই হাঙ্গামার আশু কারণ। ...লগাঁও ও নাগপুর হ'ল এই রাজ্যের শক্তিচালিত এবং হস্তচালিত ...টটি বড় তাঁতশিল্পকেন্দ্রের মধ্যে দুটি। সূতার অভাবেএই দুটি কেন্দ্রে ...ক্রমে প্রায় ১২,০০০ ও ২০,০০০ তাঁতী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

গত মার্চ মাস থেকে বয়ন-শিল্প কমিশনার তাঁতীদেরকে তাদের ...ওনা সূতা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তথাকথিত শক্তিচালিত তাঁতী ...বায়গুলি, যাদেরকে বে-আইনীভাবে সূতা তৈরীর অধিকার দেওয়া ...য়েছে, এই অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের মজুত সূতা কালোবাজারে ...ক্রি করছে। সূতার গোপন আড়ত যে আছে পুলিশের বক্তব্যেই পরিষ্কার,—তাঁরা তাঁদের বিবৃতিতে বলেছেন যে দোকান থেকে সূতা ...ঠ" করছে এমন শতশত লোককে তাঁরা হাতেনাতে গ্রেপ্তার ...রছেন।

গত কয়েকমাস ধরেই এই রাজ্যে খাদ্যপরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি ...ছে। এবং এমনকি কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী এ, পি, সিন্ধের ...ব্যক্তিও এই সেদিন শ্রীরামপুরে বলেছেন যে মহারাষ্ট্র সরকার বিগত ...স বছর ধরে রাজ্যের কৃষিকে অবহেলা করে আসছেন।

মেলগাঁও-এর অনাহার-পীড়িত মানুষের দুরবস্থার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হ'ল তাঁদের শ্লোগান : **"আমরা দিনে এক বেলা খেতে চাই।"** মেলগাঁও এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অন্যান্য অঞ্চলের মানুষরা এমনকি ত্রাণকেন্দ্রে কাঠফাটা রোদের মধ্যে শক্ত কায়িকশ্রমের কাজ করেও মাথাপিছু একবেলার খাবার পাচ্ছেন না। **মাথাপিছু প্রতিমাসে তাঁদের রেশনের পরিমাণ খুব বেশী হলে ৪ কে, জি,** কিন্তু ত্রাণকার্যের সামান্য বেতনের জন্য এবং বেশীরভাগ সময়ই তাও সময় মত না পাওয়ার ফলে তাঁরা প্রাপ্য এই রেশনও তুলতে পারেন না। প্রধানতঃ ভুট্টার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী এক ধরণের স্বাদহীন লেই-এর উপরেই তাঁরা বেঁচে আছেন। পেঁয়াজ, লবণ, আলু এমনকি লঙ্কাও তাঁদের সাধ্যের বাইরে, শহরের মত গ্রামেও এগুলির দাম দ্রুতবেগে উপরে উঠছে।

জোয়ার মহারাষ্ট্রের প্রধান খাদ্য। পশ্চিম উপকূলের লোকেরা নির্ভর করেন ভাতের উপর। জলগাঁও এবং অংশতঃ বিদর্ভে জোয়ারের এবং থানা ও কোলাবা জেলায় ধানের প্রচুর ফলন হয়েছে। সরকার যদিও খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা হাতে নেওয়ার কথা বলছেন, তবুও জোয়ারের একচেটিয়া সংগ্রহকে কার্যকরী করার দিকে এখনো পর্যন্ত কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছেনা, ফলে গমের তুলনায় কিলোপ্রতি জোয়ারের দাম বেড়েছে ৫০ পয়সা বা তারও বেশী।

জনসাধারণের কাছে জোয়ার অনেক বেশী সুবিধাজনক কারণ গমের সঙ্গে বাদাম তেল অথবা ঘি-এর প্রয়োজন, কিন্তু জোয়ার থেকে ভাক্রি তৈরী করতে তেল লাগে না। দুটো জিনিসই এখন বিলাসিতার পর্যায়ে পৌঁচেছে, কারণ প্রতি লিটার বাদাম তেলের দাম এখন ৬'৮০ পয়সা এবং নারকেল তেল ৮'৪০ পয়সা। সুতরাং রাজ্য সরকারের গম—গম বলে চেঁচানোটা কেন্দ্রের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। সরকার জোয়ারের একচেটিয়া সংগ্রহের দিকে কোন প্রচেষ্টা তো চালায়ইনি এমনকি জোয়ারের দামের দ্রুত উর্দ্ধগতি ঠেকাতেও ব্যর্থ হয়েছে।

**কালোবাজারী**

এরই সাথে যুক্ত হয়েছে অনাভাবী অঞ্চল থেকে অভাব-পীড়িত অঞ্চলে খাদ্যশস্যের ব্যাপক কালোবাজারী বন্ধে সরকারের ব্যর্থতা। উদাহরণস্বরূপ, নয়টি সর্বাধিক অভাব-পীড়িত জেলার সমবায় ক্রয়বিক্রয় সমিতিগুলিকে সরকার অনাভাবী জেলাগুলির কাছ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য বিশেষ পারমিট দিয়েছে। কিন্তু এই সমিতিগুলি যে-সব অঞ্চলে ঘাটতি নেই সেসব অঞ্চলের সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতি-গুলির সাথে সরাসরি লেনদেন করার বদলে বেসরকারী ব্যবসায়ীদেরকে এজেন্ট হিসাবে নিযোগ করেছে। এই এজেন্টরা যে-সব অঞ্চলে ঘাটতি নেই সেখানে গিয়ে সেখানকার সমিতিগুলির কাছ থেকে এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করে অভাব-পীড়িত অঞ্চলের কালোবাজারে বিক্রি করছে।

কিছু কিছু খাদ্যশস্যের উপর লেভী চাপান'র কার্যক্রমটি যেভাবে কাজ করছে, তা জনসাধারণের চোখ খুলে দেখবার এবং হতাশার পেছনে আরও একটি কারণ হিসাবে কাজ করেছে। ধনী কৃষক ও জমিদারেরা এই কার্যক্রমটিকে, যেটা অনুযায়ী তাদের উৎপাদিত ফসলের ⅓ ভাগ লেভী হিসাবে দেওয়ার কথা, এড়িয়ে গিয়ে তাদের উৎপাদন খোলাবাজারে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি করে চলেছে। উদাহরণ হিসাবে, মারাঠি সংবাদপত্রগুলিতে বিধানসভার একজন জনসংঘ সদস্যকে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যিনি অভিযোগ করেছেন যে **মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি, পি, নায়েকের পরিবার ১,০০০ বস্তা খাদ্যশস্য ঘরে তুলেছেন, কিন্তু লেভী হিসাবে দিয়েছেন মাত্র ৫০ বস্তা। আর একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, শ্রীপারবেকার, যিনি একজন বড় জমিদার, মাত্র ৩০ বস্তা দিয়েছেন। এই অভিযোগগুলি ইংরাজী পত্রিকা গুলিতেও বেরিয়েছে, কিন্তু না শ্রীনায়েক না শ্রীপারবেকার, কেউই এগুলি অস্বীকার করেন নি।**

**অন্যদিকে, ছোট কৃষকদের কাছ থেকে লেভী আদায় করা হয়েছে নিখুঁতভাবে এবং প্রায় নির্দয়ভাবে।** কার্যত, এই প্রকল্প এত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে যে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীমাধুকর চৌধুরী এক জনসভায় স্বেচ্ছায় তাদের লেভী দিয়ে দেওয়ার জন্য বড় কৃষকদের কাছে আক্ষরিক অর্থে ভিক্ষা চেয়েছেন। শোনা যায় তিনি তাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন: **"আপনারা কী চান যে খাদ্যশস্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আমরা আমাদের মা-বোনেদের বন্ধক রাখব?"**

**উন্নততর নয়**

বোম্বে শহরের অবস্থাও এর চেয়ে কিছু ভালো নয়। ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির সামনে দীর্ঘ, আঁকাবাঁকা লাইনগুলি একটা অসাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়েছে এবং অনেক সময়ই জনসাধারণকে বাড়ী ফিরে যেতে হয় খালি হাতে অথবা কাঠফাটা রোদে আর একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরদিন তাদেরকে আবার আসতে বলা হয়। মাথাপিছু খাদ্য পরিমাণ কমে ১৯৬৭-৬৮ সালের ৪০৫ গ্রাম থেকে ১৯৭১-৭২ সালে গ্রামে এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ১৬০ গ্রামে দাঁড়িয়েছে।……

**এই খাদ্যাভাবের গোটা কাণ্ডকারখানার সবচেয়ে আ দিক হ'ল, যাদের টাকা আছে তাদের জন্য শহরের ভেতর বাইরে খাদ্যশস্য সহজলভ্য।** খাদ্যশস্য চলাচলের উপর নিষে এড়াবার জন্য মজুতদাররা সহজতম যে কৌশলটি অবলম্বন করেছে হ'ল কুষ্ঠরোগী সহ বিরাট বিরাট ভিক্ষুকবাহিনী নিয়োগ, যাদে শহরের ভেতরের ও বাইরের স্টেশনগুলি দিয়ে মালপত্র আ প্রদানের জন্য রেলের সিজিন পাশ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ব্য ব্যক্তিগত ভোগের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে যাত করতে পারেন। সুতরাং, এই ভিক্ষুকরা দিনে বেশ কয়েকবা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য সঙ্গে নিয়ে যাতায়াত করে এবং সেগুলি বে মহাজনদের কাছে চালান দেয়। এইভাবে হাজার হাজার কু চাল ও গম প্রতিমাসে বোম্বে শহরে আসে এবং যে কোন জায়গ টাকা থেকে ৯ টাকা কে, জি, দরে বিক্রি হয়।…………

কেন্দ্র রাজ্যকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য দিচ্ছেনা বলে মুখ শ্রীনায়েক অভিযোগ করেছেন। পৌর সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী. জি, ভাড়তকে ভাষ্য অনুযায়ী এই রাজ্যই কেন্দ্রের কাছ থেকে সব বেশী খাদ্যশস্য পায়, যিনি বিধানসভায় বলেছেন যে সরকারের প্রচেষ্টার ফলেই মহারাষ্ট্রের পক্ষে কেন্দ্রের কাছ থেকে সর্বাধিক খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে।

**মূল কারণ**

**জনসাধারণ ক্রুদ্ধ, হতাশ এবং হিংসার আশ্রয় নি প্রস্তুত, কারণ তাঁরা জানেন যে রাজ্যে খাদ্যশস্য আছে। তাঁ তা মজুত হতে দেখছেন, তাঁরা তা নষ্ট হতে দেখছেন এবং বড় বিলাসবহুল হোটেলগুলির উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের পড়ছেন যেখানে 'গণ্যমান্য' ব্যক্তিরা, যাঁরা জনসাধারণ সংযমী হতে উপদেশ দেন, এই ধরণের ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানগু ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে একটি মাত্রও নিন্দাবাদ না ক সেগুলির সভাপতিত্ব করছেন। খাদ্যশস্য থাকলেও চড়াদামে তা কেনার মত অর্থ তাদের নেই।**

এসব ছাড়াও, ক্ষমতাসীন দলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আ এমন ব্যক্তিরা এমন সব ভয় দেখান যা সাধারণ মানুষের জঠরে মারারই সামিল। সারাভারত খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সমিতির সভা এবং কংগ্রেসের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট শ্রীদেবজী রওনসেত 'ইকনা

( শেষাংশ ৪০ পৃষ্ঠায় )

# পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ

### [স্ব]-নির্ভরতা"র পথে

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে বৈদেশিক সাহায্য [দ]শে ঢুকতে শুরু করে। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোতে এই সাহায্যের [প]রিমাণ ছিল নিম্নরূপ :

| | | বৈদেশিক সাহায্য |
|---|---|---|
| প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্য্যন্ত | — | ২০০ কোটি টাকা |
| দ্বিতীয় „ „ | — | ১,৪৩০ „ |
| তৃতীয় „ „ | — | ২,৮৬৭ „ |
| হলিডে ( Holiday ) পরিকল্পনা | — | ৩,২২২ „ |

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড—৫।৩।৭২

* * *

### [ভা]রত—ভেজাল-কারবারীদের স্বর্গ

ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ২,০০০ লোক ভেজালের ফলে মারা [যা]ন। গত বৎসর খাদ্য থেকে শুরু করে ওষুধ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জিনিসে [প্রা]য় ২০০,০০০টি ছোট-বড় ভেজালের ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। [কি]ন্তু উপযুক্ত আইন ও প্রমাণের অভাবে এই অপরাধীদের শতকরা [এক]জনকেও শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অমৃতবাজার পত্রিকা—২।৬।৭৩

* * *

### [ভে]জালের প্রতিযোগিতা

সেণ্ট্রাল কমিটি ফর ফুড্ স্ট্যাণ্ডার্ড—(Central Committee for [Fo]od Standard) এর তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যের [শ]তকরা ভেজালের পরিমাণ হলো :

বিহার ৬৬·৭%, হিমাচল প্রদেশ ৬৩·৪%, মধ্যপ্রদেশ ৫৫·৭%, [রা]জস্থান ৪৬·৪১%, ওড়িষ্যা ৪১·৮%, মহারাষ্ট্র ৪১·৪%, মাইশোর [..]·১%, অন্ধ্র ৩৭·৮, দিল্লী ৩৭%, পশ্চিমবঙ্গ ৩২·৩%, ত্রিপুরা ৩১·২%, [কে]রালা ২৬·৪%, তামিলনাড়ু ২৬·৪%, পাঞ্জাব ২২·২% এবং উত্তরপ্রদেশ [..]·১%।

স্টেট্‌সম্যান—১৮।৪।৭৩

* * *

### [বে]কার প্রসঙ্গে

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি তাঁর 'জবস্ ফর দি মিলিয়নস' গ্রন্থে বলেছেন—কর্ম-হীন সমস্ত লোকের কর্ম-সংস্থানের মতো কোনও সামগ্রিক পরিকল্পনাই আজ পর্য্যন্ত এদেশে হয়নি। অথচ বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

বেকার সমস্যা পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে মারাত্মক, বলেছেন শ্রীবিজয় ভগবতী ( চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় সরকারের বেকার বিশেষজ্ঞ কমিটি )। পশ্চিমবঙ্গে বেকার সংখ্যা ৪৫ লক্ষ—হিসাবটা দিয়েছেন সি. এম. ডি এ এবং সি. এম. পি. ও। ওদিকে রাজ্য যোজনা পর্ষদের মতে বেকার এ রাজ্যে ২৮ লক্ষের বেশী হবে না। আবার রাজ্যসভায় প্রদত্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমোহন ধাড়িয়ার হিসাব মত—পঃ বঙ্গে বেকার সংখ্যা ৪,৪৮,৩২৯ ( ১৯৭২-এর ৩০ জুন পর্য্যন্ত )।

ডঃ জয়নাল আবেদিনের একটি হিসাব মত পশ্চিমবঙ্গে বছরে আড়াই লক্ষ বেকার সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে শিক্ষিত ২ লক্ষ। গ্র্যাজুয়েট ৮০ হাজারেরও বেশী। কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন বেকার—আড়াই হাজার। অথচ এ রাজ্যে বছরে দশ হাজারের বেশী লোকে কাজ পায় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা—৩০।৫।৭৩

* * *

### ভারতে শতকরা ৫০ জন শিশু অপুষ্টিতে ভোগে

ইণ্ডিয়ান হেলথ্ মিনিস্ট্রির ( Indian Health Ministry ) পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে এক থেকে ছয় বছর বয়ঃক্রমের ১০০ লক্ষ শিশুর শতকরা ৫০ জন অপুষ্টিতে ভোগে। এই শতকরা ৫০ ভাগের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ২৫ জন শিশুর মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা এরা যকৃত, পাচনতন্ত্র, হৃদ এবং চোখের রোগে ভুগবে।

অমৃতবাজার পত্রিকা—২।৬।৭৩

* * *

### ভারতে মানসিক রোগাক্রান্ত কত ?

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ ( Indian Council of Medical Research )-এর অধিকর্তা ডঃ আর. এন. ওয়াহির বক্তব্য অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যার ১৩ লক্ষ লোক মানসিক অসুস্থতাতে ভোগেন। অর্থাৎ মানসিক রোগীর সংখ্যা প্রতি ১০০০জনে ২৩·৭৯ জন।

অমৃতবাজার পত্রিকা—১৮।১।৭৩

# চিঠিপত্র

**মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন**

[ পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা ও শুভার্থীদের কাছ থেকে ডাক মারফৎ আমরা যে সব চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা ইত্যাদি পাচ্ছি, তার বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোন ঠিকানা না থাকায় তাঁদের সাথে আমাদের পক্ষে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ এটা জরুরী। পাঠক-পাঠিকা ও শুভার্থীদের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা যেন তাঁদের চিঠিপত্রে যোগাযোগের উপযুক্ত ঠিকানা দেন। প্রসঙ্গত উপযুক্ত ডাকটিকিট দেবার জন্যও অনুরোধ করছি। পত্রিকার আর্থিক দুরাবস্থাই এই অনুরোধের কারণ। —বীক্ষণের সম্পাদকমণ্ডলী ]

## বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের পথ

আমার মা-বাবা এবং শিক্ষক মহাশয়দের প্রভাব ছাড়া যখন নিজের মনে স্বতন্ত্র চিন্তা করার বা বাস্তবের ঘটনাগুলোকে বিচার করার একটা সাবলম্বী ভাব এলো, তখনও আমি পড়ুয়া মেয়ে। নিজের পড়াশুনাটাকেই বেশী মূল্য দিতাম। মনে মনে একটা আদর্শ স্বপ্নের জাল বুনতাম। বড় হয়ে ডাক্তার হওয়াই আমার জীবনের একান্ত অভিলাষ ছিল। ভাবতাম একটা পরিশ্রমী এবং কর্মঠ জীবন যাপন করবো। অবশ্য গরীব, অসহায়, বঞ্চিতদের প্রতি আমার চিরকালই বেশী মনযোগ ছিল। কিন্তু তাছাড়াও আমার লক্ষ্য ছিল বিদেশভ্রমণ—বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখা—ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের সাথে একটা ছোট বাড়ী করে থাকা। সেখানে বিশ্বের সুন্দর এবং আশ্চর্য্য জিনিষ সংগ্রহ করে রাখা। সেখানে একটা ছোট পাঠাগার স্থাপন করে, বিশ্বের বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি সংগ্রহ করে রাখা, যেগুলো আমাদের অবসর সময়ে মনের খোরাক মেটাবে।

কিন্তু একদিন আবিষ্কার করলাম আমার এই স্বপ্নময় কল্পনা বিবেকের সমর্থন পাচ্ছে না। আমি কি রকম উদাসীন, মাঝে মাঝে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি। একটা মানসিক অস্থিরতা উপলব্ধি করতে লাগলাম। দেশের সর্বশেষ রচিত ইতিহাসের ঘটনাগুলো আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আঘাত হেনেছে। 'তাঁদের' এই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ আমার এই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারাকে যেন ধিক্কার দিচ্ছে। প্রত্যহ দৈনন্দিন পত্রিকার আশায় প্রহর গুনতাম—রাত পোহালে আবার কি সর্বনাশের খবর পাবো? এই ভয়াবহ শোষণের জাঁতাকল ভাঙার প্রচেষ্টায় আবার কত রক্তের মাশুল দিতে হ'ল? এইভাবে আমার ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বপ্নবিলাসে ভাঁটা পড়ল। মনের মধ্যে একটা আবদ্ধের জ্বালা অনুভব করলাম। কিন্তু এই পচাগলা সমাজের শি[illegible] ব্যবস্থার কারসাজিতে আমি আমার এই স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাধারা অবলম্বন করে এগোতে পারিনি। একে সুপ্ত অবস্থায় রেখে আমা[illegible] উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে হয়েছে, এবং ভাল ফলেরও আ[illegible] করেছি। কারণ তখনও আমি আমার উচ্চাভিলাষের মোহ কাটি[illegible] উঠতে পারিনি। তাছাড়া আমার অশান্ত মনকে সান্ত্বনা দিয়ে[illegible] এই বলে যে—এই মুক্তির লড়াইয়ে বিশ্বস্ত ডাক্তারদেরও প্রয়োজ[illegible] অবশেষে ফল বেরোলো। আশায় আশায় রইলাম—ডাক্তারী[illegible] সুযোগ পাবো। কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন—কয়েকটা নম্বরের জন্য আম[illegible] সুযোগ হ'ল না। ইচ্ছাশক্তিতে তখনও আমি বিশ্বাসী—ভাবল[illegible] জীবনের এই প্রথম পরীক্ষায় আমি কখনও হার মানবোনা। কা[illegible] এর ওপর নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যৎ কর্মধারা। আমি একজ[illegible] মেয়ে, স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হলে আমাকে সাবলম্বী হ[illegible] হবে, আর সেক্ষেত্রে এই পেশাকেই আমি উপযুক্ত বলে মনে ক[illegible] ছিলাম। সুতরাং শুরু হ'ল আমার ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রা[illegible] পরের বছর মেধার ভিত্তিতে পরীক্ষা হ'ল এবং তাতে উত্তীর্ণ হয়ে আমি মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেলাম।

কিন্তু এরপরই আবার সেই সুপ্তচিন্তাটা নাড়া দিয়ে জেগে উঠল। এরমধ্যে জীবনের এই বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে এই চিন্তাশক্তিটা অনেক পরিণতি লাভ করেছে। এখন স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তাগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি; সমষ্টিগত স্বার্থচিন্তাই আমার মনকে জেঁকে বসেছে। দিন দিন তার শিকড় মনের আরো গভীরে জাল বিস্তা[illegible] করছে। আমার মনে জানার স্পৃহাটা অনেক বেড়ে গেছে; সবকিছু অনুসন্ধান করে যথার্থ যুক্তির কষ্টিপাথরে সত্যকে যাচাই করে নিতে

শিখেছি। তাছাড়া নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতর বিকাশকে বেশী মূল্য দিতে শিখেছি—এতে মনোবল অনেক বাড়ে। মনোবলই প্রকৃত বল, যা মৃত্যুর মুখেও লড়াই করার শক্তি জোগায়। এইরূপ মনোবস্থায় "বীক্ষণ" প্রভৃতি আরও কয়েকটা সাংস্কৃতিক পত্রিকা মনের যথার্থ খোরাক জোটায়। এর মধ্য দিয়ে এই বিকাশমান মনগুলি সুসংগঠিত হতে পারে। তাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে রস আহরণ করে এই পত্রিকাগুলোকে আরও সঞ্জীবিত করার দায়িত্ব আমাদের। আমি জানি আমার মত হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে সচেতনভাবে গড়ে তুলছে। হয়ত খুব কমজনই তা ভাষায় রূপ দিচ্ছে। আমার আশা, আমার এই লেখা সেই অজস্র বিকশিত মনগুলোকে সংগঠিত করার কাজে 'পজিটিভ্ ক্যাটালিস্টে'র কাজ করুক। আমাদের জীবনের কোন মূল্যবান ঘটনাই যেন আমরা উপেক্ষা না করি। প্রতিটি সামাজিক ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষার রস নিংড়ে নিয়ে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলবো, যাতে এই গলিত সমাজব্যবস্থাকে তার ছিব্‌ড়েগুলো উপহার দিয়ে তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারি, আর সেই ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তুলতে পারি এমন এক সমাজ, যে সমাজে মানুষকে সত্য উপলব্ধি করার জন্য আমাদের মত এই পীড়াদায়ক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যেতে হবে না, যে সমাজে প্রতিটি সুস্থ মানবশিশুই জন্মলগ্ন থেকে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থচিন্তার এই বিষাক্ত পরিবেশের বদলে সমষ্টিগত স্বার্থচিন্তার মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠবে।

॥ জনৈকা ছাত্রী / কলকাতা ॥

## সরকারের "সমাজবাদী" নীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

গত ৩১শে মে ভারতে দুটি অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে। একটি হ'ল বিমান দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটি ঘটে দিল্লীর খুব কাছেই এবং ৮৭ জন যাত্রী এতে নিহত হন। আর অন্যটি হ'ল বোম্বাইয়ের উত্তর শহরতলীতে অবস্থিত মালাদ স্টেশনে দুটি লোকাল ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ। এক্ষেত্রে ১৫ জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং শতাধিক ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, মোট নিহতের সংখ্যা এক্ষেত্রে ৬৬ জনেরও বেশী হতে পারে।

ভারতে একমাত্র উচ্চবিত্তের ব্যক্তিরাই বিমানভ্রমণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। এবং বিশেষ এই বিমানটির আরোহীদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলম এবং অন্যান্য আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। আর যাঁরা লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেন, তাঁরা সাধারণতঃ নিম্নবিত্তের মানুষ।

রেল ও বিমান—দুটিই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা। কাজেই এদের অনুসৃত নীতিগুলিকে সরকারী নীতি হিসাবেই গণ্য করা যায়। এই উভয় সংস্থাই, যাঁরা এই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ক্ষতিপূরণ যদিও কোনক্রমেই জীবনের পরিপূরক নয়, তথাপি এর মধ্যদিয়েই আমরা যাঁরা এই দুর্ঘটনাগুলির শিকার হয়েছেন তাঁদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও দায়িত্বের চরিত্র কি তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে অনুসৃত নীতিগুলি কি ধরণের?

ভারতীয় বিমান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, এই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রীর পরিবারকেই ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে। এবং নিহতদের মধ্যে যাঁদের বয়স ১২ বছরের নীচে, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে দেওয়া হবে ৫০,০০০ টাকা। আর যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসার জন্য মাথাপিছু দিনে ১০০ টাকা করে অথবা ন্যূনতম পক্ষে ২০,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

ঐ একই দিনে দক্ষিণ রেলের একজন মুখপত্র ঘোষণা করেছেন যে রেল কর্তৃপক্ষ, এই রেল দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে ৫০০ টাকা এবং যাঁরা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে মাথাপিছু ৪০০ টাকা করে এককালীন সাহায্য হিসাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

—সরকারী অভিধানের সমাজতান্ত্রিক নীতির অর্থের সাথে এটাই হয়ত ঠিকভাবে খাপ খাচ্ছে!

॥ নির্মল পাত্র / কলকাতা ॥

## "বীক্ষণ প্রসঙ্গে"

বীক্ষণ, মার্চ সংখ্যা পড়লাম। এই জাতীয় পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা এই মুহূর্তে অত্যন্ত বেশী, তাই প্রথমেই আপনাদের প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আজকের দিনে প্রগতিশীল সাহিত্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। অপসংস্কৃতির বেড়াজাল ভেঙ্গে অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আজ সংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্তু একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে গণটোকাটুকি বা মার্কশীটে ভোজবাজী আজকের প্রধান সমস্যা নয়। আর শিক্ষাব্যবস্থার মুখোশ পাল্টে এর চরিত্র পাল্টানো যাবে না। ভারতবর্ষের মত আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী হয়েছে শোষকদের শ্রেণীস্বার্থে, কাজেই এটাকে জোড়াতালি দিয়ে এগার ক্লাশকে দশ ক্লাশ করে এর চরিত্র গোপন করা যাবে না। তাই আমাদের মূলের দিকে

অর্থনৈতিক ভিত্তিপ্রস্তরের উপর। কাজেই আমাদের সেই শোষণ-ভিত্তিক সমাজকে পাল্‌টে দেবার কথা চিন্তা করতে হবে। আর পত্রিকা করবে তারই দিকনির্দেশ।

পত্রিকাতে আরো বেশী ভাবে ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমার বিশ্বাস। 'মানবতার বধ্যভূমি ভিয়েতনামে'র প্রথম অংশে যুদ্ধের ভয়াবহতাকেই বড় করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে, পাশাপাশি প্রতিরোধের কথা সোচ্চার-ভাবে বলা হয়নি। ভিয়েতনামে নৃশংসতাই শুধু সত্য নয়; সেখানে ইস্পাতদৃঢ় প্রতিরোধ আরও বড় সত্য। পাটনার ছাত্র আন্দোলনের রিপোর্ট পড়ে ভাল লাগল। এই জাতীয় রিপোর্ট প্রকাশের প্রয়োজন আজ আছে। এর জন্য অভিনন্দন আপনার প্রাপ্য। 'একটি বিজ্ঞান সম্মেলনের রিপোর্ট' সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। গল্পগুলি নির্বাচনের জন্য প্রশংসা আপনাদের প্রাপ্য। কারণ প্রত্যেকটি গল্পই রসোত্তীর্ণ। 'বর্ষশেষের বজ্রনির্ঘোষ', 'পরিসংখ্যানে দেশ বিদেশ' ও 'পত্রপত্রিকার দর্পণে', লেখাগুলো অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়েছে।

পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা চমৎকার, তবে ভিতরে বহুপাতার অর্ধেক বা আরও বেশী অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে। এ জাতীয় পত্রিকা প্রকাশে যখন অর্থ নৈতিক সংকট আছে তখন এ জাতীয় বিলাসিতার কোন অর্থ হয় না।

অভিনন্দনসহ,—

॥ প্রতীক বসুরায়/বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ॥

২

'বীক্ষণে'র একটি সংখ্যা হাতে পেলাম। পড়ে মোটামুটি লাগল। এবং এটাই মনে হোল, আপনারা অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পা বাড়াতে চেষ্টা করছেন। আমাদের দেশের, অর্থাৎ কিনা আমি কেবল মানচিত্রের কথাই বলতে চাইছি—(আমাদের চিন্তা কাজ বিশ্ব-শোষিতের সাথে) শোষিত-লাঞ্ছিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেরও বর্তমান সংগ্রামী অবস্থা প্রশাসন যন্ত্রের নিখুঁত চেহারা—মেকী সমাজতন্ত্রীদের মুখোশ—শোষকের শেষ কামড়ের অবস্থাটা এই "বীক্ষণ" পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে "দর্পণ" এর মতো কাজ করলেই, "বীক্ষণ" সংখ্যা-গরিষ্ঠের মুখপত্র হতে পারবে। তা না হ'লে তথাকথিত "বুদ্ধিজীবিদের" মুখপত্র অর্থাৎ—সংখ্যালঘিষ্ঠের পা চাটা সেবাদাস হয়ে পড়বে। সাহিত্য জন-জীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থারই দর্পণ হবে। তা সবসময় হবে জনসাধারণের স্বার্থে। সেখানে পৃথিবীর খেয়ে কল্পনার রাজত্বে বিচরণ করা চলবে না। প্রতিটি লেখক-কবি-প্রবন্ধকারকেই রাজনীতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্জন করতে হবে। তবেই সঠিক অবস্থাটা স্লোগানধর্মী না হয়ে পড়ে তার দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। অর্থাৎ তার মধ্যে শিল্পগুণ থাকা চাই। পৃথিবীতে রাজনীতিবর্জিত, অর্থনীতিবর্জিত কিছু থাকতে পারে না। তাই আশাকরি "বীক্ষণ" তথাকথিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে না। তবেই "বীক্ষণ" সংখ্যাগরিষ্ঠের মুখপত্র হয়ে উঠবে।

আন্তরিক অভিনন্দনসহ—

॥ কল্লোল রায় / নদীয়া ॥

## "ব্রেশ্‌ট পরিচিতি"

সম্পাদক সমীপেষু,

বীক্ষণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (এপ্রিল, ১৯৭৩) বার্টল্ট ব্রেশ্‌টের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে। লেখক সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত দ্রুত কতগুলো বিবরণ দিয়ে গেছেন, যা উপযুক্ত ব্যাখ্যার অভাবে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে। যেমন কুড়ি পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে "স্কুল জীবনে ব্রেশ্‌টের একটি ঘটনা বেশ মজার...... শ্রেণীতে ওঠার বাধা বেশ কমত"—অত্যন্ত আড়ষ্ট ভঙ্গীতে লেখা এই তথ্যের উপস্থাপনার পেছনে কোন ব্যাখ্যা নেই। লেখক এর দ্বারা ব্রেশটের চরিত্রের কোন বিশেষত্বের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন? আবার ঐ কলমের একেবারে শেষে "ব্রেশট পার্টির আদর্শের প্রতি আত্মনিয়োগ করলেন..........১৯১৯ সালের স্পার্টা-কিস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করা হ'ল," এই অংশটুকু জার্মানীর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ও অপরিচিত, উভয়শ্রেণীর পাঠককেই কি বিভ্রান্ত করবে না?

লেখকের মন্তব্য আরও বিভ্রান্তিকর। তিনি লিখেছেন "১৯২৭ সালে প্রকাশিত হল ব্রেশ্‌টের কবিতা সংকলন Domestic Breviary," যাতে দেখা গেল প্যারী কমিউনের কবি "Rimband আর Villon এবং Kipling এর ছায়া"। Domestic Breviary-র কবিতাগুলিতে দেখা গিয়েছিল একধরণের নৈরাজ্য-বাদ, যদিও সে নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে র‍্যাঁবোর মনোধর্মের সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। কিন্তু আমার আপত্তি র‍্যাঁবোকে 'প্যারী কমিউনের কবি' এই বিশেষণে বিশেষিত করায়। এর দ্বারা র‍্যাঁবোর ওপর যে গৌরব আরোপ করা হয়েছে, তা অসত্য এবং অনভিপ্রেত—যা পাঠককে ভুল ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করবে। র‍্যাঁবোর সমগ্র সাহিত্য-কর্মের মধ্যে প্যারী কমিউনের বৈপ্লবিক উদ্দীপনার কোন প্রভাব নেই, প্যারীর বিপ্লবের সময় তিনি ছিলেন শার্লভিলে, প্যারীতে নয়; শোনা যায় তিনি একটি কমিউনিষ্ট সংবিধান রচনা করেছিলেন, কিন্তু তা

পাওয়া যায়নি ; র‍্যাবো প্যারী কমিউনের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত ছিলেন, ইতিহাস তা বলে না, তাঁর কবিতা তা বোঝায় না, তাঁর পরবর্তী-কালের চোরাই বন্দুক-ব্যাবসায়ী জীবন তা প্রমাণ করে না। অথচ সত্যরঞ্জনবাবু এহেন র‍্যাবোকে 'প্যারী কমিউনের কবি' বানিয়ে ছেড়েছেন। সর্বোপরি তিনি ব্রেশটের কবিতায় যা দেখেছেন, তা সাদৃশ্য নয়, ছায়া। এটা কি ব্রেশটের প্রতি সুবিচার! তিনি র‍্যাবোর সঙ্গে আরও দুজনের নাম করেছেন, ভিলোঁ ও কিপলিং। ফরাসী সাহিত্যের বিতর্কিত কবি ভিলোঁর ব্যক্তিজীবন যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন, ব্রেশটের Domestic Breviary-র কাব্যবিষয়ের সঙ্গে তাঁর কবিতার কোন মিল নেই। আর সাম্রাজ্যবাদী কিপলিং-এর ছায়া ব্রেশটের কোন কবিতায় তা সত্যরঞ্জনবাবু একটু জানাবেন কি?

ব্যাখ্যাহীন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সত্যরঞ্জনবাবু অযোগ্যকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন, ব্রেশটকে ভুলভাবে তুলে ধরেছেন, বীক্ষণের পাঠকের পক্ষে যা মোটেই শুভ নয়।

অভিনন্দন সহ —

॥ ইন্নাবান বসুরায় কলকাতা ॥

## লাল-সবুজের দেশে

| ১ |

'বীক্ষণে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (এপ্রিল'৭৩) প্রকাশিত 'লালসবুজের দেশে' লেখাটি মনযোগ দিয়ে পড়লাম। লেখক এটিকে পরিদর্শকের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে দাবী করলেও একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে অনেকগুলি মূল দিকে এটি কল্পনাপ্রসূত (খুব সম্ভবতঃ পূর্বনির্ধারিত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় এটা হয়েছে) এবং তারই ফলে মূল তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এটি সত্যের বিকৃতি ঘটিয়েছে। প্রত্যক্ষদ্রষ্টার বিবরণও সত্যকে তুলে ধরে না যখন তা উপর উপর দেখা জিনিষের মনগড়া ব্যাখ্যায় পরিণত হয়। চৌরঙ্গীর গগনচুম্বী অট্টালিকা আর ছিমছাম পথঘাট দেখার পর যদি কেউ ভুল করে ঐগুলিকে সাধারণের বাসস্থান ভেবে কলকাতার ছবি আঁকতে যান, তবে তা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হলেও কখনও কলকাতার আসল বর্ণনা হতে পারে না। সত্য সংগতিপূর্ণ এবং তার সার্বজনীন দিকও আছে, তাই অনেক ঘটনা চাক্ষুষ না দেখেও তার বিবরণকে বিশ্লেষণ করা যায়। 'লালসবুজের দেশে' লেখাটি বিশ্লেষণ করলেই তার অসঙ্গতিপূর্ণ দিকগুলি ফুটে উঠে।

লেখকের বিবরণ থেকে মনে হয় অধুনা 'স্বাস্থ্যে ঝলমল' উন্নতি-শীল যে সমস্ত চাষীদের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন, তাদের অনেকেরই প্রাথমিক অবস্থান হ'ল ক্ষেতমজুর থেকে আরম্ভ করে মাঝারী চাষী পর্যন্ত (মূলতঃ গরীব চাষী)। উন্নত বীজ, সার আর সেচের মাধ্যমে 'সবুজ বিপ্লবের' ফলে তারা না কি এই অকল্পনীয় উন্নতি করেছে। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক প্রথায় চাষ করে যে উৎপাদন অনেক বাড়ানো যায় এ সত্যটিকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। উপযুক্ত অবস্থায় 'সবুজ বিপ্লব'কে রূপায়িত করা যায় তাও সত্যি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, গরীব চাষীরা কি এমন এক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে যেখানে তারা সবুজ বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করে তুলতে পারবে? ভারতবর্ষের সমাজ সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য জ্ঞান রয়েছে তাঁরাই জানেন যে, ভারতের গরীব চাষীরা এক ভয়ানক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছেন—এমনই দারিদ্র্য যে সরকারী পরিসংখ্যান মতেই তা দারিদ্র্যসীমারও নীচে। এর কারণ শুধু আয়ের স্বল্পতা নয়, এই আয়ের অনিশ্চয়তাই নয়, তারই সাথে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে আছে ঋণের জাল। ফলে জীবনযাত্রার অতি প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলিও তাঁরা মেটাতে পারেন না। এহেন একজন চাষীর পক্ষে উন্নত প্রথায় চাষ করে উন্নত হওয়ার সুযোগগুলি কিভাবে গড়ে উঠবে?

লেখক লকলক্ করা সবুজ গমের ছবি আঁকতে গিয়ে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি যে এই ফসল ফলানোর জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার, সেচ ইত্যাদির জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন তার যোগান কিভাবে আসছে? সারা বছরই যাদের ভয়ানক অভাব অনটনের মধ্যে চলে, অস্তিত্ব রক্ষা করাই যেখানে সমস্যা সেখানে তো উন্নত প্রথায় চাষবাস করার জন্য মূলধন তোলা থাকতে পারে না। লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী কৃষিবিভাগ থেকে তারা নাকি উন্নত ধান এবং দোআঁশলা (হাইব্রিড) গমের বীজ পেয়েছে! প্রশ্ন—এটা দান খয়রাতি না নগদ মূল্যে কিনতে হয়েছে? তাছাড়া বীজ হলেই তো হবে না, এ'সব বীজের পিছনে প্রচুর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়, যা বিনা পয়সায় মেলে না। ধরে নেওয়া যাক সরকার সহজসর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করেছেন (যদিও এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে উন্নত বীজ থেকে আরম্ভ করে সহজসর্তে ঋণ ইত্যাদি সমস্ত ধরণের সুযোগ সুবিধাগুলিই স্থানীয় ধনীরাই ভোগ করে)। কিন্তু দারিদ্র্য আর তারই সাথে যুক্ত ঋণের ভারে যে কৃষক সারা বছরই নুইয়ে থাকে তার কাছে তো এটা মোটেই সহজ নয়। যে বিপুল বোঝার ভার তাকে বহন করতে হয় তার উপর সামান্য ভারও বইবার শক্তি তার থাকে না। সেচের সমস্যা সমাধানে লেখক একটি সহজ সূত্র দেখতে পেয়েছেন। তথাকথিত বাঁশের নলকূপ দিয়েই নাকি তিনটে ফসল ফলানো যাচ্ছে! গরমের দিনে যেখানে সাধারণভাবে প্রচলিত নল-কূপগুলিই জলের যোগান দিতে পারে না সেখানে বাঁশের নলকূপের

যোগান দেওয়ার ব্যাপারে এগুলির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে রীতিমত সন্দেহ জাগে।

আরো অনেক প্রশ্ন আছে। দারিদ্র্যের ফলে যাদের অন্যের জমিতেই খাটতে হয়, যাদের হাল হাতিয়ারের ঠিক থাকে না, আর তারই ফলে নিজের অল্প জমিতেও ভালভাবে চাষবাস করতে পারে না, কি অলৌকিক বলে তারা এ সমস্ত বাধা দূর করে সুষ্ঠুভাবে উন্নত প্রথায় চাষবাস আরম্ভ করে ফেলল? লেখক অর্থনীতির ছাত্র। এই অর্থনীতিতেই একটি তত্ত্ব আছে যে চাষবাসে লাভবান হওয়ার জন্য একটি ন্যূনতম পরিমাণ জমির প্রয়োজন আছে, যাকে বলা হয় 'ইকনমিক হোল্ডিং'। লেখক যে সমস্ত চাষীদের কথা বলেছেন বর্ণনা থেকে তাদের অনেকেরই জমির পরিমাণ 'ইকনমিক হোল্ডিং'-এর নীচে বলে মনে হয়। অথচ এমন একটি দেশে যেখানে সরকারী সুযোগ সুবিধাগুলি আমলারা এবং ধনীরাই ভোগ করে থাকে, সেখানে একক প্রচেষ্টায় এই সমস্ত চাষীরা শুধুমাত্র অধিক ফলনশীল বীজের সাহায্যে উন্নতি করে ফেলল, যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা মেলে না।

লেখাটি আগাগোড়াই নানা অসঙ্গতি আর স্ববিরোধিতায় ভরা। সুবিধার পাশাপাশি থাকে অসুবিধা। ভালোর পাশে মন্দ। লেখক শুধু গরীব চাষীর উদ্যম আর উন্নতি করার ইচ্ছার উৎসাহজনক দিকটিই দেখেছেন, তার অসংখ্য অসুবিধার কথা তাঁর মনে হয় নি। সবুজ বিপ্লব গরীব চাষীর জীবনে আদৌ কোন পরিবর্তন এনেছে কিনা তা দেখতে হলে ধান কিম্বা গমের ক্ষেতে নয়, গরীব ঘরেই তার খোঁজ করতে হবে। কিন্তু লেখক তাঁর অনুসন্ধানকে চাষের ক্ষেতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন! পটে আঁকা ছবির মত তিনি সবুজ বিপ্লবের এলাকাতে 'যতদূর দেখা যায়' 'লকলক করা' 'সবুজ গমের' ফসলই দেখেছেন। আবার তার মালিকানায় গরীব চাষীদেরই বসিয়েছেন! জমিদারদের শত শত বিঘা জমি আছে, যার বেশীর ভাগই পতিত। অথচ এই সবুজ বিপ্লবের এলাকাতে সে সবের অস্তিত্ব নেই একেবারে! সবুজ বিপ্লবের এলাকার বাইরে একপাশে তাদের ঠাঁই হয়েছে! তিনি জমিদারদের অলসতাই দেখেছেন কিন্তু স্থানীয় সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের গাঁটছড়া বাঁধার যে ঘটনাটি বিবরণে একদিকে যে সরকারী কৃষিবিভাগ গরীব চাষীকে উন্নত বীজের যোগান দিচ্ছে, যে সরকারী আইন বহুদিন ধরেই বর্গাদার চাষীদের অনেক অধিকার দিয়ে আসছে, অন্যদিকে সেই সরকারের বিশিষ্ট পদ অলংকৃত করে রয়েছে জমিদারেরা—জেল, পুলিশও জমিদারদেরই সাহায্য করছে! এ দুয়ের মধ্যে যে স্ববিরোধিতা রয়েছে তা লেখকের চিন্তার মধ্যে আসে নি। আর এ'সবের ফলেই ভূমিকায় চাষীদের নিদারুণ দুঃখের কথা বললেও, শেষে জমিদারদের অত্যাচারের বর্ণনা থাকলেও এ বিবরণ কৃষিকার্য্যে অনগ্রসরতা আর চাষীর দুঃখের মূল কারণকে তুলে ধরতে তো পারেই নি বরং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

॥ সুশীল মহান্তি—কলকাতা ॥

২

........'লাল সবুজের দেশে' লেখাটি পড়ে সবুজ বিপ্লবের কথাটা যেন পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে। লেখক কি বোঝাতে চাইছেন জানিনা। হয়তো আসল চেহারাটা তুলতে পারেননি। আমাদের গ্রামেও কিছু কিছু জায়গায় 'সিজন্যাল ক্রপস্' ( Seasonal Crops ) ছাড়াও অনেক সময়ই ফসলের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। আর সেটা কি ভাবে হয় তারই একটা পরিষ্কার ছবিই আমি ফোটাতে চাইছি। আমাদের গ্রামে কয়েকটা লোক আছে যারা একটা বিশেষ সর্ত্তাধীনে দরিদ্র চাষীভাইদের চাষের সময় টাকা ধার দেয়। সর্তটা কত জঘন্য হতে পারে জানেন? চাষের সময় তারা চাষীভাইদের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একবারে ধার দেয়, আর তার পরিবর্তে গম বা ধান যাই চাষ করুক না কেন, চাষী যখন ফসল ঘরে তুলবে, তখন বাজারে সেই ফসলের দাম যাই থাকুক না কেন ওই কয়েকটা লোককেই ২০ বা ৩০ টাকা মণ হিসাবে দিতে হবে—অন্য কোথাও বিক্রি করতে পারবে না। গ্রাম্যভাষায় এটাকে দাদন বলা হয়। এর বিরুদ্ধে গ্রামের কারো কোন প্রতিবাদ নেই! এভাবেও, শুধুমাত্র আমার কেন, ভারতবর্ষের অনেক গ্রামেই সবুজ বিপ্লবের রূপরেখা দেখতে পাবেন।..........

॥ জনৈক লেখিকা/পলাশী, মুর্শিদাবাদ ॥

---

( ৩৪ পৃষ্ঠার পর )

টাইমস্' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "সরকার যদি গমের সংগ্রহ-মূল্য কুইন্টল প্রতি ৯০'০০ টাকা পর্যন্ত না বাড়ায় তবে তা নেপাল, সিংহল, বাংলাদেশ এবং পাকিস্থান ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশে চোরাইচালান হয়ে যাবে।" তাঁর মতে, পাঞ্জাব থেকে (যেখানে ১০০ বস্তা গমের দাম ১০,০০০ টাকা) বোম্বেতে (যেখানে ১০০ বস্তা গমের দাম ৩০,০০০ টাকা) গম নিয়ে আসাটা চোরাকারবারীদের কাছে খুবই লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ভীতিপ্রদর্শনগুলি শুধুমাত্র তারই বাড়তি ইঙ্গিত যে, চালিয়ে নেওয়ার মত যথেষ্ট গম এখানে আছে। **এটা তাই খাদ্যশস্য মজুত না থাকার নয়, বরং ক্ষমতা ও অর্থবলে বলীয়ান শক্তিগুলির হাত থেকে মজুত খাদ্য নিয়ে নিয়ে তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করার ব্যাপারে সরকারের অক্ষমতারই প্রশ্ন।**......"

[ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৯/৪/১৯৭৩ ]

বিঃ দ্রঃ এ রচনায় ব্যবহৃত সব বড় হরফই আমাদের—সঃ মঃ বীক্ষণ।

····কিশোর ও যুব ছাত্রদের মুখপত্র বীক্ষণ-এর কয়েকটি সংখ্যা আমরা পেয়েছি। সাময়িক পত্রিকা জগতে বীক্ষণ নবাগত হলেও এর বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। পত্রিকাটিতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলী রয়েছে। তাছাড়া ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কেও প্রবন্ধ এবং সেইসঙ্গে দু'একটি গল্প ও কবিতাও আছে। কিন্তু এই গল্প কবিতার চেয়েও প্রবন্ধগুলি বেশী মূল্যবান। পত্রিকাটির এই স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে পারলে বীক্ষণ সাময়িকপত্র জগতে স্থায়ীস্থান করে নেবে বলে আশা করি।

—সত্যযুগ ( ৩১' মে '৭৩ )

........Beekshan, which is edited by a group of young people—most of them students—begins by rejecting the illusion of seventies. And it challenges them too and looks out for new values in the cold, critical light of this re-examination. The articles, poems and short stories may not reach a high standard of excellence, but they are well written and may fulfil their purpose of bringing the younger generation to a fuller sense of social realities. The problems connected with the young people at home, in the place of education and work, and in society at large can be of interest when discussed or presented by the young from their own points of view. There are some writings echoing the radical views of older people on social and cultural history. A welcome effort.

—FRONTIER, June 9, 1973

# ঃ নি য় মা ব লী ঃ

* প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 'বীক্ষণ' বেরুবে।

* 'বীক্ষণে'র সমস্ত বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ, সুস্থ এবং বলিষ্ঠ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য রচনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।

* লেখা পাঠানোর সময় লেখক-লেখিকারা, 'বীক্ষণ' প্রধানতঃ যাঁদের জন্য সেই কিশোর-যুব-ছাত্র সমাজের কথা মনে রেখে লেখা পাঠাবেন বলে আমরা মনে করি।

* 'বীক্ষণে'র পাঠক-পাঠিকারা আশাকরি এ ব্যাপারে একমত হবেন যে শুধু বিষয়বস্তুই নয়, রচনার প্রকাশভঙ্গীও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচ্য। প্রকাশভঙ্গী যত সরল হয় ততই ভালো। কিন্তু সাথে সাথে তাকে প্রাণবন্তও হতে হবে। সরল করতে গিয়ে যেন তা স্লোগানধর্মী হয়ে না পড়ে।

* 'বীক্ষণে'র প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে ও কিশোর-যুব-ছাত্র সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপারে পরামর্শ মতামত—এসবের জন্যও আমরা আবেদন রাখছি। এগুলি 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত হবে।

* সমস্ত ধরণের রচনাই কাগজের এক পৃষ্ঠায়, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখে পাঠানোর জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

* উপযুক্ত ডাক টিকিট সহকারে পাঠালে অমনোনীত রচনা, অমনোনীত হবার কারণ দেখিয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে।

* 'বীক্ষণ' সম্পর্কে 'বীক্ষণে'র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা —এঁদের মতামতের জন্যও আমরা সাদর-আহ্বান রাখছি।

* 'আমাদের কথা' বিভাগটি ছাড়া অন্য রচনাগুলিতে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব রচনাকারীদের।

* চিঠিপত্রে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

'বীক্ষণ' ; প্রদীপ মুখার্জী,
৬৯, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ সম্পাদকমণ্ডলী—বীক্ষণ ॥

## পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে

# কৈফিয়ৎ

স্থানাভাব ঘটায় এবং আগে থেকে সাবধান না হওয়ার জন্য এবারের 'বীক্ষণে' অনেক প্রতিশ্রুত রচনা এবং নিয়মিত বিভাগ বাদ দিতে হয়েছে। যেমন :

**কবিতা :** প্রকাশযোগ্য অনেক কবিতা আমাদের হাতে আছে এবং লেখক-লেখিকাদের অনেকের কাছেই আমরা তাঁদের কবিতা এ সংখ্যায় প্রকাশের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতও ছিলাম। কিন্তু স্থানাভাবে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হল।

**চিঠিপত্র :** চিঠির মাধ্যমে, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভার্থীদের অনেকের কাছ থেকেই আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ অনেক সমালোচনা, মতামত ইত্যাদি পেয়েছি। যার অনেকগুলিই পাঠক-পাঠিকাদের জানা প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছে। কিন্তু স্থানাভাবে এ সংকলনে তা করা গেল না।

**বিশ্বসাহিত্য :** এক্ষেত্রেও কৈফিয়ৎ একই।

আগামী সংকলনে—বিশেষ শারদ সংকলনে—এগুলির প্রত্যেকটিই প্রকাশিত হবে।

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

## : সূচী :

বীক্ষণ / প্রথম বর্ষ / ৫ম সংকলন / আগষ্ট '৭৩

# ঃ নি য় মা ব লী ঃ

* প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 'বীক্ষণ' বেরুবে।
* 'বীক্ষণে'র সমস্ত বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ, সুস্থ এবং বলিষ্ঠ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য রচনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।
* লেখা পাঠানোর সময় লেখক-লেখিকারা, 'বীক্ষণ' প্রধানতঃ যাঁদের জন্য সেই কিশোর-যুব-ছাত্র সমাজের কথা মনে রেখে লেখা পাঠাবেন বলে আমরা মনে করি।
* 'বীক্ষণে'র পাঠক-পাঠিকারা আশাকরি এ ব্যাপারে একমত হবেন যে শুধু বিষয়বস্তুই নয়, রচনার প্রকাশভঙ্গীও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচ্য। প্রকাশভঙ্গী যত সরল হয় ততই ভালো। কিন্তু সাথে সাথে তাকে প্রাণবন্তও হতে হবে। সরল করতে গিয়ে যেন তা স্লোগানধর্মী হয়ে না পড়ে।
* 'বীক্ষণে'র প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে ও কিশোর-যুব-ছাত্র সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপারে পরামর্শ, মতামত—এসবের জন্যও আমরা আবেদন রাখছি। এগুলি 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত হবে।
* সমস্ত ধরণের রচনাই কাগজের এক পৃষ্ঠায়, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখে পাঠানোর জন্য আমরা অনুরোধ করছি।
* উপযুক্ত ডাক টিকিট সহকারে পাঠালে অমনোনীত রচনা, অমনোনীত হবার কারণ দেখিয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে।
* 'বীক্ষণ' সম্পর্কে 'বীক্ষণে'র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা —এঁদের মতামতের জন্যও আমরা সাদর-আহ্বান রাখছি।
* 'আমাদের কথা' বিভাগটি ছাড়া অন্য রচনাগুলিতে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব রচনাকারীদের।
* চিঠিপত্রে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

'বীক্ষণ' ; প্রদীপ মুখার্জী,
৬৯, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ সম্পাদকমণ্ডলী—বীক্ষণ ॥

বীক্ষণ, ১ম বর্ষ, ৫ম সঙ্কলন,
আগষ্ট, ১৯৭৩

# পনেরই আগষ্ট "স্মরণে"

কোন কথা অনেকদিন ধরে ঢাকঢোল পিটিয়ে বার বার বলে গেলেই আপনা থেকে তা সত্য হয়ে যায় না। বরং প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে, সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরোহিতদের বার বার উচ্চারিত, বিভিন্ন "পবিত্র সত্যে"র বিরোধীতার মধ্য দিয়ে মানুষের সভ্যতা নতুন নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও, রুশো ও ভলতেয়ার যে মানুষের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হিসেবে স্বীকৃত, তার কারণ তাঁরা তাঁদের সময়ের এরকম নানা "পবিত্র সত্যে"র ফানুস, তথ্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে ফুটো করে দিতে পেরেছিলেন।

• অন্যদিকে আবার বাইরে থেকে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়া কোন ঘটনা বা জিনিষকে যা মনে হয়, সেটা যে বহু সময়েই তা হয় না সেটাও আমরা সবাই জানি। যা চকচক করে তাই যে সোনা নয়, একথাতো আমরা শিশুকাল থেকে কতবার শুনে আসছি।

গত ছাব্বিশ বছর ধরে রেডিও, কাগজ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই-পত্তরে ক্রমাগত প্রচারের ফলে এবং প্রতিবছর ১৫ই আগষ্ট বাজনা-বাদ্যি, রোশনাই আর ফৌজি কুচকাওয়াজ সহযোগে "স্বাধীনতার" জন্মদিবস পালনের ফলে আমাদের দেশটা যে স্বাধীন এই কথাটা এখন প্রায় একটা "পবিত্র সত্যে"র পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর শুধুই বাইরের চেহারাটার দিক থেকে আমাদের দেশ যে স্বাধীন তাতে সন্দেহ কী? ভারতবর্ষের উচ্চতম পরিচালক, রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে নিম্নতম প্রশাসক, থানার দারোগা পর্যন্ত, একজনও অ-ভারতীয় আছেন কী? নেই। সুতরাং শুধুই ঢাকঢোলের সমারোহ ও বাইরের চেহারা যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হয়, তবে অবশ্যই আমাদের মাতৃভূমি আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি এ দু'টোর কোনটাই সত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না।

সোনাটা খাঁটি কি'না তা কষ্টিপাথরে ঘষে বিচার করতে হয়। আমাদের দেশের স্বাধীনতাটাও আসল কি'না, সেটা কতগুলি বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া প্রতিটি দেশপ্রেমিকেরই কাজ। কারণ তারই উপর তো নির্ভর করবে দেশপ্রেমিকদের আজ কি কর্তব্য। "স্বাধীনতা"-পূর্ব ভারতীয় সমাজের সাথে "স্বাধীন" ভারতীয় সমাজের তুলনাটাই এই বিচারের সবচেয়ে ভাল মাপকাঠি।

এই তুলনাটা, গোটা জাতি আজ যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, অগ্নিযুগের এরকম একজন বীর সৈনিকের জবানীতেই রাখছি আমরা। শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—যিনি শহীদ সূর্যসেনের (মাস্টারদা) সহকর্মী ও চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের (১৮।৪।৩০) অন্যতম বীর সৈনিক হিসাবে অমানুষিক নির্যাতন সয়েছিলেন এবং দীর্ঘ ২৫ বছর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন; সেই বিদ্রোহের গৌরবময় কাহিনী বর্ণনার শেষে গভীর বেদনার সাথে বলছেন—"যে স্বাধীনতার আশা বুকে নিয়ে……ভারতের শত শত শহীদ তাঁদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন সে আশা আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে।……

"কই তাঁদের সে স্বপ্ন তো আজও পূর্ণ হয়নি—দেশজোড়া শোষণের মসনদ আজও ভিত্তিচ্যুত হয়নি। বঞ্চনার সর্বগ্রাসী নাগপাশ আজও দেশের জনসাধারণকে দুঃসহ নরকে বন্দী করে রেখেছে। দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তো আজও অত্যাচারী বিদেশী ধনকুবেরদের করায়ত্ত। মাষ্টারদা ও শত শত শহীদের রক্তে যে সব দেশ শত্রুরা তাদের হাত কলঙ্কিত করেছে আজও তাদের শাস্তিবিধান হয়নি।

"……এই কি সেই স্বাধীনতা যার জন্য ভারতের কোটি কোটি জনতা যুগ যুগ ধরে আকুল প্রতীক্ষা নিয়ে তাকিয়ে ছিল? —এই কি সেই স্বাধীনতা যার জন্য আমরা আমাদের জীবন যৌবন অকাতরে উৎসর্গ করেছিলাম?" (চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী, ১৯৪৮)

শ্রদ্ধেয় আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এ কথাগুলি বলেছিলেন ১৯৪৮ সালে। তারপর গত ছাব্বিশ বছরে "শোষণের মসনদ" আর "বঞ্চনার নাগপাশ" কি আরও কয়েকগুণ শক্ত হয়ে বসেছে, না' কি শোষণ ও বঞ্চনার শিকার দরিদ্র ভারতবাসীর সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে? "বিদেশী ধনকুবেরদের" মুঠি কি আরও আলগা হয়েছে, না' কি বেনোজলের মত প্রতিবছরই আরও

চুলে তার পাকা গমের তীব্র সুবাস……

এইসব নিষ্পাপ শিশুগুলি কত সুন্দর,

তাদের বয়স তাদের রেখেছে

জগতের অপবিত্রতা থেকে

দূরে……

তাঁর দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা তাঁকে যন্ত্রণা দিতে লাগল আর তাদের জাতীয় ভবিষ্যতের উপর বাড়তে থাকল তাঁর বিশ্বাস। তাই এটা পরিষ্কার, কেমন করে তিনি গাইতে পেরেছিলেন—

"হে আমার প্রিয় ভিয়েৎনাম।

উঁচুতে আরো উঁচুতে

তুলে ধরো তোমার চেতনা।"

—আর কেমন করেই বা তিনি সেই জ্বালাময়ী ভাষায় চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছিলেন নিকসনকে—সেই আন্তর্জাতিক পুলিশটাকে।

১১ই জুলাই সায়গনের অধ্যাপক লাই চান্ ট্রাহ, "দিয়েন ভিয়েন্" এ লিখেছিলেন: "বিন্ চাইলে সব কিছুই পেতে পারত, যদি সে খেলাটার নিয়মগুলো মেনে নিত—খুব সরল সব নিয়ম। আর নিজের বিশেষ স্বার্থের বাইরে কিছু না দেখা বা কিছু না শোনাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল…… …।

"কিন্তু বিন্ অস্বীকার করল খেলাটা খেলতে, এই প্রকাণ্ড যন্ত্রটার একটা গড়ানে চাকার দাঁত হতে অস্বীকার করল সে। যদিও এর দ্বারাই সে পুষ্ট হয়েছিল আর লাভ করেছিল উজ্জ্বল সাফল্য। সে তার চোখ কান খোলার দুঃসাহস করেছিল। চার বছর পরে বোয়িং ৭৪৭টি দক্ষিণ ভিয়েতনামে ফিরিয়ে নিয়ে এল ইঞ্জিনিয়ার ন্‌গুয়েন থাই বিন্‌কে একটা অকেজো যন্ত্র হিসাবে—একটা যন্ত্র, ব্যবহারের আগেই যাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে—একটা দেহ, এমন একজন মানুষের দেহ, যে যন্ত্র হতে অস্বীকার করেছিল।"

সরাসরি তাঁর হৃদয়ে পাঁচটি বুলেট বিঁধিয়ে তাঁকে হত্যা করে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রকাশ্যে স্বীকার করল যে ডলার দিয়ে একজন সাচ্চা মানুষের বিবেককে কেনা যায় না। আর কোন রকম আইনী অজুহাত নেই যা দিয়ে এমন একজন মানুষকে দমন করা যায়। এই কাজের মধ্য দিয়ে, যা একটা পরিষ্কার গুণ্ডামী, মার্কিন প্রশাসন স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল একটি দেশপ্রেমিক হৃদয়কে, যা তাদেরকে উত্যক্ত করেছিল। কিন্তু এই হৃদয় চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আর তার আলোকরশ্মিতে অভিষিক্ত করবে হাজার হাজার হৃদয়কে।

অনুবাদ: ফাল্গুনী সেন.

---

রচনাটি চেকোস্লাভাকিয়া থেকে প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্টস নিউজ' পত্রিকার সপ্ত-বিংশতি খণ্ডের ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৫ই আগষ্ট "স্মরণে"

# "দেশে খাদ্যশস্যের অভাব সম্পর্কে যে আশঙ্কা, সেটা অকারণ ও মনগড়া"

[ উপরের উক্তিটি ভারত সরকারের কৃষি-বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সিন্ধের। ভাগ্যের পরিহাসে একই দিনের এবং তার চারদিন আগের সংবাদপত্রে এই তথাকথিত "মনগড়া" আশঙ্কার অকাট্য (?) প্রমাণ হিসেবে এমন কয়েকটি ঘটনা ফাঁস হয়ে গেছে যে এরপর মাননীয় মন্ত্রীমশাইকে কেউ যদি অসত্যভাষী বলেন অথবা তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। আমরা শ্রী সিন্ধের উক্তি এবং ঘটনাগুলির বিবরণ সংবাদপত্র থেকে হুবহু তুলে দিলাম। আমরা নিশ্চিত যে খাদ্যাভাব-পীড়িত মহারাষ্ট্র, কেরালা বা বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং তাঁদেরই সমব্যথী-বন্ধু দেশের গোটা ছাত্রসমাজ যদি শ্রী সিন্ধেকে তাঁদের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে উপহাস করার দায়ে অভিযুক্ত করেন এবং এই অসত্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির বিরুদ্ধে ও খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন তবে তিনি নিজে এবং তাঁর সমগোত্রীয়রা নিশ্চয়ই সশস্ত্র 'শান্তি রক্ষকদের' লেলিয়ে দিয়ে ছাত্রদের "রাজনীতি" করার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে দ্বিধা করবেন না। আর তাতে আমাদের দেশের ছাত্রদরদী মাননীয় "শিক্ষাবিদ"দেরও আপত্তি হওয়ার কোন কারণ দেখি না। সত্যিই তো, জ্ঞান আহরণের এত অনুকূল আবহাওয়া স্বত্বেও ছাত্ররা যদি "বেয়াড়াপনা" করে তবে তাদের জন্য একটু কড়া ওষুধেরই দরকার! তবে আমাদের আশঙ্কা, ছাত্ররা কড়া ওষুধ খাওয়ার ভয়ে বেশী দিন ধরে নিঃশব্দে ক্ষিধে চেপে রাখতে রাজী না'ও হতে পারেন। —সঃ মঃ বীঃ ]

## উক্তি :

"নয়াদিল্লী, ১২ই জুলাই—কেন্দ্রীয় কৃষি-দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ. পি. সিন্ধে আজ এখানে বলেন আতঙ্কিত হ'বার কারণ নেই, এবং যদিও জাতীয় ভাণ্ডার খাদ্যশস্যে উপচে পড়ছে না, দেশে প্রচুর খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে......."

"গত রাতে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে একটি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রী সিন্ধে বলেন 'আমরা ৫০ লক্ষ টনেরও বেশী গম সংগ্রহের আশা রাখি। কয়েকটি দেশ থেকে গম আমদানীর ব্যবস্থাও আমরা করছি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে **দেশে খাদ্যশস্যের অভাব সম্পর্কে যে আশঙ্কা, সেটা অকারণ ও মনগড়া**"। [ বড় হরফ আমাদের ]

—হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড, ১৩. ৭. ৭৩

২

**"কেরালায় স্কুল-কলেজ বন্ধ"**

"ত্রিবান্দ্রম, ১২ই জুলাই—খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় কেরল সরকার পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন.... ...

"........গত দু'দিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এমন ঘটনার খবর আসছে যে ঐ দিনগুলিতে ছাত্ররা ক্লাশ বয়কট করেছেন এবং লরী থেকে খাদ্যশস্য আটক করে জনসাধারণের মধ্যে তা বিতরণ করেছেন।"

—দি স্টেট্‌সম্যান, ১৩. ৭. ৭৩

## ঘটনা :

১

**"খাদ্যাভাব : বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা স্থগিত"**

"বারাণসী, ৮ই জুলাই—শহরে তীব্র খাদ্যাভাবের জন্য বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে।

"বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছাত্রাবাসগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট বেশীর ভাগ মেসই গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ হয়ে গেছে। শতকরা ৫০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্র, যাঁরা ছাত্রাবাসে থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বাইরে অবস্থিত রেষ্টুরেণ্টগুলিতে তাঁদের আহার্য্য সংগ্রহ করছেন।

"বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা কর্তৃপক্ষের কাছেও গেছেন কিন্তু সফল হননি।

"ইতিমধ্যে খাদ্যাভাবের মোকাবিলায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় জনসাধারণের অসন্তোষের মাত্রা ক্রমশঃ চড়ছে। কখনও সখনও অল্প পরিমাণে খাদ্যশস্য বিক্রি করে—এমন কিছু কিছু দোকানের সামনে লম্বা লম্বা লাইন পড়তে দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও বেপরোয়া ক্রেতাদের আয়ত্তে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, **যদি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই খাদ্য সরবরাহের উন্নতি না ঘটে, তবে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে।**" [ বড় হরফ আমাদের ]

—টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ৯. ৭. ৭৩

**"খরা শিক্ষার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে"**

"পুণা: খরায়, যা মহারাষ্ট্রে পর পর তিন বছর ধরে ঘটছে, হাজার হাজার গ্রাম্য যুবকের শিক্ষার মাধ্যমে সুন্দর ভবিষ্যতের আশা শুকিয়ে গেছে।

"স্কুল খোলার একমাস পরেও এক বিরাট সংখ্যক শিশু নানা ধরণের রিলিফের কাজে যুক্ত থাকায় শিক্ষার কার্যক্রমগুলি বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

"ইউ. এন. আই-এর জনৈক প্রতিনিধি, যিনি অভাব-পীড়িত জেলাগুলি ভ্রমণ করেছেন, কাজের জায়গায় পাথর ভাঙা অথবা মোট-বহণের কাজ করছে এমন নারী ও পুরুষদের মধ্যে অনেক ম্যাট্রিকুলেট এবং স্নাতককে দেখেছেন।

"ওসমানাবাদ জেলার নিলাঙ্গায় অবস্থিত একটি খোয়া-ভাঙার কেন্দ্র, যেখানে প্রায় ২,৪০০ নারী, পুরুষ কাজ করেন, পরিদর্শনের সময় যাঁদের শিক্ষাগত যোগত্য আছে তাঁরা আমাদের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এই ভুল করে যে আমরা হয়ত কাজের জন্য লোক জোগাড় করতে বেরিয়েছি।

"খোয়া-ভাঙার শ্রমিকদের মধ্যে যাঁরা আর একটা কোন ভালো কাজের খোঁজে আছেন এমনই একজন হলেন ২০ বছরের শ্রীবিনায়ক সামিন্দার, যিনি বি. কম. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বৃত্তির সহায়তায় এম. কম. পড়ছিলেন। এম. কম.-এ তাঁর শেষ বছরে তাঁর পরিবারের সংকটময় অবস্থার ফলে দৈনিক ৩ টাকা মজুরীতে খোয়া-ভাঙার কাজ নিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন।

"১৮ বছরের শ্রীমতি নিভকতি নিম্বাভারা নিলাঙ্গার খোয়া-ভাঙা কেন্দ্রে অসংখ্য শিক্ষিতা মেয়েদের একজন। তিনি এস. এস. সি. পরীক্ষায় পাশ করেছেন এবং বর্তমানে খোয়া-ভাঙার কাজ করছেন। তাঁর বাবা ও মা'ও একই কাজ করছেন।

"তিনি বললেন যে পুরো তিন টাকার পারিশ্রমিক রোজগারে তিনি অক্ষম। কারণ নির্দ্ধারিত কাজের পরিমাণটা তাঁর পক্ষে খুবই ভারী।............

"শ্রীহনুমন্ত গুঙ্গাজ বীরশাদার, যিনি ১৯৬৮-তে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, চার বছরেরও বেশী সময় ধরে কোন কাজ পান নি। সরকার যখন ত্রাণ-কার্য হিসেবে খোয়া-ভাঙার কাজ শুরু করল, তিনি তাতে সাগ্রহে যোগ দিলেন।

" .......নিলাঙ্গা কেন্দ্রে প্রায় ২৫০ জন শিশুও কাজ করে, যাদের বেশীর ভাগই স্কুলের বয়সী।

"পীড়িত অঞ্চলের স্কুলগুলিতে তদন্ত করে জানা গেছে যে অসংখ্য শিশু তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। যারাও বা আসছে তারাও, বেশীর ভাগ সময়, বই কিনতে পারে না।

"আউরঙ্গাবাদ জেলার ভাইজাপুরের প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্র এখনও রিলিফের কাজ করছে বলে জানা যায়।

"পুণা জেলার হাভেলি তালুকের একটি প্রাইমারী স্কুলের প্রধান-শিক্ষক শ্রীরামচন্দ্র চানকার জুরাং বলেন যে তাঁর স্কুলে গত বছর যেখানে ৪০৫ জন ছাত্র ছিল, এ বছর সেখানে আছে মাত্র ২৪০ জন।............

"তিনি বলেন, তাঁর বেশীর ভাগ ছাত্রেরই পাঠ্য বই নেই। চতুর্থ শ্রেণীর ৩৬ জন ছাত্রের মধ্যে ২ জন মাত্র বই কিনেছে, যাদের একজন গ্রাম-পাতিলের ছেলে আর অন্যজন এক ব্যবসায়ীর ছেলে।

"তিনি বলেন, গত বছরও ছাত্ররা রিলিফের কাজে যোগ দিয়েছিল। তাদের বেশীর ভাগই কয়েক ঘণ্টার জন্য কাজের জায়গায় তাদের বাবা-মাকে সাহায্য করত এবং স্কুলে আসত সকাল ১০-৩০টার বদলে দুপুরে। শিশুদের পাঠ্যসূচী শেষ করার জন্য রাত্রেও তিনি কয়েকটি ক্লাশের ব্যবস্থা করেছিলেন।

"শ্রীজুরাং বলেন যে ছাত্রদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি আরো বলেন, বেশীর ভাগ শিশুই ছেঁড়া খোঁড়া কাপড় পরে স্কুলে আসে এবং তারা এত দুর্বল যে পড়াশুনায় মনসংযোগ করতে পারে না।

"পুণা জেলার সিরুর তালুকস্থিত রাওভোয়াদির জনৈক স্কুল শিক্ষক, শ্রীদশরথ বাবুরাও সাসোয়াদি বলেন, তাঁর স্কুলে ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় মাত্র এক তৃতীয়াংশ। তিনি বলেন, অনেক ছাত্র খালিপেটে স্কুলে আসে। অনেক শিশু সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। যে সব ছাত্র সঙ্গে খাবার নিয়ে আসে তাদেরকে তিনি যাদের কোন রকম খাবারই নেই তাদের সাথে ভাগ করে খেতে বলেন।

"সিরুর তালুকেরই শিখরামপুরের জনৈক স্কুল শিক্ষক সচ্ছল পরিবারগুলির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন দুঃস্থ ছাত্রদের বই পেনসিল ইত্যাদি কেনার জন্য।

"পুনা জেলার লোনিখান্দস্থিত ডঃ বসু বিদ্যাধাম মাধ্যমিক স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রী ভি. কে. পান্‌সে বলেন, এবছর এস. এস. সি. পাশ করেছে তাঁর স্কুলের এমন ১২ জন ছাত্র রিলিফ কেন্দ্র কাজ করছে। তাঁর স্কুলের যে সব ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষার পর রিলিফ কেন্দ্রে কাজ নিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুলে ফিরে এসেছে, বাকীরা আসেনি।.... ...

"ক্লাশে সামনের দিকের বেঞ্চগুলি দখল করার জন্য ছাত্রদের মধ্যে তিনি এক অভূতপূর্ব হুটোপুটি লক্ষ্য করেছেন, যা ছাত্রদের অপুষ্টিজনিত ক্ষীণ-দৃষ্টি-শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক ছাত্রই সকালবেলা প্রার্থনার সময় সাত-আট মিনিট একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। শতকরা ৯০ জন ছাত্রেরই বই পেন্সিল নেই।

"শ্রী পান্‌সে বলেন, যে তিনি স্থানীয়ভাবে অর্থসংগ্রহ করে তা দিয়ে দুঃস্থ ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য কিছু বাজরা কিনেছিলেন। পুণা শহরের কিছু স্কুল তাঁকে টাকা এবং বই, পেন্সিল ইত্যাদি সামগ্রী পাঠিয়েছে, যা তাঁরা তাঁদের ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।"

[ অমৃতবাজার—১৩. ৭. ৭৩ ]

# কবি সুকান্ত : জীবন ও সাহিত্য

অলক বসু

·····চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে। চাঁদনি রাতে চাঁদের কথা এক রাজকন্যে····· ···

যুগে যুগে দুনিয়ার কবিতার খোরাক।

সেই ছোট্টবেলা থেকে স্বপ্নের সুন্দরী মায়াবী চাঁদের কল্পনায় বিভোর হয়ে থেকেছি—যে চাঁদ খোকার কপালে টিপ দিয়ে যায়, খুকুমনির বিয়েতে হাতীর নাচ আর ঘোড়ার নাচের বাস্তির সঙ্গে আলো ঝরিয়ে যায়।

স্বপ্নের চাঁদনি রাতে হঠাৎই যেন এক দুশমনের আবির্ভাব হয়—এক অবাধ্য কবির ঘোষণা শুনি : "প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—/ কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি / ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় / পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

আর সঙ্গে সঙ্গে 'চাঁদ' সম্পর্কে ডাকারিনের মতন মিষ্টি যে ধারণা আমাদের মনে জড়িয়ে আছে শৈশব থেকে, তা যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ওই অবাধ্য কবিটা, যে কিনা স্বপ্নের আকাশ থেকে চাঁদকে টেনে নামিয়ে এনেছে 'ক্ষুধার রাজ্যে', তাকে ঝলসানো রুটি বানিয়ে ছেড়েছে যার নাম কিনা সুকান্ত সে কিন্তু এখানেই থামে না। সুকান্ত নাড়া দেয় আমাদের অনুভূতির আর ধারণার গভীরে, প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ সাধারণ ব্যাপার, যেগুলোকে আমরা ভাবনার মধ্যেই আনি না, সেইসব ব্যাপারের আশ্রয় নিয়ে হাতুড়ি মেরে মেরে ও চিনিয়ে দেয়—বেঁচে থাকার লড়াইএর স্বরূপ। আর দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারের আশ্রয় নেওয়া হয় বলেই সুকান্তর কবিতা আমাদের প্রতিদিনকার নিবিড়তম অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে দেয় লড়াইএর চেতনা। যেমন, ধরা যাক্ "সিগারেট"। রোজ অসংখ্য লোক অসংখ্য সিগারেট খায়, আরাম পায়। কিন্তু অতিসাধারণ এই সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটাকে আশ্রয় করে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে সুকান্তর কবিতায় :

আমরা সিগারেট।
তোমরা আমাদের বাঁচতে দাওনা কেন ?··· ····
····· তোমাদের শোষণের টানে আমরা ছাই হই
তোমরা নিবিড় হও আরামের উত্তাপে।

তোমাদের আরাম : আমাদের মৃত্যু।
এমনি করে চলবে আর কতকাল ?·········

তাই, আর নয় ;
আর আমরা বন্দী থাকব না
কৌটোয় আর প্যাকেটে·······
সোনা বাঁধানো কেসে আমাদের নিঃশ্বাস হবে না রুদ্ধ।
আমরা বেরিয়ে পড়ব,
সবাই একজোটে, একত্রে····( সিগারেট )

কিম্বা, সামান্য একটা দেশলাই কাঠির মারফৎ রুদ্ধ, অগণিত জনতার অসীম শক্তির কথা বলে ফেলেন সুকান্ত :

আমি একটা ছোট্ট দেশলাই কাঠি / এত নগণ্য, হয়তো চোগেও পড়ি না / তবু জেনো / মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ— / বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছাস ; / আমি একটা দেশলাই কাঠি। /····আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়— / তা তো তোমরা জানোই ! / কিন্তু তোমরা তো জাননা : / কবে আমরা জ্বলে উঠব— / সবাই—শেষবারের মতো ! / ( দেশলাই কাঠি )

অথবা 'একটা মোরগের কাহিনী' আমাদের শোনায় সুকান্ত। ছোট্ট মোরগটার ভেতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই অগণিত না খেতে পাওয়া মানুষের চেহারা : খাবার ! খাবার ! খানিকটা খাবার ! / অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে / বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে, / প্রত্যেক-বারই তাড়া খেল প্রচণ্ড। / ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে / প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের ! / তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল, / একেবারে সোজা চলে এল / ধপধপে সাদা,

দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে, / অবশ্য খাবার খেতে নয়— / খাবার হিসেবে ॥

কেন সুকান্তর এই বেয়াদপি? কেন ওর হাতে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি হয়ে যায়, দেশলাই কাঠি হয়ে দাঁড়ায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসীম শক্তিধর রুদ্ধ জনতার বিদ্রোহের ছবি? তার জন্যে জানা দরকার সুকান্তর জীবন আর সুকান্তর সময়। সুকান্তর জন্ম হয় এক পণ্ডিতবাড়ীতে ১৩৩৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ। ওঁর জ্যাঠামশাই ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত আর পণ্ডিতি আবহাওয়া ছিল বাড়ীতে। ওঁদের পৈতৃক বাড়ী ছিল ফরিদপুরে। বেলেঘাটায় যৌথ পরিবারে ন দশ বছর পর্যন্ত অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে হেসে খেলে মানুষ হয়েছেন সুকান্ত। তখন থেকেই ওঁর বাইরের বই পড়ার ঝোঁক দারুণ আর ওই বয়সেই ছড়া লিখে নাম করেছিলেন সুকান্ত। বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে ছোট্ট সুকান্ত লিখে রাখত নানা খেয়ালী কবিতা। এমনি একটা কবিতার এক টুকরো—"কালীরতন চাঁদ বদন"। কালীরতন ছিলেন দাদার দোকানের একজন কর্মচারী। খুব ছোটবেলাতেই সুকান্ত তার আদরের রাণীদিকে হারায়। তারপরে ক্যান্সারে ওঁর মা মারা যান ওঁর স্কুলে পড়ার বয়সেই। সুকান্তর পৃথিবীটা একেবারে শূন্য হয়ে যায়। ছেলেবেলা থেকেই সুকান্ত ছিলেন অন্তর্মুখী। প্রথমে বেলেঘাটার প্রাইমারী স্কুল কমলা বিদ্যামন্দির ও পরে জগবন্ধু হাইস্কুলে পড়েছিলেন সুকান্ত। স্কুল জীবনে তখনকার দিনের বিখ্যাত অনেকেই ছিলেন তাঁর সহপাঠী। প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন কবি অরুণাচল বসু। অরুণাচল বসুর মা সরলা বসুর স্নেহ পেয়েছিলেন সুকান্ত, ওঁর প্রভাব সুকান্তর জীবনে বড় কম নয়। ছোটবেলা থেকেই ন্যায় অন্যায় বোধ ওঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল আর অজানাকে জানবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা ওঁর ভেতরে ছিল। এই অজানার টানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন সুকান্ত। তারপর অবশ্য বাড়ীতে ফিরে আসেন। অনেক আগেই ওঁরা বেলেঘাটার যৌথপরিবার ছেড়ে আসেন আর তার কিছুদিন পর থেকেই অসচ্ছলতার ভেতরে ওঁদের দিন কাটতে থাকে। তীব্র ন্যায় অন্যায় বোধ, অসচ্ছলতার অশান্তি আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুকান্তর কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দেয়—বাংলা সাহিত্যে এক স্থায়ী জায়গা করে নেয় ওর কবিতা। আর সবার ওপরে ছিল সুকান্তর, সমস্ত ঘটনাকে গভীরভাবে, জীবন দিয়ে অনুভব করবার অসাধারণ ক্ষমতা—যে ক্ষমতা খানিকটা তাঁর অন্তর্মুখী মনের জন্যেই পাওয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক উত্তাল সময়। ইতিহাসের মোড় ফেরার সময় সেই সময়। চালু সমাজব্যবস্থার সমস্তরকম ভ তথাকথিত নীতিবোধ আর আইন কানুন যার আড়ালে শোষক নীতিবোধ আর অগণিত মানুষের ওপর তাদের অত্যাচারকে রাখা হত, অত্যাচারকে "ন্যায়সঙ্গত", "আইনসঙ্গত" বলে হাজির হত—তাদের মুখোশ খুলে পড়ছে। এই শোষণব্যবস্থার চেহারাটা নগ্ন হয়ে উঠেছে। এই সর্বগ্রাসী বিকৃতি আর অত্যাচ শেষ ঘটবে তখনি যখন একজোট হওয়া মারখাওয়া মানুষ শোষকদে খতম করে জনতার রাজ কায়েম করবে। এই সত্যিকথাটা সু জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই ওঁর কবিতায় গেল বিদ্রোহের ডাক, না খেতে পাওয়া মানুষ আর মারখাওয়া, খাওয়া মানুষের একজোট হয়ে মার দেবার ডাক।

"বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি? / এস তবে আজ বিদ্রোহ ক আমরা সবাই যে যার প্রহরী / উঠুক ডাক। / ··· ছিঁড়ি, গোল দলিলকে ছিঁড়ি, / বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি / খুঁজি কোন স্বর্গের সিঁড়ি, / কোথায় প্রাণ! / ····দেখব, ওপারে আজো কারা, / খসাব আঘাতে আকাশের তারা, / সারা দুনিয়াকে দেব নাড়া, / ছড়াব ধান। / জানি রক্তের পিছনে ডাকবে সুখের বান

( বিদ্রোহের গ

শুধু লেখা নয় বিপ্লবকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন তি তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যও ছিলেন তিনি। কিন্তু ও থেকে চাপিয়ে দেওয়া রাজনীতি বা বিপ্লব-চিন্তা নয়, মহাযুদ্ধ মহামারী ও মহাদুর্ভিক্ষের তিক্ততাকে জীবন দিয়ে অনুভব করেছি বলেই, লড়াই আর বাঁচার ইচ্ছেকে রক্তের ভেতর লালন করেছি বলেই ওঁর কবিতা কখনোই 'এসো একটা বিপ্লব করা যাক'—অর্ডার দেওয়া 'বিপ্লবী' কবিতায় পরিণত হয় নি। "সুকান্ত রাজনী কাঁধে চড়ে নি। রাজনীতিকে নিজের করে নিয়েছিল। রাজনৈ আন্দোলনও সুকান্তকে দিয়েছে তাই সানন্দ স্বীকৃতি। নিজে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছি সুকান্তর কবিতা।" ( সুভাষ মুখোপাধ্যায়—সুকান্ত সমগ্রের ভূমিকা রাজনীতিকে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে হজম করে রক্তমাংসের হর ফোটাতে পেরেছিলেন বলেই সুকান্তর কবিতার মর্মবাণী সমস্ত মানুষে বেঁচে থাকবার মর্মবাণী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইতিহাস-চেতন মধ্য দিয়ে বিপ্লবের অনিবার্যতাকে খুঁজে পেতে গিয়ে তাই এইরক অবিস্মরণীয় লাইন সুকান্তর হাত দিয়েই পাওয়া গেল:

"আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো, / মনে রেখে দেরি হয়ে গেছে, অনেক অনেক দেরি। / আর মনে ক'রো আকা

ত্রক ধ্রুব নক্ষত্র, / নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ, / অরণ্যের
নতে আছে আন্দোলনের ভাষা, / আর আছে পৃথিবীর
নর আবর্তন ॥" (ঐতিহাসিক)

যুদ্ধ—মহাদুর্ভিক্ষ, শোষণ আর লড়াই পুরনো ফুলশোঁকা, শিশির
জ্যোৎস্না ধোওয়া কবিতাকে বাতিল করে দিল, তাই দরকার
ান্তের, যার হাতে "পূর্ণিমা চাঁদ" "ঝলসানো রুটি" হয়ে ঝলসে
মানুষের মনে। প্রতিদিনকার তুচ্ছ ঘটনার ভেতর দিয়েও,
ন্তরঙ্গভাবে, রক্তমাংসের গভীর থেকে বাঁচবার প্রেরণা ঘোষিত
ঢ়াই-এর চেতনা প্রকাশ পেল। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী শোষকশ্রেণীর
শুনলাম এক অদ্ভুত ঘোষণা :

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনেমরণে
কখনো ভুলতে পারি?

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই। (বোধন)

কবিতা তো শিশির ধোওয়া বস্তাপচা ন্যাকা কবির নয়। এ
বিনিদ্র রাতে চাঁদ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে প্রেমালাপ করতে
া—এ কবি দুর্ভিক্ষের কবি, যুদ্ধের কবি, লড়াই-এর কবি।
ার বিনিদ্র রাতে "সাইরেন ডেকে যায়"। ওঁর কবিতা তো
ার জন্য কবিতা" নয়, ওঁর কবিতা বিদ্রোহের খসড়া :
াকাশে আকাশে ধ্রুবতারায় / কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায় /
িগন্ত দ্রুত সাড়ায়, / জানে না কেউ। / উদ্যমহীন মূঢ় কারায় /
বুলির মাছি তাড়ায় / যারা, তারা নিয়ে ঘোরে পাড়ায় / স্মৃতির
(কবিতার খসড়া)
র শুধু খসড়া নয়—বিদ্রোহের খসড়া বিস্ফোরণও ঘটায়—
ধা মানুষের প্রবল ঘৃণা আর ক্রোধের সেই বিস্ফোরণ :
তিশোধ, প্রতিশোধ! / হাজার হাজার শহীদ ও বীর / স্বপ্নে
রণে গভীর / ভুলি নি তাদের আত্মবিসর্জন। / ....ওরা বীর, ওরা
া জাগাতো ঝড়, / ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে / বন্দুক, গুলি,
বোমার আগুনে / আজো রোমাঞ্চকর; / ....ওরা দিনরাত্ত আমাদের
ডাকে / ওদের ফিরাব কবে? / কবে আমাদের বাহুর প্রতাপে / কোটি
মানুষের দুর্বার চাপে / শৃঙ্খল গত হবে? ......

... শোনো, পৃথিবীর মানুষেরা শোনো, / শোনো স্বদেশের ভাই, /
রক্তের বিনিময় হয় হোক /আমরা ওদের চাই॥ (জনতার মুখে ফোটে
বিদ্যুৎবাণী)

কবিতার আঙ্গিকে সুকান্তর কবিতা এক নতুন দিক খুলে দিয়েছে
আমাদের সামনে। কিন্তু কখনোই আঙ্গিকের মায়ায় জড়িয়ে পড়েন নি
সুকান্ত। কবিতার বক্তব্য যদি হয় তার রক্তমাংস, তবে তার
চেহারাটা হচ্ছে আঙ্গিক। আঙ্গিকের মূল তাই বক্তব্যের গভীরে।
দুটো দিক্ আছে কবিতার আঙ্গিকে। এক, ছন্দ, দুই, কথার ছবি
যাকে বলে চিত্রকল্প। ছন্দ তৈরী হয় ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির সংঘাতে—
আওয়াজের সঙ্গে আওয়াজের ধাক্কা লেগে। ছন্দের রূপ আবার
তৈরী করে দেয় 'বক্তব্য'। বক্তব্য কি? বক্তব্য হচ্ছে সমাজের আর
জীবনের অভিজ্ঞতা আর সংঘাত থেকে পাওয়া ধারণা। ঘুমপাড়ানি
গানের ঘুমপাড়ানি আমেজটা তাই সে গানের ঢুলুনি ছন্দ তৈরী করে
দিয়েছে :

"খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল / বর্গী এল দেশে / বুলবুলিতে ধান
খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।"

কিন্তু কবিতা যখন যুদ্ধের, যে যুদ্ধে মজুর কিষাণ আর সাদামাটা
মানুষের প্রতিরোধ দুর্বার হয়ে উঠেছে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সে যুদ্ধের
কবিতা কি নীচু সুরের ঢুলুনি ছন্দে বাজতে পারে? তাই বেপরোয়া
বাধাহীন গদ্যের হাতুড়ীতে এ যুদ্ধের বাজনা দুর্দান্ত হয়ে উঠল সুকান্তর
হাতে :

"লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, /
কি হবে আর কুকুরের মতন বেঁচে থাকায়? /
কতদিন তুষ্ট থাকবে আর / অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট
হাড়ে? / মনের কথা ব্যক্ত করবে / ক্ষীণ অস্পষ্ট কেঁউ-কেঁউ
শব্দে?" (১লা মে'র কবিতা '৪৬)
কিম্বা :

"ঝড় আসছে—সেই ঝড়! / যে ঝড় পৃথিবীর বুক থেকে জঞ্জালদের
টেনে তুলবে। / আর হুঁশিয়ার মজুর! / সে ঝড় প্রায় মুখোমুখি॥"
(মজুরদের ঝড়)

পদ্যছন্দেও প্রচুর কবিতা লিখেছেন সুকান্ত। কিন্তু সেখানেও
গদ্যের এই বেপরোয়া বাধাবন্ধহীন ভাবটাই প্রধান হয়ে উঠেছে—

"প্রভাত আসিল, তপন হাসিল / আসিলেন রাজারাণী"—গোছের মৃদু মৃদু মিঠে মিল ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। গল্পের ঝড়ো হাওয়ায় দারুণ লড়াই-এর আহ্বান শুনলাম পত্ত ছন্দেই :

"ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয় নি জল / দেয় নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল / পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই/ ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেই কো ঠাঁই ॥ ( বোধন )

কিন্তু চিত্রকল্পের ব্যাপারেই সুকান্তর অবদান সবচাইতে বেশী। অন্ততঃ এই একটা ব্যাপারের জন্যও বাংলা কবিতা তাঁকে মাথায় করে রাখবে। বক্তব্য খালি কথায় বললেই পরিষ্কার হয় না। ধরা যাক "১লা মে'র কবিতা '৪৬" : যেখানে মার খাওয়া কুঁকড়ে যাওয়া মানুষকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করছেন। তারপরেই আবার তাকে বলছেন পোষমানাকে অস্বীকার করতে। বশ্যতাকে অস্বীকার করতে— "শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক / সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে ॥" কুকুরকে সিংহের কেশরে সাজিয়ে তার সিংহ হয়ে যাবার যে ছবি কল্পনা করা হল, সেখানে শুধু কথার নয়, লড়াই করে বেঁচে থাকবার অসহ্য আকুতি যেন চোখের সামনে, দৃশ্য হয়ে ভেসে উঠল। ঠিক একইভাবে সিগারেটের বিদ্রোহের ছবির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন জনতার বিদ্রোহকে। দেশলাই কাঠির জলে ওঠবার ছবিতে আসলে এঁকেছেন জনতার জলে ওঠার ছবি। একটি মোরগের কাহিনীতে মোরগের ছবিটা আসলে না খেতে পাওয়া, জবাই হওয়া মানুষের ছবি। আর সবচেয়ে অসাধারণ ছবি পাওয়া গেল বোধহয় 'প্রার্থী' কবিতাতে। যেখানে সূর্যের কাছ থেকে জড়ো করা উত্তাপ যেন সমস্ত বিভেদ আর অত্যাচারকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে, এই প্রার্থনা জানানো হচ্ছে :

....হে সূর্য্য ! / তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে / উত্তাপ আর আলো দিও, / আর উত্তাপ দিও / রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে। / ....শুনেছি, তুমি এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড, / তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে / একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে / পরিণত হব ! / তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা, / তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব / রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে। / আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী ॥" ( প্রার্থী )

সহজ সরল লৌকিক ছড়ার ছন্দও ব্যবহার করেছেন সুকান্ত যাতে সহজ সরলভাবে জীবনের সমস্যা আর বাঁচার রাস্তা উপস্থাপিত হয়েছে। ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে খেলার মধ্যে, মজার মধ্যেও সমস্যা আর তার সমাধানের হদিশ পায়। সবচেয়ে পুরনো ধাঁধাঁটা কেমন ভাবে হাজির হয়েছে দেখা যাক্ :

বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে / গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ? ..................বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য / ধনীর পায়ের তলায় তা[illegible] থাকতে কেন বাধ্য ? / হিংটিংছট প্রশ্ন এসব। / মাথার ম[illegible] কামড়ায় / বড়লোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায় ( পুর[illegible] ধাঁধাঁ ) 'মিঠেকড়া'-র পাতায় পাতায় এইরকম সহজ সুরের ছড়াছড়ি[illegible] এই একই সুরে সুকান্ত চিনিয়ে দেন সমাজের তথাকথিত কর্তাদের- "হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার / ব্ল্যাকমার্কেট করে ধনী র[illegible] পোদ্দার" কিম্বা সেই 'বরেনবাবু মস্ত জ্ঞানী, মস্ত বড় পাঠক' যিনি জি[illegible] রং কালো দেখে ভয়ংকর অবাক হয়ে যান। সরলসুরের এই[illegible] কবিতাতেই আবার শাসকসমাজের বীভৎস প্রকৃতি প্রকাশ প[illegible] আমরা শিউরে উঠি যখন "ধনপতি পাল তিনি জমিদার মস্ত / সূর্য রা[illegible] তাঁর যায় নাকো অস্ত", 'কি খেতে ভাল লাগে' ডাক্তারের এই প্র[illegible] নির্বিকার জবাব দেন, ' ...বলা ভারি শক্ত সবচেয়ে ভাল খেতে গরী[illegible] রক্ত।' ছোটদের স্বপ্নের রাজ্যেও শুধু বোকাদের স্বপ্নের রাজ্য [illegible] থাকেনি সুকান্তর হাতে। সেখানেও দেখি নতুন যুগের আর লড়াই চেতনায় ইঞ্জিন, লাইন, ঘণ্টা, সিগন্যাল জোট বাঁধে, হরতাল ক[illegible] আর এই দুনিয়ার নোংরামিকেও চিনিয়ে দেয় "ভেজাল ভেজ[illegible] ভেজালরে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়, ভেজাল ছাড়া খাঁটি জি[illegible] মিলবে নাকো চেষ্টায়।'

'ঘুম নেই', 'ছাড়পত্র' থেকে 'হরতাল', 'মিঠেকড়া' সবজায়গা[illegible] সুকান্তর আঙ্গিক, তার বক্তব্য আর বক্তব্য প্রকাশের উপযোগি[illegible] অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। আঙ্গিক কোথাও বক্তব্যের বিকাশকে [illegible] দেয়নি। সবার ওপরে সবসময়েই প্রাধান্য পেয়েছে সুকান্তর কবি ম[illegible] এ কবি 'মন বাস্তবজীবনের রক্তমাংসের দ্বন্দ্ব, মতাদর্শের সঙ্গে মানু[illegible] স্বাভাবিক দুর্বলতা, ভীরুতা কিম্বা যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসের লড়াই-এর [illegible] গড়ে ওঠা। কখনো কখনো তাই তাঁর কবিতায় উচ্ছ্বাসের ক[illegible] যুক্তির পরাজয় কিম্বা কাঁচা আবেগের জোয়ার কোথাও আবার দ[illegible] যুক্তিনিষ্ঠ আবেগ, দুর্বার ঘৃণা আর সাহস। যে সুকান্ত একদিন চি[illegible] লেখেন :

"বাস্তবিক আমি কোথাও চলে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে মি[illegible] যেতে চাই....কোন গহন অরণ্যে কিম্বা অন্য যে কোন নিভৃততম প্রদে[illegible] যেখানে মানুষ নেই, আছে কেবল সূর্যের আলোর মত স্পষ্টমনা [illegible] আর নিরীহ জীবেরা আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ" ( পত্রগুচ্ছ )

সেই সুকান্তই আবার জনগণের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধে একাত্ম বলেন,

"বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে / আমি যাই তারি দিনপ[illegible] লিখে........বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদিকে।" আর ব্যক্তিগত জীব[illegible] রক্তমাংসের এই যুদ্ধে উৎরে গিয়েই মতাদর্শকে তিনি প্রাণের গ[illegible] বেঁধে নিয়েছিলেন বলেই তাঁর কবিতা আর স্বপ্ন কখনই 'ব[illegible]

ফলমের' স্বপ্ন বলে মনে হয় না, তার স্বপ্ন জীবনের হাতে গড়া মজবুত স্বপ্ন।

জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্তর কবিতা যখন ঘরে ঘরে নতুন দিনের চেতনা জোগাতে শুরু করেছে ঠিক তখনই মাত্র একুশ বছরেরও আগে অকালমৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিল। যক্ষা রোগে প্রায় বিনাচিকিৎসায় যাদবপুর যক্ষাহাসপাতালে সুকান্তর অকালমৃত্যু হল ২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪ সালে। কিন্তু এ মৃত্যু তো তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারল না। মরণের এপারে সুকান্ত যা রেখে গেল সে তো মরণের অতীত।

বাংলা কবিতায় সুকান্তের অভাব পূর্ণ হবার নয়, অন্ততঃ যতদিন না আরেকটা সুকান্ত জন্মাচ্ছে। আজকের ব্যাধিগ্রস্ত বাংলা কবিতা যেন সুকান্তর শেষদিনগুলোর মতই অসম্ভব অপূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে যক্ষারোগীর মতন কেশেই চলেছে, কেশেই চলেছে। সুকান্তর আরোগ্যের জন্য তাই একদিন এযুগেরই আরেক শক্তিধর পুরুষ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল সে আকুলতা তো আমাদেরও—শুধু সুকান্তর জন্যই নয় গোটা বাংলা কবিতার মুক্তির জন্যও :

চৈত্রের পরিচয়ে তুমি সূর্য হতে চেয়েছো।
তোমার যক্ষা হয়েছে ?
তোমার তরুণ রশ্মি দেখে ভেবেছিলাম,
বাঁচা গেল, কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।
তোমার যক্ষা হয়েছে ?
এও বুঝি ষড়যন্ত্র রাত্রির মেঘের,
ঊষায় যারা আজ দুর্যোগ ঘটালো।
বুলেট ছেঁদা করে দিচ্ছে তোমার উলঙ্গ ছেলেটার বুক,
তোমার বুক কুরে কুরে খাচ্ছে টি বি কীট।
দুর্যোগের ঘনকালো মেঘ ছিঁড়ে কেটে
আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইবে জয়গান ?
বসন্ত কোকিল কেসে কেসে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত !

**বিজ্ঞান ও সামাজিক দায়িত্ববোধ**

# একটি ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা

জনৈক গবেষক

সম্প্রতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যে ঘটনায় আমাদের গর্ববোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ঘটনাটি ছোট্ট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। এর তাৎপর্য সঠিক ভাবে বুঝতে হলে, আধুনিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সম্বন্ধে দু-একটা কথা জানানো প্রয়োজন। বর্তমানে এই পদার্থবিদদের মধ্যে একাধিক স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। এঁদের সবচেয়ে ওপরের স্তরে রয়েছেন কয়েকজন 'উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক' যাঁরা পদার্থবিদ্যার দুরূহতম দিকগুলো সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য-ভাবে আলোকপাত করেছেন এবং করছেন, এঁদের সম্পর্কে অন্যান্য পদার্থবিদদের আর সাধারণ মানুষের (যাঁরা পত্র-পত্রিকা মারফৎ এঁদের সম্পর্কে কিছু জানেন) ধারণা অনেকটা দেবতার মত। বহু জটিল বিষয়ে এঁরা বৈজ্ঞানিক অনুমানের ভিত্তিতে এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণায় আশ্চর্য রকম ভাবে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। এঁদের মেধা এমনই তীক্ষ্ণ যে মেধার ভিত্তিতে এঁদের অতিমানুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই সব প্রথম সারির বৈজ্ঞানিকের পরে আরও অনেকগুলো স্তর রয়েছে। আমরা সবগুলোর কথা আলোচনা না করে, কেবল সর্বশেষ স্তর সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলবো। এই স্তরে রয়েছেন সেই সব অখ্যাত গবেষকরা যাঁদের এক অর্থে গবেষক সমাজের ভারবাহী গর্দভ বলা চলে। এঁরা কোনও গবেষণাগারে নামী দামী পদে অধিষ্ঠিত নন ; এঁদের কাজের ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলেও প্রায়শই

ন্যূনতম সুযোগ সুবিধায় এঁদের কাজকর্ম করতে হয়; এঁদের ওপর-ওয়ালার মন জুগিয়ে চলতে হয়; অনেক ক্ষেত্রেই এঁদের আর্থিক অসুবিধাও ভোগ করতে হয়; বেশ অসুবিধা সহ্য করে কাজ করে কোনও নামকরা গবেষণা পত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারলে এঁরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ গবেষকই এই শ্রেণীভুক্ত আর উপরোক্ত প্রথম সারির পদার্থবিদরা প্রায় সকলেই ইউরোপ আমেরিকার লোক। কেন এই ব্যাপার হয়েছে সেই সামাজিক অর্থনৈতিক প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও এইটুকু বলা প্রয়োজন, আমাদের দেশে শেষোক্ত শ্রেণীর গবেষকরা যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গবেষণা করেন ও বিমূর্ত গবেষণা সম্পর্কে তাঁদের অহেতুক মোহ রয়েছে, তথাপি এর মূল দায়িত্ব কিন্তু তাঁদের নয় এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাধ্যমত তাঁদের সৃজনীশক্তিকে যথার্থ দেশের কাজে লাগাতে চান। কেবল পদার্থবিদ্যা নয়, অন্যান্য বিষয়ের গবেষকদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও, ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার কিছু বৈজ্ঞানিকের কথা বলা যেতে পারে, যাঁরা কিছুদিন আগে দেশের লোকের সামনে তাঁদের কিছু ওপরওয়ালার বিজ্ঞানের নাম করে বিরাট ধাপ্পার স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন। এই ওপরওয়ালারা প্রচার করেছিলেন যে তাঁরা নাকি এমন গম উৎপন্ন করেছেন যার মধ্যে প্রোটিন অংশ খুবই বেশী। উপরোক্ত কিছু সৎ বিজ্ঞানী বলেন যে এটা সর্বৈব মিথ্যা প্রচার, এর ফলে গবেষক সংস্থার কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করেন।

যাই হোক ঐ প্রথম সারির 'জ্যোতিষ্কদের' সম্বন্ধে এইসব অখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের অনেকেরই এক অদ্ভুত ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে। এই শ্রদ্ধার মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে ঐ জ্যোতিষ্কদের মাধ্যমে এই সংখ্যাগুরু সাধারণ গবেষকদের মনে তাঁদের বিমূর্ত গবেষণার প্রতি মোহ জাগিয়ে রাখার চেষ্টা সবসময়ই করা হয়; অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রের বাইরে ঐ সব জ্যোতিষ্কদের প্রায়ই একটা অন্য মূর্তি থাকে যা চরমভাবে মানবতাবিরোধী। অনেকের সরাসরি মানবতাবিরোধী মনোভাব না থাকলেও তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের প্রবক্তা। এঁদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন এঁদের মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের সমালোচনার বাইরে রাখা হয় অন্যদিকে তেমনই নানা রকম বিবৃতি ও রচনার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি-ক্রিয়াশীল দর্শন ছড়িয়ে দেওয়া হয় আর তাঁদের প্রতিভার ওপর শ্রদ্ধা থাকার দরুণ সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই তা বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট্ট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটার বিবরণে আসা যাক। ডঃ রোজার ড্যাশেন (Roger Dashen) নামে এক বিখ্যাত পদার্থবিদ্ সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন ও গত ৩রা মে তারিখে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর এক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। এখন ডঃ ড্যাশেন হলেন 'জ্যাসন' (Jason) নামে আমেরিকার এক কুখ্যাত সংস্থার এক উল্লেখযোগ্য সদস্য। এই সংস্থার কাজ হলো যুদ্ধের জন্য অতিমারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কৌশল উদ্ভাবন করা। Nail bomb, Computerised Electronic warfare, Laser bomb—ইত্যাদির কৌশল উদ্ভাবনে এই সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য। এইভাবে এই সংস্থা সরাসরি ভিয়েতনাম ও অন্যত্র গণহত্যায় সাহায্য করেছে। গেল-ম্যান্, ড্রেল ইত্যাদি বিখ্যাত পদার্থবিদেরাও এই কুখ্যাত সংস্থার সদস্য। ৩রা মে ডঃ ড্যাশেন বক্তৃতা দিতে উঠলে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন সৎ বিজ্ঞানী 'জ্যাসন' সংস্থার কীর্তিকলাপ বিবৃত করে এক প্রচারপত্র বিলি করেন ও তাঁদের একজন তা পড়ে শোনান। এর পর ডঃ ড্যাশেনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্বীকার করেন যে তিনি জ্যাসন সংস্থার সভ্য, কিন্তু তিনি মনে করেন যে ভিয়েতনামে গণহত্যা হয়নি। তাঁর এই জঘন্য মিথ্যা ভাষণে সভায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ও তাঁকে বলা হয় যে তিনি যখন গণহত্যায় পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন তখন তিনি যেন বিমূর্ত পদার্থবিদ্যার জটিল সমস্যাবলীর ওপর বক্তৃতা দেওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান। এই সময় অনেক শ্রোতাই বক্তৃতা কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান ও ড্যাশেনের বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। ৪ঠা মে'র Patriot পত্রিকায় এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাবে।

স্বাভাবিক ভাবেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরওয়ালার দল ঐ সৎ ও সাহসী বৈজ্ঞানিকদের অভিনন্দনযোগ্য কাজে খুশী হননি ও নানারকম মিথ্যা অতিরঞ্জন সহকারে এই ঘটনাটির সম্বন্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তাঁদের অসন্তোষভাজন হবেন জেনেও ঐ বৈজ্ঞানিকেরা যে কাজ করেছেন তা প্রমাণ করছে যে তাঁরা যথার্থ মানবতাবাদী মনোভাবের অধিকারী। ভারতবর্ষের সকলশ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে গবেষক সম্প্রদায় তাঁদের এই কাজ থেকে অনুপ্রেরণা পাবেন। এদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে সমাজসচেতনতার ক্রমশঃ বিকাশ ঘটছে ওপরের ঘটনা তারই ইঙ্গিত বহন করে। বর্তমান পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে বিশেষ করে ভারতবর্ষের বুকে আজ যখন বিদেশী প্রভুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা কায়দায় অত্যাচার চলছে ও মানবতা যখন যূপকাষ্ঠের বলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তখন ছোট হলেও এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হতে বাধ্য।

# শৈশব

শংকর বসু

**পূর্বকথা :** ঢালাই কারখানার হাতুড়ী পেটার বুকচাপা আর্তনাদ থামলে সন্ধ্যে হয়। সূর্যাস্ত দেখার বাতিক নিয়ে সন্তু জলামাঠে দাঁড়িয়েছিল। আর ছেলেটার ব্যাকুল চোখে আশা জাগিয়ে অন্নু ফিরল। সারাদিন মার জন্যে সন্তুর কষ্ট হয়েছিল। বড্ডো কষ্ট। এরমধ্যে চম্নুর মা রুটি খেতে সেধেছে। চম্নু নামের মেয়েটা বারবার ডেকেছে। সন্তু গোঁজ হয়ে ছিল। মা আসতেই ও এক ছুটে গিয়ে বর্ণপরিচয় খুলে বসেছে। অন্নু এক বাটি আটা ধার করে আনল! চোরের মতো, কাপড়ের তলায় লুকিয়ে সরকারী কি একটা টাকা পাওয়ার কথা আছে, সন্তু শুনেছে। সেটা পেলে চারটে রেশনের নিশ্চিন্তি। গুড় দিয়ে শুখ্‌নো রুটি চিবোতে গিয়ে সন্তুর দুধের দাঁত নড়ল। ইঁদুরের গর্তে দিয়ে এল, দিদির সাথে গিয়ে। ততক্ষণে সরি কানাই মাষ্টারের পাঠশালা থেকে ফিরেছে। সন্তু কানাই মাষ্টারের পাঠশালায় যেতে চায় না। কিন্তু অন্য স্কুলেও কোনদিনই যেতে পারবে না। ওরা যে গরীব। অথচ সন্তু জানেনা কেন। মা বলে, বাবা নেই বলে। সন্তু দেখেছে পাইপপাড়ার নেংটি পড়া ছেলেটাও ভীষণ গরীব। অথচ ওর বাবা আছে। তবে কি মা জানেনা? এই কেন'র উত্তর খুঁজতে খুঁজতে কখন যে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ২ ॥

—চিক্কইর দিয়া পড় ……ক্যান ?….আওয়াজ নাই ক্যান ?….জানি ফাকাইয়া আছোস…. …।

অন্নু আর সন্তুর দিকে তাকায় না। অদ্ভুত একটা বেগে কথাটা বলেই ঘাটে গেল। শুকনো পেয়ারা পাতা পায়ের তলায় পিষে, খস খস শব্দে। দাওয়ায় ছালা বিছিয়ে সন্তু ঢুলে ঢুলে পড়ছিল। তালব্য শ আর ঠ……শ….ঠ….অ…। মানে? আবার মানে! শঠ মানে কি? সন্তু ফ্যালফ্যাল করে চারদিক দেখল। অন্নু নেই। ঘাটে গ্যাছে। আর থাকলেও কি জিজ্ঞেস করা চলত? মেজাজ এখন তিরিক্ষি হয়ে আছে। আর অন্নুর আমসি মুখে যখনই কনকনে ঠাণ্ডাভাবটা হামলে পড়ে অন্নুকে গিলে ফেলে, চোখের মনি অসহায় ভাবে ভাসতে থাকে, তখনই সন্তুর বুকের কাছে শক্ত ডেলার মতো কি একটা আটকে যায়। তখন সন্তুর চিক্কইর দিয়া কানতে ইচ্ছা হয়। সন্তু জানে আসলে মাও কান্নার একটা বমির মতো বেগ দম বন্ধ করে তলপেটে চালান করে দিচ্ছে। সন্তুর মুখে সকাল থেকে এতো বেলা অব্দি একখানা শুক্‌নো রুটি দিতে পারেনি, এযে অন্নুর কি কষ্ট তা সন্তু বোঝে। সন্তু টের পায় তার দিকে মার যত টান, দিদির প্রতি ততটা নয়। সন্তুকে আদর করে একরাশ থোকা থোকা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে অন্নু কতবার বলেছে : সোনার আংটি আবার বেঁকা! সন্তু তখন ভাবে—দিদি কি ফ্যালনা নাকি! দিদি কি মানুষ না? মা বলে : মাইয়ামানুষ। অথচ সকালবেলায় দুধের লাইন, ক্যাওড়াপট্টি পেরিয়ে জোলো মাঠ হাতড়ে কচুরলতি আনা, ভোলাদার কাঠের গোলায় ধর্না দিয়ে ফুলকি আনা, সব….সবই দিদি করে। তবু দিদি মেয়েমানুষ। কি এক অজ্ঞাত কারণে দিদি মানুষ নয়, মেয়েমানুষ।

অন্নু ঘাট থেকে ফিরল। চুলের গোছা কপালের বিনবিনে ঘামের সাথে ল্যাপটে আছে। সামনের উঁচু দাঁতটার একটুখানি দেখা যায়। দুম্ দুম্ শব্দে অন্নু কাজ করছে। এখন ঘর পুঁছছে, উবু হয়ে। সন্তু স্পষ্ট দেখতে পেল মার মুখে এক ধূসর মেঘের জোলো ছায়া। সন্তু জানে এই মেঘ জলীয় বাষ্পে গড়া। কখন যে নিঃসাড়ে টিপটিপিয়ে নামে সেই আশঙ্কায় ছেলেটা চোখের পাতা টান মেরে চিরে চেয়ে আছে।

সরি গ্যাছে কানাই মাষ্টারের ক্লাবে। দুধ আনতে। সেই সকাল বেলা গ্যাছে, এখনও ফেরার নাম গন্ধ নেই। লম্বা একটা লাইন পড়ে। ক্যাওড়াপট্টি, কাঠগোলা বস্তী, আর সুলতান আলম স্ট্রীটের ছেলেবুড়ো ছানাপোনার ঠেলাঠেলি গাদাগাদি। খিস্তিখেউর আর বদরাগী কানাইদার চড়চাপট সইতে সইতে লাইনটা এগোয়। দুধের লাইন। হাতে হলদে কার্ড নিয়ে। দুধ দেওয়ার আগে কানাইদা খস খস করে কার্ডে কি একটা দাগ কেটে দেয়। যাতে ঠকিয়ে দুবার না নিতে পারে। তবু হাড্ডিসার ছানাপোনার দল ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে মার খায়। হাতের সুখ মিটিয়ে কানাইদা মারে। সরির ফিরতে আজ বড্ডো বেলা হচ্ছে। সন্তু ভাবল দিদির কাছে মানেটা জেনে নেবে। আর কথাটা ভাবতেই কেমন একটা নিশ্চিন্তি এল।

সন্তু এখন 'চিক্কইর' দিয়ে পড়ছে। মাকে খুশী করার আশ্চর্য্য

লোভে। সত্যি মাকে খুশী করাটা সন্থুর কাছে একটা লোভ। চন্নুর মা যখন বলে : দেইখেন অন্নদি ছাওয়াল আপনের সব দুঃখ ঘুচাইব········ কিরে সন্থু কথা কস না ক্যান। সন্থুর কি তখন কথা বলার ক্ষমতা আছে! তখন অজস্র কথা, বিচিত্র অনুভূতি আর একটা আশ্চর্য্য আনন্দ তালগোল পাকিয়ে সেই গোঙা মানুষটার মতো হয়ে যায়, ভিক্ষে করতে এসেও যে মানুষটা পেটের খিদের কথাটা বলতে পারে না। হাত পা নেড়ে, জান কবুল করেও কথাটা বলতে পারে না। মুখের কষ বেয়ে লালা গড়ায়—অ্যা···অ্যা····অ্যা····অ্যা। আর লুলার মতো হাত দুটো ঝোলে। সন্থুর তখন সেই অবস্থা। লুলার মতো একটা অসহায় ভাব বুকের ভেতর গোঙরায়। সন্থু দেখেছে আনন্দটা যদি একেবারে বুকের ভেতর বিঁধে যায় তখন কেমন একটা অসহ্য অস্থিরভাব জাগে। সন্থুর তো এমন আকছারই হয়। কি যে আছে বুকে, মানুষের বুকে।

ঢাকের বুকে কাঠি বাজে। বারোয়ারী তলা, কাঠগোলা, নতুন কলোনী আর পাঁকপচাডোবা পেরিয়ে ঢাকের বাড়ি গুড়গুড় গুড়গুড় করে এগোয়।

········ট্যাং····টা···ট্যাটাং····ট্যাং···টা···ট্যাটাং··ট্যাং···। ঢাকের বাড়ি না, যেন ডাক পাড়ছে। কাঠি যেন খেলিয়ে খেলিয়ে কথা ফোটাচ্ছে। ঢাকের বুকে। সন্থু তাল দিতে দিতে এসেছে। আর সোঁদোরবনের মানুষটার থ্যাবড়া পা আগুপিছু সরে। এগোতে এগোতে তাল ঠুকে মাথায় ঝাঁকি মারে। কাঠিটা ঢাকে ছোঁয়ায় কি ছোঁয়ায় না। সাথে সাথে বোল ফোটে। আবার ঝাঁকি মারে। কি যেন আছে ঢাকের শব্দে। মানুষটার হাতে। বুকের ভেতর শব্দটা হামা দিতে থাকে। আর রক্ত ফোটে। শরীরটা চঞ্চল হয়····ট্যাং···· টা...ট্যাটাং....।

বারোয়ারী তলায় থুথ্‌থুড়ে নিমগাছটার জড়দগব গুঁড়ি ছুঁয়ে প্যাণ্ডেল। তেরপলের পর্দা টাঙিয়ে তখন দূর্গাকে ঢেকে রেখেছে। মা বলে : দুগগা পরতিমা। কখনও কখনও শুধু 'পরতিমা' বলে। ঢাকের বাড়িতে সন্থুর মার কথা মনে পড়ে, পরতিমার ভরা সুখী মুখ চোখের মনিতে জলজল করে। মোষের কাটা মুণ্ডু আর ড্যাবড়া চোখ ঢাকের বোলে সাফ জেগে ওঠে। সন্থু পরতিমার মুখ দেখতে পারল না। কেওড়াপট্টির ছেলেদের পেছনে লুকিয়েছিপিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কানাইদা যে সামনেই। ফস ফস করে সিগারেট টানছে। এখানেও কানাইদা। কানাইদা যেন ভগবানের মতো। রাজার মতো। টালীগঞ্জ সুলতান আলম ষ্ট্রীটের ঘেয়ো-ঘুপচি বস্তীর বুকে দাপিয়ে বেড়ায়। একে চাবকে সিধে করে, গায়ে হাত বুলিয়ে আরেকজনকে উচ্ছনে পাঠায়। মণ্ডপের সামনে কানাইদার ভিট্টি কপাল আর বিশাল নাক দেখে সন্থু এগোল না। কানাইদার নাকের প্রকাণ্ড ছ্যাঁদা আর শুঁয়োপোকার রোঁয়ার মতো লোম দেখলে সন্থুর কেমন গা শিরশির শিরশির করে। ক্যাওড়া পাড়া কাঠগোলা বস্তী আর নতুন কলোনী মানুষটার ভয়ে ডরপুক আঁড়গুলার মতো পাখনা ঝাপটায়, ফর্‌র ফর্‌র করে। মানুষটার দাপটে। চন্নুর মা বলে—শনিঠাকুর। তেজে অস্থির। সন্থুর তাই 'কানাইদাকে দেখলেই ভগবানের কথা মনে হয়! আর ভগবানে সন্থুর বড্‌ডো ভয়। বড্‌ডো রাগ। অন্ন কত ডাকে ভগবানকে তবু ওদের দুঃখ ঘোচে না। সন্থুও কতবার মানত করেছে : হে ভগবান বাবুকে এনে দাও (সন্থু বাবাকে বাবু বলে। দিদির কাছ থেকে শিখেছে আসলে। সন্থুর তো আর বাবার কথা মনে নেই। কুট্টি বোন তো দেখেই নি)। শালা শোনেনি। হারামী। মনে মনে গাল দিচ্ছিল ছেলেটা। সন্থু আরও গালাগালি জানে। একবার মার সামনে কি একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিল। আর ঠেঙানি কাকে বলে। ক্যাওড়া পাড়ার গলুদের এসব বালাই নেই। গলু তো রাগলে যা তা বলে। মা বাবার সামনেই। কেউ কিচ্ছু বলে না। অথচ সন্থুর যেন রাগ নেই। ও যেন মানুষ নয়। অন্ন গলুর সাথে মাখামাখি পছন্দ করে না : লেখে না, পড়ে না অর সাথে তর বন্ধুত্তা কিসের। লিখলেই যেন সব হল। পড়লেই যেন সব উদ্ধার হয়ে গ্যালো। পারবে গুলতি দিয়ে উড়ন্ত হাঁস মাটিতে টেনে নামাতে? তবে বুঝব। গলু পারে। গলু সব পারে। ও না থাকলে ওদের বাড়ীতে আর কোনদিন মাংস চড়ত না। আর কাঁকড়া ধরে··উফ্‌···।

কানাই মাষ্টারের চোখ পড়ল সন্থুর দিকে। ঢাকের বাড়ি সমানে চলেছে। আর সোঁদরবনের মানুষটার নাচন কোঁদন। বাড়ী বাড়ী পালা করে মানুষটা খায়। গেল বছর চন্নুর মার ঘরে একবেলা পাত পেড়েছিল। তাল পাতার পাখা নেড়ে বাতাস দিচ্ছিল চন্নু। মানুষটা বছরভর জমিনে লেগে থাকে। জমিন থেকেই পেটখরচা চলে। আর পাছার কাপড়ের জন্যে, বৌর পেতলের নাকফুলের জন্যে, হয় বাজনদার। কোলকাতায় বায়না নিয়ে আসে। এখন নাকি সব গ্যাছে। বাজনদারের ভাত নেই। চন্নুর মার কাছে দুঃখের গাজন গাইছিল মানুষটা : আকাল নেগেছে মা। আকাল। খেতভরা কাঞ্চা সোনা আর মানুষ শুখাইন মরছে। কাতারে কাতারে।

সোঁদরবনের বাজনদার। ঢাকের বোলের ভেতর নামটা যেন গুড় গুড় করে ডাকছে। আর সন্থু ভাবে মানুষটা কোত্থেকে এতো আনন্দ পায়। ভাবে আর অবাক হয়। ঢাকের বুকে আহ্লাদ যেন মোমের মতো গলছে। গলে গলে পড়ছে। হঠাৎ কানাইমাষ্টারের গরুর মতো চোখ ঘুরঘুর ঘুরঘুর করতে করতে সন্থুর মুখে দাঁড়াল। সন্থুর সাথে চোখাচুখি হল। সাথে সাথে ছেলেটা দুদ্দার ছুটতে লাগল।

বাড়ীর পেছনে লিকলিকে কুলগাছটার লতার মতো ডাল মুঠো করে ধরে সন্থু দম নিচ্ছে। ঢাকের বাড়ি তখনও কানে বাজছে।

ৎ ওর চোখছুটো উপড়ে নিয়ে কে যেন রেললাইনে আছড়ে ফেলল। কর শব্দটা কখন যে ইঞ্জিনের সিটি আর চাকার ঘিসঘিস ঘ্যাসঘ্যাস কচু কাটা হয়ে গ্যাছে। চন্নুর বাবার ম্যাজিকের মতো। এখন ন। ইঞ্জিনের শব্দ। আর সবুজ ট্রেন। বাবুর বাড়ী ফেরার । সন্নু মার মুখে শুনেছে ওর মুখটা নাকি বাবার মতো। অবিকল র মতো। বাবার কথা মনে পড়লেই সন্নুর কেমন একটা গর্ব । বাবার জন্ম ওর গর্ব হয়। আর কারো বাবার এতো সাহস নেই। জির জোর নেই। সন্নুর বাবা দেশের জন্তে লড়েছে। সন্নু দেখেছে র কথা উঠলেই অনেকে সন্নুর দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকি-। মার মুখেই তো কত্তো শুনেছে। পিকেটিং। বিলেতি য়ের দোকানে আগুন। আগুনের নাচন।

আরও কত⋯সব মনেও থাকে না। ফরিদপুরের কালেক্টরকে নাকি পদ্মায় চুবুনি খাইয়েছিল। ইংরেজ খেদানোর লড়াই। ইংরেজ চলে গ্যাছে। তবু বাবা কেন ফিরছে না? ছেলেটা আকুল হয়। ঢাকের বাড়ির শব্দ আর কানে আসে না। বাবার জন্তে সন্নুর বুকটা ফিনফিন করে কাঁপে। বাবাকে যে সন্নু কতো ভালবাসে শুধু সেই জানে। অথচ ও কোনদিন বাবাকে দেখেনি। ওহো ছে (মার কথা অনুযায়ী), কুট্টি বোন বাবাকে না দেখেই মুখে তুলে চলে গ্যাছে। কুট্টিবোন। কুদি কুদি হাত। আহা কেন াকা মেয়েটা মরল!

াত হলে, গভীর রাত্তিরে অন্ন ছেলের পিঠে আলতো হাত রেখে খার গল্পের বদলে সেই মানুষটার কথা বলত: তর বাবায় একটা ছিল, বুঝলি সন্নু। দশ বিশটা গেরামের মানুষ চিনত⋯হ মানুষ । আর শুনতে শুনতে সন্নু ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় : বাবু আমি তোমার মতো হবো⋯।

রললাইনের ওপর এখন কুসুম কুসুম সূর্যের আলগা আলো। এতো তেও সূর্যটা বেজায় ঠাণ্ডা। সন্নু লাইনের দিকে দূরাগত কোন র প্রত্যাশায়, মিঠে আলো আর ঢাকের বোলের রেশটুকু নিয়ে য় যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। নিটোল এক স্বপ্নের মতো।

—কি রে!

—উ।

—চোখ বুজিয়ে কি ভাবছিস?

ঠাৎ কখন যে রণ এসে দাঁড়িয়েছে সন্নু টেরই পায় নি। রণর চেয়ে এবার ও হেসে ফেলল। ফোকলা দাঁতে। দুজনে পুকুরের জলে চুনোমাছের দেয়ালা দেখল খানিক। ঢাকের শব্দে রণ খাড়া করল। সন্নুর ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর হঠাৎ কি হল রণ হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল: চ আমাদের বাড়ী। আর তারপরই । সন্নুর দুবলা পাতলা আপত্তি ছোটার বেগে খান খান হয়ে ভেঙে গেল। শেষে ছুটতে ছুটতে হাঁফ ছেড়েছে: তোর মা কিছু বলবে না তো?

—ধুস্!

—সত্যি?

—হুঁ। মা বলে তোকে কত ভালবাসে!

—কেন রে?

—এমনি।

সন্নুদের বাড়ীর পেছনে ওষুধ কোম্পানীর চ্যাপ্টা থালার মতো হলুদ ডোবা। জলামাঠ। আর বুনো ঘাস। জলামাঠ পেরিয়ে রেফিউজীদের হোগলার বেড়া। জবরদখলের জমি। হঠাৎ একদিন মানুষগুলো হাঁড়িপাতিল বালবাচ্ছা নিয়ে এখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ৪৭ সন। স্রোতের শ্যাওলার মতো মানুষজন ভাসতে লাগল। সেই ভাসমান মানুষের একটা দল এখানে শেকড় গাড়লো। সন্নুর চোখের সামনে। বছর দুই আগের কথা। দুটো বছরে কত কাণ্ডই না হল!

যুদ্ধ, বোমা। দেশ স্বাধীন, দেশভাগ। স্বাধীনতা, মন্বন্তর। আর অবুঝ ছেলেটা ভোর রাত্তিরে বিউগলের যুদ্ধ যুদ্ধ শব্দে তরাস্ খেল। তরাস্ খেয়ে জেগে উঠল। আর জেগে উঠেই সারা রাত্তির প্যাটের বেদনায় কাতর উপোসী অন্নকে ঠেলতে লাগল: মা! অ মা! অন্ন ধরফড়িয়ে উঠল। সরি তখনও ঘুমে বেহুঁশ। আর ও ঘুমোলেই মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। চ্যাট চ্যাট করে। অন্ন উঠতেই বিউগলের শব্দটা শুনতে পেল। অসাড়, শিরা জাগা হাত দুটো আপনা থেকে কপালে ঠেকল। রেফিউজীদের ডেরায় লেড়ীকুত্তার মতো খোঁচপেট ফেঁড়ে শাঁখ বেজে উঠল। বুকের দম উজাড় করে ঢেলে কারা যেন আমৃত্যু শাঁখ বাজাতে ব্যস্ত। সন্নু জানে ভূমিকম্প হলে শাঁখ বাজায়। বসুন্ধরা চির খেলে, টালমাটাল হলে হুঁশিয়ারি দিতে শাঁখ বাজে। শাঁখ বাজে অমঙ্গল ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে। আট বছরের ছেলেটা তরাস্ খেয়ে তার মাকে ঠেলে: অমা! মা!

—কি হইল?

—ভূমিকম্প হচ্ছে।

— আলইক্কা!

—শাঁখ বাজছে শোন না।

— হা আমার পোড়াকপাল! আইজ স্বাধীনতা⋯রাত্তর কালে কানাই আইসা বইলা গেল⋯মনে নাই।

কি বুঝল কে জানে, ছেলেটা কেবল মার বুকের হাড়ে ল্যাপটে গ্যালো। বিউগলের শব্দটা কানের পর্দা ছিঁড়ে মস্তিষ্কে গিয়ে তোলপাড় করতে লাগল। আট বছরের কাঁচা মস্তিষ্কে। আর রেফিউজীদের শাঁখের ডাক উন্মাদের মতো চড়তে লাগল। সন্নু মার

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করেছিল : মা বাবু ফিরবে না এখন ?

—হ, ফিরবো। নিশ্চয় ফিরব। না ফিইরা যাইব কই! কই যাইব ?

তখনও স্বাধীনতার জের কাটেনি। রায়টের তাণ্ডব কমে নি। হিন্দু-মুসলমান রায়ট। রায়টের আগে মিলিটারী। রায়টের পরে মিলিটারী। আর বুকফাটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ গম্ভীর আকাশটাকে ছ্যাঁদা করছিল : কানাইদা আমি····আমি····আমি রসুল ··তোমার ভাইয়ের····। তারপর কঁৎ করে একটা শব্দ। রসুলের একটা পা ঘষটে ঘষটে থির হয়ে গ্যালো। সদু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। বুকের ভেতর বর্শার ফলার মতো প্রশ্ন বিঁধিয়ে, ছেলেটা হৃৎপিণ্ড ফালা ফালা করে খুন বইয়ে দিল। ভেতর ভেতর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল নিশির ডাকে, মানুষের আর্তনাদে : আল্লাহ্····ভগমান···। আর রক্ত। মানুষের রক্ত।

এর মধ্যে হাঁড়িপাতিল আর ছেঁড়া মাদুর বগলে নিয়ে রণদের দলটা এল। ভাসতে ভাসতে এল। জলা মাঠে খুঁটা গাড়ল। আচ্ছাদন। মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন চাই। জমিদার আর পুলিশের তাণ্ডব শুরু হল। জেলকির মতো সোঁ সোঁ করে রাক্কুসে মাটি খুন চুষে নিল। হতভাগা মানুষের খুন। জমিদার আর পুলিশের হামলায় পেট চেপে কেউ কেউ বালবাচ্ছার হাত ধরে পালাল। যারা টিঁকে গ্যালো ধীরে সুস্থে কাম কাজ ধান্ধা জুটিয়ে কোন মতে বেঁচে আছে। রণর বাবা তাদের একজন। রণ'র বাবার মাথায় আধলা ইঁট পড়েছিল। তবু নড়েনি। মাথায় হাত চেপে দাঁত কিড়মিড় করছিল : মরলে এইখানেই মরুম। তারপর একদিন রণর ঠাকুমা চশমার সুতলী কানে জড়িয়ে লম্ফ'র পলতে উসকে দিল। পদ্মপুরাণ খুলে বসল। বেহুলার উপাখ্যান : ভাইস্যা যায় রে···· ভাইস্যা যায়। রণ'র ঠাকুমার গাঁজানো ভাতের মতো চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জলের ফোঁটা গড়ান দেয়। বেহুলার দুঃখে অন্তরটা কান্দে। কাপড়ের খুঁটে চশমার কাঁচ পুঁছে ধরা ধরা গলায় বেহুলার ভাসান পড়ে :

ওয়া বালি চোওয়া বালি বিষের নাম<br>
কোন কোন বিষের কোন কোন ধাম<br>
বিষ অ নাই····নাই····রে<br>
লখাইর শরীলে বিষ····অ নাই।

সন্ধ্যে হলেই বেহুলার ভাসান গাইত রণ'র ঠাকুমা। অন্ন বলত : বাপের জম্মে শুনি নাই যে সন্ধ্যাবেলা পদ্মপুরাণ গায়। পদ্মপুরাণ গাইতে লাগে দুপইরা সময়। আর সদু মাকে তিতিবিরক্ত করে তুলত : মা বেহুলার জন্ম রণ'র ঠাকুমা কাঁদে কেন, পানের দোকানের রসুলের জন্যে তো কেউ কাঁদে না ? আচ্ছা বেহুলা কি বেঁচে আছে বেহুলার কি খু····উ····ব····কষ্ট ? বলো না মা!

অন্ন তখন সদুকে কোলের ওপর টেনে কোঁকড়া চুলে আঙু চালাত : হ, বেহুলা অগনও বাঁইচ্যা আছে। লখাইর দংশন পড়ে লখাইর জীয়ন অব্দি পড়তে লাগে। নাইলে পুত্র শোক হয়। বেহু এক অভাগা নারী····আর লখাইর রূপের খ্যাষ নাই। টিকালো না আর আগলভাগল চক্ষু····।

সদুর চোখের পাতার রাক্কুসে ফাঁক বুঁজে এল। ধূসর ছায়া নামে চোখের পাতা যেন পদ্মপাতার মতো, এক ফোঁটা জল ধারণের ক্ষম নেই। টলটল টলটল করে। লখাইর রূপের বর্ণনা ওর মন টানে পারে না। অকূল সমুদ্রে ভাসমান মান্দাস, আর দুঃখিনী বেহু সদুর মনটাকে যেন লখাইর হাড়গোড়ের সাথে কাপড়ের খুঁটে গিঁ দিয়ে বেঁধে ফেলে : আচ্ছা মা বেহুলার এ্যাতো কষ্ট কেন ?

"তয় শোন····।" অন্নর গলার স্বর পালটে গেল। অদ্ভুত চিকন সারা মুখ জুড়ে ভয়ানক গম্ভীর এক ছোপ। আর সদু হাঁ করে ম কথা গেলে।

"····লখাই হইল চান্দো বাইন্যার ছাওয়াল। চান্দো বাইন্যার জে ভাঙনের লাইগ্যা বেহুলার স্বামী লখাইরে দংশন করাইল মনস সর্প দংশন। বিষের ঢল নামল লখাইর শরীরে। সোনার অ নীল হইয়া গেল। আর বেহুলা সুন্দরীর দুঃখ শুরু হইল।"

মার কটা চোখের ঘোলাটে মনির দিকে ছেলেটা একদৃষ্টে চেয়েছিল কথাটা শুনে সদুর মার প্রতি কেমন একটা মায়া জাগল। গভী একটা মায়া। সদুর মনে হল ও যেন সেই দুঃখিনী বেহুলার কো মাথা রেখে শুয়ে আছে। সদু মার শিথিল হাতটা টেনে নিল : আ বড় হয়ে দেখোনা কি করি!

—কি করবি ?

—কচুকাটা করব মনসাকে।

—হা সর্বোনাশ!

—কেন ?

—মনসা ভাবতা এই কথা কইস না, জিভ খইস্যা যাইব।

—দেবতা না হাতি!

—সত্য!

—থাকুকগে, দেবতা দিয়ে কি হবে ?

—কস কি সদু !

—ঠিক আছে বড় হই আগে তারপর দেখো। মনসাকে গ্যা করে দেবো···তারপর গ্যাস পোষ্টটায়।

—চুপ যা, চুপ যা হারামজাদা!

—নাহ্। চুপ করবো না। কেন শুধু শুধু বেহুলাকে কষ্ট দেবে!

রণ'র ঠাকুমার চোখে ছানি পড়েছে। এখন আর পদ্মপুরান পড়তে
় না। এখন এম্‌নিই চোখে জল কাটে। সর্বক্ষণ। কথায় কথায়
ৎর তারা জলে ভাসে। চম্রুদের দাওয়ায় বসে রণ'র মার নিন্দে
ত করতে কাঁদে : এমন বৌ ঘরে আনছিলাম সকাল সন্ধ্যা দুইখান
দেয়না ঠিকমত। চম্রুর মা বুড়ীকে খান দুই রুটির সাথে এক কাপ
য়ে দিলে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। আর বুড়ী চলে গেলে চম্রুর
ল : খামাকা বৌডার দোষ দেয়·····পোলায় রোজগার করে কত
বা ? ভীমরতি ধরছে। বৌডার হাল ছাখছেন অন্নদি ! অন্ন সাড়া
দেখি নাই আবার।

দের বাড়ী সন্থ কোনদিন যায় নি। ক্যাওড়া পট্টির ভেতরে থাকে
অন্ন কিছুতেই যেতে দেয় না। জলামাঠ ভেঙে ছুটতে ছুটতে
শিহরণ জাগছিল। কেমন একটা পুলক। আবার বুক ঢিপ ঢিপ
ছুটতে ছুটতে কলের গানওয়ালা মেটে বাড়ীটা ছাড়িয়ে ওরা
ড়াপট্টির ভেতর ঢুকল। মেটে বাড়ীর কলের গানের চোঙটা
হাতছানি দিয়ে ডাকত। একদিন মাস্তর ও দাওয়ায় বসে
মেছিল। কলের গান।
'র মা চাল ভাজতে বসেছে। রণ বলে চালভাজা। আসলে
খুদকুঁড়ো। আর গম। ফট্ ফট্ শব্দে জমাট দুধের মতো আটা
আসছে। আর ধানের চিটে উড়ছে। রণ'র একগণ্ডা ভাইবোন
ঘুপচির ভেতর আগুন, কড়াই আর রণ'র মাকে ঘিরে ভন্ ভন্
। ছোটোটা খুস্তীর বাড়ি খেয়ে কান্‌তে লাগল। আবার হাত
ঘ্যানঘ্যান শুরু করল। সন্থর কেমন মজা লাগছিল। রণ'র
দাঁত বলতে নেই। ভাজাভুজি খেতে পারে না। গমভাজা
ড়ায় পিষে, এক ছিঁটে জল দিয়ে চটকে দিল রণ'র মা। অসাড়
ড়ে বুড়ী গিলতে লাগল। কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ হয়—কঁৎ ···
ৎ····। সন্থর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল : খাবা
দল ? রণ'র ঠাকুমার মুখ জুড়ে অজস্র হিজিবিজি কাটাকুটি
কিলবিল করে উঠল। হাসল একটু। এক হাতে সাপটে স্তাতা
গায়গাটা পুঁছতে পুঁছতে রণ'র মা বলল : রণ তর বন্ধুরে কি
দিবি ! কথাটার সাথে সাথে কালা রোদ্দুর রণ'র মার
পড়ল। একরত্তি সাদা পাথর সমেত বোঁচা নাকটা চিক্‌চিক্
ঠ।
এক বাটিতেই দেও।
ক খুদকুঁড়ো আর গমভাজা এনামেলের একটা বাটি করে রণ'র
হাতে দিল। সন্থর এমনিতেই লোভ হচ্ছিল। ওদের বাড়ীতে
না। হয় দুখানা রুটি নাহলে নিরম্বু উপোস। রণ'র সাথে
বসে সন্থ চিবোতে লাগল। রণ'র রুগ্‌ন বোনটা একটা থালা
মেজে নিয়ে এল পুকুর থেকে। কুচোগুঁড়ি পানা মেয়েটার পায়ের
চেটোয় চিত্তির এঁকেছে। থালা পেতে দিলে, রণ'র বাবা খেতে
বসল। আর রুগ্‌ন মেয়েটা গালের দুপাশে হাড় জাগিয়ে বাবার
খাওয়া দেখতে লাগল। রণ'র বাবা উবু হয়ে বসেছে। হাড্‌ডি গোনা
যায়। অথচ যখন এল জবরদস্ত মানুষ। রণ'র মা একহাতা ট্যালটেলে
ডাল আর চাট্টি আলুর খোসা ভাজা দিল। সন্থ রণ'র বাবার পাতের
দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল : এই রণ, তুই ইস্কুলে যাস না ?
—নাহ্।
—কেন ?
—কি হবে !
—তাহলে কি করবি ?
—বাবার কারখানায় ঢুকবো।
রণ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগল।
হঠাৎ ওর লম্বাটে মুখ ফিনফিনে নাকের ডগ কেমন ভারিক্কি হয়ে উঠল।
টানটান হয়ে বসেছে রণ। পায়ের কাছ থেকে একটা ঢিল তুলে ওমুখ
কারখানার রঙীন জলের দিকে ছুঁড়ল। টুপ করে একটা শব্দ হল।
—তুই কাজ করতে পারবি !
—হুঁ।
—যাঃ।
—সত্যি। বলে আমার মতো কত্‌তো ছেলে কাজ করছে।
—আমাকে না কানাই মাষ্টারের ইস্কুলে ভত্‌তি করে দিচ্ছে মা।
—বেশ হয়েছে। গিয়ে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাক। আমি
শাবল চালাব, হাতুড়ী দিয়ে রক্তের মতো লাল লোহা পিটে রেলগাড়ী
বানাব। আর তুই খালি কানমলা খাবি। কানমলা।
—বই পড়তে পারিস ?
—নাহ্।
—একদম না ?
—একদম না। আর আমার তো ভাই বই পড়লে চলবে না।
খাবো কি ? বাবার মাইনেয় আমাদের দু হপ্তাও চলে না। উকীল-
বাবুর কাছ থেকে কাগজ এনে মা ঠোঙা বানাত। ঢেবিও বানাত।
তা ওরা আর দিচ্ছে না···।
—এই রণ !
—কি ?
—তুই আমার কাছে পড়বি ?
—পারবি পড়াতে !
—হুঁ।
একমুঠো চাল ভাজা মুখে পুরে দিল রণ। রণ'র বাবা আঁচাচ্ছে।
সন্থ রণ'র বাবার হাতে কড়ার দাগগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল। শক্ত

শক্ত চিব্‌লি। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা থ্যাবড়ে চেপ্টে গ্যাছে। সদু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলঃ তোর বাবার হাত দুটো অমনি কেন রে? রণ দাঁত দিয়ে একটা গমের দানা কাটলঃ মেশিনে!

—মেশিনে?

—হুঁ।

—কেন? হাতে পড়ে গেছিল?

—ধুস্‌। মেশিনের সাথে যুদ্ধ করে রীতিমত। মেশিন দেখেছিস?

—নাহ।

—তালে আর কি বলব!

—বলনা!

—ইয়া বড় বড় লোহার দাঁত, হ্যাণ্ডেল, চাকা····আচ্ছা তোকে একবার দেখিয়ে আনবো। যাবি?

—যাবো।

রণ'র বাবা হাফপ্যাণ্টের ওপর ঢোলা জামা চাপাতে চাপাতে সদুকে জিজ্ঞেস করলঃ তুমি কানাই মাষ্টারের ইস্কুলে ভর্‌তি হইছ না? কথার শেষে কেমন একটা টানের সাথে কালো মাড়ি জাগিয়ে রণ'র বাবা হাসল। চিপে নাকে একটা শব্দ হল। আর সদু মানুষটার দিকে বিস্ময়ের ঘোরে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় কাত করে দিল। ও কিছুতেই ভাবতে পারছিল না, এই মানুষটাই কোমরের বেল্ট খুলে রণকে চাবকায়। যখন, তখন। রণ'রও যেন কথাটা মনে নেই। কেমন হাসিখুশী। রণ'র বাবা হঠাৎ গলা চড়িয়ে রণ'র মার দিকে ফিরল: ত্থাখো, ত্থাখ্যো····দেইখ্যা শেখো·· বাবায় মইর‍্যা বাঁচছে ····আর মায় ছাওয়ালরে মানুষ করার জন্ত কিনা করতাছে। চনুর মায় তো কইল এক বাড়ী রান্নার কাম নিতাছে····।

সদুর মাথায় চিলিক দিয়ে রক্ত উঠল। চালভাজার বাটিটা উল্টে ফেলে দিয়ে সদু পাগলের মতো ছুটতে লাগল। রণ'র মা হঠাৎ হকচকিয়ে চিৎকার করতে লাগল "কি হইছে অ সদু····কি হইল?" রণ সদুকে ধরার জন্তে পেছন পেছন ছুটছিল। কিছুতেই নাগাল পায় না। ক্রমে সদু রণ'র চোখের বাইরে চলে গ্যালো।

অন্ন তখন কচুর লতি কাটছে। সদু দমকা বাতাসের মতো বঁটি উল্টে মার কোলে ঝাপটে পড়ল। হাপুস কান্নায় ছেলেটা ভেঙে পড়ল। অন্নর দিনভর দুঃখের ধান্দায় মন মেজাজ সুবিধের নয়, তার ওপর ছেলের ঝক্কি। বয়েস তো আর কম হল না। এই আশ্বিনে দশ উত্তরে যাবে। সদু মার চোখা দৃষ্টি গ্রাহ্যি করল না। সমানে ফুঁপিয়ে চললঃ মিথ্যে কথা বললে কেন? ····বলো····কেন····মিথ্যে কথা বলে[illegible] আমাকে? তুমি মিথ্যুক····মিথ্যুক···মিথ্যুক····।

ছেলেটা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। কোঁকড়া চুলের গোছা কপাল[illegible] ছড়িয়ে গেল। চোখ দুটো পাকা তেলাকুচার মতো লাল হয়ে উঠেছে[illegible] কান্নার চোটে মুখ ফুলছে ক্রমশঃ। আর হিক্কা উঠছে। [illegible] দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্ত হয়ে চড়াতে লাগল। সদু গোঁজ হয়ে মার হ[illegible] করল। আর হিক্‌কা তুলে তুলে গোঙ্‌রাতে লাগল—মিথ্যুক[illegible] মিথ্যুক····। চনুর মা সদুকে আড়াল করে দাঁড়ালঃ ক্যান খামা[illegible] মারতাছেন ছাওয়ালডারে? অন্ন রাগ সামাল দিতে পারেনাঃ আস্কা[illegible] দিয়েন না দিদি। এতবড়ো সাহস আমারে কয় মিথ্যুক। দুধ-ক[illegible] দিয়া কাল সাপ পুষতাছি!

সদুর কালোপানা মুখ মারের দাপটে লাল হয়ে গেছে। স[illegible] কানাই মাষ্টারের ক্লাবে দুধ আনতে গেছিল। মিলিক পাউডার হঠাৎ এসে মার মূর্তি দেখে একটু হকচকিয়ে যায়। আস্তে আ[illegible] সদুর দিকে এগিয়ে গেলঃ কি হইছে?

—বাবা মরে গেছে আমাকে বলিস নি কেন? মিথ্যুক····তুই[illegible] মিথ্যুক····বাবা কোনদিন ফিরবে না।

—কে কইল?

অন্নর গলার স্বর অদ্ভুত ক্লান্ত।

—রণ'র বাবা।

ছেলেটা হিক্‌কা সামলাতে গিয়ে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। মাটিতে[illegible] উপুড় হয়ে পড়ে থাকল সদু। আর অন্নর কাঁচা ঘা দগদগ করে[illegible] আর একটা কথা নেই। চনুর মা ফিরে গেছে। সরিও কথা বলতে[illegible] পারল না। কেবল সদুর হিক্‌কার শব্দ উঠছে। শেষে হিক্‌কা থামল। তখন শান্ত। নিটোল শান্ত। সকালের কুয়াশাভরা আকাশ আর ওষু[illegible] কোম্পানীর রঙীন পানির শূন্যতা হাঁ করে শান্তি ওগরাচ্ছে। অস[illegible] শান্তি!

দাঁতে দাঁত চেপে অন্ন কচুর লতির বাকল ছাড়াতে লাগল। সরি[illegible] বনবাদাড় ঘেঁটে এনেছে। এইসব ফেলে এখন কি আর ওঠা যায়। আর প্যাট হইল আসল শত্তুর। শোক দুঃখ মানে না। এইসব নানান কথা ভেবে অন্ন নিজেকে শক্ত রাখে। খুঁটির মতো। নাহলে ছেলেমেয়ে দুটো এ্যাদ্দিনে কোথায় ভেসে যেত। স্রোতের শ্যাওলার মতো। বেহুলার মান্দাসের মতো।

(ক্রমশঃ)

# গণটোকাটুকি ঃ
## একটি অভিমত

অনির্বাণ বসু

[ প্রবন্ধটিতে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা প্রত্যেকটি াত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রী, শক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে আমরা এই বিষয়টির উপর আলোচনার ন্যে আহ্বান করছি।—সঃ মঃ বীঃ ]

বছর দুই হ'ল আমাদের বিদ্বৎ সমাজে ছাত্রদের নিয়ে ভারী হাহাকার পড়ে গেছে। তাদের কেউ বলছেন ছাত্ররা সব গোল্লায় গছে, পড়াশুনা না করে শুধু টুকেই পাশ করতে চায়, আবার কেউ কউ বলছেন শিক্ষক আর অভিভাবকগণই এই টোকাটুকির মূল ারণ—তাঁদের গাফিলাতই ছাত্রদের টোকাটুকির দিকে আকৃষ্ট হতে াহায্য করছে। কেউ কেউ অবশ্য আরো গম্ভীর ভাবে বলছেন যে াজনৈতিক অস্থিরতাই এই সমস্যার মূল কারণ। এইভাবে কোনো াদবিচার না করে যা কিছু খারাপ তার জন্য সমগ্র জনসাধারণের ঘাড়ে াষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সত্যি বলতে কি এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক-ভিভাবকগণের প্রতি অবিচারই করা হচ্ছে। এরা যদি সত্যিই এর ন্য দায়ী হয় তবে তার কারণ এদের শাসক এবং শিক্ষাপ্রবর্তকরা য়েছে এরা এই ছাঁচেই গড়ে উঠুক।

আমরা "শিক্ষিত হওয়া আর সেই সঙ্গে চাকরী পাওয়া" এই দুটি দ প্রায়ই শুনতে পাই। আসলে উক্ত শব্দ দুটি একার্থক নয়। র্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ শিক্ষিত হতে চায় চাকুরী লাভ করতে। তীয়টিকে পাবার উপায় স্বরূপ প্রথমটিকে প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি না ল প্রথমটির মূলতঃ কোন সার্থকতা নেই। আবার দ্বিতীয়টি মূলতঃ ট চালানর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই ছাত্ররা চাকুরী পেতে তটা চেষ্টা করেন শিক্ষা অর্জনের জন্য ততটা লাফালাফি করা প্রয়োজন াধ করেন না। আর চাকুরীর জন্য যেহেতু সর্বপ্রথম প্রয়োজন গ্রী, সেই হেতু তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ডিগ্রী। তাই তাঁরা গ্রীর উপর আস্থাবান কিন্তু শিক্ষাভক্ত নন্। পাঁচ-দশ বছর আগে ত্ররা শিক্ষার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উন্নতি না করেও মূলতঃ তোতাপাখীর ত মুখস্ত করে পরীক্ষা হলে গিয়ে তা বমি করে দিয়ে আসত অনেক রিশ্রম করে, কারণ তারা জানত যে পরীক্ষায় পাশ করে একটা ডিগ্রী নিতে পারলে তাদের একটা চাকুরী হবে অর্থাৎ অখাদ্য কুখাদ্য অন্তত একবেলা খেয়ে কোনোমতে বাঁচার একটা সংস্থান হবে। কিন্তু বর্তমানে বেকার সমস্যা এমনই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে ডিগ্রী পেলেই চাকরী পাওয়া যাবে এমন আশা করাটা পর্যন্ত অন্যায় করার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে বর্তমান ছাত্রদের খেটেখুটে পাশ করে মূলতঃ কোন লাভ হচ্ছে না। **লাভ না থাকায় তারা সবচেয়ে সহজভাবে ডিগ্রী অর্জনের চেষ্টা করবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। আর সবচেয়ে সহজভাবে ডিগ্রী অর্জনের এই প্রচেষ্টা থেকেই টোকাটুকির উদ্ভব।**

অনেকে হয়ত বলবেন নিছক চাকুরী ছাড়া শিক্ষার কি কোন মূল্য নেই? জ্ঞানের মূল্য?

আমি মনে করি এই শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হ'ল এই শিক্ষাব্যবস্থা সত্যিকারের জ্ঞান দানে অক্ষম। কারণ এই শিক্ষা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। ছাত্ররা বই পড়ে বিশ্বের জাহাজ হতে চায় না, চায় জীবনকে জানতে, জীবনের দুর্বিসহ দুঃখ কষ্টের হাত হতে রক্ষা পেতে গেলে সত্যিকারের কি করতে হবে তা জানতে। কিন্তু তাঁরা অবাক হয়ে দেখেন যে তা জানতে পারা দূরের কথা, তাঁদের শিক্ষা বড়লোকের স্বার্থরক্ষা ছাড়া কখনই গরীবের কোন উপকারে লাগে না। তাই তারা এই শিক্ষার প্রতি হয়ে পড়েছেন অশ্রদ্ধ। বর্তমানের তথাকথিত শিক্ষাকে তাঁরা ভালবাসেন না। এই শিক্ষা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔরসজাত। আমরা অনেকেই জানি যে, এদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরা এবং তাদের স্বঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল এমন একদল লোক তৈরী করা, যারা গায়ের চামড়ায় ও চেহারায় হবে ভারতীয় অথচ চিন্তায় ও রুচিতে হবে বৃটিশ—যারা বৃটিশ রাজমুকুটের সেবা উত্তমরূপেই করতে পারবে। আজ স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও শিক্ষাব্যবস্থার বিলাতী ছাঁচের কোন পরিবর্তন যে হয়ই নি সেকথা সরকার সমর্থকদের মুখ থেকেও শোনা যাচ্ছে।

আসলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত ক'রে তোলার অনেক অসুবিধে আছে। সত্যিকারের শিক্ষিত হলে মানুষ যুক্তিবাদী হয়ে পড়ে। এখন এই যুক্তিবাদী হওয়ার ফলে সে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে, কোনটা

ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। এর ফল বর্তমান সমাজব্যবস্থার পক্ষাবলম্বী সমাজপতিদের কাছে মারাত্মক। কারণ এর ফলে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অনেক অন্যায়ের মুখোশ খুলে তার নিরাবরণ উলঙ্গতা বেরিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া যুক্তিবাদী হলে মানুষ অন্যায়-এর প্রতিবাদ না করুক অন্ততঃ অন্যায়কে সমর্থন করতে পারবে না।

এছাড়া রয়েছে পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা—ভাল পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষকের খেয়াল-খুশির জন্য ফেল করা কিংবা ভালোরকম 'জ্ঞান'-সত্ত্বেও খারাপ পরীক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। শিক্ষা অধিকর্তারা এই কথা স্বীকার না করলেও, আমাদের মত হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রী তাঁদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই জানেন যে এসব ঘটনা হরদম্ ঘটছে। তৃতীয় সংখ্যা 'বীক্ষণে'ই (পৃঃ ৩৯) এরকম একজন ভুক্তভোগীর লেখা একটা চিঠি "যুগান্তর" পত্রিকা থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন এই ব্যাপারের দোহাই হিসেবে সর্বপ্রথম প্রয়োজন অদৃষ্টবাদী দর্শনের, যা মানুষকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়ার শিক্ষা দেয়। "ভাগ্য যদি মন্দ হয়" তবে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয় অদৃষ্টবাদীর দর্শনের দোহাই দিয়ে। ফলে মূলতঃ পরীক্ষাটা জুয়াখেলার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যেহেতু জুয়া-খেলায় জেতার কোন রীতিনীতি নেই তাই মানুষ এটা জেতার জন্য কোন পরিশ্রম করতে রাজী নয়। তাই ছাত্ররা পরিশ্রম না করে পাশ করার জন্য টোকাটুকির আশ্রয় নিচ্ছে। অনেক বিদ্বান ব্যক্তি হয়ত বলবেন তাহলে ছাত্ররা ভাগ্য পরীক্ষা করতে সাদা খাতা জমা দিলেই পারে। কিন্তু আসলে ছাত্ররা এতটা বোকা নয়। তাঁরা জানেন উত্তরের উপর খাতা না দেখে যা খুশী নম্বর দেওয়া যতটা সহজ, তার থেকে সাদা খাতায় শূন্য দেওয়া অনেক সহজ।

এরই সাথে সাথে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা ও পৃষ্ঠপোষকতার যে ব্যাপক দুর্নীতি দীর্ঘকাল ধরে চলেছে সেকথাটাও মনে রাখতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ আমাদের দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হলে বা পরীক্ষার শেষে গবেষণাবৃত্তি পেতে হলে যে বিভাগীয় কর্তাদের তোষামোদ করে চলতে হয় একথা আজ অনেকেই জানেন। কর্তৃপক্ষের আত্মীয়-স্বজন ও বিশেষ পেয়ারের লোকদের খাতার নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই অতীতের বেশ কয়েকটি বড় বড় ছাত্র আন্দোলনের কথা অনেকেই মনে করতে পারবেন। বাইরের সবাই না জানলেও, ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীরা জানেন যে কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকলে অনুগ্রহ শুধু পরীক্ষার খাতাতেই নয়, প্রশ্ন জানার ব্যাপারেও পাওয়া যায়। এছাড়া ছাত্রভর্তি, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বেতন এসমস্ত ব্যাপারে স্কুল ও কলেজগুলির পরি-চালকমণ্ডলীর (যেগুলি স্থানীয় প্রশাসকসহ অঞ্চলের বিভিন্ন "বিশিষ্ট" ব্যক্তিদের নিয়ে সাধারণতঃ তৈরী হয়) ব্যাপক দুর্নীতির খবর তো আজ কারুরই অজানা নয়। দুর্নীতির ফর্দ দীর্ঘ করে লাভ নেই। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট যে আমাদের দেশের "শিক্ষাবিদদের" সক্রিয় উদ্যোগে তথাকথিত "গণটোকাটুকির" আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই বেশীর ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এক একটি দুর্নীতির পঙ্ককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। আর মজা হচ্ছে এই পঙ্ককুণ্ডের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ভদ্রলোকদের মুখেই সুনীতির উপদেশের খই ফুটছে। চোখের সামনে দুর্নীতির ও ভণ্ডামির এইসব উদাহরণ যদি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো কোনো অংশ অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেনও তবে এজন্য তাদেরকে দায়ী করার অধিকার, এইসব মহাশয় ব্যক্তিদের আছে কী?

এরপরই আসে শিক্ষকদের কথা। কোন কোন পাগলের মতে তাঁরাই নাকি এই টোকাটুকির জন্য দায়ী। এই কথা বলে এইসব পাগলেরা ছাত্র ও অভিভাবকগণের সঙ্গে শিক্ষকদের বিভেদ সৃষ্টির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ফেঁদেছে। আবার অন্যভাবে তারাই শাসকদের নির্দেশে, শিক্ষকদের 'শিখণ্ডী' সাজিয়ে শিক্ষিত বেকার সমস্যা 'সমাধান'-এর চক্রান্ত চালাচ্ছে। এইভাবে শাসকরা শিক্ষকদের সামনে রেখে শিক্ষা সংকোচনের হীন ষড়যন্ত্রে নেমেছে। অনেক বিদ্বান (!) ব্যক্তি হয়তো বলবেন এত বুঝে তবে শিক্ষকরা কেন খাতা দেখছেন? এর কারণ শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা। স্বল্প ও অনিয়মিত বেতনের জন্য শিক্ষকদের জীবনযাপন দুরূহ হয়ে পড়েছে। এইভাবে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে তাঁদের দিয়ে যা খুশি করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই কারণেই ছাত্রদের কিছু লাভ হবে না জেনেও শিক্ষকরা কতকগুলি বস্তাপচা সমগ্র জনগণের পরিপন্থী শিক্ষা শেখাতে বাধ্য হচ্ছেন।

আর রাজনৈতিক অস্থিরতা যদি টোকাটুকির মূল কারণ হয় তবে একথা বলতে হয় যে এর জন্য রাজনৈতিক পার্টি অপেক্ষা শিক্ষা অধি-কর্তারাই বেশী দায়ী। আমার প্রশ্ন ১৯৬৭ সালের পর যখন ছাত্ররা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন আর তারই ফলস্বরূপ যখন স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান শিক্ষাকে বয়কট করছিলেন, তখন সেই তাঁদেরকে "ফিরিয়ে" আনার জন্য অর্থাৎ তাঁদের চোরাবালির পাঁকে ডুবিয়ে দিতে "শিক্ষা প্রবর্তকরা" নিজেরাই কি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের সামনে গণটোকা-টুকির টোপ ফেলেন নি? অথচ এতসব জানা সত্ত্বেও, আর ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকদের টোকাটুকির ব্যাপারে কোন দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও কতগুলি অর্বাচীন সমালোচকের চীৎকার জনসাধারণের কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। **টোকাটুকিকে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমর্থন করতে পারেন না।** কিন্তু তাই বলে মূলকারণের

তি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করে শাসকশ্রেণীর নির্দেশে যে কোন বস্থার জন্য জনসাধারণকে গালাগাল দেওয়াটাকেও কেউ সমর্থন রতে পারেন না। পেটোয়া সমালোচকরা কিন্তু তাই করছে। অন্য ব্যাপারে টু শব্দটি না উচ্চারণ করে তারা খালি জানাচ্ছে, ছাত্র-ত্রীরাই এরজন্য দায়ী, ছাত্রছাত্রীদেরই উচিত এর সমাধান করা। যেন সেই হাত-পা বাঁধা মানুষকে সাঁতার কাটতে বলা। তবে া ঠিক যে শেষ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা এর সমাধানের জন্যে অবশ্যই গিয়ে আসবেন। এই পচাগলা শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন "গণ-টোকাটুকির" মাধ্যমে হয় না, এটা যে তারা বুঝবেন তাতেও সন্দেহ নেই। তবে কথা হচ্ছে এই যে সমাধানের সঠিক পথটা শেষ পর্যন্ত বর্তমান "শিক্ষাবিদ"দের ও তাদের দেশী ও বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদেরও বিরুদ্ধে যাবে সেটা তারা ভেবে রেখেছেন'ত ? ছাত্ররা 'বিষবৃক্ষ'টিকে অটুট রেখে শুধু 'বিষফল' ছেঁড়ার অন্তহীন প্রচেষ্টায় আটকে থাকবেন, এটা যেন তারা মনে না করেন। 'বিষফল'টিকে চিনতে পারলে খুব সম্ভবত তারা 'বিষবৃক্ষ'টিকেও গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলারই চেষ্টা করবেন।

জাতীয় পরিকল্পনা

# দ্বিতীয় হুগলী সেতু ঃ
## ভারতীয় স্বনির্ভরতার একটি আদর্শ নমুনা

—অজিত চক্রবর্তী

ঘটনাটা ঘটেছিল অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরে।

"ব্রীজ ভেঙ্গে পড়ছে ?"—বয়লার মেকার চার্লি সান্টের মনে হোল। মে তিনি ভাবলেন, ব্যাপারটা বোধহয় মনের ভুল। কিন্তু পরমুহূর্তেই খের সামনে যা দেখলেন তাতে চক্ষুস্থির। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে হাঁক লেন—"আমরা ভেঙ্গে পড়ছি।" কিন্তু তখন আর দৌড়ে পালাবারও য় নেই। সান্ট একটা বল্টুর বাক্সে বসে রইলেন মহা-দুর্ঘটনার র মুহূর্তের অপেক্ষায়।

কয়েক মুহূর্ত বাদেই—ঘড়িতে তখন সকাল এগারোটা বেজে শ; তারিখটা হচ্ছে ১৯৭০ সালের ১৫ই অক্টোবর। ইয়ারা নদীর রে মেলবোর্ণের বিখ্যাত, সুবিশাল ১২০ মিটার চওড়া আর ২৫৯০ টার লম্বা ঝকঝকে নতুন ওয়েষ্ট গেট ব্রীজ প্রচণ্ড শব্দে ভেঙ্গে পড়ল চে বিস্তীর্ণ শ্রমিক বস্তীর মাথার ওপর।

যে ৬৮ জন শ্রমিক তখন ব্রীজে কাজ করছিল তার মধ্যে ৩৫ জন টনায় মারা যায়। আহত হয় ১০০ জনেরও বেশী।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার ব্যাপারে অনুসন্ধানের পর অষ্ট্রেলিয়ান রয়াল শন একটি রিপোর্ট দেয়। সেই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে জের ডিজাইন বা নকশাতেই ছিল আসল গলদ। এই ব্রীজের াইনার ছিল ব্রিটেনের ফ্রিম্যান, ফক্স অ্যাণ্ড প্যাটারসন নামে একটি নীয়ারিং সংস্থা। অষ্ট্রেলিয়ান রয়াল কমিশন তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছে, "এরাই এই দুর্ঘটনার জন্য সবচেয়ে বেশী অপরাধী।"

মেলবোর্নের ওয়েষ্ট গেট ব্রীজই ফ্রিম্যান, ফক্স অ্যাণ্ড প্যাট্যারসন সংস্থার অপদার্থতার শেষ নিদর্শন নয়। এ ছাড়া এদের তৈরী ওয়েলসের মিলফোর্ড হাভেন ব্রীজ ভেঙ্গে গেছে তৈরীর সময়তেই, আর স্কটল্যাণ্ডের আরস্কিণ ব্রীজ এবং পশ্চিম আফ্রিকায় লয়াঙ্গয়া ব্রীজ—অকেজো হয়ে গেছে।

এই গৌরচন্দ্রিকার কোন দরকার হ'ত না। দরকার হ'ল শুধু এই জন্য যে সহৃদয় পাঠক প্রস্তাবিত দ্বিতীয় হুগলী সেতু সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবেন সহজেই, যখন দেখবেন আমাদের এই ব্রীজের নকশাটাও দিয়েছে—ফ্রীমান, ফক্স অ্যাণ্ড প্যাটারসন। ঠিক সেই ধরণের নকশাই আমাদের দেওয়া হয়েছে যে নকশায় তৈরী ব্রীজ মেলবোর্নে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। অর্থাৎ তারাই হচ্ছে হুগলী ব্রীজের বিশ্বকর্মা যারা ব্রীজ গড়বার চাইতে ব্রীজ ভাঙার ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

ফ্রিম্যান ফক্স কোম্পানী তার নকশায় এমন জায়গায় নদীর মধ্যে সেতুর স্তম্ভ বসাবার পরিকল্পনা করেছে, যে জায়গা শিপিং লেনের অর্থাৎ যেখানে নদীর গভীরতা বেশী হওয়ায় জাহাজ চলাচল করতে পারে, তার অত্যন্ত কাছে। ফলে এই নক্সা অনুসারে সেতু তৈরী হলে প্রথমতঃ সেতু যত উঁচুই হোক না কেন জাহাজ চলাচলে বাধা ঘটবে,

কারণ ঐ স্তম্ভই জাহাজ চলাচলের মস্ত এক বাধা হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়ত শিপিং লেনের কাছে সেতুর স্তম্ভ থাকার ফলে হুগলী নদীতে প্রতিদিন দুবার যে জোয়ার আসে, ক্রমাগত সেই জোয়ারের ধাক্কায় অল্পদিনের মধ্যেই স্তম্ভে ভাঙন ধরার সম্ভাবনা আছে। কাজেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এছাড়া হুগলী নদীর জলে লবণের পরিমাণ বেশ বেশী এবং তা উত্তরোত্তর বাড়ছে। আবার কলকাতার হুগলী নদীতে জোয়ারের সময় সবচেয়ে গভীর গর্তের গভীরতা দাঁড়ায় প্রায় ষাট ফুটের কাছাকাছি এবং এই গর্তগুলি সৃষ্টি হয় তথাকথিত শিপিং লেনের কাছে। কাজেই এই শিপিং লেনে সেতুর স্তম্ভ হলে তাতে খুব তাড়াতাড়ি লোনা ধরবে, ফলে সেতুটি যে কোন দিন ভেঙ্গে পড়তে পারে। তৃতীয়তঃ নদীগর্ভে এই ধরণের স্তম্ভ নদীর নাব্যতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেবে। কারণ হুগলী নদী তার স্রোতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পলি নিয়ে আসে। ফলে স্রোতের মুখে কোথাও বাধা পেলে এই পলি সেখানে জমতে থাকবে এবং এক সময় তা থেকে চর সৃষ্টি হবে। ভাটার সময় হুগলী নদীতে এখন যে পরিমাণ জল আসে তা এই পলিকে সাগর অব্দি নিয়ে যেতে পারছে না। আর এই জলের পরিমাণ ক্রমশই কমে যাচ্ছে। কারণ মুর্শিদাবাদে ভাগীরথী যেখানে গঙ্গার থেকে বেরুচ্ছে, সেখানে সে গঙ্গার রিভার বেড থেকে ৪০ ফুট উঁচু। কাজেই এই সেতুর স্তম্ভের কাছে পলি জমে চর তৈরী হবে অনিবার্যভাবেই। আর এই চরের জন্য হুগলী নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর নীচে নদী শুকিয়ে যদি মাঠও হয়ে যায় তবে অবাক হবার কিছু থাকবে না। তখন হেঁটেই হয়তো নদী পার হওয়া যাবে এবং পথচারীর মাথার উপরে দ্বিতীয় সেতু তখন সামিয়ানার কাজ করবে, অবশ্য যতদিন না ভেঙ্গে পড়ে।

এসমস্ত বলার অর্থ এই নয় যে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর দরকার নেই। অবশ্যই দরকার আছে। কারণ হুগলী নদীর দুই তীরে প্রায় এক কোটি লোকের বাস। কিন্তু পারাপারের জন্য আছে মাত্র দু'টি সেতু। একটি হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত—রবীন্দ্রসেতু। আর অন্যটি বালীতে রেল ও মানুষের যাতায়াতের জন্য বিবেকানন্দ সেতু। প্রয়োজনের তুলনায় যা নিতান্তই কম। কিন্তু যে পরিকল্পনা মাফিক দ্বিতীয় হুগলী সেতু তৈরী হতে চলেছে, তার ফলে সাধারণ মানুষের উপকার তো হবেই না বরং অপকারই হবে বেশী। জাতীয় ক্ষতির বোঝাটা আর একটু ভারী হবে এই যা! তবে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে আসবে যে, বিদেশীরা আমাদের দেশে যে সমস্ত পরিকল্পনা দেয় সেগুলো আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। অল্প কথায় অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বলাই ভাল। D.V.C. এবং অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি তারই প্রমাণ।

এই সেতু নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯৬২ সাল থেকে। ঐ বছরের জুন মাসে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগানাইজেশনের সুপারিশে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের ট্রাফিক বিশেষজ্ঞদের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেতুর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য লণ্ডনের রেণ্ডেল, পামার অ্যাণ্ড ট্রিটন নামক ফার্মকে নিয়োগ করে। বিশ্বব্যাঙ্ক এই অনুসন্ধানের অর্ধেক খরচ বহন করতে "রাজী" হয়। ১৯৬৪ সালে রেণ্ডেল, পামার অ্যাণ্ড ট্রিটন যে রিপোর্ট দাখিল করে তাতে আছে যে এই সেতুটি খুব উঁচু হতে হবে। কারণ হিসাবে দেখানো হয় যে বঙ্গোপসাগর থেকে ক্রমাগত হুগলী নদীর উত্তর দিকে হাওড়া ব্রীজকে ছাড়িয়ে যে কটি ভাঙ্গা জেটি হুগলী নদীর বাঁদিকে দেখা যায় তার স্বার্থে যাতে জাহাজ চলাচল করতে পারে। জায়গাটা প্রিন্সেপ ঘাট বলে পরিচিত এবং এই ঘাটের কাছেই দ্বিতীয় সেতু তৈরী হবার কথা। অথচ দেশের ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে এটা এক চরম বিস্ময়ের ব্যাপার। কারণ এই ভগ্নপ্রায় জেটিগুলি, হলদিয়া প্রকল্প শুরু হলেই যেগুলি পরিত্যক্ত হবার কথা এবং এখনই যেগুলি প্রায় অচল হয়ে পড়ে আছে—সেগুলিকে চালু রাখার ছুতোয় এই সেতু প্রকল্পের পিছনে অনাবশ্যকভাবে এক বিরাট অংকের টাকা খরচ হবে!

পরে অবশ্য রেণ্ডেল, পামার অ্যাণ্ড ট্রিটন সংস্থাকে নক্সা তৈরীর বদলে টেণ্ডার ডকুমেন্ট ইত্যাদি তৈরী করার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু তার আগে চলল আর এক ঝলক দুর্নীতি। আর তারই দৌরাত্মে মূল ব্রীজের কন্ট্রাকটি পায় ভাগীরথী ব্রীজ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। যা হ'ল কলকাতার বার্ণ, ব্রেথওয়েট, জেসপ কোম্পানী এবং বোম্বের গ্যামন ইণ্ডিয়া লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগ। আর এই যৌথ উদ্যোগের পেছনে যে জাতীয় রাঘব বোয়ালরা রয়েছে তারা হচ্ছে কলকাতার কনোরিয়া পরিবার।

কনোরিয়ারা এর আগে কখনই এধরণের কোন বিরাট ব্রীজ তৈরীর ব্যাপারে কোথাও যুক্ত ছিল বলে আমাদের জানা নেই। যাই হোক দ্বিতীয় হুগলী ব্রীজের জন্য খরচ হবে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৩১ কোটি টাকা খরচ হবে ব্রীজ এবং তার ওপরে রাস্তা তৈরীর কাজে। বাকি ১৪ কোটি জমি ও অন্যান্য জিনিষের জন্য খয়রাতি দিতে হবে। ব্রীজের জন্য প্রয়োজনীয় জমির যে অংশটা কলকাতায় সেটা ফোর্ট উইলিয়াম অর্থাৎ সামরিক বিভাগের এবং যে অংশটা হাওড়ায় তা পোর্ট কমিশনারের অধীনে। আর তাছাড়া তিনটি বিদেশী কোম্পানীকে পরামর্শ ফী হিসাবে কোন ধরণের কাজ শুরু করার আগেই দিতে হবে ৮২৭০০০ পাউণ্ড। এই তিনটি কোম্পানী হ'ল যথাক্রমে রেণ্ডেল, পামার অ্যাণ্ড ট্রিটন; জার্মানীর লুনা এবং "বিখ্যাত" ফ্রীম্যান ফক্স আণ্ড প্যাটারসন। এরা যথাক্রমে পোর্ট কমিশনারস্, ব্রীজ কমিশন ও ভাগীরথ কনোরিয়াদের পরামর্শ দেবে। অথচ দক্ষ

ারার আমাদের দেশেই ছিল। তাঁরাই এই কাজগুলো অনেক
বে সম্পন্ন করতে পারত। কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্কের হুকুম—সুতরাং
াত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি হবেই। আর এই ব্রীজের জন্য
য় মালমশলা সবই আসবে বিদেশ থেকে। আমাদের দেশ দেবে
ইট, খোয়া, সুরকি ইত্যাদি। আর মাঝখান থেকে কনোরিয়ারা
কয়েক লক্ষ টাকা খাটিয়ে ইধার কা মাল উধার, উধার কা মাল
করে সামান্য কিছু নাফা করে নিচ্ছে। এর নাম জাতীয় পরি-
। এমনই জাতীয় পরিকল্পনা যা সাধারণ মানুষের শ্রমের ফসলে
ীয়দের একচ্ছত্র লুটের অধিকার দেয়।

তীয় হুগলী সেতু তৈরীর ব্যাপারটার মধ্য দিয়েই এই সাধারণ
পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে—"ভারত ক্রমশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে"
প্রচারটা স্রেফ বুলিবাজদের। বাইসাইকেলের পার্টসের ব্লুপ্রিন্ট্
য বিদেশ থেকে আনতে হয়—বলা ভাল আনতে বাধ্য হয়,
র ব্রীজ তৈরী করবেন দেশীয় ইঞ্জিনীয়াররা একথা ভাবতেই
ীয় নেতারা" শিউরে ওঠেন। বিদেশীদের উপর নির্ভর না
দি এই সেতু প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হ'ত, তবে এই অযথা
বন্ধ হত। দেশীয় বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের চাকরীর একটা
সুযোগ হ'ত। বিদেশ থেকে ফ্রিম্যান, ফক্স অ্যাণ্ড প্যাটারসনের মত
উর্বর মস্তিষ্ক ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মকে স্বাগতম না জানিয়ে, যারা এর আগে
সেতু তৈরীর ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সেই সমস্ত দেশীয়
কলাকুশলীদের দক্ষতা দেখাবার যে একটা সুযোগ ঘটত—এটা না বুঝিয়ে
বললেও চলে। আর এই ধরণের সেতু তৈরীর ক্ষমতা আমাদের
দেশের বহু ইঞ্জিনীয়ারেরই আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সক্রিয়-
ভাবে এগিয়েও এসেছিলেন এবং বলেছিলেন বি. বি. সি. সি.-র
ডিজাইনার ফ্রিম্যান, ফক্স অ্যাণ্ড প্যাটারসনের নক্সা আগাগোড়া ভুল,
এই নকশার পুনর্মূল্যায়ন করা হোক। সাথে সাথে তাঁরা একথাও
বলেছিলেন যে তাঁদের যদি এই সেতু তৈরীর ভার দেওয়া হয় তবে
অনেক কম খরচেই তাঁরা এই ব্রীজ করে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের
সমস্ত মতামত ও পরামর্শগুলি একের পর এক উপেক্ষিত হয়েছে।
আর এই উপেক্ষার ফল ভোগ করতে হবে পশ্চিমবাংলার আপামর
জনসাধারণকে।

শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের উপরেই নয় সারা ভারতবর্ষের উপরেই আজ
এই বৈদেশিক নির্ভরতার করাল ছায়া নেমে এসেছে। দ্বিতীয় হুগলী
সেতু সেই ছায়ার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ দখল করেছেন মাত্র।

শিক্ষাজগৎ

# ণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ বন্ধ কেন?

য় প্রতিনিধি

ণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস্ এ্যাণ্ড ড্রাফ্‌ট্‌ম্যানশিপ' অথবা
ান আর্ট কলেজ'।

ই নামটির সাথে পরিচয় নেই, এমন শিল্পরসিক এদেশে নেই
ও চলে। কলকাতার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত এই শিল্পশিক্ষণ
তে শিক্ষকতা করেছেন যামিনী রায়, অতুল বসু, সতীশ সিংহ,
মজুমদার, সোমনাথ হোড়, সর্বরী রায়চৌধুরী, সুধীর মৈত্র
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীরা। ১৮৯৩ থেকে ১৯৭৩, দীর্ঘ
বছরের জীবনে এই প্রতিষ্ঠানটি এদেশের শিল্পকলা জগতের
শাখায় তার অসংখ্য কৃতী ছাত্রছাত্রী উপহার দিয়েছে। যেমন
ন্দু পত্রী, সুনীল দাস, সুহাস রায় (১৯৬৩ সালে ললিতকলায়
ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্যারিসে যান), বিকাশ ভট্টাচার্য্য
(১৯৭০ এবং '৭১, পরপর দু'বছর ললিতকলায় এ্যাকাডেমি পুরস্কার
পেয়েছেন) এবং তরুণ শিল্পী হিসাবে খ্যাত শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য,
প্রবীর দাস, কার্ত্তিক সিংহ, বাণী মিত্র এবং আরো অনেকের নাম
করা যেতে পারে।

কিন্তু এহেন ঐতিহ্যের অধিকারী প্রতিষ্ঠানটির মূল বিভাগ (দিবা)
আজ আট মাস হলো বন্ধ! দরজায় তালা ঝুলছে! ইণ্ডিয়ান আর্ট
কলেজের ছোট্ট প্রাঙ্গনটিতে আজ এত পুলিশ গিজ্‌ গিজ্‌ করছে যে
কোন সুস্থ ব্যক্তিকেই কলেজে ঢোকার মুখে একটু দাঁড়িয়ে পড়তে

হবে তিনি ঠিক জায়গায় এসেছেন কিনা—তা পরখ করে নেবার জন্য!

কিন্তু কেন?

এত ঐতিহ্যসম্পন্ন কলেজটির আজ এই শোচনীয় অবস্থা কেন?

কেন তার সমস্ত শিক্ষক (দিবা বিভাগের) এবং চারজন ছাত্রের উপর শো-কজ নোটিশ ঝুলছে?

কেন তার চারজন পুরোনো কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে?

কেনই বা তার ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী, ১৩ জন শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা আজ এক সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিন গুনছেন?

সঠিকভাবে এর উত্তর পেতে হলে 'ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের' ইতিহাসকে আমাদের জানতে হবে। জানতে হবে একেবারে জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার এই দীর্ঘ আশি বছরের জীবনকে। কারণ, যে কারণগুলি তার বর্তমান সংকটের পিছনে কাজ করছে, প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্ন থেকেই সেগুলি তার নিত্যসঙ্গী।

## সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুপ্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি যে কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্যের তুলনায় কোনদিনই তা তেমন মজবুত ছিল না। ১৮৯৩ সালে মন্মথনাথ চক্রবর্তী 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল'ই পরে 'ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ' বা 'ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস্ এ্যাণ্ড ড্র্যাফট্‌স্ম্যানশিপ' নামে পরিচিত হয়। মন্মথনাথ চক্রবর্তীর বংশধরেরাই ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্যন্ত এর পরিচালনা করেছেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত (সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী) ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে কোন বৈধ পরিচালক মণ্ডলী নেই।

১৯৫০ সাল নাগাদ একটি বে-আইনী পরিচালক মণ্ডলী আত্মপ্রকাশ করে, যার সভাপতি ছিলেন শ্রীকে. সি. চন্দ্র, সহসভাপতি ছিলেন বিচারপতি জে. পি. মিত্র ও লেডি রানু মুখার্জী। এই তথাকথিত পরিচালকমণ্ডলীর স্বেচ্ছাচারিতা ও নিম্নমানের শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের সঞ্চিত ক্রোধ অচিরেই বিক্ষোভের চেহারা নেয়। যার ফলে ১৯৫২ সালে তৎকালীন 'ছাত্রসমিতি' কর্তৃক বিচারপতি জে. পি. মিত্র ও প্রখ্যাত শিল্পী অতুল বসুর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে জে. পি. মিত্র ও অতুল বসু যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও অনারারী ডিরেক্টর হিসাবে কলেজের পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। শ্রীবসুর অক্লান্ত পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই দেশের বহু খ্যাতনামা শিল্পী কলেজের শিক্ষাকাজে যোগ দেন এবং শিক্ষণ পদ্ধতিতেও প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ঐ বছরই কলেজের প্রসপেকটাসে তিন বছরের সার্টিফিকেট কোর্স ও পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের স্কুল সার্টিফিকেট ও ন্যাশনাল ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার কথা ঘোষিত হয়। কিন্তু তথাকথিত পরিচালক মণ্ডলী ও জে. পি. মিত্রের নানান টালবাহানায় শ্রীবসুর পক্ষে এই কোর্স চালু করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং বাধ্যহয়ে ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে তিনি পদত্যাগ করেন। শ্রীবসুর পদত্যাগের সাথে সাথে যামিনী রায়, পূর্ণ চক্রবর্তী, লতিকা ঘোষ ও অন্যান্য গুণী শিক্ষক শিক্ষিকারাও কলেজ ছেড়ে চলে যান। এঁদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে জোরালো দাবী ওঠে। কিন্তু তথাকথিত পরিচালকমণ্ডলী ছাত্রছাত্রীদের এই সম্মিলিত ইচ্ছাকে কোন রকম মর্যাদা না দিয়ে জে. পি মিত্রের নায়কত্বে উকিল-ব্যারিষ্টার ইত্যাদি অ-শিল্পী ব্যক্তিদের নিয়ে আর একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেন। ছাত্রবিক্ষোভ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ছাত্রছাত্রীদের সাথে ক্রমশঃ তাদের অভিভাবকরাও যোগ দেন। পরিচালকমণ্ডলী পুনর্গঠনের দাবী ওঠে। ১৯৬৪ সালে অভিভাবকদের নিয়ে একটি 'রি-অরগানাইজেশন কমিটি' গঠিত হয়। তথাকথিত পরিচালকমণ্ডলী কলেজের সমস্ত দায়-দায়িত্ব এই 'রি-অরগানাইজেশন কমিটি'র হাতে দিয়ে দেয়। এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীভূপাল বসু।

কলেজের আয়-ব্যয় ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদির কোন সঠিক হিসেব না থাকায় ভূপাল বসু তথাকথিত পূর্বতন কমিটির সভাপতি জে. পি. মিত্রকে হিসাব পেশ করতে বলেন। কিন্তু মিত্র কোনরকম হিসাব দিতে অস্বীকার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভূপাল বসু '৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (২৯.৯.৬৪) ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে নিজের নামে একটি এ্যাকাউণ্ট খোলেন এবং সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে কলেজের সমস্ত টাকা তাতে জমা করতে থাকেন। ভূপাল বসুর এই নিজ নামে কলেজের টাকা জমা করা এবং "এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে" জে. পি. মিত্রকে হিসাব দাখিল করতে বলার অভিযোগে ১৯৬৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর তথাকথিত পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে 'রি-অরগানাইজেশন কমিটি' বাতিল করে দেওয়া হয়। সাথে সাথে ভূপাল বসুকে বলা হয় জে. পি. মিত্রকে সমস্ত হিসাব বুঝিয়ে দিতে। কিন্তু ভূপাল বসু রাজী না হওয়ায় জে. পি. মিত্র '৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই ভূপাল বসুর বিরুদ্ধে আলিপুর কোর্টে 'পরিচালকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত না মানা', 'এক্তিয়ার বহির্ভূতকাজ' ও ৩০,০০০ টাকার তহবিল তছরূপের একটি মামলা রুজু করেন। প্রত্যুত্তরে ভূপাল বসুও ১৯৬৬ সালে জে. পি. মিত্রের বিরুদ্ধে ক'লকাতা হাইকোর্টে একটি পাল্টা মামলা দায়ের করেন। উভয়পক্ষের এই মামলা ও পাল্টা মামলায় কলেজ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে হাইকোর্ট থেকে, এই প্রথম, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর্ট কলেজের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ হয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় '৫৬ সালেই আর্ট কলেজ ভারতীর অনুমোদন লাভ করে এবং সরকারী সাহায্য আসতে থাকে। তিন বছর পরে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতায় পদত্যাগ করেন এবং বি. কে. নিয়োগী প্রশাসক নিযুক্ত হন। নিয়োগী কলেজের অধ্যাপক সুহাস রায়কে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ করেন এবং '৭১ সালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর শূন্যস্থান পূরণের জন্য আদালতের পক্ষ থেকে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রশাসকহীন আর্ট কলেজ বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা ভূপাল ও জে. পি. মিত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার আবেদন করেন। কিন্তু তাঁরা সে আবেদনে কর্ণপাতও করেন না। অধ্যক্ষ বাধ্য হয়ে কলেজ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে নিরুপায় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে ও একভাবে কলেজ চালাবার দায়িত্ব নেন। এবং কলেজের দায়িত্ব-বহনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু সরকারের থেকে জানানো হয় মামলা চলাকালীন তাদের পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া তো দূরের কথা কোন রকম সাহায্য করাও সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটি ভূপাল বসু ও জে. পি. মিত্রের কাছে মামলা তুলে নেবার জন্য আবার আবেদন করে। কিন্তু আগের মত এবারেও তা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়।

## মামলা প্রত্যাহার?

একে তো আর্ট কলেজ বেসরকারী কলেজ, তার উপর আবার সরকারী সাহায্যের পথও বন্ধ! শিক্ষক-কর্মচারীরা বিনাবেতনে, ছাত্রছাত্রীদের যৎসামান্য সাহায্যের উপর ভিত্তি করে কোনরকমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯শে জুলাই (৭২) ভূপাল বসু ও জে. পি. মিত্র হঠাৎ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার সূত্রে মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এত অনুনয়-আবেদন সত্ত্বেও যাঁরা বিন্দুমাত্র টলেননি, তাঁদের এই হঠাৎ করে মামলা প্রত্যাহার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সকলকেই হতচকিত করে তোলে। কিন্তু ৭ই আগষ্ট তাঁদেরকে আরও হতচকিত করে দিয়ে জে. পি মিত্র, ভূপাল বসু এবং তথাকথিত পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা বিশাল পুলিশবাহিনী সঙ্গে নিয়ে কলেজে প্রবেশ করেন এবং অধ্যক্ষ সুহাস রায়কে কলেজের সমস্ত দায়িত্ব তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিতে বলেন। অধ্যক্ষ তাঁদের কাছে তাঁরাই যে আইন সঙ্গত পরিচালকমণ্ডলী তার প্রমাণ স্বরূপ কোর্টের কাগজ দেখতে চান। জে. পি. মিত্র পরদিন তা দেখাবেন বলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি তা দেখান নি।

আর ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা? তাঁরা স্বভাবতই এই প্রতারক, দায়িত্বজ্ঞানহীন মহাপুরুষদ্বয়,—যাঁদের পারস্পরিক মোকদ্দমায় কলেজ অনিবার্য ধ্বংসের মুখে চলেছিল, যাঁরা শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পকেটস্থ করেছেন, তাঁদেরকে এবং তাঁদেরই পরিচালিত তথাকথিত পরিচালকমণ্ডলীকে পুনরায় কলেজের পরিচালকমণ্ডলী হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। বাধ্য হয়ে ভূপাল বসু, জি. পি. মিত্র ও তাঁদের দলবলকে কলেজ প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে চলে যেতে হয়।

## ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা

কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের জব্দ করার জন্য এই প্রতারকরা নতুন ফন্দি আঁটতে থাকেন। এবং অক্টোবর মাসে তাঁদেরই পোষ্য কলেজ-ক্যাশিয়ারকে দিয়ে অধ্যক্ষ সহ পাঁচজন ছাত্র ও দু'জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপ, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও কলেজের সম্পত্তি চুরির একটি মামলা আনে। পুজোর কয়েকদিন আগে রাত ১২টার সময় অধ্যক্ষ সুহাসরায়কে তাঁর বাড়ী থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ৫ দিন লালবাজার পুলিশ লক-আপে আটক থাকার পর তিনি জামিনে মুক্ত হন। মামলায় "অভিযুক্ত" পাঁচজন ছাত্র এবং দু'জন কর্মচারীর নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। কোর্টে আত্মসমর্পণ করে পাঁচশ টাকার জামিনে তাঁরা মুক্ত হন।*

এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা সুষ্ঠুভাবে কলেজ পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ সুহাস রায়কে একটি আইনসঙ্গত পরিচালক-মণ্ডলী গঠন করার প্রস্তাব দেন এবং প্রস্তাবটি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। প্রস্তাবটি শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করে। ১২ই ডিসেম্বর (৭২) কলেজের লাইফ-মেম্বারদের সভায় অধ্যক্ষ সুহাস রায়, শিল্পী ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠন করেন। ২ দিন পর (১৪ই ডিসেম্বর) ভূপাল বসু অধ্যক্ষ সুহাস রায়ের বিরুদ্ধে একটি ইংজাংশন জারী করেন এবং উক্ত ইংজাংশনে নিজেকে কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে ঘোষণা করেন। নতুন পরিচালকমণ্ডলী এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলে ২২শে ডিসেম্বর ভূপাল বসু আরও একটি ইংজাংশন আনেন এবং ২রা জানুয়ারী '৭৩ নৈশ বিভাগের কতিপয় পেটোয়া ছাত্র ও দুজন শিক্ষক সহ কলেজে ঢুকলে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন।

## নতুন চক্রান্ত

৩রা জানুয়ারী সকালে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা কলেজে এসে দেখেন

---

*৭০-র জানুয়ারীতে এই মামলা নাকচ হয়ে যায় এবং "অভিযুক্ত"রা বেকসুর খালাস পেয়ে যান।

কলেজ প্রাঙ্গণে গিজ্‌গিজ্‌ করছে পুলিশ! দরজায় তালা ঝুলছে। অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। নৈশ বিভাগের ছাত্ররা এই অবস্থানে যোগদান করেন নি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে এই আন্দোলনের পিছনে কি তাহলে নৈশ বিভাগের ছাত্রদের সমর্থন নেই? সংক্ষেপে, এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এর উত্তরে বলতে হয়—না, নেই। কারণ এক্ষেত্রে ভূপাল বন্ধুরা বৃটিশ-প্রচলিত সেই নীতি, কালাআদমী দিয়ে কালাআদমীদের ঠেঙ্গানোর (divide and rule) নীতিকে সার্থক-ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। অবশ্য এই সার্থকতার পিছনে ভূপাল বন্ধুদের কৃতিত্বের চাইতে বেশী পরিমাণে দায়ী নৈশ বিভাগের বিশেষ অবস্থা। কি সেই বিশেষ অবস্থা—সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। নৈশ বিভাগে শুধুমাত্র ললিতকলায় তিন বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ৭০। যাঁদের বেশীর ভাগই আবার চাকুরীজীবি। ফলে আঁকা শেখাটা দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে যতটা রুটিরুজির প্রশ্ন, নৈশ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা নয়। তার ওপর আবার ভূপালবাবুরা টোপ হিসাবে ৫ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সও চালু করেছেন। যেখানে দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ৫ বছর সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা ক্লাশ করে ডিপ্লোমা পান সেখানে নৈশ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ৫ বছর সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা করে ক্লাশ করে এই ডিপ্লোমা পাবেন। আর্ট কলেজ সরকার নিয়ে নিলে এই কোর্স নৈশ বিভাগের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় নিয়ম অনুযায়ী ৭ বছরের হয়ে যাবে। এই পাঁচ বছরের কোর্স বছরের সাত হয়ে যাওয়াটাকেই ভূপাল বন্ধুরা divide and rule নীতির মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে দিবা এবং নৈশ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা নৈশ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বলছেন —"দেখ, দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-কর্মচারীরা যে দাবী তুলেছেন, তা তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে। তোমাদের মুখ চেয়ে আমরা এই দাবীর বিরোধিতা করছি। অতএব তোমরা……।"

## ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ সরকার নিলে কি সুবিধা হবে?

নিশ্চয়ই। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের পরিচালনারভার সরকার নিয়ে নিলে শুধুমাত্র যে তার আশি বছরের নড়বড়ে জোড়াতালি দেওয়া কাঠামোর পরিবর্তে একটি শক্ত মজবুত কাঠামোর নিশ্চয়তা আসবে তাই নয়, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক-কর্মচারীদের মাইনে ইত্যাদি অনেক দিকেই অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আর তা বাস্তবসত্য—কলকাতায়ই অবস্থিত 'সরকারী আর্ট কলেজে'র সাথে 'ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে'র উক্ত দিকগুলির একটা তুলনামূলক ছবি থেকেই একথা বুঝতে পারা যায়।

(১) গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে যেখানে গড়ে প্রতি দশজন ছাত্রের জন্য একজন করে শিক্ষক আছেন, ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে সেখানে প্রতি পঞ্চাশ জনের জন্যও একজন করে শিক্ষক নেই, ফলে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের শিক্ষকদের মত যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় না। গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের শিক্ষক সংখ্যা ১৩।

(২) সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের বেতনসীমা যেখানে ১২০০-১৫০০ টাকা, ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ সেখানে বেতন পান মাত্র ৪১০ টাকা। অন্যান্য শিক্ষকরা পান মাসে ২০০-২৫০ টাকার মত। আর কর্মচারীদের কারোরই মাইনে ১৬০-১৭৫ টাকার বেশী নয়। কারণ ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের মাইনের জন্য নির্ভর করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের বেতনের উপর। সরকার ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের পরিচালনারভার নিয়ে নিলে এঁরা সকলেই সরকারী আর্ট কলেজের মত মাইনে পাবেন।

(৩) সরকার ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের পরিচালনারভার নিলে ছাত্রছাত্রীদের মাইনের হারও অনেক কমে যাবে। যেমন একটা হিসাব দেওয়া যাক।

ছাত্রছাত্রীদের বেতন

| বর্ষ | গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ | ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ |
|---|---|---|
| ১ম বর্ষ | ৪ টাকা | ৮ টাকা |
| ২য় বর্ষ | " " | " " |
| ৩য় বর্ষ | ৬ " | ১০ " |
| ৪র্থ বর্ষ | " " | " " |
| ৫ম বর্ষ | " " | " " |

মাইনের সুবিধে ছাড়াও সরকারী কলেজ হওয়ায় সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নানাধরণের বৃত্তি পান। কিন্তু বেসরকারী কলেজ হওয়ায় ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কোন ধরণের বৃত্তি পান না।

কাজেই ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজকে বাঁচাবার একটাই পথ আছে সে পথ হলো—সরকারের তরফে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ। আর সেই পথই যাতে উন্মুক্ত হয়, তারজন্য দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও কর্মচারীরা অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকেন ১২ই জানুয়ারী সকালে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা কলেজে এসে দেখেন—দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ রয়েছে। তথাকথিত পরিচালক-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের কাজে এবং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশে যোগ দিতে বলা হয়। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ভূপালবাবুরা তখন ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীরা যাতে কলেজ-প্রাঙ্গনে অবস্থান করতে না পারেন, সেজন্য কোর্টে ১৪৪ ধারার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তা নামঞ্জুর হওয়ায়

ব্র সমস্ত শিক্ষক, ও চার জন ছাত্রকে শো-কজ্ করতে ৪ জন কর্মচারীকে ( যাঁদের মধ্যে একজন ৩৫ বছরের চারীও আছেন) ছাঁটাই করেন। তাঁরা "আর্ট কলেজ খোলা ন্ত কতিপয় উগ্রপন্থী ছাত্রছাত্রী অশান্তি সৃষ্টি করছে" প্রচার চালাচ্ছেন ক্রমাগত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁরা ছাত্র-ারীদের ঐক্যে চিড় ধরাতে পারেন নি—অবস্থান চলছে ঃ কলেজের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন তার দাবীতে।

## দুমুখো নীতি

কার কি করছেন ?—তাঁরা তাঁদের সেই চিরাচরিত নীতি, ়ি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলার নীতি, রেছেন। একদিকে তাঁরা ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে যাচ্ছেন—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁরা একটা ব্যবস্থা করে আর অন্যদিকে তাঁরাই ভূপালবাবুদের আহ্বানে কলেজ-লিশ মোতায়েন করেছেন আজ ৭ মাস ধরে। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, ছাত্র-কর্মচারীদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সরকারকে অবশ্যই এই দুমুখো নীতি পরিত্যাগ করতে। হ'লে আর্ট কলেজের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার তা নেই। আজ আর এ সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র ইণ্ডিয়ান জের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এই দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন। ** কিন্তু সরকারকে তার দুমুখো নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করাবার জন্য প্রয়োজন আরো অনেক বৃহত্তর, ব্যাপক সংগ্রাম। ছাত্র-শিক্ষক-শিল্পী-শিল্পরসিক এমনকি প্রতিটি সচেতন মানুষের কণ্ঠে আজ এই আওয়াজ ধ্বনিত হওয়া দরকার- "সরকার, তোমার দুমুখো নীতি পরিত্যাগ কর। ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের পরিচালনাভার গ্রহণ কর।"

** শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা :

(১) '৭২ সালের ফেব্রুয়ারীমাসে পশ্চিমবাংলার শিল্পীরা এই আন্দোলনের সমর্থনে এসপ্লানেড ইস্টে এক দিনের প্রতীক অনশন করেছেন।

(২) ৭ই মে ('৭৩) শিল্পীসাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা মিছিল করে সরকারের কাছে আর্ট কলেজের পরিচালনা ভার গ্রহণের আবেদন জানিয়ে একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিয়ে আসেন। প্রায় ৩০০ জন শিল্পীসাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এই মিছিলে ছিলেন।

(২) ২০শে মে ('৭৩) কলকাতার শিল্পীবৃন্দ ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের সংগ্রামী ছাত্র শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের পাথেয় সংগ্রহের জন্য Statesman পত্রিকার অফিসের সামনের রাস্তায় একটি উন্মুক্ত চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। অবিশ্বাস্য কমদামে প্রখ্যাত শিল্পীদের ছবি এখানে বিক্রি হচ্ছে।

(৪) ২৯শে মে ('৭৩) ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ খোলার দাবীতে শিল্পীসাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে (Calcutta Information Centre) একটি সভা করেছেন।

## দুর্লভ প্রতিভা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখার্জীর বড় ভাই র মুখার্জী একই সাথে আসানসোলের সরকারী স্পনসর্ড অধ্যক্ষের কাজ, সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান, যাদবপুর ালয়ের পার্ট টাইম লেকচারার এবং বীরভূমের একটি গ্রাম্য প্রশাসনের কাজ চালাচ্ছেন। —সত্যযুগ ৩. ৭. ৭৩

জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা

# নীলবিদ্রোহ

নীলাদ্রি ঘোষ

"বস্তুতঃ বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহ হচ্ছে প্রথম বিপ্লব"—কথাগুলো অমৃতবাজারের শিশির ঘোষের। এখানে অল্প কথার মধ্যে নীলবিদ্রোহের তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নীলবিদ্রোহ এক গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছে। অন্যান্য কৃষকবিদ্রোহগুলির থেকে নীলবিদ্রোহের স্বতন্ত্রতা এইখানে যে এই প্রথম একটি কৃষকবিদ্রোহ সাধারণভাবে একটা জাতীয় চরিত্র নিতে যাচ্ছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ভূস্বামী ও বুদ্ধিজীবিদের একটা যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি করেছিল। প্রায় একশ বছর ধরে বাংলার কৃষক নীলকরদের দ্বারা শোষিত হয়ে এসেছে। এই এক শতাব্দী ধরে কৃষকের রক্ত নিংড়ে কোটি কোটি টাকা বৃটিশরা তাদের দেশে নিয়ে গেছে আর এদেশের জন্য রেখে গেছে অনাহার, মহামারী, চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ এবং বর্বর অত্যাচার। নীলকরদের ব্যাপক লুণ্ঠনের সময়টা হচ্ছে বাংলার কৃষকের ওপর বৃটিশের জঘন্যতম এবং হিংস্রতম আক্রমণের যুগ আর এই সময়টা মেহনতী কৃষকের বৃটিশের বিরুদ্ধে গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাসও বটে।

ইতিহাস বলছে চন্দননগরের কাছে তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় লুই বনো ( Louis Bo[illegible]and ) নামক জনৈক ফরাসী ১৭৭৭ সালে প্রথম নীলচাষ শুরু করে আর বাংলাদেশে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করে। যে ইংরেজনন্দন কুখ্যাত হবার দাবি করতে পারে সে হচ্ছে ক্যারেল ব্লুম। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সে এদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নীল উৎপাদন শুরু করে।

ক্যারেল ব্লুম যার সূত্রপাত করলো সেই বিষবৃক্ষ ক্রমশ বিস্তার লাভ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বাংলা এবং বিহারের ভাল আবাদী জমি দখল করে ফেলল। ১৮১৫-১৬ সাল মাগাদ এসে আমরা দেখছি বাংলায় উৎপন্ন নীলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৮,৮০০ মণ আর তৎকালীন অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে সেই সময় থেকে কেবল বৃটেন নয়, গোটা দুনিয়ার নীলের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে একমাত্র বাংলাদেশ।—"বাংলার নীল সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে আঠারো শতকের শেষভাগ হই উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে তো প্রতিষ্ঠা লাভ কর তার উপরে বিশ্বের বাজারেও একচেটিয়া অধিকার কায়েম কর এই প্রতিষ্ঠা সে ভোগ করল একশ বছর ধরে।"[1]

নীলকর ইংরেজ নীলচাষ করতে এসে জমিদার হয়ে বসল। থেকে গ্রামান্তরে তারা ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক তারা ভূমিদাসত্বে বেঁধে ফেলল। নীলকরদের সার্বিক পরিচয় পা যাবে এই অংশটুকুর মধ্যে—"নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদা মহাজন। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শাসক শ্রেণীভুক্ত। ঔপনিবে তন্ত্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক।"[2]

নীলকরেরা বাংলার সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠন চালালো ও যশো খুলনা এবং নদীয়াতেই তারা কৃষকদের উপর ব্যাপক আকারে ও উৎপীড়ন চালিয়েছিল। এই তিনটি জেলায় শস্যের অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় এবং কৃষকদের বাধ্য করা হয় নীলের করতে। নীলকরেরা উচ্চ খাজনায় দেশীয় সামন্ত প্রভুদের থেকে জমিদারী পত্তনি নিত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের অষ্টম আইন অনুস এদেশীয় জমিদারদের পত্তনি তালুক বন্দোবস্ত করবার অধি দেওয়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল এই দেশীয় পরগাছা কাছে এই আইন ( Regulation VIII of 1819 ) আশীর্বাদ আসে। কারণ আলস্যপ্রিয়, ভোগসর্বস্ব, বৃটিশ সৃষ্ট এইসব জ দারেরা জমিদারী চালাবার দায় থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে নীলকরদের জমিদার পত্তনি দিয়ে একটা নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয় সৃষ্টি করে। পরে অবশ্য বহু জায়গাতে নীলকরদের সংগে জমিদার বিবাদ হতে থাকে এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ অব্দি দেখা দেয়। তার ক নীলকরেরা পরে জমিদারদের উপরও হামলা শুরু করে দেয় এবং জায়গাতে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং জমিদারেরা ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যেতেও বাধ্য হয় বহু জায়গাতেই।

নীলকরেরা পাঁচ বছরের জন্য যে পত্তনি নিত তাতে তারা রায় স্বত্ব কিনত না। রায়তস্বত্ব প্রজারই থাকত। তারা রায়ত চাষীর হাতে রেখে চাষীর খরচেই নীল উৎপাদন করত। অ 'যার শীল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।' এই ব্যব নীলকরদের লাভ হত সর্বাধিক। সে নীলকর কেবল জমিদ ছিল না। সে মহাজনও বটে। ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্ট জানা যায়, নীলকরেরা জমিদার হিসেবে চাষীদের কাছ থেকে জমিদারদের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ খাজনা আদায় করত।

ায়তীসত্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী নীলচাষের ব্যবস্থাকে বলত 'রায়তী দী' বা 'দাদনী আবাদী'। এছাড়া ছিল 'নিজ আবাদী' অর্থাৎ রদের নিজের জমিতে দিনমজুর খাটিয়ে নীল উৎপাদন। প্রথম-র ব্যবস্থাই চালু ছিল বহুল পরিমাণে। কারণ, দ্বিতীয় ধরনের ায় মূলধনের প্রয়োজন হত বেশী এবং এতে লাভও প্রথম ধরনের অপেক্ষা কম হত।

আর অন্যদিকে রায়তী বা দাদনী আবাদী ব্যবস্থায় কৃষককে বিঘা মাত্র ২ টাকা দাদন দিয়ে চাষের যাবতীয় কাজ করিয়ে নেওয়া এমনকি গাছ কেটে বাণ্ডিলাকারে নীল কুঠিতে পৌছে দিয়ে সে ছুটি পেত। নীল কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় 'নিজ াদী' ব্যবস্থায় ১০৬ হাজার বিঘা জমিতে নীলের চাষ করতে খরচ আড়াই লক্ষ টাকা। সেখানে রায়তী ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ২০ র টাকা খাটিয়ে নীল চাষ সম্ভব হত।

এর ফলে নীলকরের প্রচণ্ড রকম মুনাফা হত। তাদের লাভের ছিল প্রায় ৪০৮%। নীলচাষ ভিন্ন অন্য যে কোন ধরনের ফসলের ছিল কৃষকের পক্ষে লাভজনক। নীলচাষের ফলে কৃষকের কি নীয় অবস্থা হত তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে হারান চাকলাদার য়ের বিবরণীতে—"চাষীর পক্ষে নীলচাষ ছিল সম্পূর্ণ লোকসানের ার এবং চাষীর পরিবারের পক্ষে নীলচাষের অর্থ ছিল অনশন। করদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট—নিম্নতম ব্যয়ে, অথবা কোন ব্যয় রিয়াই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। নীলকর নীলচাষীকে নামমাত্র ও না দিয়া নীলের গাছগুলি হস্তগত করিত। আর যদি ঐ াত্র মূল্যটা চাষীকে দেওয়া হইত, তাহা হইলেও নীলচাষ চাষীর বিশেষ ক্ষতিকর হইত। আবার এই নামমাত্র মূল্য হইতেও মোটা অংশ কাটা হইত। কারণ কর্মচারীরা তাহাতে এত বেশী বসাইত এবং নীলগাছ ওজন করিবার সময় এত অসৎ উপায় ষন করিত যে, চাষীর এই নামমাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায় পৌছিত। চাষী যদি কোন মতে নীলের জমি হইতে অন্তত: নার টাকাও তুলিতে পারিত, তবে সে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান করিত।......আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, যখন অন্য সকল ষের মূল্য প্রায় দ্বিগুন, তখন নীলগাছের জন্য যে মূল্য দেওয়া অথবা নামমাত্র মূল্য দেওয়া হইত তাহা এক পয়সাও বৃদ্ধি পায় ।"[৩]

এছাড়া নীলকরেরা বিভিন্ন রকমের জুলুম করত। তারা যেভাবে র মাপ দিত সেটা প্রচলিত একককথেকে বেশী হত। এছাড়া কর অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপরও তারা কব্জা বসাত। কুঠির প্রয়োজনে বাঁশ খড় ইত্যাদি সাহেবরা বিনা পয়সায় গায়ের র ছিনিয়ে আনত। আবার নীলকুঠিতে তারা কৃষকদের বেগার খাটতে বাধ্য করত। যারা অস্বীকার করত তাদের কপালে জুটত কয়েদবাস।

এ প্রসঙ্গে নীলকমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় নদীয়ার মীরদাস মণ্ডলের বিবৃতি স্মরণ করা যেতে পারে :

"নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। সাধারণ মহাজনদের নিকট বাজারদর ছিল টাকায় চৌদ্দ হইতে ষোল কাঠা ধান। কিন্তু নীলকর সেখানে দেয় মাত্র আট কাঠা, আর আমরা নীলকর ব্যতীত অন্যকোন মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিনা। আমার আর একটা অভিযোগ এই যে, গত কার্ত্তিক মাসে নীলকর আমার সাতশত বাঁশ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য সে আমাকে এখনও কিছুই দেয় নাই ; যদিও দেয় তাহা হইলে দিবে প্রতি একশত বাঁশের জন্য মাত্র চারি আনা"[৪]

প্রকৃতপক্ষে নীলকরেরা এদেশে ভূমিদাসত্ব চালু করেছিল। এই ভূমিদাসত্ব ছিল ছিল আমেরিকা এবং রুশিয়ার জারের আমলের ভূমিদাসত্বের চাইতেও ভয়াবহ। ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে কেরানী-তৈরীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করবার ব্যাপারে যে উদ্যোগী পুরুষের নাম ইতিহাসে লেখা আছে এবং যে মহাশয় ভারত সরকারের প্রথম আইন প্রণেতা সেই লর্ড মেকলের বক্তব্য থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন নীলচাষীদের প্রকৃত অবস্থা :

"নীলচুক্তিগুলি নীতিগত দিক থেকে অত্যন্ত আপত্তিকর ...একদিকে নীলচুক্তির ফলে এবং অন্যদিকে নীলকরদের বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্য্যের ফলে কৃষক প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছে।"[৫] নীলকমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়—"নীলচাষ করিবার জন্য সারাবৎসর ধরিয়া সমস্ত সময়ে নীলকরের জন্যই বেগার খাটিতে হয়। আর ইহার জন্য রায়তকে তাহার অন্যান্য ফসলের কাজ ফেলিয়া রাখিতে হয়।"[৬]

কার্যত:, ২ টাকা দাদন দিয়ে নীলকরেরা চাষীর যাবতীয় শ্রম ও জমির মালিক হয়ে বসত। যে কৃষক একবার ঋণ নিত সে আর কখনই ঋণজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না। আইন কানুন সবই ছিল নীলকরদের পক্ষে। এমনকি বহু জমিদারও নীলকরদের সংগে বিবাদ করতে যেয়ে মাঝপথে সর্বস্বান্ত হয়ে যেত।

আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাস কিনবার জন্য ক্রীতদাস মালিক-দের যে পরিমাণ পয়সা খরচ করতে হত, নীলকরদের বাংলার চাষীদের দাসত্বে আবদ্ধ করতে সেই পরিমাণ পয়সাও খরচ করতে হত না।

ক্রীতদাস মালিক নীলকরদের পক্ষে অত্যাচার ও লুণ্ঠন করাটাই ছিল স্বাভাবিক। তারা কৃষকদের সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হতো না—কৃষকের স্ত্রী-কন্যাকেও বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যেত। তাদের অত্যা-চারের বিস্তারিত বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি কিন্তু অংশ বিশেষ

জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা

# নীলবিদ্রোহ

নীলাদ্রি ঘোষ

"বস্তুতঃ বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহ হচ্ছে প্রথম বিপ্লব"— কথাগুলো অমৃতবাজারের শিশির ঘোষের। এখানে অল্প কথার মধ্যে নীলবিদ্রোহের তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নীলবিদ্রোহ এক গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছে। অন্যান্য কৃষকবিদ্রোহগুলির থেকে নীলবিদ্রোহের স্বতন্ত্রতা এইখানে যে এই প্রথম একটি কৃষকবিদ্রোহ সাধারণভাবে একটা জাতীয় চরিত্র নিতে যাচ্ছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ভূস্বামী ও বুদ্ধিজীবিদের একটা যুক্তফ্রন্ট সৃষ্টি করেছিল। প্রায় একশ বছর ধরে বাংলার কৃষক নীলকরদের দ্বারা শোষিত হয়ে এসেছে। এই এক শতাব্দী ধরে কৃষকের রক্ত নিংড়ে কোটি কোটি টাকা বৃটিশরা তাদের দেশে নিয়ে গেছে আর এদেশের জন্য রেখে গেছে অনাহার, মহামারী, চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ এবং বর্বর অত্যাচার। নীলকরদের ব্যাপক লুণ্ঠনের সময়টা হচ্ছে বাংলার কৃষকের ওপর বৃটিশের জঘন্যতম এবং হিংস্রতম আক্রমণের যুগ আর এই সময়টা মেহনতী কৃষকের বৃটিশের বিরুদ্ধে গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাসও বটে।

ইতিহাস বলছে চন্দননগরের কাছে তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় লুই বনো ( Louis Bo and ) নামক জনৈক ফরাসী ১৭৭৭ সালে প্রথম নীলচাষ শুরু করে আর বাংলাদেশে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করে। যে ইংরেজনন্দন কুখ্যাত হবার দাবি করতে পারে সে হচ্ছে ক্যারেল ব্লুম। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সে এদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নীল উৎপাদন শুরু করে।

ক্যারেল ব্লুম যার সূত্রপাত করলো সেই বিষবৃক্ষ ক্রমশ বিস্তার লাভ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বাংলা এবং বিহারের ভাল আবাদী জমি দখল করে ফেলল। ১৮১৫-১৬ সাল মাগাদ এসে আমরা দেখছি বাংলায় উৎপন্ন নীলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৮,৮০০ মণ আর তৎকালীন অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে সেই সময় থেকে কেবল বৃটেন নয়, গোটা দুনিয়ার নীলের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে একমাত্র বাংলাদেশ।—"বাংলার নীল সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে আঠারো শতকের শে[ষ] উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে তো প্রতিষ্ঠা ল[াভ] তার উপরে বিশ্বের বাজারেও একচেটিয়া অধিকার কা[য়েম] এই প্রতিষ্ঠা সে ভোগ করল একশ বছর ধরে।"[১]

নীলকর ইংরেজ নীলচাষ করতে এসে জমিদার হয়ে ব[সল।] থেকে গ্রামান্তরে তারা ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার লক্ষ [লক্ষ] তারা ভূমিদাসত্বে বেঁধে ফেলল। নীলকরদের সার্বিক প[রিচয়] যাবে এই অংশটুকুর মধ্যে—"নীলকর একাধারে নীলকর, মহাজন। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শাসক শ্রেণীভুক্ত। [...] অত্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক।"[২]

নীলকরেরা বাংলার সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠন চালালো [...] খুলনা এবং নদীয়াতেই তারা কৃষকদের উপর ব্যাপক অ[ত্যাচার] ও উৎপীড়ন চালিয়েছিল। এই তিনটি জেলায় [...] অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় এবং কৃষকদের বাধ্য করা হয় [...] করতে। নীলকরেরা উচ্চ খাজনায় দেশীয় সামন্ত প্র[ভুদের] থেকে জমিদারী পত্তনি নিত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের অষ্টম আ[ইনে] এদেশীয় জমিদারদের পত্তনি তালুক বন্দোবস্ত করবা[র অধিকার] দেওয়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল এই দেশীয় [...] কাছে এই আইন ( Regulation VIII of 1819 ) [...] আসে। কারণ আলস্যপ্রিয়, ভোগসর্বস্ব, বৃটিশ সৃষ্ট [...] দারেরা জমিদারী চালাবার দায় থেকে নিষ্কৃতিলাভ [...] নীলকরদের জমিদার পত্তনি দিয়ে একটা নির্দিষ্ট আয়ের সৃষ্টি করে। পরে অবশ্য বহু জায়গাতে নীলকরদের সংগে বিবাদ হতে থাকে এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ অব্দি দেখা দেয়। নীলকরেরা পরে জমিদারদের উপরও হামলা শুরু করে দে[য়।] জায়গাতে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং জমিদারে[রা] ছেড়ে পালিয়ে যেতেও বাধ্যহয় বহু জায়গাতেই।

নীলকরেরা পাঁচ বছরের জন্য যে পত্তনি নিত তাতে ত[ারা] স্বত্ব কিনত না। রায়তস্বত্ব প্রজারই থাকত। তার [...] চাষীর হাতে রেখে চাষীর খরচেই নীল উৎপাদন কর[ত।] 'যার শীল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।' নীলকরদের লাভ হত সর্বাধিক। সে নীলকর কেবল ছিল না। সে মহাজনও বটে। ইণ্ডিগো কমিশনের রি[পোর্ট থেকে] জানা যায়, নীলকরেরা জমিদার হিসেবে চাষীদের কাছ [থেকে] জমিদারদের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ খাজনা আদায় করত।

রতীসত্ত্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী নীলচাষের ব্যবস্থাকে বলত 'রায়তী
।' বা 'দাদনী আবাদী'। এছাড়া ছিল 'নিজ আবাদী' অর্থাৎ
দের নিজের জমিতে দিনমজুর খাটিয়ে নীল উৎপাদন। প্রথম-
ব্যবস্থাই চালু ছিল বহুল পরিমাণে। কারণ, দ্বিতীয় ধরনের
। মূলধনের প্রয়োজন হত বেশী এবং এতে লাভও প্রথম ধরনের
অপেক্ষা কম হত।

র অন্যদিকে রায়তী বা দাদনী আবাদী ব্যবস্থায় কৃষককে বিঘা
াত্র ২ টাকা দাদন দিয়ে চাষের যাবতীয় কাজ করিয়ে নেওয়া
এমনকি গাছ কেটে বাণ্ডিলাকারে নীল কুঠিতে পৌছে দিয়ে
া ছুটি পেত। নীল কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় 'নিজ
।' ব্যবস্থায় ১০৬ হাজার বিঘা জমিতে নীলের চাষ করতে খরচ
মাড়াই লক্ষ টাকা। সেখানে রায়তী ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ২০
টাকা খাটিয়ে নীল চাষ সম্ভব হত।

। ফলে নীলকরের প্রচণ্ড রকম মুনাফা হত। তাদের লাভের
ল প্রায় ৪:৮%। নীলচাষ ভিন্ন অন্য যে কোন ধরনের ফসলের
হল কৃষকের পক্ষে লাভজনক। নীলচাষের ফলে কৃষকের কি
ায় অবস্থা হত তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে হারান চাকলাদার
রর বিবরণীতে—"চাষীর পক্ষে নীলচাষ ছিল সম্পূর্ণ লোকসানের
এবং চাষীর পরিবারের পক্ষে নীলচাষের অর্থ ছিল অনশন।
াদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট—নিম্নতম ব্যয়ে, অথবা কোন ব্যয়
য়াই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। নীলকর নীলচাষীকে নামমাত্র
না দিয়া নীলের গাছগুলি হস্তগত করিত। আর যদি ঐ
ন মূল্যটা চাষীকে দেওয়া হইত, তাহা হইলেও নীলচাষ চাষীর
বিশেষ ক্ষতিকর হইত। আবার এই নামমাত্র মূল্য হইতেও
মোটা অংশ কাটা হইত। কারণ কর্মচারীরা তাহাতে এত বেশী
সাইত এবং নীলগাছ ওজন করিবার সময় এত অসৎ উপায়
ন করিত যে, চাষীর এই নামমাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায়
পৌছিত। চাষী যদি কোন মতে নীলের জমি হইতে অন্ততঃ
র টাকাও তুলিতে পারিত, তবে সে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান
করিত।......আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, যখন অন্য সকল
ষর মূল্য প্রায় দ্বিগুণ, তখন নীলগাছের জন্য যে মূল্য দেওয়া
অথবা নামমাত্র মূল্য দেওয়া হইত তাহা এক পয়সাও বৃদ্ধি পায়
।[৩]

হাড়া নীলকরেরা বিভিন্ন রকমের জুলুম করত। তারা যেভাবে
মাপ দিত সেটা প্রচলিত এককথেকে বেশী হত। এছাড়া
র অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপরও তারা কব্জা বসাত।
ঠির প্রয়োজনে বাঁশ খড় ইত্যাদি সাহেবরা বিনা পয়সায় গায়ের
ছিনিয়ে আনত। আবার নীলকুঠিতে তারা কৃষকদের বেগার
খাটতে বাধ্য করত। যারা অস্বীকার করত তাদের কপালে জুটত
কয়েদবাস।

এ প্রসঙ্গে নীলকমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় নদীয়ার মীরদাস
মণ্ডলের বিবৃতি স্মরণ করা যেতে পারে:

"নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। সাধারণ
মহাজনদের নিকট বাজারদর ছিল টাকায় চৌদ্দ হইতে ষোল কাঠা ধান।
কিন্তু নীলকর সেখানে দেয় মাত্র আট কাঠা, আর আমরা নীলকর
ব্যতীত অন্যকোন মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিনা।
আমার আর একটা অভিযোগ এই যে, গত কার্তিক মাসে নীলকর
আমার সাতশত বাঁশ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য সে আমাকে
এখনও কিছুই দেয় নাই; যদিও দেয় তাহা হইলে দিবে প্রতি একশত
বাঁশের জন্য মাত্র চারি আনা।"[৪]

প্রকৃতপক্ষে নীলকরেরা এদেশে ভূমিদাসত্ব চালু করেছিল। এই
ভূমিদাসত্ব ছিল ছিল আমেরিকা এবং রুশিয়ার জারের আমলের ভূমি-
দাসত্বের চাইতেও ভয়াবহ। ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে কেরানী-
তৈরীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করবার ব্যাপারে যে উদ্যোগী পুরুষের
নাম ইতিহাসে লেখা আছে এবং যে মহাশয় ভারত সরকারের প্রথম
আইন প্রণেতা সেই লর্ড মেকলের বক্তব্য থেকেই পাঠক বুঝতে
পারবেন নীলচাষীদের প্রকৃত অবস্থা:

"নীলচুক্তিগুলি নীতিগত দিক থেকে অত্যন্ত আপত্তিকর...একদিকে
নীলচুক্তির ফলে এবং অন্যদিকে নীলকরদের বেআইনী ও হিংসাত্মক
কার্য্যের ফলে কৃষক প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছে।"[৫] নীলকমিশনের
রিপোর্টে দেখা যায়—"নীলচাষ করিবার জন্য সারাবৎসর ধরিয়া সমস্ত
সময়ে নীলকরের জন্যই বেগার খাটিতে হয়। আর ইহার জন্য রায়তকে
তাহার অন্যান্য ফসলের কাজ ফেলিয়া রাখিতে হয়।"[৬]

কার্যতঃ, ২ টাকা দাদন দিয়ে নীলকরেরা চাষীর যাবতীয় শ্রম ও
জমির মালিক হয়ে বসত। যে কৃষক একবার ঋণ নিত সে আর
কখনই ঋণজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না। আইন কানুন
সবই ছিল নীলকরদের পক্ষে। এমনকি বহু জমিদারও নীলকরদের
সংগে বিবাদ করতে যেয়ে মাঝপথে সর্বস্বান্ত হয়ে যেত।

আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাস কিনবার জন্য ক্রীতদাস মালিক-
দের যে পরিমাণ পয়সা খরচ করতে হত, নীলকরদের বাংলার
চাষীদের দাসত্বে আবদ্ধ করতে সেই পরিমাণ পয়সাও খরচ করতে
হত না।

ক্রীতদাস মালিক নীলকরদের পক্ষে অত্যাচার ও লুণ্ঠন করাটাই
ছিল স্বাভাবিক। তারা কৃষকদের সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হতো না—
কৃষকের স্ত্রী-কন্যাকেও বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যেত। তাদের অত্যা-
চারের বিস্তারিত বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি কিন্তু অংশ বিশেষ

জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা

# নীলবিদ্রোহ

নীলাদ্রি ঘোষ

"বস্তুতঃ বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহ হচ্ছে প্রথম বিপ্লব"— কথাগুলো অমৃতবাজারের শিশির ঘোষের। এখানে অল্প কথার মধ্যে নীলবিদ্রোহের তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নীলবিদ্রোহ এক গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছে। অন্যান্য কৃষকবিদ্রোহগুলির থেকে নীলবিদ্রোহের স্বতন্ত্রতা এইখানে যে এই প্রথম একটি কৃষকবিদ্রোহ সাধারণভাবে একটা জাতীয় চরিত্র নিতে যাচ্ছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ভূস্বামী ও বুদ্ধিজীবিদের একটা যুক্তফ্রণ্ট সৃষ্টি করেছিল। প্রায় একশ বছর ধরে বাংলার কৃষক নীলকরদের দ্বারা শোষিত হয়ে এসেছে। এই এক শতাব্দী ধরে কৃষকের রক্ত নিংড়ে কোটি কোটি টাকা বৃটিশরা তাদের দেশে নিয়ে গেছে আর এদেশের জন্য রেখে গেছে অনাহার, মহামারী, চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ এবং বর্বর অত্যাচার। নীলকরদের ব্যাপক লুণ্ঠনের সময়টা হচ্ছে বাংলার কৃষকের ওপর বৃটিশের জঘন্যতম এবং হিংস্রতম আক্রমণের যুগ আর এই সময়টা মেহনতী কৃষকের বৃটিশের বিরুদ্ধে গৌরবময় সংগ্রামের ইতিহাসও বটে।

ইতিহাস বলছে চন্দননগরের কাছে তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় লুই বনো ( Louis Bonnand ) নামক জনৈক ফরাসী ১৭৭৭ সালে প্রথম নীলচাষ শুরু করে আর বাংলাদেশে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করে। যে ইংরেজনন্দন কুখ্যাত হবার দাবি করতে পারে সে হচ্ছে ক্যারেল ব্লুম। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সে এদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নীল উৎপাদন শুরু করে।

ক্যারেল ব্লুম যার সূত্রপাত করলো সেই বিষবৃক্ষ ক্রমশ বিস্তার লাভ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বাংলা এবং বিহারের ভাল আবাদী জমি দখল করে ফেলল। ১৮১৫-১৬ সাল মাগাদ এসে আমরা দেখছি বাংলায় উৎপন্ন নীলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৮,৮০০ মণ আর তৎকালীন অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে সেই সময় থেকে কেবল বৃটেন নয়, গোটা দুনিয়ার নীলের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে একমাত্র বাংলাদেশ।—"বাংলার নীল সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দিয়ে মাত্র ২০ বছরের মধ্যে আঠারো শতকের শেষভাগ হইতে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে তো প্রতিষ্ঠা লাভ করলই, তার উপরে বিশ্বের বাজারেও একচেটিয়া অধিকার কায়েম করল। এই প্রতিষ্ঠা সে ভোগ করল একশ বছর ধরে।"[১]

নীলকর ইংরেজ নীলচাষ করতে এসে জমিদার হয়ে বসল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তারা ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষককে তারা ভূমিদাসত্বে বেঁধে ফেলল। নীলকরদের সার্বিক পরিচয় পাওয়া যাবে এই অংশটুকুর মধ্যে—"নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার শাসক শ্রেণীভুক্ত। ঔপনিবেশিক তন্ত্রের সে হচ্ছে একটি চমৎকার প্রতীক।"[২]

নীলকরেরা বাংলার সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠন চালালো ও যশোহর, খুলনা এবং নদীয়াতেই তারা কৃষকদের উপর ব্যাপক আকারে লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন চালিয়েছিল। এই তিনটি জেলায় শস্যের চাষ অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় এবং কৃষকদের বাধ্য করা হয় নীলের চাষ করতে। নীলকরেরা উচ্চ খাজনায় দেশীয় সামন্ত প্রভুদের কাছ থেকে জমিদারী পত্তনি নিত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের অষ্টম আইন অনুসারে এদেশীয় জমিদারদের পত্তনি তালুক বন্দোবস্ত করবার অধিকার দেওয়া হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফসল এই দেশীয় পরগাছাদের কাছে এই আইন ( Regulation VIII of 1819 ) আশীর্বাদ হয়ে আসে। কারণ আলস্যপ্রিয়, ভোগসর্বস্ব, বৃটিশ সৃষ্ট এইসব জমিদারেরা জমিদারী চালাবার দায় থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে এবং নীলকরদের জমিদার পত্তনি দিয়ে একটা নির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। পরে অবশ্য বহু জায়গাতে নীলকরদের সংগে জমিদারদের বিবাদ হতে থাকে এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ অব্দি দেখা দেয়। তার কারণ নীলকরেরা পরে জমিদারদের উপরও হামলা শুরু করে দেয় এবং বহু জায়গাতে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং জমিদারেরা ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যেতেও বাধ্যহয় বহু জায়গাতেই।

নীলকরেরা পাঁচ বছরের জন্য যে পত্তনি নিত তাতে তারা রায়তীস্বত্ব কিনত না। রায়তস্বত্ব প্রজারই থাকত। তারা রায়তীস্বত্ব চাষীর হাতে রেখে চাষীর খরচেই নীল উৎপাদন করত। অর্থাৎ 'যার শীল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।' এই ব্যবস্থায় নীলকরদের লাভ হত সর্বাধিক। সে নীলকর কেবল জমিদারই ছিল না। সে মহাজনও বটে। ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, নীলকরেরা জমিদার হিসেবে চাষীদের কাছ থেকে দেশীয় জমিদারদের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ খাজনা আদায় করত।

রায়তীসত্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী নীলচাষের ব্যবস্থাকে বলত 'রায়তী আবাদী' বা 'দাদনী আবাদী'। এছাড়া ছিল 'নিজ আবাদী' অর্থাৎ নীলকরদের নিজের জমিতে দিনমজুর খাটিয়ে নীল উৎপাদন। প্রথম-ধরনের ব্যবস্থাই চালু ছিল বহুল পরিমাণে। কারণ, দ্বিতীয় ধরনের ব্যবস্থায় মূলধনের প্রয়োজন হত বেশী এবং এতে লাভও প্রথম ধরনের ব্যবস্থা অপেক্ষা কম হত।

আর অন্যদিকে রায়তী বা দাদনী আবাদী ব্যবস্থায় কৃষককে বিঘা প্রতি মাত্র ২ টাকা দাদন দিয়ে চাষের যাবতীয় কাজ করিয়ে নেওয়া হত। এমনকি গাছ কেটে বাণ্ডিলাকারে নীল কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে তবে সে ছুটি পেত। নীল কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় 'নিজ আবাদী' ব্যবস্থায় ১০৬ হাজার বিঘা জমিতে নীলের চাষ করতে খরচ পড়ত আড়াই লক্ষ টাকা। সেখানে রায়তী ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ২০ হাজার টাকা খাটিয়ে নীল চাষ সম্ভব হত।

এর ফলে নীলকরের প্রচণ্ড রকম মুনাফা হত। তাদের লাভের হার ছিল প্রায় ৪:৮%। নীলচাষ ভিন্ন অন্য যে কোন ধরনের ফসলের চাষ ছিল কৃষকের পক্ষে লাভজনক। নীলচাষের ফলে কৃষকের কি শোচনীয় অবস্থা হত তার একটা চিত্র পাওয়া যাবে হারান চাকলাদার মহাশয়ের বিবরণীতে—"চাষীর পক্ষে নীলচাষ ছিল সম্পূর্ণ লোকসানের ব্যাপার এবং চাষীর পরিবারের পক্ষে নীলচাষের অর্থ ছিল অনশন। নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্পষ্ট—নিম্নতম ব্যয়ে, অথবা কোন ব্যয় না করিয়াই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। নীলকর নীলচাষীকে নামমাত্র মূল্যও না দিয়া নীলের গাছগুলি হস্তগত করিত। আর যদি ঐ নামমাত্র মূল্যটা চাষীকে দেওয়া হইত, তাহা হইলেও নীলচাষ চাষীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইত। আবার এই নামমাত্র মূল্য হইতেও একটি মোটা অংশ কাটা হইত। কারণ কর্মচারীরা তাহাতে এত বেশী ভাগ বসাইত এবং নীলগাছ ওজন করিবার সময় এত অসৎ উপায় অবলম্বন করিত যে, চাষীর এই নামমাত্র মূল্যটাও শূন্যের কোঠায় গিয়া পৌছিত। চাষী যদি কোন মতে নীলের জমি হইতে অন্ততঃ খাজনার টাকাও তুলিতে পারিত, তবে সে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান মনে করিত।.......আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, যখন অন্য সকল জিনিষের মূল্য প্রায় দ্বিগুন, তখন নীলগাছের জন্য যে মূল্য দেওয়া হইত অথবা নামমাত্র মূল্য দেওয়া হইত তাহা এক পয়সাও বৃদ্ধি পায় নাই।" ৩

এছাড়া নীলকরেরা বিভিন্ন রকমের জুলুম করত। তারা যেভাবে জমির মাপ দিত সেটা প্রচলিত এককথেকে বেশী হত। এছাড়া কৃষকের অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উপরও তারা কব্জা বসাত। নীলকুঠির প্রয়োজনে বাঁশ খড় ইত্যাদি সাহেবরা বিনা পয়সায় গায়ের জোরে ছিনিয়ে আনত। আবার নীলকুঠিতে তারা কৃষকদের বেগার খাটতে বাধ্য করত। যারা অস্বীকার করত তাদের কপালে জুটত কয়েদবাস।

এ প্রসঙ্গে নীলকমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময় নদীয়ার মীরদাস মণ্ডলের বিবৃতি স্মরণ করা যেতে পারে :

"নীলকর একাধারে নীলকর, জমিদার ও মহাজন। সাধারণ মহাজনদের নিকট বাজারদর ছিল টাকায় চৌদ্দ হইতে ষোল কাঠা ধান। কিন্তু নীলকর সেখানে দেয় মাত্র আট কাঠা, আর আমরা নীলকর ব্যতীত অন্যকোন মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিনা। আমার আর একটা অভিযোগ এই যে, গত কার্ত্তিক মাসে নীলকর আমার সাতশত বাঁশ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য সে আমাকে এখনও কিছুই দেয় নাই ; যদিও দেয় তাহা হইলে দিবে প্রতি একশত বাঁশের জন্য মাত্র চারি আনা।" ৪

প্রকৃতপক্ষে নীলকরেরা এদেশে ভূমিদাসত্ব চালু করেছিল। এই ভূমিদাসত্ব ছিল ছিল আমেরিকা এবং রুশিয়ার জারের আমলের ভূমি-দাসত্বের চাইতেও ভয়াবহ। ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে কেরানী-তৈরীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করবার ব্যাপারে যে উদ্যোগী পুরুষের নাম ইতিহাসে লেখা আছে এবং যে মহাশয় ভারত সরকারের প্রথম আইন প্রণেতা সেই লর্ড মেকলের বক্তব্য থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন নীলচাষীদের প্রকৃত অবস্থা :

"নীলচুক্তিগুলি নীতিগত দিক থেকে অত্যন্ত আপত্তিকর ...একদিকে নীলচুক্তির ফলে এবং অন্যদিকে নীলকরদের বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্য্যের ফলে কৃষক প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছে।" ৫ নীলকমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়—"নীলচাষ করিবার জন্য সারাবৎসর ধরিয়া সমস্ত সময়ে নীলকরের জন্যই বেগার খাটিতে হয়। আর ইহার জন্য রায়তকে তাহার অন্যান্য ফসলের কাজ ফেলিয়া রাখিতে হয়।" ৬

কার্যতঃ, ২ টাকা দাদন দিয়ে নীলকরেরা চাষীর যাবতীয় শ্রম ও জমির মালিক হয়ে বসত। যে কৃষক একবার ঋণ নিত সে আর কখনই ঋণজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না। আইন কানুন সবই ছিল নীলকরদের পক্ষে। এমনকি বহু জমিদারও নীলকরদের সংগে বিবাদ করতে যেয়ে মাঝপথে সর্বস্বান্ত হয়ে যেত।

আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাস কিনবার জন্য ক্রীতদাস মালিক-দের যে পরিমাণ পয়সা খরচ করতে হত, নীলকরদের বাংলার চাষীদের দাসত্বে আবদ্ধ করতে সেই পরিমাণ পয়সাও খরচ করতে হত না।

ক্রীতদাস মালিক নীলকরদের পক্ষে অত্যাচার ও লুণ্ঠন করাটাই ছিল স্বাভাবিক। তারা কৃষকদের সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হতো না—কৃষকের স্ত্রী-কন্যাকেও বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যেত। তাদের অত্যা-চারের বিস্তারিত বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি কিন্তু অংশ বিশেষ

যা পাওয়া যায় তাতেই সভ্য দুনিয়া চমকে উঠবে। ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ফেলাতুর সাহেবের কথায় একবার শুনুন!

"এরূপ একটা বাক্স নীলও ইংলণ্ডে পৌঁছয় না যাহা মানুষের রক্তে রঞ্জিত নহে—এই উক্তির জন্য মিশনারীদের সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা আমারও কথা। ফরিদপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহার ভিত্তিতে আমি জোরের সহিত বলিতে চাই যে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি কতিপয় প্রজাকে দেখিয়াছি যাহাদের দেহ বল্লম দ্বারা সম্পূর্ণ বিদ্ধ করা হইয়াছিল। কতিপয় প্রজার মৃতদেহ আমার সম্মুখে আনয়ন করা হইয়াছিল যাহাদের নীলকর ফোর্ড গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল। আমি আরও কয়েকজন প্রজার কথা জানি যাহাদের বল্লম দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।" [৭]

কিন্তু নীলকরদের এই অমানুষিক বর্বর অত্যাচারই শেষ কথা ছিল না। বাংলার কৃষক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে পাল্টা আক্রমণও করেছিল। একশ বছর ধরে তারা সংগ্রাম করেছে এবং এর ভেতর দিয়ে তারা জাতীয় কলঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করেছে। জাতীয় আত্ম-সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনতে শহীদ হয়েছে, অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে নির্মম ভাবে আর ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে গেছে এক গৌরবময় ইতিহাস। আমরা আজ গর্বের সংগে বলতে পারি—

"বাংলাদেশ তার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্বিত হতে পারে। নীল আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে বাংলাদেশের রায়তরা যে নৈতিক শক্তির এত সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছে তা আর কোন কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দরিদ্র, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন, নেতৃত্বশূন্য হয়েও এইসব কৃষকরা এমন একটা বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হয়েছে যা গুরুত্বে ও মহত্বে কোনো দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। তাদের এমন শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে যাদের হাতে ছিল দুর্দ্ধর্ষ ক্ষমতার সবরকম উপকরণ, সরকার ছিল তাদের বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রগুলি তাদের বিরুদ্ধে, আইন-আদালত সবই তাদের বিরুদ্ধে—এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে তারা যে সফলতা অর্জন করেছিল তার সুফল সমাজের সকলশ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধররা উপভোগ করতে পারে।…………ইতিমধ্যেই রায়তদের অত্যাচারীরা বুঝতে পেরেছে যে তাদের স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের অবসান হতে চলেছে।……এই বিপ্লবের জন্য তাদের অসংখ্য দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে—প্রহার, অপমান, গৃহচ্যুতি, সম্পত্তি ধ্বংস, সবই তাদের ভাগ্যে ঘটেছে, সব রকমের অত্যাচার তাদের উপর হয়েছে। গ্রামকে গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের ধরে নিয়ে কয়েদ রাখা হয়েছে। স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে। ধানের গোলা ধ্বংস করা হয়েছে, সব রকমের নৃশংসতা তাদের ওপর হয়েছে। তবুও রায়তরা মাথা নোয়ায়নি……তাদের সামাজিক অবস্থায় একটা বিপ্লব এসে যাবে, যার প্রতিক্রিয়া দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়েছে।" [৮]

নীল বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়নি, কৃষকের ব্যাপক গণচেতনা কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি, সমাজের প্রগতির অন্তরায় পেছিয়ে পড়া ভূমি ব্যবস্থার ও কোন পরিবর্তন হয়নি ঠিকই কিন্তু এই বিদ্রোহ ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল; কৃষক বুঝতে পেরেছিল তার সংঘ শক্তি। আর এই বিদ্রোহের নায়করা আত্মত্যাগের যে নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন তা' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নীলবিদ্রোহের প্রথম শহীদ বিশ্বনাথ সর্দার। পাঠকের কাছে হয়ত নামটা অপরিচিত ঠেকছে। কিন্তু না, তাকে আপনারা সবাই চেনেন, খুব ভালভাবেই চেনেন। অরণ্যদেব মার্কা বাজারী কিশোর সাহিত্য পত্রিকার কল্যাণে আপনারা তাকে চেনেন বিশে ডাকাত হিসাবে। বৃটিশের বিরুদ্ধে যারাই বিদ্রোহ করেছে, যারাই চেষ্টা করেছে জাতীয় হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করবার, যারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে তার গোলামী করতে তাকেই তারা চিহ্নিত করেছে দস্যু, ডাকাত, লুণ্ঠনকারী হিসাবে আর এদেশের সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহভোগী বুদ্ধিজীবির দল আমাদের সাহিত্যে, গল্পে, রূপকথায়, ছড়ায় বৃটিশের প্রচারকেই স্থায়ী রূপ দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

বিশ্বনাথ জন্মেছিল নদীয়ার সেই অঞ্চলে যেখানে নীলকরদের অত্যাচার ছিল ভয়াবহ। চুর্ণীর কূলে কূলে হাঁসখালি, কৃষ্ণপুর, রাণীনগর, চন্দননগর, খানবেলিয়া প্রভৃতি গ্রাম ছিল নীলকরদের ঘাঁটিবিশেষ এবং এই ঘাঁটিগুলো ছিল তাদের অবাধ দুষ্কর্মের লীলাভূমি। অত্যাচারী নীলকর দস্যু ফোডীর বিরুদ্ধে বিশ্বনাথের সংগ্রাম কিংবদন্তী হয়ে আছে। নীলকর ও তার দেশীয় অত্যাচারী ঘুষ খোর কর্মচারী—যারা ছিল গ্রামের বদবাবু তাদের শাস্তি দিয়ে বিশ্বনাথ ব্যাপক সাধারণমানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। বাংলার এই অন্যতম বিদ্রোহী সন্তানকে ইংরেজ ফাঁসি দেয়। এখানে স্বল্পপরিসরে নীল বিদ্রোহের এই নায়কের যাবতীয় কার্য্যের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। অল্পকথায় বিশ্বনাথের জীবনীকার হারাধন দত্ত যেভাবে তার পরিচয় দিয়েছেন সেটা তার "ডাকাত" নাম ঘোচাতে যথেষ্ট।

"বিশ্বনাথ সর্দারকে বাংলাদেশে নীল আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও পথিকৃৎ বলে আমি অভিহিত করতে চাই। উনবিংশ শতকের প্রথম দশক। সেকালে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন একপ্রকার অবাস্তব ছিল। বিশ্বনাথ এককভাবে সেকালের এই দুর্দ্ধর্ষ অপ্রতিহত নীলকরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করে নীল আন্দোলনের প্রথম শহীদ হন। ডাকাত হিসাবেই আমরা বিশ্বনাথের গল্প শুনে এসেছি—

কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে তিনি নানাক্ষেত্রে বাংলাদেশের লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইংরেজ সরকারকে ব্যতিবস্ত করে তোলেন। বিশ্বনাথ বাংলার নীল আন্দোলনের প্রথম অগ্রপথিক—এ বিষয়ে মতান্তর হওয়ার অবকাশ নেই। এটাই বিশ্বনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—বিশ্বনাথ বিদ্রোহী।[৯]

ইংরেজরা বিশ্বনাথকে বাঁচিয়ে রাখেনি। তারা তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন তাঁকে এদেশের থয়ের খাঁ গল্পকারের দল বাংলার ডাকাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

বিশ্বনাথের পর নীলবিদ্রোহের নেতা হিসাবে যাদের নাম করতে হয় তারা হচ্ছে যশোহরের চৌগাদার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। সমস্ত বাংলাদেশ জুড়েই নীলচাষী সংগ্রাম করেছিল কিন্তু যশোহর ও খুলনাতেই নীলবিদ্রোহ ব্যাপ্তি ও বিস্তারে একটা গণ-অভ্যুত্থানের চেহারা নিয়েছিল। বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থেকে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।

তিতুমীর পরিচালিত ওয়াহাবী আন্দোলনও এক হিসাবে নীল-বিদ্রোহ।· ওয়াহাবী বিদ্রোহীরা নীলকরদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। তারা বহু নীলকুঠি ধ্বংস করে দিয়েছিল।

খুলনার দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারী নীলকর রেণীর বিরুদ্ধে জঠনদার শিবনাথের সংগ্রাম এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার হয়ে ছিল। শিবনাথ সর্বস্ব পণ করে রেণীর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী এখনও খুলনার লোকগাথায় ছড়িয়ে আছে।

এছাড়া ময়মনসিংহ জেলার বাগমারী ও জামালপুরের কৃষকরা নীলকরদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে এক উল্লেখযোগ্য সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন। এই সংগ্রাম দমন করবার জন্য বৃটিশের এক বিরাট পুলিশ বাহিনীকে দীর্ঘদিন ধরে হিমসিম খেতে হয়েছিল।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এতবড় একটা যুগান্তকারী বিদ্রোহ সেই সময়কার শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মধ্যে খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। এমনকি অনেকে সরাসরি এর বিরোধীতা করেছেন আর যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের সংখ্যাটা খুবই অল্প।

যারা নীলকরদের সমর্থনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি। জমিদারীর সংগে এঁদের কায়েমী স্বার্থ ছিল। নীলকরদের জমি পত্তনি দিয়ে তাঁরা মোটারকম আয় করছিলেন প্রকৃতপক্ষে কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েই। সুতরাং তাঁরা আগাগোড়া বৃটিশকে সমর্থন করে এসেছেন। বাংলার কৃষকের সর্বনাশ করবার জন্য তাঁরা বৃটিশদের প্রচণ্ডরকম মদৎ দিয়েছেন। এটাই তাঁদের বড় পরিচয়। তাঁরা বৃটিশ নীলকরদের সংগে অলিখিতভাবে লণ্ডনে পার্লামেণ্টে যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ দেখলেই পাঠক বুঝতে পারবেন এইসব ব্যক্তিরা কাদের সেবাদাস—"১৮৩৫ সালে জুলাই মাসে ক'লকাতার ব্যবসাদারেরা অর্থাৎ নীলকররা গভর্ণর-জেনারেলকে একটা স্মারকলিপি পাঠালেন, তাতে যে ২০০ জনের স্বাক্ষর ছিল তাদের মধ্যে দু-একজন ভারতীয়ও ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাদের মধ্যে অগ্রণী; তাঁরা বললেন যে তিনকোটি টাকা তাঁরা নীলব্যবসায়ে খাটাচ্ছেন, এটা হ'ল তাঁদের বাৎসরিক খরচ-খরচা বাদে। নীলচাষীরা ঠক, শঠ, আলসে, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি। সুতরাং এই ব্যবসায়ের নিরাপত্তা তাঁরা সরকারের নিকট দাবী করলেন।"[১০]

এঁরাই হলেন তৎকালীন বিদগ্ধ বাঙালী সমাজ কিন্তু এঁরাই সব নন। এঁদের ছাড়াও বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের আর একটা অংশ ছিলেন যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নীলচাষীদের সমর্থন জুগিয়েছেন। যাঁরা নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন।

এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'লেন হরিশচন্দ্র মুখার্জী। তিনি তাঁর "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" কাগজে দেশপ্রেমিকের ভূমিকা পালন করেছিলেন যথাযথভাবে। এই কাগজে নিয়মিতভাবে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হত। প্রকৃতপক্ষে এই কাগজে প্রকাশিত ঘটনাবিশেষই পরে 'নীল দর্পণে' স্থান পেয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' তখন শিক্ষিত বাঙালীর কাছে বিদ্রোহী বাংলার কণ্ঠস্বর পৌছে দিত। যশোরে কৃষকদের মধ্যে শিশির ঘোষ কাজ করেছিলেন। তিনি নিয়মিত নীলসংগ্রামের খবর 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' পাঠাতেন। প্রকৃতপক্ষে এঁদের ভূমিকাই, জনগণের এতবড় একটা উদ্যোগে, সামগ্রিকভাবে তৎকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের একটা মস্তবড় কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

বাংলার কৃষকের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম দেশের সমাজব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি ঠিকই, পারেনি বৃটিশকে উৎখাত করতে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এই প্রথম বড়রকমের ঘা খেয়েছিল। কৃষকের সংঘশক্তি দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এবং কিছু কিছু সংস্কারমূলক কার্য্যকলাপ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই গৌরবময় সংগ্রাম বাংলা তথা ভারতের ব্যাপক জনগণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং পরে কৃষকসংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছে। সেই সময়কার একটি সাময়িক পত্রিকা কৃষকজনতার অবস্থা বর্ণনা করে যা লিখেছিল তাতে অতিবড় হতাশা-বাদীরাও, এই গ্রাম্য, সরল, নিরক্ষর, অত্যাচার সইতে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের উপর আস্থা রাখতে পারেন এই কথা জেনে যে—কোন বিরাট আকারের পরিবর্তন এদের দ্বারাই সম্ভব। ১৮৬০ সালে Calcutta Review লিখছে—"বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আকস্মিক ও অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন এসে গিয়েছে। এক মুহূর্তে তারা নিজেদের

স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। যে রায়তদের আমরা ক্রীতদাসের মতো অথবা রুশদেশের ভূমিদাসের মতো চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলাম, জমিদার ও নীলকরদের নির্বিরোধ যন্ত্ররূপে যাদের আমরা জানতাম, অবশেষে তারা জেগে উঠেছে ; কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে, তাদের আর শিকল পরিয়ে রাখা চলবেনা। বর্তমানে গ্রামের লোকেরা যে রকমের আশ্চর্য অনুভূতির দ্বারা নীলচাষকে গণ্য করছে ও যার ফলে তারা অনেক স্থানে ফেটে পড়ছে তা' সবথেকে দূরদর্শী ব্যক্তিরাও কল্পনা করতে পারেন নি। **১৮৫৭ সালের ঠিক পরেই এইসব ঘটনা বাংলার ভবিষ্যতের উপর যে খুব প্রভাব বিস্তার করবে তাতে সন্দেহ নেই।**"[১১]


**গ্রন্থপঞ্জী**

১। প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ।
২। ঐ
৩ সুপ্রকাশ রায় : "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" থেকে উদ্ধৃত।
ঐ
৫ ঐ
৬ ঐ
৭ ঐ
৮ সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস
৯ হারাধন দত্ত : বিদ্রোহী বিশ্বনাথ ( ভারতের কৃষক বিদ্রোহ থেকে উদ্ধৃত )
১০ প্রমোদ সেনগুপ্ত : নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ
১১ Calcutta Review ,1860 : ( 'নীল বিদ্রোহ' থেকে উদ্ধৃত )




# ইপার সি মুভে

স্বপন ব্যানার্জী

তখন সূর্যটা পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে। চার্চের বিরাট হলঘরটাতে কয়েকশত লোক মাথা নত করে ঈশ্বরের পায়ে প্রণতি জানাচ্ছে। বেদীর সামনে ঝুলছে একটা বাতি। সামান্য ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠছে ওটার শেকল থেকে।

ক্যাঁচ! ক্যাঁচ! এই শব্দটা আকর্ষণ করল প্রার্থনারত এক সতেরো বছরের যুবকের মন। যুবকটির প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটানোর পক্ষে শব্দটার ক্ষমতা অসীম! নাড়ী টিপে ধরল যুবকটি। আর গুনতে শুরু করল—এক, দুই, তিন, চার—ক্যাঁচ। পাঁচ, ছয়, সাত, আট—ক্যাঁচ। আশ্চর্য তো—প্রতিটি আওয়াজের মধ্যে সময়ের ব্যবধানের কি সামঞ্জস্য। দুলতে দুলতে বিস্তার কমে আসছে অথচ সময়ের ব্যবধান একই রয়েছে। প্রার্থনা উঠল মাথায়, ছুটে এলো বাড়ীতে ; বোধহয় বিশ্বরহস্যের একটা জটিল তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছে।

এই ঘটনা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সেদিন পদার্থবিদ্যার এক বিখ্যাত সূত্র "ল অফ আইসোক্রোনিজম"-এর আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও গ্যালিলি, ভিনসেনজিও গ্যালিলির প্রথম সন্তান। ইনি ১৫৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন ইটালির পিসা শহরে। যে যুগসন্ধিক্ষণে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় মধ্যযুগের পাশ্চাত্য জগৎটা সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে জাগছে। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী নাবিকরা খুঁজে বেড়াচ্ছে নতুন দেশ, সোনাদানা আর ক্রীতদাসের সন্ধানে। ফলে সমুদ্রযাত্রার প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছিল। সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রে দিকনির্ণয় ব্যাপারটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারাদের স্থান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দিকনির্ণয় করা হোত। কাজেই জ্যোতির্বিদদের খুবই সম্মান করা হোত। নতুন উপনিবেশ আবিষ্কারের সাথে সাথে সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে পুঁজীবাদ বিকশিত হচ্ছিল। চার্চও এই পরিবর্তনের আবহাওয়া থেকে মুক্তি পায়নি। ক্যাথলিক মতবাদ পাল্টাতে লাগল আর ধর্মীয় যুদ্ধে কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেদিনের ইউরোপ।

নিত্য নতুন চিন্তাধারার ভিত্তিতে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠছিল তার সাথে পুরাতন চিন্তাধারার তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। সনাতনধর্মীদের সাথে নব্যচিন্তাধারার পৃষ্টপোষকদের সংঘাত যদিও বেড়ে উঠেছিল, তথাপি সেদিনের নতুন মতবাদগুলি চার্চের সঙ্গে মোটামুটি একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গড়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিল। এর কারণও ছিল। শতাব্দী ধরে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলে আসছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সনাতনধর্মীদের ধারণার মধ্যে এক অন্ধবিশ্বাস গড়ে তোলা। ফলে সে যুগের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও এই ধারনা বদ্ধমূল ছিল যে শাস্ত্রে যা লেখা আছে তা অভ্রান্ত। এর বাইরে কোন ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় সেদিন একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল অ্যারিষ্টটলের ধারনা সমূহের। সবচেয়ে বড় কথা ছিল "ম্যাজিস্টার

ডিকটুটা" অর্থাৎ মাষ্টার বলেছেন। মাষ্টার যা বলেছেন তাই ঠিক—এর বিরুদ্ধে কথা বলা 'মহান' চার্চের বিরুদ্ধে কথা বলা, সমগ্র মানব জাতির তীব্র 'ক্ষতি' সাধন করা এবং এর শাস্তি হোল অমানুষিক নির্যাতন—মৃত্যু।

অ্যারিস্টলের যে বিষয়গুলি থেকে স্বাবলম্বী চিন্তাধারার উদ্ভব হতে পারত সেগুলোকে চার্চের কর্তারা সযত্নে বাদ দিয়েছিলেন। কারণ বিজ্ঞানের কাজ হোল মানুষের অজ্ঞতার ক্ষেত্রকে আলোকিত করা। তাই সে যুগের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারীতাকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রুখতে হবেই। লক্ষ লক্ষ মানুষকে লুণ্ঠন করে যে সম্পদ জমা হচ্ছিল তার অপব্যয় করে রাজা ও গীর্জার পাদ্রীরা যে অভাবনীয় ভোগবিলাস ও ব্যাভিচারের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত, জনতার চোখে তা ক্রমশ ধরা পড়ে যাচ্ছিল। তাই এই সামন্তরা সেদিন, অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, অসহায় মানুষগুলোকে কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে ফেলার নিদারুণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতি, কুসংস্কারকে মানুষের মন থেকে হটিয়ে দিতে পারে এই ভয়ে রাজা ও পাদ্রীরা জোটবদ্ধ হয়ে গুণ্ডামী শুরু করে ছিল, যুগান্তকারী চিন্তার জনকদের উপর। বাইবেলের লাইন তুলে তারা তাদের ধারনাকে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করত, এবং সমস্ত রকম গুণ্ডামীর পেছনে যুক্তি খাড়া করার প্রচেষ্টা চালাতো। গ্যালিলিওর জন্ম এমনই একটা তমসাচ্ছন্ন যুগে।

অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথমে তিনি ডাক্তারী নিয়ে পড়া শুরু করেন। কিন্তু অতিশীঘ্রই তাঁর দার্শনিক মন আকৃষ্ট হয় প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণায়। তিনি বলতেন, "আমার উদ্দেশ্য হোল, একটা পুরোদস্তুর নতুন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা যা কিনা প্রকৃতির সব থেকে পুরোন ঘটনা 'গতি' নিয়ে আলোচনা করবে—"যার সম্বন্ধে দার্শনিকরা এ পর্যন্ত কম বই লেখেন নি। তবুও আমি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, প্রমাণ করেছি যে সেগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মানে যা কিনা এতদিন কেউই করেন নি। আমি বিশ্বাস করি এটা এমনই এক বিজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করবে যার কিছুটা মাত্র আমি যেতে পারছি, বাকি পথ যাবেন ভবিষ্যতে আমার থেকে অনেক উন্নততর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারীরা।" বিজ্ঞানের পরিপন্থী কোন রকম চিন্তাধারা গ্যালিলিওর ছিল না। তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেতো ঘটনার পর্যবেক্ষণ। "অ্যারিস্টটল বলেছেন তো কি হয়েছে, তিনি ভুল বলেছেন"—একথা বলতে এতটুকু পিছপা হন নি গ্যালিলিও। প্রথমে তিনি শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন পিসাতে, কিন্তু "ছেলেদের ভুল শিক্ষা দিয়ে, ভুল পথে পরিচালনা করে ও ছাত্রদের পরকাল ঝরঝরে করে দেবে" এই মিথ্যা অভিযোগে চাকুরী থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হোল সাতাশ বৎসর বয়সে। অবশ্য পরের বৎসরই তিনি পাডুয়ার অঙ্কের প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। প্রথম দিনেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতায় ছাত্ররা মুগ্ধ হয়েছিল। সকলে এক বাক্যে তাঁর পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করলেন। গ্যালিলিও যে সব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলির প্রত্যেকটির সম্বন্ধে এতো অল্প পরিসরের ভেতর বলা সম্ভব নয়। আমরা শুধু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী তত্ত্বের কথা আলোচনা করছি।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন ঘটনা থেকে জানতে পারি যে একটা ঘোড়া যত জোরে গাড়ী টানে, দুটি ঘোড়া তার থেকে বেশী জোরে টানবে। ঘোড়া থেমে গেলে গাড়ীও যাবে থেমে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যারিষ্টটল সিদ্ধান্তে আসেন যে, যদি কোন বস্তুকে সমগতিতে চলতে হয় তবে বস্তুর উপর একটা বল সমান ভাবে প্রয়োগ করে যেতে হবে। আর এই ধারণা বিজ্ঞানী মহলে জেঁকে বসেছিল, এক-দুই দশক নয়, একেবারে দুহাজার বছর ধরে। গ্যালিলিও বললেন ঠিক এর উল্টো কথা: যদি কোন বস্তুকে সমগতিতে চলতে হয় তবে তার উপর কোন রকম বল প্রয়োগ করা চলবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এই চিন্তাধারা সমগ্র বলবিদ্যাকে গ্রানাইট স্তরের ভিত্তির উপর স্থাপন করে পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীদের এর উপর সৌধ নির্মানে সাহায্য করে। এই সিদ্ধান্তের বৈপ্লবিক গুরুত্ব যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাঁর এই ধারণা পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানীকের ধারণার কোন রকম বিস্তৃতি নয়, এর অর্থ সমগ্র অ্যারিষ্টটলের বলবিদ্যাকে নাকচ করা,—বিজ্ঞানে এ ধরনের অবস্থা খুবই কম ঘটে থাকে। সাধারণতঃ বিজ্ঞানীদের পূর্বসুরীদের থেকে কিছু নেবার থাকে, কিন্তু পথিকৃৎদের পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। তাঁদের একেবারে প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। অ্যারিষ্টটলের সূত্রকে নাকচ করার জন্য গ্যালিলিও সবথেকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন, ঘটনার পর্যবেক্ষণের উপর। কতকগুলি ঘটনা পর্যবেক্ষনের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সূত্র গড়ে তোলা পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক কাজ। বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের অনেক বিজ্ঞানীর কথা বলে, যাঁরা তাঁদের পরীক্ষালব্ধ ফলের ঠিকমত বিশ্লেষণ না করতে পারায় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। ঘটনার তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করার সময় বৈজ্ঞানিকের কাছে পরিষ্কারভাবে তা আসে না, নানারকম অপ্রধান দিকও জড়িয়ে থাকে ফলে সঠিক তত্ত্ব গড়ে তোলা অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়ে। গ্যালিলিও পদার্থ বিদ্যার জনক। পরবর্তী যুগে নিউটন তাঁর বলবিদ্যাকে এই ভিত্তির উপর খাড়া করেছিলেন। গ্যালিলিওর "বল" সম্বন্ধে কোন রকম ধারণা ছিল না। তিনি এটিও জানতেন না, একটা বস্তু কেন পৃথিবীর উপর এসে পড়ে। পতনশীল বস্তুর সূত্র আবিষ্কারের জন্য গ্যালিলিও গবেষণা শুরু করেন নততলে বস্তুর গতি অধ্যয়নের মাধ্যমে। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সময়ের সঙ্গে ত্বরণের কোন পরিবর্তন হয় না

আর নতি যত বেশী বাড়ে, ততই ত্বরণ বেড়ে চলে। এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গ্যালিলিওর সূক্ষ্ম অনুমানবোধ (intutive faculty) তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে যদি কোন বস্তুকে মসৃণ সমতলে ছেড়ে দেওয়া হয়, আর বাহ্যিক কোন বল তার উপর ক্রিয়া না করে তবে সেই বস্তু অনন্তকাল ধরে সমগতিতে চলবে। আমাদের কাছে, অর্থাৎ যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাঁদের কাছে এটি বিশেষভাবে "একটা বিরাট কিছু তথ্য" বলে মনে হয় না, তার কারণ স্কুলেই বিজ্ঞানের ছাত্ররা নিউটনের প্রথম সূত্রের সাথে পরিচিত হন।

পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে অ্যারিষ্টটলের ধারণা ছিল, ভারী বস্তু হাল্কা বস্তু অপেক্ষা তাড়াতাড়ি পড়বে। গ্যালিলিও লক্ষ্য করলেন, একটি বস্তু যখন পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে তখন তার ভর যাই হোক না কেন, গতিবেগ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে একটি হারে বৃদ্ধি পায়। আর সেইজন্য ভারী হোক, হাল্কা হোক, সব বস্তুই একই সঙ্গে মাটিতে পৌঁছবে। শুধু বলা নয় শত শত দর্শকের সামনে, চার্চের বড় কর্তাদের সামনে ব্যাপারটা হাতেনাতে প্রমাণ করলেন।

ফ্লোরেন্সে থাকাকালীন গ্যালিলিও, "সিডিরিউস নানসিয়াস" অর্থাৎ "তারাদের অগ্রদূত" নামে একটি বই রচনা করেন। কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করে বইটি লেখা হয়েছিল। চার্চের বড় কর্তাদের হাতে গিয়ে বইটি পড়ল। তাঁরা বইটি পড়ে প্রমাদ গুণলেন। ভীত হওয়া আশ্চর্য ছিল না; কারণ কোর্পানিকাসের মত সমর্থন করে যিনি বই লিখছেন, তিনি তো রাম, শ্যাম নয়, ইউরোপের পণ্ডিত মহলের সুপরিচিত প্রতিভাধর গ্যালিলিও। বইটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পিছনে কারণও ছিল, ক্রনো, কোপার্নিকাস ল্যাটিন ভাষায় বই লিখেছিলেন, গ্যালিলিও সর্বজনবোধ্য করার জন্য বইটি লিখলেন ইতালীয় ভাষায়। কোপার্নিকাসের মতবাদকে গলা টিপে মারার জন্য চার্চ নিষেধাজ্ঞা জারী করল, "যে এই বই কাছে রাখবে বা এই বই সম্বন্ধে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রচেষ্টা চালাবে তার শাস্তি মৃত্যু।" পোপের আদেশে গ্যালিলিওর "সিডিরিউস নানসিয়াস" সহ আরও দুটি বই নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এদিকে ফ্লোরেন্সে থাকাকালীন তিনি যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, সেগুলি নিয়ে ইউরোপের পণ্ডিত মহলে হৈ চৈ পড়ে গেছিল। ক্রনোর ভয়ানক পরিণতির কথা চিন্তা করে গ্যালিলিও, 'এ ব্যাপারে কিছু লেখাটা এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে না', ভেবে অন্য গবেষণায় হাত দিলেন। ১৬০৭ খৃঃ আবিষ্কার করলেন দূরবীন। ১৬০৯ খৃঃ বিজ্ঞানী বৃহস্পতির চাঁদ দেখালেন। সেদিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজবংশের বদান্যতা পাবার জন্য তিনি বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির নাম দিলেন "মেদীচির তারা"। সমালোচনা শুরু হোল গোঁড়া পণ্ডিতদের মহল থেকে। গ্যালিলিও তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "বিশ্বাস না হয় চোখে দেখেই যান না, ব্যাপারটা কি।" সেদিন কি উত্তর এসেছিল তাদের তরফ থেকে, আজ শুনলে শুধু হাসিই পাবে না, তাদের হাস্যকর বোকামি আমাদের অবাক করবে। তারা বললেন, "বৃহস্পতির চাঁদ থাকতে পারে না। আমাদের শাস্ত্র এই কথাই বলে। যা নেই, তা যদি কোন যন্ত্রের ভেতর দিয়ে দেখা যায় তবে বুঝতে হবে সেটা যন্ত্রেরই কারসাজি।" এসব কথার মূলে সেই এক কথা—"পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র বিন্দু; পৃথিবী স্থির।"

গ্যালিলিও জানতেন, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে চিঠিতেও সে কথা লিখেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক যেটি টলেমির বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ধারণাকে একেবারে নাকচ করে দেয় সেটির নাম, "ডায়লগ্ অন দি গ্রেট ওয়ার্ল্ড সিষ্টেম।" এই বইটিতে দুই বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক মত স্থির করা হয়েছে। দুই বন্ধু স্যালভিয়াটাসও সিম্প্লিসিয়াস আলোচনা করছে। তাদের কথার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্য বেরিয়ে আসছে। বইটিতে সোজাসুজি কোপার্নিকাসের মতবাদকে সমর্থন করে কিছুই তিনি লেখেন নি। চার্চের বিরুদ্ধে বা বাইবেলের বিরুদ্ধেও বিশেষ কিছু বলা হয়নি। স্যালভিয়াটাস পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিরুদ্ধে যুক্তি রাখছে, সিম্প্লিসিয়াস আনন্দের সঙ্গে সেগুলি শুনছে। অবশেষে স্যালভিয়াটাস বোঝাতে সক্ষম হল যে সে অ্যারিষ্টটলের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, অ্যারিষ্টটলপন্থীদের থেকে ভালো বোঝে এবং এই অবস্থায় কোপার্নিকাসের মতের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করল।

এ দিকে চার্চ রেগে আগুন। লোকটাকে বলা হয়েছে এ সম্বন্ধে কিছু না লিখতে, তবুও আবার লিখছে? ইনকুইজিসনের রিপোর্ট গেল সঙ্গে সঙ্গেই। এখন যিনি চার্চের বড়কর্তা তিনি একেবারে কশাই। "অধার্মিকের" শাস্তি দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। ফ্লোরেন্সে যখন খবর গেল তখন গ্যালিলিও দারুণ অসুস্থ, ডাক্তার বললেন এখন যাওয়া চলবে না। ইনকুইজিসনের নির্মম আদেশ এলো স্বেচ্ছায় যদি গ্যালিলিও না আসতে চান তবে তাঁকে বেঁধে নিয়ে আসা হবে। অবশেষে বাধ্য হয়ে রোগক্লিষ্ট বৃদ্ধ বিজ্ঞানী যাত্রা করলেন। জানুয়ারীর হাড় কাঁপানো শীতে যখন তিনি ফ্লোরেন্সে পৌঁছলেন তখন তিনি অর্ধমৃত।

ছয় মাস ধরে তাঁর বিচার চলল। এক এক করে সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে চললেন গ্যালিলিও। তিনি জানতেন ভুল তিনি বলছেন না। ভুল মত চাপাচ্ছে কদর্য, নৃশংস রাষ্ট্রযন্ত্র, গায়ের জোরে। সেদিনের বৈপ্লবিক চিন্তাকারীদের কি উৎপীড়ন সহ্য করতে হোত তা নিয়ে বর্ণিত একটা বিচারশালার চিত্র থেকেই পাঠকের কাছে পরিষ্কার হবে।

গোল টেবিলের চারিধারে বিচারপতিরা বসে আছেন। পোপ সভাপতি। কাছেই রয়েছে একটা ক্যানেল। "আসামী" যদি দোষ

স্বীকার না করে তবে পেটে প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। আর রয়েছে লোহার বুট। দরকার পড়লে পায়ের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। লোহার সাঁড়াশী আছে দেহের মাংস ছিঁড়ে নেওয়ার জন্য, আরও কত কি বিভিন্ন রকমের সরঞ্জাম রয়েছে পৃথিবীর সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর শাস্তি বিধানের জন্য।

এ সব হুমকী সেদিন আর সহ্য করতে পারেন নি বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। যে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন, সেই সত্যকে শাসকগোষ্ঠীর পদতলে সঁপে দেবার আগে স্বগতোক্তি করেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী **'ইপার সি মুভে'**— Still it moves, আমি সত্য বলে যা জেনেছি, তোমরা তা কেড়ে নেবে কি করে?

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। ১৮৩৫ সালের আগেও ঘুরত; আইন করে কি তার ঘোরা বন্ধ করা যায়, নাকি এই মতবাদে বিশ্বাসী লোকেদের প্রাণদণ্ড দিলেই এ চিরসত্যটি নির্বাপিত হয়ে যাবে!

কোন রকম বই লেখা ইনকুইজিসন কর্তৃক একেবারে নিষিদ্ধ। তবুও লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি লিখলেন "লজ্ অফ্ মোশন্"। বইটি গোপনে হলাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ছাপানোর জন্য। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে বিচারের পর গ্যালিলিও আর মাত্র কয়েক বৎসর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সেদিন মৃত্যুই বোধহয় ভালো ছিল। এই সময় গ্যালিলিওর এক মেয়ে তাঁর দেখা শোনা করতেন, এহেন দুর্দিনে সে মেয়েও মারা যান। মৃত্যুর কিছু পূর্বে গ্যালিলিও পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যান।

৮ই জানুয়ারী ১৬৪২ খৃঃ। অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় কে যেন তাঁর হাতে দিল, "লজ্ অফ্ মোশন" বইটি। মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধের পাণ্ডুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। আনন্দের আতিশয্যে অন্ধ চোখ দুটির কোণ বেয়ে জল পড়তে লাগল। দুটো কথা বেরুল, "আমার সব বই-এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বই এটি। চরম যন্ত্রণার ফল," ধরণীর বুকে এই তাঁর শেষ কথা। ক্রমে তাঁর জীবনদীপ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে চিরতরে নির্বাপিত হয়ে গেল। অত্যাচার নির্যাতন করেও সেদিন সত্যের পথ রোধ করতে পারে মূর্খ ধর্মযাজকের দল। সত্যের পূজারীকে খুন করে বিজ্ঞানের রোধ করা যায় না। ব্রুনো, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস তার প্রমাণ।

আজ সেই সামন্ততন্ত্রের যুগ অতীত। মূর্খ ধর্মযাজক ও পাদ্রীরা আজ কবরে। আজকের বিজ্ঞানীদের গ্যালিলিওর মত সরাসরি উৎপীড়ন করা হয় না। কারণ আজকের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের খাতিরেই বিজ্ঞানকে কিছু স্বাধীনতা দিতে হয়। তবুও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিকরা ততক্ষণ শান্তি পাবেন না যতক্ষণ তাঁরা শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশ মত কাজ করছেন। অন্যথায় তাঁদের ওপরেও নেমে আসে অত্যাচারের খড়্গ। আর আমাদের ভারতবর্ষের মত দেশ যেখানে এখনো পিছিয়ে পড়া সমাজব্যবস্থা বর্তমান, সেখানে বৈজ্ঞানিকদের কোন রকম পরিতৃপ্তিই থাকে না। হয় তাঁদের বিজ্ঞান বিলাসীতার জন্য কাজ করতে হয় নতুবা বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে চরম মনস্তাপের জ্বালায় জর্জরিত হতে হয়। বিজ্ঞানীদের মধ্যে উচ্চপদের মোহ নিয়ে যে চরম নোংরামি চলে তা দেখে মনে হয় যে বিজ্ঞান গবেষণা নয়—সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এরা বিজ্ঞান বিলাসিতার গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছেন। ফলে এই হয় যে, সৎ গবেষকরা তাঁদের সব সমস্যার সমাধান হিসাবে বেছে নেন আত্মহত্যার পথ, ডঃ জোসেফ, ডঃ বিনোদ শাহুর* আত্মহত্যাই এটা প্রমাণ করে। ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগারে কত বিনোদ শাহুরা রয়েছেন, ভোগ করছেন আশাভঙ্গ ও মনস্তাপের চরম জ্বালা, তা কে জানে?

* 'বীক্ষণে'র ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "এই আত্মবলিদানের কি কোন প্রয়োজন ছিল?" লেখাটি দ্রষ্টব্য।

---

**১৫ই আগষ্ট স্মরণে**

**কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের গড় মাসিক বেতন ২০৭ টাকা**

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মিত কর্মচারীদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মোট বেতন (মূল বেতন ও মহার্ঘ্যভাতা মিলে) পান প্রতিমাসে ১৫০ টাকারও কম। প্রায় এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশী কর্মচারী ১৫০—২৯৯ থেকে ৩০০—৪৯৯ টাকা পান। একশজনের মধ্যে মাত্র তিনজন পান ৫০০ টাকা বা তার বেশী।

—অমৃতবাজার পত্রিকা
৪।৭।৭৩

# বিক্ষুব্ধ শিক্ষাজগৎ

## ছাত্র

**দেশঃ**

খাদ্যসমস্যা 'মোকাবিলা' করার প্রয়োজনে, কেরালা সরকার গত বারোই জুলাই থেকে সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ছাত্রদের বিরুদ্ধে সরকারের 'অভিযোগ'—গত দু'দিন ধরে তাঁরা ক্লাশ বয়কট করেছেন এবং লরি থেকে খাদ্যশস্য দখল করে, সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেরাই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন। দশদিন পর অর্থাৎ তেইশে জুলাই স্কুল-কলেজ খুললে, ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করেন। দামের উর্ধ্বগতি রোধ ও খাদ্যশস্য সরবরাহের দাবীতে ত্রিবান্দম ও কুইলন শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

●নয়াদিল্লীর জহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উপাধ্যক্ষকে প্রায় সাতঘণ্টা আটক করে রাখেন। এই 'ঘেরাও' তেরোই জুলাই দুপুর দুটো থেকে শুরু হয়। ছাত্ররা তাঁদের দাবী না মেটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ও বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারে আলাদা আলাদা ইন্টারভিউ-র দিন ধার্য করেছে। এটা থেকে পরিষ্কার যে দিল্লীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু আসন নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের এই পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন।

●'শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়' আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের সভাপতি শ্রী মহম্মদ আরিফ সহ চুয়াল্লিশ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নয়ই জুন, নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বিল সংশোধনের দাবীতে তাঁরা আন্দোলন করছেন।

●গৌহাটিতে একচল্লিশটিরও বেশী ছাত্র, যুবক ও মহিলা সংগঠ-নের ডাকে 'দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ দিবস' পালন করা হয়। গত পয়লা জুন মিছিল ও সভার মাধ্যমে তাঁরা প্রতিবাদ জানান। জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

●গুজরাটের ভবনগর জেলার বিশ হাজারেরও বেশী স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট পালন করেন। তাঁরা মিছিলে সামিল হন, ধ্বনি তোলেন—প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজটি তাঁদের জেলায় স্থাপন করতে হবে। এই একই দাবীর ভিত্তিতে রাজকোট জেলার ছাত্রছাত্রীরাও হরতাল পালন করেন।

●গত তেইশে মে থেকে সিমডেগা ও চাইবাসা টাটা কলেজের এগারো জন ছাত্র অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন। সতেরোই এপ্রিল সিমডেগা কলেজের একজন ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয়। উক্ত ঘটনার জন্য দায়ী সমস্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে বরখাস্ত করার দাবীতে তাঁরা অনশন করছেন। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ—কয়েকজন পুলিশ অফিসার তাঁদের পারিবারিক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। একত্রিশে মে রাঁচির এস. ডি. ও-আদালত প্রাঙ্গনে আন্দোলনের নবম দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছোটনাগপুর ছাত্রসংঘ।

●গরমের ছুটির সময়ে বাগনান হাইস্কুল প্রাঙ্গনে প্রাপ্তবয়স্কদের নাটক 'বারবধূ' অভিনয় করা হয়। ৪ঠা জুলাইয়ের খবরে জানা যায় যে এই অশ্লীল নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেওয়ার প্রতিবাদে, ছাত্ররা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেন। স্কুল খোলার প্রথম দিনেই এই হরতাল পালন করা হয়।

●গত চোদ্দই জুন কুন্দালিয়া আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেন। তাঁরা দাবী করেছিলেন হিন্দিতে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান পড়ানো হোক। পরে সিন্ডিকেটের এক সভায় এই দাবী মেনে নেওয়া হয়।

●গত পঁচিশে জুন নয়াদিল্লীর মর্ডান স্কুলের একদল ছাত্র কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনুরুল হাসানের কাছে গত মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনরায় পরীক্ষা করার দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। তাঁরা জানান যে পর্ষদের স্ববিরোধী বক্তব্য তাঁদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। পর্ষদ প্রথমে এই 'দুর্ঘটনা'র জন্য কমপিউটারকে দায়ী করেন, পরে আবার শিক্ষকদের ঘাড়ে দোষ চাপান হয়। কিন্তু খুব স্বাভাবিক ভাবেই কমপিউটারের গোলযোগ বা শিক্ষকদের গাফিলতির জন্য ছাত্ররা দায়ী হতে পারেন না। স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়েছে যে সম্পূর্ণ ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কলেজে ছাত্র ভর্তি স্থগিত রাখতে হবে।

●গত বারোই জুন বর্দ্ধমান বি. টি. কলেজের ছাত্ররা কলেজ স্থানান্তরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। দশবছরের পুরোনো এই কলেজটি, বর্ধমান শহরের একটি ভাঙ্গা বাড়ীতে অবস্থিত। শহরের মধ্যে উপযুক্ত বাড়ী না পাওয়ার 'অজুহাতে' কর্তৃপক্ষ কলেজটিকে হুগলিতে সরিয়ে ফেলবেন বলে স্থির করেছেন।

★গত নয়ই জুলাই মফস্বলের কয়েকশত ক্ষিপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, পর্ষদের অফিসটি ছ'ঘণ্টার জন্য দখল করে নেন। সময়মত পরীক্ষার ফলপ্রকাশে পর্ষদের ব্যর্থতাই—এই বিক্ষোভের কারণ। বিভিন্ন শাখায় প্রথম দশজন স্থানাধিকারীর নাম প্রকাশিত হবার পাঁচদিন পরেও মফস্বলের পরীক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশের ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখান।

★কৃষ্ণনগর কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক তাঁদের কলেজে অধ্যাপকের অভাব সম্বন্ধে, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন বর্তমানে পাঁচটি অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। গরমের ছুটির পর এই অধ্যাপক-ঘাটতি পূরণ করা না হলে, দাবীর স্বপক্ষে তাঁরা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

**বিদেশ :**

ব্যাঙ্ককের পুলিশ হোসে করে জল ছুঁড়ে আট হাজার মানুষের এক শক্তিশালী জমায়েত ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। গত ছাব্বিশে জুনের রাতে, চালের দাম কমানো ও গণতান্ত্রিক শাসন চালু করার দাবীতে এই বিশাল জনতা সরকারী অফিসগুলো ঘিরে ফেলেন। এর আগে সংবিধান মনুমেন্টের তলায় আয়োজিত এক জনসভায় ছাত্রনেতারা ভাষণ দেন। তাঁদের অগ্নিগর্ভ ভাষণে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন, অস্থির পদক্ষেপে সরকারী ভবনের দিকে এগিয়ে যান। বক্তারা দাবী করেন রাজধানীর অনতিদূরে অবস্থিত রামখামানেগ বিশ্ববিদ্যালয়ের আটজন বহিষ্কৃত ছাত্রের বিরুদ্ধে কোনোরকম অনুসন্ধান চালানো অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না। এইসব ছাত্রদের পুনরায় ভর্তি করা হলেও, ক্লাশে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

★গত তেরোই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নির্দেশে পুলিশ ও রক্ষী বাহিনী কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের পশ্চিম কেপ বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে নিয়ে, দেড়হাজার ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হটিয়ে দিয়েছে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে 'অভিযোগ'—তাঁরা বর্ণ-বিদ্বেষ বিরোধীদের উপর সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।

**শিক্ষক**

গত ছয়ই জুন দিসপুরে আসাম বিধানসভার বাইরে ধর্মঘটী স্কুল-শিক্ষকদের উপর পুলিশের লাঠিচালনার ফলে চুয়াল্লিশ জন শিক্ষক আহত হন। এর মধ্যে চারজনের আঘাত গুরুতর। ঐদিনই সারারাজ্যের বিশ হাজারেরও বেশী স্কুলশিক্ষক জীবনযাত্রার উন্নতমান ও বেতনবৃদ্ধির দাবীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আরম্ভ করেন। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী লাঠিচালনার কথা অস্বীকার করলে, বিরোধী সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। পরে ফিরে এসে, একটি রক্তমাখা ধুতি মুখ্যমন্ত্রীকে 'উপহার' দেন। বিং সভার দু'জন সদস্য ঐ রক্ত মাখানো কাপড়টি দেখিয়ে প্রশ্ন করে এটা কি শিক্ষকদের রক্তে লাল না মুখ্যমন্ত্রীর দোয়াত থেকে ক দিয়ে ভেজানো হয়েছে? এরপর মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন— পু 'মৃদু' লাঠিচালনা করেছে। পরের দিন গৌহাটির সমস্ত স্কু ছাত্রছাত্রীরা ক্লাশ বর্জন করেন। গৌহাটি স্কুল ছাত্র ইউনিয়ন নিখিল আসাম ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে প্রতিবাদ দিবস পা করা হয়। নয়ই জুন লখিমপুরে বারোজন ছাত্রীসহ সাতাশ জন গ্রেপ্ত বরণ করেন। শহরের সমস্ত ছাত্রছাত্রী ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে এ ধর্মঘটী শিক্ষকদের সমর্থনে মিছিল বের করেন। দশই জুন চারদি ব্যাপী আন্দোলনের অবসান হয়। সরকার শিক্ষকদের কতকগু দাবী মেনে নিতে সম্মত হলে, শিক্ষকরা এই সিদ্ধান্ত নেন।

★মেদিনীপুর জেলার ট্রেনিংপ্রাপ্ত বেকার শিক্ষকরা গত ছ জুলাই জেলা স্কুল পর্ষদের অফিসের সামনে চব্বিশঘণ্টা ব্যাপী অবস্থ ধর্মঘট পালন করেন। চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, ছাত্র-শিক্ষ সংখ্যা ২৫:১ অনুপাতে বজায় রাখা ও ট্রেনিং-র সময় একশো টাক স্টাইপেণ্ড দেওয়ার দাবীতে এক বিরাট সংখ্যক শিক্ষক এই আন্দো লনে অংশ গ্রহণ করেন।

★শারীরবিদ্যায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত ৩৩৭ জন পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক গ আটই জুলাই, রাজ্যসরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র পে করেছেন। এই পত্রে, তাঁদেরকে রাজ্যকর্মী হিসেবে গণ্য করার দাবী জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত শারীরবিদ্যার শিক্ষকদের উদাহরণ দেখিয়েছেন, এর আগেও রাজ্য সরকারের কাছে বারবার অনুরোধ জানিয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি।

**কর্মচারী**

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের কর্মচারীবৃন্দ ৪ঠা জুলাই থেকে তি দিনের গণঅবস্থান শুরু করেছেন। ১৯৭০ সালের মার্চমাসে বিশ্ব বিদ্যালয় কর্মনির্বাহক সমিতি নির্ধারিত বেতনক্রম চালু করার দাবীতে তাঁরা আন্দোলন করছেন এর পরবর্তী পর্যায়ে, নয়ই জুলাই প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হবে বলে স্থির হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কর্মীরা তাঁদের আন্দো লন চালিয়ে যাচ্ছেন। বাহাত্তর সালের জুনমাস থেকে প্রতিমাসে পনেরো টাকা অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা চালু করার দাবীতে কর্তৃপক্ষ-কর্মচারী লড়াই চলেছে।

★কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন যে কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবী-দাওয়া মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোন অতিরিক্ত কাজ করবেন না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকা শিত সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগের কর্মচারীদের 'অসহযোগিতা'কে

দায়ী করেছেন। এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে গত ষোলই জুন, তিনি এই বিবৃতি দেন।

**বাংলাদেশ:**

বাংলাদেশের অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, চিকিৎসকদের আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। গত তেসরা জুলাই ১২০০০ এরও বেশী চিকিৎসক, একজন চিকিৎসককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একঘন্টার প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। একই কারণে, বাঙলাদেশ মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করছেন। তাঁরা এই গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশ ও কয়েকজন ধনীব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

অন্যদিকে ২০০,০০০ জন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক ৫০,০০০ ধর্মঘটী বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের সমর্থনে দু'ঘণ্টার প্রতীক ধর্মঘট পালন করবেন বলে স্থির করেছেন। গত বারোই মে থেকে সমস্ত কলেজ জাতীয়করণের দাবীতে অধ্যাপকদের আন্দোলন চলেছে।

[ সূত্র: আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান ]

১৫ই আগষ্ট স্মরণে

**"পি. এল ৪৮০ তহবিল রাজনৈতিক সমাধানের অপেক্ষায়"**

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা শস্য কম দামে বিক্রী করে যে টাকা জমা হয়েছে তার সুদের পরিমাণ এই ক'বছরে জমে পি. এল ৪৮০ তহবিলে ২৮০০ কোটি টাকার বিরাট অঙ্কে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে প্রতি বছরে সুদ যুক্ত হয়ে সময়ের সাথে সাথে তহবিলের আকারও ফেঁপে চলেছে।

প্রথম পি. এল ৪৮০ অবদান আসে ঋণ হিসেবে এবং এর সুদের হার ছিল শতকরা ৩ থেকে ৪। পরে তহবিলটিকে সরকারী ঋণপত্রে ( Govt. Securities ) রূপান্তরিত করা হয়। পি. এল ৪৮০ তহবিলের ব্যাপারে সব চাইতে বিস্ফোরক অবস্থাটা হলো এই যে, নতুন দিল্লীর মার্কিন দূতাবাসেই ৬৮৭ কোটি টাকার ঋণপত্র আটকা পড়ে আছে। কাউকে এই সিদ্ধান্তে পৌছতে বেগ পেতে হবে না যে, যদি মার্কিন দূতাবাস এই ঋণপত্র মুদ্রাতে রূপান্তরিত করতে চান, তাহলে ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া বিপজ্জনক হবে।

—অমৃতবাজার পত্রিকা
২. ৭. ৭৩

১৫ই আগষ্ট স্মরণে

**৩৫ বছর বেগার খেটেও ১৫ সের আটার ধার শোধ হয়নি**

"রাঁচি, ১১ই জুলাই—পালামৌ জেলার বাঁকা এলাকায় ১৪ জন সুদখোরের বাড়িতে ১০০ জনের মত মজুরকে আজও বিনা মজুরীতে বেগার খাটতে হচ্ছে। বিহারের দায়িত্বশীল ও জনপ্রিয় সংবাদ সাপ্তাহিক "রাঁচি এক্সপ্রেসের" সর্বশেষ সংখ্যায় এই মর্মে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

"অতীত দিনের এই দাস-শ্রমিক প্রথার খবর জানতে পেরে অনেকেই গভীর ভাবে দুঃখিত।

**"একজন ১৫ সের শস্য—আটা বা চাল ধার নিয়ে এক সুদখোরের বাড়িতে বিনা মজুরিতে ৩৫ বছর বেগার খেটেছে। তার ছেলেও সে-বাড়িতে চার বছর হল বেগার খাটছে।** [ বড় হরফ আমাদের ]

"আরেকজন শ্রমিক ১৭৫ টাকা ধার নিয়ে গত ১০ বছর হল এক বাড়িতে বেগার খাটছে। আরেকজন ৯১ টাকা ধার নিয়ে গত ২০ বছর বেগার খাটছে। অন্য আরেকজন ১০৫ টাকা ধার নিয়ে গত ১৬ বছর বেগার খেটে চলেছে।.........

"১৯৬৯ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায়, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা বিভাগের ৬টি জেলার ১০ হাজার গ্রামীন পরিবারের মধ্যে ৩৪ শতাংশ পরিবার নিরন্তর ঋণে ডুবে রয়েছেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা,
১২. ৭. ৭৩

# পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ

### ২০ বছর আগে ও পরে

এখন ভারতে ২২ কোটি লোক নিম্নতম ভোগক্ষমতার নিচে বাস করছেন। ২০ বছর আগেও সংখ্যাটা এই রকমই ছিল। একটা মোটামুটি যুক্তিসংগত ভোগক্ষমতার নিম্নতম ধাপে পৌছতে হলে ১৯৬০-৬১ সালের দ্রব্যমূল্যমান অনুসারে প্রতি মাসে জনপ্রতির প্রয়োজন হবে ২০ টাকা।

—প্ল্যানিং কমিশনস্ অ্যাপ্রোচ ডকুমেণ্ট টু ফিফ্‌থ প্ল্যান।
( স্টেটস্‌ম্যান, ১. ৬. ৭২ )

### বৈদেশিক 'সাহায্য'

১৯৭০ সালে ভারতে মার্কিনী বিনিয়োগ ছিল ৩০'৫ কোটি ডলার। এর থেকে তার লাভের পরিমাণ হলো ১১'২% অর্থাৎ ৩'৪ কোটি ডলার। এই লাভের ১'৪ কোটি ডলার কোম্পানী-কর হিসেবে ভারতীয় অর্থ ভাণ্ডারে গেছে।

—"এ নিউ রেসনেল্ ফর ফরেন এইড।" রাসেল ওয়ারেন হাউস। ( স্টেটস্‌ম্যান, ৭. ৯. ৭২ )

### 'স্বাধীনতার' রজত জয়ন্তী

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৮৪৭৬ কোটি টাকা।

### 'স্বাধীনতা' বনাম বৈদেশিক ঋণ

(i) ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের মোট ঋণের পরিমাণ ৮০১১'৫১ কোটি টাকা। এর মধ্যে :—

সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ দিতে হবে ৫৭৭৯'৯২ কোটি টাকা
পণ্য-রপ্তানীর মাধ্যমে শোধ দিতে হবে ৪৬১'০১ " "
( প্রধানতঃ রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে )
ভারতীয় মুদ্রায় শোধ দিতে হবে ১৭৭০'৫৮ " "
( সরকারী খাতের ঋণ, পি. এল. ৪৮০ চুক্তি ইত্যাদি নিয়ে )

(ii) এর মধ্যে সব থেকে বেশী পরিমাণ ঋণ দিয়েছে আমেরিকা, যার পরিমাণ ৪১৫৩'৩৪ কোটি টাকা।
=২৬৫৫'৫৩ কোটি টাকা ( বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ্য )+১৪৯৭'৮১ কোটি টাকা ( ভারতীয় মুদ্রায় পরিশোধ্য )

(iii) এর পরের একক বৃহত্তম ঋণদাতা হলো বিশ্ব-ব্যাঙ্ক ( World Bank )। এর দুটি শাখার দেওয়া ঋণের পরিমাণ :

I.D.A. ( ইণ্টার ন্যাসনাল ডেভলাপমেণ্ট এজেন্সি )= ৮৪৪'০৭ কোটি টাকা

I.B.R.D ( ইণ্টার-ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রি-কনস্ট্রাকশন এণ্ড ডেভলাপমেণ্ট )=৫৮১'৮৮ কোটি টাঃ

(iv) অন্যান্য বৃহৎ ঋণদাতারা হলো :

ব্রিটেন—৬২৪'৬২ কোটি টাকা কানাডা—১৭৬'৬৬ " "
পশ্চিম জর্মানী—৬১৬'৪১ " " ইটালি—১৩৫'৭৫ " "
জাপান—৩০৯'৬৩ " " ফ্রান্স—১৫৬'৪৭ " "
রাশিয়া—৩৭৮'৮৬ কোটি টাকা

### স্ব-নির্ভর শিল্পোৎপাদনের পথে

ভারতের বে-সরকারী ক্ষেত্রে বৈদেশিক বে-সরকারী ( Private পুঁজির অনুপ্রবেশের চেহারাটা নিচের তথ্য থেকে মোটামুটি ধারণ করতে পারা যায়।

| সাল | সর্বমোট অনুপ্রবেশ |
|---|---|
| ১৯৬৩-৬৪ | ১০৮'৯ কোটি টাকা |
| '৬৪-৬৫ | ১৪১'২ " " |
| '৬৫-৬৬ | ১১৮'৯ " " |
| '৬৬-৬৭ | ২৩২'১ " " |

বিদেশী কোম্পানীগুলোকে যে ডিভিডেণ্ড ( dividends ), রয়্যালটি ( Royalty ) ইত্যাদি দিতে হচ্ছে ( প্রাইভেট সেকটার কর্পোরেশনগুলোকে নিয়ে কিন্তু 'উন্নয়ন মূলক প্রকল্প' ও বিদেশী কোম্পানীগুলোর শাখাগুলোকে বাদ দিয়ে ) সেগুলির পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে, কি ভাবে ভারতীয় কারখানাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে বৈদেশিক সহায়তা নির্ভর হয়ে উঠছে।

ডিভিডেণ্ড, রয়্যালটি এবং শিল্প সহযোগিতা বাবদ অন্যান্য সূত্রে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ

| সাল | কোটি টাকা | সাল | কোটি টাকা |
|---|---|---|---|
| ১৯৫৬-৫৭ | ১৩'৮ | ১৯৬২-৬৩ | ৩৮'২ |
| '৫৭-৫৮ | ১৩'৫ | '৬৩-৬৪ | ৩৬'২ |
| '৫৮-৫৯ | ১৪'০ | '৬৪-৬৫ | ৪৪'৯ |
| '৫৯-৬০ | ১৯'৩ | '৬৫-৬৬ | ৪৪'৭ |
| '৬০-৬১ | ২৪'৩ | '৬৬-৬৭ | ৬২'৬ |
| '৬১-৬২ | ৩৪'০ | '৭১-৭২ | ২০০'০ |

সূত্রঃ 'ফ্রণ্টিয়ার' ৩০ জুন '৭৩।

## এবারের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা

# পরীক্ষা না ছাত্রমেধ যজ্ঞ ?

ছাত্র প্রতিনিধি

কথিত আছে যে পুরাকালে কোন সমস্যার সমাধান করার জন্য মুনিঋষিরা যজ্ঞ করতেন। আজকে, আমাদের দেশের বর্তমান পরিচালকরা ক্রমবর্ধমান 'শিক্ষিত' বেকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নতুন এক যজ্ঞে বসেছেন। যজ্ঞই বটে—ছাত্রমেধ যজ্ঞ! যার ভয়াবহ প্রকাশ ঘটছে স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, ত্রিবার্ষিকী ডিগ্রী-কোর্স ইত্যাদি পরীক্ষাগুলিতে গত কয়েক বছর ধরে ক্রমবর্ধমান হারে পাশের হার সংকোচনের মধ্য দিয়ে।

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে উচ্চমাধ্যমিক বা স্কুল ফাইন্যালই হল প্রথম পরীক্ষা যা তাঁদের ভবিষ্যত জীবনের গতি নির্ধারণ করে। স্বভাবতঃই পরীক্ষার হলে ঢোকার পর থেকে ফল প্রকাশ অবধি তাঁরা দারুণ উৎকণ্ঠায় ভোগেন। কিন্তু এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়, প্রশ্নপত্র থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যথেচ্ছাচারের যে নজীর রেখেছেন তা শুধু ছাত্র-ছাত্রীদেরই নয় তাঁদের অভিভাবকদেরও চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

যেমন বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, কারিগরী, কৃষি—সব মিলিয়ে এবারে উচ্চমাধ্যমিকপরীক্ষায় পাশের হার হল ৩৭%। ১৯৭১ সালে এই হার ছিল ৭২%। '৭২-এ দাঁড়িয়েছিল ৪৫%। ৮.৭.৭৩ তারিখের আনন্দবাজার গত বছরের তুলনায় এ বছরের বিভিন্ন শাখায় পাশের হারের যে ছবি দিয়েছে তা নিম্নরূপ :

| | ১৯৭২ | ১৯৭৩ |
|---|---|---|
| বিজ্ঞান | ৫৬% | ৪৭·২৮% |
| কলা | ৩৯% | ৩৩·৩৪% |
| বাণিজ্য | ৪০% | ২৩·৭০% |

যথেচ্ছাচারের শেষ এখানেই নয়। ফলাফলে ানের ক্ষেত্রেও পরীক্ষার্থীদের প্রত্যাশাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন পর্ষদ। যাঁর নিশ্চিত প্রথম বিভাগে পাশ করার কথা ছিল তিনি করেছেন দ্বিতীয় বিভাগে। "মিত্র ব্রানচের মাষ্টার মশাইরা দুঃখ করে বলেছেন, স্কুলের সত্তর বছরের ইতিহাসে এমন খারাপ ফলাফল আর কোন বছর হয়নি। যে ছেলের প্রথম ডিভিশনে পাশ করার কথা ছিল, সে করেছে ফেল।" (আনন্দবাজার ১৮.৭.৭৩)। চরম "বিপর্যয়" দেখা দিয়েছে কলা বিভাগে। কলকাতা-হাওড়া মিলিয়ে এই শাখায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন মাত্র ১২৫ জন।

আর পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারে গাফিলতির যে নজী পর্ষদ এবারে স্থাপন করেছেন তাতে তাঁদের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী চরিত্র দিনের আলোর মতই পরিস্কার হয়ে গেছে। ৯ই জুলাই পর্ষদের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে, ১০ই জুলাই বিজ্ঞান ছাড়া অন্যসব শাখা ফলাফল সম্বলিত পুস্তিকা দোকানে পাওয়া যাবে। অথচ ঐদিন বিকে চারটার আগে পর্ষদ নির্দিষ্ট কোন দোকানেই আর্টসের (মফঃস্বল পুস্তিকা পায়নি। পর্ষদ নির্দিষ্ট দোকানে পুস্তিকা নেই। ফলে পরীক্ষার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকদের হয়রানির শেষ ছিল না বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল প্রকাশের কথা ছিল ১২ই জুলাই। কিন্তু ইংরাজী বর্ণমালার 'এ' থেকে 'আই' পর্যন্ত তালিকা প্রকাশিত হয় বাকিটা অপ্রকাশিত থাকে। এছাড়া অজস্র ভুলে ভরা এই ফলাফল পুস্তিকাগুলি সাতদিন ধরে পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করেছে। বুকলেটে যে পাশ বলে ঘোষিত হয়েছে, মার্কসসীটে সে করেছে ফেল ব উল্টো। এছাড়া অসংখ্য পরীক্ষার্থীর ফল এখনও অসম্পূর্ণ অনেকে এমন সব বিষয়ে ফেল করেছে, যে ব্যাপারে তাঁদের মাষ্টার মশাইরা (যেমন মিত্র-ব্রানচ, সাউথ সাবারবান-মেন ইত্যাদি) গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত, ঠিকমতো খাতা দেখা হলে তারা ফেল করত না অনেক স্কুলের কোন ছাত্রছাত্রীই পাশ করেনি।

চক্রান্তের শেষ এখানেই নয়। এই অস্বাভাবিক ফলাফলকে কেন্দ্র করে নানাধরণের প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ায় ১৭ই জুলাই দৈনিক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে পর্ষদের তরফ থেকে জানান হয় "অসফল" পরীক্ষার্থীদের খাতা "রিভিউ" করা হবে। শুধু তাই নয়—এক, দুই বা তিন বিষয়ে ফেল করেছেন এমন পরীক্ষার্থীরাও সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা দিতে পারবেন। তবে এতে পাশ করলে তাঁদের কোন 'ডিভিশন' দেওয়া হবে না, শুধু 'পাশ' বলে ঘোষিত হবেন। আর যাঁরা এগ্রিগেটে ফেল করেছেন তাঁরা স্কুলের মাধ্যমে আবেদন করলে "পাশ" বলে ঘোষিত হবেন—'ডিভিশন' নয়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যাঁরা পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য নিয়ে এধরণের ছিনি-মিনি খেলতে পারেন, তাঁদের তরফে হঠাৎ এই মহানুভবতা কেন?

১৮ই জুলাইয়ের আনন্দবাজার লিখছে, "পাছে কারণগুলি ফাঁস হলে জবাই করা ছাত্রছাত্রীরা সেই সংবাদ পড়ে মরণপণ কোন আন্দোলনে সামিল হয়, তাই আগেভাগেই সত্যেনবাবু (পর্ষদ সভাপতি) আন্দোলনের গলাটি কেটে রাখলেন, সংশ্লিষ্ট সবাইকে খুশি করার মত সিদ্ধান্ত জারী করে।" উপরন্তু এর মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের প্রভু, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের (যাঁদের নির্দেশে এই ছাত্রমেধ যজ্ঞের আয়োজন) সেবাটা আর একটু বেশী করে করতে পারবেন। কারণ এভাবে যাঁরা "পাশ" করবেন—আজকের চাকরীর প্রতিযোগিতার বাজারে তাঁদের পুঁজি হবে শূন্য। মাঝখান থেকে 'রিভিউ ফি' বাবদ (পেপার প্রতি ১০ টাকা) ফাউ হিসাবে প্রচুর টাকাও তাঁদের ঘরে আসবে। এই টাকা কারা দেবেন?—দেবেন সেই মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, গরীব কেরানী, মাষ্টারমশাই ইত্যাদিরা, ইতিমধ্যেই যাঁদের পিঠ বেঁকে গ্যাছে।

যাই হোক, 'রিভিউ'এর খবর পেয়ে সেদিনই সকালবেলা অসংখ্য পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা পর্ষদ অফিসের সামনে জমায়েত হন। দুপুর নাগাদ, পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের ভীড় যখন পর্ষদ অফিসের সামনে উপচে পড়েছে, কে বা কারা পর্ষদ অফিসের চারতলা থেকে আবর্জনা ভর্তি একটা বালতি অপেক্ষমান জনতার উপর নিক্ষেপ করে। একজন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হন। উপস্থিত জনতা বিক্ষোভে ফেটে পরেন এবং শেষ পর্যন্ত "শান্তিরক্ষক"দের হস্তক্ষেপে অবস্থা আয়ত্বে আসে।

**পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র**

এই ছাত্রমেধ যজ্ঞে আজ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কিম্বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শিক্ষাকর্তৃপক্ষরাই (বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) নামেন নি। সারা দেশ জুড়েই আজ এই যজ্ঞ শুরু হয়েছে। কারণ এটাই হল দেশের পরিচালকদের তরফে—ক্রমবর্ধমান "শিক্ষিত" বেকার সমস্যার "নবতম" সমাধান। মণিপুর মধ্যশিক্ষা পর্ষদে পরিচালনাধীন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় এবছর পাশের হার ২৯.৪ (অমৃতবাজার—২৫.৬.৭৩), উত্তর প্রদেশের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা এবারে পাশের হার ৪৩.৬% (লক্ষ্ণৌর, দি পাইওনিয়ার পত্রিকা—৩০.৬.৭৩), মধ্যপ্রদেশের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় এবার পাশ করেছে শতকরা মাত্র ৪১ জন ছাত্রছাত্রী (ভূপাল থেকে প্রকাশিত, হিতভা পত্রিকা—২৯.৬.৭৩)। আর মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর বেশী ভাগ পরীক্ষাগুলিতেই পাশের হার দশ শতাংশের বেশী হয়নি (আনন্দবাজার—১৮.৬.৭৩)। কাজেই "গণটোকাটুকি"র দোহাই দিয়ে কিম্বা শিক্ষক শিক্ষিকাদের "অযোগ্যতা"কে গাল পেড়ে পর্ষদ যতই নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করুন না কেন—শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না। কারণ সারা দেশ জুড়ে ছাত্রছাত্রীরা "গণটোকাটুকি"র পথ নিয়েছেন কিম্বা সারা দেশের শিক্ষককুল শিক্ষাদানে "অক্ষম"—একথা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোকই বিশ্বাস করবেন না। এটা যে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশেই তাঁরা করছেন তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই। প্রমাণ—পর্ষদের সভাপতিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, পর্ষদের সভা না করে তিনি উপরোক্ত গুরুতর সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ আবেদন করলে "পাশ" করিয়ে দেওয়া হবে) নিলেন কি করে, উত্তরে তিনি জানান—রাইটার্স বিল্ডিং তাঁকে এ ক্ষমতা দিয়েছে (আনন্দবাজার—১৮.৭.৭৩)। ইচ্ছে করেই যে কথাটা যোগ করতে তিনি ভুলে গেছেন তা হ'ল: গোটা ব্যাপারটাই সুপরিকল্পিত।

কাজেই এই ভয়াবহ ফলাফলের জন্য হা-হুতাশ কিম্বা পর্ষদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করায় কোন সুফল হবে না। কারণ কসাই কসাইই, সন্ন্যাসী নয়। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে হলে এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে হলে—এই ছাত্রমেধ যজ্ঞের হোতা এবং পুরোহিত উভয়ের বিরুদ্ধে আজ শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীরাই নয়, তাঁদের শিক্ষক এবং অভিভাবকদেরও সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

**পত্রপত্রিকার দর্পণে**

# "অনাহার ও দলীয় বিতর্ক"

"স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের দুটি বাধা—অনাহার ও কলেরা—সম্বন্ধে ধারণার একটা ভাবগত পরিবর্তন ঘটেছে। জনজীবনে এই দুটো রোগ যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আনে না তা নয় কিন্তু এরা আজ আর আমাদের লজ্জার কারণ নয়, কেন না এদের গালভরা নামান্তর এখন পাওয়া যাচ্ছে।

"ক্ষুধার্ত এবং দরিদ্র মানুষ আজ আর অনাহারে মরে না, মরে 'অপুষ্টিতে'; পানোপযোগী জল না থাকা সত্বেও তারা কখনও কলেরায় মারা যায় না—মারা যায় 'Gastro-Enteritis' (গ্যাস্ট্রো এণ্টারাইটিস)-এ। দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিদ্যমান্ থাকা সত্বেও কোন অঞ্চলকে কদাচিৎ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বলে স্বীকার করা হয়। অপর সমস্ত জায়গার সাথে উড়িষ্যার চিত্রও একই। ১৯৬৬ সালে কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষের সেই কালো দিনগুলোতে উড়িষ্যা বিধান সভার সভাপতি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"অনাহারে মৃত্যু জিনিষটা কি?" "সাধারণতঃ অনাহার জনিত মৃত্যু ঘটে অন্য কোন রোগে যার অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ ঘটে

প্রতিরোধশক্তির ক্ষীণতার জন্য। আনাহারে রোগের আক্রমণ খুব সহজেই হয় এবং এতে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। শুধুমাত্র অনাহারে মানুষ শীঘ্র মারা যায় না—এর জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন” উত্তর দিয়েছিলেন উড়িষ্যার তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শারীরবিদ এই মন্ত্রী মহোদয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ (এবং মজার) অভিমত সকলের বোধগম্য হয়েছিল কিনা জানা নেই! কিন্তু সভাপতি মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন যে, রাজস্বমন্ত্রীর বর্ণিত 'কালাহাণ্ডির কিছু মৃত্যু' হয়েছিল অনাহারে।

“এই বিতর্ক এখানেই শেষ হয়নি! বরং সময়ের সাথে এই ধারণা একটা পরিবর্তণশীল কংগ্রেসের রাজত্বকালে উড়িষ্যা বন্যা, ঘূর্ণি, ঝড় এবং খরা কবলিত হয়েছিল। সভার বিরোধী পক্ষ কংগ্রেসদল চেষ্টা করে শতাধিক অনাহার-মৃত্যুর ঘটনা সম্বলিত একটি ফর্দ তৈয়ারী করেন। বামপন্থী নেতা শ্রীরাজ্যেশ্বর রাও দুর্ভিক্ষের প্রমাণ হিসাবে মানুষের মাংস খেয়ে একটি ক্ষুধার্ত স্ত্রীলোকের জীবন ধারণের ঘটনা উপস্থাপিত করেন। সরকারের অযোগ্যতা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য সরকারকে জোরালো একহাত নেওয়ার জন্য—কংগ্রেস এবং C. P. I. দলগুলি বিধান সভাকক্ষে ঝড় তোলেন। কোন কোন জায়গায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোন মানুষই যে অনাহারে মারা যায়নি এটা প্রমাণ করার জন্য বিরোধী পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল ঐ কোয়ালিশন সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। শাসকদল ও তার বন্ধুদের ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের জুন মাসে যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় আসেন তখন চিত্রটা পালটিয়ে যায়। স্বতন্ত্র, [illegible]-কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি তখন দেশে অনাহারে মৃত্যুর অভিযোগ আনতে থাকেন এবং কংগ্রেস সরকার যারা নিজেদের “প্রগতিশীল” ভাবেন তারা এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করতে থাকেন। নিজের দলের কিছু কিছু সদস্য যখন ময়ুরভঞ্জ এবং অন্যান্য জায়গায় অনাহার মৃত্যু সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে থাকেন তখন শাসকদলকে কিছু অস্বস্তি ভোগ করতে হয়। তথাপি সরকার কিছু 'অপুষ্টিজনিত' মৃত্যুর ঘটনা স্বীকার করেন।

“উড়িষ্যার তদানীন্তন রাজ্যপাল সরদার যোগেন্দ্র সিং একজন স্পষ্ট বক্তা মানুষ ছিলেন। জনসভায় তিনি নিজেকে কংগ্রেস হিসাবে পরিচিত করতেন এবং শ্রীমতী গান্ধীর ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে অন্যান্য দলীয় কর্মীর তুলনায় বেশী উদ্বিগ্ন থাকতেন। ঢেঙ্কানল গ্রামে অনুষ্ঠিত এক সভায় এমনও বল্লেন “যতদিন শ্রীমতী গান্ধী জীবিত থাকবেন ততদিন ভারতের একজনও অনাহারে মারা যেতে পারে না।” সম্বলপুরে অনুষ্ঠিত অন্য একটি সভায় কোন কংগ্রেস নেতা খরা এবং অনটন পীড়িত এলাকায় কিছু অনাহারে মৃত্যুর উল্লেখ করলে তিনি ঐ নেতার উদ্দেশে, বক্রোক্তি করেন। বর্তমান রাজ্যপাল শ্রী বি. ডি. জেট্টি এতটা [illegible]নি। কিন্তু তিনিও অনাহার মৃত্যু বা ঐ জাতীয় কোন ব্যাপারে সামান্যতম উল্লেখেই ক্ষুব্ধ হ'ন। খরাপীড়িত কেউনঝর জেলায় অনাহ[ারে] মৃত্যুর যে খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয় তিনি তার সত্যত[া] বিশ্বাস করেন না। ঘটনার মূর্ত বিবরণময় ছবিও তাঁর ধারণার বিন্দুম[াত্র] পরিবর্তন ঘটাতে যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি এক প্রেস-সাক্ষাৎকারে তি[নি] বলেন যে অপুষ্টিজনিত মৃত্যু প্রমাণ করা খুব কষ্টকর। কেননা আ[...] ও ঐ প্রশ্নকর্তা সাংবাদিকসহ প্রায় সব ভারতবাসীই অপুষ্টি রোগাক্রান্ত[...] তাঁর সরকারের অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। তঁ[...] মন্ত্রণাদাতা শ্রীসাতারওয়ালা শপথ করে বলেন তাঁর ব্যক্তিগত অ[নু]সন্ধান সত্ত্বেও তিনি কেউনঝর জেলায় একটিও অপুষ্টিজনিত মৃত্যু[র] ঘটনার সম্মুখীন হননি। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী কংগ্রেসের সাধা[...] সম্পাদক শ্রীচন্দ্রজিৎ যাদবের একটা বক্তব্যের কথা আমাদের ম[নে] করিয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হবার সময়ে তি[নি] বলেছিলেন “কোন সরকার অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা স্বীকার করে না।”

“কিন্তু ইতিমধ্যে কেউনঝর জেলার কালেক্টর মহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্[বেও] হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন। সরকার অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর ঘট[না] অস্বীকার করার অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি এক প্রেস-সাক্ষাতকা[রে] অন্ততঃ ছ'জনের অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর কথা বলেন।

“সরকারের কাছে প্রেরিত 'কেউনঝর জিলার শস্য উৎপাদ[নে] অসাফল্য ও দুঃস্থ অবস্থার রিপোর্টে তিনি বলেন, 'অপুষ্টি ব্যাপ[ক] আকার নিয়েছে। সমস্ত জেলায় অনাহারে মৃত্যুর ব্যাপক অভিযো[গ] রয়েছে। সাতাশটা আনাহারে মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। ৬[...] ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, যে মৃত্যু ঘটেছে অপুষ্টিহেতু[...] জেলার প্রধান মেডিকেল অফিসার বলেছেন যে অপুষ্টি আক্রান্ত হ[...] ৭৪ জন হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৯ জন মা[রা] গেছেন। জেলার লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য খুবই খারাপ এবং টি. বি[...] রক্তশূন্যতা, পরাশ্রয়ী বীজাণুজনিত রোগের সংক্রমণ খুবই বেশী[...] পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বসন্ত এবং জলবসন্ত ছড়িয়ে পড়ছে[...] ইতিমধ্যেই বসন্তে ছয় জনের জীবনহানি হয়েছে। যে জেলা পরপ[র] তিন বৎসর খরাক্রান্ত হয়েছে, সে জেলায় এরূপ অবস্থা হতেই পারে[...] জেলা কলেক্টরের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগগুলিকে এভাবে ঠেলে সরিয়ে দেবার অপচেষ্টা সরকারকে শুধুমাত্র অধিকত[র] অবিশ্বাসভাজনই করে তুলতে পারে।

“রাজ্য প্ল্যানিং বোর্ডের সহ-সভাপতি শ্রীসুরেশ দ্বিবেদীর এ[ই] সাম্প্রতিক অভিমত প্রকাশে সরকার আরো বেশী অসহায় অবস্থা[য়] পড়েছেন। তিনি বলেছেন 'অপুষ্টিজনিত মৃত্যু না খেতে পেয়ে মরার[ই] নামান্তর'। একদিক থেকে শ্রী দ্বিবেদীর এই বক্তব্য এবং পূর্বোল্লিখি[ত] বিধান সভার সভাপতির বক্তব্য একই।”

—হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড, ২য়া জুলাই, '৭[...]

# সূচী

বীক্ষণ | বিশেষ শারদ সংকলন ॥ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ॥ ১৯৭৩



● **স্থানাভাবের দরুণ** এবং পেতে দেরী হওয়ায় 'বিশেষ শারদ সংকলন'-এ নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুত লেখাগুলি আমরা দিতে পারিনি—

(১) **'প্রতিবেশী চীন : ডাঃ বিজয় বসুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার'** ( আগামী সংকলনে লেখাটি থাকবে ); (২) **'অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে'**, এবং (৩) **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারায় সমাজের ভূমিকা**— ( আগামী কোন এক সংকলনে লেখাগুলিপ্রকাশিত হবে )।

**অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য পাঠক-পাঠিকারা আমাদের ক্ষমা করবেন আশা করি।** —সঃ মঃ বীঃ ●

# আমাদের কথা

'বীক্ষণে'র ষষ্ঠ ও সপ্তম ( যুগ্ম ) সংখ্যা—'বিশেষ শারদ সংকলন' ( ১৯৭৩ ) প্রকাশিত হলো। এই সাত মাসের মধ্যে অসংখ্য ছোটবড় দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা পত্রিকাটিকে মোটামুটি নিয়মিতভাবে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে 'বীক্ষণ' আংশিকভাবে 'পেশাদারী বৈশিষ্ট্য' অর্জন করতে পেরেছে—একথা বলা যেতে পারে। 'বীক্ষণ' সর্বস্তরের পাঠক মহলেই মোটামুটি ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তার বন্ধু ও শুভার্থীর সংখ্যা বেড়েছে এবং আমরা আগের অনভিজ্ঞতার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে পত্রিকার কাজগুলিকে অনেকখানি নিয়মের মধ্যে বাঁধতে পেরেছি। 'বীক্ষণে'র মতো পত্রিকার ক্ষেত্রে এই অবস্থাটিকে গুরুত্বপূর্ণ একটি সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে, যার উপর নির্ভর করছে তার বিকাশ এবং সম্ভাবনার সমস্ত ভবিষ্যৎ। এই অবস্থাটির দুটো দিক আছে। একদিকে এই আপাত-সাফল্য আমাদের ( এবং পাঠকদের ) মনে এক ভ্রান্ত আত্মসন্তুষ্টি গড়ে তুলতে পারে, যার ফলে পত্রিকার ক্রিয়াকর্ম ক্রমশ 'যেন-তেন প্রকারেণ' নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের স্থূল এক যান্ত্রিক দায়িত্ববোধে পর্যবসিত হতে পারে। অন্যদিকে প্রাথমিক বিশৃংখল অবস্থাটা কিছুটা কাটিয়ে উঠে আপেক্ষিক অর্থে এই 'স্থায়ী' অবস্থাতেই আমরা আরও বেশী সময় দিয়ে এবং অধিকতর সুশৃংখলভাবে আত্মসমালোচনায় মনোযোগ দিতে পারি। এবং একমাত্র এভাবেই আমরা আমাদের হাতিয়ারটিকে আরও শাণিত করে তুলতে পারি। এই দ্বিতীয় দিকটির নিরিখেই ভেবে দেখতে হবে—আমাদের এই সাফল্য আপাত, না কি প্রকৃত। যদি আমরা আংশিক ভাবেও সফল হয়ে থাকি তবে এই সাফল্যের ভিত্তি কি এবং যদি ব্যর্থ হয়ে থাকি তবে কোন বাস্তব কারণে তা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-আন্দোলনের ক্ষেত্রে যখন সাময়িক ভাঁটা পড়েছে, ছাত্র-যুব মানসে যখন এক ভয়াবহ দিকশূন্য অস্থিরতা তার কালো ডানা বিস্তার করেছে, সুস্থ সংস্কৃতির শূন্যতাকে অপসংস্কৃতির বেনোজলে ভরাট করে দেবার ষড়যন্ত্র যখন জোরদার হয়ে উঠেছে—সেই গভীর সংকট-সময়েই 'বীক্ষণ' আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তার সীমিত শক্তি দিয়েই এক সুস্থ ও বলিষ্ঠ আদর্শকে উঁচুতে তুলে ধরার শপথ ঘোষণা করেছে। যে বাস্তব প্রয়োজন 'বীক্ষণে'র জন্ম দিয়েছে, সেই বাস্তব প্রয়োজনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুভার্থী বন্ধুদের তার কাছে টেনে এনেছে। 'বীক্ষণ' তাঁদের হৃদয় জয় করার আগেই, তাঁরা তাঁদের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা তার উপর উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রেই, প্রয়োজনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নয়, প্রয়োজনবোধের ঐক্য এবং মৌখিক প্রতিশ্রুতিই আমাদের বন্ধুত্বের ভিত্তি রচনা করেছে। পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যে সব চিঠিপত্র পেয়েছি তাতে সমালোচনার চাইতে স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয় ও উচ্ছাসের দিকটাই বেশী ভারী। ভালোবাসার এই উত্তাপ আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে সন্দেহ নেই, তবে একই রকম সদিচ্ছার সুরে সুনির্দিষ্ট ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং পরামর্শও 'বীক্ষণে'র মজবুত, পেশীবহুল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বেশী দরকার।

একথা আমরা নিজেরা গভীরভাবে অনুভব করি যে, 'বীক্ষণ' তার ঘোষিত লক্ষ্যের থেকে এখনও বহু দূরে। আমাদের অনেক ঘোষণা এবং প্রতিশ্রুতি এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ছাপার হরফেই থেকে গেছে। 'বীক্ষণ'—কিশোর ও যুব-ছাত্রদের যথার্থ মুখপত্র এখনও হয়ে উঠতে পারে নি। কারণ কিশোরেরা তো নয়ই, এমন কি তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশের সাথে এখনও আমরা একাত্ম হতে পারি নি। পত্রিকাটিকে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করতে পারি নি, যাতে তাঁরা ছাত্র-সম্প্রদায়ের সামগ্রিক সমস্যাগুলির সাথে, নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পারেন। অন্যদিকে, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করবো বলে, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছি তার বাস্তব রূপায়ণের পথে অতি সামান্যই এগুতে পেরেছি আমরা। অনেক লেখাই এখনো ব্যাপক সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি। অন্ধভাবে আঁকড়ে না ধরে সব কিছুকে প্রশ্ন করার মতো সুস্থ ও বলিষ্ঠ যে মনোভাব গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছি আমরা, তার ক্ষেত্রেও সাফল্য সামান্যই অর্জিত হয়েছে। পাঠকদের চেতনার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রশ্নগুলিকে উপস্থাপিত করতে বহু সময়েই আমরা পারিনি। তাই প্রশ্নগুলি অনেকখানি বিমূর্ত থেকে গেছে তাঁদের কাছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে ব্যর্থতাগুলিই শেষ কথা নয়, কারণ এই ব্যর্থতাগুলির উপলব্ধির মাধ্যমেই, সাফল্যের চাবিকাঠিকে আমরা হস্তগত করতে পারবো। কিন্তু পাঠক-পাঠিকা ও শুভার্থী বন্ধুদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে এটা হওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের নিরন্তর এবং ক্রমবর্ধমান তাগিদ ছাড়া এই ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করা যাবে না। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাই এটা আমাদের অনুরোধ বা আবেদন নয়—আমাদের ঐকান্তিক এবং আন্তরিক দাবি, তাঁরা শুধু স্নেহসিক্ত প্রশ্রয় নয়, সাথে সাথে নির্মম সমালোচনা, সচেতন প্রহরা এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির মাধ্যমে 'বীক্ষণে'র প্রতিটি লেখা নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলুন। যাতে সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতাকে শীতের জীর্ণপাতার মতো ঝেড়ে ফেলে 'বীক্ষণ' নবপত্রের বর্মে সজ্জিত বসন্তের দেবদারু হয়ে উঠতে পারে।

ছড়া

## ঋতু মঙ্গল

**কিশলয় সিংহ**

এক গ্রীষ্ম
দুই গ্রীষ্ম
তিন গ্রীষ্ম কাটে
আগুন ঝড়ে অঙ্গ পোড়ে
তেষ্টায় বুক ফাটে।

এক বর্ষা
দুই বর্ষা
তিন বর্ষা যায়
ডুবিয়ে ফসল বন্যার জল
গ্রাম ভাসিয়ে যায়।

এক শরৎ
দুই শরৎ
তিন শরৎ এলো
বাবুর বাড়ী জামার সারি
ক্যাংলা কেঁদে গেলো।

এক হেমন্ত
দুই হেমন্ত
তিন হেমন্ত জানে
শূন্য গোলা যাবে ভোলা
ফসল তোলার গানে।

এক শীত
দুই শীত
তিন শীত আসে
বাবুর বাড়ী গোলা ভরে
চোখের জলে ভাসে।

এক বসন্ত
দুই বসন্ত
তিন বসন্ত আয়
গোলা কাড়ায় খামার গড়ায়
শান্তি পাওয়া যায়।

কবিতা

## সবুজ পাতারা পুড়ে গেল

**নাওয়াল আহ্‌মদ**
( বয়স—৮, প্যালেষ্টাইন )

সেখানে অনেক গাছ ছিল
আর গাছভরা ছিল ফল
এমন সময় বোমারু বিমানে চড়ে
এলো শত্রুর দল।
গাছের ওপর তারা
ফেল্‌লো বোমার ভার
জ্বলে গেল সব পাতা
তাঁবু পুড়ে ছারখার।
গোলাপ ফুলেরা পাপ্‌ড়ি খসালো
আপেল পড়লো ঝরে
পাশের বাড়ির
চেনা সে মেয়েটি
মাটিতে রইলো পড়ে॥

অনুবাদ : শান্তা সেন

## আয় বোন খুকুমনি

**সমর রায়**

জীবনে যন্ত্রণা আছে
আছে কিছু কাব্য
সংশয় দোলনা
সেতো ভবিতব্য।

খুকুমনি বোন আমার
শ্রমিকের ঘরণী
কালো কালো রদ্দুরে
কি ভীষণ সরণী
পার হয়ে যাও তুমি
দাঁত চুয়ে রক্ত
মৃত্যুকে বুক দিয়ে
আগলাতে মত্ত।

শোন বোন খুকুমনি
ভাই আমি বাঙ্লার
অনেক দেখেছি ক্ষুধা
যন্ত্রণা, কারাগার॥

অনেক সয়েছি রাত্রি
চাঁদহীন নরকে
অনেক দেখেছি মৃত্যু
বাঙ্লার মরকে।

আয় বোন, খুকুমনি
আমি তুমি দুইজন
নরকে মশাল জ্বালি
আমরণ আমরণ॥

## শিক্ষার প্রশস্তি

**ব্রেখট (জার্মানী)**

সবচেয়ে সহজগুলি জানো, কারণ
এটা তোমার সময়
দেরী কিছুই হয়নি! হয়না।
তোমার অ আ ক খ তুমি শেখো, যদিও তা সব নয়।
কিন্তু ওগুলো আগে শেখা দরকার! এতে হতাশ হয়ো না,
শুরু কর! সব কিছু তুমি জানবে!
তুমি গ্রহণ করবে নেতৃত্ব।

জানো, মানুষ এখন পাগলা গারদে!
জানো, মানুষ রয়েছে কারাগারে!
জানো, মেয়েরা সবাই রান্নাঘরে!
জানো, ষাট বছরের বৃদ্ধদেরও!

গৃহহীনেরা, নিজেদের স্কুল খুঁজে নাও
বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ কর, কাঁপছ কেন
ক্ষুধার্ত মানুষ, কিতাবের খোঁজ কর : ওটা অস্ত্র।
তুমি গ্রহণ করবে নেতৃত্ব।

প্রশ্ন করতে লজ্জা পেয়োনা ভাই।
কেউ যেন তোমাদের জিতে না নেয়
নিজের জন্য নিজেরাই তৈরী হও!
যা নিজেরা জানো না
নিজেরা শেখোনি
সব কিছুর হিসেব করো।
তোমাকে তা পূরণ করতে হবে
নিজের আঙ্গুল সব ব্যাপারে তোলো,
প্রশ্ন কর : কি করে এলো এটা ?
তুমি গ্রহণ করবে নেতৃত্ব।

অনুবাদ : বিনয় ঘোষ

## তফাৎ

অমিত দাস

কোন কোন মানুষ
সারাজীবনে
সময়ের গায়ে একটাও আঁচড় কাটতে পারেনা,

কোন কোন মানুষ
সারাজীবনে
একটাও বলবার মত গল্প বোলতে পারে না,

কোন কোন মানুষ
সারাজীবনে
একচিলতে মাটি খুঁজে পায়না, যেথানে দাঁড়িয়ে বলবে—
"এ মাটিকে আমি চিনি।"

আর
কোন কোন মানুষ
সময়ের কাঁধে হাত রেখে
সারাটা দেশের ওপর পা দিয়ে
আকাশে মাথা ঠেকিয়ে গল্প বলে
"এ মাটি আমার।"

## আমাদের শিক্ষক কিয়েত্‌কে

দাঙ্‌ ভ্যান মিউ ( ভিয়েতনাম )

পাতার মর্মর ধ্বনির মাঝে
দূরবর্তী কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাকে বিদায় দিয়ে এসে
আমি শুধু আশাকরি
আমাদের নির্ভীক পূর্বপুরুষদের পদচিহ্ন ধরে
আপনাকে সম্মুখে ধাবমান দেখার।
আপনাকে বিদায় দিতে ক্লাশঘরগুলো আমাদের বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে, মাস্টারমশাই
আমাদের হৃদয়গুলো হাসিতে উপ্‌চে পড়ছে
আর জল চিক্‌চিক্ করছে আমাদের চোখের পাতায়।
আপনি কলম ফেলে রেখে অস্ত্র ধরতে চলেছেন……

কোন চিন্তা শেষরাতে আপনার ঘুম ভাঙ্গালো ?
পিতৃভূমির ডাক, সেই চিন্তা
উজ্জ্বল সোনালী তারার আলোয় এগিয়ে চলার জন্য
দেশের এবং আমাদের প্রিয় প্রত্যেক মানুষের জন্য
তাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞাকে ইস্পাত-দৃঢ় ক'রে।
দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় সমস্ত কষ্টকে আপনি নিশ্চয়ই জয় করবেন
বীর সেনানীদের এগিয়ে যাওয়া সারিতে,
ছাত্রদের সঙ্গে একসাথে অংশীদার হবেন যুদ্ধের ট্রেঞ্চের।

তারপর
যখন দক্ষিণ আর উত্তর আবার এক হবে
আমাদের গ্রাম ঘুরে দেখা করে যাবেন আমাদের সাথে।
বিদায় জানাতে আপনাকে মাস্টারমশাই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি
আমি সাধ্যমত ভালো ক'রে সবকিছু শিখব।
হয়তো, স্কুলজীবনের শেষে এক মুক্তিযোদ্ধা মেয়ে হিসেবে
ট্রুংসন পর্বতমালায় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অনুবাদ : প্রদীপ দাস

## প্রিয়জনের স্মরণে

আবু ইক্কা

আমরা প্রতিদিন যে পথ ধ'রে হেঁটে যাই দিনে-রাতে
রক্তাক্ত পলাশ ফুল ফুটে থাকে পায়ে পায়ে
কিম্বা সারি সারি সাজানো গোলাপ বনে
নিরুদ্বিগ্ন পাপড়ির গভীর কোটরে
বারুদের বিধ্বংসী গন্ধ লুকিয়ে থাকে ওতপ্রোতভাবে
এবং পরিচিত দৃশ্যাবলীর খাঁজে খাঁজে
কুচি কুচি ফসফরাস-সিক্ত জীবন্ত হাড় এখনও
নীরব সাক্ষী হ'য়ে জেগে থাকে
আমাদের গভীর গোপন চক্ষে লিপিবদ্ধ
রক্তের লাল অক্ষরে ;

আমরা প্রতিদিন যখন প্রতিপ্রিয়জনের নাম
আঁকতে থাকি পরম শ্রদ্ধায় প্রচ্ছদে
প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের আগুন একটু একটু
জমতে থাকে রোমকূপে
ঘামের মত ফুটতে থাকে শপথ :
চক্রান্তের পুঁতিগন্ধকে নস্যাৎ ক'রে
আমরা এবার কঠিন হাতে
ফ্রাংকেন্‌স্টাইনগুলোর যত সব সাজানো কলকব্জা
বিকল ক'রে দেব—আমাদের অতি
প্রিয়জনের স্মরণে : এবং পৌঁছে যাব পায়ে পায়ে
সূর্য্যোদয়ের দেশে ॥

ইতিহাসের
এক অবিস্মরণীয়
নায়কের
জীবনালেখ্য

# ডাঃ নরমান বেথুন

রঞ্জন দেবনাথ

● [ পৃথিবীর যে কোন দেশের মুক্তিকামী সংগ্রামী জনগণের কাছে বেথুন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির নাম নয়, বেথুন একটি জীবন্ত ইতিহাস, একটি উত্তরণের আলেখ্য, ত্যাগ ও আদর্শের একটি অনির্বান শিখা যার আলোকে তাঁরা নিজেদের আদর্শের পথটিকে চিনে নিতে পারবেন। বেথুনের মতো ব্যক্তিরা কোন 'দৈবশক্তি' প্রেরিত 'মহাপুরুষ' নন, 'আর্ত' মানুষের 'ত্রাণকল্পে' তাঁরা 'আবির্ভূত'ও হন না ; তাঁরা জন্মান এই মাটির পৃথিবীতেই—মানুষের সমস্ত দোষগুণ নিয়ে। একটি সোজা মেরুদণ্ড, একটি সাচ্চা বিবেক, অহংকার ও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দেওয়ার মতো দৃঢ় মনোবল, শিক্ষা নেওয়ার মতো নমনীয়তা এবং আসল-নকলের মধ্যে ফারাক ধরতে পারার মতো একটি সজাগ মস্তিষ্ক—এই ক'টি হলো তাঁদের চারিত্রিক উপাদান যা তাঁদের সমস্ত সাধারণত্বের উর্ধ্বে নিয়ে যায় ; ইতিহাসের একটি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁরা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের কাছে হয়ে যান শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, প্রেরণার উৎস,—জনগণের নায়ক। এই যোগ্যতা তাঁরা আকাশ থেকে আহরণ করেন না ; তাঁরা শিক্ষক হন জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে, পথপ্রদর্শক হন ইতিহাসের গতিপথটিকে অনুধাবন করে, প্রেরণার উৎস হন জনগণের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে এবং নায়ক হন জনগণের সেবা করে। জনগণই তাঁদের প্রয়োজনীয় নায়কদের তৈরী করে নেন। এই নায়কদেরই একজন ছিলেন ডাঃ নরমান বেথুন।

তিনি ছিলেন একাধারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসক, শিল্পী, কবি, যোদ্ধা, সমালোচক, শিক্ষক, বক্তা, আবিষ্কারক, এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন প্রতিভাধর তাত্ত্বিক। তাঁর সংগ্রামী জীবন প্রচণ্ড এক সাইক্লোনের মতো নাড়া দিয়েছিল তিনটি দেশকে—কানাডা, স্পেন ও চীন। তিনটি দেশেই তিনি লড়াই করেছিলেন, বিভিন্ন মুখোশপরা কিন্তু একই শত্রুর বিরুদ্ধে। অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝেছিলেন বেথুন—যে শত্রু দুনিয়ার কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের বুকে যক্ষ্মার জীবাণু ছড়িয়ে দেবার চক্রান্ত করে, যে শত্রু স্পেনের গণতন্ত্ররক্ষার সংকল্পে দৃঢ়, লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার সহযোদ্ধাদের খুন করতে ফ্যাসিবাদের কালোথাবার রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যে শত্রু চীনের কোটি কোটি মানুষকে পরাধীনতার শৃংখল পরিয়ে রাখতে চায়—তার পরিচয় একই। তাই বিশেষ অর্থে যদিও তিনি এই তিনটি দেশের জনসাধারণের একজন, কিন্তু বৃহত্তর অর্থে তিনি তাঁদেরই একজন যাঁরা জাতীয় নিপীড়ন এবং জনগণের শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে ধরেন।

ডাঃ বেথুন আজ জীবিত নেই। কিন্তু তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছেন চীনের ৭৫ কোটি মানুষ, স্পেনের অগণিত দেশপ্রেমিক জনতা, ইউরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা, যাঁরা তাঁর মহৎ কর্মের সাথে ইতিপূর্বেই পরিচিত। বেথুনের জীবন এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে "একজন মানুষের ক্ষমতা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হতে পারে কিন্তু সে যদি এই রকমের ( বেথুনের মতো ) তেজোদৃপ্ত আদর্শবোধের অধিকারী হয় তবে একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে, সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে, একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারে, যে মানুষ জনগণের স্বার্থে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে।"
—সঃ মঃ বী : ] ●

॥ ১ ॥

বছর আটেক বয়স হবে ছেলেটার। অথচ এই বয়সেই তার 'বৈজ্ঞানিক গবেষণার' ঠেলায় বাড়ীর সবাই অস্থির! পোকা-মাকড় থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগী কিছুই বাদ যায় না তার ছুরির হাত থেকে। তার হাবভাব, কাজ করার সময় গাম্ভীর্য্য দেখে কে বলবে সে একজন বড় ডাক্তার নয়?

এক দিনের ঘটনা।

বিকেল বেলা সংসারের কাজে ব্যস্ত মা'র হঠাৎ মনে হলো একটা সাংঘাতিক রকমের বিশ্রী গন্ধ যেন সারা বাড়ীটাকে ঘিরে ফেলেছে। পড়ি-মরি করে ছুটলেন মা, কোত্থেকে গন্ধটা আসছে জানার জন্য। না, ব্যাপারটা তেমন কিছু গুরুতর নয়—ছেলে একটা গোরুর ঠ্যাং সেদ্ধ করে পরীক্ষার জন্য তার থেকে হাড় কেটে বার করছে। ব্যাপারটা কি প্রশ্ন করাতে ছেলে খুব সংক্ষিপ্তভাবে মাকে জানালো, "মাংসটা কেটে বাদ দিচ্ছি, যাতে হাড়গুলো ভালো করে পরীক্ষা করা যেতে পারে।" এই আট বছর বয়সেই সে একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বসলো, তাকে আর 'হেনরী' বলে কেউ যেন না ডাকে। আজ থেকে তার নাম হবে এককালের বিখ্যাত ডাক্তার, তার মৃত ঠাকুর্দার নামে—নরমান। এটা শুধু ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হলো না হেনরী, এটাকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার শোওয়ার ঘরের দরজায় আটকে দিল ঠাকুর্দার 'নেমপ্লেট': ডাঃ নরমান বেথুন।

আর একটি দিনের কথা।

হেনরী তখন আরো ছোট—মায়ের সঙ্গে গেছে বাজার করতে। কর্মচঞ্চল বিরাট সহর টরন্টো। হঠাৎ কেমন করে যেন হেনরী ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। ছোটাছুটি করছেন মা; নাম ধরে ডাকছেন হেনরীর। হেনরী নিরুদ্দেশ! কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। ক্লান্তি ও আশংকায় ভেঙে পড়েছেন মা। হঠাৎ একজন পুলিশের হাত ধরে হাসিমুখে হাজির হলো হেনরী, মায়ের ব্যস্ত প্রশ্নের জবাবে জানালো, "হারিয়ে গেলে কেমন লাগে দেখছিলাম মা। পুলিশকে গিয়ে বললাম—হারিয়ে গেছি। কেমন মজা হলো বলতো?"

শৈশবের এই দুঃসাহসী, অনুসন্ধিৎসু ছেলেটিই ভবিষ্যতের ডাঃ নরমান বেথুন। ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে গ্রাভেনহার্সট-এর উত্তর ওণ্টারিও সহরে বাবা-মার দ্বিতীয় সন্তান হেনরী বেথুনের জন্ম। বাবা রেভারেণ্ড ম্যালকম বেথুন ছিলেন মিশনারী প্রচারক এবং মা এলিজাবেথ অ্যান গুড্‌উইন ছিলেন আদর্শবাদী গোঁড়া খ্রীস্টান মহিলা, যিনি মাত্র দশ বছর বয়সে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ধর্মীয় পুস্তিকা বিলি কোরতেন। মা কিন্তু ছেলের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎ ও দুঃসাহসী কার্যকলাপে কোনদিন বাধা দেন নি।

সরলতম শিশুসুলভ খেলাটিকেও রীতিমতো অ্যাড্‌ভেঞ্চা পরিণত করতে ছোট্ট হেনরী ছিল ওস্তাদ। একবার ছোট ভা ম্যালকমকে নিয়ে হেনরী ছুটেছে প্রজাপতির খোঁজে। বাড়ীর থে বেশ দূরে একটা খাড়া পাহাড়ের গায়ে দুজনে উঠছে প্রজাপতির পি ধাওয়া করে। মাঝখানে এসে ম্যালকম আর উঠতে পারে না ভাইকে ওখানে থামিয়ে একা এগুলো হেনরী; পিছলে, পাথর আঁকড়ে লতাপাতা ধরে শেষ পর্য্যন্ত পাহাড়ের মাথায় উঠলো। ম্যালকম ে ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভয়ে কেঁদেই অস্থির। কিছুক্ষণ পরে নী নামলো হেনরী—হাতের মুঠোয় তির তির করে কাঁপছে ঈপ্সি প্রজাপতিটা! দম আটকানো গলায় বললো হেনরী, "বুঝি ম্যালকম, প্রজাপতি ধরার ব্যাপারে দুটো কথা আছে খেয়াল রাখিস প্রথম কথাটা হলো 'ধরা' আর 'প্রজাপতি'টা তো রয়েছেই।" এ একই উপলক্ষ্যে হেনরী দু-দুবার পড়ে গিয়ে পা ভাঙলো। দশ বছর বয়সে বাড়ীর সবাই মিলে ছুটি কাটাতে যখন জর্জিয়ান সাগে গেছে—হেনরী তার বাবাকে উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে সাঁতরে বন্দ পেরোতে দেখলো। আর যায় কোথায়! পরের দিন সেও চেষ্ট করলো বাবার মতো সাঁতার কাটতে। ভাগ্যিস্ সঙ্কটমুহূর্তে হেনরী বাবা নৌকোতে এসে ছেলেকে উদ্ধার করলেন; না হলে সে দিনই সলিল-সমাধি হতো ছোট্ট হেনরীর!

এর ঠিক পরের বছরই সেই বন্দর সাঁতরে পার হলো হেনরী।

*

বেশ কয়েকটা স্কুলে পড়াশুনা করেন নরমান। এবং শেষ পর্য্যন্ত ওয়েন সাউণ্ড কলেজিয়েট হাইস্কুল থেকে স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। স্কুল থেকে পাশ করে নরমান যখন কলেজে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, বেথুন পরিবার টরন্টোতে চলে আসে যাতে নরমান ও অনতিকাল পরে ম্যালকম, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেন। ঐতিহাসিক ভাবে এই সময়টি খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। সমুদ্র পেরিয়ে নতুন যুগের হাওয়া ডোমিনিয়নের বুকে বইছে। দ্রুত পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে সারা দেশ জুড়ে আর তারই সাথে সাথে জন্ম নিচ্ছে নতুন মানুষ। যে বছরে বেথুনের জন্ম, সেই বছরেই কানাডার বুকে বিস্তৃত রেল-লাইনের জাল গড়া শেষ হলো। কারখানার ইস্পাত আর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। আর তার সাথে সাথে এলো কোটি কোটি ডলারের বৃটিশ ও মার্কিনী বিনিয়োগ। ইউরোপ থেকে ঢেউয়ের মতো এসে পড়তে লাগলো ও দেশের মানুষ—কাজের সন্ধানে। পশ্চিমাঞ্চলের (কানাডার) বিরাট সমতলে

এসে বাসা বাঁধলো ইউরোপীয় কৃষক আর পূর্বাঞ্চলের কারখানায় এসে ঢুকলো অসংখ্য শ্রমিক। বিরাট বিরাট হ্রদের বুক চিরে পয়লা নম্বর গম নিয়ে ভেসে চললো ষ্টীমার, সেন্ট্ লরেন্স নদীর দিকে এবং সেখান থেকে পৃথিবীর সমস্ত বন্দরে ছড়িয়ে পড়লো কানাডার সোনালি ফসল। শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এলো নতুন নতুন শিল্প-কৌশল, এলো আধুনিকতার ঢেউ; পৃথিবী হঠাৎ করে যেন ছোট হয়ে গেল। আর এলো নতুন চিন্তার বীজ যা বেথুনদের অতি সত্বর বিচলিত করবে এবং চ্যালেঞ্জ জানাবে তাঁদের ছেলেকে। অন্যান্য নতুন চিন্তাধারার সাথে সাথে নরমান পরিচিত হলেন ডারউইনের বিবর্তনবাদের সঙ্গে, যা তৎকালীন চিন্তার ক্ষেত্রে এনে দিয়েছিল এক যুগান্তকারী বিপ্লব।

বেথুন পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও সচ্ছলতা এতো বেশী ছিল না, যাতে দু'জন ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো যেতে পারে। নরমান, বছর কয়েক আগে যিনি খবরের কাগজ বিক্রি করে পকেট খরচ যোগাড় করতেন, এখন কলেজের খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন কাজ নিতে লাগলেন। কলেজের প্রথম বছরটা চালালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্তোরাঁতে ওয়েটারের কাজ করে। তারপর গ্রীষ্মের সময়ে ফায়ারম্যানের ( fireman ) কাজ পেলেন একটা ষ্টীমারে। পরবর্তী কাজটা পেলেন উইণ্ডসরের একটা খবরের কাগজের সংবাদ-দাতার। কাজটা তাঁর দারুণ পছন্দ হলো। কথার মালা গাঁথার কাজটা শুধু সহজই নয়, বেশ মজারও! বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া এক বছরের জন্য মুলতুবী রাখলেন নরমান; পরের বছরগুলোর খরচ রোজগারের জন্য। ওন্টারিওর একটা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেলেন। এই চাকুরী শেষ হবার পর উত্তর ওন্টারিওর জঙ্গলে কাঠুরের কাজ যোগাড় করে ফেললেন নরমান। বাড়তি রোজগারের জন্য কাজের ফাঁকে বাইবেলের ক্লাসও নিতেন তিনি। কাঠুরের কাজের পরিশ্রম তাঁর চেহারাকে দৃঢ় পেশীবহুল করে তুললো। কাজটা তাঁর দারুণ ভালো লাগতো। নিজেকে কাঠুরে বলে পরিচয় দিতে রীতিমতো গর্ববোধ কোরতেন তিনি। চারজন 'সত্যিকারের'র কাঠুরের সঙ্গে—প্রত্যেকে ছ'ফিটের ওপর লম্বা আর তেমনি চওড়া, তাঁর একখানা ছবি বহু বছর ধরে সযত্নে রেখেছিলেন নরমান। পেটানো চেহারা, ছোট নাক, চওড়া ও শক্ত চোয়াল, বিস্তৃত কপাল, সবুজ-নীল চোখ ও লম্বা শক্তিশালী হাত—এই হলেন চব্বিশ বছরের নরমান। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকা আর ভাস্কর্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মেছে তাঁর এই বয়সে।

জীবনের প্রতি এক অদম্য আগ্রহ জন্মেছে নরমানের মধ্যে। কাদার যে পিণ্ডটি তাঁর আঙুলের ফাঁকে ধরা আছে, নয়ন-সুখকর যে দৃশ্যটি তাঁর ক্যানভাসের বুকে তুলির ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠছে, পাঠ্যপুস্তকের পাতায় অথবা বক্তৃতাকক্ষের মাঝে ক্রমবিস্তারিত যে নতুন দিগন্ত তাঁর চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে, সবকিছুই খুলে দিচ্ছে এক অনাস্বাদিত আনন্দের ভাণ্ডার।—সবকিছুই আনন্দের; যৌবন আনন্দময়, আনন্দময় জীবন।

কিন্তু বর্ণ-সুষমায় মণ্ডিত এই বিমূর্ত জগৎ দুনিয়াজোড়া এক সর্বনাশের ছায়ায় কালো হয়ে উঠলো। তাঁর মতো আরও অসংখ্য চব্বিশটি বসন্ত কাটানো তরুণের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মাঝে বেজে উঠলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা। তাঁদের স্বপ্নের গোলাপ ছড়ানো রাজপথে পড়ে থাকলো রক্ত, গুলি আর রূঢ় মিলিটারি বুটের ছাপ।

এম. ডি. ডিগ্রী নিতে তখনো এক বছর বাকি। কানাডা যুদ্ধ-ঘোষণা করার দিনেই নরমান মিলিটারিতে যোগ দিলেন। প্রথম কানাডিয়ান ডিভিসন ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে স্ট্রেচার বাহকের কাজ নিয়ে বেথুন গেলেন ফ্রান্সে। ফ্রেঞ্চ-কানাডাতে তখন গুঞ্জন উঠছে 'ওদের যুদ্ধ'। কুইবেক সহরের রাস্তায় বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল ধ্বনি দিচ্ছে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্'। কিন্তু বেথুনের মতো আরো অনেক তরুণের কাছে এসবের কোন অর্থ নেই, কোন সন্দেহ নেই, বিবেকের কাছে কোন জিজ্ঞাসা নেই। সাধারণ উত্তেজনার জোয়ারে তাঁরা ভেসে গিয়েছিলেন। তাছাড়া ছিল ফ্রান্সের নতুন মাটি, নতুন মানুষ, নতুন দৃশ্য, নতুন অভিজ্ঞতার আকর্ষণ।

আহতদের মাঝখানে ঘুরতে লাগলেন বেথুন। স্ট্রেচারে করে বইতে লাগলেন জীবন্ত মাংসপিণ্ডগুলোকে, যাদের আর মানুষ বলে সনাক্ত করা যায় না। রাজনীতিজ্ঞদের বক্তৃতার ফুলঝুরি আর 'নিরাপদ যুদ্ধক্ষেত্রে' দাঁড়িয়ে উৎসাহদানকারী 'দেশ প্রেমিকদের' থেকে অনেক দূরে,—অমূল্য প্রাণ ও রক্তের অর্থহীন অপচয়ের মাঝখানে বেথুনের মনে আঁকা হয়ে থাকলো ধ্বংস, কাদা, ব্যর্থতা ও মৃত্যুর ছবি। হতাশা ও যুদ্ধের ভয়াবহতা ভুলতে অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্য-পানের আশ্রয় নিলেন নরমান। এবং একদিন, এপ্রি ( Ypres )-তে শত্রুর গোলাবর্ষণের মুখে কানাডিয়ান সৈন্যরা যখন ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে—একটা গোলার মুখে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন তিনি। এবারে তাঁর পালা এলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাহিত হবার। রক্তক্ষয়ে দুর্বল; আহতদের আর্তনাদ আর কান ফাটানো যুদ্ধের আওয়াজ তাঁর স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে রইলো—স্বপ্নের মধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি করতে। পরবর্তী ছ'মাস ফরাসী এবং বৃটিশ হাসপাতালে থাকার পর দেশে ফেরৎ পাঠানো হলো তাঁকে। তাঁর কাছে যুদ্ধ শেষ হলো।

কয়েক সপ্তাহ পরে ডিগ্রী নেবার জন্য আবার বেথুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলেন। স্নাতক হবার পরে টরন্টো সামরিক হাসপাতালে তাঁকে

চাকরীর একটা প্রস্তাব দেওয়া হলো। কিন্তু তিনি সরাসরি তা নাকচ করলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাঁকে অস্থির করে তুলছিল : এই ধ্বংস ও হত্যালীলার পেছনে কারণটা কি? অনেক ভেবেও এর কোন উত্তর পাননি তিনি। কিন্তু যুদ্ধের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও 'অন্তরা যেখানে মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে অথচ তিনি সেখানে একপাশে সরে থাকবেন'—এই আত্মধিক্কার আবার তাঁকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিল।

বৃটিশ নৌবাহিনীতে নাম লেখালেন বেথুন। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত লেফ্‌টেন্যান্ট সার্জন হিসেবে থাকলেন H.M.S. Pegusus যুদ্ধ-জাহাজে। তারপর সন্ধির ছ'মাস আগে বদলি হয়ে এলেন ফ্রান্সে। তিনি ফ্রান্সে থাকার সময়েই জার্মানী আত্মসমর্পণ করলো।

বিজয় উৎসব সমাপ্ত হবার পর বেথুন বন্ধুদের সঙ্গে বসে ভাবতে লাগলেন এরপর কি হবে? এখন তাঁর বয়স আটাশ, অকালবার্ধক্যের ধূসর ছায়া পড়তে শুরু করেছে রগের দু'পাশে। ছাত্র-বেথুনের কাছে যে যুদ্ধ একটা বিশেষ সময় হিসেবে এসেছিল, আজ তা পূর্ণব বেথুনের সামনে একটা প্রশ্ন চিহ্ন এনে দিয়েছে—এরপর করবেন তিনি?

তরুণ বয়সে তিনি দেখেছিলেন শুধুমাত্র কানাডা, বয়স্ক দেখেছেন শুধুমাত্র ইউরোপ। এখন তাঁর মনে হলো সম্পূর্ণ বেব হয়ে পড়েছেন তিনি। কোন কিছুতে ফিরে যাওয়া বা কোন কি দিকে এগুনো—দুই-ই তাঁর কাছে লক্ষ্যহীন, নিষ্ফল—একমাত্র সময়টুকু পুনরুদ্ধার করা ছাড়া। সেই দুনিয়াজোড়া হতাশা ও মোহভঙ্গে একটা ক্ষুদ্র অংশ তিনি, যাকে ভিত্তি করে পশ্চিমের ঔপন্যাসিব দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে রসদ যুগিয়েছেন।

গোঁফ রাখা শুরু করলেন বেথুন। এবং পাড়ী জমালেন ইংলণ্ডে

[ ক্রমশ

## ছাত্রবন্ধুদের প্রতি

ছাত্র বন্ধুগণ,

আপনারা যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশুনো করছেন তার আভ্যন্তরীণ চেহারা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ চিঠি-পত্র পাঠান। আমাদের দেশের বেশীরভাগ সাধারণ মানুষই এইসব 'জ্ঞানের মন্দির'গুলির ভিতরের দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাণহীন অবস্থার কথাটা জানেন না। আপনাদের এই ধরণের চিঠি-পত্র প্রকাশিত হলে, তাঁদেরই কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরই সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনেদের কেমন আবহাওয়ার মধ্যে, কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন। এর ফলে তাঁদেরই স্নেহাস্পদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে তাঁদেরকে উত্তেজিত করার যে অপচেষ্টা চলে, তার বিরুদ্ধেও এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ হবে। তাছাড়া এতেই আপনাদের পারস্পরিক খবর আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম হয়ে উঠে, 'বীক্ষণ' ছাত্র হিসেবে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার কাজেও সাহায্য করতে পারবে।

॥ সঃ মঃ বীঃ ॥

# "সাহা ইন্‌স্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স"

জনৈক গবেষক

●[ বিজ্ঞান শাখার, বিশেষতঃ পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্রবন্ধুদের কাছে 'সাহা ইন্‌স্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' একটি পরিচিত নাম। ( দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, যে দেশে বিজ্ঞানসাধনাকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি গুপ্ত 'তন্ত্র অনুষ্ঠানে' পর্য্যবসিত করা হয়, সেখানে বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা স্বভাবতঃই এই জাতীয় উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রগুলোর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন ) এঁদের চোখে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি সশ্রদ্ধ বিস্ময়, বিজ্ঞানচর্চার একটি 'পবিত্র মন্দির' বিশেষ, যেখানে 'অলৌকিক' প্রতিভাধর বিজ্ঞানীরা 'পার্থিব তুচ্ছতা মুক্ত' একটি পরিবেশে অনলস বিজ্ঞান-সাধনায় ব্রতী থেকে, প্রকৃতির জটিলতম রহস্যগুলোর অনুসন্ধান করে, বিশ্বের দরবারে জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেন। স্বাভাবিকভাবেই, এই 'বিজ্ঞানমন্দিরটি'র ভেতরের খবর তাঁরা জানেন না। তাঁরা জানেন না এই প্রতিষ্ঠানটির পিছনে কি পরিমান অর্থব্যয় হয়, যে জনসাধারনের অর্থে এই জাতীয় গবেষনাকেন্দ্রগুলি চলে সেগুলির বিজ্ঞানচর্চার থেকে কতখানি উপকৃত হচ্ছেন তাঁরা, বিজ্ঞানীরা কি ধরনের পরিবেশে গবেষনা করছেন, 'সত্যের অনুসন্ধানে' তাঁদের স্বাধীনতার সীমা কতখানি, এই প্রতিষ্টানটির পরিচালনার ক্ষেত্রে কারাই বা হর্তা-কর্তা এবং বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ভণ্ডামি-শূন্য বিমূর্ত জগৎটির কথা প্রচার করা হয় তার আসল রূপটি কি ?

নীচের রচনাটিতে লেখক এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। সম্পূর্ণ না হলেও এই প্রতিষ্ঠানটির এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে—ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার বাস্তব রূপটির সম্পর্কে একটা আংশিক ধারণা পাওয়া যাবে এই লেখাটি থেকে। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের সিদ্ধান্ত হতাশাব্যঞ্জক হওয়াই স্বাভাবিক কারণ **একটি বিশেষ উদ্দেশ্যই একটি বিশেষ কাঠামোর জন্ম দেয়।** যে দেশে বিজ্ঞান বাস্তবলক্ষ্যহীন, সামাজিক-প্রয়োজন বিযুক্ত, সেখানে গবেষনা প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামো সুস্থ এবং বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী হতে পারে না।

শুধুমাত্র সাহা ইন্‌স্টিট্যুটই নয়, ভাবা এ্যাটমিক রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট, টাটা ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট, সেন্ট্রাল ফুড এ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট, ইত্যাদি আরও অনেক 'বিজ্ঞান মন্দির' আমাদের এই বন্যা-খরা, দুর্ভিক্ষ-মহামারী আর পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও বেশী ( ৩৯ কোটি ) নিরক্ষরের দেশে "জাতীয় গর্ব" হিসাবে বিরাজ করছে। **জনসাধারণের অর্থে** পরিচালিত বিশাল ব্যয়বহুল এই 'বিজ্ঞান মন্দির'গুলির আভ্যন্তরীণ চেহারাটা কেমন, কি কি বিষয়ে সেখানে গবেষণা হয়, বিষয়বস্তুগুলির **সামাজিক প্রয়োজনীয়তাই** বা কি—এইসব কিছুই তাঁদের জানানো প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ছাত্র, শিক্ষক, গবেষকদের কাছে আমাদের আবেদন—আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের উপরোক্ত দিকগুলির সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ রচনা 'বীক্ষণে' প্রকাশের জন্য পাঠান। সঃ মঃ বীঃ ]

'সাহা ইন্‌স্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' ( সংক্ষেপে এস. আই. এন. পি. ) বর্তমানে ভারতে পরমাণু-বিজ্ঞান ও উচ্চতর পদার্থ-বিজ্ঞানের আরও কয়েকটা বিষয়ে গবেষণাকেন্দ্রগুলির অন্যতম বলে পরিগণিত হয়। ডঃ মেঘনাদ সাহা এই ইন্‌স্টিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা। এই ইন্‌স্টিট্যুটের আর্থিক ব্যয় মূলতঃ ভারত সরকারের 'পরমাণু শক্তি বিভাগ' বহন করে, যদিও প্রশাসনিক ভাবে এটা একটা স্বয়ং-শাসিত সংস্থা। গবেষণার বিষয় অনুসারে এখানে দশটা বিভাগ ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে আটটা বিভাগ রয়েছে। এখানকার মোট নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা প্রায় চারশ' ও এঁদের মোট বার্ষিক বেতন পঁচিশ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। এই নিবন্ধে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত এস. আই এন. পি. সম্বন্ধে কিছু তথ্য তুলে ধরা হ'চ্ছে। আশা করা যা যে সাধারণ মানুষ, যাঁদের অর্থে এই গবেষণাকেন্দ্রের কাজ চ'লছে

তাঁরা এর থেকে এই গবেষণাকেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ চেহারা সম্পর্কে কিছু আভাস পাবেন এবং সাধারণভাবে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানগবেষণার স্বরূপ সম্বন্ধেও কিছু ধারণা করতে পারবেন।

প্রথমে এখানকার কর্মীদের একটা মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ করা প্রয়োজন। গবেষণার কাজের সঙ্গে যাঁরা সরাসরি সম্পর্কিত তাঁদের মধ্যে এক অংশ গবেষণার কাজ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেন; এঁদেরকে আমরা সাধারণ ভাবে 'শিক্ষক' বলে অভিহিত করবো (এঁদের মধ্যে আবার স্তরভাগ রয়েছে ও এঁদের নিম্নতম আর উচ্চতম স্তরের মধ্যে বেতন ও তথাকথিত মর্যাদার তফাৎ প্রচুর)। যাঁরা এই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন তাঁদের আমরা সাধারণভাবে 'গবেষক' বলে চিহ্নিত করবো। এঁদের অধিকাংশই ডক্টরেট উপাধি লাভের ইচ্ছা নিয়ে কাজ করেন (এঁদের পারিশ্রমিক, যাকে fellowship বলা হয়, মাসিক ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা), আর কিছু গবেষক ডক্টরেট উপাধি লাভের পরও উচ্চতর গবেষণা চালান (এঁদের পারিশ্রমিক মাসে ৫০০ টাকা)। শিক্ষক ও গবেষকের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫ ও ৬৭ (১৯৭১ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুসারে); এছাড়া বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষণায় সাহায্য করার জন্য Technical Assistant জাতীয় কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৬০। ইনষ্টিট্যুটের বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির কাজের জন্য ওয়ার্কশপে যে কারিগরী কর্মীরা রয়েছেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় ৪০। অফিস কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪০। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের কর্মীর মধ্যে বেহারা, ঝাড়ুদার, দারোয়ান ইত্যাদির সংখ্যা প্রায় ৭০। এঁরা ইনষ্টিট্যুটের নিম্নতম স্তরের কর্মী (প্রশাসনিক দিক দিয়ে এঁদের 'চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী' বলে চিহ্নিত করা হয়)। এঁদের বেতন অত্যন্ত কম, কোন কোন ক্ষেত্রে মাসিক ৮০ টাকা মাত্র। এঁদের অনেকেই গভীরভাবে ঋণজালে আবদ্ধ; ফলে ঐ সামান্য বেতনটুকুও তাঁরা সম্পূর্ণ ভোগ করতে পারেন না। গবেষণার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলার ক্ষেত্রে এঁদের গুরুত্ব অপরিসীম।

এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে হলে প্রথমে ইনষ্টিট্যুটের পরিচালনা ও নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে মূল নির্দ্ধারক কে বা কারা, জানা প্রয়োজন। ইনষ্টিট্যুটের সর্বোচ্চ নীতিনির্দ্ধারক সংস্থা বা গভর্নিং বডি (সংক্ষেপে জি. বি.) তে কেন্দ্রীয় পরমাণু শক্তি বিভাগ (DAE), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদির প্রতিনিধিরা রয়েছেন। এই জি. বি'র সঙ্গে ইনষ্টিট্যুটের কাজকর্মের একমাত্র যোগসূত্র ইনষ্টিট্যুটের ডাইরেক্টর। ইনষ্টিট্যুটের আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাপারে মূল নীতির কাঠামো (Broad Policy Structure) নির্ধারিত হয় DAE'র কিছু হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের দ্বারা। যদিও কাগজেকলমে এই নীতি প্রণয়নকারী হিসাবে দেখানো হয় জি. বি'কে। এই মূল নীতির বাস্তব রূপায়ণের এবং ইনষ্টিট্যুটের পরিচালনার ব্যাপারে অন্যান্য সমস্ত আনুসঙ্গিক নীতি প্রণয়নের ও তা কার্য্যকরী করার ভার (জি. বি'র অনুমোদন সাপেক্ষে) ইনষ্টিট্যুটের ডাইরেক্টরের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া ইনষ্টিট্যুটে আরও কয়েকজন মুষ্টিমেয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদের সঙ্গে ডাইরেক্টরের ঘনিষ্ঠতা গভীর। এঁদের এই ছোট 'চক্র' অথবা গোষ্ঠীর হাতেই ইন্‌ষ্টিট্যুটের পরিচালনার ব্যাপারে যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবার্ট এস. অ্যাণ্ডারসন নামে এক বিদেশী সমাজবিজ্ঞানীর কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক (ইনি 'ভারতে বিজ্ঞানচর্চার' ওপর গবেষণা করার উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ের টাটা ইনষ্টিট্যুট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ ও সাহা ইন্‌ষ্টিট্যুটের আভ্যন্তরীণ চিত্র সংগ্রহ করার জন্য কিছুদিন এই দুই গবেষণাকেন্দ্রে কাটিয়েছিলেন; এঁর অনুসন্ধানের ফল পুস্তক আকারে প্রকাশিত না হ'লেও একাধিক গবেষণাপত্রের আকারে তা আমাদের হাতে এসেছে)—"......এস. আই এন. পি'র আসল প্রশাসনক্ষমতা রয়েছে একটা ছোট্ট গোষ্ঠীর হাতে.......", "...... আমি একথা জোর দিয়ে ব'লবো যে যাঁরা ইনষ্টিট্যুট পরিচালনা করেন তাঁদের সংখ্যা পাঁচের কম.....।" এই গোষ্ঠির সঙ্গে DAE'র ও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের (যাঁদের এক অর্থে এই গোষ্ঠীর ওপরওয়ালা বলা চলে) এবং গভর্নিং বডির সদস্যদের যোগাযোগ গভীর। যদিও তা ইন্‌ষ্টিট্যুটের সাধারণ কর্মীদের কাছে অপ্রকাশ্য। কর্মীরা মাঝে মধ্যে এর ওর মুখে কানাঘুষা শোনেন, কি ভাবে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের অভিজাত বিলাসবহুল হোটেলে এইসব ক্ষমতাবান লোকেদের খানা-পিনা, আদর-আপ্যায়ন চলে। ইনষ্টিট্যুটের পরিচালনার ব্যাপারে উপরোক্ত 'প্রশাসকগোষ্ঠী'র মনোভাবকে স্বৈরতন্ত্রী আখ্যা দিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। অনেক চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীকেই এঁদের ব্যক্তিগত খিদমৎ খাটার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়। এঁরা এঁদের বিশেষ অনুগ্রহভাজন লোকেদের বাইরে ইনষ্টিট্যুটের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সাধারণতঃ বাক্যালাপ করেন না"। অ্যাণ্ডারসনের বক্তব্য অনুযায়ী —"প্রশাসনিকক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁদের কদাচিৎ গবেষণাগার-গুলোতে দেখতে পাওয়া যায়; এর ব্যতিক্রম ঘটে, যখন তাঁরা বাইরের কোন অতিথিকে গবেষণাগার দেখাতে নিয়ে আসেন"। গবেষণার উন্নতির ব্যাপারে এই প্রশাসকগোষ্ঠী একান্ত উদাসীন, যার ফলে শিক্ষক ও গবেষকদের এক বিরাট অংশের মনে এই গোষ্ঠীর প্রতি গভীর ক্ষোভ রয়েছে। এঁরা যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে গবেষণা করতে চান এবং বিজ্ঞানচর্চার প্রতি এঁদের যথেষ্ট আনুগত্য রয়েছে। বলা প্রয়োজন যে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা সম্পর্কে এঁদের অধিকাংশের মনেই কিন্তু ভ্রান্ত মোহ রয়েছে; ফলে বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে এঁদের মনোভাব মূলতঃ বাস্তববিমুখ। এঁরা বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন ও এ ব্যাপারে

নানা মনগড়া তত্ত্ব তৈরী করে নেন যাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে এঁদের মনোভাবে এর বিপরীত দিকটা একেবারেই অনুপস্থিত। এঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট অনুভব করেন ও তাঁদের চারদিকে তীব্র অন্যায়-অনাচারে বিচলিত বোধ করেন। এণ্ডারসন তাঁর এক গবেষণাপত্রে মন্তব্য করেছেন—

"এই গবেষণাগারগুলো ভারতবর্ষের সমাজজীবনের রূঢ় বাস্তবতা থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন, যদিও বেতনক্রমের নিচের দিকে যে সব বৈজ্ঞানিক রয়েছেন তাঁরা এই বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত।" এইসব গবেষক ও শিক্ষক যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও তাঁদের অনুগ্রহভাজন লোকেদের যথেচ্ছচারিতা ও প্রভুত্ব মেনে চলতে বাধ্য হন তখন এঁরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হন। এঁদের অনেকেই বিদেশের গবেষণাগারগুলোর সঙ্গে পরিচিত ও আশা করেন যে, যে 'রূঢ় বাস্তবতা'র থেকে সরে এসে তাঁরা গবেষণার রাজ্যে প্রবেশ করেছেন সেখানে অন্ততঃ তাঁদের দেখা অথবা শোনা 'আদর্শ' গবেষণার পরিবেশ, তাঁরা পাবেন। পরিবর্তে তাঁরা দেখেন এখানেও অসহ্য অন্যায়-অবিচার, এখানে বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানকে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে, এখানে বিজ্ঞানের মুখ্য ভূমিকা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নাম-যশ-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। গবেষণার প্রতি প্রশাসক চক্রের সত্যিকারের মনোভাব কি তা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গত দুই বছর যাবৎ এই ইন্‌স্টিট্যুটে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে দশটা থেকে পাঁচটা এই সময়ের বাইরে কোন কর্মীই ইন্‌স্টিট্যুটের ভেতরে থাকতে পারবেন না, এমনকি গবেষণার কাজের জন্যও নয়; কোন গবেষক এই সময়ের বাইরে কাজ করতে চাইলে তাঁকে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে (অবিশ্বাস্য হলেও সত্য)। গবেষণার কাজ অবশ্যই এভাবে ঘড়ির কাঁটার অনুশাসন মেনে চলতে পারে না এবং অনেক সময়ই গবেষককে সকাল-সন্ধ্যা এক নাগাড়ে কাজ করে যেতে হয়। এই 'নিয়ম' স্পষ্ট প্রমাণ করে যে গবেষণার কাজ ও অন্য যে কোন গতানুগতিক কাজের মধ্যে পরিচালকরা কোনই প্রভেদ দেখতে পান না। এইভাবে প্রতি পদক্ষেপে শিক্ষক ও গবেষকদের শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অনুশাসন মেনে চলতে হয়। গবেষণা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে যাঁদের মতামতের মূল্য সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিৎ, সেই শিক্ষকদের কোন পরামর্শই গ্রহণ করা হয় না।

প্রশাসকচক্রের এই স্বৈরাচারী পদ্ধতির বিরুদ্ধে শিক্ষক ও গবেষকদের অধিকাংশেরই যথেষ্ট ক্ষোভ থাকলেও তাঁরা কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সংঘবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে পারেন নি। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা পদমর্য্যাদার দিক দিয়ে উঁচুতে রয়েছেন তাঁদে কেউ কেউ সরাসরি প্রশাসকগোষ্ঠীর অনুগ্রহভাজন ও অনেকের কাছেই আবার এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করার থেকে মোটা বেতন ও প্রতিপত্তি অনেক বেশী কাম্য। পদমর্য্যাদার দিক দিয়ে যে সব শিক্ষক নিম্নতর স্তরে রয়েছেন তাঁরা তুলনামূলকভাবে আরও সৎ ও সাহসী এবং এঁরা অনেকক্ষেত্রেই প্রতিবাদের স্বর তোলেন। কিন্তু এঁদের আর্থিক ও অন্যান্য নানা বিষয়ে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা থাকার দরুণ এঁরা মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। গবেষকদের মধ্যে অনেকেরই ক্ষোভ প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও গবেষণা সম্পর্কে তাঁদের ভ্রান্ত মোহ, আর্থিক ও চাকুরিগত নিরাপত্তার একান্ত অভাব এবং 'ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের আস্থাভাজন না হলে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা নেই'; এইসব মিলিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁদের ক্ষোভ মনের মধ্যেই থেকে যায়। ওপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ায় সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানীকে চিরজীবন অখ্যাতি ও দারিদ্র্যের মাঝে কাটাতে হয়েছে, এমন নজীর ভারতবর্ষে বিরল নয়। এর ফলে অনেক সময়ই দেখা যায় যে তরুণ গবেষককে এমনকি তাঁর তত্ত্বাবধানকারী শিক্ষকেরও ব্যক্তিগত দাসত্ব স্বীকার করে চলতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই গবেষক কি ধরণের বন্ধুবান্ধবের সাথে মেলামেশা করবেন, তিনি ইন্‌ষ্টিট্যুটের সমস্যাবলীর ওপর আয়োজিত কোন আলোচনাচক্রে উপস্থিত থাকবেন কি থাকবেন না, এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপারও শিক্ষকের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়।

অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষক ও গবেষকদের মধ্যে, সংখ্যালঘু হলেও, একটি অংশ রয়েছেন যাঁদের 'রূঢ় বাস্তবতা'র মুখোমুখী হওয়ার মনোভাব রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষক ও গবেষকরাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করছেন যে 'বিজ্ঞানচর্চার' নামে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে তাঁরা বিজ্ঞানের সেবা ত করছেনই না, উপরন্তু যাঁরা বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার কাজে ব্যবহার করে, তাদেরই স্বার্থরক্ষা করে যাচ্ছেন। এঁদের দৃষ্টির প্রসারতা ক্রমশঃ বাড়ছে ও তাঁরা ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন যে এতদিন তাঁরা বিজ্ঞানচর্চাকে যে ভাবে, দেশকালের অতীত বিমূর্ত জ্ঞানের সাধনা হিসাবে দেখে এসেছিলেন, তা বাস্তবে তাঁদের নিজের দেশের জনসাধারণের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাঁরা মূলতঃ বিদেশী বিজ্ঞানীদের তল্পিবাহকের ভূমিকা পালন করছেন।

এস. আই. এন. পি'র প্রশাসকচক্রের সঙ্গে শিক্ষক ও গবেষকদের একটা বড় অংশের যে বিরোধের দিকটা ওপরে তুলে ধরা হলো তা কিন্তু এখানকার সমগ্র চিত্রের একটা অংশ মাত্র। শিক্ষক ও গবেষক ছাড়া এখানে ওপরে বর্ণিত আরও যে সব কর্মী রয়েছেন, বিশেষতঃ, তথাকথিত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা, গবেষণার কাজে, এবং সাধারণভাবে এস. আই. এন. পি'র সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এঁদের সকলের সাথেই উপরোক্ত প্রশাসকচক্রের বিরোধ বর্তমান। বছরের পর বছর এঁদের সামান্য মাহিনায় দিন কাটাতে হয়। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের বেতন মাসে পাঁচ টাকা কি দশ টাকা বাড়ানোর সমস্ত প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন চালিয়েও যখন কর্মীরা বিফল হন তখন দেখা যায় প্রশাসকচক্রের সদস্যদের অথবা তাঁদের অনুগ্রহভাজন লোকেদের বেতন মাসিক দুশ' তিনশ' এমনকি পাঁচশ' টাকা পর্য্যন্ত বেড়ে চলেছে। সামান্যতম কারণেই এইসব কর্মীদের ওপর চার্জশীট, শো-কজ নোটিশ ইত্যাদি আসে। এমনকি চাকরী ছাঁটাইও হয়। কর্মীদের তরফ থেকে সামান্য প্রতিবাদ হলেই, নানা কায়দায় তাঁদের ওপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই চতুর্থশ্রেণীর কর্মী ও অস্থায়ী কর্মীদের ওপর এই ধরণের অত্যাচার বেশী হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে কেবল প্রশাসকদের সঙ্গে ইন্স্টিট্যুটের বাদবাকী অধিকাংশ কর্মীর বিরোধই সব নয়, যদিও এটাই মুখ্য দিক। ইন্স্টিট্যুটের কর্মীদের মধ্যেও ওপরের স্তরের সঙ্গে নিচের স্তরের বিরোধ রয়েছে। শিক্ষকদের সঙ্গে গবেষকদের সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে, যদিও অধিকাংশ শিক্ষকের সঙ্গেই (বিশেষতঃ যাঁরা পদ-মর্য্যাদার দিক দিয়ে উচ্চতম ধাপে নন) গবেষকদের সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক। এখানে বিশেষ করে বলা প্রয়োজন যে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের প্রতি অন্যান্য সকল শ্রেণীর কর্মীদের অধিকাংশের মনোভাবই অত্যন্ত অবহেলাকর ও আপত্তিজনক। অনেকেই এঁদের ভৃত্যের মতো ব্যবহার করে ব্যক্তিগত অনেক কাজকর্মও করিয়ে নেন (এ ব্যাপারেও উচ্চপদস্থ শিক্ষকেরাই অগ্রণী)।

স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষক-গবেষক ও সাধারণ কর্মীদের মূল বিরোধ থাকার ফলে একাধিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীরা মিলিত হয়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ তুলনামূলকভাবে গৌণ ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রশাসকচক্রের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ইন্স্টিট্যুটের এক মেডিক্যাল অফিসার (এম. ও)-এর যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর কর্মীর সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের কথা বলা চলে। তবে নিজেদের নানাবিধ দুর্বলতার ফলে ও নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাবের অভাবে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা সত্বেও, বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ ও অবর্ণনীয় অসুবিধা সহ্য করা সত্বেও, তাঁরা ইন্স্টিট্যুটের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে ঐ যথেচ্ছাচারী এম. ও-এর বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়াতে পারেন নি। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে এঁরা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে পারবেন।

একথা সহজেই অনুমেয় যে উপরে বর্ণিত পরিবেশ আর যাই হোক, যথার্থ গবেষণার অনুকূল নয় এবং ইন্স্টিট্যুটের অভ্যন্তরের এই পরিবেশের সঙ্গে বৃহত্তর পটভূমিকায় দেশের বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ যুক্ত হয়ে গবেষণাকে প্রহসনে পরিণত করেছে। বস্তুতঃপক্ষে, সময়ের সাথে সাথে ক্রমশঃ বেশী সংখ্যক গবেষক এক ধরনের ক্ষোভ ও হতাশার সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে তাঁদের গবেষণার কাজ নেহাতই উদ্দেশ্যবিহীন ও গতানুগতিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী গবেষকদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে তা প্রয়োগ করা অথবা বিদেশী গবেষকদের পদ্ধতি বা ফলাফলের সামান্য রদবদল করার মধ্যেই গবেষণাকার্য্য সীমিত থাকে। গবেষণার বিষয় নির্বাচন এবং কোন বিষয়ের অন্তর্গত কোন বিশেষ সমস্যার ওপর গবেষণার কাজ চালানো হবে, আর চালানো হলেও তা কোন পদ্ধতিতে চালানো হবে, এ সবই নির্ভর করে বিদেশের গবেষকরা কোন বিষয়ে এবং কোন সমস্যার ওপর মনোনিবেশ করছেন তার ওপর। এছাড়া গবেষক যে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং পছন্দ-অপছন্দের কিছু ভূমিকা থাকে। এখন বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের মৌলিক কাজ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়ে এখানকার গবেষকদের হাতে পৌঁছতে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রায়ই একজন গবেষককে দারুন দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হয় যে তাঁর কাজ ইতিমধ্যেই বিদেশে কেউ করে ফেলেছেন কি না! (যাঁরা লুই ক্যারলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যালিস থ্রু দি লুকিং গ্লাস' পড়েছেন তাঁরা স্মরণ করুন সেই জায়গাটা যেখানে ছোট মেয়ে অ্যালিসকে প্রাণপাত করে দৌড়তে হচ্ছে কারণ তার পায়ের তলার রাস্তাটাই তীব্র বেগে ছুটে চলেছে—'এখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে দুরন্ত বেগে ছুটতে হয়')। পরনির্ভর গবেষণার এর থেকে করুণ চিত্র কি আর কিছু থাকতে পারে? অবশ্য এর ব্যতিক্রম নেই একথা বলা চলে না, তবে সেক্ষেত্রেও এটা বলতেই হবে যে সত্যকার দেশের স্বার্থে গবেষণার উদাহরণ খুবই বিরল, বিশেষতঃ যা ইন্স্টিট্যুটে নেই বললেই চলে। এর মূল কারণ অবশ্যই এই ইন্স্টিট্যুটের গবেষণা নীতি ও পরিচালন-ব্যবস্থা, যেগুলো আবার নির্দ্ধারিত হচ্ছে সরকারী নীতির দ্বারা। গবেষকদের অধিকাংশই এই নীতির শিকার হন, যদিও তাঁদের নিজস্ব দায়িত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। এই ইন্স্টিট্যুটের আমলা-তান্ত্রিক পরিচালনার জন্য যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে ও যার পটভূমিকা কিছুটা ওপরে তুলে ধরা হয়েছে তার জন্য স্বাভাবিকভাবেই গবেষকদের গবেষণার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসছে। ইন্স্টিট্যুটের বিভিন্ন বিভাগগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বা আদান-প্রদানেরও কোন ব্যবস্থা নেই। এর ফলে গবেষণার কাজে গবেষকরা একান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করেন এবং সম্ভাব্য অসাফল্যের জন্য তাঁদের

বিষণ্ণতা ও হতাশা অনেকক্ষেত্রেই স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়ে যায়। এর উপর তাঁদের চারপাশের সামাজিক সংকট, পরিবারের আর্থিক অনটন (অনেক গবেষকের ক্ষেত্রেই যা কমবেশী থাকে), চাকুরীর দুশ্চিন্তা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক সজীবতা ও স্থৈর্য্য নষ্ট করে দেয়।

সুখের কথা এই যে বহু বিজ্ঞানী, গবেষক ও সাধারণ মানুষ সচেতন হচ্ছেন যে এই পরিবেশে সেই গবেষণাই সম্ভব যা গবেষককে স্বদেশের বাস্তব প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন করে রাখে, যা গবেষককে সাধারণ মানুষের শত্রুদের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে বাধ্য করে এবং ক্রমশঃ এই পরিবেশ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা উপলব্ধি করছেন।



# বিদ্যুৎ সংকট ঃ দায়ী কে ?

**সুনির্মল সিংহ**

● [ বহুবিধ সমস্যা-জর্জরিত ভারতে 'গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া'র মতো যুক্ত হয়েছে আর একটি সমস্যা—বিদ্যুৎ সংকট। এর ফলে সহর-নগরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই যে শুধু ব্যাহত হচ্ছে তা নয়, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শত শত কলকারখানা, ছাঁটাইয়ের খড়্গ নেমে আসছে আর জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার অনিশ্চিত প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন হাজার হাজার শ্রমিক, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘটছে প্রচণ্ড বিপর্যয়, মুখ থুবড়ে পড়েছে রুগ্ন জাতীয় অর্থনীতি।

এটা কোন 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' নয়। যে কোন রোগের মতই, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর পেছনেও বাস্তব কারণ থাকে। যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণমুখী অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এই আপাতঃ অদৃশ্য কারণগুলো দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিটি দেশপ্রেমিকেরই উচিৎ তাঁর দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে সেগুলোকে বোঝা, তার কারণগুলোকে জানা এবং প্রতিকারের পথ খোঁজা। এই কাজের ভেতর দিয়েই আমরা আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির উপযুক্ত সন্তান হয়ে গড়ে উঠতে পারি।

বর্তমান রচনাটি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত একটি সাম্প্রতিক সমস্যা—বিদ্যুৎ সংকটের ওপর লেখা। মতামতের লেখকের দায়িত্ব। আমরা পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে আমাদের দেশের বিভিন্ন মূল সমস্যাগুলোর ওপর লেখা আহ্বান করছি। মতামত যাই হোক না কেন, রচনা তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী হলেই তা প্রকাশ করা হবে।

—সঃ মঃ বীঃ ] ●

প্রায় পঁচিশ বছর ধরে আমাদের 'জাতীয় নেতারা' **অদূর ভবিষ্যতের সুখের দিনগুলোর জন্য** জনসাধারণকে বর্তমানে কিছু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করার কথা বলে আসছেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, এটি 'আজ নগদ কাল ধারে'র মতই একটি ধাঁধা। জনসাধারণ শুধু কষ্ট ও ত্যাগ নয়, অনাহারে শরীর পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু সেই সোনালি দিনটি আর আসছে না—মরীচিকার মত ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে—যত দিন যাচ্ছে, দুঃস্থ অবস্থা দুঃস্থতর হচ্ছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তীব্র সংকটে পরিণত হচ্ছে। এই সংকট আজ কোথায় নেই? জীবনধারণের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব সর্বত্র; মহারাষ্ট্র, বিহার ইত্যাদি জায়গাতে তা এমনই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে তা জনতাকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থনীতির রুগ্নতা ও দুর্বলতাই প্রকাশ করছে, আবার তীব্র বেকারী অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তুলেছে। এই সমস্ত সমস্যার তালিকায় সাম্প্রতিককালে আর একটি নতুন সমস্যা যুক্ত হয়েছে—বিদ্যুৎ সংকট।

দেশের প্রায় সমস্ত জায়গাতেই বিদ্যুৎ সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সহরের লোকেরা নানাভাবে এই অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন। গ্রামের লোকেরা এদিক থেকে ভাগ্যবান; কারণ 'মাথা নেই সুতরাং মাথা-ব্যথা ও নেই'। কিন্তু এর সবচেয়ে মারাত্মক

দিকটা হল এই যে, যে দেশে বেকার সমস্যা এমনিতেই ভয়াবহ, সেখানে এই সংকট নতুন করে হাজার হাজার লোককে ছাঁটাইয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে বেকারী ও দুরবস্থার বন্যা নিয়ে আসছে এবং যে দেশে উৎপাদন এমনিতেই জীবনীশক্তিহীন, সেখানে উৎপাদন ব্যাহত করে অচলাবস্থায় নিয়ে গেছে। আর সবথেকে হাস্যকর ও করুণ ব্যাপারটি হলো এই যে এ'সমস্ত বিপর্যয় ঘটছে এমন একটা সময়ে যখন সরকারের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের' জন্য চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে এবং পঞ্চমটি আরম্ভ হতে যাচ্ছে।

অবশ্য নিজের দায়িত্ব এড়াবার জন্য সরকার সবরকম শিখণ্ডী খাড়া করে ফেলছেন। আরো পাঁচটা সমস্যার মত দেশব্যাপী অনাবৃষ্টিকেই তাঁরা এর জন্য দায়ী করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি এমনই খেলো যে বড় বড় সংবাদপত্রগুলি, যাদের সঙ্গে সরকারের যথেষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এবং নানা ব্যাপারে যারা সরকারের প্রচারপত্রের কাজ করে থাকে, তারাও এই অজুহাতটিকে সরাসরি সমর্থন করতে সংকোচবোধ করছে।

জল-বিদ্যুৎ, তাপ-বিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক-বিদ্যুৎ—এই তিন ভাবেই আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন হলেও, প্রত্যেকটির গুরুত্ব সমান নয়। পারমাণবিক-বিদ্যুতের উৎপাদন এখনও কম, জল-বিদ্যুতের পরিমাণও অপেক্ষাকৃতভাবে অল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের বেশির ভাগ অংশটাই (প্রায় ৬০ ভাগ) তাপ-বিদ্যুৎ থেকে এসে থাকে। জল এবং পারমাণবিক-বিদ্যুতের কেন্দ্রগুলি মূলতঃ উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে আছে। সংকট ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকেই শুরু হয়। বাঁধগুলিতে জলের পরিমাণ কমে যাওয়াতে জল-বিদ্যুতের উৎপাদন খুবই কমিয়ে দেওয়া হয়। পারমাণবিক-বিদ্যুতের উৎপাদন প্রথম থেকেই অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু যে কারণটির ফলে এই সংকটটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং এরকম একটি তীব্র আকার ধারণ করল, তা'হলো একটির পর একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে গত সাত-আট মাসে কোথাও না কোথাও তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়নি—এমন দিন খুবই কম গেছে। না হয় মেনে নেওয়া গেল, যে জল-বিদ্যুৎ বৃষ্টিপাতের ওপর কিছুটা নির্ভরশীল, সুতরাং অনাবৃষ্টির ফলে জলবিদ্যুৎ-সংকট হতে পারে। (যদিও জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বেশী হওয়ার সম্ভাবনাকে বিবেচনা করেই এগুলো তৈরী করা হয়ে থাকে)। কিন্তু তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই বিপর্যয়ের জন্য তো এই জাতীয় কোন 'প্রাকৃতিক কারণ'কে দায়ী করা যাবে না। তা'হলে এর কারণটি কি?

বিভিন্ন পত্রিকার মতে যন্ত্রপাতির উপযুক্ত মানের অভাব এবং এই সমস্ত যন্ত্রপাতির উপর মাল-মসলার ক্ষতিকর প্রভাবই হলো এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর রিপোর্টারের মতে :

"পশ্চিমবাংলাতে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সবকটি কেন্দ্রে বর্তমান গোলমাল শুরু হয়েছে বয়লার (boiler) থেকেই। বাষ্পবাহী নলগুলিতে ফুটো হয়ে যাওয়া এবং পাখাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হল এ সমস্ত কেন্দ্রগুলির ব্যর্থতার সাধারণ কারণ।

"বেশী পরিমাণ ছাই (ash)-যুক্ত কয়লার ব্যবহারের ফলেই 'বয়লার'গুলি এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেহেতু ভারতে উঁচুমানের কয়লা যথেষ্ট নেই তাই কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রক নীচুমানের কয়লা (যাতে ছাইয়ের পরিমাণ বেশী) ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পূর্বাঞ্চলের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে ব্যবহৃত কয়লাতে ছাই-এর পরিমাণ শতকরা ২৪ থেকে ২৮ ভাগ পর্যন্ত থাকে, এমনকি তা মাঝে মাঝে শতকরা ৪৫ ভাগেও গিয়ে পৌছায়। কিন্তু এই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে যে সমস্ত দেশ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য (U. K.) এবং জাপান, সেখানে এমন কয়লা ব্যবহার করা হয় যাতে ক্ষতিকর ছাইয়ের পরিমাণ অনেক কম। বেশীর ভাগ দেশগুলিতেই ব্যবহৃত কয়লাতে ছাইয়ের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগের বেশী হয় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তা শতকরা ১২ ভাগ পেরোয় না।

কাজেই, বাইরের থেকে আমদানী করা এই সমস্ত যন্ত্রপাতিতে এমন ধরনের কয়লা ব্যবহার করা হয়েছে যা 'বয়লার' চালানোর পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত; এতো বেশী অনুপযুক্ত যে পশ্চিমবাংলার ওয়ারিয়াতে ডি. ভি. সি-র জন্য পশ্চিম জার্মানী ৬০ মেগা-ওয়াট্-এর যে ইউনিটগুলি বসিয়েছে, সেগুলি প্রায় অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এমন নয় যে এটা ভারতের শুধুমাত্র একটি অঞ্চলেই ঘটেছে। দক্ষিণ ভারতীয় বাষ্প ও জ্বালানী ব্যবহারকারী সমিতি আয়োজিত, জ্বালানী ও শক্তির উপর দুদিনব্যাপী এক জাতীয় আলোচনা চক্রে কাথাগুডেন (Kathaguden) তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এস. আল্লা বক্স্ বলেছেন, "অনেক তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রেই গোলমালের পিছনে রয়েছে ভুল পরিকল্পনা। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, এই সমস্ত যন্ত্রপাতির যাঁরা নক্সা বানিয়েছেন (Designers) তাঁরা দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যন্ত্রপাতি এমনভাবে তৈরী করা দরকার যাতে সেগুলি সহজে রক্ষা করা যায়। এর জন্য দরকার সেই সমস্ত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা, যাঁরা এই সমস্ত যন্ত্রপাতি চালান ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। কিন্তু এটা করা হয়নি। নীচু মানের কয়লাও যন্ত্রপাতির ক্ষতি করছে।" তিনি আরও বললেন যে যদি এই সমস্ত তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের সন্তানের মত ভেবে এগুলির প্রতি লক্ষ্য না দেন তাহলে আশানুরূপ উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়।

[ 'ইকনমিক টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'—২৭।২।৭৩ ]

কাজেই মূল সমস্যাটা হ'ল—বিদেশের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে

ভারতীয় মালমশলা খাপ খাচ্ছে না। কিন্তু এর জন্য দায়ী করা যাবে কাকে? যদি পোষাক কারও গায়ে ঠিকমত খাপ না খায়, তাহলে তার জন্য শরীরটাকে দোষ দেওয়া যায় না। দোষ সেই দর্জির, যে পোষাকটা তৈরী করেছে। প্রতিটি দেশের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। দেশীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন হলো এই বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করে সেইমত পরিকল্পনা তৈরী করা। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রথম থেকেই ঘটনাটা ঘটেছে অন্যভাবে। ১৯৪৭-এর আগে অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ পুঁজির লাভের দিকটাই ছিল মুখ্য। কাজেই এই লাভের প্রয়োজনেই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে; অর্থনীতির সুষম ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়োজনে নয়। ১৯৪৭ সালের পরেও অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নি, কারণ এর পরেও বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, তার হার ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। ('বীক্ষণে'র পঞ্চম সংকলনের 'পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ' দ্রষ্টব্য)। এখানে তেলের পরেই বিদেশী মূলধন যেখানে সবচেয়ে বেশী নিয়োজিত হয়েছে, তা'হল ম্যানুফ্যাক্চারিং ইণ্ডাষ্ট্রী, যার অন্যতম হল বিদ্যুৎ উৎপাদন। পরিবর্তন যেটা হয়েছে সেটা হ'ল ব্রিটিশ পুঁজির জায়গায় আমেরিকান পুঁজির আধিপত্য। ১৯৭০-৭১ সালের হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশে যে ১৬-মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে তার এক তৃতীয়াংশই হ'লো আমেরিকান সাহায্যে স্থাপিত ৩০টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অবদান। ৪ মিলিয়ন কিলোওয়াটের মত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ২০টি সংস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এসেছে মূলতঃ আমেরিকা থেকে। বাকী ১০টি সংস্থার ক্ষেত্রে পুঁজির যোগান এসেছে আমেরিকার গম বিক্রির টাকা থেকে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির ক্ষেত্রেও যন্ত্রপাতিগুলি বড় বড় আমেরিকান কোম্পানির কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেনা হয়েছে। শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকান সাহায্যের পরিমাণ ৪২২.৫ মিলিয়ন ডলার এবং গম বিক্রির সঞ্চিত অর্থ-থেকে দেওয়া ৩৪৯ কোটি টাকা। পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটু দেরীতে ঢুকলেও, সোভিয়েত রাশিয়া এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নিয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১/৫ ভাগ আজ তাদের অর্থে নিয়ন্ত্রিত।

বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, তা সে আমেরিকারই হোক আর রাশিয়ারই হোক, পুঁজির লাভটাই মুখ্য। 'International currency and credit relations' নামক গ্রন্থে রাশিয়ান লেখক এ. এম. স্মির্নভ ১৯৬৩ সালে এই কথাটি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন—"পশ্চাদপদ দেশগুলিকে ধার বা সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারটি সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে কোন দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়, বাণিজ্যিক স্বার্থে এসব সাহায্য দেওয়া হয়।

তাই বিদেশী কোম্পানিগুলি যন্ত্রপাতি বিক্রি করার সময় স্বাভাবিকভাবেই ভারতের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতিগুলি তৈরী কিনা, তা না দেখে, বরং নিজেদের মুনাফাটা যাতে বেশী করে তোলা যায়, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখে। আর তাই ভারতের অর্থনীতির পক্ষে এর প্রতিক্রিয়াটাও হয়েছে মারাত্মক। এই যন্ত্রপাতিগুলি যে শুধু ভারতের প্রয়োজনের উপযোগী হয় না তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত নীচুমানের জিনিসও অত্যন্ত উঁচুদামে বিক্রি করা হয়। চোখের সামনে একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত হ'ল তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুতের কারখানাটি। আমেরিকান 'সাহায্যে', প্রচুর অর্থব্যয়ে তৈরী ভারতের এই শ্বেতহস্তীটি জন্মের সময় থেকেই এমন রুগ্ন যে তাতে দু'পাঁচদিন পরপরই বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রেও ফলটা বিশেষ উজ্জ্বল নয়। টাটা গ্রুপের বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ আগরওয়ালা বলেন, "যেখানে ভারতের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি গড়ে প্রতি কিলোওয়াট উৎপাদনী ক্ষমতা থেকে প্রতি বছরে ৩,৫০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, সেখানে ঐ একই উৎপাদন ক্ষমতার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর তাপ কেন্দ্রগুলি প্রতি বছর যথাক্রমে ৪,৭০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা এবং ৫,৬০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে।" [ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া ]

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ত্রুটিকেই এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজতে গেলে এটাই কি বেরিয়ে আসে না, যে বিদেশী পুঁজি এবং বিদেশী কারিগরী-সহায়তার উপর নির্ভরতা থেকেই এই ত্রুটির জন্ম হয়েছে? দামী এবং আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানী করা সহজ, কিন্তু তার ফলেই একটি দেশের শ্রমশক্তির কারিগরীজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় না। বরং আশীর্বাদের পরিবর্তে অনেক সময়ই তা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

একটি আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির বিকাশে যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং নিরলস পরিশ্রম জড়িত থাকে, শেখার যে প্রবল আগ্রহ সঞ্চারিত হয় এবং তারই ফলে শ্রম-শক্তি ধীরে ধীরে যে পরিমাণ উপযোগী কারিগরীজ্ঞান অর্জন করে তা বৈদেশিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী অর্থনীতিতে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য। 'উন্নতির প্রদর্শনী' হিসাবে, বাইরের থেকে আমদানী করা এই সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি চালনার ক্ষেত্রে একটা ভাসা-ভাসা ট্রেনিং দেওয়াতে, এগুলিকে নষ্ট করার পথই প্রশস্ত হয়। এটা সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে সামরিক ক্ষেত্রে। এশিয়া-আফ্রিকার অত্যন্ত পশ্চাদপদ দেশগুলিতে, সাজানো অলঙ্কারের মতো, যে সব আধুনিক জেট-বিমান, রণতরী ইত্যাদি সমরোপকরণ জড়ো করা হয়েছে, সেগুলি পরিচালনা করার উপযুক্ত লোকও সেই

সমস্ত দেশে পাওয়া যায় না ; ফলে অনেকক্ষেত্রেই সেগুলো অকেজো হয়ে পড়ে থাকে।

আত্মনির্ভরতার অভাব এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরতার ফলে একটি জাতিকে কি বিরাট মূল্য দিতে হয় এবং তা কি শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে, বর্তমান সংকটগুলিই তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য আমাদের শাসকেরা বিদেশী সহায়তা-পুষ্ট বড় বড় 'পরিকল্পনা', 'উদ্যোগ' ইত্যাদি অব্যাহত রাখার 'ঐতিহ্য' রক্ষা করে চলবেন। তাঁরা মাঝে মাঝে 'আত্মনির্ভরতার' কথাও বলতে পারেন। কিন্তু সেটা কেবল কথার কথা।

ইতিমধ্যে শ্রমিক এবং চাকুরীজীবী আরও বেশী বেশী সংখ্যায় ছাঁটাই হবেন; তাঁদের পরিবারবর্গ অনাহারে থাকবেন, জনসাধারণ নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাবেন, উৎপাদন ক্রমশঃই কমে আসবে এবং জাতি চূড়ান্ত দুর্দশার দিকে এগুবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? এতে শাসকগোষ্ঠীর শিরঃপীড়ার কারণ ঘটে না।

বিদেশী পুঁজির স্বার্থরক্ষায় এদেশের সরকার, উন্নত দেশগুলিও বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে এমন ব্যয়বহুল—Geo-Thermal Plant, M.H.D Generators ইত্যাদি বিভিন্ন রঙচঙে সরকারী পরিকল্পনার নামান্তরালে কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের টাকা নিয়ে, তার ছিনিমিনি খেলা ততদিনই অব্যাহত চালিয়ে যাবে, যতদিন না প্রতিটি দেশ-প্রেমিক এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন।

## : পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি :

**প্রিয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা**

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও সংকটের চরিত্র, তার কারণ ও তার সমাধানের সম্ভাব্য পথ সম্পর্কে আপনাদের মতামত পাঠান। এ ব্যাপারে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নয় ; শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত বা শিক্ষান্তে কর্মপ্রার্থী তরুণ,—সবার কাছ থেকেই আমরা রচনার জন্য আবেদন করেছি। এ ব্যাপারে সুস্থ বিতর্কের জন্য 'আলোচনা মঞ্চ' এই বিশেষ বিভাগটি পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আমরা রাখতে চাই। 'আলোচনা মঞ্চে' প্রকাশের ব্যাপারে রচনার তথ্যনিষ্ঠতা ও আপাতঃ যুক্তিগ্রাহ্যতাই একমাত্র বিবেচ্য হবে, রচনাকারীর সাথে 'বীক্ষণে'র সম্পাদকমণ্ডলীর মতৈক্য নয়। —সঃ মঃ বীঃ

ধারাবাহিক উপন্যাস

# শৈশব

শংকর বসু

**পূর্বকথা :** অন্ন, বেধবার বেসাতি ছেলেমেয়ে দুটোকে ফেলে টাকার ধান্ধায় ছোটে। আর সদু নামের ছেলেটা সূর্যাস্ত দেখে জলায় দাঁড়িয়ে। রক্তের মতো সূর্য দেখতে দেখতে ছেলেটার কুটি বোনের কথা মনে হয়। মাত্র দেড় বছর বয়সে মেয়েটা মুখে রক্ত তুলে মরেছে। অন্ন ফেরার আগে চন্নুর মা, চন্নু সকলের সাধাসাধিতেও ছেলেটা দাঁতে রুটি কাটেনি। অন্ন ফিরল। চোরের মতো কাপড়ের তলায় লুকিয়ে আটা ধার করে অন্ন। অবোধ সন্তানের জন্য। সদুকে ইস্কুলে দেওয়ার কথা হয়, কানাই মাষ্টারের ইস্কুল। ও যেতে চায় না। অথচ অন্ন ইস্কুলে দেওয়ার ক্ষমতা নেই অন্নর। ওরা যে গরীব। অন্ন বলে, সদুর বাবা নেই তাই গরীব। অথচ সদু দেখেছে পাইপ পাড়ার ছেলেটার বাবা আছে, তবু ওরা গরীব। ভীষণ গরীব।

সরি কাঠগোলা থেকে ফুলকি আনে। লাইন দিয়ে মিলিক পাউডার আনে। তাছাড়া শাকলতাপাতার তো কথাই নেই। তবু সরি কি এক অজ্ঞাত কারণে অবহেলিতা। অন্নর কাছে সরি শুধু মেয়েমানুষ। মানুষ নয়। সদু চিৎকার করে পড়ে। চিৎকার করে পড়লে মা খুশী হয়। পুজোর বারতা নিয়ে ঢাক বাজে। ছেলেটা শব্দ শুনে ছোটে। কানাই মাষ্টারের গোল্লাগোল্লা চোখ দেখে ফিরে আসে। কুলগাছে হেলান দিয়ে চোখের মণিতে রেললাইন গেঁথে নেয়। ইঞ্জিন দেখে। ইঞ্জিন দেখলেই বাবার কথা মনে হয়। আর স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবার কথা মনে হলেই কেমন একটা গর্ব জাগে বুকে। সদুর ১৫ই আগষ্টের কথা মনে হয়। শাঁখ বেজেছিল ১৫ই আগষ্ট। আর বিউগল। ছেলেটা যুদ্ধের তরাস্ খেয়েছিল। রায়টের সময় গরীব দোকানদার রসুলকে কারা খুন করল। সদু কিছু ভোলেনি। দাগের পর দাগ পড়েছে মনে। জমিদারের সাথে দাঙ্গা করে মানুষজন খুঁটা পাড়ল। রনর ঠাকুমা 'পদ্ম পুরাণ' পড়ত লম্প'র পলতে উস্কে। আর সদু বেহুলার দুঃখে কাতর। ··· ভাইস্যা যায় রে ভাইস্যা যায়। রনদের বাড়ীতে গিয়ে চাল ভাজা খেতে খেতে শুনল, রন কারখানায় ঢুকবে। যন্তরপাতির সাথে যুঝে রনর বাবার হাতে কড়া। রনর হাতেও একদিন কড়া পড়বে। হঠাৎ রনর বাবা ফস করে বলে ফেলল, সদুর বাবা মারা গেছে। আর কথাটা শোনামাত্তর সদু পাগল হল। কষ্টে, যন্ত্রণায়।

॥ ৩ ॥

প্যাট হৈল জলস্তর
তর জইন্য হই দ্যাশান্তর·······

দুঃখের ফিকিরে, বাঁচনের সাত ধান্ধায়, শরীল আউল হয়। পাথইরা মনটাও মাঝে মাঝে আউলবাউল হয়। আর তখন অন্নর 'আইড় মাছের মতো মুখে ছড়া ফোটে। দুঃখের ছড়া। চন্নুর মাকে সাক্ষী মানে—'বুঝলেননি দিদি···দ্যাশ যে দ্যাশ থেইখানে মাইনষের পরথম নিশ্বাস, নাইচা কুঁইদা সূরজাইর বরতো কইরা···এমন যে দ্যাশ····প্যাটের জালায় মাইনষে সেই চোদ্দ পুরষের ভিটা ছাইড়া অজানা অচেনা জায়গায় ছোটে···।

অন্নর ফিরতে দেরী হলেই সদুর আচমকা ছড়াটা মনে পড়ে যায়। আর 'দ্যাশান্ত'র কথাটা বুকের ভেতর শীতকাঁটার মতো গজায়। যেন অন্ন পেটের ধান্ধায় কোথায় কোন বিপজ্জনক রাজ্যে গ্যাছে। ফেরার কোন আশাভরসা নেই। তিনটে জীবের দানা জোটাতে অন্নর প্রাণপক্ষী উড়াল দিতে চায়। অথচ সদুর মা ছেলেমেয়ে দুটোর মুখ চেয়ে, ভবিষ্যতের ক্ষীণ একটা আশা বুকে নিয়ে, সন্ধ্যে অব্দি প্ল্যাষ্টিক কারখানায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। দানার ব্যবস্থা না করতে পারলে যেন কিছুতেই ফিরবে না। কেমন একটা আত্মহত্যার জেদ। শরীর পাত করে দিচ্ছে। সদু সব সাফসুফ বুঝতে পারে না। কেবল অন্নর ছড়াটা মনে পড়ে। থেকে, থেকেই। আর ছেলেটা ভাবে : আমার মার এ্যাতো জ্বালা, কৈ উকিল ঠাকুমার তো কষ্ট নেই। শান্তি পল্লীর সবাই কি বড়লোক! আর হাডডি্সার হাভাতি ক্যাওড়া পট্টির

খোঁচ পেট ভরে না। কেন? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি করে যে এমন একটা উদ্ভট কাণ্ড ঘটে গ্যালো! আর মানুষগুলোও বোকার হদ্দ, কেউ জিজ্ঞেসও করে না—কেন? এসব কি? ইয়ার্কি না?

ফ্যাল ফ্যাল করে সন্তু বাড়ীর সামনের জলার দিকে চেয়ে থাকে। বুকের ভেতর প্রশ্নগুলোর হাত পা গজায়। জীয়ন্ত হয়ে ওঠে। বুকের ভেতর কথাগুলো হেঁটে চলে বেড়ায়। আর ছেলেটার খাসকষ্ট হয়। এই কচি বয়সে সন্তুর চোখ জলার স্যাঁতসেঁতে বিষণ্ন আবহাওয়ায় ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়। অসহ্য ক্লান্তি।

অন্ন আটটা না বাজতে, মাথায় কাপড় টেনে ছোটে। ফেরে সেই বিকেল উতরে। মলিন সূর্যের ক্ষয়া রশ্মি তখন ঠোঁটের কোনে রক্তের ফোঁটার মতো লেগে থাকে। সারা গায়ে টকটক ঘেমো গন্ধ। কপাল জুড়ে ঘাম। প্ল্যাষ্টিক কারখানার গরমিতে শরীরটা অঙ্গার হয়ে গ্যালো। তবু তো মাস গেলে তিরিশটা টাকা আসে। গেল হপ্তায় সরি জ্যাঠামনির কাছে গেছিল। মাসকাবারী বরাদ্দ টাকা পাঁচটার জন্যে। টাকা তো পায়ইনি, উল্টে বুকে দাগা দেওয়া কথা শুনে ফিরে এসেছে। সরি ফিরে এসেছিল আষাঢ়েমেঘের গাম্ভীর্য্য নিয়ে। ভারভার মুখে। কিছুতেই মুখ খুলছিল না। আর অন্ন তত তাগাদা দিচ্ছিল: কিরে ছেমড়ি কবিতো কি হইছে? এ্যাই সরি····। তবু সরি কথা বলতে পারেনি। আষাঢ়ের জলভরা মেঘ মুখে নিয়ে মেয়েটা কথা বলতে পারছিল না। সর্বাঙ্গ অবশ করা এক যন্ত্রণায় মেয়েটার জিভে সাড় নেই। আর অন্ন ক্রমাগতঃ খোঁচাচ্ছিল। শেষে আর সামাল দিতে পারে না: হারামজাদীর জেদ কত····।

সরির মাথার চুল খাবলাখাবলা করে টানতে লাগল। সরি হাঁটুর মধ্যে মুখটা গুঁজে রেখেছিল। ঠায় মার খেল। শেষে ফোঁপাতে লাগল। ফোঁপায় আর জ্যাঠামনির বিত্তান্ত গড়গড়িয়ে এগোয়। সবটা শোনার ধৈর্য্য ছিল না অন্নর। বারান্দায় ঠেস দিয়ে বসে বিলাপ করতে লাগল। টাকার শোকে। খামাখা মেয়েটাকে মারল সেই দুঃখে। আর আজন্মের জ্বালায়।

কাজটা পাওয়ার পর থেকে অন্নর চোয়ালের হাড় যেন আরো জেগে উঠেছে। খোঁচার মতো। প্রথম একটা দিন গুম হয়ে ছিল। যুদ্ধের বাজারে টকী দেখতে গিয়ে গোরা সেপাইর তাড়া খেয়ে কেমন ভয় পেয়েছিল—সেই গল্প চন্নুর মার কাছে কতবার করেছে অন্ন। 'সরির বাবার আমলে যেমন একলা রাস্তায় বাইরাই নাই ত্যামনই এখন ভগমানে কয় খাড়া তরে ত্যাখাই'····এই অব্দি বলেই মাঝপথে অন্ন থেমে যায়। আর, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। সেই মানুষ এখন অবুঝ সন্তানের জন্য, জীবনের জন্য, প্ল্যাষ্টিক কারখানায় কাজ নিয়েছে। পুরো একটা দিন অন্ন মুখ বুজে ছিল। সন্তুর সাথেও কথা বলেনি। লেখা-পড়ার তাগাদা দেয়নি। সেদিন অন্নর চোখ জুড়ে আশমানের শূন্যতা। শূন্যতার আশমান।

চন্নুর দাদু কড়ে আঙুলের ডগা সরষের তেলে চুবিয়ে নাকে টানে। সঁৎ সঁৎ শব্দ হয়। তারপর আঙুলটা নাভিতে ঠেকিয়েই তুলে নেয়। চন্নুর দাদু শীত গ্রীষ্ম বারোমাস তেল মাখে। আগে আগে সন্তু বেবাক অবাক হয়ে যেত। আর তেল জবজবে মানুষটাকে দেখত। দলাই মালাই চড়চাপড়ের শব্দে কেমন পুলক জাগত। এখন নটা বাজলেই টের পায় দাদু তেল মাখছে। কিন্তু পুলক জাগে না। এখন নটা ন বাজতেই দূরের জুটমিলে সাইরেন বাজে। এখন সাইরেনের শব্দ সন্তুকে টানে। প্রথম যেদিন ও সাইরেনের শব্দটা ঠাহর করে, হাঁ হয়ে গেছিল। অন্নর মুখে শুনেছে, সাইরেন মানে যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় নাকি ওর জন্ম হয়েছিল। আর সাইরেনের তীক্ষ্ণ ফলায় ছেলেটা নীল হয়ে গেছিল। তবু যুদ্ধের কথা ওর মনে নেই। অথচ খিদিরপুর ডকে বোমা পড়ার আগে সন্তু জন্মেছে। এবং নিশ্চই ওর নাকে বারুদের ঝাঁঝ লেগেছিল। তবু কিছু মালুম হয় না, সন্তুর এক বর্ণ মনে পড়ে না। জুটমিলের সাইরেনের শব্দে কান খাড়া হয়ে ওঠে। সাইরেনের শব্দে চোখে মুখে উৎকণ্ঠা নিয়ে কাঠগোলা বস্তী আর ক্যাওড়া-পাড়া থেকে দু-চার-দশ জন লাইন পেরিয়ে দূরের মিলের দিকে রুদ্ধ খাসে ছোটে। রণর মা বলে: শ্যামের বাঁশী, একবার ডাক ছাড়লে রাধিকার কুল মান থাকে না। আর রণর বাবা বলে: বিষের বাঁশী। কোনটা যে সত্যি সন্তু বোঝে না। সন্তু কেবল জানে, জুটমিলের সাইরেন। দূরের মিল আর সাইরেন। সাইরেন মানে যুদ্ধ।

সন্তু চন্নুদের ঘরের পেছনে আটচালা মতো টানা বারান্দায় অমনি দাঁড়িয়েছিল। সাইরেনটা কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে থেমে গ্যাছে। এখন কেমন একটা থাম্ ধরে আছে চারপাশ। ভীষণ গম্ভীর। চন্নুর দাদু সদরদরজার পাল্লাটা ঠেলে বাইরে এল। সন্তু দেখল রোজকার মতো দাদু দাঁতনের আগা খানিকটা ভেঙে ছিটিয়ে দিল। বিড়বিড় করল। সন্তুর দিকে চোখ পড়তেই গোঁফচোয়ান-তেল সমেত দাদু হেসে ফেলল। খানিক উসখুস করেই সন্তু দাদুর দিকে এগোল: দাদু!

—কিরে?

—আচ্ছা তুমি দাঁতন করার আগে রোজ রোজ দাঁতন ভেঙ্গে এক ফেলে দাও কেন?

—ও বাবা তাও লক্ষ্য আছে!

—বলোনা।

—রাবনের নাম শুনেছিস?

—হুঁ।

—রাবনের চিতা কোনদিন নেভে না। ব্রাহ্মণমাত্রেই দাঁতন কা ভেঙে দেয় তাতেই নেভে না।

—কেন দেয়?

—রামচন্দ্র যে মন্দোদরীকে বর দিয়েছিল—জন্ম এয়োস্ত্রী হও। তক্ষণ চিতা জলবে, ততক্ষণ মন্দোদরী সধবা।

রোঁয়া রোঁয়া, সাদা, মোটা গোঁফের ডগা সরষের তেলে চিকচিক রতে লাগল। তেলটা চোঁয়াচ্ছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে। চন্নুর াদুর মুখে সরসর করে আঁকাবাঁকা একটা হাসি পিছলে গেল। াতের নীল শিরা টানটান করে দাঁতন ঘষতে লাগল। আর থেকে থকে রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করছিল। সদু্র তত জ্বালা ধরছে। ীব্র দহণ। একটা মানুষকে যুগযুগ ধরে পোড়ানো, পুড়িয়ে তবে ামচন্দ্রের মহত্ব। মানুষের মতো নয়, রামচন্দ্র যেন মানুষ নয়। অথচ বহুলা? দুঃখিনী বেহুলা। সদু ধীরে ধীরে নিজেরই বুকের ভেতর কে যাচ্ছিল। ভাবতে ভাবতে ও যেন কোথায় তলিয়ে যায়!

লম্বা চালার তলায় সদু ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসেছিল। আগে নাকি ই চালার তলায় দুবেলা বিশখানা পাত পড়ত। ক্যাঙালী ভোজন ত। ক্যাওড়াপট্টি থেকে দশ-বিশটা গরীব-দুঃখী এসে পেটের আগুন নভাত। তখন যুদ্ধের বাজার। যুদ্ধের বাজারে চন্নুর দাদুর হাত রম ছিল। অত গর্মি সহ্য করা কঠিন। গরীব দুঃখীদের খানিক বলিয়ে তবে হালকা হত। এত কথা সদু জানত না। দাদুর াথে চন্নুর মার লাগলেই অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। আর মাসে কবার না একবার দু'কাঠি বেজে উঠতই। চন্নুর মার নাকের আগা গড়ার সময় কেমন ফুলে ফুলে ওঠে। আর নাকের আগা ফুলতে খেলেই চন্নুর বাবা কেমন তটস্থ হয়ে থাকত। মানুষটা ম্যাজিক াড়া কিছুই জানেনা। অথচ সদুকে এমন টানে যে যতক্ষণ চন্নুর াবা ঘরে থাকে ছেলেটা ঘুরঘুর করে: কাকাবাবু ঐ আঙুল টার খেলাটা ...।

তখন চন্নুর দাদুর রোজগার বলতে নেই। পুরোন কাঁসুন্দীর াজেই চলছে। এখন আর বারান্দায় পাত পড়ে না। এখন ারান্দাটা ছাগলের নাদিতে ভরে গ্যাছে। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে াজ গুটিয়ে খেঁকিকুত্তা আর বস্তীর ছাগল আস্তানা নেয়। রোয়াকটার কে থ্যাবড়া আঙুল তুলে কি যেন বলছিল চন্নুর দাদু: দু'বেলা শ খানা পাত পড়ত এখানে ...বুঝলি .. হুঁ....। কি বুঝল কে নে, সদুর বিস্ময় বিস্ফার চোখ দাদুর তেল খাওয়া পিছলা মুখে টিকে থাকে। চোখা নাক, ধারালো মুখ, আর বেঁকা শরীরটায় যেন এক রহস্য আছে। গভীর রহস্য। সদু ঠিক ঠাহর করতে ারে না। আবছা আনদাজ্ হয়। আবছা, আবছা। আর সেই স্পষ্ট কুয়াশার জাল ছিঁড়ে রম্ভুলের মৃতদেহ জাগে। ওই মানুষটাই নাইদাকে ডেকে এনে এক হাঁড়ি মিষ্টি খাইয়েছিল, রম্ভুলকে খুন ার পর। কানাইদার হাওয়াই সার্টে তখনও কাঁচা রক্তের দাগ। ষের রক্ত। কেঁচোর মতো কিলবিলে গলার শিরা শিরশির করে ফুলিয়ে খেলিয়ে হাসির বমি উগরে দিচ্ছিল কানাইদা। আর রস-গোল্লা গিলছিল গোগ্রাসে। চন্নুর দাদু গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিল: কর্ম্মে'ন এবং অধিকার মা ফলেষু কদাচন। এখনও চন্নুর দাদু শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ছবি আঁকা ঝুরঝুরে লাল মলাটের গীতা খুলে জোড়াসনে বসে। আর গীতার মলাটের দিকে নজর পড়লেই সদুর রম্ভুলের কথা মনে হয়। রম্ভুলের রক্ত। ফোঁটার মতো ভাসে। রক্তের ভাসান। এক ক্যাওড়াপট্টির গলুর ক্ষেমিপিসি ছাড়া সবাই রম্ভুলের কথা ভুলে গ্যাছে। ক্ষেমিপিসি এখনও বিলাপ করে: রাজায় রাজায় যুদ্ধু হয় উলুখাগড়ার পরাণ যায়....।

আজকাল লতাগাছাও মেলে না। শাকলতাপাতা কিছু না। আগুন লেগেছে। আগুন। আগে এমনতো কতদিন গ্যাছে, কাঁড়া আকঁড়া খুঁদকুড়ো যা হোক চাট্টি ফুটিয়ে, অমুকের গোড়া সেদ্ধ তমুকের ডগা দিয়ে গর্ত বুজিয়েছে। কথাটা অন্নই বলে: গর্ত বুজানো... কোন মতে হইলেই হইল....যেমন ইঞ্জিন চালু রাখার জন্য কয়লা... ত্যামন মাইনষের শরীল....।

তবু লাইনধারের জঙ্গল, ডোবার গা বাঁচানো এক ছিঁটে জলাভূমি হাতড়ে সরি হন্যে হয়। হাত পায়ের পাতা হ্যাতা হয়ে আসে। আজকাল সরির পায়ে, আঙুলের ফাকে বারোমেসে হাজা থিক্‌থিক্ করে। সদু তবু দিদির নাকের ডগে বিনবিনে ঘাম ফুটতে দেখেছে। তখন দিদির চিকন নাকে অদ্ভুত একটা কষ্ট যেন ভাষা পায়। কথা বলে। সাত রাজ্যি টহল দিয়ে এলেই নাকের ডগে ঘাম ফোটে। ক্লান্তির ঘাম। কিছুই যে পাওয়া যায় না। আসলে দিনেরদিন মাটি ছিবড়ে হয়ে যাচ্ছে। না হলে সরির চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। ক্যাওড়াপট্টি, বামুনপাড়া ছাড়িয়ে, টালমাটাল সাঁকো পেরিয়ে সেই ঢাকুরিয়া যাদবপুর লাইনের কচুবন অব্দি সরির ঘোরা আছে। রেফিউজী আর ষ্টেশনের লাগোয়া ফুটপাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা গরীবগুর্বো মানুষজন কচুবন সাফ করে দিয়েছে। আঁটি করে বেঁধে সব্‌জির ট্রেনে শ্যালদা বৈঠকখানা বাজারে চালান দেয় ("আজ-কাল বাবুরাও কচুঘেঁচু খায় অমরেত্ বলে"—সদু এক জনকে তেড়া হাসি জাগিয়ে বলতে শুনেছিল)। দুটো পয়সার জন্যে। এখন কচুগাছাও পাওয়া যায় না। পয়সার জন্য। পেটের জন্য।

সরির চুকচুক্ চোখ তবু থারকোল পাতা খুঁজে বের করে উপড়ে নিয়ে এসেছে। একেবারে গোড়াশুদ্ধু। শিল নোড়ায় ফেলে বাট-ছিল। অন্ন কাজে লাগার পর থেকে দুপুরের রান্না সরিই করে। আর রান্না মানে তো চাট্টি ফোটানো, কিছু একটা সেদ্ধ কিংবা বাটাবুটি। কোন কোনদিন ফিরতি পথে উড়ের দোকান থেকে দু'চার পয়সার ধোকা আনে অন্ন।

এক৷ খাইস না রাক্কুসী !

সরির জলজলে চোখের দিকে চেয়ে অন্ন কথাটা বলল। আর মেয়েটার চোখ টলটল করে। নিঃসাড়ে ঠোঙাটা নামিয়ে রাখে। নাকের বিনবিনে ঘাম ধীরে ধীরে সারামুখে ছড়িয়ে যায়। সারাটা মুখ তখন পায়ের হাজার মতো স্যাঁতা হয়ে যায়। সদু জানে দিদি ঠিক এক খোঁট ভেঙে মুখে দিত। সরি বড্ডো খোকা ভালবাসে। আজ আর ছোঁবে না। তখন ও কেবল দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বুকের ভেতর থেকে উথলে ওঠা একটা বেগ সামলাবে। কান্নার বেগ।

—চাইয়া আছোস কি !

—কই ?

—তর জিব্বা জানি আমি ট্যার পাইনা ?

একটু পরেই সরির শরীরটা আউল হয়। কেমন একটা কাহিল ভাব। তলপেটে কিসের একটা বেদনা জাগে। খাটের ওপর সরি উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে ছটফট করে। অমন সাধের খাওয়া তখন শিঁকেয় ওঠে। সেদিন অন্নরও খাওয়া হয় না। আর সদু কাঠ হয়ে থাকে। কুট্টি বোনের কথা মনে পড়ে যায়। দেড় বছরের মেয়েটা মুখে রক্ত তুলে মরেছে। দিদিও যদি হঠাৎ চলে যায়। নির্মম, নিষ্ঠুর এক যমন। তখন ? তখন সদু কি করবে ?

বেদনাটা ঘণ্টা দেড়েক থাকে। তারপর সরি অকাতরে ঘুম দেয়। যখন ও ঘুম থেকে ওঠে তখন ভীষণ দুর্বল। মরা মাছের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখটা। পা টিপে টিপে হাঁটে। সদুর দিকে একপলক তাকিয়ে সরি চাতালে যায়। আর অন্ন চন্দুর মার সাথে শলা পরামর্শ করে : কি যে করি……। চন্দুর মা এক দীর্ঘ হাই তোলে সদুর ধৈর্য্য চুরচুর করে। যেন ও হাই আর কখনো পড়বে না। কেবল উঠবে, উঠবে। হঠাৎ চন্দুর মার চিনচিনে গলা টিনের চালে ধাক্কা খেয়ে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে : সরির মতো বয়সে আমাগো তো বিয়া হইয়া গ্যাছে।

আর অন্ন ধূয়া তোলে : আমার দিদির বিয়া হইছিল নয় বছরের কালে। এহন হইছে কি একদিন····দিদিতো বাইর দুয়ারে বইসা খ্যালতাছে, এমন সময় জামাই আইসা উপস্থিত। সাড়া পইড়া গ্যালো সাথে সাথে—অ ননী জামাই আইছে, জামাই। যেই না কথা শোনা দিদি পাছার কাপড় খুইলা ঘোমটা দিয়া····।

—সত্য !

—তয় আর কই কি !

—হঃ জন্ম মিত্যু বিয়া বিধাতারে দিয়া····।

টালীগঞ্জ সুলতান আলম ষ্ট্রীটের দুপুর বড়ো নির্জন। বড়ো অলস মন্থর। থেকে থেকেই ঢালাই কারখানার হাতুড়ী সারাটা তল্লাটের বুকে চাপা গুমোট শব্দে আছড়ে পড়ে। পিষতে থাকে। চন্দুর মা পানের বাটা নিয়ে বসেছে। এক ঠ্যাং আড় করে মুড়ে পান সাজছে অন্ন আঙুলের ডগায় চুনটুকু ঝট্ করে দাঁতে ছোঁয়াল। অন্নর মুখে কেমন একটা তরলভাব। রবিবারের আমেজ। রবিবার, আটটা ন বাজতে ছোটা নেই। রবিবার গতরটা বিশ্রাম পায়। প্ল্যাস্টিক কারখানার অদ্ভুত গন্ধ লাগেনা নাকে।

তিনদিন এক নাগাড়ে সরির সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে থাক করে জ্বর ওঠে নামে। ওষুধ পথ্যি ছাড়াই তিনদিনের দিন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল জ্বর ছাড়ল ভোর রাত্তিরে। আর সদু বগলে শ্লেট নিয়ে কানাই মাষ্টারের ইস্কুলে যাওয়ার জন্য সবে তৈরী হচ্ছে, এমন সময় সরি ডাকল। অথচ গলা দিয়ে আওয়াজ সরে না। প্রাণটা যেন গলায় আটকে আছে সদু দেখল তখনও দিদির সরু কপালটুকু জুড়ে বাষ্পের মতো ঘাম কেমন একটা শিথিলভাব। শরীরে যেন বস নেই।

—এক কাজ করবি ভাই !

—কি ?

—ফেরার পথে চাট্টি কাঁকড়া আনতে পারবি ?

—হুঁ।

ঠোঁট উল্টে সদু চলে গ্যালো। এ আবার না পারার কি ! ভারিতো চাট্টি কাঁকড়া ! ক্যাওড়াপট্টির গলু উড়ন্ত বক মারতে পারে, আর সদু চারটে কাঁকড়া ধরতে পারবে না। আজকাল সরির মুখটা দেখলেই সদুর কুট্টি বোনের কথা মনে হয়। দিদিও যদি চলে যায় ! হুঁ.. গেলেই হল····যাক না দেখি····। এইসব নানান কথার জাবর কাটতে কাটতে ছেলেটা কানাই মাষ্টারের কাছে গ্যালো। আর সারাক্ষণ আনমনা থাকায় তিনতিনবার 'ব্যাঙ' হতে হল। যেন ব্যাঙ না হলে লেখাপড়া শেখা যায় না। আশ্চর্য ! সেদিন একটা বর্ণ পড়া বলতে পারেনি সদু। শেষকালে মাটিতে পোঁতা বাঁশের বেঞ্চে কান ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল।

ফিরতিপথে রেললাইনের ধার ঘেঁষে বিছুটি আর আশশ্যাওড়া ঝোঁপের পাতা ছুঁয়ে সদু গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছিল। শ্লেটটা ঢিলে পেট বগল থেকে নেমে এসেছে। একেবারে কোমরের কাছে। বিছুটি পাতায় গাঙ ফড়িং থির হয়ে বসেছিল। পা টিপে টিপে ছেলেটা নিঃশব্দ সতর্কতায় এগোল। হাতের থাবা বিছিয়ে এক সাপ্‌টা মারল। আর মুঠো খুলতেই ফক্কা। ফাল দিয়ে উড়ে গ্যাছে। গাঙ ফড়িং খুব চালাক হয়—সরি বলে। আর দুপা এগোতেই ফ্যাকফেকে সাদা মাঠ জাগে চোখের মনি জুড়ে। দিনকতক আগেও নানান গাছগাছালি লতাপাতায় মাঠটা গাঢ় সবুজ বর্ণের একটা ফোঁটার মতো জাগত এখন নির্মূল করে কাটা ঘাসের মরা হলুদ গোড়া পড়ে আছে। উকি ঠাকুমা বলে : রেফিউজীর দল এয়েছে থেকে আর কিচ্ছুটি নেই। কি খায়না বলতো, কচু ঘেঁচু কিচ্ছু ছাড়ান ছুড়ন নেই। শেষে ছড়াকাটে :

গু খায় না গন্ধে

লোহা খায় না শক্তে ॥

উকিল ঠাকুমাকে অন্ন দুচোক্ষে দেখতে পারে না। অন্ন বলে : এই পোড়ার স্থাশে আছেডা কি? মার মুখে সদু পদ্মারপারের ভিটের গল্প তন্ময় হয়ে শুনেছে। আর কবে যে সেই দামালপানির কোল ঘেঁষা শ্যামল ভূখণ্ড নিবিড়ভাবে ভালোবেসে ফেলেছে তা ও নিজেই জানেনা। পদ্মা, উথাল পাথাল পানি। পদ্মাপারের দেশ। সদুর স্বপনের দেশ। সেখানে মানুষের দুঃখ শোক নেই অভাবীহাভাতি পেট নেই। থলথল করে পানির মতো মানুষ হাসে। ইলশা মাছ চান্দের মতো ফসকাইয়া যায়।

সদুরা মাছ খায় না। দরমার ফাঁক ফোকর দিয়ে চাটগাঁইয়া বিশুদের শুটকি মাছের উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগে। বিশুরা শুটকি মাছের ঝোল আর পদিনাপাতার চাটনী হরদম খায়। শুটকি মাছের গন্ধ নাকে লাগা মাত্তর সদুর সর্বশরীর গোলায়। আর সরি মাছের জন্যে হা পিত্যেশ করে। সরি মাছের কাঁটাটুকু পেলেই বত্তে যায়। একেবারে সাপটে খায় সেদিন। চন্নুর মা মাঝেমধ্যেই এক আধ টুকরো মাছ নিয়ে আসে : অন্নদি এইটুক সরিরে দিয়েন। চন্নুর মা যেন কি! মাঝে মাঝে মুখ গোমরা করে বসে থাকে। অন্নর সাথে কথা বলে না। ডাকলে সাড়া অব্দি দেয় না। ওদের দুয়োর পর্যন্ত মাড়ায় না। সদু দেখেছে মা তখন ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে আট আনা এক টাকা কর্জ্জ নেয় অন্ন। পাছে সব ফেরৎ চায়। কিম্বা এ্যামন একটা ভরসার মানুষ বিরূপ হলে যা হয়। তারপর হঠাৎ সদু দেখে চন্নুর মা অন্নদি বলতে অজ্ঞান। অন্নর মুখে, কানের লাল তিল ছুঁয়ে প্রথম দিকটায় একটা বেদনাবিধুর ভাব থাকে কিছুদিন। আর চন্নুর মা কেমন যেন ফুটতে থাকে। কিসের একটা গর্ব! সদুর রাগ হয়, কেন যে মা আবার কথা বলে। কিসের মোহে?

চন্নুর মার এই নিদারুন নেশা হপ্তা না ফিরতে ফিকে হয়। হঠাৎ শব্দ আসে গলায়। সরির ভাগ্যে মাছ আসে। সদু মাছ ছোঁয় না। রোমে না। অত্তো পয়সাও নেই। আর খামাখা সাধও নেই। অথচ মার মুখে শুনেছে : স্থাশে কি আর কেউ পয়সা দিয়া মাছ কিনত ......নাকি চাইল ডাইল তরিতরকারী কিনত........। আর এখন বেতেই পয়সা। পয়সার যে কেন জম্মো হল? আর এমন রাক্কস জন্মেই সব গিলে বসে আছে।

অবুঝ ছেলেটা তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল : মা! ওমা!

—কি ...ই... ই।

—চলোনা যাই!

—কোন চুলোয়!

—কেন, দেশে।

—স্থাশে?

—হুঁ।

—হা আমার কপাল!

—চলোনা মা!

—স্থাশ নাই, স্থাশে আগুন লাগছে.... যাবি কোনখানে? কোন চুলায়?

এখন রুক্ষ মাটি। অসহ্য তাত। হঠাৎ মাছের কথা মনে হতেই সদু ঘুর পথ দিয়ে ডোবার দিকে চলল। ডোবা থেকে সরির জন্য একবার কাঁকড়া ধরেছিল সদু। রেললাইনের দিকে একপলক চাতক-চোখ মেলেই সদু হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল। খানিক এগোতেই ও ডোবাটা পেল। মরে হেজে গ্যাছে। এক কোনে খানা খন্দ মতো। পায়ের পাতা ডোবা জল। দু একটা জলপোকা তিরতির করে সরে গ্যালো। দূরদূর থেকে দুধের সরের মতো বুনো হাঁস দল বেঁধে উড়ে আসত ডোবার জলে। পানি যেন তখন চোখের মত স্বচ্ছ ছিল। পুঁটি মাছ ফিন্ দিয়ে জলের ওপর খেলা করত। আর ক্যাওড়াপাড়ার গলু গুলতি দিয়ে বুনো হাঁস মারত। বছর খানেক ধরে জলা আর বন বাদাড় ভেঙে, কোদাল শাবল গাঁইতি আর ক্রেন নিয়ে, ঘর ঘর ঘটাং ঘটাং শব্দে কি যে এক দক্ষযজ্ঞ চলছে! গরীব-গরবার হেলেঞ্চা কলমি আর গিমাশাক এখন নেই। এখন শুধু ক্রেনের শব্দ। আর লোহার বীম। কাজ শুরু হতেই প্রথম দিনে উড়িষ্যার কুলি লিঙ্গরাজ মাথার খুলি ফাটিয়ে মরল। গাঁইতি পড়েছিল মাথায়। উড়িষ্যার জোয়ান মানুষটার গলা চিরে একটা শব্দ অব্দি বেরোয় নি। শেষ হয়ে গ্যালো। সেদিনও কাজ বন্ধ হয়নি। খবরটা চাউর হয়ে যাওয়ায়, কোনক্রমে মানুষটার নাম জানা গেছিল। ততক্ষণে ট্রাকে করে লাশটা চালান হয়ে গ্যাছে। ক্ষেমিপিসি বলেছিল : মা বসুন্ধরা রুষ্ট হলি এ্যামন ধারা হয়.........মাটিরও পরাণ আছে...... ...দেখিস না কেমন ফলফুলে ভইরে স্থায়....বিয়োয়....শোয়াস নেয় মানসির মতো.... সেই মাটির বুক চিরতে নেগেছে। আর মাটি হল মা....জননী.... আগে ভক্তি করে তার পুজো আচ্চা দে, তা নয়....দেখিস ও সাহেবও বাঁচবে নি....মাটির বুক থেকে রক্ত ফিনকি দেবে, আর লালমুখো সাহেবটারও ভেদবমি শুরু হবে....দেখিস।

সদু স্পষ্ট দেখেছে ক্ষেমিপিসির মুখে কাঁকড়ার পায়ের হিজিবিজি আঁচড়। আঁচড়ের আড়ালে নিষ্ঠুর চোখের তারা। ক্ষেমিপিসিকে দেখে তখন কেমন একটা ভয়, ঢাকের বাড়ির মতো, বুকের ভেতর গুড় গুড় করে উঠেছে। আবার যেদিন উড়িষ্যার কুলি গাঁইতি বিঁধে মরল, সেদিন লালমুখো সাহেবটার চোয়াড় মুখ আর মুখের হাসি দেখে সদুর শরীরে জলন ধরেছিল। আগুনের হলকার মত। একটা

মানুষের তাজা উষ্ণ খুনে মাটি ভেসে গ্যালো অথচ সাহেবটা নির্বিকার। ওর যেন কিছুই হয়নি। ও যেন মানুষ নয়। তাহলে? তাহলে কি? মানুষ তো মানুষের দুঃখ কষ্ট শোকে পাগল হয়। লালমুখো চোয়াড় সাহেব আর কানাইদা, এদের যেন আলাদা জাত। সদু দেখেছে লিঙ্গরাজের খুন ফিনকি দেওয়ার পর সাহেবটার লালমুখ আরো লাল হয়েছিল। আর কুলি কামিন ঠাণ্ডা রাখতে দুর্বোধ্য ইংরেজী শব্দ আওড়াচ্ছিল।

একটা দিন সবুর করল না। সঙ্গীর জন্য, কুলি কামিনের দল জিরেন নিতে পারল না। যে গেল তার জন্যে ওরা একটু হা হুতাশ করতে পারল না। দানবের মতো বিকট বিরাট যন্ত্র ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং শব্দে মাটি ফাঁড়তে লাগল। ডোবাটা বুজিয়ে ফেলল ঝাঁপ ঝাঁপ মাটি ফেলে। সদু দেখল এক দল মজুর গলার কাছে দম আটকে, শরীরটা দুমড়েমুচড়ে শালখুঁটি বয়ে আনছে। সদু দেখল মানুষগুলো দরদরিয়ে ঘামছে। 'শরীলের রক্ত জল কইরা ঘাম হয়'—অন্ন বলেছিল। সদুর বিশ্বাস হয় না। তাহলে তো মানুষ কবে চোখ উল্টে দিত। পৃথিবীর বুকে রেললাইন পেতে এই যে মানুষ কঠোর পরিশ্রমের ইঞ্জিন ভেঁপু বাজিয়ে ছুটিয়ে চলেছে তাতে কি আর বেঁচে থাকত। কত ঘামই তো ঝরেছে। আরো কত ঝরবে। সদুর কেমন একটা শ্রদ্ধা জাগে। মানুষের মরণ নেই, ঠিক বেঁচে থাকে। মুখে রক্ত তুলে মরার আগ অব্দি খাটে। কিন্তু কেন? এতো খাটছে কেন মানুষগুলো? এত খেটে কি লাভ?

সদু, দশ বছরের সদু, ছুরির ডগার মতো ফিনফিনে চোখে, শালকাঠের খুঁটি, লোহালক্কর, যন্ত্রপাতি আর কেলেভূত মানুষগুলোর মুখে আঠালি পোকার মতো ল্যাপটা ঘামের দিকে চেয়ে ভাবে: উফ্ কি কাজ!

মানুষগুলোর নেংটি পড়া শরীর, পট্টি ছেঁড়া হাফ প্যান্ট আর ঝলসা মুখের দিকে সদু চোখ চিরে চেয়ে থাকে। আশমান থেকে লোহার মুগুরটা হাঁই হাঁই শব্দে পড়ছে। আর ধরতির বুকে খুঁটি ডেবে যাচ্ছে একটু একটু করে। একেবারে বুকের কাছে। বসুন্ধরার বুক। জননীর বুক। সদুর ভয় হল—এ্যাই····এইবার····এ্যাই····। সন্তানের দুঃখে এই বুঝি দুখান হয়ে গেল বুক। মাটির বুক ফেঁড়ে খুনের ফোয়ারা ছুটল বলে। দুধের বদলে খুন। ফিন্‌কি দিল বলে।

আর তাহলে তো সাহেবটা অক্কা পাবে। মরবে। ভেদবমি করে সাহেবটা মরবে। ক্ষেমিপিসির কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে। সাহেবটা মরবে মনে হতেই সদুর মজা লাগল। আর হাঁই হাঁই হন্ হন্ ন্ ন্ শব্দটা ওর কানের পর্দা ফাটাতে লাগাল। সদু একপা দুপা করে, মাথার ওপর লোহার মুগুরের নির্মম শব্দটা বয়ে, মজুরের দঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল: হ্যাঁ গো এখানে কি হবে?

—ফ্যাকটরী বনেগা।

রোগা প্যাটকা বিহারের মানুষটার ঠোঁটের লাগাম বেয়ে পান্তাভাতের মতো ঘা ছড়িয়ে সরল হাসি জাগল।

– লিঙ্গরাজ যখন মরে তখন কাজ করতে তুমি?

—হাঁ। উসকো তো কোম্পানী খুন কিয়া।

—খুন!

– হাঁ·· ও ইনসান থা ইস্‌লিয়ে····।

—ইনসান মানে?

—মুনুষ।

—মানুষ?

—হাঁ।

রেললাইনের উঁচু পাড় ছোঁওয়া ইঁট, সিমেন্ট, ক্রেন, লোহালক্করের ভেতর হাঁটু ভেঙে বসে ছেলেটা একসময় কাঁকড়ার কথা ভুলে গেল। আর আধা হিন্দি আধা বাংলায় অদ্ভুত সব কথা শুনছিল বাত্তিধরা মানুষটার মুখে। গেঁহুর চাষ। ক্ষেতি কাম। আর চিমনির ডাক।

ক্ষেমিপিসির মুখটা বুকের ভেতর জাগতে থাকে। এই প্রকাণ্ড কারখানাটার গোড়াপত্তন থেকে গলুর পিসি জ্বলছে। কেমন একটা অসহ্য হিংসা। আর গলুর তো থোড়াই কেয়ার। গুলতি নিয়ে লাইন ধরে যাদবপুর গড়িয়ার দিকে এগোয়। অনাবাদী পতিত জমিন আর জলাভূমির অভাব এদেশে কোনদিন হবে না। বসুন্ধরার অন্তরের দুঃখের মতো স্নেহ মেখে ঘোলাপানি আর সবুজ পাতার মতো এক একটা বিন্দু কত যে ছড়িয়ে আছে!

উঠোনে পা দিতেই সদুর পা যেন মাটিতে গেঁথে গ্যালো। দরমার ফোকর দিয়ে করুণ গানের একটা ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে উঠছে: জনম দুঃখীর কপাল পোড়া·········। একতারা বাজিয়ে এক বাউল গানটা গেয়েছিল। হাতের আঙুলে মুদ্রা করে। সরি লিখে নিয়েছিল। একা থাকলেই সরি বাউলের মতো উদাস হয়। উদাস হয়ে গানটা গায়। গানের কথাগুলো সুরে ছাড় পেলেই কেমন বেদনা জাগায়। অদ্ভুত একটা বেদনা, বুকের ভেতর হামলাতে থাকে।

—দিদি!

—উঁ।

– তোর শরীর খারাপ·· ····।

—নারে।

—জানিস, কিছুতেই কাঁকড়া পেলাম না।

—থাকগে। তুই এক কাজ কর, খাটের তলায় একমুঠো ভাত আছে, আগে খেয়ে নে।

—আচ্ছা তোর লিঙ্গরাজের কথা মনে আছে?

—হুঁ।

—জানিস, ওকে না—মালিকরা খুন করে মিথ্যেমিথ্যি……।

—চুপ কর। খবরদার এসব কথা কাউকে বলিস না যেন। কি কোত্থেকে শুনে আসিস। মালিকের বাড়াভাতে যেন ও ছাই দিয়েছিল!

—সত্যি!

- কে বলল? কেন? কেন খুন করবে ওকে?

—বাহ্‌রে, ও যে ইনসান!

—নে—নে, খা।

সরি রুগন শরীরটা টেনে তুলল। ফ্রকটা টেনেটুনে ঠিক করল সাবধানে। টান লাগলেই ফেঁসে যাবে। আজকের তো আর নয়। সরি সদুকে জল গড়িয়ে দিয়ে বাইরে এল। উঠোনে।

আলো মরে আসছে। ঠিক মরা নয়, কেমন যেন সাদা সাদা। সরির মুখের মতো। পেয়ারা গাছের তলায় সরি খানিক দাঁড়িয়ে থাকল। পাগলা বাতাস দিচ্ছে। সরির ভীষণ রুক্ষু চুল পাল্‌দা দিয়ে উড়ছে। কেমন যেন তরতরিয়ে ভেসে যাওয়া। কোথায় কে জানে!

চদুর মার গলা রান্নার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ ছাপিয়ে জাগছে। আর উকিল ঠাকুমার খনখনে রায়বাঁশ গলার তো কথাই নেই। পেয়ারাতলা থেকে উকিল ঠাকুমার খাড়া কাটারির মতো নাকটা দেখা যায়। একেবারে সাফ। সাপের মতো চেরা জিভে বিষ ওগরায়।

—হুঁ, দিনে দিনে কত দেখবো!

—নাহ্‌ মাসিমা, আপনে ঠিক কইতেছেন না……।

—বেটাছেলে কাজ পায় না, আর মেয়েমানুষের চাকরী! দেখো গিয়ে কি করছে!

—এই কথা কইয়েন না। অন্নদি সেই মানুষই না।

—কত দেখলুম! অভাবে স্বভাব নষ্ট।

সরি এসে খাটের ওপর ঝাপটে পড়ল। ফোঁপাতে লাগল। সদু দিদিকে কান্নার বেগ হজম করতে বহুবার দেখেছে। কিন্তু কখ[ন] সরিকে কানতে দেখেনি। সদু জানত, দিদি শুধু হজম করতে শিখে[ছে] কিন্তু কানতে জানেনা। ছেলেটা অদ্ভুত ভয় পেল। বুকে [ক] আটকে দম বন্ধ হয়ে এল। শেষে ধীরে ধীরে উঠে, সরির হাত ধ[রে] টানতে লাগল: কি রে দিদি! কি হয়েছে দিদি? এই দিদি সরির হেঁচকি উঠছে।

ছেলেটা ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল: বলনা, বলনা দিদি!

—ওরা মার নামে যা তা বলছে….বিচ্ছিরি….বিচ্ছিরি কথা।

—কি? কি কথা?

—তুই বুঝবি না….বুঝবিনারে সদু….।

—বলনা!

—তুই যে বড্‌ডো ছোট…।

—এই দিদি, বল বলছি….বল…।

—ভগবান!

—তাহলে আমি মরে যাবো, বল শিগ্‌গির….না বল্লে ঠিক মরবে[া] দেখিস।

সদু এমন বিশ্বাসে কথাটা বলল যেন ইচ্ছে করলেই ও মরতে পারে সেরেফ্‌ ইচ্ছে। আর সরি তার জেদী ভাইটাকে বুকের কাছে চে[পে] কচি ঠোঁটের ওপর হাত রাখল: কান্দিস না ভাই….কান্দিস ন[া] সোনা।….পাগলা মরবি ক্যান?….বাঁচবি.. মানুষের মতো বাঁচবি… মানুষের মতো।

সদুরও তখন বিশ্বাস হয়। জোর একটা বিশ্বাস: হুঁ বাঁচবে… মানুষ অত সহজে মরে না….মরবে কেন?….কুট্টি বোনটা বোকার ডিম…কি যে বোকা…।

(ক্রমশঃ)

## ॥ ছাত্র-যুব বন্ধুদের প্রতি ॥

বন্ধুগণ,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে যে সব ছাত্র ও যুব আন্দোলন চলছে সেগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'বীক্ষণে' প্রকাশের জন্য পাঠান। এই পরস্পরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলির অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়েই কিশোর-যুব-ছাত্ররা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের একটি বৈজ্ঞানিক পথ খুঁজে বের করতে পারবেন।

—সঃ মঃ বীঃ

**"ভারতীয় জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করতে হলে, তাঁদের পরিণত করতে হবে একটি আত্মনির্ভর ও স্বাধীন জাতিতে। বর্তমানে বোধ হয় ভারতীয় বিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ করছেন, বিজ্ঞানীরা নন, সেইসব রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা, যাঁরা এই উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।"**

**—জে. ডি. বার্নাল**

# ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চ্চার ধারা

**জনৈক অধ্যাপক**

● [বিজ্ঞান-চর্চ্চার উদ্দেশ্য কি? পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার "অনুন্নত" দেশ-গুলিতে বিজ্ঞান-চর্চ্চার সাধারণ চেহারাটা কেমন? এই প্রশ্ন গুলির উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে নীচের প্রবন্ধটিতে এবং এই সাধারণ প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের দেশের বিজ্ঞান-চর্চ্চার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখাকে বেছে নিয়েছেন এবং সেই বিশেষ শাখাটিতে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটি দেখিয়েছেন। সেই বিশেষ শাখার বৈজ্ঞানিকেরা কিভাবে তাঁদের লব্ধ জ্ঞানকে নিজেদের উদ্যোগে দেশের মানুষের সেবায় কাজে লাগাতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব একটি প্রস্তাবও রেখেছেন।

বন্যা ও খরা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, শ্রেণীশোষণ ও বর্ণ-বিদ্বেষ পীড়িত আমাদের মাতৃভূমিকে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শোষণমুক্ত একটি দেশ হিসেবে গড়ে তোলা একমাত্র প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব। কেন আমাদের দেশে সেই সফল প্রয়োগ হতে পারছে না? কোথায় তার বাধা? সেই বাধাগুলি সরান'র ক্ষেত্রে আশু ও দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচীই বা কি? —এসব কিছু নিয়েই আজ ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনা হওয়া একান্ত দরকারী। সেজন্যই এসবের উপর, এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত ও মূল্যায়নের উপর আমরা আরও রচনার জন্য সবার কাছে আবেদন করছি। বিশেষ করে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক-দের কাছে আমাদের আবেদন, যে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ শাখাগুলিকে কেন্দ্র করে এই সব প্রশ্নের উপর আলোচনা পাঠান। ভারতীয় বিজ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা মিথ্যা প্রচারগুলিকে সাধারণ মানুষের সামনে নগ্ন ও উন্মোচিত করে দিন। —সঃ মঃ বীঃ]●

বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ডি. জে. ড. সলা. প্রাইসের[১] গবেষণা থেকে জানা যায় যে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের পরিমাণ, যা কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে বাড়তে একটা বিরাট আকার নিয়েছে। বোঝবার সুবিধের জন্য এখানে কিছু মোটামুটি হিসাবের উল্লেখ করছি : ১৯৬০ দশকের গোড়ার দিকে আনুমানিক ৩০,০০০ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রায় ৫০,০০০ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই, যেখানকার লোকসংখ্যা পৃথিবীর লোকসংখ্যার মাত্র $\frac{1}{15}$ ভাগ, এই সময়ে ১,০০০,০০০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উপাধিধারী ছিলেন; বিজ্ঞানীদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার এই দশকে এতই বেশী যে পৃথিবীর ইতিহাসে মোট যত বিজ্ঞানীর কথা জানা আছে, তার প্রতি আট জনের মধ্যে সাতজনই এই সময়ে জীবিত ছিলেন; ইত্যাদি। বিজ্ঞানীদের সংখ্যা এবং তাঁদের কাজকর্মের পরিমাণ প্রতি ১০-১৫ বছরে দ্বিগুণ হয়, কিন্তু পৃথিবীর লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয় ৪০-৫০ বছরে। **সুতরাং বিজ্ঞানের বৃদ্ধিহার লোকসংখ্যার বৃদ্ধিহারের তুলনায় অনেক বেশী।** তার ফলে সামগ্রিক লোকসংখ্যার মধ্যে বিজ্ঞানীদের এবং মানুষের সামগ্রিক কাজকর্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কাজের পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়ছে। সহজেই বোঝা যায় যে জনসাধারণের অর্থ ও সামর্থের একটা বড় অংশ এই ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানের চর্চায় ব্যয় হচ্ছে এবং এই ব্যয় ভবিষ্যতে আরও বহুগুণ বাড়বার সম্ভাবনা আছে।

### বিজ্ঞান-চর্চ্চার উদ্দেশ্য :

এই অবস্থায়, স্বাভাবিকভাবেই, প্রশ্ন ওঠে এই বিশাল ব্যয়সাধ্য বিজ্ঞান-চর্চ্চার উদ্দেশ্য কি? বিশেষতঃ আমাদের মতো একটা অনুন্নত দেশে, যেখানে সাধারণ মানুষের বৃহত্তম অংশ ভয়াবহ দারিদ্র্যের শিকার, সেখানে এই প্রশ্নের গুরুত্ব যে কোন উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশী। এ ছাড়াও অবশ্য এ প্রশ্নের একটা নীতিগত দিকও আছে।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি ও সাধারণ মানুষের মনে উঠেছে এবং বহু আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে মূলগতঃভাবে বিপরীত দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় : (এক) বিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞানের সন্ধান; এবং (দুই) এই জ্ঞানের সন্ধান শুধু জানার আগ্রহেই নয়, বরং বিষয়ের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই হওয়া উচিৎ। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোন স্পষ্ট সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই একই সময়ে দুই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন একই সমাজে দেখা যায়।

এখন এই সূত্রে পৃথিবীর কয়েকটা উন্নত দেশে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যাক।

### ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে বিজ্ঞান-চর্চ্চার ইতিহাস :

ইংল্যাণ্ডে, যেখানে বিজ্ঞানের প্রসারের মোটামুটি প্রামাণ্য ইতিহাস আছে, ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে Royal Society স্থাপনের সময় থেকেই উপরে যে দু'টি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই Society, যা বৈজ্ঞানিক কাজকর্মকে সুসংগঠিত করবার প্রথম দিকের চেষ্টাগুলির মধ্যে একটা, শুরুতে সেই সময়কার কিছু অভিজাত এবং অবস্থাপন্ন মানুষের কর্তৃত্বেই চলতো। যাঁরা বিজ্ঞান-চর্চাকে খানিকটা সঙ্গীত, চারুশিল্প, শিকার ইত্যাদির মতো আর একটা সময় কাটাবার ব্যবস্থা হিসাবেই হয়তো নিয়েছিলেন। এমনকি, এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা ধর্মীয় তাৎপর্য্য আরোপ করবার চেষ্টাও হয়েছিল। বলা হতো, Protestant ধর্মচিন্তায় পরীক্ষামূলক, যুক্তিগ্রাহ্য কাজকর্মকে ঈশ্বরের ইচ্ছাপূরণের একটা উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়। একই সঙ্গে অবশ্য সাধারণভাবে জনকল্যাণমূলক কাজে বিজ্ঞানের সম্ভাব্য অবদানকেও স্বীকার করা হয়েছিল। French Academy of Science স্থাপনের পেছনেও মোটামুটি ভাবে এই দু'টি কারণই লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এই Academy তখনই স্থাপিত হলো, যখন রাজা চতুর্দশ লুই নিশ্চিত হলেন যে তাঁর রাজ্যের সুনামের জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গেই, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হলো।

বিজ্ঞানের বিপুল ব্যবহারিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হলো শিল্প বিপ্লবের সময়ে। এই সময়ে উত্তর ইংল্যাণ্ডে কয়েকটি ছোটখাট সমিতি শিল্পপ্রচেষ্টার ব্যবহারিক সমস্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সাহায্য আহ্বান করেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিতেও সমর্থ হন।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক গুরুত্বের চরম স্বীকৃতির উদাহরণ পাওয়া যায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে, যখন বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব দেওয়া হলো শক্তিশালী ধ্বংসকারী যান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টির, যে দায়িত্ব নিতে বহু

১। পদার্থবিদ ডি. জে. ড. সলা প্রাইস হ'লেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ইতিহাস-এর (History of Science) অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান। বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ও বিজ্ঞানী সংক্রান্ত উল্লিখিত তথ্যগুলি তাঁর 'Little Science big Science' (1963) বই থেকে নেওয়া হয়েছে —লেখক।

**সমাজসচেতন বিজ্ঞানী আপত্তি প্রকাশ করেন। অবশ্য এই সময়ে এবং পরেও 'বিজ্ঞানের স্বার্থে বিজ্ঞান' এই মনোভাবও যথেষ্ট পরিমানেই ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক জে. ডি. বার্নালের বিখ্যাত বই The Social function of Science[২] প্রকাশের অল্পদিন পরেই ইংল্যাণ্ডে Society for the freedom in Science[৩] প্রতিষ্ঠা করা হয়, এবং এই দুই মনোভাবেরই প্রতিফলন ইংল্যাণ্ডের সমাজে এখনও দেখা যায়।**

সংক্ষেপে এই হলো দু'টি উন্নত ও স্বাধীন দেশে বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস। এখন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলির অবস্থা আলোচনা করা করা যাক।

## এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বিজ্ঞান-চর্চা:

এ আলোচনা শুধুমাত্র তুলনার স্বার্থেই নয়। পৃথিবীর ২/৩ ভাগ মানুষ এই সমস্ত অনুন্নত দেশেই বাস করেন। কাজেই এগুলির উন্নতির জন্য বিজ্ঞানকে কতটা ব্যবহার করা হয়েছে বা করা সম্ভব, এবং না করা হয়ে থাকলে, কেন তা হয়নি, তা বোঝাবার জন্যেই সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের ইতিহাসকে আলোচনা করা প্রয়োজন। জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই তিন মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে অনেক ফারাক থাকলেও একটা খুব বড় জায়গায় এদের মধ্যে মিল আছে। সেটা হচ্ছে তাদের গত কয়েকশত বছরের ইতিহাস। গত কয়েকশ' বছর ধরে এরা সবাই (জাপান ছাড়া) বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ভয়াবহ শোষণ ও নিয়ন্ত্রনের শিকার। দু'একটি ছাড়া এখনও এই সব দেশের বেশীরভাগই সেই দাসত্বের উত্তরাধিকারই বহন করে চলেছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এরা এখন অনেকেই স্বাধীন। দাসত্বের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই মিলের ফলে, সেই দাসত্বের যে ফলাফল তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায় সেগুলির চরিত্রও একই। **বিজ্ঞানের ইতিহাস একটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।** সেই জন্যই এইসব দেশের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসকে বুঝতে হলে ঔপনিবেশিক দেশের বিজ্ঞান-চর্চার সাধারণ চরিত্রটিকে বোঝা দরকার।

সাধারণভাবে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক দেশে সামাজিক মূল্যসম্পন্ন বিজ্ঞান-চর্চায় ঔপনিবেশিক প্রভুর পক্ষ থেকে কোন উৎসাহ পাওয়া যায় না। এমনকি কোন মৌলিক গবেষণা যা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মূল্যবান ও প্রশংসনীয় হতে পারে তার প্রতিও ঔপনিবেশিক প্রভুর উৎসাহ আশা করা যায় না। কারণ তারা উপনিবেশের জনজীবনের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নতির সম্ভাবনাকে চাপা দিয়ে রেখে নিজেদের উৎকর্ষ এবং প্রভুত্ব বজায় রাখতে চায়। উপনিবেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত নীতি নির্দ্ধারিত হয় সেখানকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়, সাম্রাজ্যবাদ এবং তার বিশ্বস্ত বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত একটা গোষ্ঠীর স্বার্থে। **এই নীতির লক্ষ্য হলো শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান-শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব এবং অপ্রয়োজনীয় করে রাখা,** যার ফলে তাঁরা এদিকে আগ্রহী না হন। শিক্ষাকে অসাধারণ ব্যয়সাধ্য করে রাখা, যার ফলে আগ্রহ থাকলেও উচ্চ-শিক্ষা অধিকাংশেরই সামর্থের বাইরে থাকে এবং **নিজেদের মনোনীত, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেই বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চাকে সীমাবদ্ধ রাখা,** যাঁরা কিছু ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে ঔপনিবেশিক প্রভুর স্বার্থরক্ষা করবেন। স্বভাবতঃই **এই সংকীর্ণ গোষ্ঠীর কাছে শিক্ষা ও বিজ্ঞান** কোন সমাজ কল্যানমূলক বিদ্যা হিসাবে গণ্য হবে না, **সামাজিক মর্য্যাদা প্রতীক হিসাবেই গণ্য হবে।**

## ভারত (১৫ই আগষ্ট '৪৭-এর আগে):

অনুন্নত দেশে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি প্রসঙ্গে এই সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবার ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চার বিচার করা যাক। এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে ব্যক্তিগত[৪] কারণে জৈবিক নৃতত্ত্বের (Physical Anthropology)[৫] ক্ষেত্র থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে লোকগণনা অধিকারি

২। বিজ্ঞান সকলের জন্য, সমাজে তার একটি ভূমিকা আছে, এবং যদি পরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হয় তবে তা খুব বেশীরকমভাবে আমাদের উন্নতিসাধন করতে পারে—এটাই হল বার্নাল প্রণীত 'The Social Function of Science' বইটির মূল উপজীব্য বিষয়। —লেখক

৩। 'Society for the Freedom in Science' সমিতি প্রবক্তাদের মতে, বিজ্ঞান কখনোই পরিকল্পিতভাবে এগোতে পারে না এবং বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা থাকতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। অর্থাৎ এই সমিতির প্রবক্তারা বার্নাল প্রণীত 'The Social Function of Science' বইটির মূল বক্তব্যের বিরোধী। —লেখক

৪। প্রবন্ধকার জৈবিক নৃতত্ত্বের (Physical Anthropology) শিক্ষক এবং গবেষক—সঃ মঃ বীঃ

৫। জৈবিক নৃতত্ত্ব বা Physical Anthropology: বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে জৈবিক (Physical) পার্থক্যের অনুসন্ধান ও ক্রমবিবর্তনের চর্চা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপজোক, রক্তের শ্রেণীবিভাগ, হাতের ছাপের বৈশিষ্ট্য, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ, শারীরতত্ত্ব বিষয়ক তথ্য, ইত্যাদির ভিত্তিতে এই অনুসন্ধান ও চর্চা করা হয়।

( Census Commissioner ) হার্বার্ট রিস্‌লির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দৈহিক মাপজোক সংক্রান্ত সমীক্ষার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে জৈবিক নৃতত্ত্বের চর্চা শুরু হয়। ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের ১৯০১ সালের লোকগণনার দায়িত্ব রিস্‌লির উপর ছিল এবং এই সূত্রেই নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে মনে হয় সাধারণ কৌতূহল নিয়ে ও গবেষণার জগতে স্থান সংগ্রহ করে সামাজিক মর্যাদা পাওয়ার আগ্রহেই তিনি এই কাজে নেমেছিলেন।

পরবর্তীযুগে এই ধরণের সমীক্ষা বহু ভারতীয় ও অভারতীয় নৃতাত্ত্বিকেরা ভারতবর্ষে করেছেন এবং তার ভিত্তিতে এখানকার মানুষের জাতিগত শ্রেণীবিভাগ[৬] করবার চেষ্টা করেছেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত কাজে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের অন্ধ অনুকরণই প্রকট হয়ে উঠেছে। অবশ্য তার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। যেমন, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের ১৯২০ দশকের গবেষণায় সামাজিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরস্পর নির্ভরতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা অবশ্যই সমাজকল্যাণমূলক বিজ্ঞান-চর্চা নয়, কিন্তু একটা বিশ্লেষণধর্মী, মৌলিক চিন্তাধারার পরিচায়ক, যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকের অনুকরণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নৃতত্ত্বের সম্ভাব্য ব্যবহারিকতা সম্বন্ধে সে যুগেও যে কিছু চিন্তাভাবনা হয়নি তা নয়, ১৯৪০ দশকে কয়েকজন নৃতাত্ত্বিক বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন তাঁদের উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তুর সামাজিক প্রয়োগ সম্বন্ধে। কিন্তু সমস্যা হ'ল এই বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার অধিকারী এবং সমাজসচেতন নৃতাত্ত্বিকেরা সংখ্যায় নেহাৎই অল্প ছিলেন।

## ভারত ( ১৫ই আগষ্ট' ৪৭-এর পরে ):

এখন দেখা যাক, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পরে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার, এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্ধভক্তি ও অনুকরণশীল মনোভাবের, কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। জৈবিক নৃতত্ত্বের ১৫ই আগষ্ট' ৪৭-এর পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, তবে একথা নিশ্চিত বলা যায় যে যদিও এই যুগে বিশ্লেষণধর্মী গবেষনায় কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান ভারতীয় নৃতাত্ত্বিকেরা রেখেছেন এবং নৃতত্ত্বের সম্ভাব্য সামাজিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও কিছু চিন্তা করেছেন, তবুও **এই ধরণের প্রচেষ্টার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে প্রায় পূর্ববর্ত্তী যুগের মতোই অল্প।**

[৬] জাতিগত শ্রেণীবিভাগ: অস্ট্রেলীয়, নিগ্রোজাতীয়, মঙ্গোলীয়, ককেশীয় এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ, জৈবিক নৃতত্ত্বে ব্যবহৃত উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে করা। —লেখক

এরপর প্রশ্ন ওঠে **ঔপনিবেশিক শাসন চলে যাওয়ার পরেও কেন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চার গতিপ্রকৃতি ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হলো না?** একজন ভারতীয় জৈবরসায়নবিদ[৭] সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের শ্রেণীগত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তিনি মনে করেন সাধারণভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সমাজের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত, তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ও আগ্রহের একান্ত অভাব থাকা স্বাভাবিক, যার ফলে তাঁদের প্রায় সমস্ত শক্তি ও সামর্থই ব্যয় হয় কিছু বাঁধাধরা, অর্থহীন ও অবাস্তব গবেষণায়, যার উদ্দেশ্য নেহাৎই ব্যক্তিগত উন্নতি। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা শাসকবর্গের স্বার্থরক্ষায়ও বিরূপ নন, এবং তাঁদের এই আনুগত্যের উপযুক্ত পুরস্কারও তাঁরা পেয়ে থাকেন। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে ভারতীয় শাসকবর্গের স্বার্থ কি? প্রকাশ্যে এরা অনেকেই অনেক সৎউদ্দেশ্য প্রণোদিত মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বাস্তবে বোধ হয় ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতোই এঁরাও চান শিক্ষা এবং বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে, যাতে এর ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে সচেতনতা খুব নীচু পর্যায়েই থাকে, সাধারণ মানুষের নিজেদের মানবিক মূল্য ও সামগ্রিক শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মাবার সুযোগ না হয় এবং শাসকবর্গের প্রভুত্ব অব্যাহত থাকে। বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই ঔদাসীন্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে শাসকগোষ্ঠীর কাছে আত্মবিক্রয়, সচেতন কিম্বা অসচেতন যে ভাবেই হোক না কেন, জনস্বার্থ-বিরোধী ভূমিকা পালনেরই নামান্তর।

ভারতবর্ষে জৈবিক নৃতত্ত্বের গবেষণায় সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার অভাবের কারণও সম্ভবতঃ বিজ্ঞানীদের শ্রেণীচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য।

## একটি প্রস্তাব:

শুধুমাত্র এই কারণ অনুসন্ধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে আমাদের আলোচনাও ওই একইরকম জ্ঞানের চর্চা হয়ে দাঁড়াবে। তাই **ভেবে দেখা যাক এই অবস্থায় আমাদের, জৈবিক নৃতাত্ত্বিকদের করণীয় কি?** আমরা কি এই সামাজিক অপ্রয়োজনীয়তার অপবাদ

[৭] এই জৈবরসায়নবিদ হচ্ছেন মহীশূরে প্রতিষ্ঠিত 'সেনট্রাল ফুড এ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট' ( C F T R I ) এর বিজ্ঞানী নরেন্দ্র সিং। গাছের পাতা থেকে খাওয়ার উপযোগী প্রোটিন তৈরী সমস্যার উপর তিনি গবেষণা করছেন। বহু পত্রপত্রিকায় তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-চর্চার গতিপ্রকৃতির সমস্যার উপর আলোচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি হল্যাণ্ডে আছেন।

—লেখক

মেনে নিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকবো, না শ্রেণীচরিত্রগত অসুবিধা সত্ত্বেও নিজেদের মনোভাবকে পরিবর্তন করে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবো? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের মনে সমাজসচেতনতা জাগিয়ে তোলা এবং আমাদের উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তুকে ভারতীয় সমাজের সামগ্রিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আরও অর্থপূর্ণ করে তোলা সম্ভব। এই সূত্রেই উদাহরণ হিসাবে একটা প্রাসঙ্গিক সমস্যার উল্লেখ করছি যার সম্বন্ধে জৈবিক নৃতাত্ত্বিকেরা কিছু মূল্যবান গবেষণা করতে পারেন।

**বর্তমান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং বৈশিষ্ট্য হলো সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক।** অর্থাৎ কয়েকটা গোষ্ঠী বেঁচে আছে এবং সাফল্যলাভ করছে অন্য কয়েকটাকে শোষণের মাধ্যমে। এই শোষণের নানা দিক আছে। **জনসংখ্যার দিক থেকে** দেখলে দেখা যায় যে **বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আঞ্চলিক ইত্যাদি গোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধির হার সমান নয়।** ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের লোকগণনার রিপোর্টের ভিত্তিতে কিছু অনুসন্ধানের ফলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মধ্যে একটা সোজাসুজি সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ **যে গোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা যতো উন্নত তার বৃদ্ধির হারও ততো বেশী।** অন্যভাবে বলতে গেলে সমাজের তথাকথিত উচ্চতর সম্প্রদায়গুলি বেঁচে আছে এবং সামগ্রিক লোকসংখ্যার সাপেক্ষে তাদের অনুপাত বাড়ছে অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনামূলক অক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনুমান করা যায় যে সম্ভবতঃ **প্রজনন শক্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই, এবং অতিরিক্ত শিশুমৃত্যুর হারই নিম্নবিত্ত গোষ্ঠীর এই তুলনামূলক অক্ষমতার কারণ।** এই অবস্থাকে আমি শোষণের একটা রূপ—জনসংখ্যাগত শোষণ বলে মনে করি। যেহেতু জনসংখ্যাবৃদ্ধি জন্ম-মৃত্যু হারের উপর নির্ভরশীল একটি জৈবতাত্ত্বিক ঘটনা, নৃতাত্ত্বিকেরা তাঁদের মানব-জৈবতত্ত্বের জ্ঞান ও বিভিন্ন ধরণের গোষ্ঠীর মধ্যে সমীক্ষামূলক কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই সমস্যা সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করে আমাদের কাছে যে জন-সংখ্যাগত শোষণের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তা যাচাই করে দেখতে পারেন এবং তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফলের প্রতি পত্রপত্রিকার মারফৎ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্মী, রাজনীতিবিদ, সাধারণ বুদ্ধিজীবি, এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, এবং এই সংখ্যাগত শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও শক্তিকে প্রয়োগ করে একটা সক্রিয় প্রতিবাদ গড়ে তুলতে পারেন। এই ভাবেই বর্তমান সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাত্ত্বিক বিদ্যাচর্চা ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সমন্বয়ে আমাদের জৈবিক নৃতত্ব শিক্ষার সার্থক রূপায়ণ হতে পারে।

এই আলোচনায় আমি জৈবিক নৃতত্ত্বের একটা সমস্যার উল্লেখ করেছি উদাহরণ হিসেবে। আমি নিশ্চিন্ত, এ ধরনের আরও বহু সমস্যার উল্লেখ করা যায়, যার সমাধানের চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আমাদের শ্রেণীগত মনোভাবকে কাটিয়ে উঠে ভারতীয় জনজীবনে আরও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারবো এবং আমাদের নিজেদেরই তৈরী সামাজিক নিঃসঙ্গতা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সমাজের সামগ্রিক আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-দুঃখ-বেদনার অনু-ভূতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারবো।

## ॥ শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ॥

বন্ধুগণ,

'বীক্ষণে' প্রকাশিত রচনাগুলির ব্যাপারে সমস্ত ধরণের সমালোচনা, পত্রিকাকে কিভাবে আরও বেশী ত্রুটিমুক্ত ও সমৃদ্ধ করে তোলা যায়—এ ব্যাপারে সমস্ত ধরণের পরামর্শ—এগুলি 'বীক্ষণে'র বেঁচে থাকা ও শক্তিশালী হয়ে ওঠার পক্ষে জল-হাওয়ার মতো। বিনা-দ্বিধায় আপনার সমালোচনা ও পরামর্শ পাঠান।

—সঃ মঃ বীঃ

# মানুষের জন্ম/ ম্যাক্সিম গোর্কি

সময়টা হ'ল ১৮৯২ সাল, দুর্ভিক্ষের বছর। আর জায়গাটা হ'ল সুহম ও ওচেম্‌চিরির মাঝামাঝি, কোদর নদীর ধারে, সমুদ্রের এত কাছেই যে পাহাড়ী ঝরনার আনন্দোচ্ছল কলধ্বনি ছাপিয়ে আছড়ে-পড়া সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম আমি।

শরৎকাল। চেরি গাছের ছোট্ট হলদে হয়ে যাওয়া পাতাগুলো চঞ্চল ট্রাউট মাছের মত কোদর নদীর সাদা ফেনায় এদিক ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছে। নদীর পাথুরে পাড়টাতে বসে ভাবছিলাম, গাঙচিল ও করমর্যাণ্ট পাখীগুলো সম্ভবতঃ পাতাগুলোকে মাছ ভেবে বোকা বনেছে আর তাই হয়তো গাছগুলো ছাড়িয়ে, ডানদিকে, সমুদ্র যেখানে তীরের ওপর আছড়ে পড়ছে, সেখানে করুণ স্বরে চিৎকার করছে ওরা।

আমার মাথার ওপর বিস্তৃত বাদাম গাছগুলো যেন সোনা দিয়ে সাজানো, পায়ের তলায় ছিন্ন করতলের মতো পড়ে আছে অসংখ্য ঝরাপাতা। নদীর ওপারে 'হর্নবীম' গাছের নিষ্পত্র শাখাগুলো ছেঁড়া জালের মতো শূন্যে ঝুলে আছে। সেই জালের ভেতরে একটা লাল আর হলুদ রঙের পাহাড়ী কাঠঠোকরা—দেখে মনে হয় যেন জালটাতে আটকা পড়ে গেছে সে, তার কালো ঠোঁট দিয়ে গুঁড়ির ছাল ঠুকরে ঠুকরে পোকা-মাকড়গুলোকে তাড়িয়ে বার করছে এবং তৎক্ষণাৎ সেগুলোকে মুখে পুরে দিচ্ছে উত্তর থেকে উড়ে আসা চঞ্চল টমটিট্‌ আর ধূসর রঙের নাট-হ্যাচ অতিথি পাখীরা।

আমার বাঁদিকে, বৃষ্টির আশংকা নিয়ে ধোঁয়াটে মেঘগুলো ঝুলে আছে পাহাড়ের মাথায়; তাদের ছায়া গড়িয়ে যাচ্ছে বক্সউড্‌ গাছে ভরা সবুজ ঢালু জমি বেয়ে। সেখানে প্রাচীন বার্চ ও লিন্‌ডেন গাছ-গুলোর কোটরে খুঁজলেই পাওয়া যাবে 'গ্রগ মধু' যা অতীতে 'দিগ্বিজয়ী পম্পিয়াসের' সৈন্য বাহিনীর ভাগ্যের দ্বার প্রায় রুদ্ধ করে দিয়েছিল; যা প্রায় ছ' হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যকে ভূতলশায়ী করেছিল তার তীব্র মাদকতাময় মিষ্টত্ব দিয়ে। বুনো মৌমাছিরা এই মধু তৈরী করে লরেল ও আজালিয়া ফুলের পরাগ থেকে আর 'ভবঘুরেরা' গাছের কোটর হাতড়ে গমের তৈরী পাতলা লাভাস রুটিতে মাখিয়ে তা খায়।

বিপজ্জনকভাবে একটা ক্রুদ্ধ মৌমাছির হুলের খোঁচা খেয়ে—বাদাম গাছের তলায় পাথরগুলোর ওপরে বসে আমিও ঠিক ওই কাজটাই করছিলাম—মধুভর্ত্তি চায়ের পাত্রটার ভেতর রুটির টুকরো ডুবিয়ে খাচ্ছিলাম আর এই অবসরে তারিফ করছিলাম শরতের ক্লান্ত সূর্যের অলস খেলা।

শরতের ককেসাস পাহাড়কে দেখে মনে হয় যেন সুরম্য এক গীর্জার অভ্যন্তরভাগ, যেরকম গীর্জা—অনুসন্ধানী চোখের দৃষ্টির কাছ থেকে তাদের অতীতের লজ্জা গোপন করতে—বানাতো মহাঋষিরা যারা মহাপাপীও বটে। সোনা, নীলকান্তমণি আর পান্না দিয়ে সেই রকমই একটি বিশাল মন্দির যেন তারা বানিয়েছে এখানে, পাহাড়ের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে সমরকন্দ ও শেমাহার তুর্কিদের সূক্ষ্ম রেশম দিয়ে কাজ-করা মহার্ঘ গালিচা, সারা দুনিয়া লুটপাট ক'রে তারা সব কিছু এনেছে এখানে সূর্যকে উপহার দিতে, যেন বলছে:

"তোমার—তোমার কাছ থেকেই এনেছি—তোমাকে দিতে!"

....আমি কল্পনার চোখে দেখছিলাম—আনন্দোচ্ছল শিশুর মতো বড় বড় চোখ নিয়ে, দীর্ঘ-শ্মশ্রু, পিঙ্গলকেশ দৈত্যরা পাহাড় থেকে নেমে আসছে, পৃথিবীর সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে, দরাজ হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের রহুবর্ণরঞ্জিত রত্নভাণ্ডার, পাহাড়ের চূড়াগুলোকে পরিয়ে দিচ্ছে নানা বৃক্ষের জীবন্ত বসন—আর তাদের করস্পর্শে স্বর্গের আশীর্বাদ ধন্য পৃথিবীর এই অংশটুকু ধারণ করেছে মোহময় সৌন্দর্য।

এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানো বড় মজার! কত আশ্চর্য জিনিসই না দেখতে পাওয়া যায়! সৌন্দর্যের শান্ত ভাবাবেশে কিভাবেই না আনন্দের দোলায় দুলে ওঠে হৃদয়, যে আনন্দ প্রায় বেদনারই মতো।

হ্যাঁ, এটাও সত্যি যে, কোন কোন সময়ে জীবনকে খুব কঠিন মনে হয় তোমার। তোমার বুক ভরে ওঠে জ্বলন্ত ঘৃণায়, দুঃখ লোভীর মতো তোমার হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত শুষে নেয়,—এরকম কিন্তু চিরটা-কাল থাকতে পারে না। এমনকি সূর্যটাও প্রায়ই অনন্ত দুঃখে মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখে: তাদের জন্য কত পরিশ্রম করেছে সে অথচ কি দুর্ভাগা বামনই না সব তৈরী হলো!......

অবশ্য, ভালো মানুষ যে নেই, এমন নয়; কিন্তু তাদের মেরামত করা দরকার, আরো ভালো হয় যদি তাদের আবার গোড়া থেকেই তৈরী করা যায়।

……আমার বাঁদিকে দেখা গেল কিছু কালো কালো মাথা ঝোপঝাড় ফুঁড়ে উঠছে; ঢেউয়ের গর্জন আর নদীর কলধ্বনি ছাপিয়ে ওদের গলার আওয়াজ প্রায় অশ্রুতই থেকে যায়। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি—এরা সব 'দুর্ভিক্ষ পীড়িত', সুহুমে রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ করে যাচ্ছে ওচেমচিরিতে আর একটা কাজ পাবার আশায়।

ওদের আমি চিনি, ওরা ওরেল প্রদেশ থেকে এসেছে। ওদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি সুহুমে এবং একসঙ্গেই আমাদের মাইনে দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়েছে গতকাল। সূর্যোদয় দেখবো বলে আমি ওদের আগেই রাত্রিবেলা বেরিয়ে এসেছি যাতে সমুদ্রের ধারে ঠিক সময়ে পৌছতে পারি।

ওরা ছিল চারজন কৃষক, আর গালের হাড়-উঁচু এক তরুণী কৃষক মেয়ে। মেয়েটি গর্ভবতী। তার পেটটা উঁচু হয়ে উপরে ঠেলে উঠেছে। নীলাভ-ধূসর চোখদুটো যেন ভয়ে ঠিকরে পড়তে চায়! ঝোপের উপরে তার মাথাটিও দেখতে পাচ্ছিলাম আমি, একটা হলুদ রুমাল দিয়ে ঢাকা, যেন একটা পূর্ণবিকশিত সূর্যমুখী বাতাসে দুলছে। সুহুমে তার স্বামী খুব বেশী ফল খেয়ে অতিভোজনের ফলে মারা গিয়েছিল। আমি একই বস্তিতে ওদের সঙ্গে থাকতাম। একেবারে খাঁটি প্রাচীন রুশী কায়দায় ওরা ওদের দুর্ভাগ্য নিয়ে এতো বেশী এবং এতো জোরগলায় অভিযোগ করতো যে তাদের এই শোক-প্রকাশ অন্ততঃ ভার্স্ট পাঁচেক দূরেও শোনা যেতো।

দুঃখে ভেঙ্গে পড়া, নিরুত্তাপ জড় মানুষগুলোকে কষ্টের তাড়না তাদের বিপর্যস্ত বন্ধ্যা জন্মভূমি থেকে শরতের ঝরাপাতার মতো উড়িয়ে এনেছে এখানে। এখানকার অচেনা প্রাচুর্যের রূপ তাক্ লাগিয়ে দিশেহারা করে দিয়েছে মানুষগুলোকে, আর এখানে কাজ করার কঠোর পরিবেশ শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে দিয়েছে ওদের। নিস্তেজ ম্লান চোখে তারা বিব্রতভাবে সবকিছুর দিকে মিট্ মিট্ করে চেয়ে ছাখে, করুণ হাসির সঙ্গে পরস্পরের দিকে তাকায় আর নীচুগলায় বলাবলি করে:

"বাঃ……কি খাসা জমি!"

"সব কিছু যেন মাটি থেকে লাফ দিয়ে বেরুচ্ছে!"

"হ্যাঁ……তবে বড্ড বেশী পাথুরে।"

"দারুণ কিছু নয়, এটা তোমায় মানতেই হবে।"

আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে পড়ে যায় 'কোবিলি লোঝক', 'সুখোই গোন', 'মোকরেনকি'—তাদের নিজেদের গ্রামগুলোর কথা যেখানে প্রতি মুঠো মাটির সঙ্গে মিশে আছে তাদের পূর্বপুরুষদের দেহাবশেষ। সেই পরিচিত অতিপ্রিয় মাটির কথা স্মরণ করতো তারা, যে মাটি তারা সিক্ত করেছে গায়ের ঘাম দিয়ে।

ওদের সঙ্গে আর একটি মেয়ে ছিল; লম্বা, ঋজু, সমতল-বুক, ভারি চোয়াল আর কয়লার মতো কালো, ট্যারা চোখ দুটিতে ভোঁতা নিরুত্তাপ দৃষ্টি।

সন্ধ্যা বেলায় হলদে রুমাল মাথায় মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে বস্তির পিছন দিকে কিছুদূর গিয়ে একগাদা পাথরের ওপর বসতো আর হাতের চেটোতে থুতনি রেখে মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো গলায় গান গাইতো:

চার্চ বাড়ীটার আঙ্গিনা ছাড়িয়ে সবুজ ঝোপের মাঝে
হলুদ বালিতে শুভ্র আমার চাদর বিছিয়ে দেবো
তাকিয়ে থাকবো মোর দয়িতের আসার পথটি চেয়ে
দেখা পেলে তার দু-হাত বাড়িয়ে মোর কাছে টেনে নোবো।

হলদে রুমাল মাথায় মেয়েটি সাধারণতঃ চুপচাপ বসে নিজের পেটের দিকে তাকিয়ে থাকতো কিন্তু কখনো কখনো সেও হঠাৎ করে গানটাতে গলা মিলিয়ে ফেলতো আর গভীর, অলস, পুরুষালি গলায় কান্নাভরা কথাগুলি গাইতো:

হে প্রিয় আমার,
হে আমার প্রিয়তম
পাবো না গো আর হেরিতে তোমায়
মন্দ ভাগ্য মম।

দক্ষিণ দেশের এই কালো শ্বাসরোধী অন্ধকার, এই আর্তস্বর আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলতো উত্তরের তুষার-ঢাকা জনহীন অঞ্চল, গোঙানো তুষার ঝড় আর নেকড়েদের চিৎকারের স্মৃতি……

তারপর সেই ট্যারা মেয়েটি হঠাৎ জ্বরে পড়লো। ক্যাম্বিসে স্ট্রেচারে শুইয়ে তাকে সহরে নিয়ে যাওয়া হলো। রাস্তায় কাঁপছিল, গোঙাচ্ছিল মেয়েটি আর তার গোঙানি শুনে মনে হচ্ছিল যেন সে গীর্জার আঙ্গিনা ও বালুকাভূমির গানটি গেয়ে চলেছে সে।

……হলদে রুমাল ঢাকা মাথাটি ঝোপের নীচে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হল।

প্রাতরাশ সেরে মধুর পাত্রটির মুখ পাতা দিয়ে মুড়ে, বোঁচকা বেঁধে নিয়ে, কর্নেল-কাঠের লাঠিটা শক্ত মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে অস্ত যে রাস্তা দিয়ে গেছে সেই রাস্তা ধরে ধীরে-সুস্থে এগিয়ে চললাম আমি। এসে পড়লাম সরু একফালি ধূসর রাস্তার উপর। ডানদিকে দীর্ঘ

কলছে গভীর নীল সমুদ্র। সমুদ্রকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন হাজার হাজার অদৃশ্য ছুতোর তার উপর র‍্যাঁদা চালাচ্ছে, আর রাশি রাশি কাঠের ছিলকে, স্বাস্থ্যবতী রমণীর নিশ্বাসের মতো আর্দ্র, উষ্ণ ও সুগন্ধী বাতাসে উড়তে উড়তে মর্মর ধ্বনি তুলে লুটিয়ে পড়ছে তীরে। একখানি তুর্কী বজরা বন্দরের দিকে ভীষণভাবে ঝুঁকে সুহুমের দিকে ভেসে চলেছে। তার পালগুলো ফেঁপে উঠেছে সুহুমের গোলগাল রোড্-ইঞ্জিনীয়ারটার ফোলা গালদুটোর মতো। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি' ছিল সে সুহুমে। কোন কারণে 'চুপরও' কে চোপরা' আর 'হতে পারে'কে 'হত্যে পারে' বলতো সে সব সময়।

সে বলতো, "চোপরা। হত্যে পারে, তোরা ভাবছিস—লড়তে পারিস তোরা; কিন্তু বাছাধন, দু'সেকেণ্ডেই আমি তোদের থানায় ছুঁড়ে দিতে পারি!"

মানুষগুলোকে থানায় টেনে তুলতে পারলে একটা 'বিশেষ' আনন্দ পেতো লোকটা, আর এখন ভাবতে বেশ ভালো লাগে, এতো দিনে নিশ্চয়ই কবরের পোকাগুলো তার শরীরটা হাড় অবধি খেয়ে ফেলেছে।

……হাঁটতে কি ভালোই না লাগছিল! হাওয়ায় ভেসে চলেছি যেন! সুখকর চিন্তা আর উজ্জ্বল সব অতীতের স্মৃতি আমার স্মরণে ঐকতান বাজিয়ে চলেছে। আমার হৃদয়ের ওই সব গুঞ্জন যেন সমুদ্রের উপরের শুভ্রশীর্ষ ঢেউগুলোর মতো, যার গভীর অতলে রয়েছে আমার শান্ত অন্তরাত্মা। ওখানে যৌবনের উজ্জ্বল আনন্দময় আশাগুলো, সমুদ্রের গভীরে রুপোলি মাছের মতো নিরুদ্বেগে সাঁতার কাটে।

সমুদ্রের দিকে চলেছে রাস্তাটা; এঁকে বেঁকে কাছে, আরো কাছে এগিয়ে যাচ্ছে ঢেউ ভেঙ্গে-পড়া বালুকাময় তটভূমির দিকে।—ঝোপগুলো যেন সমুদ্রকে একঝলক দেখবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, ঝুঁকে পড়েছে ফিতের মতো রাস্তাটার উপর, যেন মাথা নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে বিস্তৃত নীল জলরাশিকে।

বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে পাহাড় থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছে।

……ঝোপের মধ্য থেকে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ—মানুষের গোঙানি, যা সব সময়ই বুকে গিয়ে লাগে।

ঝোপগুলো ঠেলে সরিয়ে দেখলাম হলুদ রুমাল মাথায় সেই মেয়েটি একটা বাদাম গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে। এক দিকে কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে তার মাথাটা। মুখটা বেঁকে গেছে যন্ত্রণায়। একটা অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার ঠেলে ওঠা চোখ দু'টোতে।

দু'হাতে সে তার বিরাট পেটটাকে ধরে আছে আর এমনই অস্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে যে স্নায়বিক আক্ষেপে স্পষ্টতঃই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে তার পেটটা। নেকড়ের মতো হলুদ দাঁতগুলো বের করে অস্ফুটভাবে কাতরালো মেয়েটি।

"কি ব্যাপার? কেউ মেরেছে নাকি তোমাকে?" তার উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি। ধূসর রঙের ধুলোতে, একটা পা দিয়ে আর একটা নগ্ন পা'কে ঘষলো মেয়েটি যেন একটা মাছি পরিষ্কার করে নিচ্ছে নিজেকে। ভারী মাথাটা গড়িয়ে রুদ্ধস্বরে বললো:

"দূর হও এখান থেকে!……নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার!……যাও বলছি।"

বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা—এরকম ঘটনা আগেও একবার দেখেছি। ভয় অবশ্যই পেয়েছিলাম—তাই লাফিয়ে সরে এলাম রাস্তায়। কিন্তু ঠিক তখনই মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো, প্রচণ্ড জোরে দীর্ঘ আর্তনাদ। ঠেলে ওঠা চোখ দুটো যেন ফেটে যাবে, আর তার অস্বাভাবিক লাল, ফোলা গালদুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

আমি বাধ্য হলাম আবার তার কাছে ফিরে যেতে। বোঁচকা, কেৎলি ও চায়ের পাত্রটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আমি। মেয়েটিকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে যেই তার পা'দুটো হাঁটুর কাছে ভাঁজ করতে যাবো অমনি সে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, আমার মুখ ও বুকে দমাদ্দম কয়েকটা কিল বসিয়ে পাল্টি খেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের গভীরে এগিয়ে যেতে লাগলো একটা ক্রুদ্ধ মাদী-ভালুকের মতো গর্জন করতে করতে:

"শয়তান……জানোয়ার!"

শিথিল হয়ে তার হাত দুটো ভেঙে পড়লো, মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মেয়েটি। আবার সে কাতরে উঠলো, স্নায়বিক বিক্ষেপে তার পা'দুটো ছড়িয়ে দিয়ে।

উত্তেজনার মুহূর্তে, এ ব্যাপারে যা কিছু জানতাম সব কিছুই হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল আমার। মেয়েটাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে পা'দুটো মুড়ে দিলাম,—ভ্রূণের পাতলা আবরণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

"চুপ করে শুয়ে থাকো, ওটা আসছে!"—তাকে বললাম। সমুদ্রের ধারে ছুটে গিয়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে হাত দু'খানা ভালো করে ধুয়ে ফিরে এলাম সঙ্গে সঙ্গেই। দাইয়ের কাজ করার জন্য এখন আমি তৈরী।

বার্চগাছের ছাল আগুনে দিলে যেমন কুঁকড়ে যায়, মেয়েটিও ঠিক তেমনি কুঁকড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। হাতের চেটো

দিয়ে মাটিতে আঘাত করে, মুঠো ভর্তি শুকনো ঘাস খামচে মুখে পুরে দিতে চাইল সে। রক্তের মতো লাল বুনো চোখ দুটোতে, আর অমানুষিক বিকৃত মুখের ভেতর মাটি ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইতি মধ্যে ভ্রূণ-আবরণ কেটে শিশুটির মাথা বেরিয়ে এসেছে। চেপে ধরে পা-ছোঁড়া বন্ধ করলাম মেয়েটির। শিশুটির নির্গমনের সাহায্যও করলাম আর নজর রাখলাম যাতে সে তার বিকৃত মুখের মধ্যে আবার শুকনো ঘাস না পুরে দেয়।

তারপর আমরা পরস্পরকে বেশ একপ্রস্থ গালাগালি দিলাম। ও দিল দাঁতে দাঁত চেপে, আর আমি দিলাম নীচু গলায়। ও গালি দিল যন্ত্রণা এবং হয়তো লজ্জায় আর আমি গালি দিলাম সংকোচ ও ওর প্রতি প্রগাঢ় করুণায়·······

"উঃ ভগবান!" ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েটি। যন্ত্রণায় বিবর্ণ তার ঠোঁট দু'টোতে দাঁত বসে গেছে, মুখের কোনে ফেনা ভাঙছে, আর সূর্যের আলোতে নিস্প্রাণ চোখ দুটো থেকে অঝোর-ধারায় ঝরে পড়ছে মাতৃত্বের অসহ্য যন্ত্রণার অশ্রু। তার সারা দেহটা টান টান হয়ে আছে, ওটাকে যেন দুটো ভাগে ছিঁড়ে দিচ্ছে কেউ।

"চলে····যাও····শয়তান····কোথাকার!"

সে তার শিথিল দুর্বল হাত দুটো দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে আমাকে। আমি আবেদনের ভঙ্গিতে ওকে বলি:

"বোকামি করো না! চেষ্টা কর, প্রাণপণে চেষ্টা কর। এক্ষুনি খালাস হয়ে যাবে।"

তার প্রতি করুণায় আমার বুক ছিঁড়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন ওর চোখের জল আমার চোখ ফেটে বেরুচ্ছে। আমার বুকটা বুঝি ফেটে যাবে! আমি চিৎকার করতে চাইছিলাম এবং চিৎকার করে উঠলামও শেষ পর্যন্ত:

"বেরিয়ে এসো! তাড়াতাড়ি করো।"

আর ছাখো—একটা ক্ষুদে মানুষ শুয়ে আছে আমার হাতের ওপর —বিটের শেকড়ের মতো টুকটুকে লাল। আমার চোখ উথলে অশ্রুর ধারা নামলো। কিন্তু অশ্রুর ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম এই ক্ষুদে লাল প্রাণীটি এর মধ্যেই পৃথিবীটার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। যদিও সে এখনো মায়ের সাথেই বাঁধা তবুও ট্যাঁ ট্যাঁ করে তারস্বরে চিৎকার করে, হাত-পা ছুঁড়ে, রীতিমতো যুদ্ধ বাধিয়ে বসেছে আমার হাতের ওপর। চোখ দুটি নীল, কিম্ভুত কিমাকার বোঁচা হাস্যকর নাকটা লাল থ্যাবড়ানো মুখখানায় মিশে গেছে, ঠোঁট দু'খানা নড়ছে চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে—

ইঁয়া·······ইঁয়া*·······

* রুশ ভাষায় 'ইঁয়া' মানে আমি। —অনুবাদক

তার সারা দেহটা এমনই পিছল যে আমার ভয় হচ্ছিল পাছে না আমার হাত ফসকে সে নীচে পড়ে যায়! হাঁটু গেড়ে বসে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিলাম—হাসছিলাম তাকে দেখার আনন্দে···· আর ভুলেই গেলাম এর পরে আমাকে কি করতে হবে।

"নাড়ীটা কেটে ফ্যালো·······" মা ফিস ফিস করে বললো। তার চোখ দুটি বোজা, মুখখানি মৃত মানুষের মতো ধূসর, চোপসানো।

"কেটে ফ্যালো ওটা·· তোমার ছুরি দিয়ে····" বললো সে। তার বিবর্ণ চোখ দুটো নড়লো কি নড়লো না বোঝা গেল না।

বস্তিতে থাকতেই আমার ছুরিখানা চুরি গিয়েছিল—তাই দাঁত দিয়েই কামড় বসালাম নাড়ীটাতে। বাচ্চাটা খাঁটি ওরেলবাসীর কর্কশগলায় চিৎকার করে উঠল। মৃদু হাসছে মা। আমি দেখতে পেলাম তার চোখ দুটো আশ্চর্যজনক ভাবে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে—আর তার অতলান্ত গভীরে ফুটে উঠছে একটা নীল শিখা।

কালো হাতখানি দিয়ে সে তার জামার পকেট হাতড়াতে লাগলো তারপর দাঁতের আঘাতে রক্তাক্ত ঠোঁট দুটি তার নড়ে উঠলো:

"আমার····শক্তি····নেই····এক টুকরো····দড়ি····পকেটে আছে···· নাইটা····বাঁধো।" বললো সে।

দড়ির টুকরোটা খুঁজে পেলাম আমি, আর তা' দিয়ে বাচ্চার নাইটা বেঁধে দিলাম। মায়ের হাসি আরো উজ্জল হয়ে উঠলো, সে হাসি এতো দীপ্ত যে প্রায় চোখ ধাঁধিয়ে দিল আমার।

"আমি ও'কে ধুইয়ে নিয়ে আসি, তুমি ততক্ষণ নিজেকে ঠিকঠাক করে নাও।"—বললাম আমি।

"দেখো সাবধান। আস্তে আস্তে করো। সাবধানে যেও।" উদ্বেগের সঙ্গে অস্ফুট স্বরে বললো সে।

এই লাল ক্ষুদে মানুষটা কিন্তু মোটেই সাবধানী ব্যবহার চায় না হাতের মুঠি তুলিয়ে এমন ভাবে চেঁচাচ্ছে যেন লড়তে আহ্বান জানাচ্ছে আমাকে:

"ইঁয়া····ইঁয়া।"

"এইতো চাই! এইতো চাই! জোরের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠি কর ভাই; নইলে প্রতিবেশীরা তোমার ঘাড় মুচড়ে দেবে।"—আমি তাকে সতর্ক করে দি।

সমুদ্রের যে ফেনীল তরঙ্গটা আমাদের দুজনকে ভিজিয়ে দিল, তা প্রথম ধাক্কাতেই সে একটা বিশেষ বর্বর চিৎকার দিয়ে বসলো তারপর আমি যখন তার বুকে পিঠে ছোট ছোট থাপ্পড় মারতে লাগলা তখন সে চোখদুটো কুঁচকে, হাত পা ছুঁড়ে প্রাণপণে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে লাগলো আর ঢেউ এর পর ঢেউ এসে ধুইয়ে দিতে লাগলো তার ছো শরীর।

"থেমো না! চেল্লাও! ফুসফুস ফাটিয়ে চেল্লাও! ওদে

দেখিয়ে দাও যে তুমি ওয়েলের মানুষ।"—আমি উৎসাহের সুরে চেঁচিয়ে বলি।

যখন তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম তখন মা চোখ দুটি বন্ধ করে মাটিতে শুয়েছিল, প্রসব-ব্যথার পরের যন্ত্রণার ঝোঁকে ঠোঁট কামড়াচ্ছে সে; গোঙানী আর কাতরানির মধ্যেও আমি শুনতে পেলাম সে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে :

"দাও····ওকে দাও··· আমার কাছে"

"থাক না!"

"না—না·· আমার····কাছে····দাও!"

কম্পিত হাত দুটো দিয়ে সে ব্লাউজের বোতাম খুললো। আমি তাকে স্তন উন্মুক্ত করতে সাহায্য করলাম, অন্ততঃ বিশটি শিশুর জন্য প্রকৃতির গড়া প্রাণ-ভাণ্ডার! তারপর ছটফট্ করতে থাকা ওয়েলবাসীটিকে তার মায়ের উষ্ণ বক্ষে শুইয়ে দিলাম। অবস্থাটা সে মুহূর্তেই বুঝে নিল, সঙ্গে সঙ্গেই তার কান্না গেল থেমে।

"হে ঈশ্বর-জননী, কুমারী মেরি" দীর্ঘশ্বাস নিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো মা, আর তার অবিন্যস্ত মাথাটা বোঁচকার ওপর এপাশ ওপাশ করতে লাগলো।

হঠাৎ মৃদু আর্তনাদ করে নীরব হয়ে গেল মেয়েটি; তারপর তার অবর্ণনীয় সুন্দর চোখদুটি মেললো সে—সদ্য-প্রসূতি মায়ের পবিত্র চোখ দুটি। সে দুটি নীল; তাকিয়ে আছে নীল আকাশের দিকে। একটি কৃতজ্ঞ প্রফুল্ল হাসি ঝিকমিক্ করে মিলিয়ে গেল সেই চোখ দুটিতে। ক্লান্ত বাহু তুলে মা নিজের আর সন্তানের দেহে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিল·······

"জয় হোক তোমার, হে ঈশ্বর জননী, পবিত্র কুমারী মেরি।····জয় হোক····"

তার চোখের আলো আবার মিলিয়ে গেল। মুখে আবার ফিরে এলো পূর্বের বিধ্বস্ত বিবর্ণতা। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থাকলো সে, তারপর হঠাৎ দৃঢ়, কাজের কথার ভঙ্গিতে বলে উঠলো :

"আমার থলেটা দাওতো বাছা।"

আমি থলেটা খুললাম। আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো সে, ক্ষীণভাবে হাসলো আর আমার মনে হলো যেন একটা হাল্কা লজ্জার ছায়া খেলে গেল তার বসে যাওয়া গাল ও ঘর্মাক্ত ভুরুতে।

"একটু দূরে যাও তো।" বললো সে।

"সাবধান, খুব বেশী যেন নিজেকে নাড়াচাড়া করো না",—আমি তাকে সতর্ক করে দিলাম।

"ঠিক আছে····ঠিক আছে·· তুমি যাওতো এখন!"

আমি পাশের ঝোপগুলোর ভেতরে গিয়ে বসলাম। ভীষণ অনুভব করছিলাম আমি! মনে হচ্ছিল যেন সুন্দর পাখীরা সুরে গান গাইছে আমার বুকের মধ্যে—আর সমুদ্রের অ[illegible] কল্লোলের সঙ্গে মিশে তা' এতো ভালো লাগছিল যে মনে হচ্ছি[illegible] এই গান আমি সারা বছর ধরে শুনতে পারি·······

অদূরে কোথাও একটা ঝরণা কুল কুল ধ্বনি করে চলেছে কোন মেয়ে তার প্রণয়ীর কথা বলছে বান্ধবীর কাছে····

ঝোপের উপরে একটা মাথা জেগে উঠলো, হলুদ রুমালটি পরিপাটি করে বাঁধা।

"এই যে! কি ব্যাপার?"—আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছো না কি?" নিজের ভার সামলাতে [illegible] শাখা ধরে মাটিতে বসে পড়লো মেয়েটি; তাকে দেখে মনে যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুধু বিশাল নীল মতো চোখ দুটি ছাড়া, ছাইয়ের মতো ধূসর মুখ খানিতে লেশমাত্রও নেই। নরম হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে, ফিস্ ফি[illegible] বললো :

"দ্যাখো—কেমন ঘুমুচ্ছে····"

তা, বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিল ভালোই, কিন্তু যতদূর আমি পেলাম—তাতে অন্য বাচ্চাদের থেকে খুব একটা আলাদা কিছু পেলাম না; যদি কোন তফাৎ থেকে থাকে তাহলে সেটা পরিবেশের। শরতের উজ্জ্বল ঝরাপাতার একটা স্তূপের ওপ[illegible] আছে সে, একটা ঝোপের নীচে; ওরেল প্রদেশে ওরকম জন্মায় না।

"তোমার এখন একটু শুয়ে পড়া উচিৎ, মা।" আমি বললা[illegible]

"নুনা," মাথা ঝাঁকিয়ে দুবলভাবে উত্তর দিল সে, "[illegible] জিনিসপত্র গুছিয়ে ওখানে যেতে হবে····কি যেন ব[illegible] জায়গাটাকে?"

"ওচেমচিরি?"

"ঠিক! ঠিক! আমার মনে হয় আমাদের লোকেরা এখ[illegible] কিছু ভার্স্ট এগিয়ে গেছে এখান থেকে।"

"কিন্তু তুমি কি হাঁটতে পারবে?"

"কেন? কুমারী মেরি আছেন কি করতে? তিনি কি করবেন না আমাকে?"

বেশ, ও যখন কুমারী মেরির সঙ্গেই চলেছে, তখন আম[illegible] বলার কিছু নেই!

ঝোপের নীচে, কুঞ্চিত অসন্তোষ-ভরা ছোট্ট মুখখানা তাকালো সে, নিবিড় স্নেহের উষ্ণ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ত[illegible]

ছুটি থেকে। ঠোঁট চাটছিল আর নিজের বুকে ছোট ছোট টোকা মারছিল সে। আমি আগুন জ্বালিয়ে কিছু পাথর এনে পাশে সাজিয়ে রাখলাম, কেৎলি বসাবো বলে।

"এক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে খানিকটা চা করে দিচ্ছি, মা।" আমি বললাম।

"আহ্! খাসা হবে····আমার বুক দুটো যেন শুকিয়ে গেছে।"—ও জবাব দিল।

"তোমার দলের লোকেরা তোমাকে ফেলেই পালালো নাকি?"

"না! তা করবে কেন? আমিই পিছিয়ে পড়েছিলাম। তারা দু'এক পাত্তর চড়িয়ে ছিল····আর ভালোই হয়েছে। ওরা সবাই আশে পাশে থাকলে—জানিনা কি কোরতাম····"

আমার দিকে একনজর তাকিয়ে সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো, তারপর রক্তমাখা থুথু ফেলে সলজ্জ হাসলো।

"ওকি তোমার প্রথম নাকি?" —জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"হ্যাঁ, আমার প্রথম· কিন্তু, তুমি কে?"

"দেখে তো মনে হয় আমি একটা মানুষ····"

"তা, মানুষ তো বুঝলাম, বিয়ে-থা হয়েছে?"

"না, সে সম্মান এখনো জোটেনি।"

"মিছে কথা বলছো না তো?"

"না, মিছে বলবো কেন?"

চিন্তান্বিতভাবে সে তার চোখের দৃষ্টি নীচের পানে নামিয়ে নিল। তারপর প্রশ্ন করলো:

"মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপারগুলো, তুমি কি করে জানলে বলতো?"

এবার একটা মিথ্যা কথা বললাম আমি:

"আমাকে এটা শিখতে হয়েছে। আমি একজন ছাত্র,—মানেটা বোঝো তো?"

"নিশ্চয়ই! আমাদের পুরোহিতের বড় ছেলে—সেও ছাত্র। ও পুরোহিত হবার জন্য পড়াশুনো করছে····"

"হ্যাঁ, আমিও তারই মতো একজন····আমি বরং যাই, জল ভরে আনিগে' কেৎলিতে।"

মেয়েটি তার নবজাতকটির দিকে মাথা হেলালো, শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কিনা শুনতে, তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো:

"আমি একটু গা'টা ধোওয়া মোছা করতে চাই, কিন্তু জানিনা জলটা কেমন····কি রকম জল যেন ওটা! একই সাথে নোনতা আর তেতো।"

"তা ভালো। গিয়ে চান করতে পারো। বেশ স্বাস্থ্যকর জলটা।"

"সত্যি?"

"সত্যি কথাই বলছি তোমাকে। আর ঝরনার জল থেকে বেশ গরম ওটা। এখানকার ঝরণার জলটা বরফের মতো ঠাণ্ডা।"

"তুমিই জান····"

ছেঁড়া-খোঁড়া ভেড়ার চামড়ার টুপি মাথায় একজন আরখাজিয়ান ঘোড়ায় চড়ে দুলকি চালে বেরিয়ে গেল, মাথাটা তার ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। ঝিমুচ্ছে সে। তার ছোট বলিষ্ঠ ঘোড়াটা কান খাড়া করে সপ্রশ্ন চোখে একবার আমাদের দিকে চাইলো তারপর চিঁহিঁ করে উঠতেই অশ্বারোহী ঝাঁকুনী খেয়ে মাথা তুলল। একবার দেখে নিল আমাদের দিকে, পরক্ষণেই আবার ঝুঁকে পড়লো তার মাথাটা।

"এখানকার লোকগুলো কি অদ্ভুত, দেখলেই ভয় করে"—ওরেলের মেয়েটি শান্তস্বরে বললো।

আমি ঝরণার দিকে গেলাম। পারার মতো উজ্জ্বল জীবন্ত জল বুদবুদ তুলে কল্‌কল্ করে আছড়ে পড়ছে পাথরের উপরে, আর শরতের পাতাগুলো সোল্লাসে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই জলে। কি চমৎকার! আমি মুখ ধুয়ে কেৎলি ভরলাম। আসতে আসতে ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, মেয়েটি মাটি আর পাথরের উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে আর উদ্বেগের সাথে মাঝে মাঝে পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে।

"ব্যাপার কি?" —জিজ্ঞাসা করলাম আমি। মেয়েটি চমকে থেমে পড়লো। তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে উঠলো, আর কি যেন লুকোতে চেষ্টা করলো সে তার কাপড়ের মধ্যে। অনুমান কোরলাম জিনিসটা কি।

"আমাকে দাও।" তাকে বললাম। "আমি মাটিতে পুঁতে ফেলছি····"

"কি বলছো ভাই তুমি? স্নানের ঘরের নীচে এটা পোঁতার নিয়ম।"

"তুমি কি ভাবছো তোমার জন্য কেউ এখানে চট্‌পট্ একটা স্নানের ঘর বানিয়ে দেবে?"

"তুমি ঠাট্টা করছো; কিন্তু জানো, ভয় করছে আমার। ধর যদি কোন বুনো জানোয়ার খেয়ে ফ্যালে ওটা···যাই হোক, মাটিতে পুঁতে দিতে হবে এটা····।"

এই কথা বলে সে তার মুখ একপাশে ফিরিয়ে আমার হাতে একটা ভারী স্যাৎস্যাতে পুঁটলি গুঁজে দিল। লজ্জায় লাল হয়ে কাকুতি ভরা কণ্ঠে বললো:

"এটা ভালো করে পুঁতে ফেলো, কেমন ত'? যীশুর দোহাই, যত নীচে পারো পুঁতে ফেলো···· আমার বাচ্চার মুখ চেয়ে কাজটা ভালো করে করো, কেমন?"

যখন ফিরে এলাম সে তখন স্খলিত পদক্ষেপে, হাতদুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে সমুদ্রের ধার থেকে ফিরছে। কোমর অবধি ভিজে গেছে তার জামাটা। তার মুখে একটু রঙের ছোঁয়া লেগেছে—যেন ভিতরের কোন জ্যোতিতে উজ্জল হয়ে উঠেছে।

সবিস্ময়ে নিজের মনে ভাবি আমি :

"ওর গায়ে কি ষাঁড়ের মতো শক্তি রয়েছে!"

পরে আমরা যখন মধু দিয়ে চা খাচ্ছিলাম, সে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলো :

"তুমি কি তোমার বই পড়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ? মদ ধরেছিলে না কি ?"

"হ্যাঁ, মা। একেবারে গোল্লায় গিয়েছিলাম!"

"বাঃ! বেড়ে করেছিলে!—হ্যাঁ, ঠিক! ঠিক! তোমাকে মনে পড়েছে। সুহুমে তোমাকে দেখেছিলাম বটে—খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া করতে। সেই দিনই আমি মনে মনে ভেবেছিলাম : নিশ্চয়ই মাতাল হবে লোকটা। কোন কিছুতেই ভয় পায় না।" সদ্যোজাত ওরেলবাসীটি শান্তভাবে যেখানে ঘুমিয়ে আছে, ফোলা ঠোঁট দুটো থেকে মধু চাটতে চাটতে বারবার সেই ঝোপটার দিকে সে তার নীল চোখের দৃষ্টি ফেরাতে লাগলো।

"ও বাঁচবে কি করে ?"—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে। "তুমি আমাকে সাহায্য করেছ, তার জন্য ধন্যবাদ···· কিন্তু এতে কি ওর কল্যাণ হবে ? ···জানি না····"

খাওয়া শেষ হলে ও নিজের গায়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো, আর আমি যখন আমার জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলাম সে নিদ্রালুর মতো বসে শূন্য দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে দুলছিল; স্পষ্টই বোঝা যায়, চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছে সে। একটু পরেই সে উঠে দাঁড়ালো।

"তুমি কি সত্যি রওনা দিচ্ছো ?"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ।"

"নিজের প্রতি যত্ন নিও, মা।"

"কেন ? কুমারী মেরি ······ওকে তুলে এনে দাও আমাকে।"

"আমি ওকে বয়ে নিয়ে যাবো।"

এ নিয়ে দুজনের মধ্যে খানিকটা তর্ক হলো। শেষ পর্যন্ত রাজী হলো সে, তারপর রওনা দিলাম আমরা। চললাম পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

"আশা করি, হোঁচট খেয়ে পড়বো না।" অপরাধীর হাসি হেসে বললো সে, তারপর আমার কাঁধের উপর বাহুটা তুলে দিল।

রুশ দেশের নতুন অধিবাসীটি, অজ্ঞাত-গন্তব্যের এই মানুষটি আমার বাহুতে শুয়ে সশব্দে নাক ডাকাচ্ছে। সারা গায়ে সাদা-ফেনার কল্কা পরা সমুদ্র উথলে উঠে ভেঙে পড়ছে তীরের উপর। ঝোপেরা ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে পরস্পর। মধ্য গগন পার হয়ে জ্বল জ্বল করছে সূর্যটা।

আমরা মন্থর গতিতে হেঁটে চলেছি। মাঝে মাঝে থেমে পড়ছে মা, গভীর নিশ্বাস নিচ্ছে আর পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছে চারদিক—সমুদ্র, বন, পাহাড় আর তার শিশুটির মুখ; বেদনার অশ্রু-ধৌত তার চোখ দুটি এখন অদ্ভুত স্বচ্ছ, আবার সে-দুটিতে জ্বলছে অফুরন্ত ভালোবাসার নীল শিখা।

একবার সে থামলো। আর বললো :

"প্রভু, হে প্রিয় মঙ্গলময় ঈশ্বর! কি চমৎকার! কি কল্যাণময়! আহ্, যদি আমি সর্বদা এই রকম চলতে পারতাম, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, আর আমার এই ক্ষুদ্র শিশুটি বেড়ে উঠতো—বেড়ে উঠতো স্বাধীনতায়, তার মায়ের বুকের কাছটিতে আমার স্নেহের দুলাল·······

·······সমুদ্র অবিরাম গুঞ্জন করে চলেছে·······

---

গল্পটি ম্যাক্সিম গোর্কির ছোট গল্প A Man is Born-এর ভাবান্তর ]

অনুবাদক : ফণিভূষণ চট্টরাজ

# পাবলো পিকাসো

উমাশংকর চট্টোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর ছবি আঁকার জগতে পাবলো পিকাসো একটি নাম। আজ অবধি কোনো শিল্পীই তাঁর জীবনকালে সমসাময়িক শিল্পীদের উপর পিকাসোর মত এত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। পিকাসোর ছবি নিয়ে বড় বড় পণ্ডিত, শিল্পসমালোচক ও নানান্ দেশের বুদ্ধিজীবিরা অনেক আলোচনা করেছেন, অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তৈরী হয়েছে মোটা মোটা সব বিশ্বকোষ। কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ছবি আঁকা তথা শিল্পের সার্থকতা, শিল্প ও মানুষের সম্পর্ক আর তারই সাথে সাথে শিল্পীর সাথে সমাজের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক নিয়ে যে আলোচনা চলেছে তা দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারায়, শিল্পীর জগৎ তাঁর নিজস্ব, সে জগতে মানুষ আছে, কিন্তু সেই মানুষেরা শোষক আর শোষিত এই দুই দলে ভাগ হয়ে যায় নি। তাঁরা মনে করেন যে শিল্পীর বক্তব্য হবে "চিরন্তন সত্য", "কালজয়ী সৌন্দর্য", "চিরকালের" মানবীয় গুণাবলীর প্রকাশ। তাঁরা শিল্পীর সৃষ্টিক্ষমতাকে অলৌকিক আখ্যা দিয়ে শিল্পীকে সমাজ ও ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেন। দ্বিতীয় চিন্তাধারার বাহকদের মতে 'শিল্পের জন্যই শিল্পসৃষ্টি' কথাটা একটা ডাহা মিথ্যা, শিল্পী সমাজের বাইরের নন, এবং শিল্পীর "নিজস্ব" দুনিয়া বলে কিছুই থাকতে পারে না। তাঁর দুনিয়া হয় শোষিতের নয়তো বা শোষকের ; মাঝামাঝি কিছু নেই।

পিকাসোর শিল্পীজীবন—ছবি আঁকার আর মূর্তি গড়ার জীবনও দুটি ধারাতে বিভক্ত। একটি ধারায় শিল্পী পিকাসোকে আমরা দেখতে পাই মানবসভ্যতার ধর্ষণে প্রতিবাদে ফেটে পড়তে। আর অন্যটিতে—পিকাসো শান্ত, পিকাসো নিস্পৃহ, চিত্রকলার ভিন্ন ভিন্নতর প্রকাশে পিকাসো আত্মমুখী—পিকাসো পৃথিবীব্যাপী উন্মত্ত দানবের ধ্বংসতাণ্ডবে একেবারেই উদাসীন।

১৮৮১ সালে স্পেনের মালাগায় পিকাসোর জন্ম। বাবার নাম জোজ্ রুইজ ব্লাস্‌কো, মা'র নাম মারিয়া পিকাসো লোপেজ্। বাবা ছিলেন স্পেনের আর্টস্কুলের অধ্যাপক। পিকাসোর ছবি আঁকার হাতেখড়ি বাবার কাছেই। মাদ্রিদের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে পিকাসো বার্সেলোনার 'স্কুল অফ ফাইন আর্টস'-এ ভর্তি হন এবং সেখানে কয়েকবছর কাটিয়ে চলে যান মাদ্রিদের প্রধান আর্ট স্কুলে।

১৯০০ সালে, ২২ বছর বয়সে, পিকাসো আসেন প্যারিসে। পুরানো একঘেয়েমি আর চলতি রীতিনীতিকে ভেঙ্গে, প্যারিসের শিল্পীরা তখন মরণপণ লড়াই চালিয়ে, শিল্পের জগতে নিজেদের বক্তব্যকে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ১৯০১ সালে পিকাসো প্যারিসে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তাঁর এই সময়কার কয়েকটি ছবিতে ইমপ্রেশানিজম্[১]-এর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসের এই সময়টি অনেক পরিবর্তনে চিহ্নিত। সারা পৃথিবী তখন নিপীড়িত আর নিপীড়নকারীর মধ্যেকার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টায় আলোড়িত। আর এই আলোড়ন জন্ম দিলো শিল্পের নানান্ ধারার।

১৯০১ সালে মাদ্রিদে ফিরে এলে, পর এক অবসাদ (হয়ত বা যন্ত্রণা বলাই ভালো) তাঁকে পেয়ে বসলো। প্যারিসীয় চিন্তাধারার সাথে স্পেনীয় শিল্পরীতির যোগাযোগ আর সেইসাথে পিকাসোর নিজস্ব অনুভূতি তৈরী করলো "নীল"যুগের ছবি। নীলরঙ-এর প্রাধান্যের জন্য শিল্পসমালোচকরা পিকাসোর ছবির এই সময়কালকে 'নীল' যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। বার্সেলোনার রাস্তায় অন্ধভিক্ষুকের অসহায় অবস্থা অথবা গরীব মায়ের কোলে শিশুপুত্র এগুলি তার

---

১. ইম্প্রেশানিজম্ : ১৮৬৩ সালে ফ্রান্সের শিল্পআকাদেমীর বার্ষিক প্রদর্শনীতে যোগদানেচ্ছু শিল্পীদের ৪,০০০ ছবি বাতিল হয়। শিল্পীদের বহুদিনের জমাটবাঁধা বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। সম্রাট বিক্ষোভের কাছে নতিস্বীকার করে বাতিল ছবির আলাদা একটি প্রদর্শনীর জন্য আকাদেমীকে আদেশ দেন। এই শিল্পীদের মধ্যে জনাকয়েকের ছবিকে জনগণই ব্যঙ্গ করে 'ইমপ্রেশানিষ্ট' আখ্যা দেন। শিল্পীরা সেই নাম গ্রহণ করেন। ক্যানভাসের উপর বস্তুর হুবহু নকল করা পরিত্যাগ করে, কোনো বস্তু ও তার উপর পড়া আলোর প্রতিক্রিয়া শিল্পীর মনে যে ছাপ ফেলে সেটাকেই তাঁরা দর্শকেদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। আর বলতেন পুরানো ছবি 'সাজানো'—তার মধ্যে সত্যিকারের জীবনের (যে জীবন সাধারণ মানুষ ও শিল্পীদের ঘিরে থাকে) কোন গন্ধ নেই। এঁরা ছবি, পরী, দেবদূত আর পৌরানিক কাহিনীর ছবি আঁকা ছেড়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও প্রকৃতির আলোর খেলা নিয়ে মেতে উঠলেন।

ছবিতে এনে দিয়েছিলো দারিদ্র্যের বিভীষিকার মেজাজ, ভালোবাসা, মৃত্যু বা অন্ধত্বের নানান অভিব্যক্তি। ছবির আঙ্গিক খুবই সরল, রঙ্-এর কারিগরীও কম এবং ছবির অন্তর্বস্তু দর্শককে নাড়া দেয় সহজেই। অবশ্য প্রথমধারার শিল্পসমালোচকদের মতে পিকাসোর এই সময়কার ছবি নাকি 'অতিভাবপ্রবণতা' দোষে দুষ্ট, তাঁরা বলেন 'অহেতুক আবেগ ছবির সৌন্দর্য্যরসবোধে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।'

পিকাসো জীবনে পুরানো শিক্ষকদের সৃষ্টি অধ্যয়ন করেছিলেন গভীরভাবে। কিন্তু তাঁর ছবি প্রথম জীবন থেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়েছিলো। তাঁর ছবির নতুন নতুন ফর্মের (কিউবিজম্,[1] ক্যালিগ্রাফী,[2] কলাজে ইত্যাদি) মূল উৎস ছিলো স্পেনীয় শিল্প ও স্পেনের নামকরা তিন শিল্পী—এল গ্রেকো,[3] ভেলাজকয়েজ[4] ও গোয়া[5]। সারাজীবনের অধিকাংশ ছবির মধ্যেই পিকাসো বহন করেছেন স্পেনের শিল্পের ঐতিহ্য।

১৯০৪ সালে পিকাসো স্পেন থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে প্যারিসের গরীব পাড়ায় স্থায়ী আস্তানা গাড়লেন। নতুন বন্ধুবান্ধবের সংগলাভে অবসাদ খানিকটা দূর হল। এখানেই, ষ্টুডিওতে কাজ করত এমন এক মেয়ের সাথে পিকাসো গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়েন। মেয়েটির নাম হ'লো ফারনন্দ্ অলিভিয়ের।

পিকাসোর ছবিতে নীল রঙ্-এর আধিক্য কমে গিয়ে লাল রঙের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। ক্যানভাসের বিষয়বস্তু তখনও সার্কাসের ক্লাউন, রুটি বিলিকরা মেয়ে, গরীব ফুলওয়ালা ছেলে—আর পিকাসো নিজে। এসময়ের কয়েকটি ছবির কথা উল্লেখ করা যায় : বয় উইথ্ এ পাইপ, জাগলার উইথ্ ষ্টিল লাইফ, বয় উইথ্ বোকেট্, উওম্যান-উইথ্ লোভস্ ইত্যাদি। এই সময়ে পিকাসো কিছুদিনের জন্য হলাণ্ডে যান। ১৯০৬ সালে গোসলে তাঁর বহু ছবি আঁকা হয় যার মধ্যে স্থান পায় স্পেনের কৃষক ও এই ধরণের ছবি।

১৯০৭ সালে 'কিউবিজম্' তার বলিষ্ঠ ভয়ানক চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো পিকাসোর একটি ছবিতে : লেস্ ডেময়সেলেস্ ড্য এ্যাভিগনন্। ছবির বিষয়বস্তু হ'লো পাঁচটি নগ্ন নারী দেহ। এই ছবিটি সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত হলো : 'ছবিটি যেন আকৃষ্ট করার জন্য নয় আঘাত দেবার জন্য সৃষ্ট।' মানুষ তার সমস্ত চলতি সৌন্দর্য হারিয়ে নিগ্রোদের বিভৎস মুখোশে রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুর চেহারাকে কতকগুলি জ্যামিতিক চেহারায় ভেঙ্গে ফেলতে শুরু করলেন পিকাসো প্রমুখ শিল্পীরা। ছবি আঁকার যুগ শেষ, ছবি তৈরীর যুগ ( construction ) শুরু হ'লো। কিউবিজম্ এগিয়ে চল্‌লো, বস্তুজগৎ তাদের সমস্ত সনাতনী চেহারা হারাতে হারাতে এমন এক জায়গায় এলো যেখানে ক্যানভাসের উপর সৃষ্টি করা বস্তুর সাথে আমাদের আর কোনো পরিচয়ই রইল না। উদাহরণ স্বরূপ যে সব ছবির কথা বলা যায় তার মধ্যে আছে : গার্ল উইথ্ এ ম্যাণ্ডোলিন, ডানিয়েল হেনরী কাহন্‌ওয়েলার, ম্যান উইথ্ এ পাইপ ইত্যাদি। কিউবিষ্ট শিল্পীরা বোধহয় এই পরিণতিতে শেষ অবধি আস্থা রাখতে পারেন নি। শিল্পসমালোচকরা এই সময়কালকে বিশ্লেষণমূলক কিউবিজম্ ( analytical cubism ) নামে অভিহিত করে থাকেন। তার পরের যুগে অর্থাৎ সিনথেটিক্ কিউবিজম্-এর যুগে বস্তুরা আবার তাদের 'চেহারা' কিছুটা ফিরে পেতে লাগলো। এই সময়কালে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন পিকাসো ও অন্যান্য কিউবিষ্ট শিল্পীরা মনে করতেন যে বস্তুর আসল চেহারাকে পেতে গেলে আমাদের অর্জিত জ্ঞান (intellect)-কে ত্যাগ করে স্বতস্ফূর্ত জ্ঞানের ( intutive knowledge ) সাহায্য নিতে হবে—এক কথায় একে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর ঠিক বিপরীত দৃষ্টিভংগী বলা যায়। মানুষকে আর সমস্ত প্রাণী জগত থেকে আলাদা করা হয় তার অর্জিত জ্ঞানের (intellect) জন্য, কেননা পশুরা চলে ইনটেলেকট-এর অভাবে ও ইনটিউশানের বশে।

জার্মানীতে পিকাসোর প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯০৯ সালে, আমেরিকায় হয় ১৯১১ সালে, আর ১৯১২ সালে প্রদর্শনী হয় লণ্ডনে। এই সময়ে পিকাসো প্রায় দশটা বই-এর প্রচ্ছদ আঁকেন। এই বছরই প্রথম জীবন সংগিনী অলিভিয়ের-এর সাথে পিকাসোর বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯১৭ সালে 'প্যারাডে' নামক একটি মঞ্চসজ্জার ভার পেলেন পিকাসো। নাটক যতক্ষণ চল্‌লো দর্শকরা পিকাসোর কিউবিজম্ হজম করতে লাগলেন। পিকাসো-বিশেষজ্ঞদের মতে এটাই নাকি পিকাসোর স্বীকৃতির চিহ্ন! ক্রমশঃ বিমূর্তভাবের প্রকাশে নতুন

---

১. কিউবিজম্ : বস্তুর চেহারা ( ফর্ম )-কে কতকগুলি রঙ-এর জ্যামিতিক চেহারায় ভেঙ্গে ছবিতে উপস্থিত করার রীতিকে কিউবিজম্ বলা হয়। বস্তুর তিনটি ডাইমেনশানকে শিল্পীরা ছবিতে দুই ডাইমেনশানের সীমায় উপস্থাপিত করেন। কিউবিজম্ মতবাদের শিল্পীরা মনে করেন যে কিউবিজম্-এর মধ্য দিয়ে বস্তুর তৃতীয় ডাইমেনশানকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। এছাড়াও কিউবিজম্-এর মাধ্যমে একসাথে, বস্তুর একাধিক দৃষ্টি কোণ থেকে দেখা চেহারাকেও ছবিতে দেখানো সম্ভব হয়।

২. ক্যালিগ্রাফী : ক্যালিগ্রাফীর অর্থ হল তুলি দিয়ে লেখা হরফ। পিকাসো এবং তৎপরবর্তী শিল্পীরা ছবিতে ব্যাপকভাবে ক্যালিগ্রাফী ব্যবহার করেন।

৩. এল গ্রেকো : ( El. Greco ) সপ্তদশ শতাব্দীর স্পেনের শিল্পী।

৪. ভেলাজকয়েজ : ( Diego Velasquez ) সপ্তদশ শতাব্দীর স্পেনের শিল্পী।

৫. গোয়া : ( Francisco Goya ) ফ্রান্সিস্কো গোয়া ( ১৭৪৬-১৮২৪ ) এবং নেপোলিয়নের স্পেন আক্রমণ ও সেই আক্রমণ বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ ১৮১২ সালের দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী। নেপোলিয়নের অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ ও শোষকের বীভৎস চেহারা অতি নিদারুণভাবে ফুটে উঠেছিলো তাঁর ছবিতে। তাঁর একটি বিখ্যাত ছবির নাম হলো : Execution of 3rd May.

পরীক্ষার ব্যস্ত হলেন পিকাসো। শিল্পে এক নতুন পদ্ধতি চালু করলেন পিকাসো ও আর কয়েকজন শিল্পী : ক্যানভাসের ছবির উপর আট্‌কানো হ'লো খবরের কাগজের টুক্‌রো, টিন পেরেক অথবা আস্ত পাইপ। এরই নাম 'কলাজে'। শ'য়ে শ'য়ে ক্যানভ্যাস ভর্তি হতে লাগলো। এই সময়ে ইটালীতে স্বল্পকালীন সফরে ক্লাসিক্যাল শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এখানেই যুবতী ওলগা কক্‌লোভার সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং ১৯১৮ সালে ওলগাকে বিয়ে করেন। ১৯২১ সালে ওলগার গর্ভে পিকাসোর সন্তান জন্ম নেয়, আর পিকাসো ফিরে আসেন মাটির পৃথিবীতে, ছবিতে ফুটে ওঠে মাতৃত্বের নানান অভিব্যক্তি। এই সময়কার বিখ্যাত ছবি হ'লো মাদার এণ্ড্‌ চাইল্ড। বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯২৫ সালে পিকাসো কিউবিজম্‌-এ আনলেন চরম নিপুণতা। পুঁজিবাদী দুনিয়ার ফলশ্রুতি—মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, মানুষের পুরানো চেহারা ভেঙ্গে দোমড়ানো মোচড়ানো চেহারার আবির্ভাবই বুঝি পিকাসোর ছবির মানুষকে কদর্য চেহারা দিয়েছে। পিকাসোর ছবিতে লাইনের কম্পোজিসান্‌, রঙ্‌এর ভারসাম্য এসবই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে পিকাসো কি বলবেন অর্থাৎ আরও সঠিক করে বলতে গেলে ছবির বক্তব্য কি ? পিকাসো বলেন : শিল্পী যা দেখে অন্যরা তা দেখে না এবং শিল্পীর কাজ হ'লো সে যা দেখেছে সেটাকেই ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু তিনি কি দেখেন ? তাঁর ছবি থেকে যা দেখতে পাই তা হ'লো দেওয়ালের চারকোণায় আবদ্ধ দোমড়ানো মোচড়ানো মানুষ। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে পিকাসো প্রমুখ শিল্পীদের সৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বর্তমান দুনিয়ার মানসিক বিভ্রান্তি, সমাজের সমষ্টিগত মানসিক বিকারবোধ। পিকাসোর সেই সময়কার ছবির 'বস্তু'রা সব যেন মানুষের বুকচাপা দুঃস্বপ্নের জগতের প্রতীক। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে সময়টা ছিলো প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের যুগ।

১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল পৃথিবীর ইতিহাসে আর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালোছায়া দুনিয়ার আকাশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ শুধুমাত্র দানবের ধ্বংসলীলা নয়, নতুন মানবসমাজের বেড়ে ওঠার কালও বটে। পিকাসোকেও আমরা দেখতে পাই ধীরে ধীরে গুহার আঁধার কোণ থেকে বেরিয়ে আসছেন—পিকাসোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুসারি মানুষ—অল্পসংখ্যক নিপীড়নকারী আর বিরাটসংখ্যক নিপীড়িত মানুষ যাদের কাঁধে অন্যায় যুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পিকাসো ধীরে ধীরে সরে এসে দাঁড়ালেন দ্বিতীয় সারির মানুষের কাছে। প্রথম সারির মানুষ ক্রমশঃ পিকাসোর কাছে আর দোমড়ানো মানুষ রইল না—তা হয়ে উঠলো পরিষ্কার করে আঁকা ষাঁড়, হাতে তার ছোরা ( মিনোটার /minotau[r] —১৯৩৩ )। পিকাসোর বিকাশ লাভের এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে গভী[র] ভাবে পরিস্ফুট হয় তাঁর ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকায়। দ্বিতী[য়] মহাযুদ্ধ বাধল। জার্মানী ফ্রান্স দখল করলো। ফ্রান্সের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে লিথোপ্রচারপত্রে পিকাসো তাঁর তুলিকে কা[জে] লাগালেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকায়। ১৯৩৭ সালে ফ্যাসিবা[দী] জার্মানী উত্তর স্পেনের গুয়ের্নিকা শহরের উপর বোমা ফেলে পিকাসোর "গুয়ের্নিকা" ঐ ঘটনারই বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি। সমস্ত ছবি[টা] যেন একটা আর্তনাদ, সারা ছবি ধ্বংসের বিভৎসতায় ভরা—তা[র] মাঝে দেখা যায় "ফ্যাসিবাদী ষাঁড়" নির্বিকার ভাবে দাঁড়ি[য়ে] রয়েছে।

এই সময়েই পিকাসোর স্ত্রী ওলগা পিকাসোকে ছেড়ে চলে যা[ন।] কিন্তু পিকাসো তখন ভীষণ ব্যস্ত। পিকাসো কবিতা লেখেন, পিকা[সো] নাটক লেখেন। ১৯৪১ সালে মাত্র চার দিনের মধ্যে একটি নাটি[কা] ( লা দেজির আত্রাপে পার্‌ লা কো ) লিখে বন্ধুদের অবাক ক[রে] দেন। নাটিকাটির অভিনয় হয় ১৯৪৪ সালে প্যারিসে, অতি গোপনে নাটকে অভিনয় করেন কামু ও সার্ত্রে প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা। ১৯৪[৪] সালে পিকাসো যোগ দেন কমিউনিষ্ট পার্টিতে এবং এ'সম্পর্কে প্র[শ্ন] করা হলে পিকাসো বলেন : "ছবি আঁকাকে আমি কোনো সময়ে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের উপায় বলে দেখিনি। আমি সর্বদা চেয়েছিলাম ক্রমশঃ বেশী করে মানুষ ও পৃথিবীকে জানতে ও বুঝতে কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারছি যে কেবলমাত্র শিল্পে লড়াই চালালে হবে না, আমাকে আমার সর্বসত্তা দিয়েই লড়াই চালাতে হবে। ১৯৪৮ সালে পিকাসো ওয়ারশ'য় বিশ্ব শান্তি কংগ্রেসে যোগ দে[ন] এবং পরের বছর—প্যারিসে ঐ অধিবেশনের জন্য "শান্তির পায়রা" পোষ্টারটি তৈরী করেন।

"সর্বসত্তা দিয়ে যে লড়াই চালবার কথা পিকাসো বলেছিলেন, [সে] লড়াই শুরু হয়েছিলো ফ্রান্সের মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থনে 'লিথোপ্রচা[র]' দিয়ে, দি চার্নেল হাউস আর গুয়ের্নিকায় তার ব্যাপ্তি আর কোরিয়া মার্কিনী বর্বরতার বিরুদ্ধে ১৯৫১ সালে আঁকা ছবিতে তার সমাপ্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত শান্তিই পিকাসোকে বেশী প্রভাবি[ত] করেছিলো, এঁকেছিলেন 'যুদ্ধ ও শান্তি'।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর ৬০ দশকে ভিয়েতনামে বিভৎস মার্কি[ন] আগ্রাসনে যখন সারা পৃথিবীর ব্যাপক জনগণ আর প্রগতিশীল বুদ্ধি[-]জীবীরা প্রতিবাদে মুখর, যখন খোদ মার্কিণ মুলুকেও শিল্পীরা তাঁদে[র] শিল্প কার্যের উপর—লেবেল লাগান - ভিয়েতনামকে মুক্ত করে কিউবেক'কে মুক্ত করো—লাতিন আমেরিকাকে মুক্ত ক'রো—তখ[ন] পিকাসো কোথায় ? পিকাসো তখন ভয় পাওয়া কেঁচোর মতন সেধিঁ[য়ে]

গেছেন—"শাশ্বত মানবযন্ত্রণা" প্রকাশের চেষ্টায়। পিকাসোর ছবি তখন—'গুয়ের্নিকা'র ভাষায় কথা বলে না, মাইলাই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে পিকাসো তুলি হাতে তুলে নেন না। পিকাসো তখন আলজিরিয়ার মেয়েদের চেহারা ক্যানভাসের উপর দোমড়াচ্ছেন, আঁকছেন স্পেনের লড়াই, পুরাণের কথকতা—পিকাসো তখন ফর্মের খেলায় আত্মমগ্ন। পুঁজিবাদী দুনিয়ার অবসাদ, মানসিক বিকারবোধ আর উদ্দেশ্যহীনতায় পিকাসোর শিল্প তখন গা ভাসায়।

ফর্মের খেলায় আত্মমগ্ন সংগীহীন পিকাসো ছবি আঁকতে আঁকতে মারা গেলেন ৯২ বছর বয়সে, ১৯৭৩ সালের ৮ই এপ্রিল, পেছনে রেখে গেলেন দেড় হাজার পেন্টিং, চৌত্রিশ হাজার ছোটখাটো ছবি, দশ হাজার লিথোপ্রিন্ট আর তিনশ' ভাস্কর্য ও সেরামিকের কাজ।

প্রতিটি দেশের প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীর ছবিতে আজ পিকাসোর ছাপ, ফর্মের মারপিট বুঝতেই ছবির সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়......যেন ধাঁধার খেলা। এটাই কি পিকাসোর শিল্পীজীবনের সার্থকতা ? গজদন্ত মিনারের সাম্যবাদীরা পিকাসোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেউ কেউ পিকাসোকে 'সার্থক শিল্পী', 'সর্বহারা শিল্পী' আখ্যা দিতেও ছাড়েন না। কিন্তু একথাও সত্যি যে পিকাসোর মত ধনী শিল্পী পৃথিবীতে আর কেউ ছিলেন না। সাম্যবাদে পিকাসোর আস্থা ছিলো কিনা জানিনা, তবে একথা পরিষ্কার যে তিনি যখন 'গুয়ের্নিকা' এঁকেছিলেন, তখন ফ্যাসিস্ত শয়তানের বীভৎস অত্যাচারের শিকার ব্যাপক জনগণের সাথে নিজের ভবিষ্যতকে এক বলেই জানতেন। কিন্তু এই মানসিকতাকে পিকাসো জীবনের শেষদিন অবধি ধরে রাখতে পারেন নি। অদ্ভুত বৈপরীত্যে ভরা পিকাসোর শিল্পী জীবনের দুটি অধ্যায়। 'পণ্ডিত', 'সমালোচকেরা' এই দুটি অধ্যায়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা কিম্বা এই বৈপরীত্যের ন্যায্যতা প্রমাণের যতই চুলচেরা বিশ্লেষণ করুন না কেন, সত্য বদলাবে না। কারণ পিকাসো নিজেই তাঁর শিল্পী জীবনের কোন অধ্যায়টি সার্থক তার মাপকাঠি ঠিক করে দিয়ে গেছেন—মানুষকে শুধু তার কথা দিয়ে বুঝলে চলে না, তার কাজ দিয়ে বুঝতে হয়।

**জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা**

# বারাসত বিদ্রোহ

**নীলাদ্রি ঘোষ**

বাংলার নিপীড়িত, বঞ্চিত, অনাহারক্লিষ্ট কৃষকের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রাম হচ্ছে বারাসত-বিদ্রোহ। গ্রামবাংলা এই বিদ্রোহকে জানে—বারাসত-বিদ্রোহ নামে নয়, জানে **বাঁশের কেল্লা** নামে। বারাসতের আশে-পাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বংশ পরম্পরায় বারাসত বিদ্রোহের ইতিহাস বেঁচে আছে **বাঁশের কেল্লা** নামে। আর এই ইতিহাস তৈরী করেছে খেটে-খাওয়া হাজারো সাধারণ মানুষ।

কিন্তু এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ধর্ম-সংস্কারের ধ্বনি দিয়ে। ইস্‌লাম ধর্ম-সংস্কারকদের এই প্রচেষ্টা ভারতের ইতিহাসে ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতে ওয়াহাবী আদর্শের প্রচারক রায়বেরিলির সৈয়দ আমেদ আর বাংলার ব্যাপক মুস্‌লিম কৃষকের মধ্যে ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করেন **বারাসতের মীর নিসার আলি বা তিতুমীর।**

এই ধর্ম-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমান ধর্মের মধ্যে সেই সময় যে সমস্ত বিধর্মীয় অনুশাসন প্রবেশ করেছিল তাদের নির্মূল করা। ভারতের অধিকাংশ স্থানেই নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়। তাদের মধ্যে পুরাণো ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পুরো মাত্রায় থেকে যায়। ইস্‌লামকে এই বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্য থেকেই ওয়াহাবী আদর্শের সূত্রপাত। কিন্তু এই আদর্শ পূর্ণ করবার জন্ম সৈয়দ আমেদ প্রথম যে শর্ত আরোপ করলেন, সেটা হচ্ছে—এদেশ থেকে বৃটিশের উৎখাত।

এই উদ্দেশ্যে সৈয়দ আমেদ শুরু থেকেই তাঁর শিষ্যদের সামরিক শিক্ষা দিতে শুরু করেন। সৈয়দ আমেদের শিষ্য মৌলভী মহম্মদ ইস্‌মাইল এবং আবদুল হাই হচ্ছেন ওয়াহাবী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা রচনা করেন বিখ্যাত শিরাৎ-ই-মুস্তাকীন

বা "সোজাপথ" নামক পুস্তিকা। এই পুস্তিকাতে ছিল ওয়াহাবী আন্দোলনের পথনির্দেশ। এর মূল বক্তব্য ছিল এই রকম—**একজন খাঁটি মুসলমানকে** হজরত্ ব্রত পালন করতে হবে অর্থাৎ মুশরিক্ বা খ্রীষ্টানদের হাত থেকে দেশের শাসনভার কেড়ে নিতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধর্ম-আন্দোলন বা জেহাদ্ শুরুই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে ওয়াহাবী আদর্শের এই তাত্ত্বিক ভিত্তির সংগে সঙ্গতি রেখে তিতু এবং তাঁর সহকর্মীরা যে সমস্ত স্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে সংঘবদ্ধ করবার প্রচেষ্টা চালান সেগুলো ছিল **"পীর পয়গম্বর মানিতে নাই, মন্দির-মসজিদ্ তৈয়ার করিতে নাই, শ্রাদ্ধ-শান্তির ( ফতোয়া ) প্রয়োজন নাই, টাকা ঋণ দিয়া সুদ লইতে নাই ইত্যাদি।"**

আপাতদৃষ্টিতে ধর্মীয়-সংস্কারের ধ্বনি নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হলেও ওয়াহাবী তিতুর উপরোক্ত কর্মসূচী গ্রামের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত নিয়ে এল। মোল্লাতন্ত্র এই কর্মসূচীর মধ্যে দেখল তাদের সর্বনাশ। জমিদার, মহাজনেরা বুঝল, এই কর্মসূচী রূপায়ণের অর্থ তাদের নিশ্চিত মৃত্যু। ব্যাপক কৃষক সম্প্রদায় এই কর্ম-সূচী হাতে তুলে নিলে সামন্তশোষণের ভিত কেঁপে উঠবে। তাই গোড়া থেকেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামের কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা ওয়াহাবীদের বিরোধীতা শুরু করল।

ধনী মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দু জমিদার-মহাজন এবং ইংরেজ নীলকর তিতুমীরের ওয়াহাবী আন্দোলন ধ্বংস করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তোলে। অন্যদিকে কেবল নিপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র মুসলমান কৃষকরাই তিতুর দলভুক্ত ছিলেন না। নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় যাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণে জর্জরিত হয়ে আসছেন হাজার বছর ধরে, তাঁরাও তিতুর দলভুক্ত হয়ে ইংরেজ এবং গ্রামের যাবতীয় প্রতিক্রিয়াবাদী সম্প্রদায়ের দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে উঠলেন।

হিন্দু জমিদাররা তিতুর বিরোধীতা করছিল কারণ তারা যে কোন রকম পরিবর্তনেরই বিরোধী। প্রচলিত গ্রাম্য সমাজ-সম্পর্ক উলোট্-পালট্ হয়ে গেলে তাদের দৌলতের ইমারত ধ্বংস হয়ে যাবে। এইজন্য প্রাচীনপন্থী মুসলমানদের সংগে তাদের স্বার্থের সমতা ছিল। উপরন্তু প্রাচীনপন্থী মোল্লাদের ও ওয়াহাবীদের মধ্যেকার বিরোধের সুযোগ নিয়ে জমিদাররা ওয়াহাবীদের ধর্মানুচারের উপর জরিমানা ধার্য করে এবং এইভাবে একটা মোটা রকমের আয়ের বন্দোবস্ত করে। ধর্মের ব্যাপারে জমিদারদের এই হস্তক্ষেপের ফলে ওয়াহাবী মতাবলম্বী-দের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেয়।

সেই সময় বারাসত অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তিনি দাড়ির উপর কর ধার্য করেন। কৃষ্ণদেবের দেখাদেখি অন্যান্য জমিদারেরাও এই কর আদায় করতে শুরু করেন।

"জমিদারগণ যে জরিমানা ধার্য করিয়াছিলেন তাহাকে সাধারণভাবে বলা হইত 'দাড়ির খাজনা'। শুদ্ধি আন্দোলনকারী মুসলমানগণ ধর্মীয় অনুশাসন হিসাবেই তাঁহাদের এই শারিরীক অলংকারটিকে ( দাড়ি ) বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা ও ইহার চর্চা করিতেন। এই জন্যই দাড়ির উপর ধার্য জরিমানা মুসলমান জনসাধারণের ক্রোধ বহুগুণ বর্ধিত করে।"

কৃষ্ণদেব রায় কয়েকটি গ্রাম থেকে দাড়ির খাজনা তুলেও ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ওয়াহাবীদের সক্রিয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। সর্পরাজপুরের গ্রামবাসীরা এই কর দিতে অস্বীকার করলে জমিদার কৃষ্ণদেব লাঠিয়ালের সাহায্যে যখন জুলুম চালাবার ব্যবস্থা করেন তখন জমিদারের সংগে তিতুমীরের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। কৃষ্ণদেবের লোকজন সর্পরাজ-পুরে বহু কৃষকের ঘরবাড়ী লুঠ করে এবং মসজিদ্ ধ্বংস করে দেয়। তারা ব্যাপারটাকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হিসাবে বাঁচিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষ আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত সাধারণভাবে জমিদারের পক্ষ নেয় এবং একটা সাময়িক মিটমাটের বন্দোবস্ত করে।

কিন্তু জমিদারদের অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়েই চলল। শাসক ইংরেজের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় জমিদাররা নানাভাবে তিতুমীর এবং তাঁর শিষ্যদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। বারাসত অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে এই অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া সম্মানের সংগে বাঁচবার আর কোন রাস্তাই রইল না। তাই তিতুর নেতৃত্বে প্রথম সুযোগেই তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিল। আর এই সময় আমরা দেখছি মিস্কিন শাহ নামক জনৈক ফকিরও তাঁর দলবল নিয়ে তিতুমীরের সংগে যোগ দিচ্ছেন দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়।

এরপর ১৮৩০ সালের শেষ দিকে তিতু রাজা কৃষ্ণদেবের বাড়ীর উপর একবার ব্যর্থ আক্রমণ চালান। আক্রমণ ব্যর্থ হলেও সামগ্রিক ভাবে তিতুর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় জমিদাররা তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে পড়ে। তিতুমীরকে দমন করবার জন্য তারা অহরহ চক্রান্ত চালাতে থাকে।

জনগণের সমর্থন বৃদ্ধির সংগে সংগে তিতুমীর স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং এইভাবে সরাসরি ওয়াহাবী আন্দোলনকে বৃটিশের বিরোধিতার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

তিতুমীরের স্বাধীনতা ঘোষণায় স্থানীয় জমিদার এবং বৃটিশ নীল-করদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠল। তারা দ্রুত সংঘবদ্ধ হয়ে ওয়াহাবী

আন্দোলনকারীদের দমন করবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কারণ তিতুমীর সমস্ত জমিদারদের তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে কর দেওয়ার জন্ত ফরমান জারি করলেন।

গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, মোল্লাহাটির নীলকুঠির মালিক ডেভিস্ এবং কলকাতার প্রভাবশালী জমিদার লাটুবাবু সমবেতভাবে তাঁদের পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে তিতুমীরকে তাঁর গ্রামে আক্রমণ করে বসলেন। কিন্তু তিতুমীরের বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে দেশীয় জমিদার এবং ইংরেজ নীলকরদের লাঠিয়াল, পাইকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ডেভিস্ কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে যায় গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়ের সহায়তায়।

ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে ডেভিস্‌কে সহায়তা করবার জন্ত, তিতুমীর দেবনাথ রায়কে আক্রমণ করেন। দেবনাথ তিতুমীরের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত সে যুদ্ধে মারা যায়। ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন সর্বত্র এখন শ্রেণী সংঘর্ষরূপে ফেটে পড়তে লাগল।

পরপর এতগুলো খণ্ডযুদ্ধ জেতবার পর তিতুমীরের প্রভাব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। ওয়াহাবী আন্দোলনকে সাধারণ মানুষ দেখতে শুরু করে আশীর্বাদ হিসাবে; অত্যাচারী জমিদার মহাজনদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় হিসাবে। তিতুমীর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত দরিদ্র নিপীড়িত প্রজাদের কাছে জমিদারদের খাজনা বন্ধ করে দেবার আবেদন জানান। তিনি নীলচাষীদের নীলচাষ বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেন। তিতুমীরের এই আবেদনে সাড়া দিতে এগিয়ে আসে ব্যাপক জনসাধারণ। বহু প্রাচীনপন্থী ধনী মুসলমান যারা ইংরেজ এবং হিন্দু জমিদারদের সংগে একত্রে ওয়াহাবী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, তাদের উপর বিদ্রোহীরা আক্রমণ চালায়। তাদের এতদিনকার প্রভাব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বিদ্রোহীরা ধুলায় মিশিয়ে দেয়।

বিদ্রোহীদের আক্রমণে বারাসত এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজের প্রশাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণার বহু জায়গা থেকে পুলিশ পালিয়ে প্রাণ বাঁচায় এবং কার্যতঃ ব্যাপক গ্রামাঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের স্বাধীন সরকার।

এরপর ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে। ছোটলাট স্বয়ং ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বিদ্রোহ দমন করবার জোরদার আয়োজন চলতে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে একদল সিপাহী স্থানীয় জমিদারদের পাইক বরকন্দাজদের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে।

ওয়াহাবী আন্দোলনকারীরা মোটামুটিভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিতুমীরের ভাগিনের গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে কয়েকশ' বিদ্রোহী আলেকজাণ্ডার ও জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেয়। এই যুদ্ধে বহু সিপাহী নিহত হয়—আর নিহত হয় বসিরহাটের কুখ্যাত দারোগা রামরাম চক্রবর্তী। তিতুমীর এবং অন্তান্ত ওয়াহাবীদের দমন করবার জন্ত রামরাম চক্রবর্তী রাজা কৃষ্ণদেব রায়কে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছিল এবং তিতুমীর ও তার সমর্থকদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করতে চেয়েছিল। এই থানাদারের অত্যাচারে স্থানীয় কৃষকদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। অত্যাচারী দারোগাকে হত্যা করে বিদ্রোহীরা এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত কৃষকদের কাছেই উচ্চপ্রশংসিত হন।

ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের হাতে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট পরাজিত হওয়ার পর তিতুমীরের আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। এইবার নদীয়া ও ২৪ পরগণার বহু নীলকুঠির উপর বিদ্রোহীরা সংগঠিত আকারে আক্রমণ শুরু করে। বহু নীলকুঠি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। নীলকররা সব শহরে পালিয়ে যায়। আর এক শতাব্দী যাবৎ নীলকরদের দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত হয়ে মৃতপ্রায় নীলচাষী নীলচাষ থেকে অব্যাহতি লাভ করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণের সংবাদে বহু জায়গায় কৃষকরা স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাই ওয়াহাবী আন্দোলন অংশত নীলবিদ্রোহও বটে।

সুতরাং ধর্মসংস্কারের ধ্বনি দিয়ে যার সূত্রপাত সেই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত তৎকালীন বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল। ওয়াহাবী আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সৃষ্টি করল।

তিতুমীর নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ ঘোষণা করে তাঁর এলাকায় স্বাধীন সরকার চালাতে লাগলেন। আলেকজাণ্ডারের পরাজয়ের পর তিতুমীরের প্রভাব বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৃটিশ বাংলার এই প্রথম স্বাধীন সরকারের অভ্যুদয়ে মরিয়া হয়ে উঠল। জনগণের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে তারা শংকিত হয়ে পড়ল। তারা স্থানীয় জমিদার এবং নীলকরদের সংগে ষড়যন্ত্র করতে লাগল এই বিদ্রোহ সমূলে ধ্বংস করবার জন্ত।

তিতুমীরও বৃটিশের আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনা অনুমান করে তাঁর সামরিক বিভাগকে সুদৃঢ় করতে লাগলেন। এই সামরিক প্রস্তুতির ফলশ্রুতি হচ্ছে নারকেলবেড়িয়ার দুর্গ—ইতিহাসে যা বাঁশের কেল্লা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বাংলার কৃষকের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক—বারাসতের এই বাঁশের কেল্লা। যুগ যুগ ধরে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। আমাদের দেশের কৃষকের অসামান্ত শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয়

এই বাঁশের কেল্লা। বাঁশের কেল্লা নিয়ে আমরা আজও গর্ব করতে পারি।

কিন্তু এই কেল্লা এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতিতে গভর্নর বেন্টিকের দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। তার নির্দেশে গোবরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা এবং নদীয়ার অন্যান্য জমিদারদের সংগে নদীয়ার কালেক্টর স্বয়ং এলেন বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করতে, কিন্তু তাদের সম্মিলিত শক্তি আবার পরাজিত হল তিতুমীরের বাহিনীর কাছে। তিতুমীরের ঝটিকা আক্রমণে সরকারী সিপাহীরা দিশেহারা হয়ে যায় এবং তারা বন্দুক চালাবার কোন অবকাশই পায় না।

সরকারী বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে সরকার আরও ব্যাপক সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা শুরু করল। এবার একজন কর্ণেলের নেতৃত্বে একশ' ইংরেজ সৈন্য এবং তিনশ' দেশী সিপাই দুটো কামান নিয়ে নারকেলবেড়িয়ায় এল। সময়টা ছিল ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর। পরপর দু'বার পরাজিত হবার পর বৃটিশ বাহিনী এবার বাঁশের কেল্লা কামান দিয়ে উড়িয়ে দিতে সমর্থ হ'ল। ওয়াহাবী বাহিনীর প্রচুর কর্মী বীরের মত মৃত্যুবরণ করে শহীদ হলেন। তিতুমীরের শরীর কামানের গোলার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। বাংলার প্রথম স্বাধীন সরকারের হল অবসান। বীর যোদ্ধা তিতুমীরের মৃত্যুতে অবশিষ্ট বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে পালিয়ে গেল। অপর্যাপ্ত এবং দুর্বল সংগঠন ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। আর কোন পাল্টা নেতৃত্ব গড়ে উঠল না তিতুমীরের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে।

বাঁশের কেল্লা মাটির সংগে মিশিয়ে দিয়ে নারকেলবেড়িয়া এবং আশপাশের এলাকায় শ্বেত সন্ত্রাসের বন্যা বইয়ে দিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। নারকেলবেড়িয়ার পথে-ঘাটে-মাঠে ছড়িয়ে রইল শত শত নিপীড়িত বিদ্রোহী কৃষক-সন্তানের রক্তের ধারা।

এরপরও তারা আটশ' বিদ্রোহীকে কারারুদ্ধ করে। বন্দীদের উপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। বন্দীদের যা' খাবার দেওয়া হত তাতে একটা শিশুরও একবেলা পেট ভরত না। এই আটশ' বন্দীর মধ্যে একশ' চল্লিশ জন মত ওয়াহাবীকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হল এবং তিতুর ভাগিনেয়, তিতুমীরের বাহিনীর প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড হল।

জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবার জন্য বৃটিশ প্রকাশ্য দিবালোকে নারকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লার সামনেই মাসুমের ফাঁসি দেয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ গোলাম মাসুমকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ইংরেজ চেয়েছিল ইতিহাস থেকে বাঁশের কেল্লার নাম মুছে দিতে। কিন্তু ইতিহাসের চাকাকে তারা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে নি। ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে বাঁশের কেল্লা চির অমর, বাঁশের কেল্লা বিপ্লবীদের চির-অনুপ্রেরণার উৎসস্থল, বাঁশের কেল্লার শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে ভারতের মেহনতী মানুষ চিরদিন। বৃটিশের কামানের আঘাতে বাঁশের কেল্লা ভেঙে গেছে ঠিকই, কিন্তু বাঁশের কেল্লা সমগ্র জাতির মনে যে আত্ম-প্রত্যয় আর আত্মসম্ভ্রম জাগিয়ে গেছে, বৃটিশের কামান সেখানে অসহায়।

এই বিদ্রোহ অন্যান্য বিদ্রোহের মত শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ হল দুর্বল সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং সামরিক দক্ষতার অভাব। বৃটিশের উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের সংগে পাল্লাদেবার মত সামরিক কৌশল বিদ্রোহীরা আয়ত্ত করতে পারে নি। তাছাড়া এই বিদ্রোহের সংগে ধর্মীয় প্রশ্ন জড়িয়ে থাকার ফলে ব্যাপক হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ওয়াহাবীরা পায়নি এবং এই প্রশ্নটাকে সচেতনভাবে সমাধান করবার চেষ্টাও তারা করেনি।

বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায় স্বাভাবিক কারণেই কিন্তু ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ওয়াহাবী আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতের জনগণের প্রথম স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হিসাবে তিতুমীরের এই সংগ্রাম জনগণ চিরদিন শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে।

**গ্রন্থপঞ্জী**


1. Unrest Against British Rule in Bihar, 1831-1859—K. K. Datta
2. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম —সুপ্রকাশ রায়

# পট্‌জিয়েটারের কেল্লা

লুইস কোসি

● [ 'গণতন্ত্র' ও 'সভ্যতার' নামে দক্ষিণ আফ্রিকায় এখনো বর্বর ঔপনিবেশিক শাসন চলছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণ্য লালসা লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ে পরিয়েছে ক্রীতদাসত্বের শৃংখল। অন্তহীন অত্যাচার, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার গ্লানিতে নিষ্পেষিত হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অত্যাচার জন্ম দিয়েছে প্রতিরোধের। কালো মেঘের আড়ালে স্ফুরিত হচ্ছে বিদ্যুতের স্ফুলিংগ। শোষণের কারাগার ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ঘামঝরা বলিষ্ঠ হাতগুলো। মুক্তিসংগ্রামী দক্ষিণ আফ্রিকার দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ পাল্টা আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠছে সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদ। বিদ্রোহ করছেন বিদেশী মালিকের খামারে বন্দী লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষ, শহরের শ্রমিক ও গ্রামের কৃষক। কবি ও লেখকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বিদ্রোহের বাণী। বিদেশী প্রভুরা তাঁদের সাচ্চা হৃদয়কে রূপোর চাকতি দিয়ে কিনতে পারেনি বলে জেল, নির্বাসন ও আরও হাজার রকমের অত্যাচারের বল্গাহীন আক্রমণ ছুটিয়ে দিয়েছে তাঁদের ওপর। বর্তমান গল্পটির লেখকও এর ব্যতিক্রম নন। নীচের গল্পটিতে তিনি আজকের দক্ষিণ আফ্রিকার চিত্রটিকে জীবন্ত ও সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।
—সঃ মঃ বীঃ ] ●

নিদাঘের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে উলঙ্গ নীল আকাশের নীচে একটা ট্রাকের ওপরে গাদাগাদি করে বসে আছে ওরা। চোখের সামনে দিয়ে জমি দ্রুতগতিতে পিছনে সরে যাচ্ছে। 'কেরী' ও বর্শায় সজ্জিত জীর্ণ খাকি সার্ট আর প্যান্ট পরা একটা বিভৎস দর্শন কালো লোক দাঁড়িয়ে ওদের ওপর লক্ষ্য রাখছে। বলিষ্ঠ শরীর—লোকটার অসংখ্য গর্ত ও ফুস্কুড়িতে ভরা বিরাট দুটো খালি পা ওদের সামনে ছড়িয়ে আছে। লোকটার রক্তের মতো লাল চোখদুটোতে অতলান্ত নিষ্ঠুরতা ও বিষণ্নতার ছাপ, যা সেই সব লোকের দৃষ্টিতে দেখা যায় যারা অনেক হত্যা দেখেছে এবং কোনকিছুরই পরোয়া করে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা শয়তান তার সমস্ত শক্তিকে একটা আসন্ন যুদ্ধ-নৃত্যের জন্য সংহত করছে। কোনকিছুর নির্দেশ দেবার সময় বন্দী মানুষগুলোর পাঁজরে নিষ্ঠুরভাবে তার 'কেরী' দিয়ে খুঁচিয়ে একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ করা ছাড়া বাকি সময়টুকু ট্রাকের পেছনে চুপচাপ বাইরের দিকে তার অর্থহীন ঘসাকাচের মতো চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে থাকতো সে।

অন্য রক্ষীটা, যাকে ওরা পাস্ অফিসে দেখেছিল, ট্রাকের সামনের দিকে শ্বেতাঙ্গ খামার-মালিকের সঙ্গে বসে আছে। পেট্রোল ষ্টেশন আর রাস্তার ধারের ছোট 'কাফে'গুলোতে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়ানো ছাড়া, সারাদিন ধরে ট্রাকটা চলছে। যত বারই তারা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছে, শ্বেতাঙ্গ 'প্রভুটি' ট্রাক থেকে বেরিয়ে পিছনের দিকে এসে তার বন্দীদের দৈহিক অবস্থাটা নিরাসক্তের মতো দেখে যেতো, প্রত্যেকবারই সে ট্রাকে পেছনে বসে থাকা জুমা নামের কালো শয়তানের মতো দেখতে রক্ষীটাকে কি যেন ঘোঁত ঘোঁত করে বলতো আর ঝড়ের মতো 'কাফে'র ভেতরে ঢুকে দু-এক মিনিট পরেই রক্ষীদের জন্য খাবারের পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে আসতো। তারপর রাস্তার পাশের কাফেটাতে সেই যে গিয়ে সেঁধুত, আধঘণ্টার আগে আর বেরোত না। ভরপেট খাবার খেয়ে বেরোবার পর তার মুখে নতুন রক্তের উচ্ছাস দেখা যেতো। দুটো রক্ষী নেকড়ের মতো হাঁউ মাঁউ করে তাদের খাবারগুলো গিলতো ক্ষুধার্ত বন্দীদের চোখের সামনে—যারা সারাদিন ধরে এক ফোঁটা জলও পায়নি ; আর খাওয়া শেষ হলে তাদের তৃপ্ত কুৎসিত দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের বোতাম হাতড়ে রাস্তার উপর প্রস্রাব করতে শুরু করতো।

ট্রাকের বন্দী লোকগুলো সারাদিন ধরে রুটির একটা টুকরোও পায়নি। ট্রাকের পিছনের দিকে রাখা লোহার খাঁচাটাতে আটকানো, তাদের কেউ কেউ রাস্তায় নেমে তলপেটে চেপে থাকা প্রচণ্ড যন্ত্রনার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য রক্ষীদের কাছে করজোড়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে, তাদের পাঁজরে বর্শার খোঁচা দিয়ে ওরা চিৎকার করে ওঠে বন্য পশুর মতো।

"ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে মোত্ শালারা! তোরা কি মনে করিস নিজেদের—পৃথিবীর রাজপুত্তুর সব?" চেঁচিয়ে বলে রক্ষীরা। কম

বয়সী ছেলেরা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে খাঁচাটার ফাঁক দিয়ে প্রস্রাব করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে লালমুখ, লোমশ হাত আর ইস্পাত-নীল চোখওয়ালা দৈত্যাকৃতি খামার-মালিকের নির্দেশে ট্রাকটা আবার চলতে শুরু করলো। ধুলোর মেঘ সৃষ্টি করে, জল আর তেলের একটা ক্ষীণ ধারা পেছনে ফেলে ট্রাকটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চললো। অন্য ছেলেদের মতো সিপোরও কোন সঠিক ধারণা নেই তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বা বাড়ী থেকে তারা এখন কত দূরে! বন্দীদের মধ্যে বয়স্ক যারা, তারাও এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না। কিন্তু এখন আর ভয় করছে না তাদের। একটা গভীর অমানুষিক উদাসীনতা সবাইকার উপরে নেমে এসেছে। এখন তারা শুধু প্রতীক্ষা করছে দেখার জন্য—এই ট্রাকটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাদের, কি ধরনের লোক বা জায়গার দেখা পাবে তারা সেখানে এবং ওখানে পৌছাবার পর তাদের কাছে কি চাওয়া হবে।

ট্রাকের কোনায় একজন বয়স্ক লোক তার বন্দী হওয়ার ঘটনা ছেলেদের শোনাচ্ছিল। "সে যে কি একখানা হৈ-চৈ ব্যাপার, তা তোমাদের বলে বোঝাতে পারবোনা বন্ধুরা……। মানুষগুলো ছোটাছুটি করছে চারদিকে, মেয়েরা চিৎকার করছে, বাচ্চারা কাঁদছে —সারা সোফিয়া টাউন জুড়ে সে এক বিভ্রান্তির রাজত্ব! তারপর কালো মারিয়াদের Black Marias) সঙ্গে নিয়ে, এলো পুলিশ; আর আমাদের কয়েক শো কে ধরে নিয়ে গেল। "যত বছর লাগুক না কেন, আমরা এই ধর্মঘট ভাঙ্গবোই।" বলছিল তারা। থানাতে এনে ওরা 'ভবঘুরে' বলে আমাদের অভিযুক্ত করে ওই সাদা খামার-মালিকটার কাছে বন্দী-শ্রমিক হয়ে থাকবার চুক্তিনামাতে জোর করে সই করালো।"

ঘটনাটা ট্রাকের সব বন্দীদের ক্ষেত্রেই মোটামুটি এই রকমের। কিন্তু জুমা, যে রক্ষীটা ট্রাকের পেছনে বসে এতক্ষণ গল্পটা শুনছিল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ভয় ধরানো গলায় চিৎকার করে উঠলো: "চুপ কর বেজন্মারা! তোদের চ্যাচানিতে এমনকি আমার চিন্তাগুলোও শুনতে পাচ্ছি না আমি!"

একজন কালো রোগা মত বন্দী তেতো গলায় বলে ওঠে: "যখন ওই সময়টা আসবে, ওর মত লোকগুলো যারা সাদা চামড়ার তল্পী-বাহকের কাজটা করছে—সব চাইতে আগে তাদের ধড় থেকে মাথাটা হারাবে।"

"কে ওই ভয়ংকর কথাটা বললো?" জুমা তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে শূন্যে 'কেরী'টা ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে: "কে ওই লোকটা? আমি একবার দেখতে চাই ওকে –আর দেখাবো, যারা ওই ধরনের উদ্ভট স্বপ্ন দেখে তাদের কপালে কি কি জিনিস থাকে! 'মাথাগুলো গড়াগড়ি যাবে'—তাই নাকি? আর ওহে বাঁদরের পাছার মতো মুখওয়ালা আমার স্যাঙাৎ, বলি কে ওই কাজটা করবে শুনি?"

কেউ কোন জবাব দেয় না, কিন্তু সবাই বুঝতে পারে—জুমা এই প্রথম ভয় পেয়েছে। শূন্যে তোলা কেরীটা তার হাতে ভারী ঠেকতে লাগলো। আস্তে আস্তে নামিয়ে নিল সেটা। সে তখনো বন্দীদের মুখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওই বিপজ্জনক লোকটার সন্ধান করছে। বন্দীদের মুখগুলো কিন্তু একটি কথাও বললো না।

ট্রাকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে গাদাগাদি করে বসে থাকা ক্লান্ত, অসুস্থ, ঘামে ভেজা শরীরগুলো থেকে বাতাস-গুমোটকরা ভারী ঝাঁঝালো গন্ধ উঠে নাকে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। বন্দীদের মধ্যে প্রবীন যারা—এর আগেও জেলে গিয়েছে, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন চূড়ান্ত খারাপ কিছু একটা ঘটে যাবার জন্য তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ট্রাকের বাইরে শীতল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তারা। কথা বলার দরকার হলে, দ্রুত বেপরোয়া ভঙ্গিতে কথা বলছে যার বিরুদ্ধে রক্ষীরা সম্পূর্ণভাবে অসহায়। "চুপ কর কুত্তার বাচ্চারা!" ধমকে ওঠে একজন রক্ষী।

বন্দীদের মধ্যে মুখভর্তি ফুস্কুড়ি—একজন লোক চোখ কুঁচকে রক্ষীটার দিকে একবার তাকিয়ে, বিশ বছর ধরে তার পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং জেল ভেঙ্গে পালানোর তিক্ততা মাখা সংযত বিষাক্ত কণ্ঠে তার সঙ্গীর সাথে কথা বলা চালিয়ে যেতে লাগলো। রক্ষীটা কেরী দিয়ে তাদের পাঁজরে যত খোঁচা মারুকনা কেন তাকে আর তার সঙ্গীকে স্তব্ধ করা যাবে না। তারা গালাগালি দিয়ে রক্ষীর পায়ের ওপর থুথু ছিটিয়ে দিতে লাগল। একটা বিভৎস, কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠলো রক্ষীর মুখে; ওরা তাকে হিংস্র হবার একটা অজুহাত দিয়েছে! বন্দীদের দিকে প্রায় দয়ালুর মতো চোখে তাকালো সে……তার অন্ধকার চোখের কোটরে অনন্ত ঘৃণার আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে।

"তোদের আমি ভালো রকমের শিক্ষা দোবো কালো শুয়োররা! এমন একটা শিক্ষা দোবো যা কোন দিন ভুলবিনা!" দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললো সে; উঠে দাঁড়াবার দরকার মনে করলোনা। "যখন আমরা খামারে পৌছাব তখন আমি দেখতে চাই তোরা দুটোতে এই রকম পাখীর মতো গান গাইতে গাইতে ট্রাক থেকে নামছিস, আর তখন আমি তোদের সেই জায়গাটা দেখিয়ে আনবো যেখানে একটা ছেলেকে ষাঁড় দিয়ে গুঁতিয়ে মারা হয়েছিল! বুঝলি হারাম-জাদারা? আমার স্যাঙাৎ দুটোর পক্ষে চমৎকার একখানা গোপন জায়গা হবে সেটা!"

ওরা দুজন রক্ষীকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করলো, যদিও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে ট্রাকের আর সবাই আশঙ্কায় থর থর করে কাঁপছে।

এই রকম হুমকি একটা অন্ধকার পরিসমাপ্তির বিভৎস ছবি ফুটিয়ে তুলছিল তাদের মনে। তারা চাইছিল যেন রক্ষীকে আর বেশী উত্তেজিত না করা হয়।

যাত্রার শেষভাগটুকু জুড়ে ট্রাকের মধ্যে নেমে এসেছিল মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা যার ফাঁক দিয়ে একমাত্র পার্থিব শব্দ—ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন আর গরম রাস্তার ঘসা লেগে চাকার নরম চটচট্ আওয়াজই শুধু শোনা যায়। ট্রাকটা যখন প্রায় ৫০ মাইলের বেশী চলে এসেছে, সমস্ত বন্দীরা এমনকি সিপোও অনুভব করলো যেন উৎকণ্ঠার মাত্রা আর আগের মতো নেই। ভয় চলে যাবার জন্য এটা হয়নি। ক্ষুধা এবং অনড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর থেকে উঠে আসা একটা ভোঁতা অনুভূতিহীনতা ক্রমশঃ অভিভূত করে ফেলছিল তাদের। সমস্ত ব্যথা, ভয় এবং হতাশা মিলে একটা গিঁট পাকিয়ে যেন তাদের পাকস্থলীর তলায় আশ্রয় নিয়েছে আর মৃত্যুর মতো পেটের যন্ত্রণাটাকে জাগিয়ে থামচে ধরছে পেশীগুলোকে। যতক্ষণ শরীরটা হাঁটুর সঙ্গে ঠেসে ধরা আছে, পেশীগুলো টান টান হয়ে আছে ধনুকের ছিলার মতো, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের প্রত্যেকে এক ধরনের স্বস্তিতে রয়েছে। সিপো জানে ভয়টা কখন ফিরে আসবে। যে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াতে হবে ওদের সেই মুহূর্তেই ভয়টা আবার নতুন করে ফিরে আসবে। এই নির্মম সত্যটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সিপোর যে সেই চরম মুহূর্তটিতে তার হাঁটু আর পা শরীরের সঠিক ভারটা অনুভব করে ধীরে ধীরে কাঁপবে আর উদ্বেগে ঘামতে থাকবে হাতের তালু দুটো। সেই মুহূর্তটা এখনো দেরী আছে। নিস্পৃহ শীতল দৃষ্টি মেলে মৃত্যুহীন গরিমাময় শূন্যে ফুঁড়ে ওঠা বিরাট ঢাকনার মতো আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকলো তারা।

এখন ওরা একটা গভীর চওড়া নদীর ওপরে। নদীর জলটা কাদাটে, বাইরের থেকে মনে হয় বুঝিবা নদীটা স্রোতহীন; অনেক গভীরে আঁকড়ে ধরে থাকা গতিটা চোখেই পড়ে না। নদীটাকে পিছনে ফেলে অত্যন্ত জটিল একটা রাস্তা ধরে ট্রাকটা বিপজ্জনকভাবে উপরে উঠতে লাগলো। চড়াইটার দু'পাশে হাঁ করে থাকা ডোঙা-গুলো নদীর কিনারের দিকে ঝুলে আছে। পাহাড়ের উপরে উঠে আবার শুকনো মাঠের ভেতর দিয়ে তার একঘেয়ে যাত্রা শুরু করলো গাড়ীটা। মাঝে মাঝে রাস্তার ওপর দু-একটা খামার অথবা বিস্তীর্ণ শস্য-ক্ষেত্র চোখের সামনে জেগে উঠছে, যেখানে তাদেরই মতো মানুষগুলো হলুদ সূর্যের নীচে নিজেদের মেহনত নিংড়ে চলেছে।

কর্মরত মানুষগুলোর কাপড় বলতে প্রায় কিছুই নেই। কর্কশ বস্তার গায়ে হাত আর গলা বার করবার জন্য কয়েকটা বড় বড় ফুটো —এই হলো তাদের পরিধেয়। কখনো চোখে পড়ছে একজন শ্বেতাঙ্গ খামার-মালিক শ্রমিকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে যা' ট্রাকের আওয়াজে শোনাই যায় না আর কখনো বা তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে জাম্বক (Sjambok) ও কেরী হাতে কালো রক্ষীদের দল ভারবাহী পশুদের মতো বন্দী মানুষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

শুধু ভীতি নয়,—তার থেকেও অনেক বেশী আতঙ্কময়, অন্ধকার নরকে বধির করে দেওয়া তাণ্ডবের সুপ্তিভংগের মতো অথবা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো রহস্য এই আবাদভূমি এবং নিঃশব্দে রাস্তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ক্রীতদাস ও তাদের তদারককারীদের নিয়ে গড়ে ওঠা খামারগুলোকে যেন ঘিরে আছে। বেপরওয়া, অসাড় হিংস্রতার একটা পাশবিক পরিমণ্ডল যেন সব কিছুকে উদগ্র করেছে এখানে। একটা নৈরাজ্য ও অঘটনের অদৃশ্য শৃংখল যেন এখানকার হিংস্র মন ও মাটিকে গ্রন্থিবদ্ধ করেছে—যে মাটি একই সাথে অকৃপণ শস্য ও শূন্য-ভয়ংকর মস্তিষ্কগুলোকে আশ্রয় দিয়েছে। এখানে গরম খুব বেশী নয়, কিন্তু অনেক বেশী গাঢ় এবং অফুরন্ত, যেন মাটির ওপর উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলের উন্মত্ততা নিয়ে কম্বলের মতো বিছিয়ে আছে; আর সেই উন্মত্ততার আদিম রহস্যময় শক্তি যেন অদৃশ্য পোকার মতো মগজ-গুলোকে কুরে কুরে খেয়ে এখানকার ক্রীতদাসদের-পিঠে-চাবুক-মেরে তাড়িয়ে-নিয়ে-চলা হিংস্র প্রাণীগুলোকে তৈরী করেছে।

নদীটার পেরোবার পরই সব কিছুতে একটা পরিবর্তনের ভাব অনুভব করেছে বন্দীরা। ভুট্টার ক্ষেত আর রোদে-দোওয়া কবর স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথেই এই পরিবর্তনটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। একটা অনাগত আশঙ্কার ছায়ায় কুঁকড়ে উঠলো মানুষ-গুলো। অল্পক্ষণ পরেই রাস্তার শেষ মোড়টাতে এসে পড়লো তারা যেখান থেকে ডানদিকে একটা গাড়ী চলার রাস্তা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। তাদের ট্রাকটা তীব্র ঝাঁকানি দিয়ে বাঁক নিয়ে একটা লোহার গেটের সামনে থেমে পড়লো। শ্বেতাঙ্গ খামার-মালিকটার সঙ্গে সামনে বসে থাকা রক্ষীটা লম্ফ দিয়ে নীচে নেমে ট্রাকটা ভেতরে ঢোকার জন্য গেটটা খুলে দিল। গেটের পাশে আঁকা বাঁকা হরফে লেখাটা সিপো পড়তে পারলো:

"পি. জে. পট্‌জিয়েটারের সম্পত্তি"

তার মনে হলো ট্রাকটা গেট পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই তার 'অধিকার' বলে যা' কিছু ছিল—শেষ হয়ে গেছে। সে এখন মিঃ পি. জে. পট্‌জিয়েটারের সম্পত্তি।

অন্য বন্দীদের ও অস্পষ্টভাবে একই কথা মনে হয়েছে নিশ্চয়ই; তাদের চোখে মুখে এঁটে থাকা আত্মসমর্পণের বেদনা-বিমূঢ় হতাশার ছায়া সেই কথাটাই ব্যক্ত করছিল। ট্রাকটা খামার বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ানো পর্যন্ত তাদের মুখে সেই চকিত বিমূঢ়তার ছাপটা ঝুলে থাকলো। বাতাস থেকে তাদের নাকে এসে ঢুকলো খড়, গোরু,

গোবর, শস্য, কাঠ আর চষামাটির গন্ধ। প্রচণ্ড উন্মত্ত চিৎকার করতে করতে রক্ষীরা ট্রাকের পেছনের দিকের দরজা খুলে দিল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো মানুষগুলো। তাদের হাঁটু মট্ মট্ করে উঠলো। অন্ধকার হয়ে এলো আকাশের নীচে লাফিয়ে নামলো তারা মাটিতে। নীচের উপত্যকা থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসতে থাকা কালো ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে তারা খামারের মালিকের সামনে দাঁড়ালো গিনতির অপেক্ষায়। সবসুদ্ধ আটাশজন দাঁড়িয়ে আছে তারা। পাশের ছোট নদীটার থেকে ধুয়ে আসা প্রাক্ সন্ধ্যার ভিজে গরম হাওয়ার ছোঁয়া লাগছে গায়ে; শস্য ও আলুর বিস্তীর্ণ ক্ষেত থেকে আর একটা দমকা হাওয়া ধেয়ে আসছে—যা আগের বাতাসটার থেকে অনেক বেশী গরম। যৌবন হারিয়ে ফেলার অর্ধমৃত হতাশা নিয়ে শিথিলভাবে নিজেদের সত্তাগুলো ধরে আছে তারা। কশাই-খানায় নিয়ে আসা ভেড়াদের মতো অপেক্ষা করছে তাদের দিয়ে কি করা হবে, অথবা তাদেরকে কি করা হবে—তা' শোনার জন্য।

গিনতির অপেক্ষায় খামারের মালিকের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মানুষগুলো। হাতগুলো শিথিল হয়ে দু'পাশে ঝুলছে; পাগুলো দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে চেপে আছে, পেটগুলো নাভির কাছে তীক্ষ্ণ ভাবে ভেতরের দিকে ঢোকা; বিধ্বস্ত কম্পমান, বিস্ফারিত বিদ্বেষ-ভরা চোখে হাঁ করা মুখ ও নাক দিয়ে এক সঙ্গে নিশ্বাস নিতে থাকা বাদামী রঙের মানুষগুলো ক্ষিধেয় শুকনো ঠোঁটগুলো চাটছে জিভ দিয়ে; ক্লান্ত ও অভুক্ত। তাদের যে কি ভূমিকাতে অভিনয় করতে হবে তা' তারা কেউ নিশ্চিত ভাবে জানে না, কেউ তাদের বলেও দেয়নি।

রক্ষীদের ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, তারা একমাত্র যে ভাষাটা বোঝে তা'হলো হিংস্রতা যা তারা অত্যন্ত সচ্ছন্দ এবং নির্ভুলভাবে ব্যবহার করছিল। যেন মানুষকে হুকুম করার 'সুন্দরতম কৌশল'টি বহু আগেই আবিষ্কার করে ফেলেছে তারা। কেরী ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে ছুটে এলো রক্ষীরা। মালিকের নতুন সংগ্রহগুলোকে গোনার সময় হুকুম দেওয়ার থেকে বেশী থুথু ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রভুকে সাহায্য করতে লাগলো।

হাতে নামের একটা তালিকা ধরে মালিক তার-স্বরে চিৎকার শুরু করে—বিরাট এই খোলা জায়গার পক্ষে উপযুক্ত বাজখাঁই গলা:

"জালিমাণি!"

"হাজির।"

"কোসানা!"

"হাজির।"

"জেমস্ সলোমন! ডেভিড!—ব্যাটা কাফেররা, বাইবেলের নামগুলো তোদের দারুন পছন্দ, তাই না? 'সলোমন'—ব্যাটা নোংরা আবর্জনা কোথাকার! "ঠিক আছে।" মালিক একজন রক্ষীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, "জুমা, এদের নিয়ে যাও।"

কেরী দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে, মারতে মারতে রক্ষীরা ওদের একপাল পশুর মতো তাড়িয়ে নিয়ে চললো একটা বিরাট বাড়ির দিকে।

বাড়ির দরজাটা লোহার, জানলার জায়গায় জেলের মতো অনেক উঁচুতে লোহার শিক দিয়ে আটকানো কয়েকটা গর্ত। দরজাটা খুলে দেওয়া হলো। আর নতুন পরিবেশটির সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই খামারের বন্দীশালার গর্তে তালাবন্ধ করে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ওদের। রাতটা তাদের এখানেই কাটাতে হবে। আধা অন্ধকারে মধ্যে দুঃখে, আত্মকরুণায়, ক্রোধে জলতে থাকে তারা। রক্ষীর চোখের দিকে তাকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করে মানবতার অবশেষ কিন্তু অন্ধকারে একটা বিরাট কালো আকৃতি ও একখানা গরিলার মতো হাত থেকে ঝুলে থাকা 'কেরী' ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না তারা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তার বিপুল অন্ধকারের মতো আকৃতি ম্লান সন্ধ্যার আলোতে ছায়া ফেলে আছে।

"আচ্ছা, ছুঁচো-খাওয়া কুত্তির বাচ্চারা!" কর্কশ কণ্ঠে ঘোষণা করে রক্ষীটা, "আমি চাই তোমরা আমার কথাগুলো একটু মন দিয়ে শুনবে।"

কথাগুলো বলার সময় ক্রমশঃ যেন বেশী বেশী করে তার গলায় একটা বিষাদের সুর ফুটে উঠতে থাকে। কঠিন কিন্তু সংযত কণ্ঠস্বর অথচ পরিমাপ করা যায় না এমন বিষাদময়। হাত দুটো শিথিল-ভাবে ঝুলছে দু'পাশে। কেরীটা মাটিতে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা আর নিজের কথাগুলোর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য মাঝে মাঝে সেট মেঝেতে ঠুকছে।

"বুঝলে হে, এখন থেকে তোমরা মিঃ পট্‌জিয়েটারের খামারে থাকবে।" যেন দুঃখের সঙ্গে জানালো সে। তার কণ্ঠস্বর বিষাদমাখা কিন্তু অদ্ভুতভাবে নিষ্ঠুর ও কঠিন। কোমল কথাগুলোর মধ্যে এমন এক রহস্যময়তা রয়েছে যা' তার ভয়াবহ পাশবিকতাকে আরো বেশি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

"যতদূর আমরা জানি, মিঃ পট্‌জিয়েটারের খামার ছুটি কাটাবার জায়গা নয়। বলাই বাহুল্য এখানে তোমাদের কেক-বিস্কুট খাওয়াবার জন্য নিয়ে আসা হয়নি; কাজ করাতে আনা হয়েছে। ঠিক ভোর চারটের একটা ঘণ্টা শুনতে পাবে আর আমি চাই, এর সঙ্গে সঙ্গেই এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে তোমরা। একেবারে পাখীর মতো গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসবে।" বিষাক্ত সুখী সুখী গলায় বলে রক্ষীটা, "এবং আমি চাই, ফসলকাটার কাস্তেগুলো নেবার জন্য লাইন করে দাঁড়াবে তোমরা। তারপর ফসল-কাটার ক্ষেতগুলাতে কেউ তোমাদের নিয়ে যাবে।"

এই পর্যন্ত বলে থামলো সে তারপর হেসে যোগ করলো, "ঢাকা এবং মোমুন্নর বীরপুত্র বলে নিজেদের প্রমাণিত করে। এমন সুন্দর সুযোগ বড় একটা আসেনা।.........সূর্য একটুকরো হীরের মতো ঝকমক করতে করতে দিগন্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, অন্তহীন শস্যের স্তবকগুলো বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে থাকবে তোমাদের সামনে—প্রাচীন কালের সৈন্য বাহিনীর মতো; আর তোমরা, ঢাকা ও মোমুন্নর বীর যোদ্ধারা, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে শাণিত কাস্তে নিয়ে। আমি তোমাদের আবার বলছি, এমন সুযোগ বড় একটা আসে না। হি হি করে হেসে ওঠে লোকটা। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিধ্বস্ত বন্দীদের সারি থেকে কোন প্রতিধ্বনি না জাগায় মাঝ পথে হাসিটা থামিয়ে দেয় সে, যেন একটা ঘুসি খেয়েছে পেটে।

"আমি বুঝতে পারছি, তোমরা আমার কথায় মজা পাচ্ছে না; তাই না? .........না হেসে তোমরা ঠিকই করেছ। এর মধ্যে মজাদার কিছুই নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের কাছে আমার বলতে বাধা নেই—এটা হলো একটা নরক। একটা প্রেতের রাজত্ব! সূর্য এখানে তামার মতো জলে, বাতাস থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু তোমরা?—তোমরা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াবার অবসর পাবে না। এক মুহূর্তও না! তোমাদের শুধু ছুটে বেড়াতে হবে। কেন জান?......কারণ জ্যাক এবং আমি—জ্যাক হলো আমারই এক দোস্ত্, কেরী আর লোহার ডাণ্ডা নিয়ে তোমাদের পেছনে থাকবো উৎসাহ দেবার জন্য!"

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে রক্ষীটা। স্বল্পক্ষণের জন্য শ্রোতাদের মধ্যে বিস্ময় জেগে একটা গভীর আতঙ্কে পরিণত হয়।

"জ্যাককের কথা তোমাদের আগেই বলেছি—গোরু বাঁধার এই ফিতেগুলোকে, ব্যবহারের সময়টুকু ছাড়া নুনজলে ডুবিয়ে রাখা হয়। গা থেকে একপ্রস্থ চামড়া তুলে নেবার নিজস্ব একটা ক্ষমতা রয়েছে এ'গুলোর। ........থাকুগে, আমার কথাগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের একঘেয়ে লাগছে" তীক্ষ্ণভাবে বলে সে। "তবে, আমার মনে হয়, তোমাদের সব কিছু জেনে রাখা দরকার। তাতে সম্পর্কটা ভালো হয়,—একেবারে ধোয়া-মোছা শ্লেট থেকে শুরু করার মতো, তাই না? অবশ্য, মনে রাখা দরকার—শ্লেটে কি লিখছো? মিঃ পট্‌জিয়েটার এই কথাটাই সব সময় বলে থাকেন। থাকগে—, তোমাদের গড় বেতন হবে, মাসে তিন পাউণ্ড........, আর যত খেতে পার—তাজা হাওয়া।"

রক্ষীটা চলে যাওয়ার বহুক্ষণ পরেও মানুষগুলোর হুঁস হলোনা যে সে চলে গেছে। তার বক্তৃতা শোনার সময় যে যেমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, এখনো ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে। দরজাটা বন্ধ হয়ে বাইরের থেকে শেকল লাগাবার শব্দ হওয়ার পরেও তারা তাকিয়ে আছে দরজাটার দিকে—যেন রক্ষীটা আর একবার দেখা দিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবে আবার। অল্পবয়সী ছেলেদের মধ্যে একজনের নিঃশব্দ কান্না এবং বয়স্ক এক বন্দীর অস্ফুট প্রার্থনা উচ্চারণের শব্দে সম্মোহনের ভাবটা কেটে গেল তাদের আর তখনই তারা আয়তাকার ঘরটার চারদিকে—আসবাব, কম্বল বা আর যা কিছু আরামের সামগ্রি তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে দেখতে লাগলো।

এতেও অন্য অনেক কিছুরই মতো তাদের জন্য অসীম বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

## 'বীক্ষণ'-এর কিশোর-কিশোরী ভাই-বোনেদের কাছে

# আবেদন

প্রিয় বন্ধুরা,

তোমরা তোমাদের বাড়ীতে, বাড়ীর বাইরে যা কিছু দেখছ, দেখে যা মনে হচ্ছে; স্কুলে তোমাদের পাঠ্যবস্তু পড়তে বা শিখতে গিয়ে কি কি অসুবিধা হচ্ছে; পড়াশুনা করার যদি সুযোগ না পেয়ে থাক, তো কেন পেলে না;—এ সমস্ত কিছুই 'বীক্ষণ'-এর জন্য নিজের ভাষায় লিখে পাঠাও। সাথে সাথেই গল্প, কবিতা এ সবকিছুই পাঠাও। তোমাদের লেখাপত্তর 'বীক্ষণ'-এর 'কিশোর-কিশোরী বিভাগে' প্রকাশিত হবে। ঐ বিভাগের জন্য লেখার খামের উপর "কিশোর কিশোরী বিভাগ" কথাটি লিখে দেবে।

—সঃ মঃ বীঃ

# দর্শন প্রসঙ্গে

ব্রজেন মণ্ডল

॥ ১ ॥

## আমাদের জীবনে দর্শন-এর ভূমিকা

ক্লাশ টেনে-এ পড়া ছাত্র বাচ্চু যখন দোকানে গিয়ে প্রায়ই ফেরত পয়সা আনতে ভুলে যায়, অথবা বেশী পয়সা দিয়ে আসে, স্কুলে প্রায়ই কলম বই খাতা হারিয়ে আসে আর সেজন্য বাবা, কাকু'র অনেক বকাবকির পরও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না, তখন স্নেহশীলা দিদি তাকে ঠাট্টা করে বলেন—"কি'রে, তুই কি দিন দিন দার্শনিক হয়ে যাচ্ছিস না'কি?" অথবা পাশের বাড়ীর মাঝবয়েসী অধ্যাপক বিভাসবাবু'র কথাই ধরা যাক্। প্রায়ই দেখা যায় ইস্ত্রিরি করা ধবধবে জামার সাথে একেবারে কালো নোংরা ধুতি পরে তিনি কলেজে চলেছেন। দু'বেলা কলেজ যাবার বা আসবার সময় তাঁর ধুতির কোঁচা মাটিতে লুটাতে থাকে। বুকের, হাতের বোতাম আদ্দেকই খোলা থাকে। এক গাদা বই বুকে চেপে ধরে কোনরকমে সামলাতে সামলাতে পথ চলেন। কারও সাতে পাঁচে থাকেন না। কেউ কোন সম্ভাষণ করলে, উঁচুপাওয়ারওয়ালা চশমার ভিতর থেকে উদাস চোখ দুটি তুলে একটু স্মিতভাবে হাসেন মাত্র। প্রায়ই মাসের শুরুতে মাইনের টাকা অন্যমনস্কতার জন্য পকেটমার হয়ে গেছে বলে তাঁর স্ত্রী'র তর্জন-গর্জন শোনা যায়। সহৃদয় প্রতিবেশীরা একটু শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি মিশিয়ে বলাবলি করেন "বিভাসবাবু'র কেমন একটা দার্শনিক দার্শনিক ভাব" (অবশ্য দুষ্টু ছেলেরা এর জন্য অনেক সময়ই তাঁর পিছনেও লাগে)। অথবা ধরুন আপনার কলেজের কোন সহপাঠিকে কিছুতেই কোন বনভোজনের বা একসাথে, বাইরে কোথাও, বন্ধুরা মিলে বেড়াতে যাওয়ার দলে নিয়ে যাওয়া যায় না। ওসব কথা উঠলেই সে বলে "দূ-র! আমার এসব হৈ-হুল্লোড় ভাল লাগে না।" খুবই সম্ভাবনা আছে যে এজন্য তাকে বন্ধুদের কাছে ঠাট্টা শুনতে হয় "কি হে, তুমি দার্শনিক হয়ে যাচ্ছ না'কি?"

### 'দার্শনিক' সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

'দার্শনিক' শব্দটার এ'রকম ব্যবহার আমরা রোজকার জীবনে অহরহ শুনে থাকি এবং করেও থাকি। উপরের উদাহরণগুলির মত প্রধানতঃ দু'রকমভাবেই এই ব্যবহার হয়। এক, যখন আমরা কাউকে ঠাট্টা করে 'দার্শনিক' বলি। দুই, যখন শব্দটার প্রয়োগে কারুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়। কিন্তু ধরনের দিক থেকে দু'রকম হলেও দুটি ক্ষেত্রেই আদর্শ 'দার্শনিক' সম্পর্কে আমাদের মনে আঁকা এক ধরনের ছবিই বেরিয়ে আসে। সেই ছবিটার পরস্পরযুক্ত দুটি দিক: এক, সাধারণভাবে 'দার্শনিক'-এরা জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন এক ধরনের প্রতিভাধর ব্যক্তি; দুই, এই ঔদাসীন্যের কারণ তাঁদের 'দর্শন'।

আর একটু সহজভাবে বললে ছবিটা অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়—দার্শনিকদের সাধারণতঃ 'ছোটখাটো' পার্থিব ব্যাপারে কোন নজর থাকে না। সাংসারিক ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন। সাধারণ মানুষ যেসব কারণে আনন্দ পান, দুঃখ পান, রেগে যান, উত্তেজিত হন, 'দার্শনিক'দের সেসব স্পর্শ করে না। 'দার্শনিক'রা ভুলো স্বভাবের, নির্লিপ্ত, বাস্তব-জ্ঞান বিবর্জিত মানুষ। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হোল, তাঁদের এইসব অস্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ হোল, যে বিষয়ে তাঁদের পারদর্শিতা সেই দর্শন নিয়েই তাঁদের এত ডুবে থাকতে হয় যে 'বাইরের' ব্যাপার তাঁদের মনের উপর কোন প্রভাব ফেলে না।

খেয়াল করতে হবে দ্বিতীয় দিকটি যাঁদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত অর্থাৎ যাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি আমাদের মতই সাধারণ বলে আমরা মনে করি তাঁদের যদি কেবল ঐসব বাইরের চারিত্রিক লক্ষণগুলো দেখা দেয় তো তাঁদের আমরা ঠাট্টা করেই 'দার্শনিক' বলি। অর্থাৎ তাঁদের ক্ষেত্রে এইসব লক্ষণগুলির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে ব'লে আমরা মনে করি না।

কিন্তু 'দার্শনিকে'দের ধ্যানের, চিন্তার বিষয়টাই এমনি যে আমাদের বিবেচনায় তাঁদেরকে এসব সাধারণ মাপকাঠিতে বিচার করলে চলবে না। অবশ্য এটা ঠিকই যে আমাদের মনের মধ্যে গড়ে ওঠা এই ছবিটির অবিকল প্রতিমূর্তি—এরকম কোন দার্শনিকের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের কমই ঘটে। সাধারণতঃ যেটা হয় তা হচ্ছে আমাদের জানাশোনা পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের ঐসব চারিত্রিক লক্ষণগুলি দেখা যায় তাঁদেরই আমরা মোটামুটি 'দার্শনিক' জাতীয় প্রতিভাধর বলে ধরে নিই।

### 'দর্শন' সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

এখন 'দার্শনিক' সম্পর্কে আমাদের এই ধারণা থেকে কিন্তু 'দর্শন' বিষয়টার প্রকৃতি সম্পর্কেও আমাদের ধারণা বা 'দর্শন'-এর প্রতি আমাদের মনোভাবটাও বেরিয়ে আসে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই ধারণারও দুটো দিক আছে। সেগুলি হোল :

**প্রথমতঃ** 'দর্শন' বিষয়টা এমনই যে তা' বুঝতে হলে জাগতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত হওয়া চাই (তার মানে নির্লিপ্ত হলেই দর্শন বোঝা যাবে তা নয়, কিন্তু নির্লিপ্ত না হলে তা' কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়)। অথচ আমরা তা' নই। 'দর্শন'ও বুঝব আবার জাগতিক ব্যাপারেও ডুবে থাকব, এ'দুটো পরস্প-বিরোধী—একসাথে হয় না। কাজেই আমাদের পক্ষে **'দর্শন' বোঝা সম্ভব নয়।** ওটা 'দার্শনিক' জাতীয় লোকেদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

**দ্বিতীয়তঃ** 'দর্শন'-এর সাথে যখন জগৎ-সংসারের এমন আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক তখন এটা বোঝা তো খুবই সহজ যে জাগতিক ব্যাপারে অর্থাৎ আমরা সাধারণ মানুষরা প্রতিদিন যে সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, যা নিয়ে বেঁচে আছি—সে সব ব্যাপারে 'দর্শন'-এর কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং 'দর্শন' আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনে কোন কাজে লাগবে না। আর তাই যদি হয় তবে 'বিশুদ্ধ' জ্ঞানলাভের ইচ্ছে ছাড়া **'দর্শন' জানারও বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই।** আর প্রাণ রাখতেই যেখানেই প্রাণান্তকর অবস্থা সেখানে "বিশুদ্ধ" জ্ঞানলাভের ইচ্ছে আর ক'জনের অবশিষ্ট থাকে ?

অর্থাৎ আরও সোজা কথায় বললে, 'দর্শন' বিষয়টা এমনিই যে তার সম্পর্কে ধারণা করা আমাদের মত সাধারণ মানুষের কম্ম নয়, আর তার দরকারও নেই। আমরা যারা দুঃখ পেলে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদি, আনন্দ পেলে উচ্ছল হয়ে উঠি, বাজারে গিয়ে জিনিষপত্রের দাম বেশী দেখলে মাথা গরম করে ফেলি, প্রাত্যহিক জীবনের সব "তুচ্ছাতিতুচ্ছ" খুঁটিনাটি নিয়েই মশগুল হয়ে আছি, তাদের মাথায় ও'সব ঢুকবেও না আর ঢোকানোর চেষ্টা করাটাও একটা পাগলামী। পাগলামী কারণ 'দর্শন' জেনে আমার লাভটা কি হবে ? আমাদের খাওয়া, পড়া, চাকরী-বাকরী, রোগ-শোক এ'সবে তো আর 'দর্শন' জেনে কোন সুবিধা হবে না। আদার ব্যাপারী হয়ে অনর্থক জাহাজের খবরে কাজ কি ?

### 'দর্শন' সম্পর্কে এই ধারণার ফল

'দর্শন'-এর প্রকৃতি সম্পর্কে এ'ধরনের ধারণার ফল এই হয়েছে যে আমরা বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষই 'দর্শন' সম্পর্কে কিছু জানি না। তা'ই নয়, জানার আগ্রহও বোধ করি না।

### 'দর্শন'-এর সাথে অন্য বিষয়গুলির তুলনা

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমরা কি সবাই জ্ঞানের অন্য শাখাগুলি (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ইত্যাদি) সম্পর্কে সব জেনে বসে আছি না কি ?—না, সেগুলি সবই জানার জন্য একেবারে আকুলি-বিকুলি করছি ? -ঠিকই, এ'সব বিষয়ের কোন কোনটা সম্পর্কে হয়ত আমরা কেউ কেউ কিছু কিছু জানি। কিন্তু নিশ্চয়ই সবগুলি বিষয়েই ওয়াকিবহাল এ'রকম "সর্বজ্ঞ" আমাদের মধ্যে খুবই কম আছে। শুধু বেঁচে থাকার জন্যই যেভাবে সারা জীবন আমাদের কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় তা'তে তা' সম্ভবও নয়। কিন্তু, তবু এগুলি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা, নিস্পৃহতা'র সাথে 'দর্শন' সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা ও নিস্পৃহতা'র একটা বিশেষ পার্থক্য আছে—এইসব বিষয়ের যেগুলি সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে কিছুই জানি না, সেগুলি সম্পর্কেও এ'টুকু বুঝি যে আমাদের পার্থিব জগতের নানা সমস্যা নিয়েই এদের কারবার। এদের একটা উপযোগিতা আছে আমাদের জীবনে। এগুলি সবই আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষেও জানা সম্ভব। নেহাৎ সবারই সবকাজে কাজী হওয়া সম্ভব নয় বলেই এ'সব বিষয়ের সবগুলি সম্পর্কে আমাদের সবারই ধারণা নেই। অর্থাৎ এগুলি সম্পর্কে আমাদের **অজ্ঞতাটা বাইরের কারণে, বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত কোন বৈশিষ্ট্য এর জন্য দায়ী নয়।** বিষয়গুলি প্রকৃতিগতভাবেই যে দুজ্ঞেয়, তা' নয়, এবং চূড়ান্ত অর্থে অপ্রয়োজনীয়ও নয়। কিন্তু 'দর্শন' সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার চেহারাটা একেবারেই আলাদা। **প্রথমতঃ** 'দর্শন'-এর আমাদের বাস্তবজীবনে কোন উপযোগিতা আছে বলে আমরা জানি না এবং সেই থেকেই এটা জানা অপ্রয়োজনীয়। **দ্বিতীয়তঃ** 'দর্শন' সম্পর্কে আমাদের **অজ্ঞতার মুল কারণটা বাইরে নয়, 'দর্শন' বিষয়টার অন্তর্নিহিত দুজ্ঞেয় রহস্যময় চরিত্রই এর জন্য দায়ী।** অর্থাৎ এই ধারণা অনুযায়ী 'দর্শন' মাটির পৃথিবীর সমস্ত "মলিনতা" মুক্ত এমন একটা "বিশুদ্ধ" জ্ঞানের জগৎ, এমন এক ঘন রহস্যময় প্রান্তর, যে সেখানে মাটির পৃথিবীর মমতায় আবদ্ধ জীবেদের অর্থাৎ আমাদের মত সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

### 'দর্শন' সম্পর্কে বিদ্বান ব্যক্তিদের ধারণা

'দর্শন' সম্পর্কে এরকম ধারণা শুধু আমাদের মত সাধারণ মানুষেরই আছে তা' নয়। অন্য নানা বিষয়ে (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি) দক্ষতা আছে এরকম বহু বিদ্বান ব্যক্তিরও ধারণাটা খুব সম্ভবতঃ এর চেয়ে খুব একটা অন্যরকম কিছু নয়। যদিও তার প্রকাশটা হয়তো একরকমভাবে হয় না। সত্যি কথা বলতে 'দর্শন' বিষয়টিকে ঘিরে

যে পরিমাণ রহস্য বা কুয়াশা সৃষ্টি হয়েছে জগতের আর কোন বিষয় নিয়েই তা' হয়েছে কি'না সন্দেহ আছে।

## 'দর্শন'-এর প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলি ভুল

'দর্শন' সংক্রান্ত মূল আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে বিষয়টির চরিত্র সম্পর্কে আমাদের উপরের ধারণাগুলি আগাগোড়াই ভুল ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা উপকথা মাত্র। 'দর্শন'-এর সাথে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের যোগাযোগ আছে শুধু তা'ই নয়, সে যোগাযোগ এতটা নিবিড় যে **'দর্শন'-এর আওতার বাইরে আমরা কেউই নই।** মাটির পৃথিবীর সমস্যাগুলি থেকে দূরের কোন "বিশুদ্ধ" জ্ঞানের জগৎ তো নয়ই, 'দর্শন'-এর উৎপত্তিই মাটির পৃথিবীর বা আরও ঠিক করে বললে গোটা বস্তুজগতের বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের (অর্থাৎ যেগুলির অস্তিত্ব আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়েই বোঝা যায়) নানা সমস্যা থেকে। এবং উল্টো দিক থেকে বললে আমরা আমাদের জাগতিক জীবনের ছোট বা বড় সমস্ত সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে মূলতঃ 'দর্শন' দ্বারাই চালিত হই। কলেরা হ'লে মা শীতলার থানে পুজো দেব না, ডাক্তার ডাকব অথবা দু'টোই করব; খরার সময় দেবমন্দিরে ধর্ণা দেব না চাষের জলের অন্য বন্দোবস্তের কথা ভাবব; আমি কোন ছাত্র-সংগঠনের সমর্থক হ'লে অন্য সমস্ত সংগঠনের ছাত্রদেরই শত্রু ভাবব কি'না; বাস দেরী করে এলে কণ্ডাক্টর ড্রাইভারের উপরই গায়ের ঝাল মেটাব, না—রাজ্য পরিবহনের কর্তাদেরই এর জন্য দায়ী করব; অফিসের বড়সাহেব ও পিওনের সাথে কিরকম আচরণ করব—এ সমস্ত এবং আরও অসংখ্য ব্যাপারগুলিতেই অর্থাৎ যেগুলি মিলেই আমাদের জীবন, আমাদের বেঁচে থাকা—সেই সবগুলিই আমরা সেই রকম ভাবেই **ভাবি** বা **চলি** যে রকম ভাবে ভাবা বা চলাটা আমাদের **ঠিক** এবং **উচিত** বলে মনে হয়। এখন কোনটা ঠিক আর কোনটা উচিত এটা স্থির করার ক্ষেত্রে **আমাদের অজান্তেই আমাদের চালনা করে এক বা একাধিক ধরনের 'দর্শন'** (হ্যাঁ, 'দর্শন' নানা ধরনের হয়)। কিন্তু যেহেতু আমরা এই 'দর্শন'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নই, সেহেতু আমরা প্রত্যেকেই ভাবি আমরা বুঝি নিজেরাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা করে "সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে"ই এ'সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিই।

অবশ্য এইভাবে বললে 'দর্শন'-কে একটা ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হ'তে পারে, যা আমাদের অজান্তে ঘাড়ে চেপে বসে আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। তবে ব্যাপারটা যে তা' নয়, এবং ঠিক কিভাবে 'দর্শন' আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা আমরা আমাদের মূল আলোচনায় দেখতে পাব। কিন্তু উপরের কথাগুলি যদি ঠিক হয়, তবে তা' থেকে অন্ততঃ এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারি যে, 'দর্শন'-এর প্রকৃতি যদি এটাই হয় তবে জাগতিক ব্যাপারে ডুবে থাকাটা 'দর্শন' বোঝার পক্ষে বাধা হতে পারে না। অর্থাৎ 'দর্শন'-এর অন্তর্নিহিত চরিত্র এমন নয়—এত "বিশুদ্ধ" (?) নয় যে, তা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

উপরের সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয় তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, 'দর্শন'-এর "খপ্পর" থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই—হতে পারি না। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্তই 'দর্শন' যেন আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে। 'দর্শন'ই আমাদের "চালক", আমাদের "প্রভু"। আর ঘটনাটা যদি তা'ই হয় তবে আমাদের এই সর্বশক্তিমান মালিকটির স্বরূপ জানার চেষ্টা করাটা, কেমন করে সে আমাদের অজান্তেই তার ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নিচ্ছে, এটা বোঝার চেষ্টা করাটাকে আর আমরা অনাবশ্যক বলে এড়িয়ে যেতে পারি কি? এইভাবে এড়িয়ে যাওয়া আর ইচ্ছে করেই অন্ধ থাকা—এই দুটোর মধ্যে তা' হলে আর কোন পার্থক্য থাকে কি?

কিন্তু 'দর্শন' জানার প্রয়োজনটা শুধু যদি এদিক থেকেই হয় তবে একটা প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক—"'দর্শন' না জানার ফলে আমরা 'অন্ধ' হয়ে আছি, এই কথাটা যদি ঠিক হয় তবে তো বলতে হয় আমরা অধিকাংশই জন্মান্ধ। কারণ ব্যাপারটা তো এরকম নয় যে কোনকালে জানলেও এখন ভুলে গেছি। বরং এটাই ঘটনা যে কোনকালেই জানতাম না, এখনও জানি না। এখন কথা হচ্ছে জন্মান্ধদের পক্ষে তো চোখ ফিরে পেলে কি সুবিধা সেটা বোঝা সম্ভব নয়। কাজেই আমরাও 'দর্শন' জেনে দিগ্‌গজ হলে, 'আমি আর অজ্ঞ নই, অন্ধ নই, দেখ, আমি 'দর্শন' কাকে বলে জানি—একথা বলা ছাড়া আর কি অতিরিক্ত সুবিধা হবে বুঝতে পারছি না। এই তথাকথিত অন্ধত্বে আমার কি ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা বুঝছি না। সত্যিই তেমন কোন ক্ষতি হচ্ছে কি? হলে কি ক্ষতি হচ্ছে? আর চোখ ফিরে পেলে কি কি বাড়তি সুবিধা হবে—যা এখন আমরা পাচ্ছি না? এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর না পেলে 'দর্শন' শেখাটা প্রয়োজনীয় বলে মেনে নিলেও, তেমন জরুরী বলে তো বোধ হচ্ছে না। কারণ কেবল জ্ঞানের বড়াই করার জন্য—কোন কিছু শেখার মত অতিরিক্ত সময় বা শক্তি কোনটাই আমাদের নেই।"

এইসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর—হ্যাঁ, 'দর্শন' কি তা না জানার ফলে আমাদের অশেষ ক্ষতি হচ্ছে, যে ক্ষতিগুলি 'দর্শন' জানলে পরে আমরা এড়িয়ে চলা শুরু করতে পারব। কি ভাবে? এবার সেই কথাতেই আসছি।

আমরা দেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র (ধনী পরিবার থেকে

বাসা ছাত্ররা ছাড়া )—অর্থাৎ যাঁরা নিজেরা অথবা যাঁদের পরিবার মেহনত করে রুটি রুজি উপার্জন করি, তাঁদের সবাই সব দিক থেকেই যে এক ভয়াবহ অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছি—এটা বোঝার জন্য আমাদের নিজেদের কোন কেতাব পড়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের নিজেদের জীবন দিয়েই তা' আমরা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারছি। আমাদের এই বেদনা ও দুঃখগুলিকে বাইরের চেহারার দিক থেকে নিবিড়ভাবে পরস্পরনির্ভর তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

**প্রথমতঃ** দারিদ্র্য, বেকারী, দুর্নীতি, রকেটের বেগে বেড়ে চলা জিনিষপত্রের দাম, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধিগুলি, যেগুলি আমাদের শুধু বেঁচে থাকাটাই প্রায় অসম্ভব করে তুলছে।

**দ্বিতীয়তঃ** নীচতা, স্বার্থপরতা, মানুষে মানুষে কলহ, হানাহানি, মারামারি ইত্যাদি, যা আমাদের কি পারিবারিক জীবন, কি সামাজিক জীবন—সব কিছুকেই তিক্ত করে তুলছে, বিষিয়ে দিচ্ছে।

**তৃতীয়তঃ** বন্যা, খরা, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি, যা নিয়তির মত অনিবার্যভাবেই প্রতি বছর কোটি কোটি মানুষকে গৃহহারা করছে, হাজার হাজার মৃত্যু ঘটাচ্ছে—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বংসের তাণ্ডব ছুটিয়ে দিচ্ছে।

এই তিন ধরনের বেদনা বা সমস্যার কোনটার প্রতিই আমাদের পক্ষে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব নয়। আমরা নির্লিপ্ত থাকিও না। আমাদের 'নিজেদের" বিবেচনা মত তিনটির ক্ষেত্রেই আমাদের নানারকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়। এদের মধ্যে কোন কোন ধরনের সমস্যার প্রতিক্রিয়ায় আমরা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পরি, স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে সামিল হই সামাজিক ব্যাধিগুলি ), কোন কোনটাকে আমরা সমস্যা বলেই আলাদাভাবে খেয়াল করি না ( নীচতা, স্বার্থপরতা, কলহ, হানাহানি, মারামারি ইত্যাদি ), আবার কোন কোন সমস্যাকে ভবিতব্য ব'লে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকি, শুধু বিলাপ করা ছাড়া অন্য কিছু করার বা ভাবার আছে বলে মনে করি না ( প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে )।

কিন্তু আমাদের এই প্রতিক্রিয়াগুলি যে ঠিক পথে চালিত হচ্ছে না, তার সবচেয়ে বড় প্রমান, আমাদের জীবনের এইসব সমস্যাগুলি মিটে যাওয়ার বদলে ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। অথচ, আমরা প্রত্যেকেই কি এমন এক জীবন চাইনা, যেখানে অলস কর্ম-বিমুখ লোক ছাড়া সবারই জন্য শরীর ও মনের সমস্ত চাহিদাগুলিরই পূরণের প্রতিশ্রুতি থাকবে ; যেখানে মানুষে মানুষে হানাহানির বদলে এক গভীর ভালবাসা ও প্রীতির জালে সব মানুষই আবদ্ধ থাকবে, সর্বোপরি যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি আর মানুষের এমন করে ক্ষতি করতে পারবে না ? নিশ্চয়ই চাই—অত্যন্ত আকুল হয়ে চাই। তবুও হচ্ছে না কেন ? তার কারণ আমরা আগেই বলেছি এই সমস্যা-গুলির মুখোমুখি হয়ে আমাদের যা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা যা ভাবছি বা করছি তাতেই গলদ থেকে গেছে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি আমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ( জৈবিক ব্যাপার অর্থাৎ খিদে, তেষ্টা ইত্যাদি ছাড়া ) আমাদের অজান্তে নিয়ন্ত্রণ করে এক বা একাধিক ধরনের 'দর্শন' (হাঁ, নানা ধরনের 'দর্শন' আছে )। সেজন্যই এইসব গলদগুলির মূল কারণ হচ্ছে, যে অথবা যে যে ধরনের 'দর্শন' দ্বারা আমরা চালিত হচ্ছি—সেগুলিই ভুল। যতদিন পর্যন্ত আমরা এই ভুল 'দর্শন'-এর মুঠি থেকে বেরুতে না পারছি, ততদিন আমাদের বেশীরভাগ চিন্তা ও কাজেই ত্রুটি থেকে যাবে। ফলে সমস্যাগুলিও সমাধান হওয়ার পরিবর্তে বেড়েই চলবে। কাজেই আমরা যদি আমাদের চিন্তা ও কাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের জীবনের এই সব জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে চাই তবে সচেতনভাবে বেঠিক ও সঠিক 'দর্শন'গুলিকে খুঁজে বার করে দ্বিতীয়টিকে দিয়ে প্রথমটিকে স্থানচ্যুত করতে হবে। মনে রাখা দরকার 'দর্শন'-"মুক্ত" হয়ে আমরা কোন কিছু ভাবতে বা করতে পারি না। আমাদের "স্বাধীনতা" শুধু এইটুকু যে আমরা ইচ্ছে করলে বেঠিকের জায়গায় সঠিককে বসাতে পারি। আর তা' করতে হ'লে স্বভাবতঃই সঠিক বা বেঠিক 'দর্শন' কি সেটা আমাদের জানা দরকার। আর তা' জানার জন্য সবার আগে দেখা দরকার—'দর্শন' কাকে বলে।

সুতরাং 'দর্শন'-এর চরিত্র সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ 'দর্শন'-এর আওতার বাইরে যদি আমরা কেউই না থাকতে পারি তবে **'দর্শন' শেখাটা—আমাদের জীবনে অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয় তো নয়ই** বরং তা' **খুবই সম্ভব ও জরুরী।**

অবশ্য একটা প্রশ্ন তার পরেও থেকে যায় যে, 'দর্শন' সম্পর্কে এই সব শেষের ধারণাগুলিই যদি ঠিক হয়, তবে এত ব্যাপকভাবে এরকম উল্টো একটা ধারণার জন্ম কি করে হোল। এর উত্তর : যে ভুল 'দর্শন'-এর প্রভাবে আমরা অন্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও নানারকম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, সেই একই 'দর্শন'-এর প্রভাবেই 'দর্শন' সম্পর্কেও আমাদের মনে এরকম আজগুবি ধারণার জন্ম হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি ব্যাপারও উল্লেখ করা দরকার। 'দার্শনিক' বা 'দর্শন' সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণার কথা আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলি প্রধানতঃ সাধারণ মানুষের সেই অংশটি সম্পর্কেই প্রযোজ্য যাঁদেরকে আমরা "শিক্ষিত" বা "ভদ্রলোক" বলে থাকি। সাধারণ মানুষের বৃহত্তম অংশটির ক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রমিক কৃষকদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই এই সব ভুল ধারণার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁদের অধিকাংশরই 'দর্শন' শব্দটির সাথেই ( দেখা অর্থে নয় ) পরিচিতির কোন সুযোগ ঘটেনি। তবে বলা বাহুল্য সঠিক 'দর্শন'-এর উপযোগিতা

বা প্রয়োজন উপরের কারণ অনুযায়ীই, তাঁদের জীবনে অন্যদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। বরং তাঁদের জীবনে দুঃখের বোঝাটা সবচেয়ে ভারী বলেই দরকারটাও সবচেয়ে বেশী। আর তাঁদের বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতাও আমাদের মত "শিক্ষিত"দের চেয়ে কম মনে করার কোন কারণ নেই। কাজেই তাঁদের পক্ষেও 'দর্শন' বোঝাটা একই-রকমভাবে সম্ভব।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আমাদের মূল যে বিষয় অর্থাৎ 'দর্শন' কাকে বলে আর সঠিক ও বেঠিক 'দর্শন' কি করে চেনা যাবে, সে সম্পর্কে আলোচনায় যাব। তবে তার আগে 'দর্শন'-এর উপযোগিতার প্রশ্নে একটা সাবধান বাণী করা প্রয়োজন। আমাদের জীবনে 'দর্শন'-এর এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে একথা যেন আমরা মনে না করি সঠিক 'দর্শন'টা একটা যাদুমন্ত্র যা একবার আয়ত্ব করতে পারলেই ভোজবাজীর মতই আমাদের সমস্ত সমস্যাগুলি হাওয়াই মিলিয়ে যাবে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টগুলি রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে।—না সঠিক 'দর্শন' থেকে এরকম ঐন্দ্রজালিক কিছু হবে না। তবে?—সঠিক 'দর্শন'-টিকে আয়ত্ব করতে পারলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানের পথে বাধাগুলি কোথায় এবং কি কি। আর তা' বুঝতে পারলেই সেগুলিকে সরানোর কাজটাও আত্মবিশ্বাস নিয়ে শুরু করতে পারব। আমাদের চেষ্টাগুলি ঠিক দিকে চালিত হবে। কিন্তু একবারেই লক্ষ্যভেদ করতে পারব এটা যেন স্বপ্নেও না ভাবি। অনেক ব্যর্থতার পর্বের মধ্য দিয়েই আমরা সফল হতে পারব। কিন্তু সঠিক 'দর্শন' জানার আগের পর্বের ব্যর্থতার সাথে পার্থক্যটা এখানেই হবে যে আগে অন্ধকার বা আধো অন্ধকারে চাঁদমারীটা কোথায় না জেনেই আন্দাজে তীর ছুঁড়ছিলাম। কিন্তু এবারে চাঁদমারীটাকে চোখের সামনে রেখেই তীর ছুঁড়তে পারব। সঠিক 'দর্শন'-এর উজ্জ্বল আলোতেই এই চাঁদমারীটাকে আমরা চিনে নেব। কিন্তু চাঁদমারী চেনার পরেও হাতের টিপ আসতে তো সময় লাগবেই!

(ক্রমশঃ)

## বিক্ষুব্ধ শিক্ষাজগৎ

**দেশ:**

গত আটই আগষ্ট **দয়ালবাগ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের** ১০০ জনেরও বেশী ছাত্র আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আশ্রয় নেন।

### ছাত্র

আগেরদিন রাত্রিতে প্রায় ৩০ জন সশস্ত্র গুণ্ডা ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে বলে। অন্যথায় হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। কয়েকজন ছাত্র পালাতে চেষ্টা করলে, তাঁদের নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। ছাত্ররা বলেন—কলেজ কর্তৃপক্ষ ৯০ জন ছাত্রকে পার্সেন্টেজের অভাবে বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে অনুমতি দেয়নি। গত ষোলই জুলাই পরীক্ষা শুরু হলে, ছাত্ররা কয়েকটি পরীক্ষা বয়কট করেন। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ গুণ্ডা দিয়ে আক্রমণ চালায়। দশই আগষ্ট আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার এক নোটিশ দিয়ে অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলো তিন সপ্তাহের জন্য পেছিয়ে দেন, যাতে ছাত্ররা 'শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারেন।' বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কমিটির এক জরুরী বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে—"দয়ালবাগ কলেজের অধ্যক্ষ ও কর্মচারীদের উচিৎ ছাত্রদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করা যাতে ছাত্ররা তাঁদের নৈতিক সাহস ফিরে পেতে পারেন।" কমিটি জেলা কর্তৃপক্ষকে ছাত্রদের নিরাপত্তার নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। এই কলেজের কয়েকশত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ছাত্রদের অভিভাবকরাও এক বৈঠকে মিলিত হয়ে গুণ্ডা দিয়ে ছাত্রদের মারধোর করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের নিন্দা করেন।

●**রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের** একদল ছাত্র উপাধ্যক্ষ ও রেজিষ্ট্রার-এর অফিসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্লকটি দখল করে নেন। ছাত্রদের দেওয়া চব্বিশ ঘন্টার চরম প্রস্তাব উত্তীর্ণ হলে, ষোলই আগষ্টের রাত্রিতে প্রায় ১০০ ছাত্র এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রদের প্রধান দাবীগুলো হল—অবিলম্বে সমস্ত স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, আর্টস ও বিজ্ঞান শাখার শতকরা ৪২ ও ৪৮ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হবার সুযোগ দান, গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার তহবিল ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের সভাপতি শ্রীভরত সিং পাওয়ার জানান যে উপাধ্যক্ষ ও রেজিষ্ট্রার ছাড়া অন্য সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীকে প্রশাসনিক দপ্তরে ঢুকতে দেওয়া হবে।

●**উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের** ছাত্ররা উপাধ্যক্ষ শ্রীজগন্নাথ দাসকে গত আটাশে জুলাই 'ঘেরাও' করেন। সাত ঘণ্টারও বেশী সময় উত্তীর্ণ হলে ৬০ জনেরও বেশী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ শ্রীদাসকে 'উদ্ধার' করে। ছাত্ররা দাবী করেছিলেন একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক পয়লা আগষ্টের পরিবর্তে সেইদিনই করতে হবে। কৃষি বিভাগের সিলেবাস রদবদল নিয়ে এই বৈঠক বসার কথা ছিল। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীপঞ্চানন কানুনগোকে 'রাজ্যপরিবহন সংস্থার বাসকে বাধাদান ও জোর করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিয়ে যাবার অভিযোগে' গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে অবশ্য জামিনে তিনি মুক্তিপান।

●**নিখিল আসাম** ছাত্র-ইউনিয়নের ডাকে গত চব্বিশে আগষ্টের আসাম বন্ধ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বাড়ার প্রতিবাদে ! এই ধর্মঘটকে ছ'টা বিরোধী রাজনৈতিক দল সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিলং-এ একজন সরকারী মুখপাত্র বন্ধের সাফল্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেও স্বীকার করেন যে—'ব্রহ্মপুত্র এলাকার সর্বত্র বন্ধ পালন করা হয়েছে।' অন্যদিকে পি. টি. আই. ও ইউ. এন. আই-এর সংবাদদাতারা জানান—'উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের একটি ট্রেনও চলেনি। রাজ্য পরিবহনের একটি বাসও পথে বেরোয়নি। অন্যান্য যানবাহনও চলাচল করেনি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসগুলিতে, আসাম হাইকোর্ট, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এবং কলকারখানায় একজন লোকও উপস্থিত হয়নি।'

●রাজ্যের চিকিৎসাসচিব দাবীপূরণের আশ্বাস দিলে, গত পঁচিশে আগষ্ট থেকে ৩৪ দফা দাবীর সমর্থনে **শিলচর মেডিকেল কলেজের** ৩৪ দিনের ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে। গত ২রা আগষ্ট ধর্মঘটী ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জানাবার জন্য করিমগঞ্জের সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করেন।

●গত ষোলই আগষ্ট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্রসংস্থার আহ্বানে **ভূপাল বন্ধ** পালন করা হয়। আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে (সতেরোই আগষ্ট) পুলিশের বুলেটে সাতজন নিহত ও পাঁচজন আহত হন। পুলিশ ২৪ রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলি চালনার প্রতিবাদে **ইন্দোরের ছাত্ররা** কুড়ি তারিখ ইন্দোর বন্ধ পালন করেন। পুলিশ ছাত্রদের ধরপাকড় করলে, বিভিন্ন জায়গায় ছাত্র, পুলিশ সংঘর্ষ হয়। এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র জহর মার্গে সমবেত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করেন।

●গত সতেরোই আগষ্ট থেকে **মহারাষ্ট্রের** সরকারী আবাসিক চিকিৎসকদের ধর্মঘট শুরু হয়েছে। সরকার চিকিৎসকদের আবাস জোর করে কেড়ে নিলে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত বেশীরভাগ মানুষই সরকারী কার্যকলাপকে তাঁদের পেশার প্রতি এক 'চরম অপমান' বলে চিহ্নিত করেন। বিশে আগষ্ট মেডিকেল ছাত্ররা ধর্মঘটী চিকিৎসকদের পাশে এসে দাঁড়ান। মেডিকেল ছাত্রদের সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, কোন ছাত্র ক্লাশে যাবেন না ও হাসপাতালে 'রাউণ্ড' দেবেন না।

●**নয়াদিল্লীর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কলেজের** প্রায় ৫০০ ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের এক সংঘর্ষের ফলে ৫০ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ ছাত্রদের উপর ৪৬ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটান। তেইশে আগষ্টের এই ঘটনায় ১৩ জন ছাত্রকে 'জনগণের সেবকদের উপর আক্রমণ চালানোর' অভিযোগে আটক করা হয়েছে। ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ হবার কারণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি।

●গত পঁচিশে জুলাই **নয়াদিল্লীর রামানন্দ কলেজের** ছাত্ররা দিল্লী পরিবহন সংস্থার তিনটে বাসকে 'ছিনতাই' করে, কলেজ প্রাঙ্গণে নিয়ে যান। তাঁরা অভিযোগ করেন যে কলেজে আসবার সময়ে তাঁরা উপযুক্ত সংখ্যক বাস পান না। পরে কর্তৃপক্ষ কথা দিলে, তাঁরা বাসগুলোকে ছেড়ে দেন।

●**কয়েকশত নেপালী ছাত্র শিলং-এর** বড় বড় রাস্তা পরিক্রমা করেন। তেসরা আগষ্টের এই মিছিলের মূল দাবী ছিল—নেপালী ভাষাকে শীঘ্রই ভারতীয় সংবিধানের তালিকাভুক্ত করতে হবে। ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন অখিল শিলং নেপালী বিদ্যার্থী সঙ্ঘ।

●রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এক নোটিশ জারী করে এ'বছর থেকে **মেদিনীপুর কলেজে** ছাত্রী ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে মেদিনীপুর কলেজ ছাত্রপরিষদের পক্ষ থেকে 'গভীর অসন্তোষ' প্রকাশ করা হয়। এ ব্যাপারে গত আঠারোই জুলাই ছাত্ররা জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করেন। সাতই আগষ্টের এক সংবাদে জানা যায় যে ছাত্র ও এম. এল এ.দের এক প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাকে 'ফলহীন' বলে অভিহিত করেন। শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে জানান যে 'ছাত্রআন্দোলন অব্যাহত থাকলে, সরকার এই কলেজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন'। প্রসঙ্গতঃ গত কয়েকদিন ধরে ছাত্রআন্দোলনের ফলে কলেজে ছাত্রভর্তি বন্ধ আছে। ছাত্রদের এই দাবীকে অভিভাবকরা সমর্থন জানিয়ে বলেন যে বেশী বাসভাড়া দিয়ে দূরের কোনো কলেজে পড়ানো, তাঁদের কাছে একটা অতিরিক্ত বোঝা। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন যে ছাত্রভর্তি বন্ধ

থাকলে খুব শীঘ্রই কলেজ এক 'গভীর অর্থনৈতিক সংকটের' মুখোমুখি হবে।

●**জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের** ছাত্রদের উপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি চালিয়েছে। গত চব্বিশে আগষ্ট সকাল এগারোটা থেকে রাত্রি সাড়ে এগারোটা অবধি ছাত্ররা কলেজের অধিকর্তা ও তিনজন অধ্যাপককে 'ঘেরাও' করে রাখেন। পুলিশের লাঠি চালনায় ৬০ জন ছাত্র আহত হয়েছেন ও তাঁদের মধ্যে ১০ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ছাত্ররা স্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগ, চারটি উত্তরপত্র বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার ইত্যাদি দাবী জানিয়েছিলেন। পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে পরের দিন জলপাইগুড়ির সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বন্ধ পালন করা হয়। পরে সদর কোতয়ালের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, সমস্ত আটক ছাত্রের মুক্তির দাবী জানানো হয়।

●সাতদফা দাবীর সমর্থনে **মাদ্রাসায়** ছাত্ররা শীঘ্রই আন্দোলন শুরু করবেন। গত চব্বিশে আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা ছাত্র সংস্থার সভাপতি শ্রীশহিদুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান যে তাঁদের দাবী-গুলোর প্রতি প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাঁদের দাবীগুলোর মধ্যে আছে—(১) মেডিকেল, ইঞ্জিনীয়ারিং, স্নাতক ক্লাস ও প্রতিযোগিতামূলক চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রদের জন্য কিছু আসন রাখতে হবে (২) আলিয়া মাদ্রাসাকে একটা আরবিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে, (৩) মাদ্রাসাগুলোকে উপযুক্ত সরকারী সাহায্য দিতে হবে ইত্যাদি। সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই দাবীগুলোর পিছনে সাধারণ মানুষের সমর্থন জড়ো করছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শীঘ্রই একটি স্মারকলিপি পেশ করা হবে।

**বিদেশ :**

পাঁচদফা দাবীতে **বাঙলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ৫২ জন ছাত্র অনশন করছেন।** গত বাইশে জুলাই ধর্মঘটের পঞ্চমদিন অতিবাহিত হয়। দু'জন ছাত্রকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাঁদের দাবীর মধ্যে আছে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রথম বর্ষের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে একশো টাকা করে বৃত্তি দান। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রক এক বিবৃতি মারফৎ 'বাস্তব অবস্থা ও জাতীয় স্বার্থের পরি-প্রেক্ষিতে' এই ধর্মঘট তুলে নিতে অনুরোধ জানিয়েছে। এই বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে 'যে দাবীগুলো সময়োপযোগীতো নয়ই এমনকি অসঙ্গত ও অবাস্তব। কোন সরকারের পক্ষে কোন অবস্থাতেই এই দাবীগুলো মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।'

●রোডেশিয়ার রাজধানী সালিসবেরীতে অবস্থিত **রোডেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের** ১৫৫ জন কৃষাঙ্গ ছাত্রকে 'গণ্ডগোল করবার জন্য' গ্রেপ্তার করা হয়। জরুরী আইনের ১৪০ ধারা বলে পুলিশ এই অভিযান চালায়।

## শিক্ষক

**দেশ :**

সাতাশে আগষ্ট **গুজরাটের** প্রায় ১০০০ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী আয়েশা বেগম শেখের কাছে দাবীদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

●রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাকে নতুনভাবে সাজানোর অনুরোধ জানিয়ে গত ৪ঠা আগষ্ট **নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির** পক্ষ থেকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দশ ক্লাসের শিক্ষাক্রম চালু করার আগে প্রতিটি শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলো-চনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

●সাতদফা দাবী আদায়ের জন্য **রায়গঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষকরা** গত আটই আগষ্ট থেকে এক সপ্তাহের জন্য পালাক্রমে অনশন ও বিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

**বিদেশ :**

**বাঙলাদেশের** ৫০০টি বেসরকারী কলেজের ১০,০০০ অধ্যাপক কলেজ জাতীয়করণের দাবীতে এগারোই মে থেকে ধর্মঘট করছেন। নয়ই আগষ্টের খবরে জানা গেছে যে প্রায় ৮০,০০০ বেসরকারী স্কুল শিক্ষক ছয়ই জুলাই থেকে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের দাবী সরকারী স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে সমান বেতন-মান। ইতিমধ্যে বিরোধী দলের নেতা, শিক্ষাবিদ ও অন্যান্যরা শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

## কর্মচারী

**দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত কলেজসমূহের অশিক্ষক কর্মচারীরা** গত তেইশে আগষ্ট একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রম বিরোধ আইনের অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

**শিক্ষক-কর্মচারী :**

বাঁকুড়া জেলা শিক্ষক ও কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে জেলা পরিদর্শকের অফিসের সামনে তাঁদের পরিকল্পিত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। গত সতেরোই আগষ্টের এই আন্দোলনে প্রায় ২০০ জন শিক্ষক যোগদান করেন। দশ ক্লাস পাঠক্রমে বাড়তি শিক্ষকদের চাকরীর নিরাপত্তা, পেনসন আইন সরলীকরণ, সরকার অনুমোদিত স্কুলগুলোকে সরকারী সাহায্যদান ইত্যাদি দাবীতে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছেন। ঐ একই দাবীতে হাওড়ার মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা হাওড়া ডি. আই.-এর অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। চব্বিশ পরগণা জেলা সমিতির পক্ষ থেকেও ন'দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

[ সূত্র : অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, স্টেটস্‌ম্যান ]

# শিক্ষা সমাচার

## দশ ক্লাশের পাঠ্যসূচী— সুচিন্তিত না হ য ব র ল ?

"আজ যখন আবার নতুন করে দশ ক্লাশের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন হতে যাচ্ছে তখন অধিকারী ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচনা করছেন। শিক্ষক হিসাবে ক্লাশে পড়াতে গিয়ে সবচেয়ে যে সমস্যাটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হচ্ছে বাংলা পড়াবার বিষয়বস্তু। —আমি নির্বাচিত গল্প পদ্যের কথা বলছি। একাদশ শ্রেণীতে প্রমথ চৌধুরীর 'মন্ত্রশক্তি' ( পাঠ সংকলন/মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ) পড়াতে গিয়ে ছেলেদের কিছুতেই মন্ত্রশক্তিতে আস্থা স্থাপন করাতে পারছি না। কিংবা, সপ্তম শ্রেণীতে কালিদাস রায়ের 'মঙ্গল দূত' ( সাহিত্য চয়ন ) পড়াতে গেলে ছেলেরা বলে উঠছে—গ্যাঁজা। —ডাক্তার সারাতে পারলোনা : মন্তর সারিয়ে দিল। কিংবা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রুইদাস' ( সাহিত্য চয়ন ) পড়াতে গিয়ে ছেলেরা বলে উঠছে—তবে কি স্যার, আপনি আমাদের অর্থোপার্জনের চেষ্টা না ক'রে সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে বলছেন ?

"তাই প্রশ্ন—এই গল্প, কবিতাগুলো আর পড়ানো উচিত কি না ? তার আগে আমাদের আর একটা প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হবে। —আমরা কোন আদর্শ সামনে রেখে এই সমস্ত গল্প বা কবিতা নির্বাচন করবো ? কারণ সেই আদর্শ হবে নির্বাচনের মাপকাঠি। রুশিয় সংবিধান অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলা দণ্ডনীয় অপরাধ। আমেরিকায় কিন্তু প্রত্যেককে রকফেলার বা ফোর্ড হতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

"আমাদের দেশেও যেহেতু গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাই এমন কিছু গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা শিশুপাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত করব না যা গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। বিশেষজ্ঞদের জন্য সর্বদাই সব রকম আলোচনার দরজা খোলা থাক। কিন্তু অল্প বয়সে যে চিন্তার বীজ একবার ছড়ানো হবে কালে তা মহীরুহে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে।

"উদার মানবতাবাদ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান হয়ে গেলেও যদি বলতে হয় "উচ্চশির যদি তুমি কুল মান ধনে/করিওনা ঘৃণা তবু নীচশির জনে" ( রসাল ও স্বর্ণ-তালিকা/মধুসূদন দত্ত/সাহিত্য চয়ন ) তখন ছেলেরা তো চেপে ধরবেই—আদৌ কুল মান ধনের তফাৎ থাকবে কেন স্যার ? আজকালকার ছেলে অনেক সচেতন।

"তবু উদার মানবতাবাদ না হয় মানা গেল। কিন্তু দেখতে হবে কি ভাবে ওটা পরিবেশিত হচ্ছে ? 'মঙ্গল দূত' কবিতায় মানুষকে ভালবাসার কথা শেখানো হয়েছে। কিন্তু কি ভাবে ? 'বাপ্পাদিত্যে'র ( অবনীন্দ্রনাথ ) রুগী মন্ত্রের জোরে ভাল হয়ে গেল। —এই কালের গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাদান !

"'পুরাতন ভৃত্য' ( পাঠ-সংকলন ) কি সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার প্রশ্রয় দেয় না ? 'ভারতবর্ষ' ( এস ওয়াজেদ আলী/পাঠ-সংকলন ) কি ট্রাডিশন ধুয়ে জল খেতে গিয়ে গরুর গাড়ীর যুগে পড়ে থাকবে না ? 'বাপ্পাদিত্যে'র ( অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পাঠ-সংকলন ) গল্পের মধ্যে গল্প, তার মধ্যে আবার নতুন গল্প কী ছেলেদের ধাঁধার উত্তর বের করবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে ? 'ঘুমন্ত শিশু', 'একটি গ্রাম', 'শৈশবের কথা' ( পাঠ-সংকলন )—এগুলো কী করতে সংকলিত করা হয়েছে ?

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলছি ( রবীন্দ্রনাথের লেখা ব'লে ) 'গুপ্তধন' গল্পটি কি পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে না? একদিকে সরকারী উদ্যোগে লটারী খেলিয়ে ছেলেদের মনে স্বর্ণতৃষ্ণা জাগিয়ে তাদের ক্লাশে গিয়ে শিক্ষা দিতে হবে—সোনা কিছুই নয়, বুঝলে? ও সব-ই মায়া! ভারতবর্ষের প্রতিটি ছাত্রের মনে দেশের অগ্রগতির জন্য কোথায় আরও সম্পদ সৃষ্টি করতে উৎসাহ দেব,—না, ও সব মায়া! এ আত্মবিরোধ আর বেশী দিন চলতে দেওয়া উচিৎ নয়।

"পরিশেষে একটা কথা বলি—আমার সব বক্তব্য হয়তো সকলে মানবেন না। কিন্তু তবু এদিকটা নিয়ে ভাবুন।

—পীযূষকান্তি ঘোষ; নৈহাটী ( ২৪-পরগণা )।"

['সম্পাদক সমীপেষু';
আনন্দবাজারপত্রিকা; ৩১. ৭. ৭৩]

## কোন্‌টা ঠিক?

"......দুর্গাপুর ষ্টীল প্লান্টের দুটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ( বালক ) অধ্যক্ষ মহাশয়রা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সেক্রেটারীকে যাদের বিরুদ্ধে 'আর.এ.'র উল্লেখ আছে তাদের বিষয়গুলি পুনঃবিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছেন।

"যাদের বিরুদ্ধে 'আর. এ.'র উল্লেখ রয়েছে এমন কিছু ছাত্র ইতিমধ্যেই খরগপুর আই. আই. টি-র ভর্ত্তির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করেছেন এবং এন. এস. টি. এস. পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেছেন।"

[ অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬. ৭. ৭৩ ]

## উপাচার্যের যোগ্যতা

"১৭ই জুলাই—মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে শ্রীমদনেশ্বর মিশ্রের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবিদ্যাকর কবিরকে আজ বিধানসভায় সদস্যদের হাতে বেশ নাজেহাল হতে হয়।

"সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য শ্রীসভাপতি সিংয়ের এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকবির এদিন জানান, সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এই নিয়োগ করেছেন। এটাই সাধারণ নীতি শ্রীকবিরের এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসিং উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন একথা কি সত্য যে, নবনিযুক্ত উপাচার্য তৃতীয় শ্রেণীতে এম-এ এবং মাত্র গত বছর তিনি পি. এইচ. ডি. পেয়েছেন—পূর্ণিয়া কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ উঠেছিল?

"......অধিকাংশ সদস্যই অভিযোগ করেন, মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ জাতের লোকেদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শ্রীসভাপতি সিং বলেন এটা কি সত্য নয় যে, নিযুক্ত ৪৮ জনের মধ্যে ৪১ জন একটি বিশেষ জাতের লোক শুধু নন, তাঁরা একে অপরের আত্মীয়...... ?"

[ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮. ৭ .'৭৩ ]

## "মাথাপিছু ৩০০ পাউণ্ড বোমা"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ( -সরকার : সঃ মঃ বীঃ)-এর দ্বারা ইন্দোচীনের বুকে সর্বমোট যে পরিমাণ বোমা ফেলা হয়েছে, তা' এ বছরে সম্ভবতঃ দশলক্ষ টন পেরিয়ে যাবে। গ্রামাঞ্চলগুলি ধ্বংস করতে এবং কম্যুনিষ্টদের লড়াই করার সংকল্প ভাঙতে, আমেরিকা ও সাইগন, ১৯৬৬ সাল এবং এ বছরের অক্টোবরের শেষ অবধি ৬৮.৮ লক্ষ টন বোমা ব্যবহার করেছে,—অর্থাৎ সপ্তদশ অক্ষরেখার দুপাশের প্রতিটি পুরুষ, নারী এবং শিশুর জন্য গড়ে প্রায় ৩০০ পাউণ্ড বোমা ব্যবহার করা হয়েছে।

—স্টেটস্‌ম্যান ২০. ১২. ৭২

# ২৬তম "স্বাধীনতা বার্ষিকী" স্মরণে

●[ নীচের প্রবন্ধটি সেইরকম একটি সংবাদপত্রের থেকে নেওয়া হয়েছে যারা যে কোন বিদ্রোহকে 'দেশদ্রোহ' বলে চিৎকার জুড়ে দেয়। এখন সরকারের নির্ভরযোগ্য এই প্রচার মাধ্যমটির মুখেই আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী শুনুন। সঃ মঃ বীঃ ]●

"'মালিক পক্ষের তরফ থেকে এগিয়ে আসা কর্তারা, ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের সামনে—যারা বেঁচে থাকার মজুরী এবং মানুষের মত বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারের জন্য লড়াই করে, শুধুমাত্র যে বামপন্থীদের বুলি আওড়ায় তাই নয়, তাদের দমন করার জন্য গুলি এবং হিংস্রতারও আশ্রয় নেয়। এটা নিশ্চয়ই আমাদের কাছে লজ্জা এবং দুঃখের ব্যাপার।'

"এই ধরণের সমালোচনা আজকাল শোনা গেলেও এটা কোন কট্টর কম্যুনিষ্টের অথবা যে কোন রঙের প্রগতিশীল নেতার সরকার-বিরোধী উক্তি নয়। এটা বৃটিশ ইণ্ডিয়া সরকারের বিরুদ্ধে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অভিযোগ এবং ১৯২৮ সালে তাঁর দেওয়া কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণের অংশ বিশেষ।

"অবশ্য এটা হওয়া সম্ভব যে চটকল এবং ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানার শ্রমিকদের দ্বারা অধিবেশন মণ্ডপ আলোড়িত হওয়ার ফলে তিনি ঐ কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কংগ্রেস সদস্যরা নিজেরাই বলতেন যে ব্রিটিশ শোষকরা সেই সময় মেহনতী মানুষদের অর্ধাশনে রাখত। অন্য কোন রাজ্য থেকে আগত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীদের সাথে হাত মিলিয়ে ছিল ব্রিটিশরা। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক সরদার কে. এম. পানিক্কর এই গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন 'মুৎসুদ্দি' অর্থাৎ যাদের ভাগ্য বিদেশী মুনাফাখোরদের ভাগ্যের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা।

"পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ছেলে জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন ভারতবর্ষে 'সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠা করা তাঁর জীবনের আদর্শ। সমাজবাদ বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা ব্যাখ্যা না করতেই তিনি যত্নশীল ছিলেন। জনগণ ধরে নিয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে অন্তত বেকার সমস্যা ও অর্ধাশন থাকবে না।

"অপরিমিত ক্ষমতা ১৭ বৎসর ধরে প্রয়োগ করার পর প্রধানমন্ত্রী পদে সমাসীন থাকা অবস্থাতেই নেহেরু ১৯৬৪ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। লোকেরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করেন যে সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী, যাঁদের স্বার্থ সম্বন্ধে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এত ঝাঁঝালো বক্তব্য রেখেছিলেন, তাঁরা সবাপেক্ষা বেশী উন্নতি করেছেন। অবশ্য ট্রেড্ ইউনিয়ন সংস্থার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছেন।

"১৯৬৪ সালে শ্রমিকশ্রেণীর সত্যিকারের অবস্থা কেমন ছিল? তাঁরা কি ঐ সময়ের মধ্যে অর্ধাশনের দিনগুলি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন? টাকার অঙ্কে শ্রমিকদের মজুরী অবশ্যই বেড়েছে। সাথে সাথে জিনিষের দামও বেড়েছে। মজুরী জিনিষ পত্রের মূল্যের সাথে পাল্লা দিয়েই বেড়েছে। কিন্তু মজুরী ও বাজার-দরের ফারাক বেড়েই চলেছে। জাতীয় শ্রম-কমিশনের ১৯৬৯ সালের রিপোর্টে প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী পণ্ডিত নেহেরুর মৃত্যু বৎসরে শিল্প কারখানার শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী ব্রিটিশ শাসনের ১৯৩৯ সালের মজুরীর চেয়ে শতকরা ৩·৬ ভাগ কম ছিল—বেশী নয়!

"১৯৫০ সালে 'নাসিক কংগ্রেস' দেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁরা বাজার-দরের সাধারণ সীমা ক্রমশঃই সুশৃংখল ভাবে কমাবেন। বাজার দর কমেনি কিন্তু প্রথম পরিকল্পনাকালে মজুরী জিনিষপত্রের দামের তুলনায় দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভালোভাবে বাঁচার উপযোগী মজুরীর ধারে কাছে না এলেও শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

"দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কংগ্রেস মুদ্রাস্ফীতির সমর্থক হয়ে ওঠে এবং সোচ্চার প্রচার করতে থাকে যে উন্নতিশীল অর্থনীতিতে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য। ক্রমবর্ধমান্ হারে মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটা 'নীতির' অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পরবর্তী পনের

বছরের মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় গত দশ বৎসরে মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশী। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে গত দু'বছরে। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসর—অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির বৎসর হিসাবে স্মরণীয়। আজ স্বাধীনতার ২৬তম বৎসরের প্রারম্ভে মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে দেশের মুক্তির কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

"মজুরী মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। প্রকৃত মজুরী হোঁচট খেয়ে আটকেই আছে এবং ১৯৩৯ সালের তুলনায় আরো কমে যাচ্ছে। শ্রমিকদের অবস্থা আজ অনেক খারাপ। এটা কেউ বলতে পারবে না যে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা আগের তুলনায় কমে গেছে। বরং ব্যাপারটা ঠিক এর উলটো। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা আগের তুলনায় যথেষ্ট বেড়েছে। সবচেয়ে তিক্ত ঘটনা হচ্ছে এই যে কারখানার শ্রমিকরা আজ পূর্বের চেয়ে নির্দয়ভাবে শোষিত হচ্ছেন।

"মেহনতী মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সংঘবদ্ধ ও জঙ্গী শ্রেণীর অবস্থা যদি এই হয় তবে অসংঘবদ্ধ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এটা বর্ণনাতীত পর্যায়ে পৌছেছে। এই ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির বাজারে প্রায় স্থিতিশীল উপার্জন নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশই বেশী বেশী করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছেন।

"মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশ আসে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। সমাজের উপর তলার ব্যক্তিদের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, প্রতারণামূলক কাজ এবং তাতে উৎসাহ দেওয়ার ফলে বিষিয়ে যাওয়া রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ছাত্ররা যে তাঁদের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছেন তা যতই মর্মন্তুদ হোক না কেন মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। ছাত্রদের সামনে ভবিষ্যতের কোন আশ্বাস নেই। তাঁরা সমস্ত কিছুতেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। ১৫০ বছর আগে ইংরেজ যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল এবং যা এখনও পর্যন্ত চলে আসছে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। একমাত্র সেই শ্রেণী, যাঁরা বিত্তবান, তাঁরাই তাঁদের সন্তানদের ভাল শিক্ষা দিতে পারছেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের জন্ম আলাদা স্কুল এবং কলেজ তৈরী করছেন। কেউ কি স্মরণ করতে পারেন, আমাদের সংবিধানে ১৯৬০ সালের মধ্যে বিনা বেতনে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল?

"১৯৪৯ সালে কংগ্রেস ভূমিসংস্কারে "লাঙল যার জমি তার" স্লোগানটি বাস্তবায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এটা আজ পর্যন্ত সরকারের একটা 'নীতি' হিসাবেই রয়ে গেল। কার্যতঃ এর বিপরীতটাই ঘটেছে। ছোট ছোট চাষীদের একটা বড় সংখ্যা তাঁদের ক্ষুদ্র জমির উপর অধিকার হারিয়েছেন এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে-শোষিত ভূমিহীন বর্গাদারের সংখ্যা বাড়িয়েছেন।

"এই বছরের গোড়ার দিকে পরিকল্পনা কমিশনের একটি দল তাঁদের রিপোর্টে প্রকাশ করেছেন যে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি কাজে পরিণত করার ইচ্ছার ঘাটতি আছে। এই দলটি ভূমি সংস্কারের জন্ম একটা জঙ্গী কৃষক আন্দোলন তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। এরকম একটি আন্দোলন গড়ে উঠলে ফল কি হতে পারে তা ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়।

"২৫ বছরের তথাকথিত ছক বাঁধা উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরও যোজনা কমিশন দেখেছেন যে ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক লোক, তাঁরা যাকে দারিদ্র্য সীমা বলে চিহ্নিত করেছেন, তার নীচে বাস করেন। 'দারিদ্র্য সীমার নীচে' শব্দটি অনাহার, অর্ধাহার, নগ্নতা ও বাসস্থানের অভাব শব্দগুলোর একটা সুন্দর প্রতিশব্দ। সমস্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী শোষিত রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পরিকল্পনা মণ্ডলীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ এই সীমার নীচে বাস করেন। এই বেকার বাহিনীর সংখ্যা কত? দুই কোটি অথবা পাঁচ কোটি? কেউই সঠিক জানেন না। কারণ এই পরিসংখ্যানের জন্ম একটি পদ্ধতি প্রবর্তনের মধ্যেই আমাদের সরকার তাঁর দায়িত্বকে সীমিত রেখেছেন। এইটুকুই কেবলমাত্র জানা আছে এবং সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় যে এই সমস্যাটি পরিকল্পনা-আরম্ভকালীন সমস্যার তুলনায় বহুগুণ বেশী। আংশিকভাবে কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা কত? এর উত্তরটি পাওয়া যেতে পারে দারিদ্র্য সীমার নীচে কত লোক বাস করেন সেই সংখ্যাটি থেকে।

"শ্রমিকশ্রেণী, যাঁরা দেশের সম্পদ সৃষ্টি করেন, তাঁদের অবস্থার উপরোক্ত বর্ণনা থেকে যে কেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে দেশের সামগ্রিক চিত্রটি অন্ধকারময়। অবশ্য এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নিশ্চিত করে বলা যায় না। সমাজের একদিকে যদি প্রচণ্ড দারিদ্র্য, দুঃখ ও অধঃপতন জমতে থাকে তবে—অন্যদিকে চোখ ঝলসানো প্রাচুর্য ও জীবনের সবরকমের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরো অনেক কিছুর উজ্জ্বল চিত্র দেখা যাবেই। সত্যের কাছে অনুগত থেকে আজ কি কেউ বলতে পারেন যে স্বাধীন ভারতে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ধনী কৃষক, মুনাফাখোর, কালোবাজারী এবং সমস্তরকম ফাটকাবাজদের অবস্থার উন্নতি হয়নি?

"সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবারগুলির সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান রেখেছেন। পরিকল্পনার অধীনে এদের সংখ্যা বেড়েছে। যা সবচেয়ে দ্রুতহারে বেড়েছে তা হল এই একচেটিয়া পুঁজির সম্পদ। একটা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৯৪৭ সালে যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটির মূলধন ছিল ৪০ কোটি টাকা, সে আজ ৬০০ কোটি টাকার মূলধনের গর্ব

করে। এই সম্পদের বেশীর ভাগ অংশ সৃষ্টি হয়েছে সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির দেওয়া টাকায়।

"কিন্তু একচেটিয়া পুঁজি-গোষ্ঠীগুলির যে সম্পত্তির হিসাব সরকার রেখেছেন, সেই সম্পত্তি তাঁরা আইনের অনুমোদন অনুসারেই অর্জন করেছেন। সরকার-নিয়োজিত একটি কমিটি নির্ধারণ করেছেন যে ব্যবসা, কর ফাঁকি এবং অনুরূপ অন্যান্য বে-আইনী উপায়ে উপার্জিত কালোটাকার অংক প্রায় ৭০০০ কোটি টাকা! ভারত সরকারের রাজস্বের প্রায় দ্বিগুণ! সঠিকভাবেই অনেকে, এমনকি কংগ্রেস সদস্যরাও, বলে থাকেন যে কালোটাকা একটা সমান্তরাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালাচ্ছে।

"কালোবাজারের এই তাণ্ডব যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলাকে ধ্বংস করেছিল এবং অবিভক্ত ভারতের অন্যান্য সব জায়গায় নিদারুণ দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল তাকে কখনোই সমূলে উৎপাটিত করা হয়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষও এর সঙ্গে সহাবস্থান করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। যদিওবা এই কালোবাজার পণ্য-ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে অন্তর্হিত হয় তবে তা আবার আত্মপ্রকাশ করছে পারমিট ও লাইসেন্সের ব্যাপারে।

"......আমাদের দেশ এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যা আমাদের গত বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকাশ্য বাজারে একের পর এক পণ্য উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই পণ্যগুলো ক্রয় হচ্ছে যারা সেরকম মূল্য দিতে পারে তাদের কাছে। যেহেতু চাল, ডাল, গম, তেল, মশলা, চিনি ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সরকারীভাবে বেঁধে দেওয়া হয়নি তাই বলা যেতে পারে যে এই সব জিনিষের ক্ষেত্রে কোন কালোবাজারী হচ্ছেনা। প্রত্যেক সপ্তাহে বাজার-দর বেড়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বছরে কত কোটি কালোটাকা যে আয় হ'ল তা কেউ কোনদিন জানতে পারবেনা।

"প্রধানমন্ত্রী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি কি তাঁর আমলা, মন্ত্রীপরিষদের সহকর্মী এবং কংগ্রেস দলকে এই আহ্বানের অনুগামী হিসাবে পাবেন? প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই ধরণের আহ্বান এই প্রথম নয়। কংগ্রেস সদস্যরা 'ব্রিটিশ ভারত সরকার'কে এই গোরুর গাড়ীর দেশে 'রোলস্ রয়েস্ সরকার' বলতেন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস একজন মন্ত্রীর বেতন ঠিক করেছিলেন—৫০০ টাকা এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা।

"এটা কেউ বলতে পারবেনা যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের মন্ত্রীদের বেতন খুব বেশী। ১৯৩৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির কথা বিচার করলে এঁদের বেতন মোটামুটিভাবে সাধারণ বলা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও এঁদের জীবনযাত্রার মান আগেকার ব্রিটিশ প্রভুদের থেকে খুব আলাদা নয়। আমাদের রাষ্ট্রপতি-ভবনের চমকপ্রদ আড়ম্বর প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের বড়লাটদের মতই। এখন সরকার পক্ষের কেউ যদি কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বলেন তাহলে বলতে হয় প্রথমে সেই উচ্চস্তরের রাজনৈতিক জীবন-যাপন করা হোক, পরে পরিবর্তনগুলো আসবে।

"এটা কোন ধরনের পরিকল্পনা যে, যে দেশ জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলির জন্য হাহাকার করছে, সে দেশের মহার্ঘ সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে এমন সমস্ত বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যেগুলো জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ লোকও কিনতে পারেন না। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমরা অনুপযুক্ত সাজসরঞ্জাম দিয়ে একটা ছোট নিউজপ্রিন্ট-এর কারখানা গড়েছি। অথচ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রচুর ব্যয়বহুল বিদেশী সহযোগিতার মাধ্যমে কৃত্রিম সুতো এবং জামাকাপড়, রেফ্রিজারেটর, শীততাপ নিয়ন্ত্রক, গার্হস্থ্য ব্যবহারোপযোগী নির্ভরযোগ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এবং প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য একটার পর একটা কারখানা তৈরীর অনুমতি দিতে আমাদের অর্থ ও বিদেশী মুদ্রার অভাব হয় না।

"একমাত্র বিত্তবান লোকেরাই কিনতে পারে এমন পোষাক তৈরীর জন্য বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের লম্বা-আঁশযুক্ত তুলো আমদানি করতে আমাদের বিদেশী মুদ্রার অভাব হয়না, অথচ দেশের বেশীরভাগ লোক যে মোটা কাপড় ব্যবহার করেন তার একটা ন্যূনতম নির্ধারিত অংশ তৈরী করার জন্য আমরা বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজী করাতে পারিনি।

"......আমাদের 'সমাজবাদে'র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো সরকারী ক্ষেত্র (public sector)। কিন্তু এই ক্ষেত্রটির ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন একটা প্রাথমিক কাঠামোর কাজ করা, যার ওপর ভিত্তি করে বে-সরকারী ক্ষেত্রগুলো উন্নতি করতে পারে। জাতীয়করণের আগে ও পরে সরকারী ক্ষেত্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের ধরণগুলি তুলনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনকি সরকারী অর্থের চরম লোকসান ঘটতে দিয়েও যে সরকারী ক্ষেত্রের কারখানা-গুলি চালানো হচ্ছে, সেই কারখানাগুলিই বে-সরকারী ক্ষেত্রগুলিকে প্রচুর মুনাফা অর্জনে সাহায্য করে যাচ্ছে।......"

[হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৫ই আগস্ট '৭৩, স্বাধীনতা দিবসের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত রণজিত রায়ের Crisis can and must be solved প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ।]

# পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ

● **'স্বনির্ভর' শিল্প উৎপাদন**

ভারতে বর্তমানে ৭০টি সোভিয়েত সহায়তাযুক্ত শিল্পপ্রকল্প রয়েছে। রুশ-ভারত যৌথ প্রকল্পগুলি উৎপাদন করছে :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | সর্বমোট ইস্পাত | উৎপাদনের শতকরা | ৩০ | ভাগ |
| | " তৈল | " " | ৩৫ | " |
| | " বিদ্যুৎ শক্তি | " " | ২০ | " |
| | " ভারী যন্ত্রপাতী | " " | ৮৫ | " |
| এবং | " ভারী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম | " " | ৬০ | " |

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৩.৪.৭২

● **কাদের প্রতিনিধি ?**

শিল্প উন্নয়ণ মন্ত্রকের ( Ministry of Industrial Development ) সেক্রেটারী বি. বি. লাল এই মর্মে ব্রিটেনকে পরামর্শ দিয়েছেন যে **তার পক্ষে এদেশের ( ভারতের ) সস্তা শ্রমের সুযোগ গ্রহণ করা উচিৎ।** ( বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ )

—স্টেট্‌সম্যান, ৩.৩.৭২

**অতএব**·······

ওটারমিল ( Ottermill ), বাট্‌লারস ( Butlers ) ও ভিলিয়ার ( Villier )—এই তিনটি ব্রিটিশ কোম্পানি তাদের কারখানাগুলি ভারতে স্থানান্তরিত করছে। এই কোম্পানীগুলি, যথাক্রমে ইস্তন ইঞ্জিনীয়ারিং ( Easun Engg. ), কিরলোস্কার ( Kerloskar ) ও শ্রীবাস্তব এক্‌সপোর্ট-এর সঙ্গে সহযোগিতার বন্দোবস্ত করেছে।

—স্টেট্‌সম্যান, ৬.৩.৭২

● **'জনদরদী' বিশ্ব-ব্যাঙ্ক**

ভারতকে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সরাসরি সাহায্যের পরিমাণ গতবছরের তুলনায় এবছর বেশী হবে। বস্তুতঃ বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সর্বমোট সাহায্যের শতকরা ৪০ ভাগ পাবে ভারত।

বিশ্ব-ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিল যাতে এই সাহায্যের ফলে জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ উপকৃত হতে পারেন। এই সম্পর্কে ভারতের পরিকল্পনা অবহিত হয়ে সে সবিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছে।

—স্টেট্‌সম্যান, ১.২.৭২

**এবং বলাই বাহুল্য**·······

(ক) প্ল্যানিং কমিশন-টাস্ক ফোর্সের ( Task Force ) সদস্য ডাঃ জে. এন. ব্যানার্জী গত সোমবার কোলকাতায় বলেন যে বর্তমানে ভারতীয় জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২০ ভাগ লোকই আধুনিক ওষুধপত্রের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

—স্টেট্‌সম্যান, ১৪.৮.৭৩

(খ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাসিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিশ্বের মধ্যে ভারতেই ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বিশ্বে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৯০। তার মধ্যে একমাত্র ভারতেই এই রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫৬১।

—যুগান্তর, ২৫.৯.৭২

(গ) পুষ্টির অভাবকে দারিদ্রের সূচক বলে ধরলে '৬০-৬১ সালে যেখানে ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫২% দারিদ্র্যরেখার নীচে ছিল, সেখানে '৬৭-৬৮ সালে হয়েছে ৭০%।

—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া বুলেটিন,
জানুয়ারী, ১৯৭০

● **'সহযোগিতার' অবারিত দ্বার**

আজ পর্যন্ত ভারতে ৩,৪৩৬টি বৈদেশিক সহযোগিতার প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে।

'সহযোগী' দেশগুলির মধ্যে রয়েছে :

আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স, পূর্ব-জার্মানী, পশ্চিম-জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও সুইডেন।

—অমৃতবাজার, ১৬ ২.৭২

**এবং**·······

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৮,৪৭৬ কোটি টাকা।

—স্টেট্‌সম্যান, ১৬.১২.৭২

**কিন্তু**·······

**ভারত এশিয়া উন্নয়ণ ব্যাঙ্কে ( Asian Development Bank ) তার সাহায্যের পরিমাণ বাড়াবার কথা চিন্তা করছে। আজ পর্যন্ত ভারত এই ব্যাঙ্ক থেকে কোন ঋণ নেয়নি।** ব্যাঙ্কের তহবিলে ভারতের অংশ হলো ৯৩ কোটি ডলার ; **একমাত্র আমেরিকার পরেই ভারতের স্থান।** ( বড় হরফ আমাদের। সঃ মঃ বীঃ )

—স্টেট্‌সম্যান, ১৭.২.৭২

# একটি ঐতিহাসিক ছাত্র-ধর্মঘট স্মরণে

ছাত্র প্রতিনিধি

●[ যে সব ছাত্রকর্মীরা ছাত্র-সংগঠন এবং ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করছেন, আমাদের দেশের ছাত্র-আন্দোলনের ঐতিহ্য ( তার সফলতা ও ব্যর্থতা দুই দিক থেকেই )-কে অনুধাবন করা তাঁদের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। কারণ অতীতকে ভালোভাবে না জেনে—সঠিক লক্ষ্যে আজকের এবং আগামী দিনের ছাত্র-আন্দোলনগুলিকে পরিচালিত করা অসম্ভব। নীচের রচনাটি এই ধরণেরই একটি ঐতিহাসিক ছাত্র-ধর্মঘটের বিবরণ। বিবরণটিতে আংশিক অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও, গুরুত্বের বিচারে তা আমরা প্রকাশ করলাম। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে, আমাদের দেশের অতীত ছাত্র-আন্দোলনগুলির বিবরণ ও বিশ্লেষণসহ রচনার জন্য আমরা আবেদন করছি। —সঃ মঃ বীঃ ]●

আজ থেকে ঠিক চোদ্দ বছর আগে ; ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগষ্ট। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ডাকে পশ্চিমবাংলার দূর-দূরান্ত থেকে আসা তিন লক্ষাধিক ভুখা মানুষের দৃপ্ত মিছিল এগিয়ে চলেছে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দিকে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এই চলমান পুঞ্জীভূত অসন্তোষ দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। মিছিল যখন লালদীঘির কাছে ( এখনকার টেলিফোন ভবনের কাছে ) পুলিশ বাহিনী হঠাৎ উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো মিছিলের উপর। ব্যাপক বেপরওয়া, নৃশংসতম লাঠি-চার্জের ফলে আহত হলেন প্রায় সহস্রাধিক ভুখা নারী ও পুরুষ। নিরস্ত্র অসহায় মানুষ আত্মরক্ষার জন্য যখন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন, পুলিশ তখন নির্বিচারে কাঁদানে-গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। ধোঁয়ায় ভরে যায় সারা এসপ্ল্যানেড্ অঞ্চল। ছত্রভঙ্গ জনতার পশ্চাৎধাবন করে লাঠি চালায় ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত পুলিশ বাহিনী।

এই একই দিনে বর্ধমান, গঙ্গারামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, শ্রীরামপুর ও বহরমপুরে শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশ বেপরওয়া নিপীড়নের বন্যা বইয়ে দেয়।

এই অন্যায়, বর্বরোচিত পুলিশী-জুলুমের প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন ছাত্রসমাজ। সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলি ১লা সেপ্টেম্বর সারা পশ্চিমবাংলায় ছাত্র-ধর্মঘটের ডাক দেন। সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্মঘট পালন করে পুলিশী বর্বরতার জবাব দেন। বেলা সাড়ে বারোটায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। সেখান থেকে মিছিল করে তাঁরা এগিয়ে যান ডাঃ বিধান রায়ের সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বাসভবনের দিকে। বেলা দেড়টার সময় মিছিলের অগ্রভাগ মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সীমানার কাছাকাছি আসতেই পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। ছাত্রনেতারা পুলিশ বাহিনীর সামনে হাতে হাত বেঁধে মিছিলের শৃঙ্খলা রক্ষা করছেন, কোথাও কোন প্ররোচনা বা উত্তেজনা সৃষ্টির আভাস নেই ; এমন সময় হঠাৎ করে সরকারের 'ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী' লাঠি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল কাঁদানে গ্যাসের 'সেল'। পুলিশের নিপীড়ন ঘণ্টায় ঘণ্টায় উগ্র থেকে উগ্রতর হতে থাকে। দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুধুমাত্র ওয়েলিংটন স্ট্রীট ও মেছুয়া বাজারের মধ্যেকার এলাকা-টুকুতেই পুলিশ অসংখ্যবার লাঠি চার্জ করে এবং প্রায় দু'শো বারেরও বেশী কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে।

ছাত্র মিছিলের ওপর অন্যায় পুলিশী নির্যাতনের ফলে ছাত্রছাত্রীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে এবং হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাঁরা এই বর্বর আক্রমণের জবাব দেন। পুলিশী নির্যাতন ব্যাপক আকার নেয়। অলিতে-গলিতে ছাত্র ও জনসাধারণের উপর নির্বিচারে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস বর্ষিত হয়। বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, মলঙ্গা লেন, অক্রুর দত্ত লেন, হিদারাম ব্যানার্জী লেনের বাড়ীর লোক-জনদের ওপর পুলিশ বেপরওয়া মারধোর শুরু করে। পুলিশী চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড্ গড়ে তুলে ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হন।

এই অবস্থা সহরের উত্তর দিকেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পুলিশ বেপরওয়াভাবে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ছে। চারদিক ধোঁয়ায় অন্ধকার। —নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট এবং সারা কলেজ স্ট্রীট জুড়ে এই একই দৃশ্য। তিন-

চার ঘন্টাব্যাপী এই তাণ্ডবের পর জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে সরকার সমস্ত রাস্তা থেকে পুলিশ তুলে নিতে বাধ্য হয়। মুহূর্তের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে হর্ষোৎফুল্ল জনতার ভীড় জমে উঠে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই একটি বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে দু'দিক থেকে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি-চার্জ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এই দিনই বেলা তিনটে নাগাদ দক্ষিণ কলিকাতা থেকে আগত ছাত্রদের অন্য একটি মিছিল রাজভবনের সামনে উপস্থিত হ'লে পুলিশ বাহিনী মিছিলটির পথরোধ করে। এরপর মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যু দিয়ে উত্তর দিক এগুলে বহুবাজার থানার সামনে অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স্-এর সামনে পুলিশ মিছিলের ওপর নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করে।

পুলিশী অত্যাচারের মোকাবিলা করতে সারা সহরের জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সহরের বিভিন্ন অংশে পুলিশের গুলি চালনার ফলে বহু ব্যক্তি আহত ও নিহত হন। বিক্ষুব্ধ জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে থাকে। কয়েকটি বাস ও ট্রামে আগুন লাগানো হয়। মধ্য কলকাতায় একটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী পুলিশের লোক নিয়ে চলাচল করছিল—জনতার রোষবহ্নিতে সেটি ভস্মীভূত হয়। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ মধ্য ও উত্তর কলকাতার সমস্ত রাস্তায় আলো নিবে যায়। অন্ধকারের মধ্যেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের উপর পুলিশ কালো গাড়ীর ভেতর থেকে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। তাঁদের মধ্যে অনেকে যখন আশ্রয় নিতে শেয়ালদা স্টেশনের দিকে ছোটেন, তখন তাঁদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষিপ্ত হয় এবং বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর উত্তরে জনতা স্টেশনের বাইরে একটি গাড়ীতে আগুন লাগান। বৌবাজারে একটি মেল-ভ্যান পোড়ানো হয়। এরপর ধীরে ধীরে মৌলালীর মোড় থেকে উত্তরে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত সমস্ত রাস্তার আলো নিবে যায়।

উত্তর ও মধ্য কলকাতায় সারাদিনব্যাপী পুলিশী তাণ্ডবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়া মাত্র দক্ষিণ কলকাতায়—জগুবাবুর বাজার থেকে হাজরা মোড় ধরে টালিগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। বহু জায়গায় জনসাধারণ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তোলেন। সারা এলাকা অন্ধকারে ডুবে যায়। রাত ৯-১০ মিনিটের সময় একই সঙ্গে বালীগঞ্জ, টালীগঞ্জ, ভবানীপুর, মানিকতলা, বটতলা, ও শেয়ালদা এলাকায় পুলিশ বেশ কয়েক রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে।

এদিনকার গুলিবর্ষণের ফলে মোট ১১ জন নিহত ও ৭৭ জন আহত হন। প্রচণ্ড পুলিশী নির্যাতনের মুখেও জনসাধারণ যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ৭৫/বি মাণিকতলা স্ট্রীটের বাসিন্দা, ৭০ বছরের বৃদ্ধ শ্রীচুনীলাল দত্ত তাঁর শেষ বয়সের একমাত্র সাথী ৭ বছর বয়স্ক পৌত্র দীপককে নিয়ে এদিন রাত্রে পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখে বাড়ী ফিরছিলেন। পথে একটি পুলিশভ্যান থেকে দুটি গুলি এসে তাঁর বুকে লাগে। স্থানীয় জনসাধারণ এই ঘটনা দেখে তাঁর কাছে ছুটে যান এবং প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যেও তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে ইসলামীয় হাসপাতালে পৌঁছে দেন।

২রা সেপ্টেম্বর কলকাতা ও সহরতলী এলাকায় সকাল থেকেই ট্রাম, বাস বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর বিশেষ ডিভিসনের সৈন্য বোঝাই মিলিটারি ট্রাক সারাদিন ধরে সহরের পথে পথে টহল দেয়। এদিনও জগুবাবুর বাজার, হাজরা রোড, গড়িয়াহাটার মোড়, দমদম জংশন, হাওড়া ময়দান ইত্যাদি অঞ্চলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে এবং গুলি চালায়। ১৪৪ ধারা জারী থাকার ফলে এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আহূত মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সভা বন্ধ হয়ে যায়। রাত আটটায় দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজ হোস্টেলে (পুরানো) সাত ভ্যান পুলিশ গিয়ে খানাতল্লাসী করে। ভবানীপুরের টাউনসেণ্ড রোডে পুলিশ গুলি চালায়। কালীঘাট, হাজরা রোড ও চৌরঙ্গী রোডে রাত এগারোটা পর্যন্ত পুলিশ ১৬ রাউণ্ড গুলি চালায়। উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো, বটতলা ও কাশীপুর অঞ্চলে রাত এগারোটা পর্যন্ত ২৫ রাউণ্ড গুলি চলে। রাত আটটার সময় হাওড়া ময়দানের কাছে এক জনসমাবেশের উপর পুলিশ লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস চালায়।

৩রা সেপ্টেম্বর ছাত্র ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর পুলিশের বর্বর নিপীড়নের প্রতিবাদে কলকাতা ও আশেপাশের বহু স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট করলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্কুল কলেজগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেন।*

* রচনাটি প্রস্তুত করতে ১৯৫৯ সালের ১লা, ২রা এবং ৩রা অক্টোবর তারিখের 'স্বাধীনতা', 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রভূত সাহায্য নেওয়া হয়েছে—লেখক।

# দঃ ভিয়েতনামের ছাত্র-আন্দোলনের কয়েকটি অধ্যায় ( ১৯৫৪-'৬৫

তো মিন্ ত্রাঙ

●[ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, সাড়ে তিন কোটি মানুষের ছোট্ট দেশ ভিয়েতনাম এখন আর কেবল একটি নাম নয়, তা আমাদের যুগের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের একটি জীবন্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সারা দুনিয়ার মানুষ ভিয়েতনামী জনতার শৌর্য, বীর্য, আত্মত্যাগ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রতি নানাভাবে তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন, তাঁদের সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছেন। আমাদের দেশও এ'ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা ও বীর ভিয়েতনাম-বাসীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমরা বিপুল আবেগের সাথে বিভিন্ন ধ্বনি তুলেছি ; সভা-সমিতি, নাটক, গান, মিছিল ও বিক্ষোভ সংগঠিত করেছি। দু'একটি ছাড়া প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য বহু রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সংগঠন ও ব্যক্তি এই ধরণের কর্মসূচীর রূপায়ণে উদ্যোগ নিয়েছেন। এইসব দল ও সংগঠনের অনেকগুলির পরিচালকদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এইসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের যে আবেগের প্রকাশ ঘটেছে তা যে শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভিয়েতনামকে কেন্দ্র করে আমাদের হৃদয়াবেগের এই বিপুল বিস্ফোরণ সম্পূর্ণ সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত। এই আবেগকে যত ব্যাপকভাবে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি ততই ভাল।

কিন্তু দুঃখের সাথে হ'লেও একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে অবরুদ্ধ আবেগকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করার জন্য আমরা যতটা উদ্যোগ নিয়েছি তার একাংশও ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নেবার কাজে আজ পর্যন্ত ব্যয় করিনি।

একথা আমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মনে রাখিনি যে, একটি মহৎ আদর্শকে সম্বল করে লড়াই শুরু করলেই তাতে জয়লাভ করা যাবে এমন কোন কথা নেই এবং পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সফলভাবে সংগ্রাম করার জন্য, সঠিক আদর্শের মতই চাই একটি বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম—একটি সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল। পরিস্থিতি যতই অনুকূলে থাক, প্রাণ দেবার জন্য মানুষ যতই তৈরী থাক, শত্রুকে পর্যুদস্ত করার সঠিক কায়দা যদি আমাদের হাতে না থাকে, বিপুলতম আত্মত্যাগও যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তার প্রমাণ আমরা অতি সাম্প্রতিক কালেও নিজেদের দেশে ও বিদেশে পেয়েছি। ভিয়েতনামের মহান জনতা যে অস্ত্র ও অর্থবলে তাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী, মানুষের ইতিহাসের বর্বরতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে এভাবে কোণঠাসা করে ফেলতে পেরেছেন তার কারণ তাঁরা তাঁদের মুক্তিযুদ্ধকে একটি সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন। শুরু থেকেই তাঁরা তাদের সবচেয়ে বড় শত্রুকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শত্রুর ও নিজেদের সবলতা ও দুর্বলতাগুলিকে খুঁজে বার করতে পেরেছিলেন। সে'জন্যই সংগ্রাম শুরু হবার পর আর তাঁদের পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক বিজয় অর্জন করে গেছেন।

ধারাবাহিক বিজয়ের এই ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ভিয়েতনামী জনসাধারণ তাঁদের বুকের রক্তে শুধু একটি মহৎ আদর্শের প্রতি আনুগত্যই আমাদের শেখান নি, সফল বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার বহুমূল্য অভিজ্ঞতার এমন এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আমাদের জন্য গড়ে তুলেছেন যে, আমরা একটু চেষ্টা করলেই সেখান থেকে এমন অনেক মণিমুক্তা সংগ্রহ করতে পারি যা আমাদের মাতৃভূমিকে শোষণমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার পথে বিরাট পাথেয় হিসাবে কাজ করবে। নিচের প্রবন্ধটিতে, আমাদের বিবেচনায়, এরকম কিছু মণি-মুক্তার সন্ধান আমরা পাব। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-যুবরা কিভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারই এক জীবন্ত দলিল এটি। এই বৃত্তান্ত যে সময়ের (১৯৫৪-'৬৫), ভিয়েতনামের জয়ের ইতিহাস তারপর আরও বহুদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেজন্য এই বৃত্তান্তের গুরুত্ব কিছুমাত্র কমেনি। এই সংগ্রামের শুরুর দিকে ভিয়েতনামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পট-ভূমিকার যেটুকু পরিচয় এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়, মূলগতভাবে আমাদের দেশের অবস্থাটা, তার থেকে কিছু আলাদা নয় (যদিও শুধু চোখে অমিলের দিকটাই বেশী ধরা পড়ে)। কাজেই এই শিক্ষার যে আমাদের দেশের ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগিতা থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই। —সঃ মঃ বীঃ ]●

# দঃ ভিয়েতনামের ছাত্র-আন্দোলনের কয়েকটি অধ্যায় ( ১৯৫৪-'৬৫ )

দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রতিষ্ঠিত, মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদ এক সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ চরিত্র ধারণ করেছে। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যান্য সামাজিক স্তরের মধ্যে, যুবকদের, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও স্কুলের ছেলে মেয়েদের দূষিত করার জন্য এবং আদর্শগতভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্য মার্কিনীরা ও ন্‌গো দিন দিয়েম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৫৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, কুয়ক্ হোক্ কলেজের ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে হুয়ে'তে অনুষ্ঠিত উৎসবে ন্‌গো দিন দিয়েম ঘোষণা করে : "যুব সম্প্রদায়কে অবশ্যই স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে জাতীয় নবজাগরণের দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেদের নৈতিক মান ও কারিগরী জ্ঞানকে উন্নত করার জন্যে ক্রমাগতঃ দ্বিগুণ ভাবে সচেষ্ট হতে হবে। উন্নত নৈতিক মানকে ভিত্তি করে, আমরা আমাদের জাতীয় শিক্ষাকে বিকশিত করবো, আর কারিগরী সাহায্যের মধ্য দিয়ে অন্যান্য জাতির সাথে পা মিলিয়ে মানবতার যাত্রাপথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবো। সেই অবস্থায় যুবসম্প্রদায় বিদেশী অবক্ষয়ী বস্তুবাদী মতবাদের আক্রমণের হাত থেকে সনাতন সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। আর একমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই, **এখানে, মুক্ত দুনিয়ার এই সীমান্ত ঘাঁটিতে উপস্থিত যুবকরা কমিউনিষ্ট একনায়কত্বের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে অগ্রগামী সৈন্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে।**"[১] (বড় হরফ 'ভিয়েতনাম স্টাডিস'-এর সম্পাদকের )।

এই "সুন্দর" কথাগুলির আড়ালে কি রয়েছে ? এই "ব্যক্তিবাদী বিপ্লব" ( Personalist Revolution ), যাকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করার জন্য মার্কিনীরা আর দিয়েম, ছাত্র ও স্কুলের ছেলে মেয়েদের প্ররোচিত করে ; প্রকৃতপক্ষে তা যদি তাদেরকে ভাড়াটে সৈন্যদলে তালিকাভুক্তির চেষ্টা না হয়, তবে কি ?

১৯৫৪ সালে, শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার অল্প কিছু পরেই, গুণ্ডা আর ডাকাত দলের এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী নির্ভর নোংরা ছবিওয়ালা বই আর চলচিত্র, আর তারই সাথে "সর্বোচ্চমানের অশ্লীল শিল্পে ভরা সস্তা প্রেমের গল্প", উপন্যাস আর বাজারী সাহিত্যের প্রাচুর্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংস্কৃতির বাজার ভাসিয়ে দেওয়া হয়।[২] এইসব অস্বাস্থ্যকর সাংস্কৃতিক মালমশলা কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের মনের উপর এক অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করে। "কমবয়েসী ছেলেরা ভবঘুরে বৃত্তি আর চুরির অপরাধে অপরাধী হয়ে উঠেছে আর মেয়েদের টেনে নামানো হয়েছে লাম্পট্য আর গণিকাবৃত্তির রাস্তায়।"[৩] "বিচার মন্ত্রকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ট্রাইবুনালে বিচার হয়েছে, সারা দেশে এমন শিশু অপরাধের সংখ্যা ১৯৫৫সালে ১,৬৩৯টি থেকে বেড়ে ১৯৫৯সালে ৩,৬৩৮টিতে দাঁড়িয়েছে।"[৪] "থই লুয়ান" পত্রিকা তার ১৯৫৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ফু থো ক্যাম্পে উত্তরাঞ্চলের "রিফিউজীদের" বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জীবনযাত্রার নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশ করে :

"সমগ্র ক্যাম্পে ঘরের সংখ্যা মাত্র দশটি। তিন বছর ধরে সমস্ত ছাত্রদের এক জায়গায় গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। জরাজীর্ণ চটেঘেরা এই ঘরগুলি ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে মোটেই সুরক্ষিত নয়। সমগ্র ক্যাম্পের জন্য একটি মাত্র জলের কল রয়েছে, যার থেকে একটা ছোট্ট বাটি ভর্তি হতেও পাঁচ মিনিট সময় লাগে। পায়খানার খুব কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায়, রান্নাঘরটি মাছি আর মশায় থিক্ থিক্ করছে। খাবার টেবিলগুলি এত বীভৎস রকম নোংরা যে একমাত্র কসাইয়ের গুঁড়ির সাথেই তার তুলনা চলে। আর খাবার ঘরের অবস্থা ? প্রকৃতপক্ষে তা একটি পেটভরে খেতে না পাওয়া গৃহহীনদের আশ্রম। এইসব হতভাগ্য পেনসনজীবীদের বেশীর ভাগই চোর আর গুণ্ডায় পরিণত হয়েছে।"

"আমেরিকানদেরই জন্য"—লেবেল আঁটা বিলাসিতার "শো-কেস"-গুলির আড়ালে স্কুলের ঘাটতি যেন "জাতীয় কর্মনীতিকে" এক নতুন মর্যাদা এনে দিয়েছে! সায়গনের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে, "প্রতি পাঁচটি শ্রেণীর জন্য একটি করে ঘর আর প্রতি শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ হল আড়াই ঘণ্টা সময়"। পালা করে নিযুক্ত লোকেদের দিয়ে, সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি ক্লাস চলে।"[৫] 'জার্নাল অ্য এক্সট্রিম ওরিয়েণ্ট' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, স্কুলের অভাবে তিরিশ লক্ষ ( ৩,০০০,০০০ ) স্কুলের বয়সী ছেলেমেয়ে পড়াশোনার কোন সুযোগ পায় না। উপরন্তু, সুপরিকল্পিত ভাবে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে, হতভাগ্য ফেলকরা ছেলেদের বাধ্য করা হয় মিলিটারী চাকুরীতে ঢুকতে। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে বাৎসরিক পরী-

---

১। কোঙ্ হুয়ঙ্ চিন নিয়া, দোক লাপ্, দান চু ( নায্য কারণ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র )—তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৩, মিনিস্ট্রি অফ ইন্‌ফরমেশন এ্যাণ্ড ইয়ুথ (S) কর্তৃক ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত। —সে সব বই এবং সাময়িক পত্রিকার পাশে (S) চিহ্ন দেওয়া রয়েছে, সেগুলি সায়গনে প্রকাশিত বলে ধরে নিতে হবে। কড়া সেন্সর ব্যবস্থার চাপে পড়ে এইসব সাময়িক পত্রিকাগুলি হয় সত্যকে বিকৃত করে অথবা তার একটি অতিক্ষুদ্র অংশ প্রকাশ করে।

২। ভিয়েৎ চুয়োঙ্ ( ঘণ্টা ) ; ৮-৯-৫৯ (S)।

৩। ঐ

৪। কাচ্ মাঙ্ কুয়োক্ গিয়া ( জাতীয় বিপ্লব ), ১০-৩-১৯৫৯ ও ৩০-১-১৯৬০ (S)।

৫। ভিয়েৎ চুয়োঙ্, ৭-১-১৯৫৯ (S)।

স্কায় ফেলের হার ১৯৫৭ সালে শতকরা ৭৫ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৫৯ সালে শতকরা ৮৩ ভাগে দাঁড়ায়। মার্কিন-দিয়েম চক্রের কাছে স্কুলের প্রয়োজনীয়তা—নাচঘর, নাইট-ক্লাব এবং গীর্জার পরে। বার্ণার্ড ফল, সিয়াটো (SEATO) চক্রের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার না করে পারেন নি যে দিয়েম, ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ৫২৬,০০০ বর্গমাইল এলাকায় নাচঘর, গীর্জা আর উচ্চপদস্থ অফিসারদের কোয়ার্টার তৈরী করিয়েছে আর স্কুল ও হাসপাতাল তৈরী করিয়েছে মাত্র ৯২,০০০ বর্গমাইল এলাকায়।[৬] স্কুলের ছোট বড় সব ছাত্রদেরই মন দিয়ে শিখতে হয় সেই সব জিনিস যা তাদের কাছে মোটেই বোধগম্য নয়। এর উদ্দেশ্য হ'লো ছাত্রদেরকে ব্যক্তিত্বহীন এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার চেতনাবিহীন এক গোলামীর জীবনের জন্য প্রস্তুত করা।[৭] "সাংগঠনিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, উচ্চশিক্ষা ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনই আছে।"[৮] উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম সম্পর্কে দক্ষিণ ভিয়েতনামের এক ছাত্র তাঁর উত্তর ভিয়েতনামী বন্ধুকে লেখেন: "দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম নিতান্তই এক জগাখিচুড়ী—পুরোপুরি ভিয়েতনামীও নয়, ফরাসীও নয় আবার আমেরিকানও নয়। চলতি শিক্ষা পদ্ধতিগুলি ফরাসী শাসনকাল থেকেই চলে আসছে। সেগুলি হ'লো পুরোপুরি পুঁথিগত (Theoretical) মগজ ভরাট করা সব উপদেশ। যার উদ্দেশ্য—নিষ্ক্রিয় মন তৈরী করা এবং মানুষগুলিকে এমন মেশিনে পরিণত করা—যা শুধু রেকর্ড করবে এবং জ্ঞান বিতরণই করবে, সমালোচনার মাধ্যমে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারবে না। এই সব আদ্যিকালের পুরোণ পদ্ধতিগুলির সাথে যুক্ত হয়েছে শিক্ষাদানের সাথে যুক্ত আমেরিকান কর্মীদের শিথিলতা, যারা ছাত্রদের সার্বিক বিকাশের দিকটিকে পুরোপুরিই অবহেলা করে। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা, সামগ্রিকভাবে ইতিপুর্বেই যা শোচনীয় ছিল, সাম্প্রতিক কালে তা' আরও বেশী শোচনীয় হয়ে উঠেছে।"

এই সাংস্কৃতিক নীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির ফলে "স্কুলের নৈতিকমানে"র যে দ্রুত অবনতি ঘটবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে! "স্কুলের নৈতিক মান,—সত্বর বাঁচাও" (School Morality, S.O.S.!") —এটাই ছিল সায়গনের এক পত্রিকার আর্ত আহ্বান, যারা এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। নুয়েন্ ভ্যান্ ন্‌গোক্ নামে এক ছাত্র বলেন: "নবীন প্রজন্মের (rising generation) ভালমন্দের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এমন কেউ যদি জাতির ভবিষ্যতের দিকে তাকান, তবে তিনি দুশ্চিন্তা নিয়ে নিজেকে প্রশ্ন না করে পারবেন না: এদেশের ভবিষ্যৎ কি হবে? কেননা আমাদের কালের যুবকরা—তাদের কলুষিত মন নিয়ে লাম্পট্য, খুন, জুয়াচুরি প্রভৃতি অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে। আর 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় অলিন্দে' (Balcony of the Pacific) আবির্ভূত হয়েছে সব দানব—হীনবংশীয় 'টেডী বয়' আর গুণ্ডারা।

"এর জন্য দায়ী কে? এরা কি তারাই নয়, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে সব কিছুর উপরে ঠাঁই দিয়েছে?" স্পষ্টতঃই এই ছাত্রটি এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের (যাদেরকে সকলেই একেবারে হাড়ে হাড়ে চেনেন) নাম উল্লেখ না করার ব্যাপারে যত্নশীল থেকেছেন।

মার্কিন-দিয়েম চক্র ভেবেছিল যে স্কুলে থাকতেই চরম নীতিভ্রষ্টতার মাঝে টেনে নামিয়ে তরুণ তরুণীদের "কমিউনিষ্ট একনায়কত্বের বিরুদ্ধে অগ্রণী সৈন্যদলে (vanguard fighters)" রূপান্তরিত করা যাবে। কিন্তু ঘটনা প্রমাণ করে যে হিসেবে তাদের ভুল হয়েছিল।

প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে (১৯৪৫-৫৪), অন্যান্য সামাজিক স্তরের সাথে স্কুল কলেজের ছাত্ররাও একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভিয়েতনামে এমন কে আছে, যে ১৯৫০ সালের ৯ই জানুয়ারীর মত অবিস্মরণীয় দিনটির কথা এবং চিরকালের জন্য সমস্ত যুবকদের কাছে অনুসরণীয় জীবন্ত উদাহরণ সেই দেশপ্রেমিক ছাত্র, ত্রান ভ্যান ডন্'র বীরত্বপূর্ণ মৃত্যুর কথা ভুলে যাবে? দক্ষিণ ভিয়েতনামী স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের দুর্নীতিগ্রস্ত করা—শেকলে বাঁধার বৃথাই চেষ্টা করেছিল মার্কিন-দিয়েম চক্র। পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা নিবিয়ে দিতে পারে দেশপ্রেমের সেই অগ্নিশিখাকে, যা বিরাট সংখ্যক ছাত্রযুবক'কে উদ্দীপিত করেছে এবং হানাদারদের বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রামের ধারাবাহিকতার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়ে দিয়েছে। দশ বছরেরও (১৯৪৫-৫৪) বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যে সময়ের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, হিংস্র পুলিশী নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর কাঁধে শোচনীয় সব পরাজয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন এবং বিপ্লবের সামগ্রিক সাফল্যে তাঁদের অবদান মোটেই কম নয়।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামের ঐতিহ্যকে মোটামুটি দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়: ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০ এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সাল।

## "১৯৫৪ '৬০-র যুগ"

দিয়েম ক্ষমতায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই, সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রামের আবর্তের মাঝে (১৯৫৪ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত) কাও ল্যান (sadec)-এর শত শত ছাত্র এক আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের শ্লোগান ছিল "জাতীয় স্বাধীনতার ভাবমূর্তি অনুযায়ী শিক্ষা কর্মসূচীর সংস্কার সাধন করতে হবে" এবং "গণতান্ত্রিক অধিকার-

৬। বার্ণার্ড বি. ফল (Bernard B. Fall) "দুই ভিয়েতনাম" ১৯৬৩, পৃ/৩১৫।

৭। বাক্ খোয়া (এনসাইক্লোপিডিয়া) নং ১৩৩: পৃ/৩৭ (s)।

৮। নগোন লুয়ান (মতামত), ক্রোড়পত্র নং: ১৩: ১৯-৬-১৯৬০; পৃ/২, (s)।

-গুলো চালু করতে হবে"···· আর এটাই ছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের ছোঁড়া প্রথম গুলি, যা চাদমারীর কেন্দ্রস্থল—দিয়েম চক্রের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থায় আঘাত হেনেছিল।

এটা ছিল সেই আন্দোলনের শুরু যা অতিশীঘ্রই ছড়িয়ে পড়েছিল সায়গন ও হুয়েতে এবং পরে যা অন্যান্য প্রদেশেও ব্যাপ্তিলাভ করে, যার মধ্যে নামবু'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি জায়গায় ছাত্ররা—শান্তি, উত্তর দক্ষিণের পুনর্মিলনের আলোচনা, সায়গন-চোলনের ক্ষতিগ্রস্থ লোকেদের সাহায্যের জন্য অভিযানের সমর্থনে এবং "কমিউনিস্ট বিরোধিতা," ভুয়া "কৃষি সংস্কার" ও সায়গনের ভুয়া "বস্তিসাফ্" কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আয়োজিত মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে বহু সংবাদপত্র বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে বাস্তব দাবিগুলিকে সামনে নিয়ে আসে। এর উদ্দেশ্য ছিল দিয়েমের অত্যাচারী শাসন, প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি এবং জেনেভা চুক্তিকে বানচাল করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করা। প্রথমে সায়গন, হুয়ে ও চোলন ইত্যাদি বড় শহরগুলিতে আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকলেও—দ্রুত তা সমস্ত প্রদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষভাবে, ১৯৫৬ সালের ২০শে জুলাই মার্কিন দিয়েম চক্র জেনেভা চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে লঙ্ঘন করায়, স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের সংগ্রাম শক্তি ও সম্ভাবনার দিক থেকে জোরদার হয়ে ওঠে।

"শিক্ষা কর্মসূচীর সংস্কার" প্রসঙ্গে মার্কিন-দিয়েম চক্রের দেওয়া বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলিকে পুঁজি করে ১৯৫৭ সালে, দক্ষিণের সমস্ত অঞ্চলের ১১৫টি স্কুলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাদের দাবি ছিল: শিক্ষাপদ্ধতি ও স্কুল-বইয়ের প্রকাশনায় উন্নতি সাধন। সায়গন-চোলনের দক্ তিয়েন্, প্রেকস কাই, ফ্যান বোই চাউ, প্রভৃতি স্কুল ও কারিগরী কলেজ ক্রমশঃ মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। এই আন্দোলন ছিল জবরদস্তি স্কুল ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে নাম লেখানো ও **ব্যাপকভাবে** পরীক্ষায় ফেল করানোর বিরুদ্ধে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষা কর্মসূচীর সংস্কার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের আইন প্রণয়নের সমর্থনে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 451-GD ফরমানের দ্বারা 'মেডিক্যাল এন্ড্ স্কুল' বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে সেই স্কুলের ছাত্রদের ধর্মঘট। সায়গন-চোলনের স্কুলগুলি কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মঘটের সমর্থনে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্ত মাধ্যমিক স্কুলগুলি ফরমান-163-GD'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত করে। উক্ত ফরমানে জুনিয়র স্কুল থেকে সিনিয়র সেকেণ্ডারী স্কুলে উঠবার পরীক্ষায় পাশের হার সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল।

বিকাশের এই পর্যায়ে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্কুল-কলেজ ছাত্রদের সংগ্রাম তখনও দিয়েমের পারিবারিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, দিয়েম শাসনের ত্রুটিগুলির নিন্দাবাদ ও সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে নগ্ন করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন যে রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে, তা কোনক্রমেই কম নয়। ১৯৫৬ সালের শেষ থেকে ১৯৫৭ সালের শুরু অব্দি—এই সময়ের মধ্যে, স্কুল-কলেজ ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ ও আইনী সংগ্রামের ঢেউগুলিতে প্রতিফলিত হয় সমাজের এই স্তরটির দেশপ্রেমের ঐতিহ্য। আমেরিকান "সাহায্য" লাভকরা কাল্পনিক "সমৃদ্ধির" হাতছানি তাঁদেরকে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত জাতীয় স্বাধীনতার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়।

দুর্নীতি, ক্রীতদাসত্ব, পরাধীনতা- কোন প্রচেষ্টাই বেশীর ভাগ যুবকের মাথা নোয়াতে পারেনি। ১৯৫৮ সালের শুরু থেকেই তাই মার্কিন-দিয়েম চক্র নানান বাগাড়ম্বরপূর্ণ কর্মপন্থার পাশাপাশি নিতান্তই বর্বরতামূলক সন্ত্রাস অভিযান শুরু করে। কিন্তু জনগণের হৃদয়ে ইতিমধ্যেই প্রজ্জ্বলিত ক্রোধের আগুনে তা' শুধুমাত্র ঘৃতাহুতিরই কাজ করে।

সমগ্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রভাবে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা নতুন উদ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে যান। শিক্ষাসংস্কারের সংগ্রামে নিতান্তই সাধারণ ও অস্পষ্ট শ্লোগানের জায়গায় ক্রমশঃই উপস্থিত হয় সুনির্দিষ্ট সব দাবি:

(১) উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ভিয়েতনামী ভাষার ব্যবহার।

(২) জাতীয় স্বাধীনতার চেতনার উপযোগী করে শিক্ষাদান-কর্মসূচীর পরিবর্তন সাধন।

(৩) স্কুল ও ক্লাসের অভাব পূরণ, ছাত্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অভাবী ছাত্রদের সাহায্য, শিক্ষার উপযোগিতা বৃদ্ধি এবং যে কোন মূল্যেই চলতি ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের অবসান।

এই দাবিদাওয়াগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় ছাত্রদের ন্যায্য আকাঙ্খা এবং প্রকাশ হয়ে পড়ে নয়া ঔপনিবেশিক কর্মনীতির জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্র। এটা স্মরণে আনা দরকার যে, ১৯৫৪ সালে, প্রতিরোধ যুদ্ধের (১৯৪৫-১৯৫৪) সময়ে সৃষ্ট নানান অসুবিধা সত্ত্বেও, ভিয়েতনামী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে এক সামগ্রিক শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং শিক্ষার প্রতিটি শাখায় ও স্তরে তার রূপায়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এটা হয়েছিল উত্তরে; কিন্তু দক্ষিণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী অথবা ফরাসী—যে কোন একটি ভাষাই প্রধান ভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলক ছিল। এটাই হ'ল দক্ষিণ ভিয়েতনামের মোসাহেবী চরিত্র ও ইয়াংকী সাম্রাজ্যবাদের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার প্রমাণ। সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা

মার্কিনী শিক্ষাব্যবস্থার 'কার্বন কপি'মাত্র। 'দক্ষিণ ভিয়েতনাম বিশ্ববিদ্যালয়' হল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও জমিদার প্রভৃতি মুষ্টিমেয় "সুবিধাভোগী"র ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার নার্সারী। মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার দাবিতে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সংগ্রাম আসলে ছিল এই শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার ধিক্কার। এই আন্দোলন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সমর্থন লাভ করেছিল। তাছাড়া, এই আন্দোলন, মার্কিন-দিয়েম চক্রের বাগাড়ম্বরপূর্ণ চাতুরীতে মোহগ্রস্থ কিছু ছাত্রের চোখ খুলে দিতেও সাহায্য করেছিল।

এই আন্দোলনের পিছনে ব্যাপক জনমতের সমর্থন ছিল। জনমতের চাপে পড়ে 'বাক্‌খোয়া' (বিশ্বকোষ), 'দাই হোক্' (বিশ্ববিদ্যালয়), ইত্যাদি রিভিউগুলি(S); তাছাড়া 'গন লুয়ান' (মতামত), 'তু দো' (স্বাধীনতা) ইত্যাদি দৈনিকগুলি(S) এবং এমনকি ন্‌গো দিন দিয়েমের সরকারী মুখপত্র—'কাং মাঙ কুয়োক গিয়া' (জাতীয় বিপ্লব)-ও প্রায়শঃই, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মার্কিন-দিয়েম চক্রের তথাকথিত "মানবতাবাদী, জাতীয় ও মুক্তিকামী" শিক্ষা-কর্মসূচীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণের মঞ্চ হিসাবে কাজ করত।

দিয়েম তাড়াহুড়ো করে দু'দুটো "শিক্ষা সম্মেলন" আহ্বান করে এবং একটি ঘোষণা প্রচার করে। তাতে সে শিক্ষা কর্মসূচীর পরিমার্জনের প্রতিশ্রুতি দেয়। ছাত্রদের অভিভাবকদের এক সম্মেলনে সরকারী অসুবিধার নানান "ব্যাখ্যা" তুলে ধরা হয়, যেমন বিল্ডিং করার জায়গার অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদি। কিন্তু অতি শীঘ্রই, মার্কিন-দিয়েম চক্র তাদের ভাবগতিক পাল্টে, "ক্লাশবন্ধ করে দেওয়ার, ক্লাশরুমের সংখ্যা ও ক্লাশের সময়কাল কমিয়ে দেওয়ার" হুমকি দিতে শুরু করে। 'স্কুল ছাত্র ইউনিয়ন' ও 'জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন' এর মতো যুব-সংগঠনগুলিতে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

মার্কিন-দিয়েম চক্র কর্তৃক গৃহীত সব ব্যবস্থাগুলিই ছাত্রজগতের বেশীর ভাগ অংশকে ধোকা দিতে অথবা ভয় পাওয়াতে ব্যর্থ হয়। ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের গলা টিপে মারতেও সেগুলি অসমর্থ হয়। তাঁরা তখন সাধারণ দাবিদাওয়ার বদলে সুনির্দিষ্ট বাস্তব দাবি আদায়ের আওয়াজ তুলেছেন এবং (পরোক্ষ সমালোচনার বদলে) প্রকাশ্য এবং শান্তিপূর্ণ কিন্তু দৃঢ় সমালোচনা শুরু করেছেন।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, ১৯৫৪ থেকে ১৯৬০—এই সময়ের মধ্যে, স্কুল-কলেজ ছাত্রদের সংগ্রাম কোন নিয়মিত রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়নি, এমনকি সরাসরি তার প্রভাবেও ছিল না। কিন্তু তাই বলে, তা যে একটি অসচেতন এবং অন্ধ-স্বতঃস্ফূর্ততা প্রসূত আন্দোলন ছিল, তাও নয়। এটা ছিল, সেই সব আরও বেশী বেশী করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও স্লোগানের ভিত্তিতে সংগঠিত এক সংগ্রাম, যেগুলি দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে তাল রেখে চলত: ছাত্রসংগ্রাম সামগ্রিকভাবে এক হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে, যে জনগণ ফরাসীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং মার্কিন-দিয়েম চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বছরগুলির মধ্য দিয়ে পোড় খেয়েছেন, যে জনগণের জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনা দিনে দিনে সুসংহত হচ্ছে।

তাই, প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থাকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্কুল-কলেজ ছাত্ররা উৎসাহভরে ধিক্কার দিয়েছিলেন শাসনব্যবস্থার চরিত্রকে--একটি পুলিশী সন্ত্রাসের শাসন:—আগ্রাসন, ফ্যাসিস্ট সমরবাদ এবং বিশ্বাসঘাতকের মত চুক্তি সম্পাদন, বিভেদের বীজ বোনা আর গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালানোই ছিল যার নীতি।

এমনকি ফ্যাসিস্ট আইন ১০-৫৯* তাঁদের সংগ্রামের সংকল্পকে ভাঙতে পারেনি। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর—এই তিন মাসের মধ্যে, যে সময়ে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন জ্বলে ওঠে, ৫৬,০০০ স্কুল-কলেজ ছাত্র রাস্তায় রাস্তায় মার্কিন-দিয়েম চক্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল পেত্রুস্ কাই স্কুলের প্রতিক্রিয়াশীল উপাধ্যক্ষ—নুয়েন থোই থাপের বিরুদ্ধে ৪,৫০০ স্কুল ছাত্রদের প্রতিবাদ (১২-১১-১৯৫৯), চোলনের 'নুয়েন কিয়েন' স্কুলের স্নাতক পরীক্ষা বর্জনকারী ছাত্রদের ধর্মঘট এবং তিয়েন হো হুয়ঙ (দঙ্ থাক্ মুয়ই) সেকেণ্ডারী স্কুল ছাত্রদের ধর্মঘট (২৩-১২-১৯৫৯), যাঁরা ইউনিফর্ম পরতে অস্বীকার করেন এবং সহপাঠীদের এলোপাথাড়ী গ্রেপ্তার ইত্যাদির বিরোধীতা করেন।

১৯৬০ সালে, এই আন্দোলন আরও বিভিন্ন রূপের মধ্য দিয়ে আরও গতিবেগ লাভ করে। ১৯৬০ সালের ১৬ই জানুয়ারী 'তিয়েঙ্ চুয়োঙ্'(S) খবর দেয়, "কোন এক স্কুলে একটি প্রতিকূল ঘটনা ঘটল, আর সে ঘটনার কোনরকম ব্যাখ্যা পাওয়ার আগেই শুরু হল অন্য কোথাও আর একটা; এইভাবে সমস্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। পুলিশ অভিভূত। অসংখ্য স্কুলের পরিস্থিতি প্রচণ্ড পরিমাণে বিশৃংখল হয়ে পড়েছে।" সায়গন-চোলনের পর আসে হুয়ে'র পালা; তারপর দালাত এবং ক্রমে সমস্ত প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে। সর্বত্রই, "মার্কিন-দিয়েম চক্র নিপাত যাক্!" "সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক্!" "অবিলম্বে ইয়াংকী আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে!" এবং "ভিয়েতনামী জনগণকে আগ্রাসকদের কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না!" ইত্যাদি স্লোগানকে কেন্দ্র করে—মিটিং, মিছিল ও ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক সংকট এবং সায়গন

* অথবা আইন-৯১, যা ১৯৫৯'র মে মাসে "স্পেশাল ট্রাইবুনাল" বসিয়েছিল।

পুতুল প্রশাসনের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে, স্কুল-কলেজ ছাত্রদের সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬০ সালের ১১ই নভেম্বরের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান ছিল এই অন্তর্দ্বন্দ্বগুলির প্রথম লক্ষণ। পাতি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াদের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ছাত্রদের ক্রমপ্রসারমান এই আন্দোলন, বস্তুতঃ, একটি জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নেতৃত্বে সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনামী জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে।

১৯৬০ সালের ২০শে ডিসেম্বর, জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের জন্ম হয়। জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের জন্মের মধ্যদিয়ে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সংগ্রাম একটি নতুন গতিপ্রকৃতি লাভ করে।

## "১৯৬১ – '৬৫-র যুগ"

**১৯৫৪-৬০, এই সময়টিকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধের (১৯৪৫-৫৪) আগুনে পোড় খাওয়া, স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার বিকাশলাভের এমন একটি যুগ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, যে যুগে যুবসম্প্রদায় সন্ত্রাসমূলক ব্যবস্থা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক পরিকল্পনাগুলির বিরুদ্ধে "আইনসম্মত" সংগ্রাম চালিয়েছেন। সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের এবং গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের মত কোন নিয়মিত সংগঠন তখনও ছিল না। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হবার মধ্য দিয়েই স্কুল ও কলেজ-ছাত্রদের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে সংগঠিত হবার প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলি গড়ে ওঠে।** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ)

জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট তার কর্মসূচীতে, প্রত্যেকটি সামাজিক স্তরের সংগ্রামের লক্ষ্য নির্ধারণ করে :

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের **ছদ্মবেশী ঔপনিবেশিক** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ) **শাসন** ও ন্গো দিন্ দিয়েমের একনায়কতন্ত্রী প্রশাসনকে উৎখাত করতে হবে এবং একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে।"[৯] এবং ১৯৬১ সালের ৯ই জানুয়ারী, জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নেতৃত্বে, একটি সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে, যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে স্কুল ও কলেজের সমস্ত দেশপ্রেমিক ছাত্রদের নিয়ে 'লিবারেশন ষ্টুডেন্টস্ অ্যাণ্ড পিউপিল্‌স্ ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। **"দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তির জন্য জনগণের অন্যান্য অংশের সাথে দেশপ্রেমিক যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাথে সাথে, নিজেদের সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ আশা-আকাঙ্খার জন্যও" তাঁদেরকে সংগ্রাম করতে হবে।**[১০] (বড় হরফ আমাদের —সঃ মঃ বীঃ)

তারপর থেকেই, স্কুল ও কলেজ-ছাত্রদের সংগ্রাম বিকাশের এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে, যে স্তরে নেতৃত্ব এবং সাংগঠনিক কাজকর্ম চালানো সম্ভব। 'লিবারেশন ষ্টুডেন্টস্ অ্যাণ্ড পিউপিল্‌স্ ইউনিয়নে'র প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাতে ১৯৬১-র সারা জানুয়ারী মাস ধরে নাম্বোর মধ্যাঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র, একনায়কতন্ত্রী শাসন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (এই বছরের এপ্রিল মাসে যা হবার কথা ছিল) বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হন। ১৯৬১-র জুলাই মাস পর্যন্ত এই আন্দোলন চলে।

২০শে জুলাই[১১] উপলক্ষে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় প্রতিটি সহরেই স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা, ১০ থেকে ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে—"একটি জাতীয়, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ কোয়ালিশন সরকার চাই"—এই স্লোগানকে সামনে রেখে অসংখ্য মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সায়গন, চোলোন, হুয়ে এবং কান্‌থো ইত্যাদি সহরের একেবারে বুকের উপর আত্মপ্রকাশ করে 'ব্যানার' 'ফ্ল্যাগ' ও 'লিফ্‌লেট'। আর ২০শে জুলাই, জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরের বর্ষপূর্তির দিনটিতে ৫,০০০ স্কুল ও কলেজ-ছাত্র 'সায়গন বটানিক্যাল গার্ডেন'-এ একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত করেন। সন্ত্রাসের অবসান, গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ প্রতিষ্ঠা, মার্কিনী সেনাবাহিনীর অপসারণ এবং একটি জাতীয়-গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন, ইত্যাদি দাবি করে এই সমাবেশে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরীক্ষা আর সংগ্রামের এই সাতটি বছর ভিয়েতনামের জনগণকে, বিশেষকরে স্কুলের তরুণদের ইস্পাত দৃঢ় করে তুলেছে। তাঁদের জাতীয় চেতনার মান উন্নত হয়েছে এবং তাঁদের ন্যায়সংগত স্বার্থের জন্য তাঁদের সংগ্রামের সংকল্প আর বেশী দৃঢ় হয়েছে। **বেশীর ভাগ তরুণই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটিই মাত্র পথ আছে—শ্রমিক-কৃষকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।**

(বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ)

১৯৬১ সালের অক্টোবরে লঙ্ ড়ুয়েন, চাউ ডক্, মাই থো, কিয়েন ফঙ্ এবং ফিয়েন তুয়ঙ্ প্রদেশের প্রায় ৩০০,০০০ স্কুল ছাত্র, নতুন স্কুল খোলা ও টাইফুন আক্রান্ত এলাকার স্কুলের ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত পরীক্ষা সেসানের ব্যবস্থার দাবিতে এবং সন্ত্রাসমূলক ব্যবস্থা ও 'মিলিটারী সার্ভিসে'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৯৬২ সালের

৯। Mat tran dan toc giai phong Mien Nam Vietnan—Su That Publishing House, Hanoi 1961, P-14.

১০। ঐ, পৃ ৮৮/৮৯।

১১। ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরের বার্ষিকী দিবস।

ফেব্রুয়ারীতে ফু থো কারিগরী বিদ্যালয়ের ১৫০ জন ছাত্র বিয়েন হোয়া বিমান ঘাঁটিতে কারিগরী অফিসারের পদে শিক্ষানবিস হিসাবে কাজ করতে অস্বীকার করেন। একের পর এক এইসব বিক্ষোভ প্রদর্শন শত্রুকে ভীত করে তোলে। এর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মার্কিন-দিয়েম চক্র "২৪শে মে'র বিচারে"র আদেশ দেয়।

১৯৬২ সালের ২৪শে মে, তাদের বিশেষ ট্রাইবুন্যাল অধ্যাপক লে কুয়াঙ বিন্, হুয়েন ভ্যান চিন্ নামে একজন তরুণ, লে হঙ তু ও হুয়েন ভ্যান থান্ নামে দু'জন ছাত্রকে প্রাণদণ্ডে এবং অন্য ৮ জন ছাত্রকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তাঁদের অপরাধ? —"রাষ্ট্রপতি নির্বাচন" (এপ্রিল ১৯৬১) বানচাল এবং গ্রেনেড দিয়ে সায়গনস্থিত মার্কিনী দূতাবাস আক্রমণের চেষ্টা।

১৯৬২ সালের ২৪শে মে, এই তরুণ বীরেরা ট্রাইবুন্যালের সামনে অভিযুক্ত হওয়ার বদলে অভিযোগকারীর ভূমিকা নেন। মার্কিন হানাদার ও তাদের পদলেহীদেরই তাঁরা অভিযুক্ত করেন। প্রকাশ্য আদালতে, শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন এক আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, গণিতের অধ্যাপক এবং কবি লে কুয়াঙ বিন্ এই স্মরণীয় কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন, "আমার একটিই মাত্র ক্ষোভ আছে আর তা' হলো এই যে, হানাদার সর্দারদের কাউকেই আমি মারতে পারি নি!"

বিচারকদের সামনে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সকলেই ঘোষণা করেছিলেন, "দিয়েম নিপাত যাক!" "ফ্যাসিস্ট আইন সমূহ নিপাত যাক!"। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এই চারজন মানুষ দয়া ভিক্ষা করেননি বা আবেদন করার অধিকারও দাবী করেননি। হানাদার আর বিশ্বাস-ঘাতকদের কাছ থেকে কোন কিছুই নিতে তাঁরা রাজী ছিলেন না।

সাহসের সাথে ফ্যাসিস্ট নিপীড়নের মোকাবিলা করতে, লে কুয়াঙ বিনের উদাহরণ স্কুল কলেজের ছাত্রদের দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তাঁদের অত্যন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র এই সাথীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাঁরা প্রস্তুত হন। লে কুয়াঙ বিনের বিচার, সেই অল্পসংখ্যক তরুণদের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে, যাঁরা তখনও পর্যন্ত দোদুল্যমান এবং মার্কিণ-দিয়েম চক্রের বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলির প্রতি প্রলুব্ধ।

লে কুয়াঙ বিন্ ও তাঁর সহযোদ্ধাদের হত্যার প্রতিবাদে, কেবলমাত্র ১৯৬২ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহেই, স্কুল ও কলেজের ১৫,০০০ ছাত্র পথে নামেন। কাও লান্—(সাদেক) এ ১০৮ জন স্কুল ছাত্র বেপরওয়া পুলিশী অত্যাচারের শিকার হন, কিন্তু সংগঠনের কোন খবরই তাঁরা ফাঁস করেন নি।

নিপীড়নের পুরোপুরি হিংস্র সব পদ্ধতি, আগ্রাসী যুদ্ধ এবং অবক্ষয়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিক্ষোভগুলির সাথে যুক্ত হয়ে, লে কুয়াঙ বিনের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ ১৯৬২ সালের শেষ মাস পর্যন্ত চলে। সায়গন—চোলোন, তানান্, ভিন লঙ্, বেন্‌ত্রে থেকে শুরু করে—হুয়ে, কোয়াঙনাম এবং বিন্‌দিন পর্যন্ত এই আন্দোলন বিস্তারলাভ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তানান্-এর ৮,০০০ স্কুল ছাত্র এবং অন্যান্য অধিবাসীদের মিছিল (৮, ৬, ৬২)।

১৯৬২ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্টের কেন্দ্রীয় কমিটি সায়গন-চোলোনের স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সংগ্রামের কথা, দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করে বলেন যে, "এই আন্দোলন দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি এবং পিতৃভূমির পুনর্মিলনের সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

শত্রুর বেয়নেট আর বন্দুকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আরও অনেক উজ্জ্বল বিজয় অর্জন তখনও বাকি ছিল। যেগুলি সম্ভব হয়েছে স্কুল কলেজ ছাত্রদের শক্তি এবং সেই দৃঢ় সমর্থনের ফলে, যা তাঁরা সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক ফ্রণ্টে জনগণ ও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক অর্জিত মহান বিজয়গুলির মধ্য থেকে পেয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে, আপ্-বাক্ বিজয়ের ঠিক পরেই এবং তারই অনুপ্রেরণায় জনগণ ও মুক্তিফৌজ, প্লাইমঙ্গ, কোয়াঙ্‌নাম, থেইনিন, মাইথো, কামাউ এবং অন্যান্য জায়গায় শত্রুর উপর শোচনীয় সব পরাজয় চাপিয়ে দিয়েছেন। তারই সাথে সাথে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা, শত্রুর একেবারে অন্তঃস্থলে অর্থাৎ সহরগুলিতেই তার উপর আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। ৮ই মে হুয়েতে স্কুলের ছাত্র এবং বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন সবচেয়ে দোদুল্যমান ব্যক্তিদেরও আহত করে। একেবারেই প্রাথমিক সব অধিকারগুলিও পদদলিত হয়।

১৯৬৩ সালের ৮ই মে, বুদ্ধজয়ন্তী পালনের উপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ২০০,০০০ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ, যাদের বেশীর ভাগই স্কুল-কলেজের ছাত্র, হুয়েতে একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অনুষ্ঠান করেন। ৩১ মি.মি. বন্দুকে সজ্জিত সাঁজোয়া গাড়ী থেকে জনতার উপর দু'ঘণ্টা ধরে অবিরাম গুলি বর্ষণ চলে: ১২ জন বিক্ষোভকারী নিহত ও ২০ জন আহত হন এবং কয়েক'শো পুরোহিতের সাথে প্রধান পুরোহিত থিক্ ট্রি কুয়াঙ[১২] ও বেশ কিছু সংখ্যক বৌদ্ধমতাবলম্বী ছাত্র গ্রেপ্তার হন। ফলে এই সংগ্রাম একটি শান্তিপূর্ণ, ধর্মীয় বিক্ষোভ থেকে মার্কিন-দিয়েম চক্রের ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বের বিরুদ্ধে এক বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল হিংসার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করতে স্বয়ং বুদ্ধকেও "নেমে আসতে হয় রাস্তায়"। বৌদ্ধমতাবলম্বী জনতা, যাঁদের হাতে শুধুমাত্র ধর্মীয় পতাকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সাহসের সাথে জল্লাদদের মুখোমুখি রুখে দাঁড়ান। সৈন্যরা "হস্তক্ষেপ করতে অসম্মত হয়" এবং সাঁজোয়া

১২. হুয়ের বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি

গাড়ীগুলির উপর গুলি চালনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যেই বিক্ষোভকারীদের পাশে এসে দাঁড়ায় ( ইউ. পি. আই )।

১৯৬৩ সালের ৮ই মে'র দিনটি ছিল খোদ সহরের বুকেই এক প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের মতো, যা সমগ্র দেশব্যাপী এবং সারা দুনিয়া জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

৯.৫.৬৩ তারিখে "লিবারেশন প্রেস" লেখে :

**"এটা হল' এমনই এক আন্দোলনের সূত্রপাত যা অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে অন্যান্য সহরগুলিতে এবং যার উপর লুটেরা আর বিশ্বাসঘাতক মার্কিন-দিয়েম চক্রের শাসনকে কবরে পাঠাবার আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করেছেন সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনামবাসী।"**

গ্রীষ্মের ছুটিতে যাঁরা বাড়িতে ছিলেন, সেই ছাত্ররা একনায়কতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে দলে দলে হুয়েতে ফিরে আসেন। একটি চিঠিতে তাঁরা হুয়ের অধ্যাপকদের, যে শোকাত্মক রক্তাক্ত ঘটনার শিকার হয়েছিলেন তাঁদেরই ছাত্র, বৌদ্ধ তরুণেরা—তার প্রতি তাঁদের ঘৃণ্য ঔদাসিন্যের জন্য ধিক্কার দেন।

'৬৩ সালের ৩রা জুন, ২,০০০ ছাত্রের একটি রাজনৈতিক সভায় হাজারে হাজারে দিয়েমী সৈন্য বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যিনি বীরের মত প্রত্যাঘাত হেনেছিলেন সেই ফান দিন্ বিন্ সহ ৫০ জন ছাত্রকে হয় নিহত অথবা আহত করে। পাঁচ হাজারেরও বেশী মানুষ তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন।

১৯৬৩ সালের মে থেকে জুলাইয়ের মধ্যে প্রায় সমস্ত স্কুলের ১৫০,০০০ জন স্কুল ও কলেজ ছাত্র তাঁদের হুয়ের সাথীদের সংগ্রামের সমর্থনে, দিয়েমের উৎখাত ও মার্কিনী সৈন্যের অপসারণের দাবি নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। অসংখ্য ছাত্র ও বৌদ্ধদের এই সংগ্রাম এবং হুয়ের এই রক্তাক্ত ঘটনা সমস্ত দেশপ্রেমিক তরুণের হৃদয়কে গভীর ভাবে উদ্বেলিত করে এবং দেশ ও তরুণ সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য জনগণের অন্যান্য অংশের সাথে যোগ দিতে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

**গণআন্দোলনের এই অনুপ্রেরণাময় উত্তাল জোয়ার বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই নাড়া দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়।** ( বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ )। এরই ফলশ্রুতি হলো শাসনব্যবস্থার অবনতিকে কেন্দ্র করে জনৈক অধ্যাপকের নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়া :

"এটা এমনই এক সংকট, যার মূল সাধারণভাবে নিহিত আছে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এবং বিশেষভাবে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মধ্যে।"[১৩]

ছাত্রদের চোখে ঘৃণ্য হবার কারণটিকে যে সমস্ত অধ্যাপকেরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁরা তাঁদের কাজে ইস্তাফা দেওয়ার মধ্যদিয়ে সায়গন পুতুল প্রশাসনের রাজনৈতিক সংকটকে আরো তীব্র করে তোলেন।

স্কুল-কলেজের ছাত্ররা বোমার সলতের ( ফিউজ ) ভূমিকাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন সমস্ত দ্বন্দ্বগুলির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, যা শাসনব্যবস্থাকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

আতঙ্কিত মার্কিন-দিয়েম চক্র ১৯৬৩ সালের ২১শে আগষ্ট এই ভেবে সামরিক আইন জারী করে যে, এই আইন দিয়ে তারা গণআন্দোলনের জোয়ারকে ঠেকাতে সক্ষম হবে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারে। সায়গনে পরিস্থিতি অত্যন্ত থমথমে হয়ে ওঠে। বিরামহীনভাবে অনুষ্ঠিত হয় একের পর এক সভা। এই সভাগুলিতে তরুণদের আদর্শগতভাবে দূষিত করা এবং ক্রীতদাস বানানোর নয়া-ঔপনিবেশিক নীতির এই সব চাইতে ভয়াবহ কায়দাগুলির স্বরূপ উন্মোচন করা হয় এবং সেগুলির প্রতি তীব্রভাবে ধিক্কার জানানো হয়। অধ্যাপক নুয়েন ভ্যান ট্রাঙ লেখেন :

"আমার মনে হয় যে, আমরা এক নৈতিক গণিকাবৃত্তির অবস্থার মধ্যে বাস করছি। একজন গণিকা, যে কেউ বলবে, আপনার সাথে ভালোবাসার কথা বলে, এবং যে কোন লোক সর্বদাই প্রতারিত হয় তার আশ্বাসগুলিতে—আপাতঃদৃষ্টিতে ঐকান্তিক, যেন একেবারে তার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উঠে আসছে। এর পরেও কি মানুষের আর বিশ্বাস থাকতে পারে?"[১৪]

আমেরিকানরা এবং তাদের খিদমদ্‌কাররা এমনকি তাদের উচ্চপদস্থ অফিসার আর সহযোগীদের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলে। বিপ্লবী জনতাকে প্রতারিত করার আশা তারা কিভাবে করবে?

পরপর ২৪শে ও ২৫শে আগষ্ট সায়গন-চোলোনে, লক্ষ লক্ষ স্কুল ও কলেজ-ছাত্ররা তাঁদের অধ্যাপকদের সাথে মিলিতভাবে অবিরাম একের পর এক সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠান করেন, যাতে তাঁরা একনায়কতন্ত্রী শাসনের তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে তার উৎখাত দাবি করেন।

মার্কিন-দিয়েম চক্র 'প্রতারণার' দ্বারা যা পেতে ব্যর্থ হয়েছিল, সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে তা পাবার চেষ্টা করে। ১৯৬৩ সালের ২৫শে আগষ্ট, তারা ১০ জন ছাত্রকে হত্যা করে, আহত করে ২০ জনকে

---

১৩. নুয়েন ভ্যান ত্রাং—বাক্ থোয়া, সংখ্যা—১৬৭, পৃ—৪ ( ৪ )। দর্শনের অধ্যাপক এবং খৃষ্টান অস্তিত্ববাদী নুয়েন ভ্যান ত্রাং প্রথমে মার্কিন-দিয়েম চক্রের সাথে সহযোগিতা করেন কিন্তু পরে নিজেকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন।

১৪. নুয়েন ভ্যান ত্রাং—বাক্ থোয়া ( ৪ ), সংখ্যা—১৬৭, পৃ—৫।

এবং ২,০০০ স্কুল ও কলেজ-ছাত্রসহ ৮,০০০ সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করে। ২৫শে আগষ্ট থেকে ২৭শে আগষ্টের মধ্যে ছাত্র গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২,০০০ থেকে ৪,০০০ দাঁড়ায়। এই দানবীয় নিপীড়ন জনগণের সমস্ত অংশের বিরোধিতাকে সাংঘাতিকভাবে বাড়িয়ে তোলে। ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগষ্ট সায়গন আইনজীবী সংঘের ১০৪ জন সদস্য একটি প্রতিবাদ পত্রে স্বাক্ষর করেন এবং ধর্মঘটের পথে পা বাড়ান। পরের সপ্তাহে, তাঁদের হুয়ে'র সহকর্মীরাও প্রতিবাদে সামিল হন।

এই দানবীয় হত্যা ও গণগ্রেপ্তার, যা ৮ই মে হুয়েতে শুরু করে ২৭শে আগষ্ট পর্যন্ত সায়গন-চোলোনে চালানো হয়, তা প্রমাণ করে যে সহরের মানুষদের ক্রমবর্ধমান সবল প্রতিরোধ শত্রুকে এক কানাগলিতে ঠেলে দিয়েছে। কারণ আমেরিকানরা ও তাদের পুতুলরা সহরগুলিকেই তাদের লোকবল ও অন্যান্য সম্পদ মজুত করার নিরাপদ পশ্চাদভূমি হিসাবে এবং গ্রামাঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। তাই সহরগুলিকে বাঁচানো ও তাদের স্নায়ু-কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন-দিয়েম চক্র, বর্বরতম থেকে শুরু করে ধূর্ততম, সম্ভাব্য সমস্ত কায়দাগুলিই গ্রহণ করেছিল। জনগণকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেবার জন্য রাজনৈতিক, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা জনগণের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত, বিশেষ করে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল অব্দি সহরের মানুষ এবং স্কুল-কলেজে ছাত্রদের সংগ্রাম শত্রুর সবক'টি মুখোসই ফুটো করে দেয়। যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

সায়গন-চোলোনের স্কুল ও কলেজ-ছাত্রদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের উদাহরণ অনতিবিলম্বেই সমস্ত প্রদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বেন্‌ত্রে-তে তান্‌দান ও কওল্যাপ্‌-এর স্কুলগুলির ৫,৬০০ ছাত্রের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়; ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) দালাত-এ ৬,০০০ স্কুলছাত্র ধর্মঘট করেন; ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) কানথো-য় ৩,০০০ স্কুল ছাত্রের একটি মিছিল ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়, ৩,০০০ সহরবাসীও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

**সামগ্রিকভাবে, একথা বলা যায় যে, ১৯৬৩ সালের শেষের মাসগুলি ধরে, ব্যতিক্রমহীনভাবে, দক্ষিণের সমস্ত সহরগুলিই স্কুল-কলেজ ছাত্রদের মার্কিন-বিরোধী ও দিয়েম-বিরোধী সংগ্রামের মঞ্চ হয়ে উঠে।** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ) কখনও বা তাঁরা তাঁদের সংগঠনের কাঠামোর থেকে পৃথকভাবে সংগ্রাম করেছেন, আবার কখনও বা সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। যে সাধারণ সংগ্রাম ১৯৬৩ সালের ১লা নভেম্বর আমেরিকানদের বাধ্য করেছিল দিয়েমের পতন ঘটাতে, তা'তে স্কুল-কলেজ ছাত্রদের ভূমিকাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

●

দিয়েমের জায়গায় আসে দুয়ঙ্‌ ভ্যান্‌ মিনের সরকার। এই সরকার তার পূর্বসূরীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকেই চালিয়ে যায়, নতুন নতুন বাগাড়ম্বরপূর্ণ কায়দার ছদ্মবেশ পরিয়ে। এই সরকারের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তাগুলির একটি ছিল—কিভাবে সহরগুলিতে, সর্বোপরি, সায়গন-চোলোন, হুয়ে ও দানাং-এর মতো সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা কায়েম করা যায়। তরুণদের দেশপ্রেমিক সংগ্রামকে শ্বাসরোধ করে মারার জন্য দুয়ঙ্‌ ভ্যান মিন তথাকথিত "সংগ্রামরত স্কুল ও কলেজ-ছাত্রদের কণ্ঠস্বর থেকে উত্থিত" বলে কথিত "ঘোষণাপত্র" ও "ইস্তেহার"গুলির ব্যাপক প্রচারের আদেশ দেয়। "কমিউনিজমের বিরুদ্ধে", "নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে" নানান আবেদনই ছিল এই সব "ঘোষণাপত্র" ও "ইস্তেহারে"র বিষয়বস্তু। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী এবং পরবর্তীকালে বিপ্লবী যুবকদের সারি থেকে বহিষ্কৃত কিছু প্রতিক্রিয়াশীলদের কথা বাদ দিলে, স্কুল কলেজের ছাত্ররা ফরাসীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিরোধের ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন এবং মুক্তিফ্রন্টের নেতৃত্বে মার্কিনী নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে তিন বছরের সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ইস্পাতের মতো দৃঢ় হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সকলের কাছে এটা পরিষ্কার যে কমিউনিজম্‌-বিরোধিতা এবং নিরপেক্ষতা-বিরোধিতা হল দেশ ও জনগণের স্বার্থ-বিরোধী এবং তা কেবলমাত্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই সেবা করবে। তাঁদের চোখে দুয়ঙ্‌ ভ্যান মিনে'র শাসন ছিল—'দিয়েমহীন দিয়েমবাদ'।

আর তাই, ১৯৬৩ সালের ১লা নভেম্বর'এর সামরিক অভ্যুত্থানের পরবর্তী মাসগুলিতে হাজারে হাজারে স্কুল-কলেজ ছাত্র, শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মগোপনকারী গুপ্তচরদের বহিষ্কার এবং নতুন সরকারের প্রশাসনযন্ত্রের মধ্যে তখনও ঝুলে থাকা, দিয়েম সৃষ্ট 'অ্যাক অন'[১৫]-দের শাস্তি বিধানের দাবী নিয়ে উঠে দাঁড়ান।

ব্যাপক বিপ্লবী আন্দোলনের এই যুগটির মতো, আর কখনোই, ছাত্রদের সংগ্রাম পুতুল সেনাবাহিনীর এতো বেশী সংখ্যক সদস্যের সমর্থন পায়নি। ভিন লঙ্‌, বেন্‌ত্রে, হওগু (চাউডক্‌)·······প্রতিটি জায়গাতেই সৈন্যদেরকে তরুণ বিক্ষোভকারীদের সারিতে দেখা যায়। ১৯৬৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর, হওগুতে সশস্ত্র সৈন্যরা বিক্ষোভকারীদের উপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে।

---

১৫. অ্যাক অন (দানো) কথাটি যে সমস্ত মার্কিনী পুতুল দালালরা জনগণের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ করে তাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

তরুণ, শিক্ষিত, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রেমে ভরপুর এবং সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অসংখ্য জয়ের অধিকারী স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সহরের মানুষদের ব্যাপক অংশগুলিকে এবং পুতুল প্রশাসনের ও সেনাবাহিনীর বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সৈন্যদের আকৃষ্ট করেন। **সহরগুলিতে ফ্রন্ট, যা সমস্ত স্তরের মানুষদের নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, 'শক্ ফোর্স' হিসাবে স্কুল-কলেজ ছাত্রদের মাধ্যমে তা দিনে দিনে বিস্তৃত হতে থাকে।** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ) স্কুলগুলির স্বদেশপ্রেমিক আন্দোলন সম্পর্কে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নুয়েন হু থো বলেছেন : "দক্ষিণ ভিয়েতনামী জনগণের সাধারণ স্বার্থে এটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান।"[১৬]

নুয়েন খান্ ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে তীক্ষ্ণতার দিক থেকে সংগ্রাম আরও বৃদ্ধি পায়। নুয়েন খান্ ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র পাঁচ দিন কাটতে না কাটতেই কুইন হোন (ফেব্রুয়ারী—২), কাঙ্ গিউক ও চোলোন (ফেব্রুয়ারী—৩ ও ৪) সায়গন-চোলোন (২৩ থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী) ট্রাভিন্ (মার্চ—৩), বেন্‌ত্রে (মার্চ—৫), কাওলান, সাদেক (মার্চ—৬ ও ৭), গিয়াদিন্ (মার্চ—১০) প্রভৃতি জায়গায় একের পর এক প্রতিবাদের ঢেউ ফেটে পড়ে। এইসব একরোখা প্রতিরোধ চলাকালীন স্কুল-কলেজ ছাত্ররা নুয়েন খান্‌কে উৎখাত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। দানাঙ্-এর জনৈক ছাত্র বলেন : "দিয়েমের কবরের ঘাস এখনো সবুজ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমরা এই ছোট্ট চারাগাছটিকে (খান্‌কে) মহীরুহে পরিণত হবার আগেই কেটে ফেলতে চাই।"

খান্-বিরোধী সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। ১৯৬৪ সালের ৮ই মার্চ, মার্কিণ প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাক্‌নামারার তৃতীয়বার সায়গনে আগমনকে কেন্দ্র করে, স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা—"আগ্রাসক সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্!" - এই শ্লোগান সামনে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। যতবার একজন ইয়াংকীকেও রাস্তায় দেখা গেছে, ততবারই তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছিলেন, "ম্যাক্‌নামারা দূর হও!",—"মার্কিনীরা দেশে ফিরে যাও!" এই সমস্ত বিক্ষোভ প্রত্যেকটি স্তরের সহরবাসীদের দৃঢ় সমর্থন লাভ করে।

১৯৬৪ সালের ৫ই মে আমেরিকানদের হাতে তিন জন ট্যাক্সি চালক নিহত হলে, আন্দোলন আরও গতিবেগ লাভ করে। হুয়েতে পুলিশ গুলি চালায়, ফলে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হন। ১৯৬৪ সালের ৯ই মে, একহাজারেরও বেশী স্কুল ও কলেজ ছাত্র স্বয়ং খান্ আয়োজিত একটি সভাকে, তারই কৃত অপরাধগুলির কঠোর নিন্দার এক মঞ্চে পরিণত করেন। বিশ্বাসঘাতক জেনারেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বিক্ষোভকারীরা এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন : "শুধুমাত্র দিয়েমের অপকর্মের সংযোগীদেরই যে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে হবে তা নয়; রক্তপিপাসু সমস্ত মার্কিন-দালালদেরও শাস্তি দিতে হবে।"

সায়গন-চোলোনে, 'ভিনাটেক্সকো' শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে এবং নুয়েন খান্ ও ক্যাবট লজ কর্তৃক স্থাপিত কেনেডির মূর্তি অপসারণের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ নুয়েন খানের বিরুদ্ধে পরিচালিত এই প্রচার আন্দোলন ১৯৬৪ সালের ৫ই মে থেকে আগষ্ট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অসংখ্য আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। এই সভাগুলিতে পুতুল নুয়েন খানের একনায়কতন্ত্রী শাসনের মুখোস উন্মোচিত করা হয় এবং তীব্রভাবে ধিক্কার জানানো হয়। ১৯৬৪ সালের ২২শে আগষ্টে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে স্বয়ং খান্‌কে (যে সে সময়ে কেপ সেন্ট জ্যাকুইস-এ আত্মগোপন করেছিল) সায়গনে উপস্থিত হয়ে তার কর্তৃত্ব ও বিশেষ অধিকার সম্পর্কে স্কুল ও কলেজ-ছাত্র প্রতিনিধিদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে : "কোন অধিকার বলে সে দেশের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং সনদ জারী করেছে?"[১৭]

সায়গন-চোলোনে, স্কুল কলেজ-ছাত্রদের সামনে রেখে ৩,০০,০০০ মানুষ রাস্তাদিয়ে মার্চ করে সোজা নুয়েন খানের প্রাসাদে প্রবেশ করেন। এবং কোয়াক্ থিত্রাং এর[১৮] প্রতি এক মিনিট নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর, তিনদিন আগে স্কুল-কলেজ ছাত্রদের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য খানকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে—এই দাবী করে তাঁরা একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। নুয়েন খান্ নিজে না এসে প্রেসিডেন্ট-দপ্তরের জনৈক মন্ত্রী গিয়েম জুয়ান হঙ্ কে পাঠায়। কিন্তু জনতা তাকে টিট্‌কিরি দিয়ে ভাগিয়ে দেন। **শেষ পর্যন্ত, জনতার কাছে নতি স্বীকার করে পুতুল বাহিনীর অধিনায়ক (নুয়েন খান—সঃ মঃ বীঃ) একটি খোলা গাড়ীতে দাঁড়িয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সবাইকার সামনে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়। "সামরিক একনায়কতন্ত্র ধ্বংস হোক!"—বিক্ষোভকারীদের এই ধ্বনির সাথে সাথে হাত তুলতে এবং "আমি নিজেও এর বিরুদ্ধে" চিৎকার করে বলতে বাধ্য হয় নুয়েন খান্।** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ) এর পর সে সভা থেকে চম্পট দেয়। পরের দিনই অর্থাৎ ২৬শে আগষ্ট নুয়েন খান্ '১৬ই আগষ্টের সনদ' নামের গণতন্ত্র-বিরোধী সনদটি, যা সে

১৬. দঃ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের দ্বিতীয় অধিবেশনের রাজনৈতিক রিপোর্ট।

১৭. রয়টার, ১৯, ৮, ৬৪।

১৮. দক্ষিণে "রিফিউজি" হিসাবে যাওয়া উত্তর ভিয়েতনামী ছাত্রী যিনি ১৯৬৪ সালের ২৫শে আগষ্ট সায়গনের একটি সভায় মার্কিন-দিয়েম চক্রের গুলিতে নিহত হন।

সারা দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, প্রত্যাহার করে নেয়।

এই একই দিনে (২৫শে আগষ্ট) হুয়েতে স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র সহরের অধিবাসীদের সহযোগিতায় কুড়ি মিনিটের জন্য 'হুয়ে বেতার কেন্দ্র' দখল করেন। বেতার মারফৎ তাঁরা নুয়েন খানের একনায়কতন্ত্রী শাসনকে ধিক্কার জানান।

এই ঘটনাগুলির ফলে, একদিকে যেমন সায়গন পুতুল প্রশাসন সাংঘাতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনই সহরের মানুষদের রাজনৈতিক বাহিনী, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলিকেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার কাজে, নিজেকে সক্ষম বলে প্রমাণিত করে।

সায়গন ও হুয়ে থেকে ভানান, মাইথো, ভিন্ লঙ্, বেনত্রে, কানথো, সকত্রাঙ, কোয়াঙ্গাই ইত্যাদি সমস্ত প্রদেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত প্রদেশেই স্কুল-কলেজ ছাত্ররা একের পর এক সভা ও বিক্ষোভ-প্রদর্শন অনুষ্ঠিত করেন।

সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের দিনগুলিতে জনগণের ব্যাপক অংশের এবং পুতুল বাহিনীর বহু সৈন্যের সমর্থন লাভ করে, ছাত্র-আন্দোলন আমেরিকানদের এক কানাগলিতে ঠেলে দেয় এবং সামরিক শাসকদের সরিয়ে 'ত্রান ভ্যান্ হুয়োঙ'-এর অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে।

ত্রান ভ্যান হুয়োঙ, শাসনভার হাতে পেয়েই, এক বাগাড়ম্বরপূর্ণ অভিযান শুরু করে। সে বলে: "জাতীয়-মুক্তি ও গঠন কার্য হলো সমগ্র জনগণের একটি দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো যুবক ও স্কুল-কলেজ ছাত্ররা"।[১৯] সে ছাত্রদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই মর্মে রাজী করাতে চেষ্টা করে যে, "ছাত্রদের সাধারণ সমিতির (General Association of students) উচিত কমিউনিষ্ট-বিরোধী ও নিরপেক্ষতা-বিরোধী কাজকর্মগুলিকে জোরদার করা এবং অসামরিক সরকারের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তোলা"........ তথাকথিত "সায়গনী ছাত্রদের সাধারণ সমিতি" আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু করে, যাতে "ছাত্ররা সরকারে কাছে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে পারেন।"

এ সমস্ত ফন্দীবাজী কাউকেই ধোঁকা দিতে পারেনি। যাঁদের পেছনে ইয়াংকী নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দশ বছরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেই স্কুল-কলেজ ছাত্রদের তো নয়ই। শত্রুর বাগাড়ম্বরের এইসব কায়দাগুলোকে, কিভাবে তারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হয় এবং কিভাবে এইসব বিতর্কের মধ্যে থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে বিপ্লবের স্বার্থানুকুল প্রস্তাবে রূপান্তরিত করতে হয়, তা' তাঁরা জানেন। তাঁরা, অধিক সংখ্যাতে, এইসব বিতর্কে যোগ দিলেন। ছাত্র-জনতার চাপে গৃহীত সমস্ত প্রস্তাবগুলি এক দ্বৈত চরিত্র ধারণ করলো। (নিম্নরেখ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ) একদিকে তাঁরা যেমন দাবী করলেন "কমিউনিজম্ ও নিরপেক্ষতাবাদকে রুখতে হলে, সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নতি বিধান করতে হবে," আবার অন্যদিকে তেমনি তাঁরা খুলে ধরলেন ত্রান ভ্যান হুয়োঙ-এর "অসামরিক সরকারের" আসল চেহারাটা, যা হলো "খান্-থো-দিয়েম বিহীন দিয়েম, থো ও খানের সরকার, একটি "সুস্পষ্টভাবে বাগাড়ম্বরপূর্ণ সরকার।"

একদিকে যখন "সায়গনী ছাত্রদের সাধারণ সমিতি" কর্তৃক আয়োজিত সভাগুলিতে গৃহীত দ্ব্যর্থক প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল ও পচাগলাদিকগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ছিল, অন্যদিকে তখন 'লিবারেশন ষ্টুডেন্টস্ অ্যাণ্ড পিউপিলস ইউনিয়নে'র নেতৃত্বে সমস্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামী স্কুলগুলি অভূতপূর্ব প্রচণ্ডতার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই আন্দোলনগুলি চলে।

১৯৬৪ সালের ২৫শে নভেম্বর সায়গন-চোলোনের স্কুল-কলেজ ছাত্রদের বিক্ষোভ-প্রদর্শনের সময় পুলিশ লে ভ্যান ন্গোক নামে একজন বালক সহ বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে হত্যা করে।

মুক্তিবাহিনী কর্তৃক অর্জিত সবচাইতে বৃহত্তর বিজয়গুলির ও শহরের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের উদ্দিপনাময় সংগ্রামের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৬৪ সালের ১০ই থেকে ২০শে ডিসেম্বরের (জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী) মধ্যে সায়গন-চোলোন, হুয়ে, দানাঙ্, ভায়নিন্, মাইথো, ভিন লঙ্, বেনত্রে, সোকট্রাঙ্, কানথো, বিন্দিন্ এবং কোয়াঙ্নামের প্রায় সমস্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় পথসভা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীদের এই অপ্রতিরোধ্য চাপে শিক্ষামন্ত্রী ফান্ তান্ চুক্ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ত্রান ভ্যান হুয়ঙ্কেও তার সাথে টেনে নামিয়ে আনে। এটাই ছিল "বেসামরিক সরকারের" প্রথম ফাটল।

সহরগুলিতে ছাত্রআন্দোলন সহ গণসংগ্রাম এতদূর ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে, টেইলারকেও আশ্চর্য হয়ে স্বীকার করতে হয় "বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েতনাম হলো একের পর এক ঘটে যাওয়া ভিন্ন ভিন্ন ৪৫টি যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ।"[২০] এই উক্তিটি প্রমাণ করে যে, সাম্রাজ্যবাদী ও দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলি একটি সামগ্রিক চেহারা লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্কুল-কলেজ ছাত্রদের আন্দোলনের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে, আমেরিকান সংবাদসংস্থা এ.পি. (২৯শে ডিসেম্বর)-কেও স্বীকার করতে হয় যে, এই আন্দোলন হল

১৯. দান চু (গণতন্ত্র), ৩. ১১. ৬৪(ঃ)।

২০. নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন; ২৭. ১২. ৬৪

মার্কিন, খান্‌ ও হুয়ঙ-বিরোধী' এক বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ....জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম, তার ১৯৬৪ সালের ১১ই ডিসেম্বরের প্লেনারী অধিবেশনে মন্তব্য করে : সহরাঞ্চলগুলির গণআন্দোলনের মধ্যে স্কুল ও কলেজ ছাত্রদের দেশপ্রেমিক আন্দোলন "তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, বিপ্লবের সাধারণ স্বার্থে তাঁরা তাঁদের রণনীতিগত ভূমিকা পালন করে চলেছেন।"

১৯৬৪ সাল চিহ্নিত হয়েছে, ম্যাক্‌নামারা-পরিকল্পনার মূলগত দেউলিয়াপনা আর দক্ষিণ ভিয়েতনামী বিপ্লবীদের অর্জিত মহান সব রণনীতিগত বিজয়ের মধ্য দিয়ে। "বিশেষ যুদ্ধ" আর মার্কিনীদের আগ্রাসননীতি নতুন করে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। স্কুল-কলেজ ছাত্ররা জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নেতৃত্বে শান্তি, নিরপেক্ষতা এবং জাতীয় পুনর্মিলনের সাধারণ সংগ্রামে নিজেদের গণসংগঠন ও রাজনৈতিক অবস্থানটিকে সুসংহত করতে যে বিপ্লবী উদ্দিপনা ও প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাঁদের অভিনন্দন।

ফরাসী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নয়টি বছর এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দশটি বছর, তাঁদেরকে ১৯৬৫ সালে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপযোগী বস্তুগত এবং নৈতিক উপকরণগুলি জুগিয়ে ছিল। এখন আর শহরগুলি ইয়াংকী সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীদের শেষ ঘাঁটি হিসাবে মোটেই নিরাপদ পশ্চাদ্‌ভূমি নয়। তাদের নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক শাসনের বিরুদ্ধে শহরের মানুষেরা ক্রমাগত চলতে থাকা একটি শক্তিশালী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

১৯৬৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী, সায়গনে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা একটি সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত করেন। জানুয়ারীর ২১শে থেকে ২৫শে তারিখের মধ্যে, পরপর বহু স্কুল, বাজার এবং কারখানাতে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং তথ্যকক্ষের (Information Hall) সম্মুখ ভাগের ক্ষতি সাধন করেন। শ্লোগান ওঠে, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।" "টেলর—তুমি নিপাত যাও।" "পুতুলরা নিপাত যাও" ইত্যাদি। সায়গন, দানাঙ্‌ আর হুয়ের থেকে আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য সহরগুলিতে। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে আরম্ভ হয়ে মার্চ মাসের শুরু পর্যন্ত তা' চলতে থাকে।

১৯৬৫ সালের ৩রা এপ্রিল হুয়েতে বৌদ্ধ ছাত্র নুয়েন হু তোয়ান-এর হত্যা, ৪ঠা এপ্রিল থেকে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত, বেশ কয়েকদিন ধরে স্থায়ী এক রাজনৈতিক অভিযানের জন্ম দেয়। হাজারে হাজারে স্কুল-কলেজ ছাত্র এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। এই রাজনৈতিক ঘটনার খবর সারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং ইতিমধ্যেই যারা মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল সেই পুতুলদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে।

ছয়মাসের মধ্যে (১৯৬৫ সালের প্রথমার্ধে) তিনটি সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয় : ফান হুয়ে কোয়াৎ কর্তৃক ত্রান ভ্যান হুয়ঙ্‌-এর অপসারণ; থাও-ফাটচক্র কর্তৃক ফান হুয়ে কোয়াৎকে সরাবার নিষ্ফল সামরিক অভ্যুত্থান এবং নুয়েন কাও কাই কর্তৃক ফান হুয়ে কোয়াতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। কিন্তু এক পুতুলকে সরিয়ে আর এক পুতুলকে বসালেও শাসনব্যবস্থার চরিত্র পাল্টায় না, ক্রমশঃই তা আগের চাইতে বেশী প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংকট জর্জরিত হয়ে ওঠে। শাসনভার হাতে পাওয়ার অতিঅল্পদিনের মধ্যেই, আমেরিকানদের নির্দেশে কাইকে ১৬০,০০০ জনকে জবরদস্তি সৈন্যদলে তালিকাভুক্ত করার কাজে নামতে হয়। এই কাজে তাকে যুবকদের কাছ থেকে দৃঢ় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

১৯৬৫ সালের আগষ্টের শেষ দিকে, যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর তার পদলেহীরা শোচনীয় সব পরাজয়ে বিধ্বস্ত, বিশেষতঃ ত্রাণ্ডি বো তে এবং যখন তাদের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বগুলি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে—ক্যাবট লজ টেলরকে সরিয়ে দিয়েছে, কাই ও থিউ'র বিবাদ চলছে ক্যাবট লজের সাথে, যে সব রকমের চেষ্টা করছে তাদেরকে সরিয়ে দিতে; তখন আগ্রাসকদের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়ে, দানাঙ্‌ ও সায়গনে স্কুল-কলেজ ছাত্ররা তাঁদের সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান।

বৌদ্ধ গণ-হত্যার দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে হুয়েতে, ২০ থেকে ২২শে আগষ্ট-এর মধ্যে, ২,০০০ স্কুল-কলেজ ছাত্র ও যুবক সহরের অন্যান্য অধিবাসীদের সাথে অবিরাম পথ-বিক্ষোভে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালের ২২শে আগষ্ট হুয়ের ছাত্ররা "সামরিক সরকারের (থিউ-কাই) উৎখাতের দাবি করে, একটি ইস্তেহার প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, আমেরিকান সংবাদসংস্থা ইউ. পি আই. বলে যে, ছাত্রদের ক্রিয়াকর্মের একটি সমগ্র ধারার পরিণতি হলো এইঘোষণাপত্র। ২৬শে আগষ্ট পর্যন্ত এই আন্দোলন চলে। ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা রয়টার, তার পক্ষ থেকে মন্তব্য করে, "বর্তমান সভাগুলির সাথে সেই সব সভাগুলির মিল রয়েছে, যেগুলি অতীতে নুয়েন খান এবং ত্রান ভ্যান হুয়ঙ্‌ সরকারের পতন ঘটিয়েছিল।"

হুয়ের বিক্ষোভ প্রদর্শনগুলি কোয়াঙ্‌ ত্রি, দানাং, সায়গন ইত্যাদি অন্যান্য অঞ্চল থেকে যথেষ্ট উৎসাহপূর্ণ সাড়া পায়। "মার্কিন সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েতনাম ছাড়ো!", "থিউ-কাই সরকার নিপাত যাক!" ও "জবরদস্তি সৈন্যদলে ঢোকানোর নীতি নিপাত যাক!"—ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে, ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় মার্চ করে চলেন। পাল্টা ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করতে, থিউ-কাই চক্র দালাত'এ "গোপন সভা"

করতে হয়। "মার্কিন সেনাবাহিনীর অফিসাররা, তাদের লোকজনদের বিক্ষোভের এলাকা থেকে দূরে থাকবার জন্ম আদেশ দেয়" ( ইউ. পি. আই. ) স্কুল-কলেজের বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি, এই ভাবে, নিপীড়ক-শক্তিকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

শক্তি ও সম্ভাবনার দিক থেকে এই আন্দোলন, বিশেষতঃ ১৯৬৫'র ২৯শে ও ৩০শে আগষ্ট, আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

২৯শে আগষ্ট. হুয়ের ৪,০০০ স্কুল-কলেজ ছাত্র ও যুবক অন্তান্ত নাগরিকদের সাথে খিউ-কাই চক্রের উৎথাত দাবি করে অবিরাম বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই আন্দোলনের সমর্থনে সারা সহরের রিক্সা-চালকরা ধর্মঘট করেন।

দানাং-এ ২৯শে আগষ্টের সন্ধ্যায় বহু যুবক ও ছাত্র রিক্সা করে সহরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে জনগণকে হরতালে যোগ দেবার জন্ত আহ্বান জানান। পরের দিন সকালেও ৪,০০০-এরও বেশী স্কুল-ছাত্র ও অন্তান্তরা ধর্মঘটে যোগ দেন। ইতিমধ্যে সায়গনের স্কুল-কলেজ ছাত্ররা খিউ-কাই চক্রের "জবরদস্তি সৈন্তদলে ঢোকানোর আইন" ও ক্যাবট লজ কর্তৃক গৃহীত যুদ্ধ প্রচেষ্টাগুলির বিরুদ্ধে অসংখ্য সভা ও বিক্ষোভ সংগঠিত করেন।

আমেরিকানদের বেতনভোগী রাজনীতিজ্ঞরা ( বৌদ্ধ-পুরোহিত খিচ্ টাম চাউ, যাদের একজন ) ছাত্র-সংগ্রামকে, তাদের নিজেদের স্বার্থানুকূলে ঘোরাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আন্দোলন যে ক্রমশঃই বেড়ে চলবে, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিই নেই, যা দক্ষিণ ভিয়েতনামী ছাত্রদের স্বদেশপ্রেমিক এবং বিপ্লবী অগ্নিশিখাকে নিবিয়ে দিতে পারে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

তো মিন্ এাঙ্

প্রবন্ধটি হ্যানয় থেকে প্রকাশিত 'ভিয়েতনাম স্টাডিজ'-এর ৮ম সংখ্যায় মুদ্রিত 'দি স্টুডেন্টস এ্যাণ্ড পিউপিল্‌স্ স্ট্রাগল' প্রবন্ধের অনুবাদ। —সঃ মঃ বীঃ।

# চিঠিপত্র

**মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নয়**

## লাল সবুজের দেশে ( লেখকের বক্তব্য )

বীক্ষণের তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যার 'চিঠি-পত্র' বিভাগে 'লাল সবুজের দেশে' প্রসঙ্গে কয়েকটি সমালোচনা পড়লাম। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সাথে "কল্পনা-প্রসূত" এই বিশেষণ দিয়ে একজন তো লেখাটির সত্যতা সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠিয়েছেন! কাজেই অন্ত প্রশ্নে যাবার আগে জানিয়ে রাখি—গ্রামটির নাম গোয়াসী। পূর্ণিয়া শহর থেকে মাত্র ছ'মাইল দূরে অবস্থিত এই গ্রামে গিয়ে যে কেউ 'লাল সবুজের দেশে'র তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করে আসতে পারেন।

সাধারণভাবে আরো একটি দিকে সমালোচক বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—লেখাটি কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়। পূর্ণিয়ায় গিয়ে সেখানকার বাস্তব অবস্থা আর নিজের সঞ্চিত কেতাবী ধারণার মধ্যে যে অদ্ভুত গরমিল আমার চোখে ধরা পড়ে, তরুণ ছাত্রবন্ধুদের সাথে তা ভাগ করে নেওয়াই ছিল, প্রবন্ধটির একমাত্র উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে, ভয়াবহ যে বাস্তব অবস্থা আমার জ্ঞানচক্ষুকে খুলে দিয়েছে, শুধুমাত্র তার বর্ণনাই আমি প্রবন্ধটিতে করেছি। কিন্তু সমালোচক বন্ধুরা প্রচলিত রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতেই বাস্তব ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে চেয়েছেন।

সমালোচক বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে এবং পাঠক বন্ধুদের বিচারের জন্ত, 'লাল সবুজের দেশে'তে বর্ণিত ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা নিচে রাখছি।

(১) গোয়াসী গ্রামের 'সবুজ বিপ্লব' সরকারের খয়রাতী সাহায্যের ফলে 'সম্ভব' হয়েছে। একইরকমভাবে সরকার একশ' জন বেকার ডাক্তারকে চাকরী দিয়েছেন, হাজার পাঁচেক আদিবাসীকে ঘর তৈরী করে দিয়েছেন। বিরাট দেশের বিরাট সমস্তার তুলনায় এইগুলো কিছুই নয়। কিন্তু সরকারী প্রচারযন্ত্র ছিটে ফোঁটা এই ঘটনাগুলোকেই, সাড়ম্বরে সরকারের 'সদাশয়তা', 'সমাজবাদী চরিত্র' ইত্যাদি প্রমাণের জন্ত ব্যবহার করে থাকে। নিজের শ্রেণীগত অবস্থান থেকেই, পূর্ণিয়ার ঐ এস.ডি.ও. আমাদেরকে, অনেকটা বিদেশী ট্যুরিস্টকে কোলকাতা দেখাবো বলে চৌরঙ্গী দেখানোর মত, গোয়াসী গ্রাম দেখিয়েই এই ধরণের প্রচারের সত্যতার সাক্ষী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা

প্রথম থেকেই প্রচারের এই কৌশলটার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলাম বলেই, শুধুমাত্র 'গোয়াসী' দেখেই চলে আসিনি। এবং চলে যে আসিনি তার প্রমান—'লাল সবুজের দেশে'তে বিশদভাবেই পুর্ণিয়া জেলার 'সবুজ বিপ্লবে'র নগণ্যতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জমিদারের বর্বরতা ও প্রাধান্যের নজির ছড়িয়ে আছে। কাজেই, তাকে 'কলকাতা দেখবো' বলে 'চৌরঙ্গী দেখার' মতো ( শুদ্ধশীল মহাস্থির চিঠি—চতুর্থ সংখ্যা ) অপবাদ দেওয়া যায় কি ? গোয়াসী গ্রামের সত্য ঘটনার বর্ণনাই কি (শুদ্ধশীল মহাস্থির) 'অসঙ্গতি' এবং 'বিভ্রান্তির' কারণ ?

(২) 'জনৈক বন্ধু' ( তৃতীয় সংখ্যা ) মিস্ ফ্র্যাঙ্কেলের পরিচয়টি ঠিক দিলেও, চিন্তাধারার ব্যাপারে যেন তাঁরই নির্দেশিত পথ মেনে নিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকের প্রতিনিধি মিস্ ফ্র্যাঙ্কেলরা, 'সবুজ বিপ্লবে' শুধুমাত্র একটা জিনিসই খোঁজেন—আমেরিকার শোষনের প্রয়োজনীয় দালাল মধ্যচাষীটির উত্থান হচ্ছে কি না। 'জনৈক বন্ধু'ও, মিস্ ফ্র্যাঙ্কেলদের মতই, 'মধ্য কৃষক আসছে কি না' এই প্রশ্নকেই 'সবুজ বিপ্লবে'র প্রধান প্রশ্ন হিসাবে দেখেছেন। আমার মতে, এই প্রশ্নটা আমাদের কাছে গৌণ। একটু আলোচনা করা যাক।

'সবুজ বিপ্লবে'র রাজনৈতিক কারণ সম্বন্ধে, সহজ করে, বলা যায় যে শোষক শ্রেণীর ধূর্ততর অংশ, যেমন মার্কিন বিশেষজ্ঞরা অথবা দেশী দালাল বুর্জোয়ার প্রতিনিধিরা বোঝে যে, কুরসেলারাজের একার বারো হাজার একর জমিতে কয়েকশ' ছোট ছোট মালিক থাকলে, এক জনের জায়গায় কয়েকশ' দালাল পাওয়া যেত। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও, ক্রয়ক্ষমতা একের জায়গায় একশ জনের হাতে ছড়িয়ে পড়লে, মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের বাজারের সমস্যা কিছুটা অন্তত: সাময়িক-ভাবে সমাধান হত। এই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণকেই বইয়ের ভাষায় বলে 'মধ্য চাষীর শোষণভিত্তি স্থাপন' করা। অনেকেই জানেন, 'সবুজ বিপ্লবে'র মত 'ভূমি সংস্কার'ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের একটি প্রিয় বিষয়। এর পিছনেও ঐ একই কারণ। মিস্ ফ্র্যাংকেলরা তাই শুধু এটুকুই খোঁজেন—'মধ্য চাষীটিকে পাওয়া যাচ্ছে কিনা', 'সবুজ বিপ্লব' ইত্যাদির ফলাফল আশানুরূপ হচ্ছে কি না।

তাঁরা তাঁদের কাজ করুন—আমরা আরেকটু তলিয়ে দেখি। একটু ভাবলেই বোঝা যায় এর মধ্যেও আছে নতুন এবং পুরানো ধরনের শোষকের একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কুরসেলারাজের মত জমিদাররা কি 'সবুজ বিপ্লব' চায়, না চাইতে পারে ? অন্যদিকে আমরা আগেই দেখেছি, শোষকবর্গের এক অংশ নিজেদের স্বার্থেই এটা চায়। কিন্তু এদের চরিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে এদের দোদুল্যমানতা। এরা বিশেষ বিশেষ 'সংস্কারমূলক' কাজ সম্বন্ধে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু করতে গিয়ে যখন অসুবিধা দেখা দেয়, তখন কাজগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে পুরানো অবস্থাতেই ফিরে যায়। কাজেই এদের হাতে 'সবুজ বিপ্লবে'র মত কাজ কি ভাবে রূপায়িত হতে পারে ?

আমাদের পরিচিত এস. ডি. ও. টি 'সবুজ বিপ্লব' আনতে আগ্রহী এবং শোষকশ্রেণীর ধূর্ততর অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি, এমনকি, সরকারী খয়রাতী সাহায্য দিয়েও চাষীদের 'সাহায্য' করতে উৎসুক। কিন্তু এরই ফলে, জনতা নিজের অধিকার বুঝে নিতে এগিয়ে আসছে। যেমন এসেছে, খেদলীচকের মুশাহারেরা। এরপর দোদুল্যমান শাসকশ্রেণী নিজেদের গুটিয়ে নেবে, এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, আমরা পুর্ণিয়া থেকে ফেরার পরই এ ঘটনাটা ঘটেছে। 'ঝামেলা করনেওয়ালা' পুর্ণিয়ার ঐ এস. ডি. ও. কে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। তারই সঙ্গে পুর্ণিয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিভিসনাল কমিশনারকেও বদলি করে দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁরা এই এস. ডি. ও.টিকে 'উৎসাহিত করতেন'। মোটামুটি এই হচ্ছে সরকারী 'সবুজ বিপ্লবে'র দৌড়।

আমার মতে, বিকাশের এই নিয়মটাই 'সবুজ বিপ্লবে'র মুখ্য প্রশ্ন। 'লাল সবুজের দেশে'তে, তাই, এটাকেই আমি যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। 'মধ্য কৃষক' কি করে 'আসে', দু'এক কথায়ই তা বলা যায়। ঐ 'উৎসাহী' এস. ডি. ও.-র জায়গায় নতুন যিনি আসবেন, তিনি কৃষকদের পাওয়া প্রায় সব সুবিধাই তুলে নেবেন। সামনের বছর গোয়াসীর কৃষকরাও, অন্যান্য এলাকার কৃষকদের মতই, বীজ, সার ইত্যাদি পাবেন না। এর ধাক্কাটা শুধুমাত্র ঐ পচিশ একরের চাষী এবং যাঁদের বাৎসরিক আয় অন্তত: ২০/৩০ হাজার টাকা, তারাই সামলাতে পারবেন ; একেবারে ছোট কৃষকরা আগের অবস্থায়ই ফিরে যাবেন। এরপর মিস্ ফ্র্যাঙ্কেলরা আবার বই লিখবেন —'মধ্য কৃষকরাই সবুজ বিপ্লবের ফলে লাভবান হচ্ছে', ইত্যাদি।

(৩) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো আর তাদের ভাড়াটে সমাজ-বিজ্ঞানীরা আজ পৃথিবী জুড়েই প্রচার চালাচ্ছে—অনুন্নত দেশগুলোর খাদ্য সমস্যার প্রধান কারণ তাদের 'অত্যধিক' জনসংখ্যা, কাজের ব্যাপারে তাদের 'আলস্য'। এগুলো যে কত বড় ধাপ্পা, তা বোঝাবার জন্যই গোয়াসী গ্রামের চিত্র আমি বিশদভাবে এঁকেছিলাম। আজ

উন্নত বিজ্ঞানের প্রয়োগে পঁচিশ ডেসিমেল জমি একটা গোটা পরিবারের খাদ্য সংস্থান করতে পারে। কৃষকের 'কুসংস্কার', 'শ্রম বিমুখ' চরিত্র, 'গাঁজা-ভাঙে'র নেশা—এসবগুলোই যে দারিদ্রের সাথে যুক্ত, এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি যে এর দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন করতে পারে, গোয়ালসী গ্রামে তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ভুল হতো, যদি আমি বিজ্ঞানের জয়গান করতে গিয়ে, সেটাকে 'সরকারের জয়গানে'র সাথে মিলিয়ে দিতাম। কিন্তু 'লাল সবুজের দেশে'র কোথাও তো তা করা হয়নি!

প্রসঙ্গতঃ 'সবুজ বিপ্লব' বা ঐ জাতীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 'ভূমি সংস্কার' সম্বন্ধে ভিয়েতনামী দেশপ্রেমিকরা কি ভাবেন, উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"নয়া-উপনিবেশবাদ, পুরনো উপনিবেশবাদের মতোই, গ্রামের দিকে 'অবস্থা ঠিক' রাখতে সব সময়েই একাধিকারী ভূ-স্বামী এবং তাদের রাজনৈতিক শক্তির উপর নজর দেয়। কোন কোন অবস্থায় দেশীয় সামন্তশ্রেণীর অস্থায়ীত্ব অনুভব করে ওয়াশিংটন 'ভূমিসংস্কার' করতে উদ্যোগী হয়েছে, ভূমিহীন কৃষকের স্বার্থে নয়, বৃহত্তর সামাজিক ভিত্তি এবং তুলনামূলকভাবে কম অনুন্নত ধরনের অর্থনৈতিক শোষণের অধিকারী এক মধ্য আয়তনের ভূ-স্বামী শ্রেণী তৈরী করতে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা সব সময়েই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ বড় জমিদার এবং ভূ-স্বামীরা সব সময়েই আমেরিকার উপস্থিতির শ্রেষ্ঠ রক্ষক।" ('ভিয়েতনাম স্ট্যাডিজ', নং ২৩, ১৯৭০, পৃঃ ৪৯)

অর্থাৎ অবস্থাটা এই যে, বড় জমিদারদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে 'সবুজ বিপ্লব' ইত্যাদি হতেই পারে না। কাজেই, মিস্ ফ্র্যাঙ্কেলদের মতো—'হলে কি হবে', 'কোন শ্রেণী আসবে' এই প্রশ্নের বিচারকে আমরা অগ্রাধিকার দেব কেন?

শুদ্ধশীল মহান্তির "তথাকথিত বাঁশের নলকূপ" সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলাম। জানতে পারলাম, কোশী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় সেখানকার জলের স্তর খুব উঁচু। ফলে সামান্য খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। এবং বাঁশের নলকূপ কাজ করে। সাথে সাথে এও জানতে পারলাম—এই সেচ পদ্ধতি মেদিনীপুর জেলার কোথাও কোথাও না কি আছে, খুব সম্ভবতঃ কাঁথীর কাছে নদীর চরে। কেউ খোঁজ নিয়ে জানালে খুবই খুশী হব। শুদ্ধশীল মহান্তিকে ধন্যবাদ। কারণ এ সম্বন্ধে খোঁজ নিতে গিয়েই খেয়াল হল যে, যেখানে জল এত সহজে পাওয়া যায়, সেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে 'কোশী সেচ প্রকল্প' করার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

বন্ধুদের সমালোচনাগুলোর যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনীতির প্রথম পাঠ নিতে গিয়ে, সবকিছুই যে সঠিকভাবে বুঝেছি, এমন কথা বলতে পারি না। এই কারণে আরও সমালোচনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

—নবীন সেন

## জনৈক শুভার্থী বন্ধুর কিছু পরামর্শ ও সমালোচনা

দূরে থাকলেও এ'পর্যন্ত প্রায় সব ক'টি সংখ্যা ও সংকলনের 'বীক্ষণ' পড়ার সুযোগ ঘটেছে।

না;—শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ভালোলাগার, মন্দলাগার কথা জানাবো না, বা নগদ একটা ধন্যবাদ জানাতেও এ চিঠি নয়, কেননা 'বীক্ষণ' তার স্বকীয় গুণে ওসব ধরনের মামুলি সমালোচনার অবকাশ না দিয়ে আমাদের অনেকের ভালোবাসাকে স্বতঃস্ফূর্ত এক দায়িত্ববোধের প্রেরণায় রূপান্তরিত করেছে। তাই ভালো-মন্দ, ভুল-নির্ভুলের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কি করে আরও ভালো ভাবে, আরও সঠিক ভাবে এর বিকাশ ঘটানো যায়, তার জন্য উপযুক্ত সবরকমের বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা ও পরামর্শের উপর নজর দেওয়া দরকার।

পত্রিকাটির যে কোন শুভার্থী বন্ধুমাত্রেই চাইবেন, এর জনপ্রিয়তা ও মানোন্নয়ন। এই প্রসঙ্গে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই।

'বীক্ষণ' প্রধানতঃ যাদের জন্য সেই কিশোর-যুব-ছাত্র সমাজের বেশ বড় একটা অংশকেই ছাত্র জীবনের দীর্ঘ পথে দু'এক পা ফেলেই বিদায় নিতে হয়—সামাজিক ও আর্থিক নিপীড়নের শিকার হয়ে। কারণ এ'কথাটা আজ আর কারও নিশ্চয়ই অজানা নেই যে, আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে 'শিক্ষিত' হওয়াটা একটা বিশেষ আর্থিক অবস্থার সর্তসাপেক্ষ। আজকের এই যন্ত্রনাময় অত্যন্ত জরুরী পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল সংস্কৃতির স্বাদ থেকে বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া অথচ আগ্রহী এই রকম অনেক অনেক বন্ধুদের কাছে 'বীক্ষণ' পৌঁছয় না বা পৌঁছলেও তা তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারে নি।

এখন প্রশ্ন হলো, অপেক্ষাকৃত উঁচু সাংস্কৃতিক চর্চায় এগিয়ে থাকা কিছু আগ্রহীদের ভালোলাগার উপর বেশী জোর দেওয়া হবে, না পিছিয়ে পড়া প্রগতিশীল সংস্কৃতির নতুন স্বাদ পেতে উন্মুখ এক বিরাট সংখ্যক সাধারণ আগ্রহী বন্ধুদের ভালোলাগার উপর বেশী জোর দেওয়া হবে? যদি 'বীক্ষণের' প্রায় প্রতিটি পাতায়ই শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ঘনিষ্ঠ হওয়ার আন্তরিক আবেদন শুধু ছাপার হরফে না রেখে, সেটিকে

বাস্তবায়িত করতে হয় তবে, তাকে অবশ্যই দ্বিতীয়টির জন্য সক্রিয় হতে হবে। যাতে পাঠকদের ব্যাপক অংশটি সহজে এবং তাড়াতাড়ি 'বীক্ষণ'কে স্বচ্ছভাবে বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারেন। তবেই 'বীক্ষণ' তার বন্ধুদের মনমেজাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করে একাত্ম হতে পারবে। তা না হলে শুধু একতরফা মানোন্নয়নের ঝোঁক নেহাৎই বুদ্ধিজীবী কেন্দ্রিক প্রগতিপনা' দেখানোর বিলাসিতায় পরিণত হবে।

'বীক্ষণ' পড়ে আগ্রহ বেড়েছে এমন কিছু বন্ধুদের সাথে পত্রিকাটির বিভিন্ন লেখা সম্পর্কে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তে এসেছি সেটা আমাদের অনেকেরই একটা আন্তরিক আবেদন হিসাবে জানাবার প্রয়োজন মনে করি। ইতিহাসের প্রবন্ধগুলি একেবারে অত সংক্ষিপ্ত করে ছেড়ে না দিয়ে আরও পুংখানুপুংখভাবে স্পষ্ট করে তুলে ধরলে খুব ভালো হয়।

আমাদের এই 'কেতাবী' শিক্ষা-সংস্কৃতির 'ধারক ও বাহক' হিসাবে যেসব 'মনীষী'দের আমরা ছোটবেলা থেকে 'স্মরণীয়-বরণীয়'বলে পরিচয় পেয়ে থাকি, শ্রদ্ধার যোগ্য বলে যাঁদের উপর একটা ভালো ধারণা থাকে, জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁদের সত্যিকারের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ 'বীক্ষণে'র পাতায় প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

'বীক্ষণে'র মাধ্যমে আমার মতই আরও সব আগ্রহী বন্ধুদের বলি —শুধু তফাতে থেকে নিষ্ক্রিয় মন্তব্য করে নয়, আসুন, কাছে বা দূরে যে যেখানেই থাকি না কেন, আজকের এই হতাশা-জর্জর দিকভ্রান্ত পরিস্থিতিতে বীক্ষণে'র মত সাথীকে যখন কাছে পেয়েছি তখন আমরা সবাই মিলে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করি, যাতে আমাদের মুখপত্রটি সফল প্রচেষ্টার সঙ্গে অব্যাহত ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। শিক্ষা ও সমাজ-জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্যে কি বাস্তব কারণ কাজ করছে সেগুলোকে নির্ভুল ভাবে ধরিয়ে দিক, নতুনতর অভিজ্ঞতার আঁচে পোড় খাওয়া আমাদের ধারণাগুলোকে দো'টানার সমস্ত সংশয় পার করে সঠিক আদর্শের আরও কাছাকাছি এগিয়ে যেতে সাহায্য করুক—'বীক্ষণে'র কাছে এই কামনা করেই শেষ করছি।

অরবিন্দ দেশমুখ
॥ বাঁকুড়া ॥

স্থানাভাবের দরুণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে পাওয়া বেশ কিছু চিঠিপত্র এই সংকলনে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। আগামী সংকলনে এগুলি প্রকাশিত হবে। —সঃ মঃ বীঃ

## 'বীক্ষণে'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে

# একটি আবেদন

প্রিয় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা,

'বীক্ষণে'র মত একটি হাতিয়ারকে অব্যাহতভাবে চালনা করার ক্ষেত্রে অর্থের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে একথা বলাই বাহুল্য। আর 'বীক্ষণে'র ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই এই ভূমিকা খুব স্বাভাবিক কারণেই সংকটের চেহারা নিয়ে দেখা দিচ্ছে। 'বীক্ষণে'র ধরণের পত্রিকাগুলি যে, হয় 'সূতিকা-গৃহে'ই মারা যায়, নয়তো তাদের ঘোষিত সময়-সীমার বহুপরে মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা দিয়ে 'আমি বেঁচে আছি' কেবল এই কথাটি পাঠক পাঠিকাদের জানিয়ে দেয় তার একটি বড় কারণ এই আর্থিক সংকট। 'বীক্ষণে'র শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন 'বীক্ষণ'র আর্থিক সমস্যাটিকে নিজেদের সমস্যা হিসাবে দেখেন এবং এই কথাটি মনে রাখেন যে, বীক্ষণ'র প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোন সাহায্যই অতি সামান্য নয় বা কোন সাহায্যই প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়।

—সঃ মঃ বীঃ

## ত্রুটি সংশোধন

অসতর্কতাবশতঃ. গত সংকলন (আগষ্ট'৭৩) এবং বর্তমান সংকলনে (বিশেষ শারদ সংকলন'৭৩) কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি থেকে গেছে। সেগুলি নিম্নরূপ :

॥ আগষ্ট সংকলন ॥

(১) **'দ্বিতীয় হুগলী সেতু : ভারতীয় স্বনির্ভরতার একটি আদর্শ নমুনা'** রচনাটিতে তথ্যের সূত্রগুলি দেওয়া হয়নি। সেগুলি হ'ল : (ক) 'সপ্তাহ'—সংখ্যা ৩৯, ৪ঠা মে, '৭৩; (খ) 'বাংলার নদনদী ও পরিকল্পনা' গ্রন্থের লেখক এবং ডি. ভি. সি'র ভূতপূর্ব ইঞ্জিনীয়ার ও খ্যাতনামা নদী-বিশেষজ্ঞ শ্রীকপিল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে মৌখিক আলোচনা।

(২) **পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ'** বিভাগের কয়েকটি তথ্যের সূত্র দেওয়া হয়নি। সেগুলি হ'ল : "স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী"—[ স্টেটস্‌ম্যান, ১৬.১২.৭২ ]; "স্বাধীনতা বনাম বৈদেশিক ঋণ"—[ স্টেটস্‌ম্যান, ১১.২.৭২ ]; এবং "'স্ব-নির্ভর' শিল্পোৎপাদনের পথে"—[ স্টেটস্‌ম্যান, ২০.২.৭৩ ( ফ্রন্টিয়ার ৩০ জুন'৭৩ থেকে উদ্ধৃত ) ]

বিশেষ শারদ সংকলন

৪২ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৪র্থ অনুচ্ছেদের ১ম লাইনটি হ'ল—"তারপর উনবিংশ শতাব্দীর ৬০ দশকে...."। লাইনটিকে পড়তে হবে—"তারপর বিংশ শতাব্দীর ৬০ দশকে........।"

## ঠিকানা পরিবর্তন

এখন থেকে ৬৯, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, কলিঃ-১২'র পরিবর্তে 'বীক্ষণে'র যোগাযোগের ঠিকানা হ'ল—

**'বীক্ষণ কার্যালয়'**
**৫৯/সি, শম্ভুবাবু লেন,**
**কলিকাতা-১৪**

## ত্রুটি সংশোধন

পঁচিশ পৃষ্ঠার রচনাটির শিরোনামটি হবে—"**প্রতিবেশী চীন**/চীন-প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসু ও শ্রীমতী ইন্দিরা বসুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার।" ।

## কৈফিয়ত

স্থানাভাবে '**দর্শন প্রসঙ্গে**' ধারাবাহিক রচনাটি এই সংখ্যায় দিতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত। আগামী সংখ্যায় এটি অবশ্যই থাকবে।

॥ সঃ মঃ বীঃ ॥

## সূচী



'সম্পাদকমণ্ডলী—বীক্ষণে'র পক্ষে প্রদীপ মুখার্জী কর্তৃক 'বীক্ষণ কার্যালয়'—৫৯/সি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত ও ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

**দাম—এক টাকা**

# 'বীক্ষণে'র সভ্য হোন

চাঁদার হার :

এক বছর : ১২ টাকা

ছয় মাস : ৬ টাকা

- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- রেজিস্ট্রির জন্য অতিরিক্ত খরচ না দিলে পত্রিকা বুক-পোষ্ট করে পাঠান হয়।

### সভ্য আবেদন-পত্র

প্রদীপ মুখার্জী,
'বীক্ষণ কার্যালয়',
৫৯/সি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪।

আমি এক বছর/ছয় মাস-এর জন্য 'বীক্ষণে'র সভ্য হ'তে চাই। সভ্য চাঁদা বাবদ............টাকা মনি অর্ডার/বাহক মারফত পাঠালাম। ইতি—

নাম.......................................................................................

ঠিকানা

## 'বীক্ষণে'র
## নবম সংকলন
## ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

### সম্ভাব্য সূচী

**আকুপাংচার :** চীন-প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

**সরকারী ভূমি-সংস্কার : কথায় ও কাজে** ( একটি সেমিনারের রিপোর্ট )

**সাঁওতাল বিদ্রোহ**

**দর্শন প্রসঙ্গে—২**

**ডাঃ নরম্যান বেথুন**

**শৈশব**

**কবিতা**

**নিয়মিত বিভাগ**

## ॥নিয়মাবলী॥

- **প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 'বীক্ষণ' বেরুবে।**

- **'বীক্ষণে'র সমস্ত বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ, সুস্থ এবং বলিষ্ঠ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য রচনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।**

  লেখা পাঠানোর সময় লেখক-লেখিকারা, 'বীক্ষণ' প্রধানতঃ যাঁদের জন্য সেই কিশোর-যুব-ছাত্র সমাজের কথা মনে রেখে লেখা পাঠাবেন বলে আমরা মনে করি।

- 'বীক্ষণে'র পাঠক-পাঠিকারা আশাকরি এ ব্যাপারে একমত হবেন যে শুধু বিষয়বস্তুই নয়, রচনার প্রকাশভঙ্গীও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচ্য। প্রকাশভঙ্গী যত সরল হয় ততই ভালো। কিন্তু সাথে সাথে তাকে প্রাণবন্তও হতে হবে। সরল করতে গিয়ে যেন তা শ্লোগানধর্মী হয়ে না পড়ে

  'বীক্ষণে'র প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে ও কিশোর-যুব-ছাত্র সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপারে পরামর্শ, মতামত-এসবের জন্যও আমরা আবেদন রাখছি। এগুলি 'চিঠিপত্র' বিভাগে প্রকাশিত হবে।

- সমস্ত ধরণের রচনাই কাগজের এক পৃষ্ঠায়, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখে পাঠানোর জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

- উপযুক্ত ডাকটিকিট সহকারে পাঠালে অমনোনীত রচনা অমনোনীত হবার কারণ দেখিয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে।

- 'বীক্ষণ' সম্পর্কে 'বীক্ষণে'র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা—এঁদের মতামতের জন্যও আমরা সাদর-আহ্বান রাখছি

- 'আমাদের কথা' বিভাগটি ছাড়া অন্য রচনাগুলিতে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব রচনাকারীদের।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

'বীক্ষণ কার্যালয়'
৫৯/সি, শম্ভুবাবু লেন,
ক'লকাতা-১৪

**সম্পাদকমণ্ডলী ॥ বীক্ষণ**

# থাইল্যাণ্ডের সংগ্রামী ছাত্র জিন্দাবাদ !

অত্যাচার থেকে অশ্রু, অশ্রুর থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে বিদ্রোহ।

অগণিত মানুষের রক্ত-ঘাম ও স্বপ্নকে যারা লালসার আগুনে ঝলসে নিজেদের পাশবিক ক্ষুধা মেটায়, শান্তি-সাম্য ও মৈত্রীর এক বেহেস্ত্ এই মাটির পৃথিবীতে গড়ে তুলতে দৃঢ়-সংকল্প অভিযাত্রী মানুষদের পায়ে যারা দাসত্বের শৃংখল পরিয়ে রাখতে চায়, তাদের কল্প-সৌধ জনগণের বিদ্রোহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—এটাই ইতিহাসের শাশ্বত শিক্ষা। সত্য ও ন্যায়ের এই সংগ্রামে সামিল হন লাখো জনতা, মেহনতী মানুষের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ান যুব-ছাত্র, আত্ম-বিস্মৃতির গহ্বর থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসেন সৎ বুদ্ধিজীবী। মিলন হয় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার। শুরু হয় জীবনের—যৌবনের গান। বিদ্রোহ হয়ে ওঠে জনতার মহান উৎসব।

ইতিহাসের সরণীতে বহুবার এই ছবিটি ভেসে উঠেছে,—যেখানে তাঁদের প্রিয়তম সহযোদ্ধাদের হাতে রক্তের রাখী পরিয়ে দিচ্ছেন যুব-ছাত্ররা। নিপীড়নকারীদের কারাগারে বন্দী—বন্ধু ও দেশপ্রেমিক সহযোদ্ধাদের মুক্তির দাবিতে ফুঁসে উঠেছে ছাত্র-মিছিল। মিলিত কণ্ঠের বজ্র-নির্ঘোষে ভেঙে চৌচির হয়েছে বন্দীশালার প্রাচীর। পরজীবী শাসকগোষ্ঠীর নির্মম থাবা থেকে ছিনিয়ে এনেছেন তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের। এই সত্যটিরই নবতম রূপায়ণ ঘটেছে সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডে।

সুদূর অতীত থেকে বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিনিময়ের সৌহার্দ্র-বন্ধনে বাঁধা দুটি দেশ—ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্র-মেখলা থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ। ভারতেরই মতো, সুপ্রাচীন উন্নত সভ্যতার অধিকারী এই দেশটির ওপর বারবার পড়েছে বিদেশী শক্তির লালসাময় দৃষ্টি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়াকে নূতন করে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার হয়েছে এশিয়ার এই অনুন্নত দরিদ্র দেশটিও। ভুয়া 'গণতন্ত্রের' ভেক পরিয়ে থাইল্যাণ্ডে ঘাঁটি গেড়েছে পররাজ্যলোভী মার্কিন দস্যুরা। দরিদ্র একটি দেশকে লুণ্ঠন করা এবং এশিয়ার পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে বারবার ফুঁসে ওঠা গণ-বিদ্রোহের লেলিহান শিখাকে প্রশমিত করার হীন নীতির সামরিক কৌশল হিসেবে মার্কিনী যুদ্ধবাজরা তাদের পাশবিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছে থাইল্যাণ্ডের বুকে। থাইল্যাণ্ডে অবস্থিত মার্কিন সামরিক বিমান ঘাঁটিগুলি থেকে মারণাস্ত্রে সজ্জিত আধুনিকতম যুদ্ধবিমানগুলি থাইল্যাণ্ডবাসীদের ন্যায়যুদ্ধরত প্রতিবেশী-বন্ধু ভিয়েতনাম-লাওস-কম্বোডিয়ার অধিবাসীদের ওপর মৃত্যু বর্ষণ করে আসে ঘড়ির কাঁটা ধরে। থাইল্যাণ্ডের উপকূলে টহল দেয় হামলাবাজ মার্কিনী যুদ্ধ-পোত। থাইল্যাণ্ডের বুকে বসে শিকারী ঈগলের হিংস্রতা নিয়ে লক্ষ্যবস্তুর দিকে লোভার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নির্দেশের অপেক্ষা করে ধ্বংসের বীজ ছড়ানো মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রগুলি।

এশিয়াকে পদানত করার লোলুপ চক্রান্তের দ্বিতীয় 'মার্কিন প্রধান সামরিক দপ্তর'—আজকের থাইল্যাণ্ড।

যখনই কোন নির্ভীক মানুষ, তাঁর মাতৃভূমির ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই পরাধীনতার অসম্মান দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর মাতৃভূমিকে বৈদেশিক শক্তির পরোক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে ; তাঁর স্বপ্নের ভাগীদার করতে চেয়েছেন দেশের প্রতিটি হৃদয়কে —তখনই তাঁর ওপরে নেমে এসেছে পীড়নের বন্যা। মার্কিন দস্যুদের তাঁবেদার—দেশীয় দালাল শাসকবর্গ, নির্ভীক দেশপ্রেমিককে তুলেছে 'আসামীর' কাঠগড়ায় ; অভিযোগ এনেছে—তিনি 'দস্যু', তিনি 'গণতন্ত্রের' বিরোধিতা করেছেন, 'রাষ্ট্রের সুতরাং (?) দেশে'র প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ! কিন্তু দেশের কোটি কোটি মানুষদের চোখে বারবার মিথ্যা ভাষণের ধুলো দেওয়া যায় না। রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাঁরা—কে শত্রু কে মিত্র তা' স্পষ্ট করে চিনে নিতে পারছেন। সংগ্রামের মাধ্যমে শত্রুর ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দিচ্ছেন। থাইল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ছাত্র-বিদ্রোহের এই হলো পটভূমি।

১৪ই অক্টোবর—বিশ্বের ছাত্র-সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তের আখরে লেখা একটি নাম। ১৩ জন দেশপ্রেমিক অধ্যাপক ও ছাত্রের মুক্তির দাবিতে (যাঁদের বিরুদ্ধে থাইল্যাণ্ডের বিশ্বাসঘাতক সামরিক শাসক-চক্র 'গণতন্ত্র বিরোধিতা' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' সেই পুরানো কায়দাটির

[illegible] দাবি নিয়ে। আতঙ্কিত সামরিক শাসক-চক্র সৈন্য বাহিনীকে লেলিয়ে দেয় ছাত্রদের উত্তাল ক্রোধবহ্নিকে ঠেকাবার জন্য। ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন শহরের সাধারণ মানুষ। নিরস্ত্র ছাত্র ও নাগরিকদের ছত্রভঙ্গ করতে ব্যাংককের রাস্তায় নেমে আসে মিলিটারি ট্যাঙ্ক! বৃষ্টির মতো নির্বিচারে ঝরতে থাকে কাঁদানে গ্যাসের গ্রানেড ও বুলেট। প্রচণ্ড নিপীড়নের মুখেও ছাত্ররা এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেননি। অত্যাচার যতো বেড়েছে ততই দৃঢ়তর হয়েছে ছাত্র ও নাগরিকদের ঐক্যের গ্রন্থি, ইস্পাতের মতো শক্ত হয়েছে তাঁদের মনোবল। তু'দিন ধরে চলেছে লড়াই। যা প্রথমে ছিল প্রতিবাদ, তা'ই ক্রমে হয়ে দাঁড়ালো প্রতিরোধ—প্রতি-আক্রমণ। শুধু মার ঠেকাননি তাঁরা, পাল্টা-মারও দিয়েছেন। ছাত্র ও জনতার মিলিত আক্রমণে গুঁড়িয়ে গেছে পুলিশ ফাঁড়ি, অধিকৃত হয়েছে প্রশাসনিক দপ্তর, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মিলিটারি 'আউট্-পোষ্ট'।

শহীদ হয়েছেন ২৮৩ জন ছাত্র ও নাগরিক। রক্ত ঝরেছে বহু ছাত্রের কিন্তু বিনিময়ে তাঁরা ছিনিয়ে এনেছেন ১৩ জন দেশপ্রেমিককে কারান্তরাল থেকে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন গৌরবময় ছাত্র-সংগ্রামের ঐতিহ্য, আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছেন ফিল্ড মার্শাল কিত্তিকাচর্ণ-এর নৃশংস সামরিক সরকারকে এবং প্রেরণা জুগিয়েছেন প্রতিটি দেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে।

সাথী, আসুন আমরা শিক্ষা নিই আমাদের সহযোদ্ধা থাইল্যাণ্ডের মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামী ছাত্রদের কাছ থেকে। তাঁদের সংগ্রামের নিরিখে ফিরে তাকাই আমাদের দেশের দিকে, যেখানে এখনো রয়েছে 'জেলের মধ্যে জেল', যেখানে বিনা বিচারে বা বিচারের প্রহসন করে মৃত্যুকূপে শত অত্যাচারের বন্যা বইয়ে আটকে রাখা হয়েছে হাজার হাজার দেশপ্রেমিককে। আসুন, তাঁদের মুক্তির দাবিতে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠি—বুকের রক্ত ঢেলে থাইল্যাণ্ডের সংগ্রামী ছাত্রসমাজকে সহযোদ্ধার অভিনন্দন জানাই।

কবিতা

## কাঁধের থেকে নামাও বোঝা মাথাটাকে জোর খাটাও

**সৃজন সেন**

নূতন নূতন জয়ের পথে
এগিয়ে যেতে যদি বা চাও
'কাঁধের থেকে নামাও বোঝা'
'মাথাটাকে জোর খাটাও'!

অন্ধজনের মত তুমি
সব যদি ভাই আঁকড়ে ধরো,
'কি' বা 'কেন' প্রশ্নছাড়া
সব যদি ভাই মান্য করো,
সব জিনিসই মাথার উপর
চাপবে হয়ে ভীষণ 'বোঝা'

পথ চলতে দেখবে তখন
এগিয়ে যাওয়া নয়কো সোজা!

ভুল করে ভাই যেমন ধরো
হতাশায় কেউ ভেঙ্গে পড়ে,
ভুল না করে কেউবা দেখ
অহংকারে ফেঁপে মরে,
সংগ্রামেরই অভিজ্ঞতা
অল্পদিনের রয়েছে বলে
কিছু কিছু বন্ধু দেখ
দায়িত্বকে এড়িয়ে চলে,

সংগ্রামেরই অভিজ্ঞতা
বহুদিনের যাদের আবার
বিজ্ঞ সেজে আদেশ দিয়ে
দেখো তাদের কর্ম কাবার,
অনেক সময় মজুর কিষাণ
শ্রেণী ভিত্তিক গৌরব নিয়ে
বুদ্ধিজীবীর বিচার করে
অহংকারীর দৃষ্টি দিয়ে,
বুদ্ধিজীবী অনেক সময়
নিয়ে 'জ্ঞান'-এর বিরাট 'বোঝা'
ভাবে—'ওরা বুঝবেটা কি?
জ্ঞানলাভ কি অতই সোজা?'

যুবকরাও অনেক সময়
বুদ্ধি পারদর্শিতায়—
বয়স্কদের হেয় বলে
বোঝে এবং বোঝাতে চায়,
অন্যদিকে বয়স্করা
অভিজ্ঞতার 'বোঝা' বয়ে
নবীনেরে তরুণেরে
অহংকারে নেয়না সয়ে;
বিচার করে এসব কথা
বন্ধুরা সব—এগিয়ে যাও,
'বোঝা' হোল ঐগুলো ভাই
'বোঝা'গুলো নামিয়ে নাও!
নামিয়ে 'বোঝা' এবার তোমায়
মাথাটি ভাই খাটাতে হবে,
নইলে তুমি সব কিছুতে
পিছিয়ে ভাই রবেই রবে!

কারো কারো পিঠে দেখো
যদিও নেই বোঝার ভার
জনগণের সাথে তাদের
নেইকো অভাব মেলামেশার,
সব কিছুতে পিছিয়ে থাকে
তবু কাজের ক্ষেত্রে তারা,
কঠিন চিন্তা কঠোর চিন্তা
মাথায় তাদের দেয় না সাড়া,
অন্যদিকে কারো কারো
পিঠে 'বোঝা' থাকার তরে
'অন্যজনে খাটাক মাথা'
—এমনিভাবে চিন্তা করে,
তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যারা
গেছেন বলে—"খাটাও মাথা"
জানতে হবে তাদের কথা
দূর করতে বিফলতা,
মন হোল ভাই চিন্তা করার
বিরাট রকম কারখানা
মনীষিরা গেছেন বলে—
"চিন্তা ছাড়া কাজ মানা।"

নূতন নূতন জয়ের পথে
এগিয়ে যেতে যদি না চাও
তাইতো বলি নামাও "বোঝা"
"মাথাটাকে জোর খাটাও"!

## ত্রুটি স্বীকার

'বীক্ষণ বিশেষ শারদ সংকলনে' প্রকাশিত "পট্‌জিয়েটারের কেল্লা" গল্পটির অনুবাদক নাম মৃণাল দত্তের নামটি অসাবধানতা বশতঃ ছাপা হয়নি। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

—সঃ মঃ বীঃ

**আগষ্ট-সেপ্টেম্বর—এই দুই মাসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা অজুহাতে পুলিশের গুলিতে নিহত এবং আহতদের তালিকা ( অসম্পূর্ণ )**

| তারিখ | স্থান | নিহত | আহত | উপলক্ষ্য | নিহত বা আহতের পরিচয় | সূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২।৮।৭৩ | কেরালা | ২ | ২ | খাদ্য আন্দোলন | সাধারণ মানুষ | স্টেট্‌সম্যান. ৩।৮।৭৩ |
| ১৬।৮।৭৩— ১৭।৮।৭৩ | ভূপাল | ৭ | ৬ | দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন | সাধারণ মানুষ | স্টেট্‌সম্যান, ১৮.৮।৭৩ |
| ২৭।৮।৭৩ | হায়দ্রাবাদ | ১ | ৮ | নেতার মুক্তির দাবিতে আন্দোলন | ক্ষেতমজুর ( হরিজন ) | হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৯.৮।৭৩ |
| ১৩।৯।৭৩— ১৪।৯।৭৩ | বাঙ্গালোর | ৩ | ৩ | খাদ্য আন্দোলন | সাধারণ মানুষ | স্টেট্‌সম্যান, ১৫।৯।৭৩ |
| ১৮।৯।৭৩ | হুবলী ( মহীশূর ) | ১ | ২ | খাদ্য আন্দোলন | ছাত্র | হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯।৯।৭৩ |
| ১৮।৯।৭৩ | বাঙ্গালোর | ১ | ২ | খাদ্য আন্দোলন | সাধারণ মানুষ | স্টেট্‌সম্যান, ১৯।৯।৭৩ |
| ২০।৯।৭৩ | মাদুরাই | ১ | ৯ | জানা যায়নি | গ্রামবাসী | স্টেট্‌সম্যান, ২২।৯।৭৩ |
| ২১।৯।৭৩ | মাদ্রাজ | ১ | ১০ | জানা যায়নি | সাধারণ মানুষ | হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২২।৯।৭৩ |
| ২১।৯।৭৩ | মুঙ্গের | ১ | সংখ্যা জানা যায়নি | সিনেমা মালিক ও পুলিশের আঁতাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন | ছাত্র | স্টেট্‌সম্যান, ২৩।৯।৭৩ |
| ২৭।৯।৭৩ | ইন্দল | জানা যায়নি | ৫ | স্কুলের সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্দোলন | ছাত্র | হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৮।৯।৭৩ |
| ২৮।৯।৭৩ | কারোয়ার ( মহীশূর ) | ১ | ২ | দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন | ছাত্র ও সাধারণ মানুষ | স্টেট্‌সম্যান, ২৯।৯।৭৩ |
| ১১।৯।৭৩ | আমেদাবাদ | ২ | সংখ্যা জানা যায়নি | জানা যায়নি | সাধারণ মানুষ | স্টেট্‌সম্যান, ১২।৯।৭৩ |
| ১৮।৮।৭৩ | মথুরা জেলা ( আগ্রা ) | ২ | সংখ্যা জানা যায়নি | বাঁধ কাটার ব্যাপারে আন্দোলন | গ্রামবাসী | স্টেট্‌সম্যান, ১৯।৮।৭৩ |

মোট নিহত—২৩ জন এবং মোট আহত—৪৯ জন।

# ডাঃ নরমান বেথুন

**বিশ্ব-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয়**

**নায়কের জীবনালেখা**

**রঞ্জন দেবনাথ**

**কা**নাডার মানুষ, ডাঃ নরমান বেথুনের নাম আমাদের দেশে খুব একটা পরিচিত নয়। অথচ, গোটা মানবজাতির জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, এই মানুষটিকে—যিনি তাঁর মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত একটি নিপীড়িত জাতির সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবন দান করেন—পৃথিবীর বিরাট এক অংশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। মানবজাতিকে যারা চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যদিয়েই যে প্রকৃত মানব-সেবা সম্ভব—এই শিক্ষাই আমরা পাই ডাঃ বেথুনের জীবন থেকে। আর, একটি বিশেষ বিজ্ঞানে দক্ষতাকে পর্যন্ত কেমন করে সেই সংগ্রামের শাণিত অস্ত্রে পরিণত করা যায়, তার এত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা আমাদের দেশের যুব সমাজকে, বিশেষত যাঁরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁদেরকে, একটা সঠিক পথের সন্ধান দেবে, এই বিশ্বাস থেকেই আমরা এই জীবনকাহিনী পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থিত করছি।—সঃ মঃ বীঃ ●

**পূর্বানুবৃত্ত ॥**

১৮৯০ সালের মার্চ মাসে গ্রাভেনহার্সট-এর উত্তর ওণ্টারিও সহরে (কানাডা) হেনরী বেথুনের জন্ম। বাবা রেভারেণ্ড ম্যালকম বেথুন ছিলেন মিশনারী প্রচারক এবং মা এলিজাবেথ অ্যান গুডউইন ছিলেন আদর্শবাদী গোঁড়া খ্রীষ্টান মহিলা। বালক বয়সেই হেনরী বেথুনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং দৃঢ় সংকল্পের মনোভাব প্রকাশ পায়। বাবা-মা কিন্তু ছেলের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও দুঃসাহসী কার্যকলাপে কোন দিন বাধা দেননি। বেথুনের ঠাকুর্দা ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ডাক্তার। খুব ছোট বেলা থেকেই বেথুনের মনে ঠাকুর্দার মতো বড়ো ডাক্তার হবার বাসনা গড়ে ওঠে। মাত্র আট বছর বয়সে বেথুন বাবা-মার কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন, আজ থেকে তাঁর নাম হবে মৃত ঠাকুর্দার নামে—ডাঃ নরমান বেথুন।

বেথুনের শৈশব কাল ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুগত ও চিন্তার জগতে সারা দুনিয়া জুড়ে উঠছিল পরিবর্তনের জোয়ার। দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল তাঁর মাতৃভূমি কানাডা। এবং এই পরিবর্তনের হাওয়া বেথুনের নবজাগ্রত চেতনায় ফেলে যাচ্ছিল তার ছায়া। স্কুলের পড়াশুনা শেষ করার পর বেথুন আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন পেশা নিয়ে পয়সা জমাতে লাগলেন, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালানো যায়। সব পেশাই ছিল তাঁর কাছে সমান আকর্ষণীয়। বিভিন্ন কাজের ভেতর দিয়ে জীবনের প্রতি এক প্রগাঢ় ভালবাসা জন্ম নিল বেথুনের মধ্যে। শিল্প ও ভাস্কর্যে দক্ষতা অর্জন করলেন তিনি। কিন্তু যৌবনের এই স্বপ্নময় আকাশে হঠাৎ উঠলো ধ্বংসের কালো মেঘ—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এম. ডি. ডিগ্রী নিতে তখনো এক বছর বাকী। কানাডা যুদ্ধ ঘোষণা করার দিনই নরমান মিলিটারিতে যোগ দিলেন। এপ্রিলে শত্রুর

গোলাবর্ষনের মুখে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন তিনি। ফরাসী ও ব্রিটিশ হাসপাতালে ছ'মাস থাকার পর দেশে ফেরৎ পাঠানো হলো তাঁকে। ডিগ্রী নিতে বেথুন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলেন। স্নাতক হবার পর ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে নাম লেখালেন বেথুন। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট সার্জন হিসেবে থাকলেন H. M. S. Pegusus যুদ্ধ জাহাজে। বদলী হয়ে ফ্রান্সে আসার সময়েই জার্মানী আত্ম-সমর্পন করলো। যুদ্ধ শেষ। বেথুনের বয়স আটাশ। কিন্তু এই বিশ্বজোড়া ধ্বংস তাঁকে অকালবৃদ্ধ করে দিয়েছে। চুরি করে নিয়েছে তাঁর আশা, স্বপ্ন ও যৌবন। হতাশার হাত থেকে মুক্তি পেতে বেথুন পাড়ী জমালেন ইংলণ্ডে।

॥ ২ ॥

ইংলণ্ডে আসার সময় বেথুনের কাছে বিমান বাহিনীর থেকে পাওয়া বেতন ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আর্থিক অভাব ঘোচাবার একটি অভিনব কৌশল আবিষ্কার করে ফেললেন তিনি। টাকা না থাকলেও বিভিন্ন শিল্পের ওপর দক্ষতা ছিল তাঁর। আর বলাই বাহুল্য অর্থবানদের শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট 'হুজুগ' থাকলেও সাধারণত সেই মাত্রায় শিল্পবোধ থাকে না। এই বিশেষ সূত্রটিকে কাজে লাগালেন বেথুন। ফ্রান্স ও স্পেনের ষ্টুডিও এবং ধুলোতে ভর্তি অখ্যাত ছবির দোকানগুলো ঘুরে দারুন সস্তায় আজব সমস্ত শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করে বেশ চড়া দামে ইংলণ্ডে বিক্রি করতে শুরু করলেন তিনি। প্রথম অভিযানে, তাঁর কাছে পুঁজি ছিল ১০০ পাউণ্ডের মতো—সব বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা, কিন্তু এতেই লাভ দাঁড়ালো ৮০০ পাউণ্ড! যখনই টাকার দরকার হতো, বেথুন চ্যানেল পেরিয়ে সমস্যার সমাধান কোরতেন। সব চাইতে ভালো খাদ্য ও পানীয়, প্রচুর বইপত্র, যে কেউ চাইলে ধার দেওয়ার মতো টাকা এবং নিজের শিল্প কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কাদা, রঙ, ক্যানভাস—ইত্যাদির খরচ চালাবার মতো যথেষ্ট পরিমানে অর্থোপার্জন হতে লাগলো এইভাবে।

সোহো অঞ্চলের যে ফ্ল্যাটটিতে বেথুন থাকতেন তার ভেতরের দৃশ্যটি ছিল রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। সর্বত্র ছড়ানো থাকতো অদ্ভুত সব ভাস্কর্য—প্লাষ্টারের তৈরী হৃৎপিণ্ড, কিড্‌নী, মস্তিষ্ক, জট পাকানো নাড়ি-ভুঁড়ি, হাত, পা ইত্যাদি। বেথুনের শিল্পী-চোখে মানুষের বাহ্যিক আকারের বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন ভালো লাগতো, ঠিক তেমনি ভালো লাগতো মানব শরীরের আভ্যন্তরীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো। তাঁর এই ঘরটির কথা স্মরণ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে বেথুন বলতেন—'আমার ঘরটা ছিল একটা কসাইয়ের দোকান।'

এই 'কসাইয়ের দোকান'টিতে তাঁকে ঘিরে বসতো আড্ডার আসর। অনেক তরুণ ভক্ত, লেখক, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞের জমায়েত হতো ওখানে, যাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতেন বেথুনের কথা—তাঁর জীবনদর্শন। অবশ্য এই মন্ত্রমুগ্ধতার পিছনে আর একটি জিনিসের প্রলোভন যে কাজ করতো না তা নয়, এবং তা হলো—বেথুনের নিজের খরচে উত্তম পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা!

যুদ্ধ তার অর্থহীন বীভৎসতার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছে দুনিয়াজোড়া এক অনিশ্চিৎ ভবিষ্যতের ক্লেদাক্ত অনুভূতি। হতাশা, নির্লিপ্ততা, যুগ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ আর ভীতির সঙ্গে তাল রেখে গড়ে উঠছে ভুয়া-ধর্মপ্রবনতা, জাজ সঙ্গীত, যতিহীন কবিতা; এবং জনসাধারনের চেতনার মধ্যে আসন করে নিচ্ছেন বিভিন্ন তত্ত্বের প্রবক্তারা। কেউ কেউ ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদকে* বসাচ্ছেন জ্ঞানের সিংহাসনে, আবার কেউ কেউ জড়ো হচ্ছেন কার্লমার্কসের পতাকাতলে। বেথুন যাঁকে তাঁর জীবন-বেদের প্রবক্তা বলে মেনে নিয়েছিলেন তিনি হলেন একধারে অধ্যাপক, লেখক, সমালোচক, আনন্দ-অনুভূতি-রুচির ব্যাখ্যাকার, ছাত্র-সমাজের চোখে 'ইনটেলেকচ্যুয়াল হীরো'—ওয়াল্টার পিটার। অধ্যাপক পিটারের জীবন দর্শনকে আদর্শ-হিসাবে আঁকড়ে ধরলেন বেথুন—"অভিজ্ঞতার ফল নয় অভিজ্ঞতাই শুরু এবং শেষ।....জীবনের সাফল্য হলো, হীরের দ্যুতির মতো নিজের জীবন প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখা এবং জিয়িয়ে রাখা এই তীব্র আনন্দের অনুভূতিকে ...।"

হাসপাতালের কাজ, পড়াশোনা আর সারা রাতব্যাপী পানচক্রের মধ্যে বাধাহীন আনন্দের সন্ধান করতে লাগলেন বেথুন। সব রকমের অভিজ্ঞতাকে অর্জন করতে হবে। যুদ্ধ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল—জীবনের কানাকড়িও মূল্য নেই, মৃত্যু আসতে সময় লাগে না এবং জীবনের প্রসাদ উপভোগ করার জন্য মানুষের অবসর স্বল্প ও সীমিত। সার্জারী, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং অধ্যাপক পিটারকে ব্যাখ্যা করা—এর ভেতর দিয়েই বেথুনের ব্যস্ত তিনটি বছর কেটে গেল। হাসপাতালের শিক্ষাকাল শেষ হলো। লণ্ডন ইষ্ট এণ্ড-এ প্রাইভেট ক্লিনিক খুলে বসলেন বেথুন। বেথুন মনে মনে একরকম ধরেই নিয়েছিলেন, যে ভবিষ্যতে কোন এক সময় খুব বড় সার্জন হবেন তিনি। কিন্তু এর জন্য যে ব্যয়বহুল

---

* ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষন (Psycho-analysis) পদ্ধতির একটি প্রধান অনুমীতি-অবচেতনবাদ। এই দৃষ্টিভংগিতে অবচেতন হলো মানবমনের একটি বিশেষ স্তর, যেখানে ব্যক্তির সেই আকাঙ্খা ও ইচ্ছাগুলি চাপা থাকে, সামাজিক কারণের ফলে যেগুলির পরিপূরণ সম্ভব হয় না। এই আকাঙ্খা ও ইচ্ছাগুলি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সাঙ্কেতিক রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির জন্ম দেয়।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি হলো ভাববাদী। এর বিপরীত, বস্তুবাদী মতবাদ হলো পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব (Pavlovian psychology)। পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদকে স্বীকার করে না। —লেখক

পড়াশুনার প্রয়োজন তা করার সামর্থ তাঁর ছিল না। ফ্রান্স ও স্পেন-এ 'বিশেষ অভিযান' চালিয়েও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। হয়তো বা, বেথুনের আশা শুধুমাত্র কল্পনার জগতেই সীমাবদ্ধ থেকে যেতো, যদি না আকস্মিকভাবে বন্ধুত্ব হতো ডাঃ ইলিয়েনর ডেল্-এর সঙ্গে। ডাঃ ডেল্ ছিলেন একজন বিত্তবান ব্রিটিশ শিল্পপতির স্ত্রী এবং বেথুন যে ইষ্ট এণ্ড ক্লিনিকে কাজ করতেন, তার প্রধান। তাঁর আর্থিক আনুকূল্য ও সহায়তায় বেথুন কঠিন পরিশ্রম করে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন এবং এফ্. আর. সি. এস. পরীক্ষার প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন। ১৯২৩ সালে এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বেথুন গেলেন এডিনবরাতে এবং সেখানেই তাঁর পরিচয় হল ফ্রান্সেস কেম্পবেল পেনির সাথে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই পরিচয় প্রগাঢ় প্রণয়ে পরিণত হলো। পরীক্ষার মাত্র কয়েকমাস পরেই তাঁরা লণ্ডনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। ফ্রান্সেস ছিলেন এডিনবরার এক নামী ধনী পরিবারের মেয়ে। উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তিও পেয়েছিলেন তিনি। বিয়ের পরের দিনই বেথুন ফ্রান্সেসের কাছে প্রস্তাব করলেন যে তিনি কপর্দকশূন্য, সুতরাং পড়াশুনা আপাততঃ মুলতুবী থাক। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন বেথুন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন কিন্তু সুখের হয়নি! বেথুনের বেপরওয়া, প্রচণ্ড বেগবান জীবনের সাথে, উচ্চ শ্রেণীর 'মার্জিত', ও 'অভিজাত' রুচিসম্পন্ন ফ্রান্সেস, নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি। সুতরাং সাংসারিক জীবনে হতাশা, পরস্পর বিরোধিতা এবং ভুল বোঝাবুঝির পালা শুরু হলো। বেথুনের মনে হলো বিবাহটা তাঁর জীবনেরই এক করুণ ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি যেন। এই বিভ্রান্তির পিছনে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের সাধারণ বিশৃংখলাময় আবহাওয়ারও কিছুটা ভূমিকা ছিল। ব্যক্তিগত হতাশা মাঝে মাঝে বেথুনকে যুক্তিহীন করে তুলতো। এমন সমস্ত উদ্ভট কাজকর্ম করে বসতেন তিনি, যে ফ্রান্সেস ভয়ে আরো বেশী করে গুটিয়ে নিতেন নিজেকে। একবার প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বেথুন। ডুবে যাওয়ার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন সে যাত্রায়। পরে স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন: তাঁর বহুদিনের ইচ্ছে ছিল ঝড়ের সময় ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরাবার। স্বভাবতই ফ্রান্সেস সিদ্ধান্ত করলেন, বেথুন নিজেকে ধ্বংস করেত চান। এমনি আরেকবার তিনি জেদ ধরলেন, লাফ দিয়ে একটা চওড়া পাহাড়ী নদী পেরোতে হবে ফ্রান্সেসকে। বাধ্য হয়ে লাফ দিলেন ফ্রান্সেস। এই 'বিপজ্জনক অনুরোধটি' রক্ষা করার পরমুহূর্তেই তিনি ছুটলেন হোটেলে এবং কাল বিলম্ব না করে বেথুনকে ফেলে রেখে ফিরে গেলেন লণ্ডনে। ফ্রান্সেসের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলেন বেথুন; লিখলেন, এই অদ্ভুত কাজটি তিনি কেন যে করলেন তা তিনি নিজেই জানেন না। ফিরে এলেন ফ্রান্সেস। এক সপ্তাহের জন্য আবার পারস্পরিক ভালোবাসা ফিরে এলো। কিন্তু হতাশা এবং ভুল বোঝাবুঝির আবার বিস্ফোরণ ঘটলো অল্প কয়েকদিন পরেই।

প্রচুর মদ্যপান, প্রচণ্ড পড়াশুনা এবং ঝড়ের মতো জীবনযাত্রা— সুতরাং এক বছরের মধ্যেই ফ্রান্সেসের ব্যক্তিগত সম্পত্তিটুকু প্রায় নিঃশেষিত হতে কোন বেগ পেতে হয়নি।

বিয়ের এক বছর পরে ফ্রান্সেসের কাছে অবশিষ্ট থাকলো মাত্র ২০০ পাউণ্ড। তাই সম্বল করে তাঁরা লণ্ডন থেকে কানাডা এবং কানাডা থেকে ডেট্রয়েট্-এ এলেন। ডেট্রয়েট্-কে পেশার স্থান হিসাবে নির্বাচন করার পেছনে একটা বিশেষ কারণ ছিল। কানাডিয়ান সীমান্তের ঠিক ওপারে ডেট্রয়েট্ তখন কর্মচাঞ্চল্যে মুখর। গড়ে উঠছে নতুন নতুন কলকারখানা। ধনী আমেরিকার সম্পদের স্রোত ঢুকছে ডেট্রয়েটে। আমেরিকা এগুচ্ছে অভাবিত উন্নতির পথে এবং তারই সাথে সাথে এসেছে ডেট্রয়েটের সীমাহীন ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। এসেছে টাকা, কাজ ও উদ্যমের জোয়ার। এখানে বেথুনকে কারও কর-চুম্বন করতে হবে না বা কোন ব্রিটিশ বিত্তবানের সামনে নতজানু হতে হবে না। ডেট্রয়েট্ হলো আমেরিকার দীপ্তিমান ভবিষ্যতের মানব-সৃষ্ট সীমানা।

১৯২৪ সালের শীতের শেষে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী নরমান বেথুন কাস্ ও সেলডন্ ষ্ট্রীটের এক কোণায় ফ্ল্যাট্ ভাড়া নিলেন। হাতে রয়েছে মাত্র ২৪ ডলার।

ডেট্রয়েট শহরকে ফ্রান্সেসের মনে হলো নিরস, নোংরা এবং অস্বস্তিকর। কিন্তু বেথুনের চোখে ডেট্রয়েট ছিল বিংশ শতাব্দীর মূর্ত রূপ, যন্ত্রযুগের এক বিশাল দুর্গ, যেখানে প্রত্যেকের দরজায় সুযোগ করাঘাত করে যায়।

ঠাকুর্দার 'নেম প্লেট' অফিসের সামনে লাগিয়ে বেথুন সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। এক বছর কেটে গেল। কিন্তু বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শহরের অন্যান্য স্থানে কলকারখানা ও বাণিজ্য উন্নয়নের গতিতে বাড়তে লাগলো এবং তার সাথে সাথে কাস্ ও সেলডন ষ্ট্রীটের চারপাশে বাড়তে লাগলো পতিতাবৃত্তি। ধীরে ধীরে রোগীরা তাঁর চেম্বারে আসতে লাগলো। কিন্তু সাধারণত বেশ্যাদের বাদ দিলে ডাক্তারের 'ফি' দেওয়ার ক্ষমতা থাকতো না কারোর। এখানে থাকতেই একটি বিশেষ শিক্ষা পেলেন বেথুন যা তিনি টরন্টো, লণ্ডন, ভিয়েনা বা বার্লিনের ডাক্তারী পাঠ্যসূচীতে পান নি: তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন যাদের যত বেশী, 'ফি' দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ততই কম।

হঠাৎ করে একটুকরো সৌভাগ্যের দেখা পেলেন বেথুন। পাশের

মুদির দোকানের মালিক একদিন ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁকে, নিজের অসুস্থ স্ত্রীকে দেখাতে। ভদ্রমহিলার একটা পা সাংঘাতিকভাবে ফুলে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন পা-খানা কেটে বাদ দিতে হবে। যা'হোক বেথুনের চিকিৎসার ফলে সেরে গেলেন মুদির স্ত্রী। কৃতজ্ঞতায় বিগলিত দোকানী বললো, বেথুনকে, "ডাক্তার, কি দেওয়ার মতো আমার টাকা নেই। তবে আপনার প্রয়োজন মতো সব কিছু বিনিপয়সায় পাবেন আমার দোকান থেকে।" খাদ্যের সমস্যার মোটমুটি সুসমাধান হল। বাকি সমস্যার সমাধান হল একজন কসাইয়ের মাধ্যমে। একদিন জনৈক কসাই এলো তাঁর অফিসে। জুতো থেকে করাতের গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, "আমার পুরো একঘর ভর্তি' কাচ্চা-বাচ্চা। অসুখ-বিসুখ হলে আপনি তাদের দেখবেন; যত মাংস খেতে পারেন আপনারা, আমি যোগাবো।" ফ্রান্সেসকে বললেন বেথুন, "যাক, এতো দিনে অন্ততঃ মোটামুটি একটা সুষম খাদ্য পাবো আমরা।" সবশেষে একদিন যখন একজন বাসন ও আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী নিজের অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর অফিসে এলো, তখন এই বিচিত্র যোগাযোগ-পর্বের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হলো। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী বেথুন শোওয়ার জন্ত পেলেন একখানা চৌকি এবং রান্না-বান্না করার জন্ত কিছু বাসনপত্র।

বেথুনের অভাব তবুও ঘুচলো না। রোগী জুটতে লাগলো প্রচুর কিন্তু অর্থাগম হলো যৎসামান্ত। কিছু কিছু সময়ে বেথুন রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। রোগীরা হয় নিজেরাই তাঁর অফিসে আসতো অথবা কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠাতো তাঁকে। যে অসুখ প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করলে সহজেই সেরে যেতে পারতো, দীর্ঘদিন গড়িমসির পর বেথুনকে যখন ডাকা হতো সেই অসুখই মারাত্মক আকার নিয়েছে। যেটা প্রথমে ছিল সামান্ত ব্যথা, অবহেলার ফলে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে···হয় অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, নয় হার্ণিয়া অথবা আরো হাজার রকমের জটিল ব্যাধির একটি।

"তোমরা এতদিন অপেক্ষা না করে আগে ডাক্তার ডাকতে পারো না?" —বেথুন রেগে যেতেন। আর রোগী—একজন স্লাভ বা হাঙ্গেরিয়ান, দারিদ্রের লজ্জায়, সংকোচে আড়ষ্ট জবাব দিতে গিয়ে বক্তব্যের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য রাখতে পারতো না।

বিত্তশালী আমেরিকার শিল্প-কেন্দ্রিক গর্বোদ্ধত সহরে স্যাঁতসেঁতে ফ্ল্যাট, দারিদ্র্য ও সর্বব্যাপী রুগ্নতা বেথুনকে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন করে তুলতো। "এটাকে চিকিৎসা বলে না"—তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলতেন ফ্রান্সেসকে, "এটা হলো কাঠের পায়ের ওপর প্লাষ্টার করার মতো। যখন চিকিৎসা করার একান্ত প্রয়োজন, হয় তখন তারা সেটা জানেনা, নয় কি দিতে পারবে না এই ভয়ে চিকিৎসা করায় না। শেষ পর্যন্ত তারা যখন আসে তখন হয় খুব দেরী হয়ে গেছে, নয় তো বা স্বাস্থ্য চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। তাছাড়া, একজন বেশ্যা যখন চিকিৎসার জন্ত আসে আমি তার কি করতে পারি বলো? তার অসুখটাতো আসল সমস্যা নয়, সমস্যা হলো তার পেশাটা, যা সে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।" পৃথিবীর ওপরই সমস্ত দোষ চাপাতেন বেথুন। এবং এই রকম মুহূর্তগুলোতে নিজেকে বোঝাতেন, তাঁর এসব চিন্তা করার কোন অর্থ হয় না। জগৎ যা, তাই-ই। তিনি ডাক্তার; তিনি যেটা পারেন তাহলো, ভাঙা পা জোড়া লাগানো, হার্ণিয়া সারানো অথবা যখন কোন দুর্ভাগিনী পতিতা নারী তার বৃত্তির অনুসংগী বিপর্যয়ের শিকার হয়, তখন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া।

মাসের পর মাস গড়িয়ে চললো। একটা নতুন আশংকা দানা বাঁধতে লাগলো বেথুনের বিশ্রামহীন জীবন এবং বিক্ষুব্ধ মনের মধ্যে। তাঁর মনে হতে লাগলো, খুব সহজেই আজকাল ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন তিনি; অনেক বেশী ঘুমের দরকার তাঁর। যে উদ্যম ও অফুরন্ত শক্তি তাঁর সঙ্গে কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, পাছে তাই হারিয়ে ফেলেন —এই দুশ্চিন্তা অধীর করে তুললো তাঁকে। এই ক্রমবর্ধমান ক্লান্তির সঙ্গে এলো আরো বেশী সংশয়, আরো বেশী তিক্ততা। মুমূর্ষু রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্বলতা আর অবসাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতেন বেথুন। চিকিৎসার মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিতেন নিজেকে এবং প্রাণান্ত পরিশ্রম করে একটি অমূল্য জীবনকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতেন। কেবল এই মুহূর্তটিতেই সমস্ত তিক্ততা মুছে যেতো তাঁর মন থেকে। বিজয় ও সার্থকতার এক অপূর্ব অনুভূতি তাঁর নষ্ট ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতো; পুনরুজ্জীবিত করে তুলতো মুমূর্ষু আশা ও আত্মবিশ্বাসকে। জ্ঞান ও দক্ষতার শিখা উদ্দীপিত হয়ে উঠতো তাঁর মানসলোকে যেখানে অর্থহীন ভাবালুতা ও সংশয়ের আর কোন স্থান থাকতো না। পুনরায় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সার্জন হয়ে উঠতেন তিনি, শত দারিদ্রের মধ্যেও যার সামনে রয়েছে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

এই সময়ে, বেথুন কিছু বুঝে উঠবার আগেই, তাঁর জীবনে একটি আশ্চর্য ইন্দ্রজাল ঘটে গেল। ব্যর্থতার থেকে সফলতা এবং প্রাচুর্যের জগতে একলাফে উঠে আসলেন বেথুন।

রুটিন-মাফিক সার্জারীর কাজে যে হাসপাতালটিতে যুক্ত ছিলেন তিনি, তার 'অপারেশন থিয়েটার' থেকে একদিন যখন বেরিয়ে আসছেন বেথুন, দামী পোশাকপরা এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। নিজের পরিচয় দিলেন ডাঃ গ্রাণ্ট মার্টিন বলে, যাঁর খ্যাতির পরিচয় বেথুনের অজানা ছিল না।

"আপনার কাজের আমি প্রশংসা করি ডাঃ বেথুন।"—ডাঃ মার্টিন বললেন বেথুনকে, "আমার সার্জারীর কেসগুলো আপনার কাছে পাঠাতে চাই আমি···শ্রীমতী বেথুনকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা দয়াকরে

আমার ওখানে আসুন না? ব্যাপারটার সম্বন্ধে পুরো আলোচনা করা যেতে পারে……।"

"সে তো খুবই ভালো কথা"—বললেন বেথুন।

করমর্দনের পালা শেষ হলো। বিদায় নেবার সময় আন্তরিক গলায় বললেন ডাঃ মার্টিন, "আমাদের জোড় বাঁধাটা ভালোই হবে।"

সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা—কিন্তু সবকিছু আমূল পাল্টে গেল।

ডাঃ মার্টিনের বাড়িতে বেথুনের সঙ্গে পরিচয় হলো সহরের নামকরা ডাক্তার এবং সমাজের উঁচুতলার লোকেদের। কাম্ এবং সেলডন্ ষ্ট্রীটের অফিসে ভীড় জমাতে লাগলো এক নতুন শ্রেণীর মানুষ, যাদের রয়েছে অঢেল টাকা আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য ডাক্তাররা ডাঃ মার্টিনের পথ অনুসরণ করে নিজেদের রোগীদের পাঠাতে লাগলেন বেথুনের অফিসে। দেখতে না দেখতেই ডাঃ বেথুনের নাম শোনা যেতে লাগলো মুখে মুখে। 'দর্শনীয়' মানুষ হয়ে উঠলেন তিনি।

টাকা আসতে লাগলো হুড়মুড় করে। প্রতিবেশী রোগীরা যেখানে চরম অবস্থা ছাড়া আসতো না, কিম্বা আসলেও দারিদ্রের জন্য কাকুতি মিনতি করতো, সেখানে বেথুনের নতুন রোগীরা 'সামান্যতম চিকিৎসার' উত্তরে প্রত্যাশা করেন—যেন 'প্রদর্শন যোগ্য' একটা বিল্ তৈরী করা হয় তাঁদের নামে।

ইউরোপে শেখা সমস্ত কৌশল, দক্ষতা ও জ্ঞান উজাড় করে সার্জারীর ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলেন বেথুন। কয়েক মাসের মধ্যে বেথুনরা একটি ফ্যাসানদুরস্ত পাড়ায় দামী বাড়িতে উঠে গেলেন, কিন্তু অফিস পাল্টালেন না।

সফলতা এসেছে। কিন্তু নিজের সুন্দর সাজানো অফিসে বসে মাঝে-মাঝে বেথুন নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে ভাবেন: কি পাল্টেছে? হাত দুটোতো ঠিক আগের মতই রয়েছে! না কি আজ হঠাৎ কোন যাদুর স্পর্শ পেয়েছে হাত দুটো, যা আগে পায়নি? উত্তরটা বেথুন জানতেন: গতকাল তাঁর হাত দুটো গরীবদের চিকিৎসা করতো আর আজ সে দুটো চিকিৎসা করছে ধনীদের।

অর্থের প্রয়োজন ছিল বেথুনের। তা তিনি পেয়েছেন। কিন্তু যে নিষ্ঠুর ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে এই টাকা তাঁর কাছে এসে পৌছোচ্ছে তার ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন বেথুন। সেই লৌহকঠিন ব্যবস্থার একটি অংশ হয়ে পড়েছেন তিনি, যেখানে 'পারস্পরিক পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন'ই সুখের একমাত্র উৎস এবং বড় ডাক্তার থেকে শুরু করে ছোট বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এই যে চক্র, তার ভেতর দিয়ে রোগীকে, যে যার প্রয়োজন মত, শোষণ করাই একমাত্র জীবিকার নীতি। টাকাই শুরু এবং শেষ। যত পারতেন ধনী মক্কেলদের কাছ থেকে টাকা নিতেন বেথুন আর ফিরে যেতেন তাঁর বস্তির রোগীদের কাছে,—নষ্ট শান্তিকে ফিরে পেতে এবং চিকিৎসকের 'পীড়িত ও দরিদ্রকে সেবা করার' আদর্শ থেকে নিজের বিচ্যুতিকে রোধ করতে।

একদিন রাত্রে দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বেথুনের। দেখলেন অন্ধকারে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। এক নিশ্বাসে ঝড়ের বেগে কি সব বলে গেল লোকটি। তার থেকে বেথুন যে মর্মার্থ করতে পারলেন তা হলো: আগন্তুকের স্ত্রীর প্রসব যন্ত্রণা উঠেছে কিন্তু সাহায্যের জন্য কোন ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। কারণটা ডাঃ বেথুন খুব সহজেই বুঝতে পারলেন। স্বামী, স্ত্রী ও দুটি সন্তানের এই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারটি সহরের একপ্রান্তে থাকে। তাদের বাসস্থান হলো একটি ভাঙা পরিত্যক্ত গাড়ী।

এক কোণায় ছেঁড়া মাদুরের ওপর ভয়ার্ত চোখে জড়াজড়ি করে বসে আছে দুটি বাচ্চা। ক্ষীণ কেরোসিনের আলোয় এবং লোকটির সহায়তায় বেথুন একটি অত্যন্ত অপুষ্ট কুঁকড়ে যাওয়া শিশুকে জন্ম দিতে সাহায্য করলেন। শিশুটিকে ধুয়ে, বাবার দেওয়া একটুকরো ছেঁড়া কম্বলে ঢেকে মায়ের পাশে শুইয়ে দিলেন বেথুন।

বাইরের একটা পিপের জলে বেথুন যখন হাত পরিষ্কার করছেন, নবজাতকটির পিতা জড়সড়ভাবে এসে সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁর হাতে গুঁজে দিল একটি ডলার। বেথুন টাকাটা নিলেন, তারপর ভাঁজ করে লোকটির ছেঁড়া পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন নোটটা।

এক বাক্স ফল এবং শিশু ও তার মায়ের জন্য কিছু পোশাক নিয়ে সকালে ফিরে গেলেন বেথুন। অপুষ্ট মায়ের জন্য একটা খাবারের তালিকা তৈরী করলেন। শিশুটিকে পরীক্ষা করলেন। তারপর বিমূঢ় পিতার সসঙ্কোচ ধন্যবাদ এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, মা হয়তো বেঁচে যাবে কিন্তু শিশুটির আয়ু হয়তো একমাসেরও বেশী হবে না। আশ্চর্য! এটাকেই ওরা বলে 'চিকিৎসা',—'মহান রোগনিরাময় বিদ্যা'!

ফ্রান্সেসের কাছে অভিযোগ করেন বেথুন: কপালে অকালমৃত্যুর পরোয়ানা লেখা এই শিশুটির ওপর হাজার চিকিৎসাবিদ্যার ম্যাজিক দেখালে যা ফল হবে, তার থেকে অনেক ভালো ফল হতো যদি এই দরিদ্র পিতাটির সপ্তাহে ২০ ডলার রোজগারের সংস্থান থাকতো। চিকিৎসা? ভাঙা-গাড়ীটার মধ্যে শিশুটিকে প্রসব করাতে কেউ গেল না, পাছে সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে! তাঁর কিছু সংখ্যক সহকর্মীর বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়তেন বেথুন। শান্তভাবে বসে বই পড়ে যেতেন ফ্রান্সেস আর নিজের সমস্ত তিক্ততার অনুভূতি উদ্গীরণ করতেন বেথুন, "ওদের বড়জোর মধ্যযুগীয় ক্ষৌরকার হবার দক্ষতা রয়েছে; ডাক্তার নয়। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে ওই পরগাছাগুলোকে উপড়ে ফেলতাম আর দেখতাম যাতে বাকীরা—তারা যে ডাক্তার, ব্যবসায়ী নয়,—এটা বোঝে।"

বেথুনের তীক্ষ্ণ উক্তি এবং স্পষ্ট অভিযোগ কিছু ডাক্তারদের মধ্যে তাঁর

বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় তুললো। বন্ধুদের কাছে বেথুন বললেন, "ওদের কেউ কেউ এমনই নির্বোধ যে তারা আশা করে তাদের 'অব্যর্থতা' আর 'কর্তব্যে আত্মনিবেদন'-এর এই পরীর গল্প সবাই বিশ্বাস করে নেবে! ওরা সমালোচনাই হজম করতে পারে না। ওরা চায় লোকে বিশ্বাস করুক যে তারা অব্যর্থ। আবার, এদেরই কিছুসংখ্যক শেষ পর্যন্ত নিজেদেরকেই বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে যে তারা কখনও ভুল করতে পারে না! এদের স্লোগান হওয়া উচিৎ 'সমাজের ওপরটাকে বাঁচাও তাহলেই সবটা বাঁচবে'। এরা যেটা বোঝে এবং এদের স্বার্থ যেখানে জড়িত—তা হলো এই 'ওপর তলাটা'। বস্তির লোকেরা প্রয়োজনের সময় আমার কাছে আসতে পারে না, কারণ ওদের টাকা নেই। আর, এখানে আমার যত নেওয়া উচিৎ তার অনেক বেশী টাকা দাবি করি আমি এবং পাইও। যখন একটি পয়সা না নিয়ে আমি মানুষের জীবন বাঁচাতাম তখন আমি ছিলাম ডাক্তার হিসাবে 'ব্যর্থ'। আর এখন? যে ভদ্রমহিলাটির দু-বেলা একটু ব্যায়াম করলেই রোগ সারবে তাঁকে একটা মামুলি টনিক দিয়ে অবিশ্বাস্য মোটা 'ফি' নিই;—এবং বলাই বাহুল্য, এখন আমি একজন 'প্রতিষ্ঠিত, 'সফল' ডাক্তার!"

বিশেষ রচনা

# একটি শিক্ষা-পর্যটনের অভিজ্ঞতা

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

●[ আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক 'ভাগ্যবান' স্কুল ও কলেজ থেকে 'শিক্ষামূলক পর্যটনের' নামে একটি 'বাৎসরিক প্রমোদ-ভ্রমণের' আয়োজন করা হয়ে থাকে। যে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এই 'ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার' উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়ে থাকে, আংশিকভাবে তা' আসে ছাত্রদের কাছ থেকে এবং বাকী বৃহত্তর অংশটি, বিভিন্ন করের মাধ্যমে জুগিয়ে থাকেন দেশের সেই কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যাঁদের শিক্ষা তো দূরের কথা, পেটে দু-বেলা অন্নও জোটে না। ব্যাপক ছাত্রদের মধ্যে যাঁদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল অর্থাৎ যাঁরা সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলি সহজে ক্রয় করতে পারেন, কেবল তাঁরাই এই 'প্রমোদ অভিযান'গুলিতে অংশ নিতে পারেন। যাঁদের ক্রয়ক্ষমতা কম, শিক্ষামূলক পর্যটনগুলি তাঁদের জন্য নয়। কে কতখানি শিক্ষা 'ক্রয়' করতে পারবে, তা' নির্ভর করছে তার 'ক্রয় ক্ষমতার' উপর। এটি হলো একটি দিক। অন্যদিকটি একটি প্রশ্নের আকারে রাখা যেতে পারে: যাঁরা এই শিক্ষা-পর্যটনগুলিতে যোগ দিতে পারছেন, তাঁরাই বা কতটুকু শিক্ষা পাচ্ছেন এর ভেতর দিয়ে? বলাই বাহুল্য, এই প্রশ্নটির উত্তরও নেতিবাচক। আমাদের দেশে শিক্ষা-পর্যটনের অর্থ—দেশকে জানা, জনগণকে জানা বা জাতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে জানা নয়; দার্জিলিং—সিমলা—নৈনিতাল—দিল্লী—কাশ্মীর বেড়ানো অথবা বড় জোর কয়েকটি জাতীয় গবেষণাগারে গিয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বিজ্ঞানের 'ভেল্কি' দেখে আসা! কিন্তু না; এটাও পুরো সত্য নয়। শিক্ষা-পর্যটনগুলি থেকে শিক্ষাও পাওয়া যায়। এবং তা হলো: শিক্ষার 'স্ট্যাম্প' লাগানো 'ছাত্র-মনোরঞ্জক কর্মসূচীগুলির' মাধ্যমে কিভাবে ব্যাপক ছাত্র সমাজকে স্থূল আমোদ-প্রমোদের নেশায় ডুবিয়ে সামাজিক বাস্তবতাগুলির থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, যাতে তাঁরা বৃহৎ সামাজিক পটভূমিকায় তাঁদের সঠিক অবস্থানটিকে ভুলে থাকেন,—এই নির্মম সত্যটির উপলব্ধি। এই শিক্ষাটি পেতে হলে অংশগ্রহণকারীকে খোলা চোখ ও সজাগ মন নিয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে হবে, নিজের কাছে বারবার প্রশ্ন তুলতে হবে অর্থাৎ শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক নয়, সমালোচক হতে হবে তাঁকে। নিচের রচনাটি, এই রকমেরই এক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা, একটি 'শিক্ষামূলক পর্যটনের' বাস্তব বিবরণ।

আমরা 'বীক্ষণের' পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে এই জাতীয় রচনা আহ্বান করছি।—সঃ মঃ বীঃ ]

পাটনার বাইরে সাধারণত রাজগীরই হ'ল একমাত্র জায়গা, যাকে পাটনা কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা-পর্যটনে যাওয়ার উপযুক্ত স্থান বলে মনে করেন। কিন্তু এ বছর আমরা আরও একটু দূরে যাওয়াই স্থির করি। পছন্দটা কাশ্মীরের উপরেই পড়ে কারণ, আমাদের বিভাগ-প্রধানের ভাষায়, "তার চেয়েও দূরে আমরা যেতে পারি না।" কিন্তু শিক্ষা-পর্যটনের ক্ষেত্রে কাশ্মীর, আমাদের কাছে, আদৌ উপযুক্ত বলে মনে হয় না। তাই বুদ্ধি করে আমরা আমাদের ভ্রমণ সূচীতে, বরং বিচক্ষণভাবেই, দিল্লীকেও যোগ করি এই কথা বলে যে, পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করাই আমাদের এই পর্যটনের একটা উদ্দেশ্য। অর্থ সাহায্য এবার খুব সহজভাবেই আসে—পাটনা কলেজের তরফে ৫০০ টাকা আর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ১০০০ টাকা। কিন্তু এত দূরের 'হ্রদ আর উদ্যানের দেশে' যাওয়ার পক্ষে টাকার এই অঙ্কটা ছিল নিতান্তই কম। কাজেই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই বলা হ'ল ১৫০ টাকা করে জমা দিতে এবং বাড়তি ৫০ থেকে ১০০ টাকার মত হাতে রাখতে, যদি মাঝপথে টাকা ফুরিয়ে যায়। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল। সাহায্যের ১৫০০ টাকা আর ছাত্রদের দেওয়া ৩৬০০ টাকাটা যথেষ্ট ছিল না। ফলে কাশ্মীর যাওয়ার জন্যে আমাদের প্রত্যেককেই কমবেশী ২০০ টাকার মত খরচ করতে হয়। স্পষ্টতই, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা এই পর্যটনে, তাদের যাওয়ার সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও, যেতে পারে নি।

সবকিছুই এখন তৈরী। আমাদের ভ্রমণ সূচীতে ছিল নয়াদিল্লী, জম্মু, শ্রীনগর, হরিদ্বার ও দেরাদুন। বিভাগ-প্রধান ডঃ চেতকার ঝা'র নেতৃত্বে আমরা ২৪ জন যাত্রা করলাম। ডঃ ঝা'র সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং নাতনীও গিয়েছিলেন। ডঃ ঝা'র খরচ বহন করেছিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ আর তাঁর স্ত্রী ও নাতনীর খরচ তাঁর নিজের। এই দুই ভদ্রমহিলাও কি আমাদের সাথে শিক্ষিত হ'তে চলেছিলেন? না, আমাদের অধিকাংশের মতোই, তাঁরা মজা উপভোগ আর দেশ দেখার কথা ভাবছিলেন? নাকি তাঁরা নিতান্তই গিয়েছিলেন আমাদের বিভাগ-প্রধানের জন্য একটি ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করতে। কারণটা যাই হোক না কেন, অস্বীকার করার উপায় নেই যে পুরো ব্যাপারটাই ছিল যথেষ্ট অযৌক্তিক।

বিড়লা মন্দির ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা, ছাত্র হওয়ার অপরাধে, প্রত্যাখাত হওয়ার পর আমরা বিহারের দু'জন শাসককংগ্রেস এম. পি.'র সঙ্গে তাঁদের নর্থ এভিনিউ'র বাসায় থাকাই ঠিক করি। এরকম বড়লোকী পাড়াইতো ভারতের 'সমাজবাদী' শাসকদের থাকার 'উপযুক্ত' জায়গা। এর আলোক-সম্ভারের দিকে তাকিয়ে আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না, বিদ্যুত-ঘাটতি নিয়ে এত হৈ-চৈ হচ্ছে কেন? এমন কি জলাভাবের কথাও, নর্থ এভিনিউ'এ থাকার সময়, মনে হচ্ছিল ভিত্তিহীন। আমরা আরও দেখতে পাই যে, এম. পি. দের একটা বিরাট অংশ তাঁদের ফ্ল্যাটগুলি ভাড়া খাটাচ্ছেন এবং প্রতি বছরই এভাবে মোটা টাকা কামাচ্ছেন। কিন্তু, এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সংসদে কেউ কথা তোলে না।

দিল্লীতে আমাদের স্বল্পকালীন অবস্থানের মধ্যেই আমরা লোকসভার প্রাতঃকালীন অধিবেশন দেখার একটা সুযোগ পেয়ে যাই। একজন এম. পি.'র সুস্পষ্ট অনুমতি পেয়ে, লোকসভায় ঢোকার আগে পর্যন্তও, আমরা জানতাম না যে, দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত গালিচা আর মোটা গদিযুক্ত আসনও 'সমাজবাদী'দের আবশ্যকীয় জিনিসের তালিকায় থাকতে পারে। মন্ত্রীদের বিলাসিতার কথাতো প্রবাদেই পরিণত হয়েছে, কিন্তু লোকসভায় আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও যে খুব একটা কম বিলাসিতার মধ্যে থাকেন না, সেটা চাক্ষুস দেখে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম আমরা। আর আমাদের শাসকদের মোটা ভুঁড়ি'র গোপন রহস্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, যখন আমরা পার্লামেন্টের ক্যান্টিন পরিদর্শন করলাম। সুলভ মূল্যের এই ক্যান্টিন, যার অন্তঃসজ্জা এমন কি পাটনার সর্বশ্রেষ্ঠ রেস্তোরাকেও লজ্জা দেয়, চলে রেল-বিভাগের পরিচালনায়। আমরা ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম, যে রেল-বিভাগ কেবলমাত্র রেল-স্টেশনেই ক্যান্টিন চালায়। দিল্লী সহরের একেবারে বুকের উপর রেলওয়ে পরিচালিত একটি ক্যান্টিনের ধারণা আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। আমরা এর গোপন রহস্য জানতে ইচ্ছুক। যাই হোক, জনৈক এম. পি'র সুস্পষ্ট অনুমতি নিয়ে, এই ক্যান্টিনেই আমরা আমাদের দুপুরের আহার সারলাম। মাথা-পিছু ঠিক পাঁচ টাকা দামের, আমাদের এই খাদ্য তালিকায় ছিল চিকেনসুপ, চিকেন তন্দুরী, বাসমতি চালের ভাত, উৎকৃষ্ট মানের চাপাটি, ফলের তৈরী পুডিং আর একটা করে কোকাকোলা। সন্দেহ নেই যে, এই ক্যান্টিন চালাতে বছরে কত টাকা লোকসান হয় আর আমাদের প্রতিনিধিদের পাওয়াতে করদাতাদেরই বা কত টাকা খেসারত দিতে হয়, তা জানাটা খুবই চিত্তাকর্ষক হবে।

যদি কেউ দাবি করেন, যে আমাদের প্রতিনিধিদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং তাঁরা যাতে তাঁদের কাজে তাঁদের সবটুকু সময় দিতে পারেন, সে জন্য এসবের প্রয়োজন আছে তবে তাঁকে আমাদের একটাই পরামর্শ—তিনি যেন একবার আমাদের পার্লামেন্টের যে কোন একটা অধিবেশন, যখন কোন 'জনস্ত' সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে না, দেখতে যান। 'জনস্ত' কথাটা আমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই ব্যবহার করছি, কারণ, এমনকি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও লোকসভার বিতর্কে খুব একটা তারতম্য সৃষ্টি করে না। ১৩ই মে, সোমবার, লোকসভার বিষয়বস্তু ছিল মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাবটির অনুমোদন।

কেন্দ্র কর্তৃক প্রদেশগুলির স্বায়ত্বশাসনের অধিকার হ্রাস করার ব্যাপারে যখন এত কথা উঠছে, সে অবস্থায় এটা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল। এ ব্যাপারে শাসন বিভাগের উপর নজর রাখাটা যদিও সংসদের দায়িত্ব, সংসদে সেদিন উপস্থিতির সংখ্যা ছিল কোরামের (মোট সদস্য সংখ্যার এক দশমাংশ, অর্থাৎ লোকসভার ক্ষেত্রে—৫২ জন) প্রয়োজনীয় সংখ্যার ঠিক উপরে। একদিকে সদস্যদের কেউ কেউ ঘুমাচ্ছেন, অন্যদিকে তাদের অনেকেই গভীর গালগল্পে মশগুল। এই যেখানে লোকসভার অবস্থা, তখন আমরা কোন কারণ দেখি না—ছাত্রদেরই বা কেন ক্লাশে গল্প করার অধিকার থাকবে না! বিতর্কের শেষে, লোকসভার অধ্যক্ষ যখন তিনটি বিষয়কে ভোটে প্রয়োগ করলেন—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কংগ্রেস সদস্য-সারি নেশাগ্রস্ত তোতাপাখীর মত গুঞ্জন করে উঠল—'হ্যাঁ', আর কয়েকজন উদাসীন বিরোধী সদস্য জবাব দিলেন—'না'। অধ্যক্ষ যদি কোন এম. পি'কে ভোটে প্রদত্ত বিষয়গুলি কি ছিল তা জিজ্ঞাসা করতেন, তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি তার উত্তর দিতে পারতেন না। জনৈক বিরোধী সদস্য, যিনি কঠোর ভাষায় মণিপুরে সরকারের কাজের নিন্দা করছিলেন, এমন কি তিনিও ভোটভুটির সময় এই প্রস্তাবটির ক্ষেত্রে 'না' বলার জন্য অপেক্ষা করেননি। এই হচ্ছে আন্তরিকতার নমুনা, যা লোকসভায় দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের দিল্লীবাসের মধ্যেই একদিন মিনিট ১৫-০০'র জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীএল. এন. মিশ্রের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি রেলভবনে আমাদের চায়ের নেমতন্ন করেছিলেন, কিন্তু আসেন প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট দেরী করে। বিহার কেন এত অনুন্নত জিজ্ঞাসা করা হলে, একমাত্র কারণ হিসাবে তিনি দেখান—দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব। দুর্নীতি নয়, শ্রম ও সম্পদের অর্থনৈতিক শোষণ এই দুয়ের কোনটাই নয়। বর্তমানে বিহারে যদি দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব থাকে, তবে তার অর্থ হয় যে, অতীতে সেখানে ভাল নেতৃত্ব ছিল। আর যদি তাই হয়, তবে অতীতে বিহারের উন্নতি করারই কথা। কিন্তু কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। তিনি স্বয়ং প্রশ্ন করলেন—পাটনা কলেজ কেমন চলছে। এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জনৈক ছাত্র বলেন, "যতটা খারাপ চলা সম্ভব।" পাটনা কলেজের এই দুরাবস্থার কারণগুলি কিম্বা বাস্তবিক অবস্থাটা কি জানার চেষ্টা না করেই শ্রীমিশ্র বলে উঠলেন যে, তাদের সময় এটা তত খারাপ ছিল না। আমরা ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম যে, একজন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী অন্ততঃ কিছুটা বাস্তববাদী হবেন এবং শুধুমাত্র ঘটনাগুলি জেনেই কথা বলবেন।

রেলমন্ত্রী তার মস্তিষ্ক প্রসূত, 'ছাত্রদের জন্য বিশেষ ট্রেন' চালু করার ব্যাপারে খুবই উৎসাহভরে কথা বললেন। 'ডাইনিং কার' যুক্ত এই ট্রেনগুলি কোন এক বিশেষ ষ্টেশন থেকে শুরু হবে। রেল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে, স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষরাই পথচলগুলির গতি-পথরেখা ঠিক করবেন। খাবার বিতরণ করা হবে সুলভ দামে—পেটভরে খাওয়ার জন্য এক টাকার মতো আর প্রাতরাশের জন্য ৬০ পয়সা। শ্রীমিশ্র মনে করেন, এরকম ভ্রমণ জাতীয় সংহতির বিকাশ ঘটাবে। যদিও, আশ্চর্যজনকভাবে, শ্রীমিশ্র জাতীয় সংহতি কিভাবে আসবে, তা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হন।

দিল্লী থেকে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল, কাশ্মীরে পৌঁছালাম। কাশ্মীর সম্বন্ধে একটা কথা খুবই সত্য—কাশ্মীরীরা কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা বলেই মনে করেন। আমাদের থাকার সময়েই শ্রীনগরের বাজার অঞ্চলে কিছু গণ্ডগোলের সূচনা হয়। একজন কাশ্মীরীকে গণ্ডগোলের কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, জনগণের (কাশ্মীরের—সঃ মঃ বীঃ) সাথে ভারত সরকারের পুলিশের একটা সংঘর্ষ হয়েছে। আমরা লক্ষ করলাম যে, কাশ্মীরীরা নিজেদেরকে কাশ্মীরী ছাড়া আর কিছু বলেই মনে করেন না। তবুও রাষ্ট্রটির স্বাধীনভাবে থাকা সম্ভব নয়, কারণ তা সামরিকভাবে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থিত যে, কোন শক্তিই সেখানে এই শূণ্যতা (Vacuum) সহ্য করবে না।

'সুখের উপত্যকা কাশ্মীরে'র সব প্রসিদ্ধ জায়গাই জাহাঙ্গীর, শাহজাহানের মত বিখ্যাত মোগল সম্রাটদের আর আমাদের যুগের 'মোগল-সম্রাট' নেহরুর নামের সঙ্গে যুক্ত। আমরা উপলব্ধি করি যে, কাশ্মীরের বহু বিজ্ঞাপিত ধর্মসমস্যা পুরোপুরি একটা ধাপ্পাবাজী। যদিও কাশ্মীরীদের ৯০ শতাংশই মুসলমান, সারা কাশ্মীর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা শিবমন্দিরগুলিকে তারা যথেষ্ট সম্মান করেন। তাদের এই শ্রদ্ধা নিশ্চিতভাবেই আমাদের 'ধর্মনিরপেক্ষ' মন্ত্রীদের বাণীর ফলশ্রুতি নয়। কার্যত, কাশ্মীরের রাজনীতিতে ধর্মের কোন জায়গা নেই। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই এটাকে চাপিয়েছেন রাজনীতিবিদরা—যাদের কিছু স্থানীয় কিন্তু অধিকাংশই বাইরের।

কাশ্মীরীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁদের প্রাক্তন শাসক হরি সিংকে তাঁরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু হরি সিং-এর ছেলে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় পর্যটন ও বিমান পরিবহন মন্ত্রকের মন্ত্রী, করণ সিংকে সাধারণত কেউ পছন্দ করেন না। একজন বললেন, করণ সিং তাঁদেরকে বিক্রী করে দিচ্ছেন। কিন্তু কার কাছে তিনি কাশ্মীরীদের বিক্রী করছেন, আমাদের কেউই আর তা জিজ্ঞাসা করে নি। কাশ্মীরীরা সুনিপুণ কারিগর এবং খুব কঠোর পরিশ্রম করেন। তথাপি তাদের অধিকাংশই 'দিন আনেন দিন খান'। যাঁরা সর্বোৎকৃষ্ট কাশ্মীরীশাল বা কাঠের জিনিষপত্র তৈরী করেন, তাঁদের আয়ও খুবৎসামান্য। আয়ের অধিকাংশটাই তাদের তুলে দিতে হয় অন্যের হাতে। 'হাউসবোট'গুলির মালিক সাধারণত কতিপয় ধনী

জম্মু ও কাশ্মীরের পেছনেই সবচাইতে বেশী টাকা ব্যয় করেন। তথাপি, এটা পরিহাসের বিষয় যে, কাশ্মীরের জনগণ এত গরীব। এটা কি এই কারণেই যে, সরকার সেখানে শুধুমাত্র পর্যটক আর সৈন্য-বাহিনীর জন্য চিহ্নিত ?

শুধুমাত্র দিল্লী আর শ্রীনগরই হল সেই ছু'টি জায়গা, যেখানে আমরা

মনে করি, এই পর্যটন থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের কি লাভ হল, তা না বলাই সবচেয়ে ভাল। তাহলে, এই পর্যটনের উদ্দেশ্য কি ছিল ? এটা কি শুধুমাত্র যারা এর পয়সা দিতে পারে, তাদের আমোদের জন্য আয়োজিত হয়েছিল ? যদি তাই হয়, তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে টাকাটা পুরোপুরি জলে গেছে।

প্রবন্ধটি 'অয়েস্টার (Oyster) পত্রিকায় (জুলাই সংখ্যা, '৭৩) প্রকাশিত The Trip রচনাটির বাংলা অনুবাদ। ভাষান্তর : মণিকা রায়

# শৈশব

ধারাবাহিক উপন্যাস

শঙ্কর বসু

**পূর্বকথা :**

অন্ন গ্যাছে নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীর বিধবা স্ত্রী হিসেবে প্রাপ্য সরকারী সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিতে। সতু জলায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত ভাখে, সূর্যটা কুট্টি বোনের মতো রক্ত তুলে অস্ত যায় রোজ। অন্ন ফেরার আগে চন্নুর মা, চন্নু কারো সাধাসাধিই ওকে খাওয়াতে পারে না। অন্ন ফিরে আটা ধার করে আনলে তবে খাওয়া। লাইন দিয়ে সতুর দিদি সরি মিলিক পাউডার আনে, কাঠগোলা থেকে ফুলকি চেয়ে আনে তবে সংসারটা চলে। এর মধ্যে সতু কানাই মাষ্টারের ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। কচুর শাক, থারকোন পাতা কটা দিয়ে বাঁচার একটা দুর্দান্ত চেষ্টায় ছোট্ট পরিবারটা হাঁপায়। ঢালাই কারখানায় রণ'র বাবা কাজ করে। সতু দেখেছে ওরা বড্ডো গরীব। ভাসতে ভাসতে পাকিস্তান থেকে রেফেউজী হয়ে এসেছিল। রণ'র ঠাকুমা সুতলীর চশমা চোখে দিয়ে পদ্মপুরাণ পড়ত। আর রণ'র তো লেখাপড়াই হল না। কাজে ঢুকবে। কারখানায়। সেই যখন রণরা এল তার ক'দিন আগেই ভূমিকম্পের তরাসে শাঁখ বাজিয়ে স্বাধীনতা এসেছিল। রণ'র বাবাই সতুকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে সতুর বাবা মারা গ্যাছে। সতু আগে জানত তার বাবা পাকিস্তানে আছে, ট্রেনে করে ফিরবে।

আর এখন তো অন্ন পেটের ধান্ধায় প্লাষ্টিক কারখানায় কাজ নিয়েছে। কাজটা পাওয়ার পর অন্ন যেন আরো রুক্ষ হয়েছে। চন্নুর দাদুর মুখে সতু অন্নছত্রের কথা শোনে। যুদ্ধের বাজারে লাল হয়ে চন্নুর দাদু গরীব দুঃখীকে দুটি খাওয়াত। লম্বা আটচালাটা এখন সেই সাক্ষ্য বহন করে। আর পেটের ধান্ধায় জংলা-বাদা ঘেঁটে সাতরাজ্যি ঘুরে শাক লতাপাতা জুটিয়ে কোন মতে সতুদের সংসারটা চলে। মাতো আয় করে মোটে তিরিশটা টাকা। এদিকে পেট তিনটে।

সরির শরীরটা খারাপ। সতুকে ইস্কুলে যাওয়ার পথে চাটি কাঁকড়া আনতে বলল। কাঁকড়া কি আর অত সস্তা। তার ওপর ডোবা জলা বুজিয়ে কারখানা হচ্ছে এখন। বিরাট কর্মযজ্ঞ। অন্ন বলে শরীলের রক্ত জল করে ঘাম হয়। সতুর বিশ্বাস হয় না। তাহলে তো মানুষ কবে চোখ উল্টে দিত। পৃথিবীর বুকে রেললাইন পেতে এই যে মানুষ কঠোর পরিশ্রমের ইঞ্জিন ভেঁপু বাজিয়ে ছুটিয়ে চলেছে তাতে কি আর বেঁচে থাকত। কিন্তু পরিশ্রমী মানুষগুলোর নেংটি পরা শরীর দেখে ছেলেটা ভাবে—মানুষগুলো এতো খেটে কি পায় ? আর এই কারখানা গড়তে গিয়েই তো লিঙ্গরাজ মরল। আগে সতু জানত লিঙ্গরাজ দুর্ঘটনায় মরেছে। বিহারী এক মজুর বলল কোম্পানী খুন করেছে। সতু ঘরে ফিরে দিদিকে সেই খবর দিলে, সরি আতঙ্কিত হয়। ওকে চুপ করে থাকতে বলে। আর হঠাৎ মার নামে কি একটা অকথা-কুকথা শুনে সরির শরীরটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সতু জানতে চাইলেও সরি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না। সতু যে এখনও বড্ডো ছোট।

॥ 8 ॥

ক্যাওড়াপট্টির রুক্ষু তামার মতো পোড়া শরীর, লম্বা ঝুল হাতাতি চোয়াল, আর ঝাঁকড়া মাথার ওপর মাছের পিত্তি ফাটা আকাশ। ফিকে হলুদ আর রক্তের একটা তেলতেলে ছোপ নিয়ে আকাশটা লদলদ করছে। বুদবুদের মতো আকাশটা হঠাৎ নিঃশব্দে ফেটে গ্যাছে। আর ফাটা বুদবুদের তলায় বেল্লিক ডাঁটো জীবন। জলার একহাত

ওপরে ব্যাঙের ছাতার মতো মাথা তুলে আছে ক্যাওড়াপট্টির বেঁটেখাটো সার সার ঘুপচি। আকাশের নিচে ক্যাওড়াপট্টির বুড়ো-হাবড়া, ছানা-পোনা, খিস্তি-খেউর আর ব্যাঞ্জোর পিঁ-পিঁ সুর।

গলুর দাদা শ্যামের থ্যাবড়া গাঁটালো আঙুল আলগোছে ব্যাঞ্জোর বোতাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে যন্ত্রটার কলিজা নিংড়ে নিংড়ে কেমন এক করুণ সুর ফোটাচ্ছিল। বেঢ়প একটা যন্ত্র। অথচ সুরটা কি আশ্চর্য করুণ, বেদনার্ত। ঠিক যেমন রণ'র বাবার কপালের মোটা রগ থেকে ঘাম ঝরে পড়লে, হাতুড়ীর বিকট শব্দে গনগনে লাল লোহার পাতে ফুলকি ফোটে। ইস্পাতের ফুল। ঝিরঝিরে লোহার বাবরি। পরিশ্রমের পারিজাত। সদুর কাঠির মতো পাঁচটা আঙুল গালে দেবে বসেছে। সুরটা কেঁপে কেঁপে সদুকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে চলেছে। ক্ষেমিপিসির মুখের কুটিকুটি রেখার মতো সারাটা আশমান জুড়ে নিষ্ঠুর শোকের চিহ্ন কেটে কে যেন এক করুণ কাহিনীর মালা গেঁথে চলে—রণ'র ঠাকুমা গালের দু'পাশের খোদল ব্যাঙের পেটের মতো ফুলিয়ে ফুলিয়ে সারাটা জীবনের যে গল্প অহরহ বলে—গুতা খাইতে খাইতে জীবনটা শ্যাষ....অখন ন্যাতার মতো পইড়্যা আছি। অখন গেলেই বাঁচি....। এক বেলার অনাহারে আলজিভ নাড়ার তাগত-টুকুও আর নেই। হঠাৎ খেই হারিয়ে রণ'র ঠাকুমা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। অন্নর মুখে, চন্নুর মার মুখে এক আশ্চর্য কৌশলে সমবেদনা জাগাতে চেষ্টা করে। তারপর চন্নুর মা চা রুটি দিলে, অন্ন দীর্ঘশ্বাস ফেললে, রণ'র ঠাকুমা একখানা রুটি কায়দা করে কোচড়ের ভেতর লুকিয়ে ফেলে। ঝট্ করে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ কোন কথা না বলে ডেরার দিকে হাঁটা ধরে। এসে হয়তো রণ'র মুখখানা নারকেল ছোবার মতো শুকনো দেখে জিজ্ঞেস করে: অ মনু!.... মনু রে!

রণ তিতিবিরক্ত: কি ই ই?

—ক্ষুদা লাগছে?

—ন ন্ না।

—উঁহু মুখখান শুকনা দেখি।

—রুটি চেয়ে এনেছো ঠিক?

—ক্যান আমি কি ভিক্ষুক!

—তাইলে আনো ক্যান!

—সাধা অন্ন পায়ে ঠ্যালতে নাই বুঝলি...শোন তয়, আমাগো গ্যাশে ছিল এক....।

—যাউক হইছে। ভিক্ষুক জানি কোথাকার!

—কি কইলি! কি কইলি তুই!........

ভাঙা মাজার ওপর দলাপাকানো শরীরটা শক্ত করে দাঁড় করানোর চেষ্টায় রণ'র ঠাকুমা তখন হাঁপায়। বড্ডো হাঁপায়। আর আস্তি কালের কালচে পাকা সর্দি বুকের ভেতর ঘড় ঘড় ডাক ছাড়ে।

এইসব কথা, কাহিনী শ্যামের ব্যাঞ্জোর ধরা পড়ে। সদুর অতিশয় পরিচিত দুনিয়ার উদোম পেটটা আর অসাড় বেকুফ দুঃখ শোক সব কেমন হাত পা খেলিয়ে নাচতে থাকে করুণ সুরের তীক্ষ্ণ শব্দে।

আর গলুর দাদার চিকন গোঁফ ছুঁয়ে আবছা হাসির বাঁকা রেখা জাগল। দুখেরও হতে পারে। গভীর কোন দুঃখের। কে জানে সাইকেল কারখানার মিস্ত্রিটার মনে কি আছে। সদু জানেনা। সদু বোঝে না। কেবল সুরটার নাড়ী ছেঁড়া টানে ও গলুর দাদাকে কথাটা বলতে পারল না, যে কথাটা বলার জন্যে সেই থেকে বসেছিল। ও কেবল তন্ময় হয়ে দেখছিল কি করে মানুষটার বিদিকিচ্ছিরি আঙুল জলের মতো তিরতির করে বয়ে চলেছে।

ক্যাওড়াপট্টির মদ্দোগুলোর পেটে এক ফোঁটা চোলাই পড়লেই আর রক্ষে নেই। নাকের ফুঁটো দিয়ে পাতলা সর্দির মতো জল গড়ায়, কেঁদে ভাসায় কেউ কেউ। মুখ ভ্যাটকে, কোদাল দাঁত বের করে খিস্তি দেয়। হল্লা করে। মদ্দোগুলো মোরগলড়াইর মতো ঝাপটা-ঝাপটি করে। গলুর দাদা সারাটা ক্যাওড়াপট্টির বিস্ময়। মানুষটাকে কোনদিন বেচাল হতে দেখেনি সদু। খাটেপেটে আর ব্যাঞ্জো নিয়ে থাকে। সদু হঠাৎ ফস্ করে বলে উঠল: আমাকে শেখাবে?

—হুঁ।

—কবে!

—হবেখন যা...বলে তিন বছর ঠায় এক গুরুর পিছনে লেগে তবে এইটুকু....আর শালা যা নোংড়ার জান্তু....জিন্দেগীতে কুর্তা সাফ করতো না....।

—শেখাবে তো?

—বললুম তো হবেখন।

ব্যাঞ্জোটা তুলে রাখতে রাখতে আপন মনে বকছিল শ্যাম। আর ছেলেটার লোভী চোখ যন্ত্রটাকে তারিয়ে তারিয়ে চাটতে লাগল। শ্যামের বিড়বিড়ানি চড়তে লাগল: বৈজু বাওরা দেখেছিস....যা বই না একখানা উফ্....ধুস্ শালা কার সাথে কি বকে মরছি....চুনোপুঁটি যা যা ভাগ।

খট্ করে একটা শব্দ হল। শ্যাম বাক্সটায় তালা লাগাল। তারপর গাঢ় নীল সার্টটা গায়ে চাপিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। গলুর দাদা সেই যণ্ডবাবুর বাজার ছাড়িয়ে কোথায় যেন কাজে যায়। সাইকেল কারখানায় কাজ করে। চলেও তেমনি। হনহনিয়ে।

বেমালুম স্ফূর্তিতে শিষ দিতে দিতে অশথ গাছের মাটি ফেঁড়ে জাগা শেকরের জটলার ভেতর দিয়ে শ্যাম মিলিয়ে গ্যালো। শ্যাম মিলিয়ে যেতেই সদুর কেমন ভয় ভয় লাগল। কেমন একটা তরাস্। যদি গলুকে কক্ষনো না ছাড়ে।

অন্নর কারখানায় কাজটা পাওয়ার পর থেকে সন্থুর পোয়া বারো হয়েছে। এমনিতেই একহারা কালো পানা ছেলেটা সন্থুকে টানত। সন্থুকে টানত গলুর পেয়ারা ডালের শিঙের মতো গুলতিটা। আর অন্ন কিছুতেই সন্থুকে গলুর সাথে মিশতে দিত না। তাইতেই টানটা লুকিয়ে ছিপিয়ে এমন বাড় বেড়েছে যে গলুর জন্য সন্থুর আকণ্ঠ তৃষ্ণা। আর গলুর সাথে দু চার দিন মিশতেই এখন কেমন নেশার মতো। কানাই মাষ্টারের ইস্কুলকে কলা দেখিয়ে, গলুদের বাড়ীতে বই-শ্লেট রেখে ট্রেনে করে সেই যেদিন সোনারপুর গেছিল, আনন্দে আর উত্তেজনায় সন্থু হার্টফেল করছিল। উফ্, এ্যাতো মজা! আর আজ গলুকে চেকারে ধরেছে। আজ সন্থুর কেমন ভয় লাগছে। কেমন একটা আশঙ্কা। এ্যাতো ভয় যে সন্থু কাউকে কথাটা বলতেই পারছে না। গিলতেও পারছে না। একমাত্তর ক্ষেমিপিসি ছাড়া আর কারো কাছে মুখ খুলতে পারবে না।

ওদিকে বেলা পড়ে আসছে। ওষুধ কোম্পানীর লাগোয়া পুকুরের ফনফনা কচুরির টেপাটোপা গায়ে মিঠে আলো চিকচিক করছে। এখন না ফিরলেই অন্ন টের পেয়ে যাবে। নাহলে সরিই বলে দেবে। এমনিতে সরির কাছে ভাই কলজের টুকরো। কিন্তু এ ব্যাপারে কেমন অদ্ভুত শক্ত। একটুও মায়া নেই। এই তো সেদিন মা আসতেই বলল : জানো মা সন্থু আজ ইস্কুল পালিয়ে কোথায় যেন গেছিল! আর যায় কোথায়! আস্তো একটা তালপাতার পাখা ফর্দাফাই করে ফেলল। শেষে বিলাপ। নিজের মনে বিলাপ। আজন্মের দুঃখ শোক সাঁড়াশী দিয়ে বুকের ভেতর থেকে টেনে টেনে আনতে লাগল—আমার কপালে সুখ লেখে নাই····একটা ছাওয়াল ···হা ভগমান····।

বুকের ভেতর থেকে কথাগুলো টেনে তোলার সময় ভেতরটা ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়। সমস্ত জীবনের কষ্ট শরীরের কোষে কোষে আশ্রয় নিয়েছে। কথাগুলো মাংসের সাথে হৃদপিণ্ডের সাথে লেপটে থাকে। রক্ত মাংসের এক একটা ডেলার মতো কথাগুলো অন্ন নির্মমভাবে বুকের ভেতর থেকে ছিঁড়ে আনে : কে কার দুঃখ বোঝে····।

এসব শুনলেই সন্থুর কচি বুকটায় মোচড় দিয়ে ওঠে। ও নিষ্ঠুর ভাবে ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফ্যালে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে : মা! আর কক্ষনো করবো না····ওমা····মা ···।

ওদিকে অন্ন'র দুঃখের ভেলা ভাসতে ভাসতে চলে : তেরো বছরের কালে বিয়া হইছিল·· ····স্বামী কি বস্তু বুঝি নাই · জেলে জেলেই কাটাইছে····পঁচিশ বছরের কালে বেধবা হইলাম····।

ধীরে ধীরে সরির মুখে এক ফালি গাঢ় কালো মেঘের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে। অন্নর পাশে সরি নিঃসাড়ে এসে বসে। সরির মুখে কথা যোগায় না, গলার নলী শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। আঁচলের খুঁট দিয়ে অন্ন ফুদি ফুদি নাক মুছে নেয়। সরি তখন অন্ন'র পায়ের নোখ থেকে ময়লা খুঁটে তোলে আর ভাবে : না বলেই বা কি করব? সন্থুরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে····।

হিম বাতাস সন্থুর বুকের উঁচু হাড়টা ছুঁয়ে কোথায় যেন মিশিয়ে গ্যালো। ক্যাওড়াপট্টির মাথার ওপর বিষাদের আকাশ। কাকপক্ষী ডানা ঝাপটিয়ে, আলজিভ বের করে, ভয়ভরে শব্দ করে উড়ে পালাচ্ছে। কোথায় যেন উড়ে পালাচ্ছে। এবার অন্ন'র ছুটি হবে। আর ছুটি হলেই দুখানা হাড়ের ওপর দাঁড়করানো লম্বা ঢ্যাঙা শরীরটা ছ্যাঁচড়ে ছ্যাঁচড়ে টেনে অন্ন ফিরবে। শ্লেটটা বগলের তলায় চেপে ও ক্যাওড়াপট্টির গলিঘুঁজি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। বেরিয়ে আসতে গিয়ে দপ করে আবার গলুর কথা মনে পড়ে গ্যালো। যদি ওকে না ছাড়ে। কোনদিন না ছাড়ে।

অশথ গাছটার তলায় সবসময় কেমন একটা অন্ধকার সাপের মতো শিরশির করে। পিছলা অন্ধকার। ঐ গাছটার তলায় ক্ষেমিপিসির বর হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেছিল। আর খাড়া হয়নি জীবনে। ক্ষেমিপিসি ফাঁক পেলেই গাছটার তলায় গুলের কৌটো হাতে নিয়ে বসে থাকে। ক্যাওড়াপট্টির ক্ষেমিপিসি। ক্ষেমিপিসির বয়েস কত কে জানে। সারাটা ক্যাওড়াপট্টিই গলুর পিসিকে ক্ষেমিপিসি বলে ডাকে। বিয়েথা. পুজোআচ্চা, আপদবিপদ, সবেতেই ক্ষেমিপিসি। ক্যাওড়াপট্টির অশথ গাছটার জটাল শেকরের মতো ক্ষেমিপিসির বুক থেকে সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা বেরিয়ে সারাটা মহল্লার মানুষের হৃদপিণ্ডে ঢুকে গ্যাছে। মদ্দোগুলো যখন চোলাই টেনে, চোখের তারায় আগুনের ফুল ফুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরস্পরের ওপর—তখনও ক্ষেমিপিসি থুতু ছিটিয়ে আঁচড়ে থামচে জন্তুর মতো লালা ফেলে সামাল দেয় : তেজ দ্যাকানোর আর জায়গা পেলিনি····মরদরে····গতভে্র ছেলের সঙ্গে লড়গে যা··· ছাড়··· ছাড় বলছি পোড়ার মুখো····। আর থুতু ছেটায় : থুক্ তোর জীবনে····থুক্ তোর···।

থাবলা থাবলা থুতু ফ্যালে মাটিতে। মনে হয় ক্ষেমিপিসি যেন সত্যি সত্যিই জীবনটার ওপর থুতু ফেলছে। শ্যাল কুত্তার জীবন। সন্থু দেখেছে ওদের বাগানো মুঠোগুলো তখন কেমন ঢিলে হয়ে যেত। আস্তে আস্তে মাথাটা ঝুঁকে পড়ত মাটির দিকে। ঠিক যেখানটায় ক্ষেমিপিসি থুতু ফেলেছে। আর কেমন যেন অসহায় হয়ে যেত চোয়ার মুখগুলো। ঠোঁটের খ্যাঁতলানো মাংস জিভ দিয়ে টেনে বিড়বিড় করত : ওই তো আগে লাগতে এলো ···। আমি বলে মচ্ছি নিজের জ্বালায়····।

সন্থু ফ্যাল ফ্যাল করে অপদস্থ আতঙ্কিত মানুষগুলোকে দেখত। আর ক্ষেমিপিসির গলায় পাকা গয়েরের মতো ঘেন্না ঝরে পড়ত। কুত্তার মতো মানুষগুলো একজনকে আরেকজনের দিকে লুলিয়ে দিয়ে কি যে আনন্দ পায় সন্থু বুঝত না। গলু বলে : জ্বালা মেটায়। সাপের

যেমন তিথি নক্ষত্রে বিষ বাড়লে কলাগাছে ছোবল দেয় তেমনি……। কিন্তু কিসের জ্বালা ? পেটের ? পেটের জ্বালা কি সন্থুর হয় না কখনও ! কই ও তো কাউকে আঁচড়াতে কামড়াতে যায় না। তবে ? তবে কি ক্ষেমিপিসি যে জীবনে থুক ফ্যালে, সেই জীবনের জ্বালা। জীবন মানে কি ? জ্যান্ত। জীবন্ত। নাকি বেঁচে থাকা ? জীবন কাকে বলে ?

অশথ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে, মাথার ওপর জলদ আকাশটাকে নিয়ে ক্ষেমিপিসি নির্বিকার বসেছিল। আর অলস মন্থর গতিতে মাড়িতে গুল ঘষছিল। মুখের চেরাচেরা জালি জালি দাগ আর অজস্র রেখার আঁকিবুঁকিতে ক্ষেমিপিসি তখন অশথ গাছটার সাথে মিশে গ্যাছে। হঠাৎ বৃষ্টি এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে বৃষ্টি আর বিদ্যুতের কড়াৎ কড়াৎ শব্দ। বিদ্যুত যেন কাঠগোলার করাতের মতো আকাশটাকে ফালি দিচ্ছে। সন্থু ক্ষেমিপিসির গায়ের সাথে লেপটে দাঁড়িয়েছে। ক্ষেমিপিসি আঁচল দিয়ে সন্থুর মাথাটা ঢেকে দিয়ে মুখটিপে হাসতে লাগল। জালি জালি দাগগুলো আশ্চর্য্য রহস্যে বেঁকে দুমরে যাচ্ছে ক্রমশ।

—আকাশটা একেবারে কেঁদে ভাসাচ্ছে……।

—আকাশ কাঁদলে বুঝি বৃষ্টি হয় ?

—হুঁ।

—আকাশের আবার দুঃখ কিসের ?

—সে অনেক কথা !

—বলোনা !

—শোন তাহলে……আকাশ হল গিয়ে তোর পিথিবীর গভভোধারিনী… জননী……আর মানুষ হল তার সন্তান।……মানুষের দুঃখের তো আর ক্ষ্যামাঘেন্না নেই…সেই দুঃখ শোক মেঘ হয়ে চোখের জলের ফোটার মতো আকাশে ভাসে……মানুষের দুঃখে আকাশটা কাঁদে। কিন্তু মানুষ কে ভাখ !

ক্ষেমিপিসি বেঁটে আঙুলের ডগায় গুল নিয়ে মাড়িতে ঘষতে ঘষতে কেমন আনমনা হয়ে যায়—কেন বল দিকিন…মানুষ কেন মানুষের দুঃখ বোঝে না……।

রণর ঠাকুমার চোখের ছানির মতো, চুনের জলের মতো, সারাটা ক্যাওড়াপট্টি কেমন আবছা ঘোলাটে হয়ে উঠল। গলুদের দাওয়াটাও আর ঠাহর হয় না। দূরে একটা লেড়ীকুত্তার আবছা ছায়া ঝট্ করে সরে গ্যালো। আর ক্ষেমিপিসি তখনও বিড়বিড় করছে : বলদিকিন……।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তেই সন্থু আঁৎকে উঠল, চোখের কোন চিকচিক করে উঠল : পিসি গলুকে আজ ঢেকারে ধরেছে……কি হবে ?

—হবে আর কি। দু'দিন হাজত ঘুরে আসবে……সে ওর অভ্যেস আছে।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধামসে আকাশটা কাহিল হয়ে পড়ল। বৃষ্টিটা ধরে আসতেই সন্থু পিসিকে কি একটা কথা বলে আলগা বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুট লাগাল।

ততক্ষণে অন্ন ফিরেছে। কে জানে কেন, অন্ন আজ সাত তাড়াতাড়িই ফিরেছে। আর সন্থু মাকে একপলক দেখেই ভয়ে সিঁটিয়ে যেতে লাগল। শুধু মারধোর করলে কথা ছিল না। সন্থুর আতঙ্ক হয় তার পরের অধ্যায়টা নিয়ে। দেয়ালে পিঠ ঠেকেয়ে অন্ন ভেঙে পড়ে। অন্নর কটা চোখ দুটো ওষুধ কোম্পানীর ঘোলাটে জলের অতলে তলিয়ে যেতে থাকে। আর তখন সন্থুর আতঙ্ক হয়। গায়ে কাঁটা দেয়।

অথচ অন্ন আজ বকাঝকা করল না। আজ অন্নর মুখটা অদ্ভুত প্রসন্ন। দেহতত্ত্বের কি একখানা গান গুনগুন করে গাইছিল। সন্থু হাত-পা ধুয়ে ঘরে এসে দেখে সরি কপালের ওপর রুক্ষু চুলের গোছা ফেলে, চোখের কোনে কেমন একটা ধুসর জাল বিছিয়ে মরার মতো পড়ে আছে। আর অন্নর গলার স্বর অদ্ভুত তরল : নে এই সন্দেশখান খা……বুঝলি সন্থু দির বিয়া ঠিক হইয়া গ্যাছে।

অন্নর কথাটা ফুরোনোর আগেই সন্থু সরির হাত ধরে টানতে লাগল। কেমন একটা নেশার ঘোরে সন্থু সরির কোলের কাছে মাথাটা রেখে সাংঘাতিক খুশীতে পাগলের মতো বকতে লাগল—হ্যাঁরে দিদি তোর বিয়ে হচ্ছে।……দই……রসগোল্লা… উফ্ কত কি যে হবে…।

সরি তখনও পাথর, অহল্যার পাষাণ।

আর অবুঝ ছেলেটা তার দিদির চিবুক ধরে টানছিল : কিরে দিদি…… চুপ করে আছিস কেন ?……এই দিদি……বলনা……সানাই বাজবে তো ……বলনা ?

হঠাৎ সরি রুক্ষু চুলের গোছ এক ঝট্‌কায় ছিটকে, চোখের কোনে কাঁচা আগুন জেলে সন্থুর গালে পাঁচ পাঁচটা আঙুল বসিয়ে দিল।

সন্থু চড়টা খেয়ে হকচকিয়ে গ্যালো। ফ্যাল ফ্যাল করে দিদির মুখের দিকে চেয়ে থাকল। আর নিঃসাড়ে বড় বড় কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে নামল থুতনি বেয়ে। অন্ন শব্দটা শুনে বাজের মতো ছোঁ মেরে এসে সন্থুকে কোলে সাপটে নিল—অ্যাছোস ক্যান হারামজাদীর কাছে………। সরি নির্বিকার। সরির যেন হুঁশ নেই। সরির যেন আর কোন দিন হুঁশ ফিরবে না। আর ফটফটা সাদা চোখের মনি নির্মম ভবিষ্যতের এক ছায়া নিয়ে স্থির। আর সন্থু দিদির মুখের দিকে চেয়ে ভয়ভয় বিস্ময়ে বোবা হয়ে গ্যালো। অন্ন তখন সরির চুল চামরা শুদ্ধু উপড়ে ফেলছে : আমি কোথায় ভাল রে বইলা সমন্ধ করলাম……… না ভাত কাপড়ের কষ্ট থিকা বাঁচবো………তা মাইয়ার মনই ওঠে না…… কোথিকা রাজপুত্তুর আইব………হারামজাদীর ত্যাজ কত……।

যাকে নিয়ে এতো কথা সেই সরি গুটলী পাকিয়ে পড়ে থাকল। খাটের

এক কোনে সরি শামুকের মতো শরীরটা গুটিয়ে নিয়েছে। শামুকের মতো সরি যেন নিজের শরীরের ভেতরই ঢুকে যেতে চায়। কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায়, নিজেকে রক্ষা করার দুর্বল প্রচেষ্টায়। আর দিদির মুখের ভাব দেখে সদু চড়টা খেয়েও সরির কাছ থেকে নড়ছিল না। অন্ন চোখের আড়াল হতেই সদু সরির দিকে বড় বড় চোখ দুটো ফুটিয়ে চেয়ে থাকল কি এক উত্তরের আশায়, আশঙ্কায়—কি হয়েছে রে ?

—কিছু না।

—বল !

—সদু তুই কি কিছু বুঝিস না·······আমার যে ভয় করে···কেমন দম আটকে আসে।

—কেন ?

—বিয়ের কথা ভাবলে···· ··।

—কই আমার তো ভয় করছে না।

—আমার করে। ভীষণ ভয় করে রে সদু।

—ঠিক আছে তোকে তাহলে বিয়ে কর্তে হবে না·······

—আচ্ছা তুই বল সিঁদূর আলতা এসব দেখলে ভয় করে না, ভয় করে না তোর ?····কেমন দগদগ করে না রক্তের মতো ?

সরির মুখের ওপর কুচিকুচি চুল লুটোচ্ছে। হঠাৎ সদুর মনে হল দিদি যেন কত বড় হয়ে গ্যাছে। সরির কথায় সদু বুঝতে পারছিল বিয়ের সাথে কেমন একটা শঙ্কা মিশে আছে। উলুধ্বনির মধ্যে কি গভীর এক আতঙ্ক ! কেমন যেন আবছা আবছা টের পায় সদু।

—দেখিস না রণর বাবাকে········বৌটাকে মেরে ফাতা ফাতা করে।

—হুঁ।

—বিয়ে দিলে আমি মরে যাবো দেখিস।

সদু হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে যায় : দরকার নেই···।

অনেক গভীরভাবে চিন্তা করে ও যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গ্যাছে, এমনভাবে কথাটা বলল। আর সদুর ভারভার মুখের দিকে চেয়ে, মুখের কথাটা শুনে সরি কেমন একটা জোর পেল। একটা হাত ভাইয়ের পিঠে আলগোছে রেখে সরি স্বপ্নের গিঁট খুলতে বললো : এই ধর প্লাষ্টিক কারখানা না হলে চাটনীকলে আমিও একটা কাজ জুটিয়ে নেবো····তাহলে তো আর ভাত কাপড়ের জন্য মরবো না··· বেশ কাজে যাবো, আর মাইনে পেলে তোর জন্যে একটা জুতো কিনে দেবো···· তারপর তুই বড হবি একদিন না একদিন····তখন···।

(ক্রমশঃ)

## ঃ ছাত্রবন্ধুদের প্রতি ঃ

ছাত্র বন্ধুগণ,

আপনারা যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশুনো করছেন তার আভ্যন্তরীণ চেহারা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ চিঠি-পত্র পাঠান। আমাদের দেশের বেশীরভাগ সাধারণ মানুষই এইসব 'জ্ঞানের মন্দির'গুলির ভিতরের দুর্নীতিগ্রস্থ প্রাণহীন অবস্থার কথাটা জানেন না। আপনাদের এই ধরণের চিঠি-পত্র প্রকাশিত হলে, তাঁদেরই কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে তাঁদেরই সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনদের কেমন আবহাওয়ার মধ্যে, কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্ক সঠিক ধারণা পাবেন। এর ফলে তাঁদেরই স্নেহাস্পদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে তাঁদেরকে উত্তেজিত করার যে অপচেষ্টা চলে, তার বিরুদ্ধেও এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ হবে। তাছাড়া এতেই আপনাদের পারস্পরিক খবর আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম হয়ে উঠে, 'বীক্ষণ' ছাত্র হিসেবে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার কাজেও সাহায্য করতে পারবে। ॥ সঃ মঃ বীঃ ॥

# রাজনীতির খাতিরে বিজ্ঞান গবেষণা বর্জন

জেমস কে গ্যালম্যান

●[ এই শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত পদার্থবিদ ফ্রাঙ্ক বলেছিলেন—"আমরা বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানকে আফিমের মতো ব্যবহার করে থাকি যাতে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারি এবং সেগুলির ব্যাপারে আমাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারি।" এটিকে 'আবেগপ্রসূত অত্যুক্তি' বললে সত্যের অপলাপ হবে। কারণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে হিরোসীমা-নাগাসাকী ও ভিয়েতনামের ওপর 'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার' শত শত দৃষ্টান্ত। সমাজ যেমন বিজ্ঞানকে নির্ধারিত করে, বিজ্ঞানও তেমনি সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে প্রভাবিত করে। বৈজ্ঞানিক কোন সমাজ বহির্ভূত জীব নন। সুতরাং প্রতিটি সৎ এবং বিবেকবান বৈজ্ঞানিকের প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে এই প্রশ্ন করা দরকার, তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের মাধ্যমে সমাজের ওপর কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাঁকে বিচার করে দেখতে হবে, যে সত্যের অনুসন্ধান তিনি করছেন তা, যাঁরা তাঁকে এই 'নিরালম্বতার' অবকাশ ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন, সমাজের সেই কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনে কি নিয়ে আসছে—আরো তীব্রতর শোষণের কৌশল না শোষণ থেকে মুক্তি? যে সমাজে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসাধারণের কোন ভূমিকা বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না সেখানে প্রথমটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই রকম অবস্থায় বৈজ্ঞানিকের কাছে মাত্র দুটি পথই খোলা থাকে: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও 'বিজ্ঞান-মন্দিরে' 'সমাহিত পুরোহিতের' আত্ম-প্রবঞ্চনার পথটি বেছে নেওয়া অথবা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা করা; এবং তা বিজ্ঞানের স্বার্থেই। কারণ বিজ্ঞানের মুক্তি সামাজিক শোষণের অবসান ছাড়া হতে পারে না।

বর্তমান প্রবন্ধটির নামকরণ যদিও "রাজনীতির খাতিরে বিজ্ঞান গবেষণা বর্জন," কিন্তু শেষ বিচারে এটি **বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞান গবেষণা বর্জন।** জেমস্ স্যাপিরোর মতামতগুলির সাথে আমরা পুরোপুরি একমত নই তবুও তিনি এবং অন্যান্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সামাজিক শোষণের অবসান ও বিজ্ঞানের মুক্তির জন্য সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী সংখ্যালঘু অংশের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাই।—সঃ মঃ বীঃ ]●

**বোস্টন:** গত নভেম্বরে একদল হার্ভার্ড- বিজ্ঞানী ঘোষণা করেন যে ইতিহাসে এই প্রথম এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়াল ভাইরাস[১] থেকে তাঁরা একটি খাঁটী জীন ( gene )[২] পৃথক করেছেন। এই দলেরই একজন প্রধান সদস্য স্থির করেছেন যে তিনি বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হবেন। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের ব্যাক্টিরিওলজি এবং ইম্যুনোলজির ( immunology ) গবেষক ছাব্বিশ বছর বয়সের এই বিজ্ঞানী হলেন জেমস স্যাপিরো।·······নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সালভাডোর লুরিয়া এবং স্যাপিরোর বিষয়টিতে বিশেষজ্ঞ অন্যান্যদের মতে তিনি হলেন সারা দেশে সব চেয়ে সম্ভাবনাময় আনবিক জীনতত্ত্ববিদদের ( molecular geneticist ) অন্যতম।

একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাতকারে স্যাপিরো তাঁর বিজ্ঞান ছেড়ে দেওয়ার সপক্ষে তিনটি মূলকারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

**প্রথমত: তিনি বিশ্বাস করেন যে, যারা বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই সরকার এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি তিনি যে কাজ করছেন তাকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে যেমন ভাবে পারমানবিক শক্তিকে খারাপ কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।**

---

(১) ব্যাক্টিরিয়াল ভাইরাস: ভাইরাস হলো প্রাণের এমন এক স্তর যা আজও বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিস্ময়। জীব ও জড়ের মাঝামাঝি এদের ফেলা যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। এদের মধ্যে একটি হলো আমাদের অতি পরিচিত—ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। ব্যাক্টিরিয়াল ভাইরাস হলো সেইসব ভাইরাস, যারা তাদের থেকে কিছুটা উন্নততর প্রাণী—ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে নিজেদের বংশগতি-নির্ধারক অংশকে ( heriditary material ) প্রবেশ করায় এবং পরে বংশবৃদ্ধি করে। —অনুবাদক

(২) জীন: জীব-জগতের সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবকোষে ক্রোমোসম নামে একটি বস্তু থাকে। জীবভেদে এই ক্রোমোসমের সংখ্যার তারতম্য ঘটে। এই ক্রোমোসমেই জীনের অবস্থান। জীন জীবের বংশানুগতির ( heridity ) এক-একটি একক। —অনুবাদক

**দ্বিতীয়ত : বিজ্ঞানীরা কি কাজ করবেন তা ঠিক করার ব্যাপারে জনসাধারণের মতামতের কোন ভূমিকা থাক, এটাকেও যেখানে অস্বীকার করা হয়, সেই রকম একটি ব্যবস্থার জন্য তিনি কাজ করতে চান না। তৃতীয়ত : তিনি মনে করেন, দেশ আজ সবথেকে গুরুতর যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যেমন স্বাস্থ্য, এবং আবহাওয়া দূষিতকরণ সেগুলির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের থেকে রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজন অনেক বেশী জরুরী।**

( বড় হরফ আমাদের - সঃ মঃ বীঃ )

## দুটি রাজনৈতিক উদ্যোগ :

গত মাস থেকে শ্যাপিরো দুটি রাজনৈতিক উদ্যোগের পিছনে তাঁর সমস্ত সময় নিয়োজিত করতে শুরু করেছেন। এর একটি হলো 'অ্যাফিলিয়েটেড্ হসপিট্যাল সেন্টার' নামে বোস্টনের তিনটি শিক্ষার ব্যবস্থাযুক্ত হাসপাতালগুলিকে নিয়ে হার্ভাড পরিচালিত যে প্রকল্পটি গড়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী, ছাত্র এবং গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সংগঠিত করা।

মেডিক্যাল স্কুলের কাছে ব্ল্যাক রক্সবারিতে এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। কেম্ব্রিজ ক্যাম্পাসের গত এপ্রিল মাসের গোলমালের পর থেকেই এই প্রকল্পটি হার্ভাডের সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের লক্ষ্যবিন্দু হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রটির স্থাপনার জন্য যে জায়গাটি প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল সেটিকে মূলতঃ ছাত্রদের প্রতিবাদের চাপে ছেড়ে দিতে হয় কারণ এর ফলে ১৮০টি কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার গৃহহারা হতেন।

শ্যাপিরোর দ্বিতীয় উদ্যোগটি আরো সাধারণ চরিত্রবিশিষ্ট। বিজ্ঞানীদের তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষিত করাই হলো এর উদ্দেশ্য। তাঁর মতে, **বিজ্ঞানীদের কাজের রাজনৈতিক ফলাফলের দায়িত্ব শেষ বিচারে তাঁদেরই এবং নিজেদের স্বার্থেই তাঁদেরকে অন্যান্যদের সাথে মিলে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যেতে হবে।** ( বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ ) সাধারণ সভায়, টেলিভিশন-সাক্ষাৎকারে এবং বিজ্ঞানীদের ছোট ছোট গ্রুপের সঙ্গে তাঁর জীন-গবেষণা সম্পর্কে কথা বলার সময় শ্যাপিরো এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

....জীন-পৃথকীকরনের কাজে যুবকদের যে দলটি ( এঁদের মধ্যে মাত্র একজনেরই বয়স চল্লিশের উর্ধে ) নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকেই শ্যাপিরোর রাজনীতির সাথে একমত, যদিও গবেষণা ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা অন্যকারুরই নেই। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞানে নিযুক্ত থেকেও ঐ একই উদ্দেশ্যগুলি সফল করা যাবে। অন্যরা বলেন যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্যই তাঁরা রাজনীতিতে পুরোপুরি সময় দিতে পারছেন না। শ্যাপিরো স্বীকার করেন যে একটা উত্তরাধিকার পাওয়ার ফলেই তাঁর পক্ষে ( পেশাগতভাবে—সঃ মঃ বীঃ ) বিজ্ঞান গবেষণার কাজ ছেড়ে দিতে পারা সম্ভবপর হয়েছে। ৩৪ বছর বয়স্ক জোনাথন আর. বেকউইথ ও—যিনি শ্যাপিরোর সঙ্গে প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন, সক্রিয়ভাবে হাসপাতালকেন্দ্রটির বিরোধিতা করেছেন। দলের অন্য একজন সদস্য রিতা আরদিতি ছিলেন এ. এ. এ. এস ( আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স—সঃ মঃ বীঃ ) সভায় প্রতিবাদকারীদের অন্যতম নেতা। বিজ্ঞানে মেয়েদের সমান অধিকারের দাবির খসড়াটি তিনিই বানান। বোষ্টনের সভায় এ. এ. এ. এস পরিষদ এটি বিবেচনা করতে অস্বীকার করে।

ডেলব্রুক এবং হারসে'র সঙ্গে শারীরতত্ত্ব ও মেডিসিনে যিনি ১৯৬৯ সালে নোবেল পুরস্কার পান সেই এম. আই. টি'র ( ম্যাসাচুসেট্‌স ইনস্টিট্যুট অফ টেক্নোলজি ) জীবতত্ত্ববিদ লুরিয়া হলেন শ্যাপিরোর আর একজন সমর্থক। একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে লুরিয়া বলেন, "আমি মনে করি, শ্যাপিরোর মতো সেইসব বৈজ্ঞানিকদের থাকা খুবই প্রয়োজন, যাঁরা বিজ্ঞানের অপব্যবহারগুলিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন।" বিজ্ঞান ছেড়ে রাজনীতিতে পুরোপুরি নিজেকে নিয়োজিত করার যে সিদ্ধান্তটি শ্যাপিরো নিয়েছেন, সেটিকেও তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। শ্যাপিরোর এই কাজের জন্য বিজ্ঞানের ক্ষতি হবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হেসে বললেন, "এমনিতে বিজ্ঞানী অনেক আছেন।....... অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে, ও যা করবে উৎসাহের সঙ্গেই করবে।"

জীন পৃথকীকরণের ঘোষণার সময় শ্যাপিরো যে বক্তব্য রেখে ছিলেন তার মধ্যে এই সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ছিল। বেকউইথ এবং হার্ভাড মেডিক্যাল স্কুলের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র লরেন্স এরোন-এর সঙ্গে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, এই গবেষণার ফলটিকে বিকৃত করে মানুষের ক্ষেত্রে অসদুদ্দেশ্যে জীন নিয়ন্ত্রণের ( Genetic manipulation ) মত ক্ষতিকর কাজে লাগান হতে পারে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যাপিরো বলেন, "আমরা এই কাজটি করছিলাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য, তাছাড়া কাজটি করতে খুবই ভাল লেগেছিল বলে। কিন্তু কাজ করার সময় বিজ্ঞানীদের সাধারণতঃ একটা প্রবণতা থাকে তার ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা না করা। এখন যেহেতু সে চিন্তা করছি তাই পুরোপুরি সুখী হতে পারছিনা আমরা। সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণারই এটা একটা সমস্যা যে, এর খারাপ ফলাফলকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। বিজ্ঞান এবং কারিগরী কৌশলকে নির্দোষ মানুষের উপর, যেমন ভিয়েৎনামে, যেরকম ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে আমাদের মধ্যে অনেকে হতাশ বোধ করছেন। আমি মনে করি না আর আমাদের পারস্পরিক পিঠ চাপড়ানোর স্বাভাবিক অধিকার আছে।"

বক্তব্য থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হল গবেষণা শেষ হওয়ার পর এবং যখন তিনি সাধারণের কাছে এটি বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন তারপরই স্যাপিরো তাঁর কাজের ফলাফলের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেন। তার রাজনৈতিক ধারণা নির্দিষ্ট আকার নিতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে গত বছর পর্যন্ত তিনি রাজনীতির সঙ্গে খুব একটা জড়িত ছিলেন না। হার্ভার্ডের প্রাক্-স্নাতক ছাত্র হিসাবে তিনি চারটি শান্ত—তাঁর ভাষাতে "ভীষণ নিঃসঙ্গ" বছর কাটিয়ে ১৯৬৪ সালে স্নাতক হন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উইলিয়াম হেইসের অধীনে মাইক্রোবিয়াল জেনেটিক রিসার্চ ইউনিটে জীনতত্ত্ব অধ্যয়ন করার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান। সেখান থেকে প্যারিসে যান পাস্তুর ইন্স্টিটিউট-এ ফ্রাংকোয়িস জ্যাকবের অধীনে এক বছরের জন্য কাজকর্ম করতে। কেম্ব্রিজ থেকে জীনতত্ত্বের উপর পি, এইচ্, ডি ডিগ্রী লাভের পর তিনি ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকায় ফিরে আসেন। সময়টা হল চিকাগো ডেমোক্রাটিক কনভেন্সন্ এবং রিচার্ড নিক্সনের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরে। ইউরোপে থাকাকালীন তিনি রাজনীতি অল্পই শিখেছিলেন। কিন্তু যেটা তিনি সেখানে পেয়েছিলেন তা হল —তার নিজের ভাষায়—তাঁর দেশের সমস্যাগুলো সম্পর্কে একটা "চমৎকার ধারণা"। তিনি এও শিখেছিলেন যে, "জীবনকে আক্রমণ-মুখী এবং হিংস্র হতেই হবে এমন কোন কথা নেই।"

তাঁর রাজনৈতিক ধারণাগুলো সাংবাদিক সম্মেলন এবং টেলিভিসনের মাধ্যমে প্রকাশ করলে কিছু বিজ্ঞানী তাঁকে "বিজ্ঞান বিরোধী" এবং "অ-বুদ্ধিজীবি" বলে সমালোচনা করতে থাকেন। একজন বিজ্ঞানী ত' তাঁকে "আজকের প্রদর্শনীতে টাই না বেঁধে আসার জন্য" তিরস্কারই করলেন। এই সমস্ত সমালোচনা স্যাপিরোকে উত্তেজিত করে। তিনি জবাব দেন, "সত্যিকারের বিজ্ঞান-বিরোধী তারাই যারা শস্য-ধ্বংসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে—যারা বিষয়টিকে না জেনেই হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন ( Heart transplantation ) করছে এবং যারা বিনাপ্রয়োজনে গাদাগাদা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে।" প্রকৃতপক্ষে তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর রাজনৈতিক কাজ "গবেষণাগারগুলির বেশীর ভাগ কাজের চেয়ে অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক।" **তিনি বলেন, দেশের সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যেটা প্রয়োজন তা হল, আরও বেশী গবেষণাগারের কাজ নয়, আরও বেশী রাজনৈতিক কাজ** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ) যেমন একটি প্রধান দৃষ্টান্ত হল স্বাস্থ্যবিষয়ক: রোগ নিরাময়ের উপায় আছে, সমস্যা হল, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যে, দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও যেন সে সুযোগ পায়।

স্যাপিরো বলেন যে, বিজ্ঞান এখনো তাঁর কাছে আকর্ষণীয়। … অগ্রগতির সঙ্গে তিনি তাল রাখছেন পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং বন্ধুবান্ধ… সাথে আলোচনা করে। একটি মেডিক্যাল স্কুলের গবেষণাগারে এখ… তাঁর একটা অফিস আছে। তিনি নিজে কোন গবেষণার কাজ… করেন না। কিন্তু আমাদের সাক্ষাৎকারের একটু আগেই বে… উইথ্‌কে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলে… তিনি বললেন, "যদি আমি একেবারে খাঁটি হতাম তাহলে, বোধ… বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম সম্বন্ধে কথাও বলতাম না। কিন্তু আমার বন্ধু রয়েছেন এবং তাঁরা চাইলে আমি তাঁদের সাহায্য করতে আগ্রহী।"

স্যাপিরোর আর একটি মতামত যেটিকে অন্যরা "বিজ্ঞান-বিরোধী" বলে মনে করেন তা হ'ল, গবেষণার জন্য টাকা কোথায় খরচ ক… দরকার সেটা ঠিক করার মত যথেষ্ট জ্ঞান শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক-নির্বিশে… সমাজের সকলেরই রয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি… বিদদের দল জনগণকে, এমনকি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অধীন… ব্যাপারগুলি সম্পর্কেও মতামত দিতে দেয় না। তিনি মনে করে… মহাকাশ গবেষণায় কোটী কোটী ডলার খরচ করার জন্য দায়ী হ… সরকার এবং বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থ। যদি জনসাধারণ… এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হত তাহলে, পরিকল্পনাটি কখনো… আরম্ভ করা হত না, অর্থব্যয় করা হত সেই সমস্ত বিষয়ের গবেষণা… যেমন আবহাওয়া দূষিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে, যেগুলোকে তিনি অনে… অর্থবহ গবেষণা বলে মনে করেন।

বিজ্ঞানীরা কি কাজ করবেন তা ঠিক করবেন সমাজের সকলেই-এটা হল স্যাপিরোর রাজনৈতিক পরিকল্পনার একটা অংশ। তি… বলেন, "কয়েকজনের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের" অবসান ঘটা… হলে আমূল পরিবর্তন দরকার। প্রকৃতপক্ষে তিনি মনে করেন বি… কি কাজ করবেন সেটাও জনসাধারণ ঠিক করবেন। তিনি বলে… "এই ব্যাপারটিও সম্পূর্ণভাবে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে নয়।"

প্রাচীনপন্থী বৈজ্ঞানিকদের অনেকের কাছেই এ ধরণের উগ্র প্রগতিশী… মতামত—চরম, এমনকি ছেলেমানুষী বলে মনে হতে পারে। কি… বেশী বেশী করেই নবীন এবং ভাবী বিজ্ঞানীরা স্যাপিরোর মত ভাবছে… যে, আমেরিকার বর্তমান সমাজব্যবস্থা হল ধ্বংসাত্মক এবং বিজ্ঞানীর… প্রায়শই সচেতনভাবে কিছু কিছু ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য দায়ী… এমনকি পুরাণো অনেক রক্ষণশীল বিজ্ঞানীরাও এব্যাপারে একমত হবে… যে স্যাপিরো তাঁর কথাগুলিকে সার্থক করে তোলার জন্য এক বিরা… আত্মত্যাগ করেছেন।

রচনাটি 'সায়েন্স' (Science) পত্রিকায় (ভল্যুম: ১৬৭, ১৬৩) প্রকাশিত Harvard Genetics Researcher Quits Science For Politics লেখাটির ভাবান্তর।

অনুবাদক: শিবশঙ্কর দাশগুপ্ত

# প্রতিবেশী চীন

চীন-প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসু শ্রীমতী ইন্দিরা বসুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

●[ ভারতবর্ষ আর চীন। পরস্পরের প্রতিবেশী এশিয়া ভূখণ্ডের এই দুই মহান দেশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি আর ভাবের আদান-প্রদান ঘটেছে সুদূর অতীত কাল থেকে। কিন্তু ১৯৬২ সালে সুপ্রাচীন এই মৈত্রীবন্ধনে আকস্মিক ছেদ পড়ে। 'হিন্দি চীনি ভাই ভাই'-এর আকাশকে দখল করে 'সীমান্ত বিরোধে'র বিষাক্ত বাতাস। তারপর থেকে চীন, আমাদের কাছে এক নিষিদ্ধ দেশের নাম। চীন সম্পর্কে নানাধরণের পরস্পরবিরোধী সংবাদ আমরা শুনে আসছি এ ক'বছর ধরে! স্বভাবতই, ৮০ কোটি মানুষের দেশ—আমাদের এই প্রতিবেশীকে ঘিরে আমাদের মধ্যে আজ জমা হয়েছে অজস্র প্রশ্ন, অনন্ত কৌতূহল।

১৯৬২ সালের পর, ডাঃ বিজয় বসু এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা বসুই হলেন প্রথম বে-সরকারী ভারতীয় যাঁরা চীন ঘুরে এলেন। তাঁদের কাছে আমরা, আমাদের এই অজস্র কৌতূহলগুলির মধ্যে যেগুলি সবচাইতে সাধারণ চরিত্রের, সেগুলিকে রেখেছিলাম এবং তাঁরাও, তাঁদের সাধ্যমতো সেগুলির উত্তর দিয়েছেন।

এই উত্তর দিতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই, উত্তরের সাথে সাথে তার আদর্শগত ব্যাখ্যা হিসাবে অনেক ক্ষেত্রেই যেসব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে—তার সাথে সবাই একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু ব্যাখ্যাগুলি সম্পর্কে মতামত যাই হোক না কেন, তার মধ্য দিয়ে বর্তমান চীনের বাস্তব অবস্থার যে ছবি পাওয়া যায়, তা যে সবারই পক্ষে মূল্যবান হবে তাতে সন্দেহ নেই। —সঃ মঃ বাঃ পিঃ]

## সমাজ

প্রশ্ন—আমাদের দেশে যেমন বছরের অর্ধেক সময় জুড়ে বন্যা আর অপর অর্ধেক সময় জুড়ে খরায় কোটি কোটি লোক না খেয়ে মারা যান, ঘরবাড়ী হারান, ফসল নষ্ট হয়, জমি অনাবাদী পড়ে থাকে, চীনে কি সেরকম হয়?

ডাঃ বসু—আগে হ'ত। কুওমিণ্টাং শাসনের সময় আমি নিজে দেখেছি—বহু লোক না খেয়ে মারা গেছে, পীত নদীর বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়েছে, মারা গেছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে চীনের যখন মুক্তি হল, তারপর থেকে লোকের কাছে ওগুলো ইতিহাসের কথাই হয়ে আছে। এখন তারা নদীতে বাঁধ দিয়েছে, জলে সেচের ব্যবস্থা করেছে, জমির ফসল যাতে বাড়ে তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে। এখন আর কোন বন্যাও হয় না। কিন্তু খরা হলে পরেও তাদের জমির ফসলের কোন তারতম্য হয় না, কারণ, সেচের ব্যবস্থা এত ভালো হয়েছে।

প্রঃ—চীনে বেকারের সংখ্যা কত?

বসু—চীনে এখন আর কোনও বেকার নেই। চীন একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ। সমাজতান্ত্রিক দেশে, আমাদের ধনতান্ত্রিক দেশের মত, বেকারসমস্যা হতেই পারে না। ওখানে সবাই কাজ পায়—সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ। তাদের লোকের ভীষণ দরকার।

প্রঃ—চীনে কি ভিখারী দেখেছেন?

বসু—চীনের সমাজব্যবস্থা আমাদের মতো নয়। যখন কুওমিণ্টাং-শাসনব্যবস্থা ছিল তখন আমাদের মতো সেখানেও ভিখারী ছিল। আমাদের দেশে এখন সেই ধরণের সমাজব্যবস্থাই রয়েছে। কিন্তু চীনের জনসাধারণের মুক্তি হয়েছে। অর্থাৎ সেখান থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নির্মূল হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে সব সামাজিক পীড়াগুলি দেখা যায়, চীনে তা আর দেখা যায় না। বেকার সমস্যা নেই, খাদ্য সমস্যা নেই, গৃহ সমস্যা নেই—সবাই বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত।

প্রঃ—চীনে কি কালোবাজারী, ঘুষ, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি চলে? না চললে কি করে তা বন্ধ হয়েছে?

বন্ধু—ধনতান্ত্রিক দেশে ঘুষ, কালোবাজারী ইত্যাদি যে সব ব্যারাম আছে, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক দেশে সেগুলো থাকতে পারে না। আমাদের দেশে স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু 'মুক্তি'ত আসেনি। 'মুক্তি' মানে কি?—জনসাধারণের মুক্তি। কিসের থেকে মুক্তি?—শোষণ, নিপীড়ন থেকে মুক্তি। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে সমস্ত শোষণ, নিপীড়ন আছে—সেগুলো ওরা সমূলে উৎপাটিত করেছে। এবং বলপ্রয়োগ করে, 'ইলেকশন' করে নয়। ওদের নিজেদের 'আর্মি' গঠন করে—People's Liberation Army—এরা জনসাধারণের মুক্তি এনেছে, জনসাধারণের সঙ্গে থেকে। কাজেই, আমাদের দেশের সঙ্গে চীনের তুলনা করা যায় না।

প্রঃ—আমাদের দেশে যেমন সরকার থেকেই লটারী, রেস ইত্যাদি নানাধরণের জুয়াখেলা চালানো হয়, চীনে কি তা আছে?

বন্ধু—থাকবে কেন? ওগুলো তো দরকার হয় না ওদের। কারণ লোককে ধোঁকা দেওয়ার দরকার নেই। সেখানে তো আর কতিপয় ধনী জনসাধারণের নাম করে শাসন চালাচ্ছে না। সেখানে সত্যি সত্যিই জনসাধারণ নিজেদের শাসনব্যবস্থা নিজেরাই চালাচ্ছে।

## সরকার

প্রঃ—আমরা শুনেছি চীনে না'কি জনসাধারণের ইচ্ছামত প্রতিনিধি নির্বাচনের কোন ক্ষমতা নেই। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতা মাও-সে-তুঙের খুশী মত সবকিছু ঠিক হয়। এ সম্পর্কে আপনাদের অভিজ্ঞতা কি?

বন্ধু—আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো, তাদের প্রভু আমেরিকা, ব্রিটিশ—এদের কাছ থেকে ধার করে এসব প্রচার করে। চীনের যারা শত্রু তারা তো অপবাদ দেবেই। চীনের শত্রু ধনতান্ত্রিক দেশ আর সাম্রাজ্যবাদ। চীনের সরকার চালায় জনসাধারণ। যাকে বলে, নীচের তলা থেকে এগিয়ে যাওয়া। যেমন 'কমিউন' থেকে। 'কমিউন' কাকে বলে জানেন?

চীন যখন মুক্ত হ'ল তখন জমিদার-জোতদার—এদের জমি বণ্টন করে দেওয়া হ'ল গরীব কৃষকদের মধ্যে। এবং অতিরিক্ত জমি বণ্টন করে দিয়ে এইসব জোতদার বা জমিদারদেরও একটু একটু দেওয়া হ'ল, যাতে তারা পরিশ্রম করে খেতে পারে। কিন্তু ছোট ছোট জমি দিয়ে কৃষকরা তো আর বেশী উৎপাদন করতে পারে না। তাই 'মিউচ্যুয়াল এইড টিম' হ'ল যাতে তারা উৎপাদন খানিকটা বাড়াতে পারে। এরপর 'কো-অপারেটিভস্' হ'ল এবং তারা হাল, সার সব একসাথে নিয়ে চাষ করলো এবং উৎপাদন আরও বাড়িয়ে তুললো। এরপরে তারা দেখলো যে কয়েকটা 'কো-অপারেটিভ' যদি একসাথে রাখা যায়, তা'হলে সেচ, সার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা এবং অন্যান্য উপজীবিকারও সুবিধে হচ্ছে এবং এর থেকে জন্ম হ'ল 'কমিউনে'র। এক একটা 'কমিউনে' একসাথে ২০/৫০ হাজার লোক বাস করে। সেখানে যত জমি আছে তারা একসাথে চাষ করে। এই ২০/৫০ হাজার লোক মিলে 'ইলেকশন' করে 'কমিউনে'র প্রতিনিধি ঠিক হ'ল। এরাই 'কমিউন' চালাচ্ছে। এবং কতগুলো 'কমিউনে'র প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী হ'ল এক একটা 'কাউন্টি'। এগুলো আমাদের জেলার থেকে ছোট। কতগুলো 'কাউন্টি' নিয়ে এক একটা প্রদেশ এবং এইভাবে প্রতিনিধি নিয়ে তারা 'সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট' পর্যন্ত চলে এলো। তাছাড়া আবার 'সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট'-এর মধ্যে আছে ওদের একটা পার্লামেন্ট—'ন্যাশনাল এসেমব্লি'; যা বিভিন্ন 'কনস্টিটুয়েন্সি'তে ভাগ করা আছে এবং সেখানে 'ইলেকশন' করে ডেপুটি চলে আসছে জাতীয় কংগ্রেসে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সব আইন, নীতি—এসব তারাই করছে। এবং এর নেতৃত্ব দিচ্ছে সি. পি. সি. (চীনের কমিউনিস্ট পার্টি)। সব সংগঠনেই আছে সি. পি. সি.। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মধ্যেও তারা আছে। কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'ল সাধারণ মানুষরা। তাদের পরামর্শ দিচ্ছে সি. পি. সি'র লোকেরা। তারা না মানলে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সেখানে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সি. পি. সি-র থেকে যে সমস্ত নির্দেশ এবং নীতি বলে দেওয়া হয়, সেগুলো নীচের তলা পর্যন্ত চলে আসে। আলোচনা হয়। তারপর তার ভিতর থেকে যে সার-সংকলন হয় সেগুলো উপরে চলে আসে। তাই দিয়ে দেখা হয় নীতিটি চলবে কি চলবে না। যদি দেখা যায় যে জনসাধারণের অন্য অভিমত রয়েছে—তা'হলে সেটা বাতিল করে দেওয়া হয়। গণতন্ত্রের একেবারে সত্যিকারের দৃষ্টান্ত, এখানে পাওয়া যায়।

প্রঃ—কমিউনিস্ট পার্টি বা মাও-সে-তুঙের সমালোচনা করলেই নাকি তাকে অমনি জেলে পুরে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়; এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে পর্যন্ত মাও-সে-তুঙের বিরোধিতা বরদাস্ত করা হয় না?—এ ব্যাপারে আপনাদের অভিজ্ঞতা বলুন।

বন্ধু—এরকম আমরা কখনও দেখিনি। বরং মাও-সে-তুঙকে ওরা যেমন ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে—এমন ভালোবাসা, শ্রদ্ধা একজন ব্যক্তিকে ঘিরে আমরা কখনো দেখিনি ৮০ কোটি মানুষের মধ্যে। আমরা যাকে বলি—ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা—ওরা

বলে, ইতিহাসে একটা লোকের অনেক অবদান আছে কিন্তু জনসাধারণই ইতিহাস সৃষ্টি করে। মাও-সে-তুঙ আর জনসাধারণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাও-সে-তুঙ যেমন ইতিহাসে একজন মস্ত বড় নেতা হয়েছেন, তেমনি তিনিও জনসাধারণের উপর নির্ভর করেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জনসাধারণ তাঁকে খুব সম্মান করে, ভালোবাসে আর তাছাড়া—যেখানে সরকার জনসাধারণের, সেখানে জনসাধারণইতো তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে সরকার চালাচ্ছে। শোষক কেউ নেই। কাজেই এসব প্রশ্ন সেখানে উঠতেই পারে না।

## শিক্ষা, সংস্কৃতি : সাংস্কৃতিক বিপ্লব

প্রঃ—সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব—ব্যাপারটা কি? আমরা এখানকার কাগজপত্রে যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, এটা মাও-সে-তুঙ-এর সমর্থকদের সাথে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আর একজন ভূতপূর্ব নেতা লিউ-শাও-চি'র সমর্থকদের মারামারি ও ঝগড়া। আসল ঘটনা কি তাই? সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় নাকি সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল?

বন্ধু—সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব হ'ল—চীনের ভেতরে যে অ-সমাজতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া ভাবধারা প্রকট হয়েছিল তার বিরুদ্ধে লড়াই। এ লড়াই সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সি. পি. সি'র এক নেতা লিউ-শাও-চি ও অন্য কিছু নেতা চীনে সমাজতন্ত্র বদলে দিয়ে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সি. পি. সি. মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লব তৈরী করে এবং চালায়। এটা চীনের জনসাধারণকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেয় যে—সমাজতন্ত্রের উপরি-কাঠামো, স্কুল-কলেজ, সংস্কৃতি, নাটক-নভেল, চলচ্চিত্র সরকারী প্রশাসনযন্ত্র—এগুলো সব সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে না গড়ে তুললে দেশ আবার ধনতন্ত্রের দিকে চলে যেতে পারে। এবং সেটার মস্ত বড় একটা দৃষ্টান্ত হ'ল—সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের কাঠামো গড়ে তুলেছিল লেনিন-স্তালিনের সময় কিন্তু মানুষের চিন্তাধারা, কৃষ্টি, উপরি-কাঠামো—এগুলো বদলাবার স্তালিন সময়ও পাননি আর বাধাও পেয়েছিলেন। তাতে কি হ'ল?—যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল, সেটা বদলে দিয়ে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ আবার ফিরে এসেছে। এই এতো বড় একটা নেতিবাচক উদাহরণ সি. পি. সি. জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছে। এবং বলেছে যে—আমাদের দেশে এখন সমাজতন্ত্র বিকাশ লাভ করছে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজতান্ত্রিক; তার মানে ধনতান্ত্রিক শোষণ নেই। এটা হ'ল অর্থনৈতিক দিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি উপরি-কাঠামো, মতাদর্শের ক্ষেত্র ইত্যাদির পরিবর্তন না করা হয় তবে লিউ-শাও-চি প্রমুখ নেতারা দেশকে আবার ধনতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তোমরা ঠিক কর, কে জিতবে—ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র?

আলোচনা শুরু হ'ল। দু'পক্ষ হয়ে গেল। কিন্তু তারা আলোচনা করে দেখলো—আমরা যে সমাজ ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে এসেছি, সে সমাজে আমরা কতো দুর্ভিক্ষে মরেছি, কতো খারাপ অবস্থায় ছিলাম। তার থেকে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা অনেক ভালো আছি। যাবো ধনতন্ত্রের দিকে?—না, কখনোই না। এই আলোচনা চলেছে তিন-চার বছর ধরে। গ্রামে-গ্রামে, একেবারে পিছিয়ে থাকা সব অঞ্চলেও এ আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার মূল শক্তি ছিল তরুণ সম্প্রদায়। তরুণরা তাদের 'রেড গার্ড' সংগঠন গড়ে তুলে, মাও-এর বিভিন্ন লেখার সংকলন নিয়ে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে গিয়ে প্রচার করেছে, লোককে শিখিয়েছে এই হ'ল সমাজতন্ত্র আর এই হ'ল ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্রের কথা মনে আছে? কত দুঃখে আমরা ছিলাম। বুড়ো বাবা-মা'রা ছোট বাচ্চাদের বলেছে কত খারাপ অবস্থায় তারা ছিল। কত অত্যাচার তাদের সইতে হয়েছে। আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হ'ল এই রকম....।

ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারার মূলে রয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ—'আমি' ছাড়া আর কেউ না, 'আমি' নিজে কতো বিখ্যাত হব, সব 'নিজের'—এই চিন্তা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যরকম—'আমি'টাকে একদম বাদ দিয়ে, জনগণের সেবা কর। বেথুনকে তারা দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছে। বেথুন কত দূর থেকে এসেছিলেন, কোন গণ্ডগ্রামে সংগ্রামরত মানুষের সেবা করতে; এটাকেই তুলে ধরা হয়েছে। পরের জন্য সব, নিজের জন্য কিছু না—এই হ'ল সর্বহারা-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবদান। এই দৃষ্টান্ত আজ চীনের ৮০ কোটি লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা ঠিক করেছে—ধনতন্ত্রের দিকে এগুবে না; সমাজতন্ত্রের দিকে এগুবে।

হাজার হাজার বছর ধরে বয়ে নিয়ে আসা ব্যক্তিস্বার্থ, পরের জন্য চিন্তা না করে নিজের জন্য চিন্তা করা—এই মানসিকতা তো একদিনে যায় না। রোজ আলোচনা করতে হবে—সংগ্রাম-সমালোচনা-রূপান্তর (Struggle-Criticism-Transformation)। এবং এভাবেই নির্ধারিত হবে, কে জিতবে—বুর্জোয়া ভাবধারা না সর্বহারা ভাবধারা? এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব, একটা নয়, হাজার হাজার করতে হবে।

এই সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব এ ব্যাপারে একটা গ্যারান্টি যে চীন আবার ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো ধনতন্ত্র বা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দিকে ফিরে যাবে না। এটা হ'ল মস্ত বড় একটা জিনিস যা আমরা চীনে গিয়ে বুঝতে পেরেছি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে—তাও আমরা উপলব্ধি করেছি। আর যেহেতু, চেতনা যখন বাড়ে তার কর্মক্ষমতাও তখন বাড়ে—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে জমিতে যা ফসল উঠতো, এখন তার দ্বিগুণ—তিনগুণ উঠছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে কারখানায় যে পরিমাণ উৎপাদন হতো, এখন তার চাইতে দ্বিগুণ, তিনগুণ হচ্ছে। মানুষের আত্ম-বিশ্বাস বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং তারা যে এক বিরাট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এই উদ্দীপনা তাদের মধ্যে এসেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল কিনা আপনারা জানতে চেয়েছেন। স্বভাবতই স্কুল-কলেজ তখন বন্ধ ছিল। কারণ আগেই বলেছি তরুণ সম্প্রদায়ই ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূলশক্তি। তাদেরই "রেড গার্ড" সংগঠন গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে গিয়ে মাও-এর চিন্তাধারা প্রচার করেছে। কৃষকদের সাথে একসাথে থেকেছে, কাজ করেছে। তার থেকে তারা নিজেরা যেমন শিক্ষালাভ করেছে কৃষকরাও তেমনি শিক্ষালাভ করেছে। এখানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা কিন্তু উল্টাপাল্টা। মানে এও শেখে ওও শেখে। এই ছাত্ররা কোনদিন কায়িক শ্রম করতো না। গ্রামে বা কারখানায় যেতো না। এখন কিন্তু সে রকম নয়। প্রত্যেককেই উৎপাদন-মূলক শ্রম করতে হয়, তা সে যত উচ্চপদেই থাক না কেন। অধ্যাপকই হোক আর গবেষকই হোক কিম্বা হাস-পাতালের ডাক্তারই হোক—তাদেরকে গ্রামে এবং কারখানায় যেতে হবে। শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে থাকতে হবে। ওদের কাছ থেকে শিখতে হবে ওরা কি ভাবে উৎপাদন করছে। এবং সে ভাবেই উৎপাদন করতে হবে। বুদ্ধিজীবীরা ভাবতো তারা হ'ল সমাজের উচুস্তরের লোক। 'আমরা সব বিদ্যাদান করবো আর সবচেয়ে হেয় শ্রমিক-কৃষক'। কিন্তু সেই বুদ্ধিজীবীদেরই এখন একাত্মতা ( integration ) হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে। তাদের সেই নাক-সিটকানো ভাব চলে গিয়েছে। তারা এখন ভাবছে "স্কুল কলেজে পড়ে আমরা আর কতটুকু জেনেছি ? —শ্রমিক-কৃষকরা তাদের হাজার হাজার বছরের প্রয়োগের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের চাইতে অনেক বেশী জানে। তাদের কাছ থেকে অনেক শিখছি আমরা।" ১৯৬৬ থেকে '৬৯ চার বছর ধরে এটা চলেছে। তারপর '৭০ সালে যখন দেখা গেল যে জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য অনেকখানি অর্জিত হয়েছে তখন স্কুল কলেজ খুললো। কিন্তু সে স্কুল কলেজ আর আগের মতো নেই। তখন স্কুল কলেজে যা পড়ানো হতো তার বেশীর ভাগই ছিল চীনের জনসাধারণের ব্যবহারিক জীবনের বাইরে ; যেমন আমাদের দেশে। লিউ-শাও-চি'র সময় এটা বেশী হতো। তারা বলতো 'বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু গুণ রয়েছে' এবং এই ভাবে ব্যক্তিস্বার্থের মনোভাব বাড়ানোর শিক্ষা দেওয়া হতো। জনগণের সেবার প্রশ্নটা ছিল গৌণ। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরে পাঠ্যপুস্তক বদলে গেল। ৬/৭ বছরের কোর্সও কমিয়ে দেওয়া হ'ল। এবং এমন সব বিষয়বস্তু তাতে দেওয়া হ'ল যা নাকি ব্যবহারিক জীবনে লাগে। এইসব কতগুলো হাবি-জাবি থিওরি, যেগুলো কোন কাজে লাগে না—যেমন আমাদের দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন অনেক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানো হয় যেগুলো এখন আর হয়না বা আমাদের দেশে আদৌ হয় না—সেগুলো ওদের দেশেও পড়ানো হতো। কিন্তু এখন সেগুলো তুলে দিয়ে ওদের দেশে যে রোগ হয় সে সম্পর্কেই শেখানো হয়। এই ভাবে ওদের শিক্ষার সংস্কার হয়ে গেল। এবং আগে যে বললাম কি ছাত্র, কি অধ্যাপক, কি গবেষক—সবাইকেই বছরে অন্ততঃ তিনমাস অথবা তিনবছরে এক বছর হয় কমিউন, না হয় কোন কারখানায় বা খনিতে কৃষক-শ্রমিকদের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হয়। কিন্তু তাই বলে এখানে জোরাজোরির কোন প্রশ্ন নেই। কারণ ওরা এতে খুব উৎসাহী। প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে কখন তার পালা আসবে। অনেক বড় বড় ডাক্তারের সাথে আমরা আলাপ করেছি। তাঁরা বলেছেন— "আমরা জানতাম না, শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে এতো জ্ঞান আছে—ব্যবহারিক জ্ঞান। আমরা বইপত্র পড়ে ভাবতাম যে আমরা অনেক বেশী জানি ! কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি চার হাজার বছর ধরে তারা যেসব শিখেছে—সেসব জ্ঞান, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। এতে আমাদের কাজের অনেক সুবিধে হয়েছে।" এই যে একাত্মিকরণ ( Integration )— যাকে ওরা বলে 'শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকদের সাথে বুদ্ধিজীবীদের একাত্মিকরণ'—তারই মূর্তরূপ আমরা চীনে দেখেছি। চীনে ওরা তিনটে শ্রেণীকেই মূল সামাজিকশ্রেণী হিসাবে ধরে—শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক।

প্রঃ—চীনে কোন রকম ধর্মাচরণ নাকি বে-আইনী ? মসজিদ, গীর্জা এসব নাকি জোর করে দখল করে সেখানে অন্য কাজ করা হয় ?

আপনাদের অভিজ্ঞতা বলুন ?

—না। বে-আইনী করতে হয়নি। তবে যেহেতু ওদের মার্কস, লেনিনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জ্ঞান অনেক বেড়ে গিয়েছে, ওরা দেখতে পাচ্ছে—ধর্ম হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষ, যা এখনও রয়ে গিয়েছে। ক্রীতদাসত্বের যুগ থেকেই এটা শুরু হয়েছে। তারপর থেকে নানা রকম সমাজব্যবস্থায় একটা শ্রেণীকে দিয়ে আর একটা শ্রেণীকে শোষণ করার নানারকম ব্যবস্থার মধ্যে ধর্ম দিয়েও একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ধর্ম বলেছিল—"তোমরা বিদ্রোহ করো না। তোমাদের যে অবস্থা সেই অবস্থাই থাকবে—এটাই নিয়ম।" পুঁজিবাদীরা এটাকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের এর কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু মার্কস লেনিন শিখিয়ে গিয়েছেন যে —আমরা পরিশ্রম করে খাই এবং পরিশ্রমলব্ধ ফলটুকু যদি আমরা পাই তাহলে ভগবানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই, সেইহেতু চীনের জনসাধারণ উপলব্ধি করেছে ধর্মের কোন দরকার তাদের নেই।....

ী বন্ধু—আর তাছাড়া ধর্ম কি কখনও "বে-আইনী" করে বন্ধ করা যায়? ধর্মের অবস্থান তো মানুষের মনে। সেখানে তো কোন আইন খাটে না।

-আমরা শুনছি, মাও-সে-তুঙ নাকি বলেছেন—"যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়।" এটা কি সত্যি ?

-না এটাতো আমরা কখনও দেখিনি ? বরং স্কুল কলেজে যেখানেই গেছি, আমরা তো দেখলাম বেশ পড়াশুনা হচ্ছে ?........

ী বন্ধু—ওরা হয় তো সেই পড়াশুনার কথা বলেছিল, মানে, Practical field'এ কাজ না করে শুধু পড়াশুনা করলে মূর্খ হয়।

চীনে কি নিরক্ষর আছে ? থাকলে তার শতকরা হার কত ?

নিরক্ষরতা একদম দূর হয়ে গেছে, আমরা বলবো। কুওমিন্টাং আমল থেকে যে সব বুড়ো বুড়ি বেঁচে আছে—তাদের মধ্যে নিরক্ষরতা ছিল। কিন্তু এবার আমরা সুদূর গণ্ডগ্রামেও গিয়ে দেখেছি—তাদের নাতি-নাতনিরা তাদের শিখিয়ে শিখিয়ে নিরক্ষরতা দূর করেছে। আর বর্তমান প্রজন্মের ( Generation ) মধ্যে তো নিরক্ষরতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বলা যায় বর্তমানে চীনে শতকরা ১০০ জনই সাক্ষর।

প্রঃ—চীনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম কি ?

বন্ধু—চীনা ভাষা। প্রযুক্তিবিদ্যা, ডাক্তারী, কারিগরী—সবই চীনা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। আর বিদেশী ভাষা হিসাবে ওরা বেশীর ভাগই ইংরাজী শেখে।

প্রঃ—আচ্ছা, আমাদের দেশে যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, নাগা ইত্যাদি অনেক আদিবাসী-উপজাতি ইত্যাদি আছে—চীনেও নিশ্চয়ই আছে। তাদের কি ভাষায় লেখাপড়া শিখতে হয় ?

বন্ধু—হ্যাঁ আছে। ওখানে ওরা বলে 'ন্যাশনাল মাইনরিটি'। প্রায় ৫০টির ওপর ন্যাশন্যাল মাইনরিটি আছে চীনে। পিকিংয়ে আমরা—'ন্যাশন্যাল মাইনরিটিস একাডেমি'তে দেখলাম, সেখানে তাদের নিজ নিজ ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। তিব্বতি-মোঙ্গল-উইগুর-কাজাক-মুসলিম সবাই নিজেদের ভাষাতেই শিক্ষা লাভ করছে।

প্রঃ—চীনে শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের জীবন ধারণের মানে কোন পার্থক্য আছে কি ?

বন্ধু—এখনও পুরোপুরি মেটে নি। তবে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এক রকম হয়। এই যে 'একাত্মিকরণে'র ( Integration ) কথা বললাম।

প্রঃ—আচ্ছা চীনে শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মাইনের কোন তফাৎ নেই ?

বন্ধু—আছে। তবে সেটাও কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগে যখন গিয়েছিলাম ('৫৮)—তার চেয়ে এখন অনেক কমে গেছে। সবচেয়ে কম—৩৫ উয়ান আর সবচেয়ে বেশী ১০৮ উয়ান।

প্রঃ—আচ্ছা—আমাদের 'টাকা'র তুলনায় চীনা 'উয়ান' এর মূল্য কত ?

বন্ধু—১৯৫৮ সালে ছিল ১ উয়ান=২ টাকা আর এখন ১ উয়ান=৪ টাকা। অর্থাৎ আমাদের টাকার দাম এখন অর্ধেক কমে গেছে উয়ানের তুলনায়।

প্রঃ—আচ্ছা, চীনে কে কত মাইনে পাবে—সেটা ঠিক করার ভিত্তি কি ?

বন্ধু—ওটা তো অর্থনীতির ব্যাপার—আমি জানি না। বলতে পারবো না।

প্রঃ—আচ্ছা, যেমন ধরুন একজন শিক্ষক আর একজন শ্রমিক—চীনে এদের মধ্যে কে বেশী মাইনে পায় ?

বন্ধু—শ্রমিক। যে কাজ করবে বেশী, উৎপাদন করবে বেশী তার মাইনে সবচেয়ে বেশী। একজন দক্ষ শ্রমিক সবচেয়ে বেশী পাবে।....

শ্রীমতি বন্ধু—তা বলে ১০৮ উয়ানের বেশী নয়। অন্য সুযোগ সুবিধা অনেক আছে, তবে মাইনেটা একই জায়গায়।

বন্ধু—বিদেশীরা অবশ্য বেশী পায়। কিন্তু নিজেরা যখন বিদেশে যায় তখন সেখানকার শ্রমিকরা যা পায় তাই নেয়। সেখানকার

জনসাধারণের জীবনের মান যে রকম সেইরকম জীবনযাপন করে। এটা একটা জলন্ত উদাহরণ চীন তুলে ধরেছে। আমাদের দেশে আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া ইত্যাদি থেকে যে সব বিদেশী বিশেষজ্ঞরা আসে তারা এখানে কিরকম বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। কিন্তু চীন তা করে না। যেমন নেপাল এবং তাঞ্জানীয়ায়। এটা একটা জলন্ত উদাহরণ—সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের।

প্রঃ—চীনের শহরাঞ্চলে কোন বস্তি আছে কি? যদি না থাকে তবে আগে কি ছিল?

বসু—যখন মুক্ত হল তারপরেও বস্তি ছিল। '৫৮ সালে যখন গিয়েছিলাম তখন সাংহাইতে দেখেছিলাম বস্তি ভেঙ্গে দিয়ে শ্রমিকদের জন্য বড় বড় আবাস তৈরী হচ্ছে। এখন তো বস্তির কথা উঠতেই পারে না। শ্রমিকদের জন্য সব বড় বড় আবাস বাড়ী গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রশ্ন—চীনে পারিবারিক জীবন বলে নাকি কিছু নেই। স্বামীর থেকে স্ত্রীকে, বাবা-মার থেকে সন্তানকে আলাদা বাস করতে বাধ্য করা হয়?

বসু—এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীমতি বসু দেবেন—উনিই বরাবর দিয়ে এসেছেন।

শ্রীমতী বসু—পারিবারিক জীবন ঠিক আমাদের যেমন, তেমনই আছে। তাতে একটুও ঘুণ ধরেনি। আমাদের দেশেও যেমন আগে স্বামীরা দূরে কাজ করতেন, স্ত্রীরা থাকত শ্বশুর বাড়ীতে—শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে। স্বামী পূজোর সময় বাড়ী আসতেন। চীনেও দু'একজন তেমনইভাবে থাকতে পারে। কিন্তু বেশীর ভাগই একসাথে থাকে। তবে কর্মক্ষেত্র হয়ত আলাদা। যেমন কেউ হয়ত শিক্ষক আর কেউ হয়ত শ্রমিক। কিন্তু একই বাড়ীতে বাস করছেন। একই সাথে খাচ্ছেন। যেমন আমাদের বাড়ীতেও হয়। স্বামীও কাজ থেকে এলেন স্ত্রীও কাজ থেকে এলেন, ঝগড়া-ঝাটিও হল না—বেশ ভালোভাবেই চলে। শ্বশুর-শাশুড়ী সবাইকে নিয়েই ওরা থাকে। বিশেষ করে বাচ্চাদের মা-বাবা কাজে চলে যান বলে, যদি দেখবার মতো কেউ না থাকে, তবে বাচ্চাদের কে দেখবেন?—এই শ্বশুর-শাশুড়ীরাই। আর যদি তা না থাকে তবে বাচ্চাদের 'Creche' (শিশু-আবাস)-এ রেখে যান মা-বাবারা এবং সন্ধ্যেবেলা নিয়ে আসেন। তারপর আমাদের পারিবারিক জীবন যেমন চলে, তেমনই ওদেরও চলে। রবিবার বা ছুটির দিনে ওরাও ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যান বন্ধুর বাড়ীতে। বন্ধুরাও আসেন। যেমন, একদিন এক ভদ্রমহিলাকে তার বাড়ীর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম কারণ কি? বললেন—বন্ধু আসবেন তাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে চীনেও বন্ধু আসাটা আছে। আর একদিন একটি মেয়ে আমাদের সাথে ট্রেনে করে ক্যান্টন পর্যন্ত এলো। সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র দেখে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাচ্ছে। বললে—বাপের বাড়ী। তারা দশ ভাই-বোন। সেই সবচাইতে বড়। জিনিসপত্রগুলি বাবা-মা, ভাই-বোনদের জন্য নিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি একা কেন? তোমার স্বামী যাচ্ছেন না?" সে বললে—"স্বামী গেছে ক্যাডার স্কুলে। তাছাড়া সে বলেছে—'আমার দশটা শালাশালি।' তাদের জন্য যদি কিছু না নিতে পারি তবে আমি যাই কেমন করে?" তাহ'লে দেখছেন—আমাদের মতোই সব রয়েছে। সেখানে কোন তফাৎ হয়নি।

প্রঃ—চীনে কি প্রবাসী ভারতীয় আছেন? তাঁদের কি কোন সংস্থা আছে?

বসু—চীনে ভারতীয় দূতাবাসে যা আছে, তাছাড়া আর কেউ নেই। ভারতীয় দূতাবাসে মোট ভারতীয়ের সংখ্যা ৮৫ জনের মতো।

## উপসংহার

প্রঃ—আচ্ছা, ভারতবর্ষ এবং তার মানুষদের সম্বন্ধে চীনের সাধারণ মানুষদের কি ধারণা?

শ্রীমতী বসু—ভারতবর্ষের মানুষদের সম্বন্ধে ওদের অদম্য আগ্রহ। কি কমিউন কি কারখানা যেখানেই গেছি—আমার শাড়ী দেখে প্রথমে ভেবেছে আমরা শ্রীলংকা থেকে আসছি। কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করার পর যখন দেখেছে যে শাড়ী পরার ধরণটা আলাদা—তখন জিজ্ঞেস করেছে কোন দেশ থেকে আসছি। যখন বলেছি—ইণ্ডিয়া, খুশীতে চিৎকার করে উঠেছে "ইণ্ডিয়া!" এগিয়ে এসে নানাধরণের প্রশ্ন করেছে—অজস্র সব প্রশ্ন। যারই সঙ্গে কথা বলেছি—বুঝতে পেরেছি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওরা খুবই চিন্তিত। আমাদের দুঃখ, কষ্ট, খরা-বন্যা, দুর্ভিক্ষ-মহামারী—সবকিছুই ওরা জানে—ভারতবর্ষের মানুষদের সম্পর্কে ওরা খুব চিন্তিত—ভীষণভাবে ভাবে। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে ওদের একটা আন্তরিক দুর্বলতা আছে। যাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা হয়েছে তারা সবাই বলেছে—"যা হয়েছে তা তো সরকারী স্তরে হয়েছে—তোমাদের আমাদের মধ্যে তো কিছু হয়নি।"

# বন্যাত্রাণের রাজনীতি

**জনৈক ষ্টাফ রিপোর্টার**

প্রত্যেক বছর বর্ষাকালে পশ্চিমবঙ্গের বন্যার সম্ভাবনাযুক্ত সমতল এলাকার জনসাধারণ হাল ছেড়ে দিয়ে বন্যার আগমনের দিন গুণতে থাকেন। আর খরার বছরটি বাদ দিলে, প্রতি বছরই বন্যাপ্লাবিত এলাকাগুলো আয়তনে বেড়ে চলে।

যেই না জেলাগুলো বন্যাকবলিত হলো অমনি কলকাতার অপেক্ষাকৃত বন্যা-মুক্ত এলাকায় অবস্থিত রাজ্যের সদর (বন্যাত্রান—সঃ মঃ বীঃ) দপ্তরটি জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী কিম্বা রাজ্যপাল, যিনিই এ সময়ে প্রশাসন চালান না কেন—তাঁর কাছে. বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করা, একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠানের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের শত শত অফিসার জেলাগুলিতে আবির্ভূত হ'ন। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হয়—'রিলিফের' 'কোটা' ঠিক করা হয় এবং 'অপারেশন'টি শুরু হয়। বছরের পর বছর এই একই 'সূত্র'টি অনুসৃত হয়।

জেলাগুলিতে বন্যার ব্যাপারে সরকারের কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়, তা দেখার সুযোগ বর্তমান সাংবাদিকের হয়েছে। তিনি কম করে দু'জন রাজ্যপাল, একজোড়া মুখ্যমন্ত্রী, কয়েকজন মন্ত্রী এবং এক দঙ্গল অফিসারকে বন্যার সময় জেলাগুলি পরিদর্শন করতে দেখেছেন। বন্যার ব্যাপারে ভি. আই. পি'দের কাজের ধারা সাধারণতঃ একটা নির্দিষ্ট ছক অনুসারে চলে।

একদিকে রয়েছেন রাজ্যপাল; যিনি বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলগুলির সবথেকে কাছের বিমান-বন্দরটিতে বিমান থেকে অবতরণ করবেন। পেন্ট-কোট-টাই পরা রাজ্যপাল অফিসারদের সঙ্গে বিমান-বন্দরেই বেশ ভারী এবং বিলাসবহুল প্রাতঃরাশ সেরে নেবেন। এর অব্যবহিত পরেই রাজ্যপালের গাড়ীর সারি ছুটে চলবে বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলির দিকে। পথে তাঁকে দেখানো হবে রাস্তার দু'পাশে জলে ডুবে যাওয়া বিশাল ধানের ক্ষেত এবং রাস্তা মেরামত করতে থাকা অনেক মানুষের ভীড়। এই উপলক্ষে কয়েকটি সুনিয়ন্ত্রিত মিছিলও আয়োজিত হবে। ভি. আই. পি ত্রাণ-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবেন, যে খাদ্যগুলি বিতরণ করা হচ্ছে তার থেকে দু-এক কণা মুখে ফেলে পরীক্ষা করবেন আর দু'একজন অফিসারকে তাঁদের নীতি-জ্ঞানের মান উন্নয়নের জন্য তিরস্কারও করবেন যা সমবেত জনতা সানন্দে উপভোগ করবেন।

অতঃপর তিনি পরবর্তী কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঝড়ের মতো বেরিয়ে যাবেন, এবং পরের ঘটনাগুলোও অনুরূপ ঘটবে। এই পরিদর্শনের পরে জেলার অফিসারদের নিয়ে একটি অধিবেশনের আয়োজন করা হবে। অন্যান্য ঘটনার মতো বন্যার জলও এক সময়ে সরে যাবে, সংবাদপত্রগুলো তাদের মনোযোগ অন্য কোন ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত করবে, এবং জন-সাধারণ ও সরকার পরের বছর না আসা পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটাই ভুলে যাবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে বর্ণনাটার কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের প্রয়োজন। ভি. আই. পি স্যুটের বদলে ধপ্‌ধপে ধুতি ও পাঞ্জাবী পরবেন। স্থানীয় পার্টির লোকদের সংখ্যা অফিসারদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে। রাস্তায় তাঁকে কয়েকটি ফুলের মালা পরানো হবে এবং তিনি কয়েকটি ছোট-খাট বক্তৃতা দেবেন। অফিসাররা যথারীতি ভি. আই. পি'রা যে রাস্তাগুলো দিয়ে যাবেন সেগুলো পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার কাজে ব্যস্ত থাকবেন।

বস্তুতঃ, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যগুলি বন্যার ব্যাপারটিকে খণ্ডিত দৃষ্টিভংগীতে দেখে আসছে। রাজনীতিজ্ঞরা সর্বদাই, বন্যার পুনরাবৃত্তি স্থায়ীভাবে রোধ করার থেকে, দুর্গতদের সাময়িকভাবে ত্রাণ সাহায্য-দানকেই বেশী পছন্দ করে আসছেন। যাঁদের স্মৃতিশক্তি জোরালো তাঁদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে ত্রাণ-সামগ্রী কালোবাজারে বিক্রী করার অপরাধে কয়েক বছর আগে জনৈক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ত্রাণ-সামগ্রী সত্যি সত্যি বন্যা-দুর্গত মানুষদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা তা ধরার মতো কোন উপায় এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের হাতে নেই।

সাধারণতঃ যা ঘটে থাকে তা হলো, বন্যাপরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সবরকম প্রচেষ্টার দায়ীত্বই শেষ পর্যন্ত বি. ডি. ও অফিসের উপর ন্যস্ত হয়। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। শাসকপার্টির স্থানীয় নেতার উপদেশ অনুসারে তাঁকে, কারা বন্যার্ত—তা' ঠিক করতে হয়। ত্রাণ-সামগ্রী বণ্টনের খবরদারীর ভার বি. ডি. ও'র কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বণ্টনের কাজটা স্থানীয় পার্টিকর্মীরা করে থাকেন। এবং সম্ভবতঃ 'বন্যাত্রাণের' ভাগ্যের দ্বার এখানেই রুদ্ধ হয়ে যায়। অফিসাররা ত্রাণ-সামগ্রী বণ্টনের

ক্ষেত্রে দুর্নীতির কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন, কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে তাঁরা এ ব্যাপারে প্রায় কিছুই করতে পারেন না।

যে কেউই সঙ্গত কারনে প্রশ্ন রাখতে পারেন, স্বাধীনতার পর গত পঁচিশ বছর ধরে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার কি করছেন। মেদিনীপুর, যা দুজন সেচমন্ত্রী দিয়েছে—একজন হলেন অজয় মুখোপাধ্যায় এবং অন্যজন হলেন তাঁর ভাই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সেই জেলাটিই বন্যার কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সব চেয়ে বেশী। এর জন্য স্বয়ং মন্ত্রীদের নয় বরং সরকারের সেচ-নীতিকেই দায়ী করতে হয়। ১৯৪৭ সালেই সরকার স্থির করেছিলেন যে বন্যার জন্য দায়ী নদীগুলিকে শুধুমাত্র নৌ-চলাচলের মাধ্যম হিসেবে না রেখে বরং জল-নিকাশী ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ। এই নীতির ফলশ্রুতি হিসেবে উত্তর এবং দক্ষিণ বঙ্গের নদীগুলিতে পলি জমতে থাকে। নদীর খাতের একটি অংশে বা সম্পূর্ণ পৃথক পথে জল-নিকাশী ব্যবস্থা বর্তমান থাকাতেই সরকার সন্তুষ্ট ছিলেন। রাজ্যের সমস্ত বড় নদীগুলির খাতের উচ্চতা যখন পার্শ্ববর্তী এলাকার তলকে ছাড়িয়ে গেল, তখনও এটাকে কেউ কোন গুরুত্ব দিল না। বিশেষজ্ঞরা এখন স্বীকার করেন যে নদী-খাতের খনন কার্য—অর্থ এবং সামগ্রী উভয় পরিপ্রেক্ষিতেই, একটি পর্বতপ্রমান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্যই বোধহয় কেন্দ্রীয় সেচ-মন্ত্রী ডঃ কে. এল. রাও বলেছেন **"বন্যার সাথেই আমাদের বসবাস করতে হবে।"** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ)

**এখন এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে সরকার ইচ্ছে করেই রিলিফের রাজনীতিকে বাড়তে দিয়েছেন।** (বড় হরফ আমাদের —সঃ মঃ বীঃ) এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে কংগ্রেস এবং বিরোধী বামপন্থী দলগুলি আরো বেশী পরিমাণ রিলিফের দাবিতে এক যোগেই সরব হয়েছেন। **বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা দাবি করে, এই দলগুলির কোনটিই কোন রকম আন্দোলনের সূচনা করেননি।** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ)........

বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীয় সাহায্য পাবার জন্য বন্যা এবং ত্রাণকার্যকে যুগ্মাস্ত্র হিসেবে এখন বিভিন্ন রাজ্য সরকার ব্যবহার করে থাকেন। রাজ্য সরকারগুলি ত্রাণকার্যের জন্য বিপুল পরিমানের সাহায্য দাবি করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য সাধারণতঃ একজন মন্ত্রী এবং কয়েকজন অফিসারকে পাঠিয়ে থাকেন। একমাত্র ভগবানই জানেন কিভাবে কেবল একটি ঝটিকা সফরের মাধ্যমে অফিসাররা প্রপীড়িত অঞ্চলগুলির ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নিধারণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে 'কোটা'র পরিমাণ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অফিসারদের মধ্যে, দর কষাকষির সেই মান্ধাতা আমলের পদ্ধতির সাহায্যেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

**রাজনৈতিক দলের উচ্চক্ষমতাশীল নেতা এবং সাধারণ নেতা উভয় শ্রেণীর দ্বারাই ব্যবহৃত এই রিলিফের রাজনীতি হাজার হাজার গ্রামবাসীদের ভিক্ষুকে রূপান্তরিত করছে।** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ)। গত দু'বছরে দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাসকারী লোকদের সংখ্যা যে ১০%এর সীমা অতিক্রম করেছে, এই ঘটনাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। তবুও এখনও গ্রামে এমন লোক বসবাস করছেন যাঁরা ৫ থেকে ৮ বিঘা জমির উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করেন। উক্ত রিলিফের নীতি এই ধরণের ব্যক্তিদেরও ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হ'তে বাধ্য করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার দুবদা, কাঁথি, বড়দা চৌকা প্রকল্প এবং মেদিনীপুরের অন্যান্য বেসিন প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কাজ এগোয়নি। **বেসিনগুলির উর্বর জমি যা রাজ্যের শস্যভাণ্ডারে রূপান্তরিত হ'তে পারত, এখন বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডি. ভি. সি. ও ময়ূরাক্ষী খাল ব্যবস্থা বন্যানিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার পরিবর্তে বন্যাসৃষ্টিকারী ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে।** (বড় হরফ আমাদের—সঃ মঃ বীঃ)

....মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে বন্যা যেমন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে সেই স্থান অধিকার করেছে—অনাবৃষ্টি। যথাসময়ে সামান্য খরচ করলেই এই দুটো জেলায় জলের উৎস সৃষ্টি করা সম্ভব হতো। ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ করা শেষ হয়েছে এবং মৃত্তিকাতলবর্তী জলের উৎসও নির্দিষ্ট হয়েছে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সব কিছু থাকতেও শুধু মাত্র 'ড্রিলিং রিগ্' না পাওয়ার জন্য 'গভীর নলকূপ' বসানো হয়নি। কর্মকর্তারা 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার' কাছ থেকে, যাঁদের অন্ততঃ দুটো 'রিগ্' কলকাতায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে—খুব সহজেই দুটো 'রিগ্' ধার হিসাবে পেতে পারতেন। রাজনৈতিক নেতারা মাঝে মাঝে সাড়া তুলেছিলেন কিন্তু যখনই জেলায় ত্রাণ-সামগ্রী ঢেলে দেওয়া আরম্ভ হলো অমনি তাঁরা চুপ করে গেলেন।

বিধান সভার সদস্যরা নিশ্চয়ই এসম্বন্ধে অনেক কিছুই করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা কি করেছেন? তাঁরা বিধান সভা-কক্ষের মধ্যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেছেন এবং সভার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে দিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর বিধানসভার রেস্তোঁরায় মিষ্টি খেয়েছেন এবং কফিতে চুমুক দিয়েছেন। মন্ত্রীরা যথারীতি 'যথেষ্ট ব্যবস্থা' গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

- দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড', (৩. ১০. ৭৩)-এ প্রকাশিত Politics of flood relief প্রবন্ধটির নির্বাচিত অংশের অনুবাদ। —সঃ মঃ বীঃ

# বিক্ষুব্ধ শিক্ষাজগৎ

**দেশ :**

## ছাত্র

গত পয়লা অক্টোবর থেকে **বর্ধমান মেডিকেল কলেজের** ছাত্র-ছাত্রীরা অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কলেজের উন্নতিকল্পে কতকগুলো দাবিতে তাঁরা আন্দোলন করছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ও কলেজ অধ্যক্ষের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা আন্দোলন তুলে নিলেন। ছাত্রসংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে দাবিপূরণ না করা হলে, তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

● অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বাস চলাচলের প্রতিবাদে **দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ভগৎ সিং কলেজের** ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। গত সাতই সেপ্টেম্বরের এই বিক্ষোভের ফলে পরিবহন সংস্থার পাঁচটি ভ্যান ও বাসের ক্ষতি হয়; ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের সময় পুলিশ ৩১ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। পুলিশ ছাত্রসংসদের সভাপতি সমেত ৩১ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

● ১৪৪ ধারা ভঙ্গের 'অভিযোগে', গত সাতাশে সেপ্টেম্বর ইম্ফল থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মৈরাংয়ে একদল ছাত্রের উপর পুলিশ গুলি চালায়। বুলেটে আহত পাঁচজন ছাত্রকে সাধারণ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা' স্বরূপ মৈরাংয়ের সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

● অবিলম্বে জঞ্জাল অপসারণ ও ভাঙ্গা রাস্তা সারানোর দাবিতে **রবীন্দ্রভারতী** বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রী মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পৌরমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলে, ছাত্রছাত্রীরা ফিরে যান।

**বিদেশ :**

গত তেরোই অক্টোবর **থাইল্যাণ্ড** সরকারকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের 'অভিযোগে' ধৃত ১৩ জনের মুক্তির দাবিতে রাজধানী ব্যাংককের রাস্তায় ১০০,০০০ ছাত্রের মিছিল বের হয়। এর আগে এক সপ্তাহ ধরে নতুন সংবিধানের দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন করছিলেন, পরের দিন সকালে (চোদ্দই অক্টোবর) থাম্মাসাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হাজার হাজার ছাত্রের সঙ্গে সেনাদলের সংঘর্ষ শুরু হয়। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ দল ট্যাংকে চড়ে ছাত্রদের উপর মেশিনগান চালায়। সরকারবিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মারশাল থানম কিত্তিকাচরণ পদত্যাগ করেন। এক বেতার বার্তায় তিনি বলেন যে ছাত্ররা ও সাধারণ মানুষ 'তাঁর' পরিচালিত সরকারের প্রতি যে চরম অসন্তুষ্টি দেখিয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পদত্যাগ করছেন। রাজা ভূমিবল আতুলয়াদেজ নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী থামমাসাক সান্না ছয় মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন ও নতুন সংবিধান রচনার প্রতিশ্রুতি দিলেও, গণতন্ত্র মনুমেন্টের তলায় আয়োজিত জনসমাবেশে ছাত্রনেতারা- আর একবার প্রতারিত না হবার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন। পনেরোই অক্টোবরও ছাত্রবিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও আরও তিনজন বিশিষ্ট সামরিক নেতা দেশ ত্যাগ করেন। "দেশে যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে সেজন্যই তাঁরা দেশ ছেড়ে চলে যান।" অন্যদিকে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ওই তিনজনকে ফাঁসিতে লটকে দেবার দাবি জানান। এই দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—বিক্ষোভকারীরা ব্যাংককে মেট্রোপলিটান পুলিশের সদর দফতর ধ্বংস করে ফেলেন। থাইল্যাণ্ড রেডিও থেকে এই খবর জানানো হয়। এরপর পুলিশ স্টেশনের উপর আক্রমণ চালানো হয়। ছাত্রদের সঙ্গে বাসচালক ও পোর্ট শ্রমিক সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যোগদান করেন। চুলালংকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানো হয়। হাজার হাজার ছাত্র রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। গতকালের (১৪ই অক্টোবর) সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা তিনশ থেকে চারশ, আহত অগণিত। গণতন্ত্র স্তম্ভে আয়োজিত গণসমাবেশে ছাত্রনেতারা ঘোষণা করেন —"মারশাল থানমকে সরিয়ে সান্নাকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসানো হয়েছে বটে কিন্তু আসলে পরিবর্তন কিছুই হয়নি।" থাইল্যাণ্ডের জাতীয় ছাত্র কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রীকে তিন দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি দিয়েছেন। দাবি তিনটি হল : (১) ফিল্ড মারশাল থানম ও প্রাক্তন উপপ্রধান-মন্ত্রীকে সমস্ত সামরিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত করতে হবে। (২) সরকার গঠনের আগে সান্নাকে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। (৩) মন্ত্রীসভা নিয়োগের আগে মন্ত্রীদের নাম ছাত্রদের

জানাতে হবে। অন্যদিকে, ধৃত ১৩ জনকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

**দেশ :**

গত পাঁচই সেপ্টেম্বর **বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির** নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার প্রাথমিক শিক্ষক এসপ্ল্যানেড ইস্টে বিক্ষোভ দেখান।

## শিক্ষক

তাঁদের দাবি—প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এবং শিক্ষকদের বেতন দেবার দায়িত্বও সরকারের। বৃহস্পতিবার ( ছয়ই সেপ্টেম্বর ) আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে, তাঁরা অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন।

**দেশ :**

**পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্কুলের** প্রায় ২৬০ জন অশিক্ষক কর্মচারীকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের 'দায়ে' গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত আঠারোই

## কর্মচারী

সেপ্টেম্বরের এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন ম্যাধমিক শিক্ষক ও কর্মচারী সমিতি। তাঁদের মূল দাবি ছিল বেতনবৃদ্ধি।

**শিক্ষক-কর্মচারী :**

গত সতেরোই সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী সমিতির প্রায় তিনশ জন সভ্য ১৪৪ ধারা অমান্য করে গ্রেপ্তার হন। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে দশজন মহিলা সদস্য ছিলেন। এর আগে প্রায় ১০০০ জন শিক্ষক-কর্মচারী সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হন। তাঁদের মূল দাবি ছিল প্রাথমিক স্কুল সমেত সমস্ত মাধ্যমিক স্কুলকে বেতন ঘাটতি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

[ সূত্রঃ স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডারড্, আনন্দবাজার

# পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ

## জনগণের সেবক

★'৭০-৭১ এবং '৭১-৭২ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের থাকার বাংলোগুলো সাজানো এবং ঠিকঠাক রাখা বাবদ খরচ হয়েছে, প্রতি বছরে—১২ লক্ষ টাকারও বেশী।
ওয়ার্কস অ্যাণ্ড হাউসিং দপ্তরের মন্ত্রী লোকসভায় এই তথ্যটি জানান।

★প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের সাম্প্রতিক যুগোশ্লাভিয়া ও কানাডা সফরের জন্য রাষ্ট্র তহবিল থেকে খরচ করা হয়েছে ১৯ লক্ষ টাকা।

★শ্রম-মন্ত্রী শ্রীকে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডীর, ৪ জন অন্যান্য সদস্য ও ৮ জন বেসরকারী প্রতিনিধিসহ ৫৮তম আন্তর্জাতিক শ্রম-অধিবেশন 'সেসনে' যোগদান করার জন্য জেনেভা-সফর বাবদ ২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। — সূত্র : স্টেটস্‌ম্যান, ২৮.৭.৭৩

## এবং জনগণ

★ভারতের মোট ক্ষেত্রফলের শতকরা ১৯ ভাগ হ'ল খরা-পীড়িত প্রতি তিন বছরে একবার করে, মোট জন সংখ্যার শতকরা ১২ ভাগ মানুষ এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

—সূত্র : স্টেটস্‌ম্যান, ৩০.৭.৭৩ ( প্ল্যানিং বডি টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট )

★ স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ( পার্লামেণ্ট কোয়েশ্চনস্ ) মারাত্মক রকমের অপুষ্টির ফলে এই দেশে প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ শিশু প্রাণ হারায়। —সূত্র : স্টেটস্‌ম্যান, ৭.৮.৭৩

★এই দেশে, যেখানে প্রায় ৮০ লক্ষ লোক যক্ষ্মাতে ভুগছেন এবং যাঁদের মধ্যে ২০ লক্ষ লোকের রোগটি ভীষণভাবে সংক্রামক, সেখানে '৭২ সালের পয়লা এপ্রিলের তথ্য অনুযায়ী যক্ষ্মারোগীদের বেড্-এর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজারেরও কম।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীআর. কে. খাদিলকর রাজ্যসভায় এই তথ্যটি প্রকাশ করেন। —সূত্র : স্টেটস্‌ম্যান, ৯.৮.৭৩

★ শ্রীস্বরণ সিং রাজ্যসভায় বলেন, ১৯৭১ সালের শেষের দিকে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৮৭ লক্ষ। — সূত্র : স্টেটস্‌ম্যান, ২৮.৭.৭৩
প্রত্যেক পঞ্চম শিক্ষিত ভারতীয়—একজন বেকার।
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হলো ৯৭ হাজার।

—সূত্র : স্টেটস্‌ম্যান, ২৭.৮.৭৩

## কচি ছেলেমেয়েদের মাথা খাওয়া হচ্ছে

জনৈক সংবাদদাতা

গত বছর হাওড়া জেলার প্রাইমারী ফাইন্যাল পরীক্ষার (বৃত্তি পরীক্ষা) প্রশ্নপত্রগুলো প্রকাশ্যে মঙ্গলাহাটে আট আনা দরে পরীক্ষার আগেই বিক্রি হয়েছিল। ফলে জেলা শাসকের এক আদেশে ঐ পরীক্ষাগুলি পরে বাতিল করে দেওয়া হয়। সকলেই এ খবর দৈনিক কাগজগুলোয় ফলাও করে দেখেছিলেন। এ মাসের শেষ সপ্তাহে এ বছরকার প্রাইমারী ফাইন্যাল পরীক্ষাগুলি আবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।
প্রত্যেক স্কুলেই এর জন্য একটি টেষ্ট পরীক্ষা নেওয়া হয়। দমদম অঞ্চলের দুটি স্কুলের এবারকার টেষ্ট পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়। এই স্কুল দু'টি হল, দমদম জংশন স্টেশনের কাছে অবস্থিত কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ) ও তারই কাছে অবস্থিত ৫নং দমদম রোডস্থ অমূল্যরতন সর্বদয়া বিদ্যালয়। গত ১০ই সেপ্টেম্বর অমূল্যরতন বিদ্যালয়ে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়। ঐদিন ছিল বাংলা ও ভূগোল-বিজ্ঞানের পরীক্ষা। পরের দিন কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়, এবং বাংলা পরীক্ষা নেওয়া হয়। দু'টি স্কুলের প্রশ্নপত্র হুবহু এক। প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই এ ঘটনা ঘটে। কুমার আশুতোষের কিশোর ছাত্রছাত্রীরা অমূল্যরতন বিদ্যালয়ের একটি প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে, তা বাড়ীতে চর্চা করে ও পরের দিন 'আনন্দের' সাথে উত্তরগুলো লিখে দিয়ে আসে। জানাজানি হবার পরেও কুমার আশুতোষের শিক্ষকমশাইরা পরীক্ষাগ্রহণ বন্ধ করেন নি। স্থানীয় জনসাধারণ এ প্রহসন দেখে প্রশ্ন করেছেন, কচি ছেলেমেয়েগুলোর মাথায় এখন থেকে বিনাশ্রমে ফল পাবার চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন?

# চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

## পুলিশী নির্যাতনের শিকার জনৈক ছাত্রের বিবৃতি

১২ই অক্টোবর সোমবার, বেলা ১১টা বেজে ১৫ মিনিট। ৪২ নম্বর বাসে করে বালীগঞ্জ ফাঁড়িতে নেমে, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড ধরে কলেজের দিকে যাচ্ছি—'জুট টেকনলজিক্যাল ইনস্টিট্যুট' আর 'টাকা কেন্দ্রে'র মাঝামাঝি একটি কালো পুলিশ ভ্যান, পিছন দিক থেকে এসে, আমার পাশে দাঁড়ায় এবং জনৈক পুলিশ অফিসার নেমে এসে বলে—"হ্যালো মিঃ পিপলাই! উঠুন।" "কি ব্যাপার?"—দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করি। "আপনাকে একটু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে"—পুলিশ অফিসার বলে। "কারণ?"—জিজ্ঞাসা করলাম আমি। তার উত্তর—'গিয়েই শুনবেন।' কথা বলে কোন লাভ হবেনা, বুঝতে পেরে, ভ্যানে উঠলাম। ভ্যানটা চলতে শুরু করলো। কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ, ভ্যানটা থেকে বাইরের কিছুই দেখা যায় না। আমাকে ভ্যানের মধ্যে নিয়ে ভ্যানটা ঘণ্টা খানেক ঘুরে একসময় থামল। দরজা (ভ্যানের) খোলা হ'ল এবং আমাকে বলা হ'ল—"আসুন"। নামলাম। দেখলাম একটা থানার দরজায় (গেট নয়) আমি নেমেছি। কোন থানা—আমি বলতে পারবো না। কারণ ভ্যানের দরজা খোলা হয়েছিল একেবারে থানার দরজায়—এবং তা এমন ভাবেই যে,

কোন কিছুই ( অর্থাৎ কোথায় এলাম, কোন অঞ্চল ইত্যাদি ) বোঝা, আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

থানার একটা ঘরে আমায় ঢোকানো হ'ল। একজন পুলিশ অফিসার ব'সে আছে। অফিসারটি বললো—"বসুন মিঃ পিপলাই।" বসলাম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অফিসার বললো—"দেখুন মিঃ পিপলাই, আপনাকে এখানে আনার আমাদের কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বোঝেনইতো আমরা চাকরী করি। কর্তব্যের খাতিরেই আপনাকে আনতে হ'ল। আমাদের ভুল বুঝবেন না।" আমি চুপ করে আছি। একটু থেমে, পুলিশ অফিসারটি আবার বললো—"দেখুন, মারধোর করতে আমাদের ভালো লাগে না। আর তাছাড়া আমরা জানি, যদিও আপনারা C. P. I. ( ML ) নন, তবুও মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারা আপনাদের মাথায় এমন ভাবে ঢুকে গ্যাছে যে মার দিয়ে বার করা যাবে না।" আমি শুনে যাচ্ছি। একটুখানি থেমে আবার শুরু করলো সে "আর তাছাড়া আপনি তো ভালো ভাবেই Hons. নিয়ে B. Sc. পাশ করেছেন। চাকরী-বাকরী করুন না; আমাদের মতো। কারণ, একটা অনুরোধ আপনার কাছে—Please don't try to appear in the coming M. Sc. Exam. This is not only for this year but for future also." "কারণ?"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"দেখুন, আপনাদের যেমন কিছু Organizational secrecy maintain করতে হয়, আমাদেরও তেমনি কিছু Secrecy maintain করতে হয়। কাজেই, কারণটা নাই বা শুনলেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—আপনার ভালোর জন্যই বলছি, এটাকে হালকা ভাবে নেবেন না। আপনি পরীক্ষা দিলে, আর যার পক্ষেই হোক, আমার পক্ষে অন্ততঃ আপনার Life এর risk নেওয়া সম্ভব নয়। আর তাছাড়া আপনি পরীক্ষা দিলে আপনার জীবন তো বিপন্ন হবেই, দিলীপ চৌধুরীর ( আমার একজন সহপাঠী এবং পি. জি. এস. এফ-এর সম্পাদক ও 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি'র যুগ্ম-সহকারী সাধারণ সম্পাদক—দীঃ পিঃ ) ব্যাপারটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তাছাড়া ধরুন, আপনাকে যদি বোমা বাঁধতে দেখা যায় বা Arms and Ammunitions রাখতে দেখা যায়, Naturally, তখন তো Life এর risk নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই বলুন কি করবেন?" আমি আগের মতো চুপ করে আছি দেখে, অফিসারটি একটু উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো—"দেখুন মিঃ পিপলাই, I can't delay, তাড়াতাড়ি বলুন পরীক্ষা দিচ্ছেন কি দিচ্ছেন না?"

—"দেখুন," আমি বললাম, "আমাকে ভাবতে হবে। আর তাছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর আমি পুলিশকে দিতে যাবো কেন?"

—"ও! এখনও মেজাজ কমে নি দেখছি; ঠিক আছে....."।

আমার ডান কানের পাশে একটা ঘুষি পড়লো। ঝুঁকে পড়ে গেলাম। আমার কলার ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে এবং সাথে সাথেই বাঁ দিকে আরেকটা ঘুষি পড়লো। মাথা ঘুরে গেল। সামনেটা অন্ধকার দেখলাম। এরপরই পিঠের উপর পরপর দুবার লাঠির বাড়ি অনুভব করলাম।

—"কি এবার বলুন, বলবেন কি না?"

"Certainly not"—বললাম আমি।

আবার বুকে পিঠে মার পড়তে শুরু করলো। সাথে সাথেই চললো গালাগালির বন্যা। হঠাৎ একজন পুলিশ পা দিয়ে আমার বাঁ পায়ের পাতা চেপে ধরে বুকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিল। উল্টে পড়ে গেলাম। এমন সময় মাথার পিছনে একটা বাড়ি পড়লো। আঘাত কি দিয়ে হলো—জানি না। সাথে সাথেই সংজ্ঞা হারালাম। এবং মাঝে মাঝে যখনই সংজ্ঞা ফিরে এসেছে তখনই মার পড়েছে এবং আবার সংজ্ঞা হারিয়েছি। কতক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলাম জানি না। এক সময় মনে হ'ল—আমি দুলছি। চোখ খুলে দেখলাম—আমি একটা চলন্ত পুলিশ ভ্যানের মধ্যে। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম। একজন পুলিশ, আমাকে তুলে ধরে, পেটে লাথি মেরে ফেলে দিল। আবার সংজ্ঞা হারালাম। আবার যখন সংজ্ঞা ফিরে এলো, দু'জন পুলিশ আমাকে চুল ধরে টেনে তুলে, ভ্যানের দরজা খুলে, একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে "যা" বলে কোমরে লাথি মেরে ফেলে দিল। পড়ে গেলাম রাস্তায়। এবং আবার সংজ্ঞা হারালাম। কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলাম জানি না। যখন সংজ্ঞা ফিরে এল—দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে, আমি ভিজে যাচ্ছি। সামনের দিকে তাকাতেই দেখলাম—দুটো হেডলাইট ছুটে আসছে আমার দিকে। তারপর, আমিই উঠে হাত তুলেছি, নাকি তারাই আমাকে দেখতে পেয়ে, জানি না—দেখলাম একটা লরি এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। দুজন কুলি নেমে এল। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কোথায় যাচ্ছে। উত্তরে তারা যা বললো, বেশীর ভাগই আমি বুঝলাম না—"বেঙ্গল" এবং 'খড়্গপুর' এই দুটো শব্দ শুনলাম।

এর মধ্যে খড়্গপুরই আমার কাছে পরিচিত। তাদের বললাম খড়্গপুরেই আমাকে নামিয়ে দিতে। তারা আমাকে লরিতে তুলে নিল। কতক্ষণ লরিতে ছিলাম জানি না—তখনও আমি পুরোপুরি সংজ্ঞা ফিরে পাই নি। যাই হোক খড়্গপুর ষ্টেশনে তারা আমায় নামিয়ে দিল। তারপর, কোন লোককে বলে, নাকি নিজেই জানি না—আমি ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পুরোপুরি সংজ্ঞা ফিরে পেলে পর দেখলাম—আমার চশমা নেই, বইপত্র-নোট এবং থিসিস পেপারের পাণ্ডুলিপিও নেই। বাড়ী থেকে বের হবার সময়

২০ টাকা নিয়ে বেরিয়ে ছিলাম, টাইপিষ্টকে দেব বলে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম,—মাত্র ১ টাকা আছে। কোথায় যাবো, কি করবো—ভাবতে লাগলাম। মনে পড়লো খড়্গপুরেই আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী আছে। তাঁর বাড়ীতে আমি আগে একবার গেছি। রাস্তাটাও খানিকটা চিনি। কিন্তু বাড়ীর নম্বরটা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। যাই হোক, একজন রেলকর্মীকে বিশ্রাম কক্ষেই তিনি ছিলেন—বললাম আমাকে ওভার ব্রীজটা পার করে একটা রিক্সায় তুলে দিতে। রিক্সায় উঠে রিক্সাওয়ালাকে মোটামুটি পথের নিশানা এবং বাড়ীটারও একটা মোটামুটি অবস্থান বলে, পৌছে দিতে বললাম। ঐ অবস্থানে পৌছে, রিক্সাওয়ালা এবং আরও দুজন স্থানীয় লোক মিলে, অনেক খোঁজাখুঁজি করে উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ী আমায় পৌছে দিলেন। রাত তখন ১টা বেজে ১৫ মিঃ। আমাকে বাড়ীতে শুইয়ে দিয়ে, ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ীতে ট্রাঙ্ককল করে, আমার মোটামুটি অবস্থা জানিয়ে, পরদিন সকালে গিয়ে আমাকে নিয়ে আসতে বললেন।

পরদিন আমার কাকা, মামা এবং আমারই এক সহপাঠী গিয়ে আমায় বাড়ী নিয়ে আসেন। এখন আমার চলাফেরার শক্তি নেই। সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। কথা বলতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসছে। পাশ ফিরতে পারছি না, শুয়ে আছি।

স্বাঃ দীপক পিপলাই

তারিখ—১৭।১০।'৭৩ বিদায়ীবর্ষের ছাত্র, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

**গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির বক্তব্য**

'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত এক প্রেস বিবৃতিতে ( ২৩. ১০. ৭৩ ) উক্ত ঘটনাটিকে "সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সরকার ও শাসকদলের নির্দেশে কি বীভৎস সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে" "তারই একটি জীবন্ত প্রমাণ" বলে অভিহিত করেন। "এই ঘটনার পটভূমি হিসাবে" তাঁর বিবৃতিতে এও প্রকাশ যে শ্রীপিপলাই "বালীগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের পি. জি. এস. এফ. নামক যে ছাত্রসংগঠনটির সাথে যুক্ত, সেই ছাত্রসংগঠনটির উপর গত দু'বছর ধরে শাসকদলের ছাত্রসংগঠন- ছাত্রপরিষদ বারে বারে হামলা চালাবার চেষ্টা করেছে।" "বর্তমান ঘটনার অল্প কিছুদিন আগে তারা নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের একটি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রীপিপলাইকে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করানো'র ভয় দেখায়" বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

[ এই বিবৃতিগুলির সাথে মেডিকেল কলেজের দেওয়া একটি সার্টিফিকেটের ফটো-কপিও আমাদের হাতে এসেছে, যাতে শ্রীপিপলাইয়ের উপর আঘাতজনিত মারাত্মক জখমের বিবরণ রয়েছে। স্থানাভাবে তা এখানে দেওয়া গেল না—সঃ মঃ বোঃ ]

# যে সূর্য উঠছে

গত ২৬শে. সেপ্টেম্বরের 'যুগান্তর' পত্রিকার এককোণে একটা খবর বেরিয়েছিল। তার অংশবিশেষ এই রকম—

"হাসানে ( বাঙ্গালোর ) পুলিশ হাজতে একজন যুবকের মৃত্যুর পরে রাজ্যব্যাপী ছাত্র-বিক্ষোভের ফলে শহরের কলেজগুলো ১২ দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল খুলেছে। কিন্তু আজ দ্বিতীয় দিনেও ছাত্ররা ক্লাশে যোগদানে বিরত থাকে। রাজ্যসরকার ইতিমধ্যেই একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।"

বিচারাধীন বন্দীকে নানা ছল ছুতোয় পুলিশ-হাজতে অথবা জেল-হাজতে হত্যা করাটা গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে, একটা 'স্বাভাবিক' ( ! ) ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই দিক থেকে বন্দী-হত্যার এই ঘটনাটা নতুন কিছু নয়। নতুন হচ্ছে, এ ধরণের অমানুষিক ঘটনার বিরুদ্ধে ছাত্রদের দলবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করাটা। আসলে সবকিছুরই একটা সীমা আছে। এই সীমানা বিষয়ে একটা গল্প শুনেছিলাম—

একবার এক পেয়াদা এক মুসলমান প্রজাকে রাজার একটা আদেশ জানাতে এসে দেখল—প্রজাটা টুপি মাথায় নামাজ পড়ছে। টুপিটা সে প্রজাটার মাথা থেকে তুলে নিল এবং প্রজাটাকে বাধ্য করল টুপিটার বিনিময়ে কিছু অর্থ দিতে। তারপর থেকে পেয়াদাটা প্রায়ই এরকম করত। কিন্তু প্রায়ই এরকম করার ফলে প্রজাটা একদিন মরীয়া হয়ে উঠে পেয়াদাটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে দিল।

একই রকম ভাবে পেয়াদাটার মতো, আমাদের শাসকবর্গও নির্বিচারে এবং অব্যাহত গতিতে একটার পর একটা হত্যালীলা চালিয়ে—চিলটি মারলে যে পাটকেলটি খেতে হবে—একথা ভুলেই গিয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করলে তো আর আয়নার ভেতরে সুন্দর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। রক্ত যখন শাসকশ্রেণী ঝরিয়েছে তখন তাকে নিজের রক্ত ঝরিয়েই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। হিটলার থেকে থিউ, চিয়াং-কাইশেক, লন নল কেউই পারেনি রক্ত ঝরিয়ে সত্যকে ধুয়ে দিতে। কাজেই এটা অবশ্যম্ভাবী যে, আজ যা বাঙ্গালোরে ঘটেছে কাল তা সারা দেশে ঘটবে। কোন কিছুই একে ঠেকাতে পারবে না। সূর্যের আলোকে তো আর কুৎসিত কালো মেঘ চিরতরে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সূর্য উঠবেই। সূর্যের আলো আসবেই।

আমাদের দেশের যুব-ছাত্রদের উচিত হল আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা ভুলে গিয়ে এই অবশ্যম্ভাবী ইতিহাসকে ত্বরান্বিত করা। ছাত্রদের নৈতিক দায়িত্বও তাই। আর এ ব্যাপারে তাঁদের বাঙ্গালোরের ছাত্রদের সংগ্রামের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তার থেকে শিক্ষা নেওয়া

উচিত। শুধুমাত্র ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারাই শাসক-শ্রেণীর এই হত্যালীলা বন্ধ করা সম্ভব।

অনির্বাণ বসু
ক'লকাতা

## মোপলা বিদ্রোহের সরকারী ভাষ্যের প্রতিবাদে

গত তেরোই মে তারিখের স্টেটসম্যান কাগজের ভেতর দিককার পাতায় সামান্য জায়গা জুড়ে একটি ছোটো খবর প্রকাশিত হয়েছিলো।

"....কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএফ্, বি, এইচ্, মোহসিন গত সপ্তাহে লোকসভায় ঘোষণা করেছেন (যে) **কেন্দ্রীয় সরকার মোপলা বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ বলে মনে করেন না।**....গত বছর কেরালা সরকার স্থির করেন যে সরকারী পেন্সনের সুযোগসুবিধে (=৫০ টাকার মাসিক ভাতা।—অ. মি.) মোপলা বিদ্রোহীদেরও দেওয়া হবে। এর ফলশ্রুতিতে, একটি আবেদন-পত্র পরীক্ষা করার পর এক বৃদ্ধ কংগ্রেসী মালপুরম্ জেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর মতে ১৯২১-২২ সালের ঐ বিদ্রোহ ছিলো সাম্প্রদায়িক চরিত্রের এবং ভুক্তভোগীরা তার ভয়ংকর স্মৃতি ভুলতে পারেন নি।

কেরালা সরকারের সমালোচকরা বলছেন, যেহেতু মুসলিম লীগ তাঁদের মন্ত্রীসভার অংশীদার, সেই হেতু পূর্বতন সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হঠা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, পাছে তা মুসলমানদের ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে।"

ছোট্টো এই খবরটির গুরুত্ব বিরাট। যে স্বাধীনতার কথা আজকে প্রবল ঢক্কানিনাদে প্রতিনিয়ত প্রচার করা হচ্ছে, সেই স্বাধীনতার অর্থ, এবং তথাকথিত সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব সম্পর্কে খুব তীক্ষ্ণ কতকগুলো প্রশ্ন তুলে ধরেছে এই সংবাদ।

কিন্তু সে সব প্রশ্নে যাওয়ার আগে মোপলা বিদ্রোহের প্রকৃত পরিচয়টুকু সংক্ষেপে জানা প্রয়োজন।

"মালাবারের মুসলমান ধর্মাবলম্বী মোপলা কৃষকের ধারাবাহিক বিদ্রোহ **বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা সংগ্রামেরই একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।** বর্তমান কেরল রাজ্যের সমুদ্রতটবাসী এই মোপলা সম্প্রদায়ের উপর বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর প্রথম আক্রমণ হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সেই সময় হইতে মোপলা সম্প্রদায় বৃটিশ শাসনের আর্থিক শোষণের শিকারে পরিণত হইয়াছিল। আর তখন হইতেই শুরু হইয়াছিল বৃটিশ শাসনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল হইতে মোপলাদের আত্মরক্ষার সংগ্রাম। সেই ধারাবাহিক সংগ্রাম সেই সময় হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক, অর্থাৎ ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়া ভারতের সশস্ত্র গণসংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন, চিরউজ্জ্বল অধ্যায় যোজনা করিয়াছে এবং **ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অফুরন্ত প্রেরণা যোগাইতেছে।**....

সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মোপলাদের মতো এরূপ দারিদ্র আর কাহারও ছিল না। মুসলিম ধর্ম নহে, অভাবনীয় দারিদ্রই মোপলা সম্প্রদায়কে দক্ষিণ ভারতের একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিল।....বৃটিশ শাসক, জমিদার ও মহাজন—এই ত্রিশক্তির মিলিত শোষণই ইহাদিগকে করিয়া তুলিয়াছিল মৃত্যুভয়হীন, দুর্ধর্ষ।" (—সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ; পৃষ্ঠা ৮১-২।)

এতো বড়ো একটা সংগ্রাম, দেখা যাচ্ছে, ভারতের শাসক দলের কাছে অর্থহীন শুধু নয় ক্ষতিকারক। অথচ এঁরাই নিজেদেরকে স্বাধীন ব'লে দাবী করছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পুরোহিত ব'লে প্রচার করছেন। এঁদের মতে, মোপলা বিদ্রোহ নাকি "সাম্প্রদায়িক"। হাঁা, মোপলারা ছিলো সাম্প্রদায়িক, আমাদের শাসকদের মতো 'বিশ্বপ্রেমিক' নয়। কেননা মোপলাদের সংগ্রাম শোসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শোষিত সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ; সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রাদায়ের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণসম্প্রদায়ের সংগ্রাম ; বিজাতীয় ও দালাল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় দেশপ্রেমিক সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ; সুতরাং এ সংগ্রাম "সাম্প্রদায়িক" বৈকি!

এই মহান্ সংগ্রাম সম্পর্কে মেকি স্বাধীনতার ফেরিওয়ালাদের গাত্র-দাহের কারণটা বুঝি। উদ্ধৃত সংবাদটিতে বলা হয়েছে, "ভুক্তভোগী"রা সেদিনের ভয়ংকরতাকে আজও ভুলতে পারেনি। কারা এই "ভুক্ত-ভোগী?" সুপ্রকাশবাবু পরিষ্কার বলছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার ও মহাজন এদের বিরুদ্ধেই মোপলা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিলো। আর এই জমিদার ও মহাজনরাই কি কংগ্রেস দলের মেরুদণ্ড নয়? সুতরাং, মোপলা বিদ্রোহের ভুক্তভোগী জমিদার মহাজনদের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসী মন্ত্রীমশাই পার্লামেন্টে সংগত কারণেই ঘোষণা করেছেন যে মোপলা বিদ্রোহ কংগ্রেসী স্বাধীনতা আন্দোলনের অংগ নয়। কংগ্রেস যে সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য জমিদার মহাজনদেরই দল; এবং তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত "স্বাধীনতা" সংগ্রাম যে প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, তার এতো স্পষ্ট, গাণিতিক প্রমাণ সচরাচর কিন্তু মেলে না!

১৯২১-২২ সালে মোপলা বিদ্রোহ যখন তুংগে, আমাদের সরকারী অর্থাৎ স্বীকৃত রাজনীতির জগতে তখন খিলাফৎ আন্দোলনের যুগ। মূর্খ, অশিক্ষিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন মোপলারা নাকি "ভুল" ক'রে খিলাফতের মুসলমান বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বানকে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার আহ্বান ব'লে মনে করে। ইংরেজী শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত, মহান

বৃটিশ সরকারের সংস্কার আন্দোলনের সুফলবঞ্চিত মোপলারা কি অবলীলাক্রমে এমনি একটা "ভুল" ক'রে বসতে পারে, তা ভেবে জনৈক লেখক তাদের ঈষৎ করুণা করেছেন,—

"আগষ্ট মাসে মালাবার মোপলারা বিদ্রোহ করিল।...খিলাফৎ আন্দোলনের ঢেউ তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সরল ও উৎপীড়িত চাষীরা ইহার অর্থ করিয়া লয় যে খিলাফৎ আন্দোলন বুঝিবা আপন আপন এলাকায় মুক্ত ও স্বাধীন রাজ্য গঠনের নির্দেশ। এই উত্তেজনায় তাহারা কিছু ইউরোপীয় ও হিন্দু সুদখোর মহাজন ও জোতদারদের হত্যা করিয়া তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিল। কয়েকজনকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিল।"...(নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড ; পৃষ্ঠা ১৬৯-৭০)। জনাবসাহেব, বাবুসাহেব এবং শুধু সাহেবদের বাগাড়ম্বরকে ভুল বোঝবার মতো যথেষ্ঠ নির্বুদ্ধিতা ছিলো ব'লেই মোপলারা আমাদের কাছে শ্রদ্ধার্হ।

যে আন্দোলন এতো প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী তাকে, দু'চারজন হিন্দুকে মুসলমান করার নজির দেখিয়ে "সাম্প্রদায়িক" লেবেল মেরে দেওয়াটা ক্রুর শয়তানির চরম নয় কি? এ আন্দোলন যদি সাম্প্রদায়িকই হবে, তবে দরিদ্র হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়নি কেন? কেনই বা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ—যা ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রধান উস্কানিদাতা—নির্মম অত্যাচার ক'রে হাজার হাজার মোপলাকে হত্যা ক'রে এ-আন্দোলন দমন করবে? 'জবাব মেলে না তার।'

পাঠক একটা প্রশ্ন করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে আন্দোলনকে "স্বাধীনতা"-সংগ্রামের অংশ বলে মানে না, কেরালা সরকার কি ক'রে তাকে সেই স্বীকৃতি দেয়? উত্তরটা দেওয়া রয়েছে উদ্ধৃত সংবাদের শেষ অনুচ্ছেদে। মুসলিম লীগ যেহেতু সেখানকার প্রগতিশীল' মন্ত্রীসভার শরিক, এবং যেহেতু তাঁরা মোপলা বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক চরিত্র দেবার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তে লিপ্ত, তাই সব জেনে শুনেও কিছু করার নেই অন্যান্য শরিকদের কেন না, গদি হারাবার ভয়। কেরালা সরকারকে, বা কোনো দলকেই, কেন্দ্রীয় বক্তব্যের বিরোধী মনে করবার কোনো কারণ নেই। ওঁরা যা কিছু করছেন, সবই গোষ্ঠী স্বার্থে।

এতোবড়ো একটা সংগ্রামকে যারা অস্বীকার করবার মূঢ়তা দেখায়, তারা দেশের মানুষ কিনা সে প্রশ্ন করবার অধিকার জনগণের আছে ব'লে মনে করি।

যারা দেশের মানুষ নয়, তারা দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, একথাটা কি সোনার পাথরবাটির মতো শোনায় না? (উদ্ধৃত অংশগুলিতে ব্যবহৃত বড় হরফগুলি আমার—অঃ মিঃ)

অচেনা মিত্র
ক'লকাতা

# 'ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চার ধারা' প্রসঙ্গে

বীক্ষণের 'বিশেষ শারদ সংকলন'-এ প্রকাশিত জনৈক অধ্যাপকের "ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চ্চার ধারা" পড়লাম। আজকের শিক্ষাজগতের বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে—এ ধরণের আলোচনা, আমাদের হতাশাগ্রস্ত জীবনে আলোকদীপের মত। আমরা হতাশাগ্রস্ত, কারণ—প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞানপিপাসু মনটাকে প্রথমেই দমিয়ে দেওয়া হয় নানা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মাধ্যমে। কোন কিছুর কারণ জানতে চাওয়া ধৃষ্টতার পরিচয় বলে গণ্য হয়। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক কারণ—যা আমাদের উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে।

"বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য" বলতে লেখক যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করেছেন—সেটা আমাদের দেশে কতটা কার্যকরী? এ প্রশ্ন আমার একার নয় বিভিন্ন অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্র সমাজের অধিকাংশের—যাঁরা যথার্থই শিক্ষাব্রতী তাঁদেরও এই একই প্রশ্ন।

লেখক "একটি প্রস্তাব" শিরোনামায় যে প্রশ্ন তুলেছেন—"আমরা কি সামাজিক অপ্রয়োজনীয়তার অপবাদ মেনে নিয়ে—নিশ্চেষ্ট থাকবো, না শ্রেণীচারিত্রগত অন্তরায় সত্ত্বেও নিজেদের মনোভাবকে পরিবর্তন করে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব?" ব্যক্তিগতভাবে লেখক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "আমাদের মনে সমাজসচেতনতা জাগিয়ে তোলা এবং আমাদের উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তুকে ভারতীয় সমাজের সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আরও অর্থপূর্ণ করে তোলা।" কিন্তু (লেখক আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন) সমাজসচেতনতা কাদের মধ্যে জাগাবেন?—যারা নিজেদের ক্ষুদ্র অসুবিধার জন্য নানা কারণে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যারা "শান্তিপ্রিয়তার" জন্য অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে ভুলে যায় তারা কি এতই অচেতন যে সমাজচেতনা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে? যারা জেগে ঘুমায় তাদের কিভাবে সচেতন করা যায়? আমরা দৃষ্টি থেকেও অন্ধ, শ্রবণশক্তি থেকেও বধির, আর কথা বলার ক্ষমতা থেকেও মূক। মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে। আমরা মানুষ নামের অধিকারী বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বের অধিকারী কি?

পরিশেষে, লেখককে অনেক ধন্যবাদ—তিনি জৈবিক প্রযুক্তির একটি সমস্যা উদাহরণ হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই শাখারই একজন শিক্ষার্থী হিসাবে লেখকের কাছে আমি এই ধরণের আরো সামাজিক সমস্যার কথা জানতে চাই, যার অনুসন্ধান আজকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় তুলতে পারে।

শ্যামলী অধিকারী
কলকাতা

## '‘শৈশব’ সম্বন্ধে

‘কিশোর জ্ঞান’-পত্রিকায় প্রকাশিত শংকর বসুর ধারাবাহিক উপন্যাস ‘শৈশব’ (জুন-জুলাই এবং আগষ্ট, ১৯৭৩) পড়লাম। এই অংশ দুটি পড়ে আমার যা ধারণা হয়েছে বলি।

প্রথমে জুন-জুলাই সংকলনের কথা। রচনার আরম্ভেই “আগুনের শক্ত ঢেলা, সূর্য”…ইত্যাদি। কিন্তু সূর্য তো শক্ত ঢেলা বা কঠিন বস্তু নয়। কতকগুলো ছবি খুব পরিষ্কার আর ‘আবেদন শক্তি’ সম্পন্ন। যেমন গ্যাসপোষ্টে ঝোলানো প্রহার-জর্জর চোরের প্রতি কাঠগোলার মালিক ভুলুদার নিষ্করুণ, নির্দয় ব্যবহার, সতুর দাঁত পড়া এবং ইঁদুরের গর্তে ফেলে দেওয়া, পাইপের মধ্যে বাস করা ছেলেটার প্রত্যেকদিন স্বাধীনতা পাওয়ার ইচ্ছা এবং তার প্রতি কানাইদার নিষ্ঠুর ব্যবহার, ইত্যাদি। মুখ্যতঃ এই কয়েকটি ঘটনা দ্বারা সজ্জিত রচনার প্রথম অংশটি খুবই মনোহারী; শুধু তাই নয় এখানে লেখকের বক্তব্য পরিষ্কার এবং রচনার উদ্দেশ্যমূলকতা বোঝা যায়। যেমন—পাইপের মধ্যে বাস করে যে ছেলেটা কোনদিন ভাল খাবার দূরে থাক্ জীবনটুকু বইবার জন্য একফোঁটা কুখাদ্যও যোগাড় করতে প্রাণান্ত করে, স্বাধীনতার প্রথম দিনে রোদে খেয়ে সে যে নিত্য স্বাধীনতা চায় সেটা বঞ্চিত শ্রেণীর বেঁচে থাকবার সংস্থান প্রার্থনার প্রতিনিধিত্বমূলক : বড় হওয়ার জন্য, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য সতুদের যে আকাঙ্ক্ষা তা’ চিরকাল নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দরিদ্রের কুটীরের কথা মনে রাখে নি, শুধু বড় লোকের প্রাসাদের দিকে তাকিয়েছে। আসলে দরিদ্রের ভগবানের অবস্থাও খারাপ, তাঁর ক্ষমতাও কম। মনে হয় তেত্রিশ কোটি দেবতার রাজ্যে তারা অবহেলিত, পদদলিত এবং চিরকাল ঘৃণিত। আসলে মানুষের মাপকাঠি মনুষ্যত্ব নয়, (মনুষ্যত্ব মানে কি ?) —মাপকাঠি হ’ল ‘অর্থ’ যেটা কিনা মানুষেরই সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি মানুষকে এমন পাকে পাকে জড়িয়েছে যে দমবন্ধ হবার উপক্রম। আমরা যতটা ধ্বংসমূলক ততটা সৃষ্টিমূলক বা গঠনমূলক নই সার্বিক-বিচারে। সতু তার অ-দেখা বাবাকে তাদের উদ্ধারকর্তা ভেবেছে, বুঝি বা তিনি পরম আশ্রয়। কিন্তু গল্পের পরবর্তী অংশে (আগষ্ট) দেখা গেল তিনি মৃত। যদি এই রূপকটাকে (রূপক তো ?) সাজিয়ে নেওয়া যায় দারিদ্রের উদ্ধারকর্তা যে পরমপিতা তিনি শাসকশ্রেণী তথা অত্যাচারী গোষ্ঠীর (ভাল বোঝাতে পারলুম না) তীব্র অত্যাচারে শেষ হয়ে গেছেন : তাই দারিদ্র, নিবিড়, নিঃসীম, বর্ধিত এবং একটানা।

তারপর আগষ্ট সংকলনের কথা। এই অংশে সবচেয়ে ভাল লেগেছে যে ভাবে লেখক সতুর বাবার রহস্যটি উদ্ঘাটন করেছেন সেই রচনা-কৌশলটি। রণ’র বাবার মুখ থেকে অমোঘভাবে বেরিয়ে এসেছে সেই [illegible] এই জায়গাটি চমৎকার। অন্নর চরিত্রটিও ভাল লাগছে। সন্তানকে অমঙ্গলের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে তাকে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন অন্নরা চিরকাল দেখছে তা’ বলিষ্ঠ সার্থকতা লাভ করুক। বাবার মৃত্যুসংবাদ সতু জানবার পর অন্নর মনের যে ব্যথা গুমরে উঠেছে নির্বাকভাবে, তা’ হৃদয়দ্রাবী। তবে এখানে একটা ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে চাই। এই দ্বিতীয় কিস্তি কেমন যেন বিবৃতিমূলক। আরও কথাবার্তা বসিয়ে রচনাটিকে প্রাণবন্ত করা যেতে পারে। যেমন—কানাই মাষ্টারের চরিত্রটি। আভাসে তার চরিত্রের কঠোরতা, রুক্ষতা প্রকাশ পায়। বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত এই চরিত্রটিকে মনের সামনে জীবন্ত উপস্থিত করতে পাঠককে কিছুটা শ্রমস্বীকার করতে হয়। সতু উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র। সতুর সম্বন্ধে প্রথমে যা লক্ষ্যণীয় তা’ তার ভাবপ্রবণতা। লেখক এখানে সতুর মনো-বিশ্লেষণে গতানুগতিক। মনে হয় গল্পের মূল কেন্দ্র ‘সতু’ চরিত্র, ‘অন্ন’, ‘রণ’-র বাবা’, ‘রণ’-র মা’ বা ‘চন্দ্রর মা’ অপেক্ষাও কিছুটা হীনবল। দু’এক কথায় অন্যান্য চরিত্র যে ভাবে পরিস্ফুট, বিস্তৃত অবকাশেও ‘সতু’ তেমন আশানুরূপ নয়। সতু ভাবপ্রবণ এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার চিন্তাধারা কিছুটা গঠনমূলক (ভবিষ্যতে বড় হওয়ার চিন্তায় সে উত্তেজিত হয়) ও বিচিত্র (মা মনসা সম্বন্ধে তার মন্তব্য) বটে, কিন্তু সব মিলিয়েও লেখক তাকে এখনো নির্ভরযোগ্য করতে পারেন নি। যখন সতু রণ’র বাবার মুখে কঠোর দুঃসংবাদ শুনে ‘বাটি উল্টে’ দৌড়ে পালিয়ে গেল তখন তার কার্যকলাপে একটা মানসিক অস্থিরতা (mental unstability) বা প্রায় পাগলামির পরিচয় পাই। ‘বাটি উল্টানো’র কারণ কি ?—ক্রোধ ? কিন্তু শোক যেখানে ক্রোধকে ছাপিয়ে ওঠে সেখানে ক্রোধের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবার সুযোগ কোথায় ? কিংবা কারণটি কি শোকজনিত ক্ষোভ ? কিন্তু লেখক পূর্বে বলেছেন যে সতু তাদের বাড়ীতে খুদ আর গমভাজা খেতে পায় না। গরীবের কাছে এই সামান্য খাবার কত মূল্যবান, তা’ছাড়া এই খাবার অপর এক দারিদ্রের ভালবাসার দান। একে উল্টে ফেলা মোটেই বিবেচনার কাজ হয় নি। লেখক কিশোরদের মুখ চেয়ে রচনাটি লিখছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রচনায় এতাবৎ কোন বলিষ্ঠ আদর্শ নেই (শুধু চন্দ্রর মার মুখে সতুর বড় হওয়া সম্বন্ধে একটি উক্তি ছাড়া) বরঞ্চ সতুর হীনমন্যতা দেখিয়েছেন গদুর সঙ্গে তুলনায়। পাখি মারার টিপ না থাকায় শিশুমনে হীনমন্যতা আসা খুবই স্বাভাবিক পাশাপাশি আশার বাণী শোনালে মন উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। আশা করি ভবিষ্যতে এসব পাব। রচনা চিত্তগ্রাহী, প্রাঞ্জল। মনে হয় লেখক ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে এটি লিখেছেন কিছুটা অস্পষ্টভাবে ভাষা কিছুটা লঘু কিন্তু গল্পের উপযোগী এবং গতিশীল।

আশীষ ভট্টাচার্য, কলকাতা-

## ডিসেম্বর-জানুয়ারী কেন ?

ছাপার কাগজ দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠার দরুন নবম সংকলন প্রকাশিত হতে দেরী হয়ে গেল। তাই বাধ্য হয়ে ডিসেম্বর-জানুয়ারী একসাথে নবম সংকলন হিসেবে বের করতে হল।

●

## কৈফিয়ত

জরুরী কতকগুলো লেখা শেষ মুহূর্তে এসে পড়ার দরুন 'দর্শন-প্রসঙ্গে' ধারাবাহিক রচনাটি এবারেও দেওয়া গেল না এবং সেই সঙ্গে 'চিঠিপত্র' বিভাগটিও। আগামী সংকলনে এগুলো থাকবে।

●

## সভ্যদের প্রতি

সভ্যদের ক্ষেত্রে এবারের পত্রিকা মাস হিসেবে গণ্য হবে না। সংকলন হিসেবে গণ্য হবে।

॥ সঃ মঃ বীঃ ॥

# সূচী ঃ

বীক্ষণ / প্রথম বর্ষ / ৯ম সংকলন / ডিসেম্বর জানুয়ারী, '৭৩-'৭৪

# আমাদের কথা

যে গাছটাতে পচন ধরেছে, তার কতগুই ডালপালাগুলোকে মাঝে মধ্যে কেটে বাদ দিলেই গাছটাকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পচনের হাত থেকে বাঁচানো যায় না। তেমনি যে সমাজের বুকে ক্ষয়রোগের বীজাণু বাসা বেঁধেছে তাকে সুস্থ করতে কিছু সাময়িক নিরাময় বটিকা'ই যথেষ্ট নয় কারণ রোগের লক্ষণগুলোই রোগ নয় আর, রোগের লক্ষণগুলোকে জোর করে চেপে দেওয়ার দাওয়াই রোগটাকে সারায়তো না বরং আরো জটিল করে তোলে। প্রাত্যহিক খবরের কাগজ খুললেই গোটা ভারতীয় সমাজের যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে সে ছবিটা কিন্তু আসল রোগটার নয়—রোগটার বিভিন্ন লক্ষণ। 'ভুখা মিছিল', 'শ্রমিক ধর্মঘট', 'জোতদারের হাতে কৃষক খুন', 'পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ছাত্রের হাতে অধ্যাপকের নিগ্রহ', 'অফিসার মহলে কেলেংকারী', 'জাতীয় শিল্পোদ্যোগগুলির ব্যর্থতা', 'খরা-বন্যায় অসংখ্য মৃত্যু', 'সুন্দর বনে শিশু বিক্রয়', 'বেকারীর জ্বালায় আত্মহত্যা' ইত্যাদির কোনটাই আলাদা আলাদা রোগ নয়—একই রোগের বিভিন্ন লক্ষণ, এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা সামাজিক বিপর্যয়ের বিভিন্ন দিক। এই বিভিন্ন দিক বা লক্ষণগুলোর আন্তঃসম্পর্ক ও পরস্পর-নির্ভরতাকে না বুঝলে রোগের কারণটা বোঝা যাবে না।

সচেতনভাবে উপলব্ধি না করলেও আমরা কিন্তু অদৃশ্যচক্রের দাঁতের ডগায় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে পাক খেয়ে চলেছি। পাক খেয়ে চলেছে সবাই—ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, কেরাণী, ডাক্তার,—এক কথায় সমাজের নীচু আর মাঝের তলার সব বাসিন্দা। একের সঙ্গে অন্যের আপাতঃ পার্থক্য এই যে কারো শেকলের দৈর্ঘ্যটা একটু বেশী, কারো বা একটু কম কাজ এই মজবুত শেকলটাকে ছেঁড়া একার নয়। একসাথে ফুসফুস ফাটিয়ে না টানলে এটাকে ছেঁড়া যাবে না। এই সমলক্ষ্যতাই ব্যাপক অর্থে হবে আমাদের ঐক্যের ভিত্তি। এই ঐক্য শুধু একটা ঘোষণা বা আহ্বানের ফলে একদিনে গড়ে ওঠে না—একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই এটা গড়ে ওঠা সম্ভব। যাদের সাথে জোট বাঁধবো তাদের না জানলে, ভালো করে না চিনলে, জোটবাঁধা যায় না।

ঐক্যের প্রয়োজন ঐক্যের অভাব থেকেই আসে।

ঐক্য আকাশ থেকে পড়ে না, সংগ্রামের মুখেই ঐক্য অর্জিত হয় কিন্তু এর মানে এই নয় যে শুধু সংগ্রাম করে গেলেই ঐক্য নিজের থেকেই গড়ে উঠবে কারণ সংগ্রাম করতে গেলেও ন্যূনতম ঐক্য চাই। আসলে সংগ্রামের জন্য যেমন অপরিহার্য সর্ত হলো ঐক্য ঠিক তেমনি সংগ্রামকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কোন অর্থ হয় না। কতখানি ঐক্যের ওপর নির্ভর করে কি ধরণের সংগ্রাম করবো বা সংগ্রামের পথে কতখানি এগোবো—এর যথার্থ বিচার এবং প্রয়োগই সাফল্যের মাপকাঠি। সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নিজেদের ঐক্যের ঘাঁটিকে সুসংহত ও বিস্তৃত করা সংগ্রামেরই আর একটি অংশ। এটিকে বাদ দিলে আসল সংগ্রামই এগুতে পারে না। আমাদের দেশের ছাত্র আন্দোলনগুলির আপাতঃ ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো, এই ধারণাটিকে উপযুক্ত গুরুত্ব না দেওয়া। যেখানে এর সামান্যতমও প্রয়োগ হয়েছে সেখানে সাফল্যের দিকে সংগ্রামও এগিয়েছে অনেকখানি। গত ডিসেম্বর (১৯৭৩)-এর সারা পশ্চিমবঙ্গের হাউসষ্টাফ-ইন্টার্ণ ও মেডিকেল ছাত্রদের যে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটটি হয়ে গেল* তার সাফল্যের (যে পরিমান হয়েছে) চাবি কাঠিটি হলো—সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্র গোষ্ঠিদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই আন্দোলনটিকে এক বিপুল শক্তির জোয়ার এনে দিয়েছিল যা কর্তৃপক্ষের ভীতিপ্রদর্শন, অনমনীয়তা এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারী অপপ্রচারের প্রচণ্ড বাধাকে অতিক্রম করে, ন্যায্য দাবিগুলির সামনে কর্তৃপক্ষকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছিল। সম্ভবতঃ, নেতৃত্বের ত্রুটির জন্য কর্মচারীরা এই আন্দোলনে সামীল হতে পারেননি। তাঁরা যদি এই আন্দোলনে নিজেদের ভূমিকাটিকে চিনে নিতে পারতেন তবে হয়তো এই আন্দোলনটি আরো অনেক উঁচু স্তরে যেতে পারতো এবং পরিসমাপ্তিও অন্যরকম হতো। এই ত্রুটি সত্বেও সাম্প্রতিক এই আন্দোলনটি ভবিষ্যতের সমস্ত ছাত্র আন্দোলনের কাছে এক ঐতিহাসিক নজির হয়ে থাকবে এবং এই ধরণের ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারতীয় ছাত্র আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণ ঘটবে।

---

* এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট এই সংকলনের ছয়পৃষ্ঠায় দেখুন।

# সাঁওতালডিহি :
## একটি 'স্বনির্ভর' প্রয়াস ও সরকারী 'সততা'র তথ্যচিত্র

● [সাঁওতালডিহি, "দেশের সর্বপ্রথম পুরোপুরি ভারতীয় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র" এবং "কারিগরী স্বনির্ভরতার পথে দেশের অগ্রগতির এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ"—উক্তি দুটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। গত ১৫ই অক্টোবর ('৭৩) পুরুলিয়ার এক সুদূর গণ্ডগ্রাম সাঁওতালডিহিতে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গের "সবচেয়ে বড়" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৬.১০.৭৩) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটি (১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন) সুইচ টিপে উদ্বোধন করার পরে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এই মন্তব্য করেন। সমস্ত বৃহৎ বাজারী সংবাদপত্রগুলিতেই আশা ও বিশ্বাসে ভরপুর উদ্দীপনাময় এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সচিত্র ও বিশদ বিবরণী প্রকাশিত হয়। সাথে সাথেই প্রকল্পটির 'স্বনির্ভর' চরিত্র, বিপুল সম্ভাবনা ও বিশালতা সম্পর্কে প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত প্রধান পরিচালক ও স্থপতি "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ"-এর (একটি সরকারী সংস্থা) কর্তাব্যক্তিদের দেওয়া, ভারী ভারী পরিসংখ্যান সম্বলিত স্বপ্নরঙীন, রোমাঞ্চকর বর্ণনা ও ভবিষ্যদ্বাণীও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় স্থান পায়।

চারদিন পর (২০।১০।৭৩) এক দৈনিক সংবাদপত্রের (দি ষ্টেটসম্যান) চিঠিপত্র স্তম্ভে প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে সামান্য দু-একটি যন্ত্রাংশ ছাড়া সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নক্সা, যন্ত্রপাতি, সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণভাবে একটি বিদেশী (বৃটিশ) একচেটিয়া কোম্পানী সরবরাহ করেছে। ইউনিটটিকে স্থাপনও করেছে তারাই। পত্রিকাটির বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্যবাহী "সম্ভ্রান্ত" চরিত্রের জন্য এতে প্রকাশিত সমালোচনার ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত স্পর্শকাতর। অতীতে এখানে প্রকাশিত সরকারের ত্রুটিসংক্রান্ত খবরে ভুল থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের তরফ থেকে প্রতিবাদ এসেছে। কিন্তু এই রচনা ছাপাখানায় যাওয়ার সময় (২৭.১২।৭৩) পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়নি। অর্থাৎ, চিঠির তথ্যগুলি সম্পূর্ণ সঠিক এবং 'স্বনির্ভরতা' সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ও বিদ্যুৎপর্ষদের আমলা বিশেষজ্ঞদের উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার এক ঘৃণ্য অপকৌশল মাত্র।

দেড়মাস পরে (২৯।১১।৭৩) প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা যায় যে প্রথম ইউনিটটি উদ্বোধনের পর আর একদিনও চলে নি। কারণ, জেনারেটরে, অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল যন্ত্রটিতেই "খুঁত বেরিয়েছে", অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও জনসাধারণের অর্থে প্রতিপালিত মোটা বেতনের আমলাদের যে 'অক্লান্ত' পরিশ্রমের উদ্দীপনাময় বর্ণনা সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল, তার সবটাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের দিনটিতে কোনরকমে ইউনিটটি চালানো'র জন্য। এর বিপুল সম্ভাবনা ও কার্যকরীতা সম্পর্কে তাঁরা যা বলেছিলেন তার সবটাই ছিল ভুয়া।

আমরা ভারতীয় "স্বনির্ভরতা"-র এই বেদনাময় ও লজ্জাকর চিত্র এবং জাতির 'সর্বোচ্চ অধিনায়িকা' ও মোটা বেতনের সরকারী কর্তাব্যক্তিদের তুলনাহীন 'সততা'র জীবন্ত প্রমান হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগের ও পরের দুটি প্রেরণাদায়ী বিবরণ এবং উপরোক্ত চিঠি ও খবর দুটি সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

প্রশ্ন এই যে, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উপর যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে (এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-উৎপাদন) এমন অসহায়ভাবে নির্ভর করতে হয়, সে দেশের স্বাধীনতার আসল চরিত্রটা কি? যে দেশীয়-সরকার বিদেশী লুটেরাদের হাতে এমনভাবে জাতির ভবিষ্যতকে সঁপে দেয় এবং জনসাধারণের কাছ থেকে সেই বিদেশী শোষককে আড়াল করার এমন কদর্য প্রচেষ্টা চালায়, তাকে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে কোন দেশপ্রেমিক ভারতীয় যদি মনে করেন, তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কী? —সঃ মঃ বীঃ] ●

## উদ্বোধনের প্রস্তুতি...

সাঁওতালডিহি ( পুরুলিয়া ) অক্টোবর, ১৪—আধুনিক কারিগরীতে স্বনির্ভরতার দিকে দেশের অগ্রগতিকে নিজের চোখে দেখার জন্যই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, সোমবার এখানে চারটি ১২০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথমটির আবরণ উন্মোচনের জন্য, তাঁর ব্যস্ত কর্মসূচী থেকে সময় দিতে সম্মত হয়েছেন।

**সাঁওতালডিহির পূর্বে ভারতীয় কারিগররা কখনও, প্রায় সম্পূর্ণভাবে দেশের নিজস্ব সম্পদ থেকে এক বিরাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নক্সা তৈরী এবং স্থাপনের কাজ গ্রহণ করতে সাহস করেননি। অন্তত এইরকম ক্ষমতাবিশিষ্ট বিদ্যুৎকেন্দ্রের বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানী পুরোপুরি তৈরী ( turn-key ) প্রকল্প।**

গত পাঁচদিন যাবৎ ইঞ্জিনীয়ার, সুপারভাইজার এবং অন্যান্য কারিগরী কর্মীরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতিগুলোকে যেমন, টারবাইন-জেনারেটর, ষ্টীম-বয়লার, হেভী পাম্প, পাওয়ার-সাইকেল, নানারকম পাইপিং ব্যবস্থা, ট্রান্সফর্মার, সুইচ্ গিয়ার, কেবলিং ও যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ইত্যাদি ( যেগুলোর সবই ভারতবর্ষে তৈরী )—চালান'র চূড়ান্ত (critical) পরীক্ষার জন্য ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করে চলেছেন।

এই সব কারিগরী কর্মীদের ক্লান্ত দেখাচ্ছিল না। বরং যখন বৈদ্যুতিক মেশিন, টারবাইন জেনারেটর হিস্ হিস্ শব্দে চালু হল এবং যখন অসংখ্য মিটারে—শুধু সংলগ্নগুলিতেই নয়, সূক্ষ্ম বোধশক্তি-সম্পন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্র লাগান যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষেও—প্রত্যাশিত ফল দেখা যাচ্ছিল, তখন, তাদেরকে স্পষ্টতঃ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

সাঁওতালডিহি প্রকল্পের প্রধান কারিগর শ্রীবি. এন. দত্ত রবিবারে যখন বললেন যে এ যাবৎ পরীক্ষামূলক চালনা "খুব সন্তোষজনক" হয়েছে তখন তাঁকে যেন কিছুটা স্নায়বিকভাবে দুর্বল মনে হচ্ছিল। প্রত্যেকটি জিনিষই স্বাভাবিক আছে। "তবুও, বুঝতেই পারছেন, আমি সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাকব।"

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ( W B S E B ) সভাপতি শ্রীজে. সি. তালুকদার বললেন, "আমরা একটা চূড়ান্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। পাঁচদিনের পরীক্ষামূলক চালনা শেষ হয়ে আসছে। এতক্ষণ কোন সমস্যা দেখা দেয়নি এবং আমি আশা করি আগামী চব্বিশ ঘণ্টা অনুরূপ স্বাভাবিকভাবেই যাবে।"

আবরণ উন্মোচন উৎসব উপলক্ষে আয়োজনের সমস্ত খুঁটিনাটি পরিদর্শন করতে শ্রীতালুকদার এখানে গত শনিবার থেকে আছেন।...

এই দশকের শেষ নাগাদ যখন ১২০ মেগাওয়াটের চারটি কেন্দ্রই স্থাপিত হবে তখন সাঁওতালডিহি এক শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে, যার যোগাযোগ থাকবে পূর্বে দুর্গাপুর আসানসোলের শিল্পাঞ্চলগুলির সঙ্গে, উত্তরে বোকারোর সঙ্গে এবং পশ্চিমে জামসেদপুরের সঙ্গে। এইভাবে একটা অনুর্বর পিছিয়ে থাকা জায়গা, পুরুলিয়া, আধুনিক শিল্প যুগে প্রবেশ করবে।

ভারী ইস্পাতের যন্ত্রপাতি ও জটপাকান এ্যালুমিনিয়ামের পাইপ, এবং সবার উপর মাথা উঁচু করে ওঠা ৩৩৩ ফুট উঁচু চিমনী—এই নিয়েই সাঁওতালডিহি প্রকল্পটি তৈরী হয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রচেষ্টার সাফল্য এবং দারিদ্র্য-কবলিত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এক নতুন যুগের প্রতিশ্রুতির প্রতীক হিসেবেই যেন চিমনীটি একরাশ ধূসর ধোঁয়া উদ্গীরণ করছিল।..

...প্রকল্পটি বর্তমানে কয়লার বদলে হাল্কা ডিজেলে চলছে। শীঘ্রই তা কয়লায় চলতে শুরু করবে। এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী. সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রটি নির্দ্ধারিত ক্ষমতায় ১২০ মেগাওয়াট উৎপন্ন না করতে পারার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয় কেন্দ্রটির প্রস্তুতি কাজ খুব দ্রুত চলছে এবং আগামী বছরের শেষদিকে এটি চালু হবার কথা। তৃতীয় ও চতুর্থ কেন্দ্রের প্রাথমিক ভিত্তির কাজও নির্দ্ধারিত সূচী অনুসারে এগিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

### পরীক্ষা নিরীক্ষা ( Trial & Errior )

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীদত্ত বললেন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রথম কেন্দ্রটি স্থাপন করতে যে দেরী হয়েছে তা পরবর্তী কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে এড়ান যেতে পারে। আসলে, অন্যসব কেন্দ্রগুলি আরও তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করা যেত, যদি স্থানীয় উৎপাদকরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহে আর একটু বেশী তৎপর হতেন।

প্রথম কেন্দ্রটির স্থাপনের সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরী করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। ১০,০০০-এরও বেশী জটিল ধাঁচের নক্সা তৈরীর প্রয়োজন হয়েছিল। এতে সময় লেগেছিল। এছাড়া যন্ত্রপাতি এবং মালমশলা সরবরাহেও অপ্রত্যাশিত দেরী হয়েছিল।

শুরুতে আনুমানিক হিসাবে চারটি কেন্দ্রের খরচ ধরা হয়েছিল ৭৫ কোটি টাকা। পরিবর্তিত খরচের বর্তমান পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৭ কোটি টাকা যার মধ্যে ৪৭ কোটি টাকার বেশী ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। এটা এখন স্পষ্ট যে মোট খরচ আরও বেশী পড়বে। শ্রম এবং উপকরনের দাম বাড়াটাই আগের আনুমানিক হিসেবগুলির ক্রমাগত ঊর্দ্ধমুখী পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে বলা হচ্ছে।

শ্রীদত্ত আশা করেন **প্রথম কেন্দ্রটি নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ১২০ মেগাওয়াট উৎপন্ন করবে।** এর মধ্যে ২০ মেগাওয়াট

১৩২ কে. ভি. লাইনের মধ্যে দিয়ে পুরুলিয়ায় চলে যাবে এবং বাকী অংশ ২২০ কে. ভি. লাইনের মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুরে যাবে। শেষোক্ত অংশটি ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করবে। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল প্রথম কেন্দ্রটি থেকে কেবল সামান্য কিছু উপকার পাবে।...

[ দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ১০।১০।৭৩ ]

## উদ্বোধন

সাওঁতালডিহি, অক্টোবর ১৫—পূর্বনির্ধারিত সময় মত ঠিক ১০-৪৫ মি-টে আজ শ্রীমতী গান্ধী হেলিকপ্টার যোগে সাওঁতালডিহি পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল মি: এ. এল্. ডায়াস এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, যাঁরা তাঁকে পানাগড় বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে যান। প্রধান মন্ত্রী পানাগড়ে দিল্লী থেকে একটি আই. এ. এফ. বিমানে নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মি: আগে এসে নেমেছিলেন।

তিনি সাওঁতালডিহি হেলিপ্যাডে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে যান পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীঅরুণ মৈত্র, স্থানীয় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীদেবেন মাহাতো এবং পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার এম. পি ও এম. এল. এ. সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা। মন্ত্রীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীএ. বি. গণি খান চৌধুরী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা, ভূমি এবং ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খান, বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসীতারাম মাহাতো। মুখ্যসচিব শ্রীঅমিতাভ নিয়োগী এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিব শ্রীবি. আর. গুপ্তও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

### বিরাট জনসমাগম

একটি খোলা জীপে চড়ে শ্রীমতী গান্ধী হেলিপ্যাড থেকে সামনের ডিস্‌পেন্‌সারীতে যান। যাত্রাপথের ধারে বিশাল জনতা লাইন করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে "ইন্দিরা গান্ধী যুগ্ যুগ্ জীও", (ইন্দিরাগান্ধী দীর্ঘায়ু হোন)। ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে, তিনি হেলিপাডে তাঁকে দেওয়া ফুলের মালা ছুঁড়ে দেন [ এই ডিস্‌পেনসারীটি বিদ্যুৎ প্রকল্পটি সংলগ্ন যে শহরটির অংশ, সেখানে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য ইতিমধ্যেই ১,০০০ বাসগৃহ তৈরী হয়েছে সেখানে। ]

ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে প্রধানমন্ত্রী সুন্দরভাবে সাজানো অতিথি-শালায় যান এবং সেখানে তিনি শ্রীদেবেন মাহাতোর নেতৃত্বে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কংগ্রেসী কর্মীদের এক প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ...বিদ্যুত প্রকল্পে তিনি একটি ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন এবং একটি সুইচ্ টেপেন। তারপর তিনি বিভিন্ন কারখানা ঘুরে দেখেন, তেষট্টি টি সিঁড়ি পেরিয়ে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ওঠেন এবং বয়লারের কাজ ও টারবাইন জেনারেটর পরিদর্শন করেন,-যেগুলো সমস্ত স্থানীয়ভাবেই তৈরী হয়েছে।

বিদ্যুতকেন্দ্রের সংলগ্ন মাঠে একটি জনসভায় তিনি বলেন: "বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্বোধন করার জন্য এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। কারিগরী স্বনির্ভরতার পথে দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটি একটা তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

### ইঞ্জিনীয়ারদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

তিনি মন্তব্য করেন যে সাওঁতালডিহির মত এইরকম কেন্দ্রস্থাপন একটা অঞ্চলেরই উন্নতিতে শুধু সাহায্য করেছে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে দেশকেই সাহায্য করেছে। তিনি ইঞ্জিনীয়ারদের এবং শ্রমিকদের, যাঁরা দেশের প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে যুক্তভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন যে, একমাত্র যুক্ত প্রচেষ্টাই দেশের প্রগতি আনতে পারে।

[ দি স্টেটস্‌ম্যান, ১৬।১০।৭৩ ]

## স্বনির্ভতার চিত্র...

"মহাশয় -যখন ১২০ মেগাওয়াটের প্রথম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সাওঁতালডিহিতে উদ্বোধন করা হল তখন দাবি করা হয়েছিল, ফুয়েল পাম্প ও হিটিং সেট্ (Heating Set) বাদ দিলে বাকি পুরো ইউনিটটির নক্সা এবং তৈরীর কাজ দেশীয় মাল-মশলা ও উদ্যোগে করা হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী সাওঁতালডিহিকে এই বলে বর্ণনা করেন যে "এটি কারিগরী স্বনির্ভতার পথে দেশের অগ্রগতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।" তিনি দেশের এই সর্বপ্রথম পুরোপুরি 'ভারতীয়' তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নির্মান সাফল্যের জন্য জনগণকে ধন্যবাদ দেন।

টারবাইন এবং জেনারেটরগুলি যা হেভী ইলেকট্রিক্যাল (ইণ্ডিয়া) লি:, ভূপাল সরবরাহ করেছে, এ. আই. ই. লি: (যা এখন ইংলিশ ইলেকট্রিক এবং 'জ. ই. সি'র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে)-এর সঙ্গে একটি সহযোগিতার চুক্তির ভিত্তিতে, ব্রিটেন থেকে আমদানী করা হয়েছিল। দামটা স্টারলিং-এই দিতে হয়েছে। এ. আই. ই'র সঙ্গে চুক্তির মধ্যে সাধারণ যন্ত্রপাতির কাজ, যেমন পাইপের সংস্থান, যন্ত্রাদির বিন্যাস ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং দেশীয়ভাবে প্রস্তুত উপকরণ, যেমন ল্যাগিং অয়েল (Lagging Oil), ওয়াটারকুলার এবং সুইচ্ গিয়ার ও কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদির সংখ্যা যৎসামান্যই বলা চলে। তাও আবার এগুলি বানানো হয়েছিল এ. আই. ই'র সরবরাহ করা নক্সার উপর ভিত্তি করে।

**নিজেরা তৈরী করেছে বলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ যে ধারণাটি প্রচার করতে চেয়েছে তাও মিথ্যা।** যথাযথ জায়গায় যন্ত্রপাতি বসানো এবং সেগুলি চালু করে দেওয়া, সরবরাহকারী বা নির্মাতাদেরই দায়িত্ব। ১০,০০০ নক্সা এখানেই তৈরী কর

সাওঁতালডিহি/পাঁচ

হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়েছে তা আর একটি অলীক প্রচার। একটা আলপিন থেকে শুরু করে টারবাইন পর্যন্ত সবকিছুরই নক্সা এ. আই. ই. থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। যে কাজটুকু ভারতে করা তা হল মেট্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগুলিকে প্রকাশ করা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ শুধুমাত্র বাজার সরকারের কাজটুকু করেছে যেমন নির্মাতা এবং এবং ঠিকাদারদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া, জমি সংগ্রহ করা, রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ী তৈরী করে দেওয়া এবং সার্বিক সংগতি রক্ষা ও পরিকল্পনার কাজ নির্বাহ করা। এতেই সে এতোখানি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যে প্রধান যন্ত্রটি সাঁওতালডিহিতে একটি ক্রেটের মধ্যে তিন বছরেরও বেশী সময় ধরে চুপচাপ পড়েছিল।

বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর জন্য, এ দেশেই যে দু-একটি মামুলি উপকরণ তৈরী করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, তাই হল এই অস্বাভাবিক বিলম্বের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু শিল্পে উৎপাদন ও দেশের উন্নয়নে গত ছয় থেকে আট বছরে যে পরিমান ক্ষতি হয়েছে তার তুলনায় এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় অতি নগন্য।

—পি. সি. দাস [ স্টেটস্ম্যান, ২০.১০.৭৩ চিঠিপত্র বিভাগ ]

**শেষ খবর...**

**সাঁওতালডিহির 'সেই জেনারেটর' অকেজো**

"......সাঁওতালডিহি বিজলি প্রকল্পের প্রথম ইউনিটটির উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী গত ১৫ই অক্টোবর। ওই পর্যন্তই। তারপর থেকে একদিনও প্রথম ইউনিটটির জেনারেটারটি কাজ করে নি। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। খুঁত বেরিয়েছে। এখন জানা যাচ্ছে, ১৯৭৪ সালের মার্চের আগে ওই জেনারেটার থেকে বিজলী উৎপাদনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাও আবার ওই সময় ৩০ থেকে ৩৫ মেগাওয়াটের বেশী উৎপাদন করা যাবে না। অথচ এই ইউনিটটির উৎপাদন ক্ষমতা ১২০ মেগাওয়াট।

১৯৭৪ সালের মার্চে যদি ৩০ থেকে ৩৫ মেগাওয়াট বিজলি উৎপন্ন হয়ও, তাহলেত' কলকাতা ও শহরতলির শিল্প এলাকার বিজলি সংকট চলতেই থাকবে। প্রথম ইউনিটটির উদ্বোধন করার সময় বলা হয়েছিল এই জেনারেটর থেকে উৎপন্ন ৫০ মেগাওয়াট বিজলি কলকাতা পাবে।" [ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.১১.৭৩ ]

* রচনাটিতে ব্যবহৃত মোটা হরফ আমাদের—সঃ মঃ বী

ডাক্তার-ছাত্র যৌথ আন্দোলনের দলিল

# সারা পশ্চিবাংলার ডাক্তার ও ডাক্তারী ছাত্রদের আন্দোলন

●[ পশ্চিমবাংলার হাউসস্টাফ, ইন্টার্ণ ও ছাত্রদের সম্প্রতি যে আন্দোলন হয়ে গেল—তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এ আন্দোলনে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর অনুগামীদের নিয়ে হয়নি—সমস্ত দলমতের ডাক্তার ও ছাত্ররাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে। নানাদিক থেকেই, এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যময় গণআন্দোলনের ইতিহাসকে নতুন ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রায় ১,৫০০ ভাতাপ্রাপ্ত ডাক্তার ও প্রায় ৪,০০০ ডাক্তারী ছাত্র রাস্তায় নেমেছিলেন—সাধারণ মানুষের মধ্যে—প্রচলিত সমস্ত ভুল ধারণাগুলিকে ভেঙে দিতে এবং তাঁদের মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণাগুলিকে গড়ে তুলতে। সাধারণ মানুষদের জন্যে আন্দোলনকারীদের তৈরী দলিলগুলির যেগুলি আমাদের হাতে এসেছে, সেগুলি অপরিবর্তিত ভাবেই নীচে আমরা প্রকাশ করলাম। আন্দোলনের পটভূমি এবং তার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ধারণাগুলি এর থেকেই পাওয়া যায়।

'সর্বাধিক প্রচারিত' দৈনিক-পত্রপত্রিকাগুলির অধিকাংশই এই আন্দোলন সম্পর্কে যে অর্ধসত্য ও মিথ্যার মেশান বিভ্রান্তিকর প্রচার চালিয়ে এসেছে নীচের এই দলিলগুলি তা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

দলিলগুলি ভাতাপ্রাপ্ত ডাক্তার ও ডাক্তারী ছাত্রদের 'কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত।

● দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলিলের কয়েকটি অংশ আমরা বাদ দিয়েছি, কারণ সেই অংশগুলির বক্তব্য প্রথম দলিলটিতেই আছে।

● আন্দোলনের ধারা, পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা 'বীক্ষণ' এর পরবর্তী সংকলনে প্রকাশ করবো।—সঃ মঃ বীঃ ]●

## হাসপাতালগুলো বন্ধ কেন?

সারা বাংলার ডাক্তাররা আজ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি কেন তাঁরা অবশেষে এই চরম পন্থা নিতে বাধ্য হলেন? ডাক্তার মানেই, আপনারা জানেন, টাকার কুমীর, কিন্তু আদপেই তা নয়! আমরা যারা ডাক্তারী জগতের নিচের তলার বাসিন্দা অর্থাৎ হাউসস্টাফ ও ইণ্টার্নরা, ৬ বৎসর পড়াশুনার পর (বর্তমানে ৮ বৎসর) মাইনে পাই **মাত্র ১৭৫ টাকা** এক বৎসরের জন্য, তারপর ৬ মাসের জন্য **১৫০ টাকা** এবং তারপর গুণগত বিচারে **মাসে ৩০০ টাকা** এসবই **সর্ব্বসাকুল্যে**। যেখানে অন্যান্য যে কোনও বৃত্তির যেমন ৪র্থ-শ্রেণীর কর্মচারী, দারোয়ান অথবা ইঞ্জিনীয়ারের পারিশ্রমিক কত অকিঞ্চিৎকর তা একবার তুলনা করে দেখুন। আজকে সভ্যজগতে যেখানে একজন শ্রমিককে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা খাটতে হয় (একদিন সাপ্তাহিক ছুটি সহ) সেখানে **আমাদের খাটতে হয় সপ্তাহে ৭ দিনই রোজ ২৪ ঘণ্টা করে—কোনও ছুটি নেই।** এ ছাড়া বছরে যে কয়টি নির্ধারিত ছুটি তা সবই কর্তৃপক্ষের দয়ানির্ভর।

এই শোচনীয় পরিবেশেও আমাদের সান্ত্বনা—ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই অবস্থা নয়—মহীশূরে একজন হাউসস্টাফ পান প্রায় ৬৫০ টাকা, মহারাষ্ট্র ৪৭৫ টাকা। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান পাঞ্জাব ও অন্যান্য অনেক প্রদেশে অবস্থা আরও ভালো।

তারপর আবার এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর আমাদের থাকার দুরবস্থা—**একটা ছোট ঘরে ৪/৫ জন আমরা** যেভাবে থাকি হিটলারে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও বোধ হয় লোকে এর চেয়ে সুখে থাকত।

এবার ভেবে দেখুন এর পরিবর্তে আপনাদের কি দিতে পেরেছি—**আউটডোরে ভীড়, ইনডোরে বেড পাওয়ায় অনিশ্চয়তা এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পদ্ধতির (যেমন X-ray E.C.G. রক্ত, মল, মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষা)** অভাব সম্বন্ধে আপনারা সকলেই ওয়াকিবহাল, তাই আজ আপনাদের সুচিকিৎসার দাবীতে এবং আমাদের শোচনীয় অবস্থার উন্নতির দাবীতে ডাক্তাররা আজ আন্দোলনের পথে।

গত ১৪।১১।৭৭ তারিখে ২১ দিনের সময়সীমা সহ ৬ দফা দাবী সম্বলিত পত্র মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা রেখেছিলাম। সেগুলি হল—

১। **২৪ ঘণ্টার এক্সরে' ই, সি, জি, ব্লাড ব্যাঙ্ক ও রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা।**
২। **উন্নততর টেলিফোন ব্যবস্থা।**
৩। **উপযুক্ত নিরাপত্তা।**
৪। **সপ্তাহান্তে একদিন ছুটি**
৫। **থাকার সুব্যবস্থা।**
৬। **ভাতা-বৃদ্ধি।**

১৬ দিন যোগনিদ্রার পর ৩০শে নভেম্বর তিনি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতির সদস্যদের ডাকলেন শুধুমাত্র এই কথাই জানাতে যে, আমাদের এবং জনগণের দাবীদাওয়া সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অসহায়। পরে, আবার ৫ই ডিসেম্বর উক্ত সদস্যদের জানালেন—মন্ত্রীসভার ঝটিকা অধিবেশনে আমাদের দাবীগুলি এক কমিশনের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার রায় নাকি তিন মাসের আগে জানা সম্ভব নয় এবং যে রায় নাকি অনুমোদন বা খারিজ করার পূর্ণ অধিকার সরকারেরই থাকবে! স্বভাবতঃই কমিশন মানতে অনিচ্ছুক হ'য়ে আগামী সোমবার থেকে স্তরে স্তরে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিই। মন্ত্রী মহাশয় নিজে যদি অসহায় বোধ করেন তবে এই কমিশন তাঁকে কোন সাহায্য কর'তে পারবে বলে আমরা মনে করিনা। তা ছাড়া সকলেই জানেন যে, **'কমিশন' মানেই ধামা চাপা।**

তাই, সংগত কারণেই আন্দোলনের প্রথম পর্যায় হিসাবে, স্মারকলিপি পেশ করার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল সংহত ডাক্তার ও ছাত্রদের এক সংযত অভিযান—যে অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল বেঁচে থাকার ও অপরকে বাঁচাবার এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা; যার বীজ আমাদের অন্তরে, বাণী আমাদের কণ্ঠে, আর বাস্তবায়ণের দায়িত্ব আমাদের ও আপনাদের হাতে। এই সংগত মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবী কোনও দল, মত বা রাজনৈতিক প্ররোচনার অপেক্ষা রাখেনি—এই দাবী ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাই এ মিছিল সৃষ্টি করেছে এক ইতিহাস—যে ইতিহাস ঐক্যের, সংযমের, অথচ গতিশীলতার—যা বাংলার মানুষ কোনও দিন দেখিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—এই শান্ত মিছিলকে স্তব্ধ করতে, মানবিকতাকে পদদলিত করতে এগিয়ে আসে, সরকারের **পোষ্য বর্বর পুলিশের চিরকলঙ্কিত লাঠি।** এই লাঠির আঘাতে আহত হন কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতির বেশ কিছু সদস্যসহ কয়েকজন ডাক্তার ও ছাত্র (যার মধ্যে কিছু মহিলাও ছিলেন)। যা 'সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে ইতিপূর্বেই আপনারা অবগত হয়েছেন। এরই প্রতিবাদে আমরা ৭ই ডিসেম্বর থেকে সব হাসপাতালের আউটডোর ও ইনডোর বন্ধ করার দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। **কিন্তু একথাও আমরা জানাতে চাই যে আমাদের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আমাদের হাসপাতালে কোনও মুমূর্ষু রোগীকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেব না। এর জন্য আমরা 'এমার্জেন্সী স্কোয়াড' খোলা রেখেছি এবং এমার্জেন্সী** চালু রাখব।

। পশ্চিমবাংলার ডাক্তার ও ডাক্তারী ছাত্রদের আন্দোলন/সাত

মনে রাখবেন আমাদের এ আন্দোলন বাঁচার তাগিদে। রোগীদের ও হাসপাতালগুলোকে বাঁচাবার তাগিদেও। কারণ নিপীড়িত ডাক্তার দিয়ে পীড়িত রোগীর সেবা করা যায় না। জানি এ সংগ্রামে **বহু রকম সরকারী অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সত্বেও আপনারা আমাদের পাশে আছেন—থাকবেন। তাই এ সংগ্রামে জয় আমাদের হবেই।**—বিনীত

*. সারা পশ্চিমবংগের হাউসষ্টাফ, ইন্টার্ণ ও ছাত্রবৃন্দ।

## ২

## ডাক্তাররা আজ আন্দোলনের পথে কেন?

· সারা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে ঠিক এই মুহূর্তে নেমে এসেছে একটা কালো মেঘের ছায়া। কম বেশী দশখানা সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল প্রায় অচল, ডাক্তারী শিক্ষা বিপর্যস্ত, দৈনিক ২০,০০০ আউটডোরের ও ১০,০০০ ইনডোরের রোগীরা চেয়ে আছে এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। বিপর্যস্ত হতে চলেছে গ্রামের হেলথ সেন্টারগুলো—সেখানকার ডাক্তারদের নাকি নিয়ে আসা হচ্ছে শহরের দিকে।

অন্যদিকে রয়েছে প্রায় ১৫০০ হাউসষ্টাফ ও ইন্টার্ণ এবং প্রায় ৪,০০০ ডাক্তারী ছাত্রদের সংগ্রামী ঐক্য। মৃত্যুপণ তাদের লড়াই, বাঁচবার জন্য—বাঁচাবার জন্য।.....

......বাঁচাবার আর বাঁচবার তাগিদে ছ-দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করেছিলাম মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে গত **১৪ই নভেম্বর**।...

গত ৩ শে নভেম্বর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানালেন—আমি 'অসহায়'। প্রতিবাদে তখনই আমরা কর্মবিরতি পালন করতে পারতাম। কিন্তু জনসাধারণের ব্যাধিগ্রস্থ চেহারা আর পঙ্গুত্বের ছবি দেখে থেমে গেলাম। ঠিক করলাম ৫ই ডিসেম্বর মিছিল করে রাইটার্সে গিয়ে পুনরায় ভেবে দেখার জন্য আরও সময় দেবো।

নেমে এলো আমাদের মিছিলের উপর পুলিশের নিষেধাজ্ঞা—মিছিলকে করা হলো বেআইনী। প্রতিবাদে ৬ই ডিসেম্বর হোলো প্রতীক ধর্মঘট দেড় ঘন্টার জন্য শুধু মাত্র আউটডোরে। পরে বেশী খেটে আমরা পুষিয়ে দিয়েছিলাম। সঙ্গে হয়েছিল ডাক্তারী ছাত্র ধর্মঘট সারা বাঙলায়।

৭ তারিখে বের করা হোলে এক বিরাট ঐতিহাসিক শান্তিপূর্ণ মিছিল। ডাক্তারেরা পথে নেমে এলো। এবার নিষেধাজ্ঞা নয়—এলো আমাদের শক্ত পাঁজরে পুলিশের লাঠিচার্জ। আহত হলেন কয়েকজন লেডী ডাক্তারও।

অনেক সয়েছি—কিন্তু আর নয়। তখনই ঠিক হোল—সমস্ত পশ্চিমবাংলায় ঘটবে হাউসষ্টাফ ও ইন্টার্ণদের কর্মবিরতি, দাবী না মানা পর্যন্ত। কর্মবিরতি এখনও চলছে—চালাতে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের দাবী একটাও মানা হয় নি এখনও মাননীয় মন্ত্রী শুধু বলেছেন ও বলছেন কি কি বর্তমানে আছে। কি হবে জানতে চাইলে বোঝা গেল ইচ্ছে হয় তো আছে কিন্তু উপায় নেই, টাকার অভাব। কবে দাবী মানা হবে জানি না। কতটা তাও না। মানা হলে কবে নাগাদ হয়ে উঠবে তাও না। শুধু কাগজে জানতে পারছি আমাদের সব দাবীই মানা হয়ে গেছে। অদ্ভূত। সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে ভাতা বৃদ্ধিই নাকি আমাদের একমাত্র দাবী, অবার বলছি—ছ দফা দাবী না মানা পর্যন্ত থামবো না আমরা।

বলুন কমিশনে আপনাদের কোন শ্রদ্ধা আছে?

মনে রাখবেন, **আমাদের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত কো রোগীকে বিনাচিকিৎসায় মরতে দেবো না।** আমাদে আন্দোলন আপনাদেরও জন্য। আমরা এমার্জেন্সী স্কোয়াড খুলে ছিলাম, আমরা বাইরে ক্লিনিক খুলেছি। আমাদের সামা ক্ষমতায় আমরা নার্সিং হোমও ভাড়া করতে পারি। তবু, দা না মেটা পর্যন্ত থামবো না ।

কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতি (সি, এ, সি
হাউসষ্টাফ, ইন্টার্ণ ও ছাত্র

## ৩

## জনগণ জানুন জনগণ প্রতিবাদ করুন
## জনগণ আন্দোলনে সামিল হোন !!

বন্ধুগণ,......

আপনাদের সামনে ডাক্তারদের যে ছবি সাধারণতঃ তুলে ধরা হয় তাতে আপনারা তাদের গাড়ি-বাড়ি সমৃদ্ধ সুখী মানুষ হিসেবে জানেন। চিকিৎসার ত্রুটির জন্য আপনারা তাঁকেই দায়ী করেন, ( ডাক্তার (ভাতাপ্রাপ্ত) সব সময় আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন চব্বিশ ঘন্টা আপনাদের সেবা করেন। আপনারা শুনেছেন, ডাক্তার গ্রামে যেতে চান না, নিজেদের স্বার্থে শহরে থাকেন।

—প্রচারের বিভ্রান্তিতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন সমাজে বিত্তশালী চিকিৎসক, সোজা কথায় যাকে বলে 'বড় ডাক্তার' এব আমাদের মতন হাসপাতালের 'ছোট ডাক্তার'—এর মধ্যে রয়েছে এক বিরাট ব্যবধান। খোঁজ নিয়ে দেখুন, চিকিৎসার ত্রুটির জন্য দায়ী কে? ডাক্তাররা গ্রামে যান না কেন? তাঁরা উপেক্ষি কি না?

গ্রামের হেলথ-সেন্টারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তো **নেই-ই**। ছাড়া চিকিৎসার কথা ভাবাও যায় না, সেই **ওষুধও নেই**। যে পেনিসিলিনের কথা আজ সব মানুষের কাছেই অতি পরিচিত, সেই পেনিসিলিনও গ্রামে পাঠানো হয় না।—একথা নিশ্চই ভাবা উচিত নয়, যে ডাক্তাররা দৈববলে রোগ সারাবেন। এত সত্ত্বেও অনেক ডাক্তার গ্রামে যেতে চান, কিন্তু আপনারা কি জানেন—তাঁদেরও স্থায়ী চাকরী এবং সরকারী পে স্কেলের সুযোগ দেওয়া হয় না?...

.. ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য তাঁরা শেষ পর্যন্ত **নিরুপায় হয়ে** আন্দোলনে নেমেছেন,—কর্মবিরতির ডাক দিতে বাধ্য হয়েছেন জানি অসুবিধে হবে কিছুটা আপনাদের। তবে আমরা জরুরী বিভাগ চালু রেখেছি—অঘটন না ঘটলে রাখবোও। প্রয়োজনে বাইরে ক্লিনিকও খুলব। আমাদের প্রতিজ্ঞা, **রোগীকে বাঁচাবার** আর **নিজেদের বাঁচবার দাবী পূর্ণ** না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলবেই চলবে। কিন্তু এ আমরা **চাই-নি**। আমরা চেয়েছিলাম সহজ পথে একটা সুষ্ঠু মীমাংসা।

**বন্ধুগণ, এ আন্দোলন রোগী, হাসপাতাল ও ডাক্তারদের স্বার্থে। অতএব আসুন ডাক্তার আর রোগী এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুচিকিৎসার জন্য, ডাক্তারদের ওপর অবিচার রুখবার জন্য সংগ্রাম করি।**

তবে মনে রাখবেন, আপনার আমার বাঁচার লড়াই সমস্ত রকম রাজনীতির ঊর্দ্ধে, জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত।

**সরকার বিরোধী রাজনৈতিক লড়াই এটা নয়।**

সারা বাংলার মেডিক্যাল কলেজের ইন্টার্ণ
হাউসষ্টাফ ও ছাত্রছাত্রী।

# আকুপাংচার

## চীন-প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসু'র সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

●[ সমাজতান্ত্রিক চীনে, তাদের প্রাচীন দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির অন্তর্গত 'আকুপাংচারে'র পুনরুজ্জীবন এবং তার সাম্প্রতিক নতুন নতুন প্রয়োগগুলিকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী জুড়েই আজ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি সাধারণ মানুষদের মধ্যেও এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আজ চীনে যাচ্ছেন এই আকুপাংচার শেখার জন্য।

চীনের সাথে আমাদের দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক না থাকায়, বাধা নিষেধের পাহাড় ডিঙিয়ে সেই আলোড়নের ঝড় আমাদের দেশে এসে পৌঁছুলেও, ডাঃ বিজয় বসু এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা বসুর সাম্প্রতিক চীন সফরের আগে পর্যন্ত, তা খুবই একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই কিছুদিন আগেও, আমাদের অনেকেই জানতাম না, আমাদের দেশে এবং এই কলকাতাতেই ডাঃ বিজয় বসু গত ১৪-১৫ বছর ধরে এই আকুপাংচার পদ্ধতিতে চিকিৎসা করছেন। ডাঃ বসুর এই সফরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—আকুপাংচারের সাম্প্রতিক নতুন নতুন প্রয়োগগুলিকে শিখে আসা। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করেই আজ আমাদের মধ্যে আকুপাংচার সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসা জমা হয়েছে—আকুপাংচার কি? কেমন করে সেটা কাজ করে? কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আকুপাংচার করা হয়? অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্য কোথায়?—আরো কত কি!

তাই চীন সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নাবলীর (যার বিবরণ এর আগের সংখ্যায় আপনারা পড়েছেন) সাথে সাথে ডাঃ বসুর কাছে আলাদা করেই আমরা আকুপাংচার সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসাগুলিকে রেখেছিলাম। বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে এড়িয়ে, যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি সেগুলির উত্তর দিয়েছেন। নীচের বিবরণটি আকুপাংচার সম্পর্কে সেই সব জিজ্ঞাসা ও তার উত্তরের বিবরণ। --সঃ মঃ বাঃ ]●

### পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক-ভিত্তি, প্রয়োগ ও চর্চা

প্রশ্ন—আকুপাংচার চিকিৎসা-পদ্ধতিটি কি? চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি? অন্য সমস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্য কোথায়?

ডাঃ বসু—আকুপাংচার একটি চীনা পদ্ধতি। প্রাচীন চীনা চিকিৎসা-পদ্ধতি। আমাদের দেশে যেমন নাকি আয়ুর্বেদীক, ভেষজ—চরক-শ্রুততের লেখা বহু পুরোন চিকিৎসা পদ্ধতি আকুপাংচারও তেমনি। ওরা বলে—চার হাজার বছর আগে থেকে এটা চলে আসছে। চীনের জনসাধারণ হাজার হাজার বছর ধরে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং তার থেকে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে—সেটাই এর ভিত্তি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বিদ্যাটা ওরা আহরণ করেছে। আড়াই হাজার বছর আগে এটা লিখিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। যখন কোন ওষুধ-পত্র ছিল না বা অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন এটা দিয়ে ওরা অনেক ধরণের রোগ সারিয়েছিল। মধ্যযুগে চীনা সম্রাটরাও এটাতে উৎসাহ দিত এবং সারা দেশেই এটাকে চালিয়েছিল। তারপর কুওমিন্টাং আমলে, যখন বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীরা চীন দখল করতে শুরু করলো তখন পশ্চিমী চিকিৎসা-ব্যবস্থাও ওখানে চালু হ'ল। চীনা ডাক্তাররা পশ্চিমী চিকিৎসা শুরু করল এবং নাক-সিটকাতে শুরু করলো নিজের দেশের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং আকুপাংচার সম্বন্ধে বলতে লাগল এটা

অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যাদুবিদ্যা এবং তারা এটা বন্ধ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু, চীন মুক্ত হবার বহু আগে থেকেই, মাও-সে-তুঙ বরাবর বলে আসছেন: চার হাজার বছর ধরে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার যে সারসংকলন চীনা জনগণ করেছেন তার ভেতরে অনেক মূল্যবান জিনিস আছে। এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিমী চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদরাও অনেক শিক্ষা পাবেন। এবং এই দুই ব্যবস্থা—আমাদের প্রাচীন পদ্ধতি আর আধুনিক পশ্চিমী পদ্ধতি—এই দুটোকে যদি একাত্মীভূত করা যায়, তবে সত্যি সত্যিই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে।

মুক্তির পর থেকে সেই ব্যবস্থাই চলে আসছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচুর পরিমাণে উন্নতি হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা কি? তখনকার দিনে ওদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও একটা তত্ত্ব ছিল। যেমন আয়ুর্বেদীয় তত্ত্ব ছিল—সব রোগের জন্ম বায়ু, পিত্ত, কফ্ ইত্যাদি দোষ থেকে। এখন আমাদের 'বায়ু-পিত্ত-কফ্'কে তো আর আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ওদেরও তেমনই একটা তত্ত্ব ছিল—'ইন এ্যাণ্ড ইয়াং' থিওরি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। আমাদের 'বায়ু-পিত্ত-কফে'র মতই এটা যদিও আর এখন গ্রহণযোগ্য নয়, তথাপি দেখা যাচ্ছে তার ভেতরেও অনেক 'ডায়লেকটিকস্' আছে। আমরা রোগাক্রান্ত হলে আমাদের শরীরের ভেতর স্বাভাবিক শরীরের সাথে অসুস্থ শরীরের যে সংগ্রাম চলে—তখনকার ঐ 'থিওরি'তেও দেখা যাচ্ছে, এই 'ডায়লেকটিকস্' এর কিছু কিছু আছে। আসল কথা হল, তারা পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দেখেছে যে আকুপাংচার দিয়ে রোগ সারান যায়। যদিও তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা ছিল না। কিন্তু এখন তারা চেষ্টা করছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা বের করার জন্য। হাজার হাজার চীনা ডাক্তার গবেষকরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই কাজ চালাতে চালাতে তারা দেখেছে যে আকুপাংচারের নতুন নতুন প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে। যেমন নাকি আগের ঐ লেখা-টেখায় কোথাও লেখা ছিল না যে ঐ ছুঁচ ফুটিয়ে শরীরের যে কোন জায়গায় অপারেশন করা যায় এবং রোগী বুঝতেই পারে না। কোন ব্যথা পায় না। এখন তো আবার নতুন করে আকুপাংচার দিয়ে অ্যানেসথেসিয়া করছে। আমরা জানি, অপারেশন করতে হলে রোগীকে অজ্ঞান করতে হয়। কিন্তু আকুপাংচারের ফলে তা করার দরকার হয় না। যেমন—পেট কাটতে হলে পায়ের দিকে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া হল। রোগী জাগা আছে, কথা বলছে, সরবৎ খাচ্ছে, রসিকতা করছে অথচ সাথে সাথেই পেট কেটে অপারেশনও চালানো হচ্ছে।

আকুপাংচারটা কি?—এ হ'ল শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়ে চিকিৎসা। কিন্তু তাই বলে এটা ইনজেকশনের মত নয়। চীনের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি বলে যে, শরীরের ভেতরে যে সব অন্ত্রসমূহ আছে সেগুলোর সঙ্গে বাইরের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির একটা যোগাযোগ রয়েছে। এই যোগাযোগটা হয় কতগুলো পথ (channel) দিয়ে। শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এই পথগুলো ত্বক পর্যন্ত আসে। এই পথগুলো দিয়ে কি যাতায়াত করে?—এই পথগুলো দিয়ে যাতায়াত করে রক্ত এবং প্রাণশক্তি (ভাইটাল এনার্জি)। তখনকার তত্ত্ব অনুসারে, এই পথগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শরীরে রক্ত এবং প্রাণশক্তির এই প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায় এবং তখনই অসুখ করে। আকুপাংচার দিয়ে কি হয়?—এই পথগুলোর মধ্যে অনেক বিন্দু আছে (শরীরের এক একটা দিকে প্রায় সাড়ে তিনশ'র উপর আছে)। এই বিন্দুগুলোতে যদি ছুঁচ ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে এই পথগুলো আবার চালু হয়ে যায়। যেমন নাকি, জলের কলের পাইপ বহুদিন যদি পরিষ্কার না করা হয় তবে তাতে মরচে পড়ে। তারপর কাঠি ঢুকিয়ে পরিষ্কার করতে হয়, তবেই আবার জল পড়তে শুরু করে। সেরকম—ছুঁচ দিয়ে পথগুলো পরিষ্কার করে দিলে বাইরের সাথে শরীরের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই সম্পর্ক স্বাভাবিক করাটাই হল ওদের চিকিৎসা পদ্ধতির মূল কথা। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক একটা সাম্যের মধ্যে আছে। এই সাম্যটা আবার স্থিতিশীল নয়। সব সময়ই পরিবর্তিত হচ্ছে। একেই বলে পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। যদি এই পথগুলোর ভিতর কোন বাধার সৃষ্টি হয় তা হলেই এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় এবং সেই দ্বন্দ্বের থেকে জন্ম হয় রোগের। এখন এই দ্বন্দ্বটাকে যদি ভাঙতে হয় অর্থাৎ যদি দ্বন্দ্বটার সমাধান করতে হয় তবে ঐ ছুঁচ দিয়েই করতে হবে। এবং ঐ ছুঁচ দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যে স্বাভাবিক সম্পর্ক সৃষ্টি হল সেটা কিন্তু পুরোন অবস্থার মতো নয়। একটা নতুন রকমের স্বাভাবিক অবস্থা। অন্যসমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্য হ'ল—অন্যসব চিকিৎসা

পদ্ধতিতে রোগীকে হয় ওষুধ খাইয়ে কিম্বা ইন্‌জেক্সন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় আর আকুপাংচারের বেলায় চিকিৎসা করা হয় শুধু ছুঁচ ফুটিয়ে অথবা 'মক্সা' ( Moxa ) দিয়ে। 'মক্সা' অনেকটা গরম সেঁকের মতো। আর্টিনেসিয়া ভালগেরিস ( Artenvasia Vulgaris ) নামে এক ধরণের গাছ আছে, নেপালে একে বলা হয় 'তিতিপত্তি'। এই 'তিতিপত্তি' অনেকটা চন্দ্রমল্লিকা জাতীয় গাছের পাতার মতো। এই পাতাগুলিকে সিগারেটের মতো পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে, আগে যে বিন্দুর কথা বললাম, সেই বিন্দুর কথা বললাম, সেই বিন্দুর মুখে ধীরে ধীরে সেঁক দেওয়া হয়। এটা ছুঁচের মতোই কাজ করে।

প্র: এটা তো পুরোপুরি একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা—তাই নয় কি?

বসু—হ্যাঁ। আমাদের পুরোন আয়ুর্বেদের মতো এটাও একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা মাত্র। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। সেই জন্যেই তো প্রায় হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক কর্মী এখন এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটাকে আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করছে।

প্র:—এখন পর্যন্ত কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আকুপাংচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে? এ সম্পর্কে চীনে আপনার দেখা বা শোনা কিছু উদাহরণ বলতে পারেন কি?

বসু—এখানে একটা ধারণা আপনাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, চীনের আকুপাংচার পদ্ধতি বা ওদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এটাই ওরা ভালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে ওটা হ'ল পরিপূরক; প্রতিদ্বন্দ্বী নয় যে এটা বাদ দিয়ে ওটা করবো। আমাদের এখানে যেমন বলে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেলে অন্য কোন ওষুধ খেতে পারবে না, এটা সে রকমও নয়। একটা মানুষ তার অসুখ হয়েছে। তাকে কি করে তাড়াতাড়ি ভালো করবো, সুস্থ সবল করতে তুলবো—সেটাই লক্ষ্য। তাই, যদি দেখা যায় কোনো একটি ব্যবস্থা বা কতকগুলি ব্যবস্থার সমন্বয়ে তাকে তাড়াতাড়ি ভালো করা যাবে, তবে তারই চেষ্টা করা হবে। এখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতা নেই। কাজে কাজেই, একটা অসুখ নিয়ে একজন রোগী হাসপাতালের 'আউটডোর'এ এলো, তার রোগ নির্ণয় হ'ল এবং ডাক্তাররা দেখলো কোন ব্যবস্থায় তাকে তাড়াতাড়ি ভালো করা যাবে। যদি দেখা যায় যে খালি আকুপাংচার দিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি ভালো করা যাবে, তখন রোগীকে জিজ্ঞাসা করা হল—সে কোনটা নিতে রাজী আছে। সে যদি আকুপাংচার নিতে রাজী না হয় তবে তাকে তার পরিবর্তে ভালো ব্যবস্থাই দেওয়া হ'ল বা বোঝানো হ'ল কেন আকুপাংচার করা উচিত। এখানে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, কতগুলো অসুখ আছে, যেগুলো পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থায় ভাল হয় না—সেগুলোর ক্ষেত্রে আকুপাংচার খুব ফলপ্রদ। বিশেষ করে, নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি—বাত জাতীয় অসুখ বা প্যারালিসিস জাতীয় অসুখ, যা নাকি ওষুধ খাইয়েও ভাল করা যায় না, সেগুলো আকুপাংচার পদ্ধতিতে খুব তাড়াতাড়ি নিরাময় হয়ে গেছে। বাত জাতীয় অসুখ, অনেক দিনের পুরোন অসুখ—'সাইনো সাইটিস', 'কোলাইটিস' বা 'টন্‌সিলাইটিস' ইত্যাদি বা জটিল কোন অসুখ, যেখানে অপারেশন করা দরকার—সেখানে আকুপাংচার পদ্ধতি ব্যবহার করলে অপারেশন না করলেও চলে। চীনে 'এ্যাপেন্ডিসাইটিস' অপারেশন করা হয় না, 'টন্‌সিলাইটিস'ও অপারেশন করার দরকার পড়ে না।

প্র: আকুপাংচারের কার্যক্ষেত্রের পরিধি কতখানি?

বসু—যখন বৈজ্ঞানিক ওষুধপত্র আবিষ্কার হয়নি তখন চীনে এটা দিয়েই সব অসুখ সারানো হ'ত। ম্যালেরিয়া পর্যন্ত সারানো হতো। কিন্তু এখন যে সমস্ত অসুখ ওষুধ দিয়েই আকুপাংচারের চাইতে তাড়াতাড়ি নিরাময় করা যায়, সেগুলোতে ওষুধই ব্যবহার করা হয়। এখানে নীতিটা হ'ল রোগীকে কত তাড়াতাড়ি ভালো করা যায়। একটা সাইটিকা বা বাতের রোগী এলো, আমাদের পশ্চিমী ওষুধপত্র যা আছে খেলো। কিন্তু তাৎক্ষনিক স্বস্তি পেলেও ওষুধ বন্ধ করলেই আবার তা আরম্ভ হল। অর্থাৎ রোগটা নিরাময় হল না। ওষুধ দিয়ে একটা সাময়িক যন্ত্রনার উপশম করা হল মাত্র। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আকুপাংচার করে দেখা গেছে, রোগটাও সেরে যায় এবং জীবনে আর তা হয় না।

প্র:—আর কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে চীনে গবেষণা চলছে?

বসু—নতুন নতুন প্রয়োগ বলতে, আমি বলবো, যেখানে পশ্চিমী দাওয়াই কোন কাজ করে না, তার অনেকগুলির ক্ষেত্রেই, দেখা গেছে, আকুপাংচার পদ্ধতি অনেক ভালো কাজ করে।

প্র:—যেমন ধরুন ক্যান্সার?

বসু—না, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত হয়নি। তবে ওদের ভেষজ যে ওষুধপত্র আছে তাতে, ওরা বলছে যে কতগুলো ধরণের ক্যান্সার নাকি বন্ধ ( অ্যারেষ্ট ) করা গেছে। বোবা কালা—এদের ক্ষেত্রে আমাদের E. N. T. Specialistরা বলে—"ও আর ভালো হবে না।" কিন্তু ওরা তা ভালো করেছে—আকুপাংচার দিয়ে।

প্রঃ—বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে বা অস্ত্রোপচারে আকুপাংচার পদ্ধতির সাফল্যের শতকরা হার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি? একই ক্ষেত্রে প্রচলিত পশ্চিমী চিকিৎসা পদ্ধতিতে সাফল্যের শতকরা হার কত?

বসু—সে তো অসুখ বুঝে। বিভিন্ন অসুখে বিভিন্ন রকম ফল পাওয়া গিয়েছে। বাত সম্পর্কে, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, শতকরা ৭০-৮০ জন এতে ভালো হয়েছে। আর 'প্যারালিসিস' সম্পর্কে— শতকরা ৫০ জন। রোগ যত পুরোন হয় ফলও ততটা আশানুরূপ হয় না।

প্রঃ—আমরা শুনেছি—সর্দি-কাশির ক্ষেত্রেও নাকি আকুপাংচার প্রয়োগ করে আরাম পাওয়া যায়। আমরা কি ঠিক শুনেছি?

বসু—হ্যাঁ। সর্দি-কাশির ক্ষেত্রেও আকুপাংচার পদ্ধতির প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়।

প্রঃ—কি করে এটা সম্ভব হ'ল? সর্দি, কাশির জীবাণু (virus) তো এখনও আলাদা (isolate) করা যায় নি। আকুপাংচার করে নিশ্চয়ই আলাদা করা যায় না?

বসু—আকুপাংচার দিয়ে যে শুধুমাত্র রোগ নিরাময় হচ্ছে তাই নয়। তা দিয়ে রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রঃ—আকুপাংচার শেখার জন্য কি সাধারণ ভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রে পূর্বদক্ষতা প্রয়োজন হয়, নাকি যে কোন সাধারণ মানুষই চেষ্টা করলে আকুপাংচার পদ্ধতি শিখে নিতে পারেন?

বসু—ওখানে চিকিৎসার সাথে যুক্ত কর্মীরাই আকুপাংচার শেখে। তাছাড়া ওখানে 'bare foot doctor' বলে এক ধরণের ডাক্তার আছে। এরা সবাই সাধারণ কৃষক। তাদেরকে একটা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিতে দু'মাসের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তারা Anatomy, Physiology, Pathology, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশুনা করে এবং বাস্তব-ক্ষেত্রে কি ভাবে চিকিৎসা করতে হয় তাও শেখে এবং সাথে সাথে আকুপাংচারও শেখে। তারপর গ্রামে গিয়ে production team এর মধ্যে কৃষিকাজও করছে এবং অন্যসময়ে চিকিৎসাও চালাচ্ছে। এ রকম প্রায় ৭-৮ লক্ষ 'bare foot' ডাক্তার সমস্ত চীনে ছড়িয়ে আছে। চীনে এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান একেবারে গ্রামদেশ পর্যন্ত চলে গেছে। কেউ এখন বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না—সবাই চিকিৎসা পায়। কাজে কাজেই, ডাক্তারী যারা জানে, তারা আরও গভীর ভাবে অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ইত্যাদি করতে পারে। সাধারণ লোকে যদি শেখে, তবে তারা সহজ (simple) অসুখগুলি কি করে নিরাময় করতে হয়, তা শেখে। যেমন নাকি, আমাদের এখানেও আছে—আমাশা হ'ল, ডাক্তার Entroquinol খাইয়ে দিল, আমাশা সেরে গেল। এখানেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই তবে অনেক বেশী সুসংবদ্ধ (Systematic)। আমাদের এখানে যেমন সাধারণ লোকেরা জানে না Entroquinol খেলে কেন আমাশা সারে—ওখানেও তাই।

প্রঃ—চীনে কি আলাদা ভাবে আকুপাংচার শেখানো হয়—না মেডিক্যাল কলেজের নিয়মিত পাঠ্যসূচীরই এটা অন্যতম বিষয়?

বসু—না এটা ওদের নিয়মিত পাঠ্যসূচীর ভেতরই আছে। তাছাড়াও, ওদের Special কতগুলো কলেজ আছে, Post Graduate Training এর জন্য এবং চীনের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি শেখার জন্য।

প্রঃ—আকুপাংচার সম্পর্কে কোন সাধারণ মানের বইপত্র আছে কি? থাকলে আমাদের দেশে কি তা পাওয়া সম্ভব?

বসু—চীনা ভাষায় অনেক আছে। লণ্ডন থেকে ইংরাজী ভাষায় কিছু কিছু বেরিয়েছে। লণ্ডনের একজন ডাক্তার—Dr. Phelixman, তিনি অনেক বই লিখেছেন আকুপাংচার সম্বন্ধে, Oxford University Publication-এ পাওয়া যায়। খুব দাম।

প্রঃ ভারতে কি একই জাতীয় কোন চিকিৎসা পদ্ধতি কখনও চালু ছিল?

বসু—আমি জানি না। চীনে এটা চার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। সেদিন কাগজে দেখলাম একজন এম, পি, দাবি করেছেন যে ভারতেও নাকি একই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অতীতে চালু ছিল—মনে হয় না কথাটা ঠিক। তবে বৌদ্ধধর্মের আমলে চীনের সঙ্গে ভারতের চিকিৎসা পদ্ধতির আদান প্রদান হয়েছিল। ভারতীয় অনেক ভেষজ পদ্ধতি ওদের দেশে চালু হয়েছে। ওদের দেশের অনেক চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের দেশে এসেছে। তবে আকুপাংচার এসেছে কি না ঠিক জানি না।

## আমাদের দেশে আকুপাংচার

প্রশ্ন—আমাদের দেশে আকুপাংচার ব্যাপকভাবে চালু হলে সুলভে চিকিৎসা সম্ভব হবে বলে কি আপনি মনে করেন?

বসু—নিশ্চয়ই। এতে কোন খর্চা নেই। শুধু ছুঁচ, তুলো আর স্পিরিট, ব্যাস। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তো খুব সুবিধে হয়।

প্রঃ—আমাদের দেশে আকুপাংচারের প্রচার ও প্রসারের জন্য সরকার কি ভাবে উদ্যোগ নিতে পারেন বলে আপনি মনে করেন?

বসু—সরকার কি ভাবে উদ্যোগ নিতে পারেন জানি না। তবে আমি নিজে ১৪-১৫ বছর ধরে সরকারের দিক থেকে কোন ধরণের সাহায্য বা সাড়া পাইনি।

প্রঃ—আকুপাংচারের প্রচার ও প্রসারের জন্য বেসরকারী উদ্যোগ কি ভাবে নেওয়া যায়?

বসু—হ্যাঁ যায়। যেমন বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের 'আউটডোরে'র ডাক্তারদের শেখানো যায়। কিন্তু সেটা হবে খুবই সীমিত। কারণ আমার একার পক্ষে এটা করা অসম্ভব। এটা সম্ভব করতে হলে চীনের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হবে। এখানকার ডাক্তার এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-কর্মীরা ওখানে যাবেন, ওখানকার বিজ্ঞান-কর্মীরা এখানে আসবেন—একমাত্র তবেই আমাদের দেশে আকুপাংচারের ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হবে। যেমন মিশর, অস্ট্রিয়া, তাঞ্জানিয়া, আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে ডাক্তারদের চীনে পাঠানো হয়—আকুপাংচার শেখার জন্য।

প্রঃ—'কোটনিস মেমোরিয়্যাল কমিটি'র কি এ ব্যাপারে কোন কর্মসূচী আছে?

বসু—হ্যাঁ, ওদের পক্ষ থেকে চেষ্টা হচ্ছে। কিছু কিছু লোকেদের শেখানো হচ্ছে। যাতে কিনা তারা bare foot ডাক্তারদের মতো স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা করতে পারে। যেমন এই তো সে দিন মেটিয়াবুরুজে আমি একটা কেন্দ্রের উদ্বোধন করে এলাম। উত্তরপাড়ায়ও একটা হচ্ছে। আরও অনেক জায়গায় এ রকম কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

প্রঃ—আকুপাংচার যারা শিখতে চায় তারা কি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে?

বসু—উৎসাহী ডাক্তারী ছাত্ররা ঐসব কেন্দ্রগুলিতে গিয়েই শিখতে পারেন।

## আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন

প্রঃ—চীনে আকুপাংচারকে যে ভাবে হাতুড়ে বিজ্ঞানের স্তর থেকে উঠিয়ে এনে আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক করা হয়েছে, আমাদের দেশের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকেও (যেমন আয়ুর্বেদ, হাকিমী ইত্যাদি) সেইভাবে উন্নত করা সম্ভব কি?

বসু—উচিত তো তাই। আগের অভিজ্ঞতার ভিত্তি যাই হোক না কেন কাজ যখন হয়—তখন তাকে দাঁড় করানোই তো আমাদের কর্তব্য।

প্রঃ—তা' হ'লে সে চেষ্টা করা হচ্ছে না কেন?

বসু—হচ্ছে না, কারণ—কুওমিন্টাংদের মতো আমাদের দেশের সরকারেরও নিজেদের দেশের পদ্ধতির প্রতি নাক সিটকানো মনোভাব রয়েছে।

## ডাঃ বসু ও আকুপাংচার

প্রঃ—আপনি নিজে কোন সময়ে আকুপাংচার শিখেছিলেন?

বসু—১৯৫৮ সালে, যে বার চীনে যাই, তখন শিখেছিলাম।

প্রঃ—এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করেছেন কবে থেকে?

বসু—১৯৫৯ সাল থেকে।

প্রঃ—এবার চীনে যাবার আগে কি কি রোগের চিকিৎসা আপনি এই পদ্ধতিতে করতে পারতেন?

বসু—আমি বাত, প্যারালিসিস ইত্যাদি পুরোন অসুখ, যেগুলো আধুনিক ওষুধ দিয়ে সারানো যায় না—তারই চিকিৎসা করতাম।

প্রঃ—এবার চীনে গিয়ে আকুপাংচার বিষয়ে কি কি নতুন জিনিষ শিখে এসেছেন যা এখানে প্রয়োগ করবেন বা করছেন?

বসু—এবার গিয়ে নতুন শিখেছি 'এ্যানাসথেসিয়া'। তবে প্রয়োগ করতে পারিনি এখনও।

প্রঃ—আপনিই কি প্রথম আমাদের দেশে আকুপাংচার পদ্ধতি চালু করেন?

বসু—আমি তা দাবি করি না। তবে, মনে হয়, পূর্বাঞ্চলে আমিই প্রথম এটা চালু করেছি।

প্রঃ—বর্তমানে আপনি ছাড়া আর কেউ কি এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন?

বসু—দিল্লীতে একজন করেন। তিনি জাপান থেকে শিখে এসেছেন। আর ব্যাঙ্গালোরে একজন করেন—ভিয়েনা থেকে শিখে এসেছেন। ইদানিং এক দম্পতি জাপান থেকে শিখে এসেছেন এবং বোম্বেতে চিকিৎসা করছেন। আর বিজয়াদা, মেদোর, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলে তো আমার ছাত্ররাই করছে।

প্রঃ—আকুপাংচার পদ্ধতিতে চিকিৎসার লোকজনের কি রকম সাড়া পাচ্ছেন?

বসু—প্রচণ্ড।

প্রঃ—আপনার কাছে যাঁরা চিকিৎসার জন্য আসেন তাঁরা বেশীর ভাগ কোন শ্রেণীভুক্ত মানুষ?

বসু—সব শ্রেণীর মানুষ। শ্রমিক-কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, এমনকি বড় বড় রাজনীতিবিদরাও আসেন। এই তো সেদিন বিহারের ছাপরা জেলা থেকে একজন কামার এসেছিল চিকিৎসার জন্য। আমি তাকে বলেছিলাম পয়সা নেবো না। যাওয়ার সময় সে আমাকে এই নরুণটা (ডাঃ বসু আমাদের একটা নরুণ দেখালেন—সঃ মঃ বীঃ) দিয়ে গেছে।
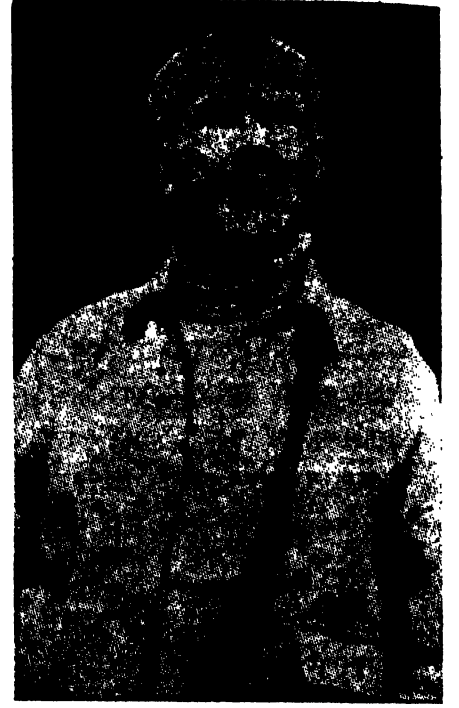
# ডাঃ নরম্যান বেথুন

**বন্ধ-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় নায়কের জীবনালেখ্য**

**রঞ্জন দেবনাথ**

[ কানাডার মানুষ, ডাঃ নরম্যান বেথুনের নাম আমাদের দেশে খুব একটা পরিচিত নয়। অথচ, গোটা মানব জাতির জন্ম উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, এই মানুষটিকে—যিনি তাঁর মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে স্বাধীনতার জন্ম সংগ্রামরত একটি নিপীড়িত জাতির সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবন দান করেন—পৃথিবীর বিরাট এক অংশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। মানব জাতিকে যারা চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যদিয়েই যে প্রকৃত মানব-সেবা সম্ভব—এই শিক্ষাই আমরা পাই ডাঃ বেথুনের জীবন থেকে। আর, একটি বিশেষ বিজ্ঞানে দক্ষতাকে পর্যন্ত কেমন করে সেই সংগ্রামের শাণিত অস্ত্রে পরিণত করা যায়, তার এত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা আমাদের দেশের যুব সমাজকে, বিশেষতঃ যাঁরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁদেরকে একটা সঠিক পথের সন্ধান দেবে, এই বিশ্বাস থেকেই আমরা এই জীবন কাহিনী পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থিত করছি। —সঃ মঃ বীঃ

**পূর্বানুবৃত্তি**

১৮৯০ সালের মার্চ মাসে গ্রাভেন হার্স্ট-এর উত্তর ওন্টারিও শহরে (কানাডা) হেনরী বেথুনের জন্ম। বাবা রেভারেণ্ড ম্যালকম বেথুন ও মা এলিজাবেথ অ্যান গুডউইন। বালক বয়সেই হেনরী বেথুনের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ভালোবাসা, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং দৃঢ় সংকল্পের মনোভাব প্রকাশ পায়। খুব ছোটবেলাতেই বেথুনের মনে ঠাকুর্দার মতো বড় ডাক্তার হবার বাসনা গড়ে ওঠে। মাত্র আট বছর বয়সে বাবা-মা'র কাছে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন বেথুন, আজ থেকে তাঁর নাম হবে, মৃত ঠাকুর্দার নামে—ডাঃ নরম্যান বেথুন। স্কুলের পড়া শেষ হলে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিভিন্ন পেশা নিয়ে পয়সা জমাতে লাগলেন বেথুন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালানো যায়। সব ধরণের পেশাই ছিল তাঁর কাছে সমান আকর্ষণীয়, তা সে সাংবাদিকতাই হোক, বা কাঠুরের কাজ হোক। এই সময়ে শিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ গড়ে ওঠে। এম, ডি পরীক্ষার আগে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বেথুন যোগ দিলেন মিলিটারিতে। যুদ্ধ শেষ হলো। বেথুনের বয়স তখন আটাশ। এম. ডি ডিগ্রী নেওয়া হয়ে গেছে বেথুনের। কিন্তু যুদ্ধের হতাশা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার থেকে মুক্তি পেলেন না তিনি। তাই একটা পরিবর্তনের আশায় পাড়ী জমালেন ইংলণ্ডে। আত্মবিস্মৃতির জন্ম বেপরওয়া বিলাসবহুল জীবন যাত্রা শুরু করলেন বেথুন। তিনি যে ক্লিনিকে কাজ করতেন তার প্রধান ডাঃ ডেল্ এবং উৎসাহ ও আর্থিক আনুকূল্যে বেথুন পেলেন এডিন-

বর্‌া—এফ. আর. সি. এস পরীক্ষা দিতে এবং সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো এক বিখ্যাত ধনী পরিবারের কন্যা, ফ্রান্সেসের সঙ্গে। পরীক্ষার পরই তাঁরা বিবাহ করলেন। বেথ্যুন-দম্পতী সৌভাগ্যের খোঁজে লণ্ডন ছেড়ে এলেন ডেট্রয়েটে (কানাডা)। চেম্বার খুলে বসলেন বেথ্যুন কিন্তু পসার ভালো জমলো না। যে সব রোগীরা তাঁর কাছে আসতো তারা সবাই অত্যন্ত গরীব। বেথ্যুন যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন তখন হঠাৎ করে বন্ধুত্ব হলো সে সময়কার একজন বিখ্যাত ডাক্তার ডাঃ মার্টিনের সঙ্গে। ডাঃ মার্টিন তাঁর সার্জারীর কেসগুলো বেথ্যুনের কাছে পাঠাতে শুরু করলেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়তে লাগলো বেথ্যুনের আর সেই সঙ্গে এলো টাকা। বেথ্যুন কিন্তু গরীব রোগীদের কোন সময়ে বিমুখ করতেন না। বড় লোকদের চিকিৎসা করে প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও মানসিকভাবে বেথ্যুন শান্তি পেলেন না। চিকিৎসকদের নীতিহীনতা এবং সমাজের উঁচু তলাকে সেবা করার প্রবণতা ও লোভ তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। স্পষ্ট এবং তীব্রভাবে তিনি এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো। বেথ্যুনের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তাঁর সহকর্মীরা।

॥ ৩ ॥

ফ্রান্সেস কচিৎ দেখা পেতেন স্বামীর। মাঝে মাঝে রাত্রেও বাড়ী ফিরতেন না বেথুন। ফ্রান্সেস সন্দেহ করতেন, অফিস ও রোগী দেখার পর রাত্রের বাকী সময়টুকু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পান-চক্রে কাটাচ্ছেন তাঁর স্বামী।

ক্রমশঃ ফ্রান্সেসের চোখে বেথুনের চেহারার একটা পরিবর্তন ধরা পড়তে লাগলো। বন্ধুরা সাবধান করে দিলেন কাজের মাত্রা কমিয়ে দেবার জন্য। দৈহিক শক্তি দ্রুত হারিয়ে ফেলতে লাগলেন বেথুন। সকাল বেলাতেই দারুণ ক্লান্তি লাগতো তাঁর, এমন কি রোগী দেখার সময়ও সেই ক্লান্তির ভাব কাটতো না। তবুও দিন বা রাত্রির যে কোন সময় হোক না কেন রোগীকে ফিরিয়ে দিতেন না তিনি—বিশেষ করে রোগী যদি গরীব হয়।

ক্রমশঃ মারাত্মক কাশি প্রকাশ পেলো। শুরুর দিকে বেথুন এটাকে পুরোপুরি অবহেলা করলেন, পরে কাশি ঠেকাবার জন্য সাধারণ ওষুধ-পত্র খেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হ'ল না। ধীরে ধীরে তাঁর চোখে-মুখে একটা অস্বাভাবিক জল-জলে ভাব ফুটে উঠতে লাগলো। দৃশ্যতঃই বেথুন ক্ষয়ে যেতে লাগলেন। একদিন ওজন নিতে গিয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেলেন বেথুন; ৫০ পাউণ্ড ওজন কমে গেছে তাঁর! একটা 'টনিক' মিশিয়ে নিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন তিনি। উঁচু কপালের ওপর চুল পাতলা, ধূসর হয়ে গেছে। আয়নার মধ্যেই ফ্রান্সেসের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। বেথুন বললেন: এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।—আমার বাবার চুলেও অকাল-ধূসরতা এসেছিল।

এর মধ্যেও নিজের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন বেথুন। মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক একটা মারাত্মক অবসাদের পালা আসতো। চোখের সামনে থেকে সব কিছু যেন মুছে যেতো; বিছানার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার একটা তীব্র ব্যাকুলতা পেয়ে বসতো তাঁকে। রাত্রে এক অজানা আতঙ্কের ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম ভেঙে যেতো তাঁর। আবিষ্কার করতেন বেথুন, তাঁর হৃৎপিণ্ড জোরে স্পন্দিত হচ্ছে, রাত্রি-বাস ভিজে গেছে ঘামে। অবশিষ্ট রাতটুকু ঘরের মধ্যে পায়চারী করে কাটিয়ে দিতেন তিনি। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলতো বিরামহীন কাশির পালা।

একদিন সন্ধ্যায় কাজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলেন বেথুন। হল-ঘরের মাঝামাঝি এসে স্বামীকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন ফ্রান্সেস; দেখলেন—মুখের ওপর একটা রুমাল চেপে ধরে আছেন বেথুন। রুমালটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। ফ্রান্সেসের দিকে একবার শুধু তাকিয়ে টলতে টলতে সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরের দিকে উঠে গেলেন বেথুন। এক মুহূর্তের জন্য ফ্রান্সেস চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর টেলিফোনের দিকে ছুটে গেলেন—প্রতিবেশী ডাক্তারকে 'কল' দিতে। ডাক্তার এলেন। বেথুন চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন বিছানায়। মুখ কাগজের মত সাদা। ঠোঁটের নিচে জড়ানো তোয়ালেটা কফ আর রক্তে ভিজে উঠেছে। মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছেন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গলার ভেতর ঘড় ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। ডাক্তার ধমক দিয়ে ফ্রান্সেসকে ঘর থেকে বার করে দিলেন। দ্রুত সামনের দিকে ঝুঁকে বেথুনের বুকের শব্দ শুনলেন, তারপর শুকনো গলায় বললেন, "ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার। তবু, এক্ষুনি এক্স-রে প্লেট নিতে হবে আমাদের।"

দু-সপ্তাহ ধরে শুয়ে থাকলেন বেথুন। একটা কুয়াশা যেন তাঁর মনকে ঘিরে রয়েছে। চিন্তার সূত্রগুলো হারিয়ে যাচ্ছে সেই কুয়াশায়। কখনো কখনো ঠোঁটের কোনায় এক টুকরো তিক্ত বাঁকা হাসি ফুটে উঠছে। হলঘরের মধ্যে অস্পষ্ট ফিস্ ফিস্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। ডাক্তারদের মুখ মাঝে মাঝে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে ভেসে উঠছে। হঠাৎ কুয়াশার জাল সরে যায়; ফ্রান্সেসের দিকে তাকান বেথ্যুন, তারপর চোখ সরিয়ে নেন। স্থির দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুনতে পান, ডাক্তাররা বলাবলি করছেন—"মারাত্মক ধরনের রক্তস্রাব।"

দিনের পর দিন হল-ঘরের ফিসফিসানি শোনা যায়। ফ্রান্সেসের ছায়া তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে। গলায় একটা উষ্ণ নোনতা ফেনা ঠেলে উঠে বেথ্যুনকে কখনো অন্ধকার কখনো আলোতে জাগিয়ে দেয়।

অনেক মুখ তাঁর দিকে তাকিয়ে দূরে সরে যায়। ছায়াগুলো পরস্পরের পেছনে তাড়া করে শয়তানের নাচ নাচতে থাকে ছাদের গায়ে…

"ডাঃ বেথ্যুন…"

একজন ডাক্তার তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। কেন তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে এরা? "ডাঃ বেথ্যুন…" গুঞ্জন করে দাড়ি ছাঁটা একটি সুখী সুখী মুখ, রোগশয্যার উপযোগী সযত্নে অভ্যাসিত 'মার্জিত' ব্যবহার—একটি মোটা-সোটা 'কি'র কুৎসিৎ মুখ! "কেমন আছো?" কি সীমিত শব্দভাণ্ডার এদের!

'কেমন আছেন?'-ভেংচি কাটেন বেথ্যুন, "যেন আমি মারা যাচ্ছি!—

"কেমন আছেন?"

দাড়িশুদ্ধ মুখটি সরে গেল।

বুড়ো ভালুক কোথাকার! বে-ওয়ারিশ ভাঙা গাড়িতে একটি হতভাগ্য শিশুর জন্ম দিতে মাঝ রাত্রে যদি ডাকা যায় ওকে…চিন্তা করতে গিয়ে ক্লান্ত বোধ করেন বেথ্যুন। চোখ বন্ধ করে আধো ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যান।

একদিন খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। মনের কুয়াশাটা কেটে গেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে তীর্যক রোদ এসে পড়েছে। একটু স্বস্তি বোধ করেন বেথ্যুন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আগের থেকে সহজ মনে হচ্ছে। রক্তস্রাব প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে কত তারিখ? রাস্তার শব্দ কান পেতে শোনেন বেথ্যুন। ভাবতেও কেমন অদ্ভুত লাগে—ঠিক আগের দিনগুলোর মতো আজকের দিনটি। রাস্তার আওয়াজগুলো ঠিক আগের মতোই পরিচিত মনে হচ্ছে। অবাক হলেন বেথ্যুন; কত সহজে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর ঘরটার বাইরে জীবন ঠিক আগের মতোই চলছে?

বেথ্যুনের চোখের সামনে একে একে ছবির মতো ভেসে ওঠে—ডেট্রয়েট, লণ্ডন, ভিয়েনা, ফ্রান্সেসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ, দারিদ্র, ভাগ্যের আকস্মিক পরিবর্তন। অতীতের ক্ষীণ বিবর্ণ স্মৃতি। কত অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে সমস্ত কিছু? এগুলো এক সময়ে ঘটেছিল—তার বেশী কিছু নয়। একটা বাজে নাটকের অংশ হিসেবে এসেছিল ওগুলো যে নাটকের যবনিকা পড়ে গেছে। কি যেন 'ভবিতব্য' শৈশব থেকে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য—ওহ হ্যাঁ, 'বিরাট সার্জন হওয়া'! হাসি পেলো তাঁর। তাইতো হয়েছেন তিনি,—ভাঙা হাড় ঠিক-ঠাক করেন আর টাকা ছিনিয়ে নেন লোকের কাছ থেকে! বেথ্যুনের চোখ ঘুরে আসে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর দিয়ে। আয়নাটা টেনে নিয়ে সাগ্রহে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। এতোখানি পরিবর্তন দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বেথ্যুন। যে অল্প কয়েকদিন বিছানায় আছেন তার মধ্যেই গাল ঢুকে গেছে ভেতরে, চুল আরো ধূসর হয়েছে, জ্বরের তাপে জলজল করছে চোখমুখ।

ক্লান্তিতে ডুবে যান বেথ্যুন। "হীরের দ্যুতীর মতো নিজের জীবন প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখো…" নাহ্! পিটারের দর্শনও একটা ভ্রান্তি।

কার পায়ের শব্দে চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় বেথ্যুনের। তাকিয়ে দেখলেন টেবিলের ওপর দুধের গ্লাস রাখছেন ফ্রান্সেস। ফ্রান্সেসকে পিঠের তলায় বালিশ ঠিকঠাক করতে দিলেন বেথ্যুন, তারপর দৃঢ় গলায় বললেন:

"আমাদের কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার ফ্রান্সেস।…আমি জানিনা ওরা কি বলেছে তোমায়, কিন্তু আমি জানি আমি আর বাঁচবো না। আমি শেষ হয়ে গেছি—তোমার সামনে পুরো জীবনটা পড়ে আছে ফ্রান্সেস। আমি চাই, তুমি আমাকে ছেড়ে নিজের পথ ঠিক করে নাও।"

কয়েক সপ্তাহ স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসিত হলেন বেথ্যুন তারপর যাত্রা করলেন গ্রাভেনহার্স্ট-এর ক্যালিডর স্যানেটোরিয়াম-এর উদ্দেশ্যে। 'বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন' বেথ্যুন, জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস সমাপ্ত হতে চলেছে!

স্টেশনের ব্যস্ত ভীড়ের মধ্যে শোকস্তব্ধ ফ্রান্সেস স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। শেষবারের মতো স্টেশনটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন বেথ্যুন। ডেট্রয়েট,—নূতন আমেরিকার হৃৎপিণ্ড! একটি সম্পূর্ণ বছর, একটি নিটোল স্বপ্ন যেখানে ধ্বংসের কীটগুলো কুরে কুরে খেয়েছে।

ফ্রান্সেসের দিকে ফিরে তাকালেন বেথ্যুন। প্রাণপণে চেষ্টা করলেন ফ্রান্সেস শেষ মুহূর্তে স্বামীকে কিছু বলতে, ফিরে পেতে সেই অমূল্য সম্পদ যা তাঁদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে হারিয়ে গেছে। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বেরুলনা তাঁর—একটা বোবা কান্না তাঁর কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। "বিদায় ফ্রান্সেস…" কোমল স্বরে বললেন বেথ্যুন, 'এডিনবরাতে ফিরে যাও—হয়ত' সুখী হবে সেখানে। সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে সেখানেই ফিরে যাও ফ্রান্সেস…"

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্লাটফর্ম দিয়ে এগিয়ে গেলেন বেথ্যুন।

পরের দিন সকালবেলা টরন্টো স্টেশনে বেথ্যুনের বাবা-মা উঠলেন গাড়িতে, তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার জন্য। বাবা অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন, সামনের দিকে ঝুঁকে গেছেন অনেকখানি। মা'র দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখে ফুটে উঠেছে যন্ত্রণার ছাপ। ডন নদী পেরিয়ে ট্রেন চললো। বেথ্যুন নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন চলমান গাছের সারী আর খয়েরী হয়ে আসা মাঠের দিকে। বার্ধক্যের ছায়া-পড়া চোখ দুটো তুলে প্রশ্ন করলেন মা, "তোমার কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, নরমান?" মাথা নাড়লেন বেথ্যুন। সে ধরণের কোন যন্ত্রণা নেই।

মাঠের মধ্যে টুকরো টুকরো বালুকাময় জমি, ঋজু সবুজ পাইন, অচ্ছ পাহাড়ের সারী এবং সব শেষে মাসকক হ্রদের একাংশ—তাঁরা গ্রাভেনহার্স্ট-এ এসে গেছেন।

হাসপাতালের পোশাক পরে শুয়ে থাকা বেথুনের পাশে ঝুঁকে পড়ে প্রার্থনা করলেন মা। জলে ভরে উঠেছে চোখ দুটো। বেথুন আস্তে করে মা'র হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন। "না, মা। প্রার্থনা বা অশ্রুর কোন প্রয়োজন নেই। কোন দুঃখতো নেই আমার? শুধু ভীষণ ক্লান্ত আমি। এটাই তো আমার যোগ্য পরিণতি। এখন যদি অপ্রত্যাশিত কোন কিছু ঘটে, তবে সেটাই বরং হবে একটা বাজে নাটকের শেষ অংকের মতো।"

* * *

পৃথিবীর কাছে তিনি শেষ হয়ে গেছেন কিন্তু ট্রুডো স্যানিটোরিয়াম থেকে একটা চিঠি এসে তাঁর জীবনকে নতুন খাতে বইয়ে দিল। ডেট্রয়েটে থাকার সময়েই বেথুনের প্রথম ইচ্ছাটি হয়েছিল ট্রুডো হাসপাতালে ভর্তি হবার কিন্তু জায়গা পাওয়া যায়নি। এখন গ্রাভেনহার্স্টে আসার একমাস পরে সারানাক (ট্রুডো হাসপাতাল) হ্রদ থেকে চিঠি এসে জানালো যেন খুব শিগ্রী হাসপাতালে ভর্তি হন।

স্যানিটোরিয়াম ট্রিটমেন্ট-এর পথিকৃৎ উত্তর আমেরিকার এডওয়ার্ড লিভিংস্টোন ট্রুডোর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সারানাক লেক হাসপাতাল চিকিৎসা জগতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। জীবনের এই নিষ্ঠুর পরিণতিকে ভবিতব্য বলে মেনে নিলেও হঠাৎ—ঘটে যাওয়া এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাবেন বলে ঠিক করলেন বেথুন। ১৬ই ডিসেম্বর ট্রুডো হাসপাতালে এলেন তিনি—নিঃশব্দে মেনে নিলেন ছক বাঁধা প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোকে। খুব মজা পেলেন নিজের এক্স-রে ছবি দেখে। পড়লেন, চিঠি লিখলেন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুয়ে চিন্তা করলেন। কোন ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ পেলোনা তাঁর মধ্যে। কোন আশাও না—ভয়তো নয়ই। একটা উদাসীন শান্তভাব ঘিরে থাকলো তাঁকে যদিও নার্সদের প্রচণ্ড আপত্তি সত্বেও হাসপাতালের নিয়ম-কানুনগুলোকে ভেঙে নিজের খেয়াল ও মর্জির সাথে খাপ খাওয়াতে কসুর করলেন না। খড়ের তৈরী যে টুপীটা সঙ্গে এনেছিলেন, শোওয়ার সময়ও সেটা মাথায় পরে থাকতেন বেথুন। বিছানা ছাড়ার অনুমতি পাওয়ার পর, নিয়ম বহির্ভূত হলেও হাসপাতালের করিডোরে পাজামা পরে ঘোরাঘুরি শুরু করেদিলেন কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে! শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের ঢালু অংশে অবস্থিত একটি কটেজ-এ তাঁকে স্থানান্তরিত করা হলে, হাসপাতালের কর্মচারীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এমন বেয়াড়া রোগী তারা এর আগে দেখেনি!

কটেজটির নাম ছিল লী। এখানে আরো তিন জনের সঙ্গ পেলেন বেথুন। চার জনের এই ছোট বৃত্তটির মধ্যে তিন জনই ডাক্তার যাদের প্রত্যেকের ওপর মারাত্মক ক্ষয়রোগ মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করেছে। এঁদের সকলেরই রোগটির সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি দিনে, প্রতি সপ্তাহে যে সব লক্ষণগুলো প্রকাশ পাচ্ছে সে সবক'টির অন্তর্নিহিত অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন তাঁরা।

২২৫ বর্গফুট জায়গার মধ্যে চারটে খাট অধিকার করে শুয়ে আছেন চারজন। চারদিকে হলুদ পাইন গাছের দেয়াল। তিন দিকেই দরজা, চতুর্থ দরজাটি খোলা রয়েছে একটি ছোট্ট বাথরুমের দিকে। গর্জনরত বাতাস আর কটেজের ওপর জমতে থাকা তুষারের মধ্যে চারজনকে ঘিরে সৃষ্টি হতে থাকে একটি বিচিত্র জগৎ যেখানে প্রত্যেকে অপরের কাশির বিশেষত্ব জানে, জানে তাদের পছন্দ-অপছন্দ, অভ্যাস, জাগরণের সময় আর দুঃস্বপ্নগুলোকে।

চার বন্ধুর ওপরই বিছানায় বিশ্রাম নেবার নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু চার জনেই ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কিভাবে কাটাবেন। হাসপাতালের পরিচারকদের মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে একটা গুপ্ত যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন তাঁরা। সেই পথ দিয়ে আসতে লাগলো নিষিদ্ধ পানীয়, খাদ্য এবং যা কিছু তাঁদের ইচ্ছা হতো। দিন ও রাত্রির স্বাভাবিক সীমারেখা মুছে দিলেন তাঁরা। অন্য কটেজগুলোতে আলোগুলো যখন মিট্ মিট্ করতো চারবন্ধু তখন বাথরুমে গাদাগাদি করে সারারাত ধরে রাশিয়ান ব্যাঙ্ক (জুয়া) খেলতেন। বাথরুমে একমাত্র জানালায় ঝোলানো থাকতো একটা রাত্রিবাস যাতে বাইরে আলো না যায়। চার বন্ধুই গান ভালোবাসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গ্রামোফোনে ঘুরে ফিরে বেজে চলতো তাঁদের প্রিয় গানটি—লোনসাম্ রোড। একটি 'গুপ্ত রান্নাঘরে' তৈরী হতো পছন্দ মাফিক খাবার যা দেখলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চোখ নির্ঘাৎ কপালে উঠতো। কখনো কখনো বাইরের বন্ধুদেরও আমন্ত্রণ করা হতো এই "আনন্দসভায়"। যে রাতটি সম্পূর্ণ জাগরণের মধ্য দিয়ে কাটতো, তার পরের দিনটি পুরো ঘুমিয়ে 'পুষিয়ে নিতেন' তাঁরা। আর এছাড়া, অফুরন্ত আলোচনা হতো জীবন, যক্ষা ও বিভিন্ন বই নিয়ে।

তাঁদের এই সময়কার মানসিক ভাবটিকে বেথুন প্রকাশ করলেন কয়েকটি ছবির ভেতর দিয়ে। ছবিগুলি আঁকলেন দেয়ালের গায়ে। ছবিগুলির নাম দিলেন: একটি যক্ষ্মার অগ্রগতি—এক অংক ও নয়টি যন্ত্রণাময় দৃশ্যের একটি নাটক। সংকেতের সাহায্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর জীবনকে তুলে ধরলেন বেথুন এই চিত্র-নাটকের মধ্যে।

ডাঃ নরমান বেথুন/সভেরো

স্পষ্ট রঙ ও শক্তিশালী রেখার টানে চারজনের অকাল মৃত্যুর ভবিষ্যৎ-বাণীকে ফুটিয়ে আঁকা হলো ছবিটি। প্রত্যেকটি ছবির তলায় বেথুন লিখলেন একটি একটি করে ব্যঙ্গ কবিতা।

বসন্ত এলো, তার সাথে এলো ফ্রান্সেসের লেখা একটি চিঠি। ডিভোর্স ঠিক হয়ে গেছে, তিনি ফিরে যাচ্ছেন এডিনবরা।

বেথুন পড়লেন চিঠিটা। তারপর সেটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটলেন পাহাড়ের ওপর দিয়ে। অতীতের হাজারো স্মৃতি ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে তাঁকে। দাঁতে যখন ফিরলেন তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। বন্ধুরা উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছেন তাঁর ফেরার। ঘরে ঢুকেই জিগ্যেস করলেন বেথুন "পানীয় কিছু আছে?"

বিছানায় বসলেন বেথুন। নিজের সমস্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। অন্যরা তাঁর বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে বিনা প্রশ্নে শুনতে লাগলেন বন্ধুর কথা।

বাইরে বরফ পড়ছে। সাদা ফুলকিগুলো আছড়ে পড়ছে জানালার গায়ে। মনে হচ্ছে যেন রাত্রিটা প্রাণহীন, মড়ার মতো সাদা। একটা পর একটা সিগারেট খেয়ে চললেন বেথুন। এক গ্লাস শেষ করে আর এক গ্লাস মদ ভরে নিয়ে বলে চললেন নিজের জীবনের ইতিহাস। দৈত্যের হাতের মতো বাতাস নাড়া দিচ্ছে কটেজটাকে।

থেমে গেলেন বেথুন। শুয়ে পড়লেন বিছানায়। চিঠি পাওয়ার পর এই উত্তেজনার প্রকাশ তাঁকে একটা নতুন কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে: ট্রুডোতে তিনি এসেছেন ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে আসলে কিন্তু বাঁচার অদম্য ইচ্ছা তাঁর মধ্যে নির্বাপিত হয়নি।

"গোল্লায় যাক সব"—বেথুন বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ফুসফুসে দুষ্ট ক্ষত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। শিগ্রীই সব যন্ত্রণার, সব প্রশ্নের সমাপ্তি হবে।

"এসো আর এক গ্লাস পান করা যাক" বন্ধুদের বললেন বেথুন। উচ্ছল মদীরা বুদবুদের হাসিতে ফেটে পড়লো গ্লাসে।

গ্রামাফোনের ডিস্ক-এ রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন বেথুন...দি লোন্‌সাম রোড।

(ক্রমশঃ

রিপোর্ট

# সরকারী ভূমি-সংস্কার ঃ কথায় ও কাজে

—জনৈক পর্যবেক্ষক

●[ ভারতের মূল অর্থনৈতিক কাঠামোটি কৃষিভিত্তিক। তাই ভারতীয় সমাজ পরিবর্তনের ধারায় ভূমিসম্পর্কের প্রশ্নটি একটি অন্যতম মুখ্য প্রশ্ন। বস্তুত: ব্রিটিশ রাজত্বের কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত জাতীয় ইতিহাসের প্রধান চালিকা শক্তিটি হলো কৃষক আন্দোলন অর্থাৎ ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তনের আন্দোলন। জমিতে যারা শ্রম ঢালে সেই কৃষকশ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা না আসা পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। আইনগত পরিধীর মধ্যে এর সমাধানের পথ নেই বলেই বিভিন্ন সময়ে সরকারী উদ্যোগে 'ভূমি-সংস্কারের' নামে একধরনের 'নাটক' অভিনীত হয়ে থাকে যার আসল উদ্দেশ্যটি হলো এই শ্রম ও মালিকানার মৌলিক প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাওয়া এক একটি পুরাতন ব্যাধির স্থায়ী নিরাময়ের পরিবর্তে 'সাময়িক স্বস্তি'র ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই ভূমি-সংস্কার কার্যক্রম যে কতখানি অন্তঃসার শূন্য এবং অবাস্তব তা' সব থেকে বেশী সুন্দর-ভাবে বেরিয়ে আসে বিভিন্ন 'সেমিনার' ও বিতর্ক সভাগুলি থেকে যেখানে সরকারী প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক নেতারা অংশ নিয়ে থাকেন। কোন প্রশ্নকে একটি অবাস্তব কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সেই কাঠামোর মধ্যে তার সমাধান খুঁজলে সেটি কতখানি যে হাস্যকর হয়ে পড়ে তার প্রমান, এই জাতীয় একটি সেমিনারের বাস্তব বিবরণ— নীচের লেখাটিতে পাঠক-পাঠিকেরা খুঁজে পাবেন। —স: ম: বী: ]●

এ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে পাটনায় পূর্বাঞ্চলের সরকারী অফিসারদের একটা বড় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনের বিচার্য বিষয় ছিল : ভূমি সংস্কার আইন কি করে কাজে লাগানো যায়। সম্মেলনে সরকারী অফিসাররা ছাড়াও আর দুই ধরনের লোক আমন্ত্রিত ছিলেন—ভারতের কিছু গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবী এবং কিছু রাজনৈতিক নেতা যেমন তিনজন ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী, কংগ্রেসরে শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ, সি. পি. আই এর শ্রীইন্দ্রদীপ সিংহ এবং মার্কসবাদী পার্টি'র শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার। সম্মেলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমোহিত সেন এবং শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও ছিলেন। ছিলেন কিছু প্রফেসর—নির্মল চন্দ্র, রঞ্জিত কুমার সাউ, প্রণব বর্ধন, হনুমন্ত রাও, প্রধান হরিশংকর প্রসাদ এবং সচ্চিদানন্দ। অফিসারদের মধ্যে ছিলেন ভারতের পূর্বাঞ্চলের অনেক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার এবং ভূমি-সংস্কার ও পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সম্পর্কিত অনেক অফিসার। এই রকম বিভিন্ন ধরনের লোকের উপস্থিতির ফলে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটিকে আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে এবং এর থেকে এর অন্তর্বিরোধগুলিও স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে।

তিন দিনের এই সেমিনার ১৫ই ফেব্রুয়ারীতে উদ্ঘাটন করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রধান বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়। প্রথম দিনের বিষয় ছিল "ল্যাণ্ড রেকর্ড", বা ভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র তৈরী করা। কেন্দ্রীয় ভূমিরাজস্ব বিষয়ের কমিশনার শ্রীরামানুজম দেশে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের প্রচলিত পদ্ধতির কথা বললেন। কিন্তু এর বক্তব্যের মধ্যে জমিতে যারা কাজ করে তাদের কথা কমই ছিল। এর পর তিনি ভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন। বলেন যে জমি সংক্রান্ত ঝগড়া-বিবাদে সরকারী অফিসার এবং ন্যায়ালয় দুপক্ষেরই এ জাতীয় দলিলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে 'ল্যাণ্ড রেকর্ডে'র' অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

এর এর শ্রীমোহিত সেন যোগ করেন যে ল্যাণ্ড রেকর্ড যে কেবল খারাপ অবস্থায় আছে তা নয়, বরং বলা উচিত বড়-

**লোকদের সুবিধা অনুসারে এগুলো তৈরী করা হয়েছে।** এজন্য প্রথম থেকেই এ জাতীয় দলিলপত্রের উপর সন্দেহ পোষণ করা অসমীচিন হবে না। অতএব একটি নতুন রেকর্ড তৈরী করতে হবে। এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং কলেজ ( যেখানে আই, এ, এস, অফিসার-দের ট্রেনিং দেওয়া হয় )-এর ডাইরেক্টর শ্রীসাঠেও একজন সৎ অফিসারের মত এই একই দাবি করেন। কিন্তু এর জন্য অর্থ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? একজন বলেন যে সম্ভবতঃ এইবারের পরিকল্পনায় এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। কিন্তু আরেকজন উচ্চপদস্থ অফিসার শ্রীআপপু প্রশ্ন ওঠান: এর আগেও বহু অর্থব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সরকার সঠিক রেকর্ডের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেননি। এবারেও কি ঠিক একই ব্যাপার হবে না?

এক সময়ে যিনি বিহারের ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন সেই শ্রীইন্দ্রদীপ সিংহ এই প্রশ্নটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি দুটো ঘটনা উল্লেখ করেন। একজন জমিদারের কথা তিনি বলেন যিনি সার্ভের সময় কোন কোন জমি তাঁর, তা দেখাতে অসমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও সে সব জমি তাঁর নামেই রেজিস্টার্ড হয়। অন্য একটি ঘটনা ১৯৬৪-৬৫তে সহরসা জেলায় হয়েছিল। যখন কিছু অফিসার উদ্যোগী হয়ে সত্যি সত্যিই কিছু 'ল্যাণ্ড রেকর্ড' জোগাড় করেছিলেন, তখন এর ফলে যে সব জমিদাররা মুস্কিলে পড়েন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন, এবং মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের মুখ চেয়ে এই কাজ বন্ধ করার জন্য টেলিগ্রাম করেন। এরপর রাজ্যের মন্ত্রীসভা লিখিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেন, **যে অফিসার ল্যাণ্ড রেকর্ড জোগাড় করবে তাকে সাজা দেওয়া হবে।**

তাই, ইন্দ্রদীপবাবু, এবং আরো অনেকে, বারবার এই কথাটির উপর গুরুত্ব দেন যে জনতাকে এর জন্য সংগঠিত করতে হবে, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। রাজনীতিবিদদের এই ভূমিকা পালনের ফলে জনতাই যখন উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জমির জন্য দাবি জানাবে তখনই ল্যাণ্ড রেকর্ড তৈরী করা সম্ভব হবে। তাঁরা বলেন যে সচেতন জনতা এবং ইমানদার অফিসার একজোটে ভূমি সংস্কার করতে পারে এবং করবে।

এর পর প্রশ্ন উঠল, এর জন্য জনতাকে কি ভাবে সচেতন করা যায়। ইন্দ্রদীপ বাবু প্রস্তাব দেন, সব এলাকায় গরীবদের জন্য এক একটি কমিটি বসানো হোক, যাতে খালি গরীব লোকেরাই থাকবে। আর তা' যদি না হয় তবে সরকার নিজের তরফ থেকে কিছু রাজনৈতিক দলের সদস্যকে মনোনীত করে একটি কমিটি বানাক। আসাম রাজ্যের একজন অফিসার, শ্রী পালিত খবর দেন যে সেখানে সরকার নাকি কৃষকদের ট্রেড ইউনিয়ন বানাচ্ছেন।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, যে সরকার একটি শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করছে সে এইরকম সংগঠন কেন বানাবে? কিন্তু সি, পি, আইয়ের নেতারা—ইন্দ্রদীপবাবু, মোহিতবাবু এঁরা এই প্রশ্নটিকে অন্য এক দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁরা বলেন যে রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীতে যদি সত্যিই ভূমি সংস্কার করতে ইচ্ছুক কেউ থাকেন তবে তিনি তা করবেন। মোহিত বাবু বললেন, তাঁরা কেরলে যা করেছেন তা হচ্ছে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনতাকে সংগঠিত করা। সরকারী অফিসার যদি এরকম সচেতন জনতার সাথে সহযোগীতা করে তবে ভূমি সংস্কার সম্ভব হবেই। কেমন ধরণের সহযোগীতা? মোহিত বাবু এর উত্তরে বলেন: **যখন জনতা জমির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করে তখন আকছার সরকার শান্তিভঙ্গের ভয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে দেন, যার ফলে জমির লড়াই বেআইনী হয়ে যায়।** তাই জনতার সাথে সহযোগীতা করার জন্য সৎ অফিসারের উচিত ১৪৪ ধারা জারী না করা।

মোহিত বাবুর এই সিদ্ধান্ত, যার ভিত্তি হলো এই যে অফিসারদের কোনও শ্রেণী চরিত্র নেই, খোদ অফিসাররাই এর ধাপ্পাবাজী ধরিয়ে দেন। উপস্থিত এক উচ্চপদস্থ অফিসার বলেন যে সব অফিসার ত' 'ইমানদার' হনই না, বরং খুব কমসংখ্যক অফিসারই আছেন যাঁরা 'ইমানদার'। তাহলে কি করা উচিত? শ্রী আপপু এ প্রশ্নের জবাবও এক সৎ অফিসারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেন: এ কাজের জন্য বাছা বাছা সৎ অফিসারের উপর ভরসা রাখা হোক।

কিন্তু এই বাছাবাছির কাজটা কে করবে? শ্রী আপপু কি জানেন না যে শাসক শ্রেণীর স্বার্থের হানি যখন হয় তখন সরকার বহু অফিসারকেই বদলী ইত্যাদির দ্বারা সরিয়ে দেন? সম্ভবতঃ শ্রী আপপুও মোহিত বাবুর মতই চিন্তা করেন যে মন্ত্রীসভা কোন সঠিক রাজনৈতিক দলের হাতে গেলে তাঁরা 'ইমানদার' অফিসারদের উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করবেন। এইভাবে অন্য আরেকটা প্রস্তাব—অফিসারদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করা, ( যা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং শ্রী পালিত করেছিলেন ) এরও ব্যাখ্যা এই রকম করা হয় যে ভোটে কোন সঠিক রাজনৈতিক দল জিতে এলে এই সব ভাল ভাল কাজগুলি করা সম্ভব হবে।

এইভাবে প্রথম অধিবেশনে যা মোটামুটি বেরিয়ে এল তা হচ্ছে **ভূমি সংস্কারের কাজে প্রশাসন দপ্তর জনতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।** হ্যাঁ, জনতা যদি ইচ্ছা করে তবে প্রশাসন দপ্তরের সাহায্য নিতে পারে। সব থেকে ভাল প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত এই হয়ে দাঁড়ায় যে ভোটে যদি একটি সঠিক রাজনৈতিক দল জিতে আসে এবং সে দল যদি 'ইমানদার' অফিসারদের এই কাজে নেয়

তবেই সমস্যাটির সমাধান সম্ভব হবে। তাই সেমিনারের তৃতীয় এবং শেষ দিনে যখন শ্রী হরেকৃষ্ণ কোনার পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীত্বের কালে এরকম পদ্ধতির একটা উদাহরণ পেশ করেন তখন ওনাদেরই প্রশাসন বিভাগীয় ভূমি সংস্কারের 'চ্যাম্পিয়ন' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আমরা এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

ল্যাণ্ড রেকর্ড সংক্রান্ত অধিবেশনের সময় কেউ কেউ সাবধান করে দিচ্ছিলেন—"আমাদের খালি রেকর্ডেরই দরকার নেই, আমাদের ভূমি-সংস্কারও করতে হবে—এটা ভোলা চলবে না"। পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে, যখন বর্গাদারীর সিলিং ( ceiling ) আইনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয় তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এর মধ্যে "ভোলা না ভোলার" প্রশ্ন নেই। একবার ল্যাণ্ড রেকর্ড নেওয়ার চেষ্টাই জমির জন্য সংগ্রাম শুরু করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, আর ভূমি সংস্কার কার্যক্রমও এর সাথে সাথেই শুরু হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বিহারের এক কমিশনার কিছু তথ্য পেশ করেন। **১৯৫২ তে তাঁরা কোন এক এলাকায় বর্গাদারদের, পুরোপুরি না পারলেও প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ লোকের সঠিক ল্যাণ্ড রেকর্ড তৈরী করেছিলেন। পরে তাঁরা জানতে পারেন যে কোন না কোন কারণ দেখিয়ে কোর্ট এর অধিকাংশই খারিজ করে দিয়েছে।** উনি আরও বলেন, অনেক জায়গায় খোদ বর্গাদার চাষীই নাম লেখাতে আপত্তি করে; বলে, **"সরকার, আজ তো নাম লিখিয়ে নিচ্ছি, কাল কি আপনি আমায় বাঁচাবেন।"**

শ্রীরণজিত গুপ্ত কথাটাকে লুফে নেন; টিপপ্নী করেন যে "আইন-গত অধিকার যতদিন না থাকে ততদিনই এদের জমির উপরে স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কিছু গ্যারাণ্টি থাকে।" কেননা যখন সরকার এঁদের "রক্ষা" করার প্রয়াস নেন, এঁদের অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করেন তখন, দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে সব অধিকার থেকেই এঁরা বঞ্চিত হয়ে গেছেন। যেমন, উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, সরকার যখন বর্গাদারী আইনের উপর জোর দেয় তখন জমির মালিকেরা তাদের জমি থেকে বর্গাদারদের সরিয়ে দেয়, বিশেষতঃ সে সব জমি থেকে যা তারা বহুদিন ধরে চাষ করতো। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়*, যিনি পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট শাসনের সময় ভূমি সংস্কারের সম্বন্ধে প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন, তিনি একথার পর বলেন যে সরকার স্বয়ং কিছুই করতে পারেন না যদি জনতা নিজের অধিকার বুঝে নিতে নিজেই অগ্রসর না হয়। **বর্গাদার চাষীদের সামনে একটাই রাস্তা খোলা আছে। তা হলো জমিদারের ষড়যন্ত্র এবং বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আজ প্রয়োজন একটি "লড়াকু সংগঠন যা শুধু আত্মরক্ষা করতেই সমর্থ নয়, প্রয়োজন হলে হামলা করতেও সক্ষম।"** বুঝুন! এ কথা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর মুখ থেকে না বেরিয়ে আর কারো মুখ থেকে যদি বেরুতো তবে এর পরে কি 'শান্তিভঙ্গের' দোহাই দেয়া কি সরকারের পক্ষে খুব অসুবিধে হতো? কিন্তু এর থেকেও আশ্চর্যের কথা শুনুন। **গান্ধিজীর শিষ্য কংগ্রেসী মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ এর পর জানতে চান জনতার লড়াকু স্বভাবকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রশাসন বিভাগ কি ব্যবস্থা নিতে পারেন?**

এইভাবে ধীরে ধীরে অধিবেশনের চেহারা বদলে যায়। প্রফেসর প্রধান সরকারী কর্মচারীদের নৈতিক স্তর উঁচু করা প্রয়োজন ইত্যাদি প্রস্তাবের পর সোজাসুজি বলেন, "ভীখ মাঁগনেসে নীহ মিলতা হায়। হক্ ভাগদসে মিলতা হায়।" ভূদান, গ্রামদান ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠলে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ অত্যন্ত শান্ত ভাবে বলেন যে তাঁরা ত' জমি বিলি করেছিলেন। লোকেরা যদি তা না রাখতে পারে তবে, তাঁরা কি করবেন? তৃতীয় দিন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী-সভার ভূমি-সংস্কার কার্যক্রম সম্বন্ধে মোটামুটি একই কথা বলেন—**আমরা ত' দিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা রাখতে পারল না ত' কি করা যাবে।** যাহোক 'শান্তির দূত' জয়প্রকাশজীও এইভাবে মেনে নেন যে জমি রাখবার জন্য 'তাগদের' প্রয়োজন হয়।

এই রকম অবস্থায় যখন এই আলোচনা আরম্ভ হল যে ভূমি-সংস্কার করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে কি কি সংস্কার করা প্রয়োজন তখন এত সব দায়িত্বপূর্ণ অফিসার, রাজনীতিবিদ্ আর প্রফেসররা উপস্থিত থাকতেও কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব নেওয়া সম্ভব হল না। সকলেই বুঝে গেছেন যে কিছুই করার নেই। একজন অফিসার, শ্রীআর, পি, সিন্‌হা বলেন যে কিছুই করা সম্ভব নয় কারণ অফিসারদের সংখ্যা খুবই কম, তাঁদের সময় খুবই কম, জনতা তাঁদের বিশ্বাস করে না, এবং সবচেয়ে বড় কথা যে তাঁদেরও এ কাজ করার ইচ্ছা নেই। এরপর একদম হল্লা শুরু হয়ে যায়। শ্রীসিন্‌হা গলায় আওয়াজ উঠিয়ে বলেন: **কোনও রাস্তা নেই।** প্রো. রণজীত সাউ প্রশ্ন ওঠান ভূমি-সংস্কার কে চায়—সরকার না সাধারণ অফিসার? যা হোক, মুখরক্ষা করার জন্য কিছু কিছু প্রস্তাব নেওয়া হয়। যেমন প্রশাসনের উন্নতি করা, জনতাকে সঙ্গে নেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই বুঝে নেন দেশের আসল পরিস্থিতিটি কি?

শেষ দিন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোনার তাঁর লম্বা ভাষণে সুন্দর ভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার কার্যকালে ভূমি সংস্কার কার্য্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কি করে মন্ত্রীসভা গঠনের পর তাঁরা পুরানো রেকর্ড থেকে সরকারী জমির হিসাব বার করেছিলেন যার প্রতি কংগ্রেস সরকার কখনও নজরই দেয়নি। এর পর তাঁরা আইনী পদ্ধতিতে না গিয়ে সোজা কৃষকদের বলেন জমির উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করতে, আর অফিসারদের বলেন পুলিস পদ্ধতিতে তাদের বাধা না

* বীক্ষণ, তৃতীয় সংখ্যায় ইন্দ্র লোহারের উচ্ছেদের তথ্য যিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

দিতে। কোনার বলেন, "পুলিস অফিসার খুব বুদ্ধিমান হয়। তারা জানে কি ভাবে হাইকোর্টের অর্ডার মানতে হয় এবং কিভাবে না মানতে হয়।" কোনার সাহেবের হিসাব মত তাঁর মন্ত্রীত্বের কালে কৃষকদের কম করেও চার লাখ একর জমি মিলেছে।

উচ্চপদস্থ অফিসার, কংগ্রেসী রাজ্য মন্ত্রী, সর্বোদয়ী নেতা—সকলেই শ্রীকোনারকে অনেক সাধুবাদ দেন। সকলেই বলেন যে এই হ[illegible] একমাত্র রাস্তা। মাঝখানে কেবল দু-একজন, যেমন প্রফেসর অমিয় বাগচী, প্রশ্ন করেছিলেন যে **পরে ঐ জমির কি হল?** তা' যখন রাস্তা পাওয়া গেছে তখন আর এ জাতীয় ছোট প্রশ্নের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনই কেউ বোধ করেন নি! শ্রীকোনারের পরে যখন প্রফেসর নির্মল চন্দ্র বলেন যে পৃথিবীতে প্রশাসনীয় ভূমি সংস্কারের কোনও উদাহরণ নেই তখন খুব সম্ভবতঃ সবাই ভেবেছিলেন যে এবার একটা উদাহরণ স্থাপিত হল।

খানাপিনার পর তিন দিনের সেমিনার শেষ হল। কিছু কিছু প্রশাসকীয় প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল। শ্রীকোনার সি,পি,আই (এম্)-এর 'বদনাম' ধুয়ে দিলেন।" স্রেফ একটাই প্রশ্ন রয়ে গেল। কি করে না জানি এই সব দায়িত্বশীল লোকেদের সেমিনারে কিছু 'উচ্ছৃঙ্খল' যুবক ঢুকে গিয়েছিল! তারা শ্রীকোনারকে জিজ্ঞাসা করে: **আপনার ভূমি সংস্কারের পদ্ধতি আর সি, পি, আই এবং কংগ্রেসের ভূমি সংস্কারের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কি? মার্কসবাদী শ্রীকোনারের দৃষ্টিভঙ্গী কি করে অমার্কসবাদী কংগ্রেসের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য হয়ে গেল? শ্রীকোনার কি জবাব দেবেন যে যেখানে কৃষক জমি পেয়েও হারাতে বাধ্য হয়েছে সেখানে এ জাতীয় ভূমি সংস্কারের ফলে তাদের কি লাভ হবে?** কিন্তু জবাব মেলেনি।

মনে রাখতে হবে, এই সেমিনারের অংশ গ্রহণকারীরা, আই, এ, এস এবং অন্যান্য অফিসার, প্রফেসররা, রাজনীতিবিদ্‌রা প্রায় সকলেই ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উজ্জ্বল রত্ন' ছিলেন। কিন্তু কি কারণে এত 'সুশিক্ষিত' এবং 'সুপণ্ডিত' ব্যক্তিদের সেমিনারও এরকমভাবে ব্যর্থ এবং এ জাতীয় বৃথা কচকচানীতে ভরে উঠতে পারে? পারে; যখন বুদ্ধি এবং বিচারকে কোনও স্বার্থের সাথে রফা করতে হয়। এবং এ সেমিনারে এটাই হয়েছিল।

সেমিনারে প্রথমেই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে যায়—**তা হল কৃষকের নিজের সংগঠন না থাকলে ভূমি সংস্কার করা সম্ভব নয়।** কিন্তু এদের কে সংগঠিত করবে—অফিসার না সরকারের দ্বারা মনোনীত লোক? স্বার্থান্বেষীদের সাথে রফা করে যাঁরা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায় তারা এর মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে ব্যস্ত। কিন্তু ইতিহাস বলে এই দুই শ্রেণীর কেউই এ কাজ করতে পারে না—যারা পারে তারা হচ্ছে অন্য এক শ্রেণী, মজদুর। অথচ সেমিনারে অত্যন্ত সাবধানে এই ঐতিহাসিক সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ তা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে যায়।

শ্রীমোহিত সেন খুব পাণ্ডিত্য দেখিয়ে বলেছিলেন চীনের সমালোচনা করার সাথে সাথে তার কাছ থেকে আমাদের শেখাও প্রয়োজন। তিনি বলেন যে গরীব চাষীদের সংগঠিত করার জন্য আমাদের 'তিক্ততা ছড়াও অভিযান' চালানো প্রয়োজন—গ্রামে গ্রামে চাষীদের সভা করে তাদের নিজেদের দুর্দশার কথা আলোচনা করানো প্রয়োজন, যে রকম চীনে হয়েছিল। শ্রীসেন নিশ্চয়ই জানতেন যে চীনে এই প্রচার শ্রেণী ঘৃণা তীব্র করার জন্য করা হয়েছিল এবং এ থেকেই শ্রেণী সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ সেমিনারে শ্রেণী সংঘর্ষের মত ঐতিহাসিক সত্যকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এ সব অফিসাররা পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে ল্যাণ্ড রেকর্ড তৈরী করার প্রচেষ্টার সাথে সাথেই লড়াই বেধে যায় এবং ভূমি সংস্কার হবে কি না তা নির্ভর করে, এই লড়াইয়ে কে জিতবে তার উপর। শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব যাঁদের উপর তাঁদের কাছে এই অলিখিত নির্দেশটি অস্পষ্ট নেই যে এ লড়াইয়ে ভূস্বামীদের পক্ষ নিতে হবে। এই স্পষ্ট কথাটা স্বীকার করা সম্ভব ছিল না বলে তাঁরা অজস্র কথা বলেছেন এই প্রশ্নটাকে ঘুলিয়ে দিতে এবং তিনদিনের সেমিনার—একটি প্রহসন অভিনীত হওয়া ছাড়া এবং আর কিছুই হয়নি।

---

* রচনাটিতে ব্যবহৃত বড় হরফ আমার—লেখক

**জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা**

# সাওঁতাল বিদ্রোহ ঃ

## মহা বিদ্রোহের অগ্রদূত

নীলাদ্রি ঘোষ

'সাওঁতাল' বলতে সাধারণের মনের মধ্যে যে ধারণাটি ফুটে ওঠে তা' হলো একটা পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা। বলা ভাল, 'ভদ্রবাবু'দের কাগজপত্রে এদেরকে এই ভাবেই দেখিয়ে আসা হয়েছে। আর, বাংলা সাহিত্যের যারা রথী-মহারথী সেই ভাববাদী দর্শনের ফেরিওয়ালা কবি, সাহিত্যিকদের রচনা পড়ে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়—সাওঁতাল মানেই কেবল মাদল, যৌথনৃত্য আর মহুয়া !

অথচ সাওঁতাল সম্প্রদায়ের এক দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের ইতিহাস হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত সশস্ত্র সংঘর্ষের ইতিহাস, লুণ্ঠিত জমির উপর পুণরাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস। ব্রিটিশ-ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে তারা যে সংগ্রামের মশাল জ্বালিয়ে তুলেছিল তা আজও নির্বাপিত হয়নি।

শোষন-জর্জরিত এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়েছে, শহীদ হয়েছেন হাজারো বীর সাওঁতাল। তাদের এই সমস্ত বিক্ষোভগুলির মধ্যে ১৮৫৫-৫৭ সালের সাওঁতাল বিদ্রোহ ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিগ্‌চিহ্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে অপরাজেয় নয়, তার শাসন ব্যবস্থা যে উল্টে দেওয়া যেতে পারে, তার শোষণের যাবতীয় হাতিয়ার যে ধ্বংস করে ফেলা যেতে পারে—সাওঁতাল বিদ্রোহ ভারতের জনগণকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

আমাদের ভদ্রবাবুদের সাহিত্য যাদেরকে "আদিম", "বন্য", "হিংস্র" হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত সেই সম্প্রদায় একশো বছরেরও আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শৃংখলিত নিপীড়িত ভারতের সামনে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল শিক্ষা ও প্রেরণা তুলে ধরেছিল। যুগ যুগ ধরে সাওঁতাল বিদ্রোহ অত্যাচারিতদের কাছে বিদ্রোহের প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে।

সাওঁতালদের পূর্ব ইতিহাস যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ও বিহারে তারা আসতে আরম্ভ করে ১৭৯০ সাল থেকে। স্থানীয় জমিদাররা বাংলার পশ্চিমাঞ্চল ও বিহারের দক্ষিণাংশে জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদী জমি তৈরী করবার জন্য এদেরকে ব্যবহার করে দিন-মজুর হিসাবে। সেই থেকে এরা ছড়িয়ে পড়ে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পাকুড়, দুমকা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম, মেদিনীপুর, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে।

ভাগলপুরের যে অঞ্চলে এরা সর্বাধিক বসতি স্থাপন করে তার নাম দেয় এরা – দামিন-ই-কো। পরবর্তীকালে এই 'দামিন-ই-কো' সাওঁতাল পরগণা নামে পরিচিতি লাভ করে। দামিন-ই-কো'র বন কেটে বসত স্থাপন করল সাওঁতালরা। এক কালের বিপদ সংকুল জঙ্গল হয়ে উঠল আবাদ ভূমি এবং ঠিক তখনই এসে হাজির হ'ল বাঙালী, ভাটিয়া ভোজপুরী এবং অন্যান্য পশ্চিম দেশীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দল। আর ইংরেজ সরকার খাজনা আদায়ের জন্য দামিন-ই-কো'র বিভিন্ন অঞ্চল ভাগ করে দিল দুধর্ষ জমিদারদের মধ্যে।

সাওঁতালদের সরলতা ও অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে মহাজন ও ব্যবসায়ীরা প্রায় নামমাত্র মূল্যে তাদের যাবতীয় শস্য কিনে নিত আর এর বদলে তারা পেত লবন ও অন্যান্য জিনিষ। অসম লেনদেনের ফলে তারা খুব শীঘ্রই তাদের সমস্ত জমি ও ধন-সম্পত্তি হারিয়ে মহাজনদের কেনা গোলাম হয়ে পড়ল। এরপর জমিদারদের অসহনীয় নিপীড়নের শিকার হবার ফলে তাদের জীবন হয়ে উঠল দুর্বিসহ। নিজ ভূমিতে তারা হয়ে পড়ল পরবাসী এবং প্রায় ভূমিদাসের মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হল তারা। জমিদার, মহাজন, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং গ্রামীন বাবুদের হাজারো রকম অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে লড়বার মত কোন রকম আইনগত রাস্তাই তাদের খোলা ছিল না। কারন ব্রিটিশের কোর্ট-কাছারিতে তারা সৎ-বিচার তো পেতই না উপরন্তু কোর্টের আমলা, পিয়ন ইত্যাদি বিভিন্নভাবে তাদেরকে শোষণ করত। তাছাড়া সে অবধি যাওয়ার ক্ষমতাই অধিকাংশের ছিল না।

সাওঁতালদের দুর্দশা দিনেরপর দিন বেড়েই চলল। মহাজনদের শোষন ছিল সীমাহীন, জমিদারদের ক্ষুধা ছিল অবাধ আর ব্রিটিশের কাঁচা মালের [ এই অঞ্চল থেকে প্রধানতঃ সরষে রপ্তানি করা হ'ত ] যোগানদার ব্যবসায়ীদের চতুরতার কাছে সরল সাওঁতালরা ছিল অসহায়। জমিদারদের অত্যাচার কি নির্মম আকার ধারণ করেছিল তার লিখিত বিস্তারিত বিবরণ খুব একটা নেই, কিন্তু যেটুকু আছে সেটাই এত ভয়াবহ যে সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চমকে উঠবেন—

"জমিদার, আরও যথাযথ ভাবে বলিলে গোমস্তা, সরবরাহিবৃন্দ, পিওন ও মহাজন প্রভৃতি জমিদারী কর্মচারীবৃন্দ, পুলিশ, রাজস্ব

আদায়কারী ( নায়েব-সাযোয়াল ) এবং আদালতের আমলা কর্মচারী-গণ সকলে একত্রে 'মলিয়া সাওতালদের ওপর একটা ভয়ংকর শোষণ, বলপূর্বক সম্পত্তি হস্তগত করা, সাওতালদের অপমানিত করা এবং প্রহার ও অন্যান্য প্রকার উৎপীড়নের জাল বিস্তার করিয়াছে। ঋণের সুদ শতকরা পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে। হাটে-বাজারে সাওঁতালদের ঠকাইবার জন্য ভুয়া দাঁড়ি পাল্লার ব্যবহার করা হয়। সাওঁতালদের জমির শস্য নষ্ট করিবার জন্য জমিদার ও মহাজনগণ গরুর পাল, গাধা ও ঘোড়া এমনকি হাতি পর্যন্ত বলপূর্ব্বক শস্য ক্ষেত্রে নামাইয়া দেয়। এইরূপ আইন বিরুদ্ধ ও অপরাধজনক কার্যাবলী সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি যে কোন ব্যক্তি শান্তিরক্ষার জন্য সাওঁতালদের 'মুচ লেখা' লিখাইয়া লইয়া যায়, ঋনের শর্ত হিসাবে দাসত্বের 'বণ্ড' লিখাইয়া লওয়া—উৎপীড়নের আর একটি রূপ।" অত্যাচার যেখানে আছে, প্রতিরোধ সেখানে অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজ, জমিদার ও মহাজনদের সীমাহীন অত্যাচার এবং অবাধ লুণ্ঠন সাওঁতালদের বাধ্য করল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। তাদের বাঁচবার পথ হিসাবে অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করাই ছিল একমাত্র রাস্তা। সাওঁতাল কৃষিমজুর এবং দরিদ্র চাষী স্বাধীনতার জমি ও ধান্যের জন্য এবং অমানুষিক উৎপীড়ন ও ভূমি দাসত্বের অবসানের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরল।

এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল এক ব্যাপক গণভিত্তি। সাওঁতাল জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণে তার সাক্ষ্য মেলে। সাওঁতালদের সঙ্গে যোগ দেয় স্থানীয় নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় যারা ঠিক একইভাবে শোষিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

বিদ্রোহ ধূমায়িত হতে থাকে ১৮৫৪ সাল থেকেই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। প্রথম দিকে কোন সুশৃংখল নেতৃত্বের অধীনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এই বিদ্রোহ শুরু হয়নি। বীর সিং মাঝি নামে জনৈক সাওঁতাল মহাজনদের অত্যাচারের বদলা নেওয়ার জন্য একটি দল গড়ে তোলেন। বীর সিং মাঝি এবং গোক্কো সাওঁতালের নেতৃত্বে জমিদার-মহাজনদের উপর কিছু বিক্ষিপ্ত আকারের আক্রমনের মধ্য দিয়ে সাওঁতাল বিদ্রোহের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয় জমিদার-মহাজন এবং দিঘি থানার দারোগা মহেশ দত্ত সমবেত ভাবে বীর সিং মাঝি এবং গোক্কোকে কারারুদ্ধ করে নির্মম অত্যাচার চালায়। এই ঘটনা সমস্ত সাওঁতাল অঞ্চলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এর ফলে সমগ্র সাওঁতাল অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক অভ্যুত্থান ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। বিদ্রোহ জন্ম দেয় নতুন মানুষের। নেতৃত্ব বিদ্রোহ পরিচালনা করে, আবার বিদ্রোহের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে নতুন নেতৃত্ব। দামিন-ই-কো'র ধূমায়িত বিদ্রোহ থেকে জন্ম নিলেন সংগ্রামী ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ সাওঁতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক নায়ক সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব।

এঁরা চার ভাই। এঁদের জন্মস্থান—সাওঁতাল পরগণার ভাগনা ডিহি। এঁরা সমস্ত সাওঁতাল সমাজকে শোষন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্য আহ্বান জানালেন। বিদ্রোহের প্রতি আস্থা জাগিয়ে তুলবার জন্য এঁরা ধর্মকে ব্যবহার করলেন। ইংরেজ, জমিদার এবং মহাজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সংগত, এবং এটা ধর্মীয় নির্দেশ ও দেবতার ইচ্ছা—এই কথা তাঁরা প্রচার শুরু করলেন। এই প্রচারে হাজার হাজার সাওঁতাল দ্রুত সংঘবদ্ধ হতে শুরু করল নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য।

বিদ্রোহের সম্ভাবনা কিছুটা আঁচ করতে পেরে ইংরেজরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুজব ছড়াতে লাগলো যে পরেশনাথ পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী মরগো রাজা স্বাধীন সাওঁতাল রাজ্যের জন্য বিদ্রোহের আয়োজন করছেন। অন্য একটা গুজব ছড়ানো হলো এই রকম—সিন্ধু প্রদেশের প্রাক্তন আমীর মীর আব্বাস আলি হাজারিবাগে শিকারের অছিলায় এসে অভ্যুত্থানের আয়োজন করছেন। কিন্তু ব্রিটিশের এই সমস্ত প্রচারের সঙ্গে বাস্তবতার আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। সমস্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে চার ভাইয়ের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে সাওঁতাল সম্প্রদায় দ্রুত সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন ভাগনাডিহিতে চারশত গ্রামের প্রতিনিধি হিসাবে দশ হাজার সাওঁতাল সমবেত হয়। এই সমাবেশে আলোচিত হয় সাওঁতালদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কাহিনী আর এর প্রতিকার হিসাবে ঘোষিত হয় ব্রিটিশ, জমিদার, মহাজন এবং যাবতীয় উৎপীড়ক-দের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন দামিন-ই-কো'র প্রতিষ্ঠার শপথ।

এই সমাবেশের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইংরেজ সরকার এবং তার সমস্ত অধীনস্থ সংস্থার কর্মকর্তাদের বিদ্রোহীরা চরমপত্র দান করে। এরপর তারা ভাগনাডিহির কাছে পাঁচকেতিয়া বাজারে স্থানীয় দেবীর পূজা দেয় এবং তাদের অভিযান শুরু করে। এই বাজারে তারা পাঁচজন মহাজনকে খতম করে এবং দিঘী থানার কুখ্যাত দারোগাকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার দ্বারা সংঘটিত ভয়াবহ অত্যাচার গুলির প্রতিশোধ নেয়। ৪ঠা জুলাই বিদ্রোহের এই খবর ভাগলপুরে এসে পৌঁছায়। প্রথমে এটিকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু বোরিও থানাদারকে হত্যার খবর এসে পৌঁছাতেই হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়। কমিশনারের নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ মেজর বারোজ ১৬০ জন সিপাই নিয়ে রাজমহলের দিকে যাত্রা করল কিন্তু কোলগঙ পৌঁছাবার পর সে আর এগোতে সাহস করলো না।

১৩ই জুলাই বিদ্রোহীরা রেলরক্ষীবাহিনীর ৭-৮ জনের একটি দলকে পরাজিত করে এবং তাদের জনা তিনেক গুরুতর আহত হয়। ফলে ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার পর বিদ্রোহীরা ঘোষণা করে—কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং স্বাধীন সাওঁতাল রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে।

এরপর ১৬ই জুলাইতে মেজর বারোজের বাহিনীর সাথে বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বারোজ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং সার্জেন্ট ব্রাডোন, কিছু দেশীয় অফিসার এবং ২৫ জন সিপাহী মৃত্যুবরণ করে। এই বিজয়ের পর বিদ্রোহীদের মনোবল প্রচণ্ড বেড়ে যায় এবং শোষক-উৎপীড়কদের শিবিরে দেখা দেয় ব্যাপক হতাশা।

বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহীদের কার্য-কলাপ দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং সাওঁতালদের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ গণ বিদ্রোহের চেহারা নেয়। ভাগলপুরের কমিশনার অবশেষে সামরিক আইন জারী করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। বিদ্রোহের নেতাদের মাথার উপর 'পুরস্কার' ঘোষনা করা হয়। বিদ্রোহের প্রধান নেতার জন্য ১০,০০০, প্রতি দেওয়ানের জন্য ৫,০০০ এবং পরগণার নীচের সারির নেতাদের জন্য ১,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষনা করেও ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। তারা বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যাপক আয়োজন করতে লাগল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহ সাওঁতাল অধ্যুষিত সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। গোকো মাঝির নেতৃত্বে লক্ষ্মীপুর, হিরাপুর বাজার, মানসিংপুর এবং সংগ্রামপুরে মহাজন ও সরকারী আমলাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলে। এরপর সিধু, কানু, ভৈরব ও চাঁদের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের একটি বিরাট দল পাকুর জমিদারবাড়ী আক্রমণ করে। কিন্তু পাকুরের জমিদার ক্ষেমসুন্দরী অবস্থা বেগতিক দেখে আগেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। এরপর বিদ্রোহীরা মহেশপুরের রাজবাড়ীতে আক্রমণ চালায় এবং ব্রিটিশ বাহিনীর সংগে বহুস্থানেই খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই সমস্ত যুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারী বাহিনী পরাজিত হয়।

বিদ্রোহ বীরভূমেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ২০শে জুলাই বীরভূমের তালডাঙা থেকে ভাগলপুরের জি.টি. রোড এবং রাজমহলের গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কাযতঃ এই অঞ্চল জুড়ে কোম্পানীর প্রশাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়।

অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ইংরেজ সরকার ব্যাপক অত্যাচারের পরিকল্পনা করে। লাকবার্গ, বারোজ, এবং সমস্ত সাওঁতাল অধ্যুষিত এলাকায় হত্যার তাণ্ডবলীলা চালায়। তারা গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দেয়। শিশু এবং স্ত্রীদের নির্বিচারে হত্যা করে। গ্রামের বাড়িঘর মাটিতে মিশিয়ে দেবার জন্য তারা হাতি ব্যবহার করে এবং মুর্শিদাবাদের নবাব প্রচুর হাতি দিয়ে ব্রিটিশদের এই ধ্বংসলীলা চালাতে সাহায্য করে। স্থানীয় জমিদার ও নীলকর তাদের পুরানো আস্থা ফিরে পাবার জন্য অর্থ ও পাইক-বরকন্দাজ দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্য করে। সামরিক আইনের অজুহাতে ব্রিটিশ বাহিনী যে বীভৎস অত্যাচার চালায় তার নাম 'গণহত্যা'। বিদ্রোহীদের শতকরা পঞ্চাশ জনকেই তারা হত্যা করে। ইতিমধ্যে সরকার থেকে আত্মসমর্পনের জন্য আহ্বান হতে থাকে কিন্তু বিদ্রোহীরা ঘৃনাভরে এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা জঙ্গলে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ চালিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীকে নাজেহাল করে তোলেন।

কিন্তু ১৮৫৫ সালের আগষ্ট থেকেই বিদ্রোহ কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে এবং ১৮৫৬ সালের গোড়া অবধি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু জায়গায় বিদ্রোহ হতে থাকে। বিদ্রোহীরা জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। পরপর কতকগুলি পরাজয়ের ফলে বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙে যায়। বিদ্রোহের প্রধান নেতা সিধু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ধরা পড়েন এবং ইংরেজদের গুলিতে প্রাণ হারান। এর আগেই চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপুরের কাছে এক যুদ্ধে প্রাণ হারান। আর ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে পুলিশের গুলিতে কানুর মৃত্যু হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর যোদ্ধা সিধু, কানু ও চাঁদ ও ভৈরবের মৃত্যুর সংগে সংগে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান এবং ভারতের জনগনের এক গৌরবময় সংগ্রামের অবসান হয়। সাওঁতাল বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দামিন-ই-কো এলাকা নিয়ে সাওঁতাল পরগণা গঠন করে এবং প্রশাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তোলে এবং সাময়িক ভাবে খ্রীষ্টান মিশনারী ব্যতীত অন্যদের সাওঁতাল পরগণায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। সরকার সাওঁতালদের 'উপজাতি' হিসাবে ঘোষণা করে তাদের 'তুষ্ট' করে রাখবার চেষ্টা করে। কিন্তু মহাজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল মাত্র তিন বৎসরের জন্য আর ব্রিটিশের হরেক রকম খাজনা বিন্দুমাত্র কমেনি বরং বেড়েই গিয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যত গুলি বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে সাওঁতাল বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সাধারণ দেশী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে ছিল "বুনো", "অসভ্য", "জংলী" সাওঁতাল সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে সাওঁতাল বিদ্রোহই হচ্ছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত।

কিন্তু স্বাধীনতা, জমি ও অন্যান্য যে সমস্ত দাবির জন্য সাওঁতালরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল সেগুলি আজও পূরণ হয়নি। স্বাধীনতা ও জমির দাবি কেবল সাওঁতাল কৃষকেরই দাবি নয়, সমগ্র ভারতের নিপীড়িত কৃষকদের দাবি। সাওঁতাল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা আজও চলছে।

# "এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়....."

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজগুলিতে কিছু বাৎসরিক অনুষ্ঠান প্রথাগতভাবে আয়োজিত হয়ে থাকে, যেমন সরস্বতী পূজো (এমন কি বিজ্ঞানের পড়ুয়ারাও যাঁর দাক্ষিণ্য কামনায় 'উপবাস শুদ্ধ' হয়ে কৃত-অঞ্জলী 'বর' প্রার্থনা করে থাকেন ; অতি-প্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব এবং সাফল্য-অসাফল্য যে সেই শক্তিরই মর্জি মাফিক নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে—এই প্রাচীন কুসংস্কারটিকে শিক্ষা নিকেতনগুলিতে এখনো সযত্নে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে), ভাড়াটে শিল্পীদের দিয়ে জলসা (যাকে কলেজ সোস্যাল বলা হয়ে থাকে), স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন (অর্থাৎ আমরা যে 'স্বাধীন', এ কথাটি বৎসরে একবার মনে করিয়ে দেবার আয়োজন), স্পোর্টস (নিয়মিত চর্চায় উৎসাহ দান নয়, আনুষ্ঠানিক নিয়ম রক্ষা) এবং ছাত্র-শিক্ষকদের সাংস্কৃতিক উদ্যমের 'নমুনা' হিসেবে বৎসরে একটি পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি। বৃহৎ সামাজিক পটভূমিকায় শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার না করে শিক্ষাকে যে দেশে একটি গতানুগতিক অনুষ্ঠানের অর্থে নেওয়া হয়ে থাকে (এর জন্য কার্যকরী অসদ উদ্দেশ্যটি অবশ্য শুধুমাত্র অনবধান নয়, আরো ব্যাপক এবং গভীর) সেখানে এর চাইতে বেশী আর কি আশা করা যেতে পারে ? কিন্তু এই নৈরাজ্যের মধ্যে সংখ্যায় নগণ্য হলেও দু-একটি সৎপ্রচেষ্টার সঙ্গে যখন আকস্মিক সাক্ষাৎকার ঘটে তখন সমাজের পশ্চাৎমুখী শক্তির তীব্র স্রোতের বিরুদ্ধে যে শক্তিটি আপাতঃ দুর্বল হলেও মরণপণ যুঝছে এক-পা, এক-পা করে এগুচ্ছে—সেটি যে ঐতিহাসিক সম্ভাবনার দিক থেকে কত বলিষ্ঠ এবং নিশ্চিৎ তা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। সম্প্রতি এই রকমই একটি ঋজু এবং প্রত্যয়-দৃঢ় প্রচেষ্টার সাথে আমাদের পরিচয় হলো—'পল্লব', মুদিয়ালী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকা (১৯৭৩)। অবাস্তব, অলীক, নকল, দায়-সারা ও অসম্ভব গল্প-কবিতা ভরা স্কুল/কলেজ পত্রিকা দেখতে অভ্যস্ত চোখে 'পল্লব' সত্যিই একটি বিস্ময়। "পল্লব এই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বাজারে ছাত্রদের মুখে ভেজাল 'সন্দেশ' তুলে দিতে চায় না বা 'শুকতারায়' নিয়ে যাবার অবাস্তব মিথ্যে প্রলোভনের প্রচেষ্টাও 'পল্লবে'র লক্ষ্য নয়। 'পল্লব' এক সাধারণ বিদ্যালয়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামেরই মুখপত্র—যে কাগজে সকল শ্রেণীর ছাত্র তার নিজস্ব মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে"— সম্পাদকীয় এই বিবৃতিটি শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নয়, 'পল্লবের' প্রতিটি পাতায় এটি প্রতিফলিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে প্রতিটি লেখায়। না বলে পারছিনা, আরো একটি নতুন খবর (!) জানতে পারলাম আমরা সম্পাদকীয় থেকে—পত্রিকাটির জন্য 'ম্যাগাজিন ফি' বলে ছাত্রদের কিছু দিতে হয় না ; বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এর প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করে থাকেন।

আমাদের মতো দেশে একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার সন্দেহ নেই।

'পল্লবে' প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ সুলিখিত হলেও বিশেষ করে যেগুলি মনে দাগ কাটে সেগুলি হলো : প্রধান শিক্ষক, প্রবীর পাল মহাশয়ের লেখা 'শিক্ষায় গণতন্ত্র', 'একটি কাল্পনিক বিতর্ক' (লেখক—একাদশ শ্রেণীর ছাত্র প্রবীর গাঙ্গুলী), 'ভারতীয় মুক্তি যুদ্ধের মহান নায়ক : তিতুমীর' (লেখক—সমীর ঘোষ, একাদশ শ্রেণী), 'হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' (লেখক—বিজন ধাড়া—সহঃ শিক্ষক), 'দ্বি-বচন' (কিশোর ঘোষ, একাদশ শ্রেণী), ও 'বিরশা মুণ্ডা : অজানা নায়ক' (স্বপন দাশ, নবম শ্রেণী)।

'শিক্ষায় গণতন্ত্র' প্রবন্ধে আমাদের দেশের অ-গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপটিকে নিজের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতার আলোতে মনোজ্ঞ ভংগীতে তুলে ধরেছেন লেখক। শুধুমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচার নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের উপযোগী একটি বাস্তবসম্মত গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি ; অবশ্য এই স্বল্প-দৈর্ঘ্যের প্রবন্ধে তা পুরোপুরি সম্ভব নয়। একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতির অভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং যা পরোক্ষভাবে সামাজিক অবক্ষয়ে ইন্ধন যোগাচ্ছে—তার কয়েকটি অভিজ্ঞতালব্ধ উদাহরণ তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। স্কুলে প্রচলিত পাঠ্য-পুস্তকগুলির সমালোচনা করে লেখক আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পেরেছেন যে "আমাদের (প্রচলিত) পাঠ্য-

পুস্তকগুলি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে বানচাল করার একটা হাতিয়ার বিশেষ।" 'পল্লবে'র পরবর্তী সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে একটি পূর্ণতর আলোচনা আমরা লেখকের কাছে দাবি করছি।

'একটি কাল্পনিক বিতর্ক', একটি সুন্দর ও সার্থক রচনা। রম্য-রচনার আঙ্গিকে লেখা এই রচনাটি আমাদের বর্তমান বাস্তব সমাজ জীবনের পটভূমিকায় 'মহাপুরুষদে'র বহু-প্রচারিত 'বাণী'গুলির অসারতা ও অসঙ্গতি নিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। লেখক বয়সে কিশোর হলেও লেখার হাতটি পাকা। তবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিতর্কটি অন্যগুলির তুলনায় যথেষ্ট বলিষ্ঠ নয়। লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তর্ক ঠিক মতো দানা বাঁধতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে প্রথম দিকে যে সুন্দর সচ্ছন্দ ভংগীতে কথোপ-কথনটি শুরু হয়েছিল তা' শেষের দিকে অন্য 'ফর্ম' নিয়েছে। প্রথম ভংগীটি রাখলেই খুব ভালো হতো। অবশ্যই ছোট-খাট এই দু-একটি ত্রুটি সমগ্র লেখাটির উৎকর্ষতার তুলনায় নগণ্য।

'ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের মহান নায়ক : তিতুমীর'—আমাদের অব-হেলিত জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। লেখার ধরণটি খুব সাবলীল, 'পুস্তকী' ইতিহাসের পাল্টা হিসেবে লেখাটি সার্থক।

সহঃ শিক্ষক বিজন ধাড়া মহাশয়ের লেখা 'হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' রচনাটি একজন বিস্মৃত দেশ প্রেমিকের সাথে পরিচিত করে দিয়েছে, যাঁর সম্বন্ধে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই এ যাবৎ স্বল্পবাক।

'দ্বি-বচন', যোগ্যতার প্রচলিত সামাজিক মাপকাঠিকে কশাঘাত করে লেখা একটি ছোট গল্প। একটি কাল্পনিক পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে 'গোপাল ভাটায়ারে' পরিণতী লাভ করে সার্থক হয়ে উঠেছে গল্পটি যেখানে যোগ্যতা বিচারের প্রচলিত মানদণ্ড—'ডিগ্রী' না থাকায় রবীন্দ্রনাথ চাকরি না পেয়ে এই ব্যবস্থাকে 'অশ্লীল' বলে অভিযুক্ত করে ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে যান। 'বিরশা মুণ্ডা' আমাদের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাসের আর একটি অধ্যায়। রচনার ভংগীটি ঝরঝরে, গতিশীল।

উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে এগুলি ছাড়াও সুকান্ত, দু-তন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি রচনা সংযোজিত হয়েছে। লেখাগুলি সুনির্বাচিত।

পত্রিকাটির সামগ্রিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি অভাব চোখে পড়ে। সাহিত্য এবং জাতীয় ইতিহাসের তুলনায় বিজ্ঞানের দিকটি অবহেলিত থেকে গেছে। সমাজ চেতনার স্ফুরন ঘটাতে প্রকৃতি-বিজ্ঞান যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করে তাতে উৎসাহ দেওয়া 'পল্লবের' মতো পত্রিকার একটি অন্যতম কর্মসূচী হওয়া উচিৎ।

ছাত্র-শিক্ষকদের মিলিত সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যমের ফসল, ভ্রাতৃপ্রতিম 'পল্লব'কে আমরা স্বাগত জানাই।

সম্পাদক মণ্ডলী—বীক্ষণ

---

* পত্রিকার নাম—পল্লব/গার্ডেনরীচ মুদিয়ালী হাইস্কুল পত্রিকা ঠিকানা—এন/৯৮, মুদিয়ালী রোড। কলকাতা-২৪

সম্পাদক—শ্রী উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। ছাত্র সম্পাদক—শ্রী সমীর ঘোষ

# শৈশব

ধারাবাহিক উপন্যাস

শঙ্কর বসু

**পূর্বকথা :**

নাবালক শিশু সন্তান দুটো নিয়ে অন্ন কোন মতেই বাঁচার হদিশ খুঁজে পায়না। স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়ে বার চারেক জেল খেটে সন্তুর বাবা ৪৭ এর আগেই মারা গ্যাছে। আর এখন সন্তু আর সরি কে নিয়ে অন্ন নাজেহাল। তদ্বিরের অভাবে সরকারী সাহায্য ( 'নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী' হিসেবে ) ও জোটে নি।

সংসার চলে সাত ধাক্কায়। সরি কাঠের ফুলকি, বিনে পয়সার লাইনের খয়রাতি মিল্কি পাউডার আনে। বনবাদার থেকে কচু ঘেঁচু। আর সন্তু আশপাশের মানুষ জনের ভেতর রনর মা, গলু, গলুর দাদা, ক্যাওড়াপাড়ার ভেতর দুঃখ কষ্ট বড় হচ্ছে। কানাই মাষ্টারের ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে সন্তু। এই কানাই মাষ্টারই রায়টের সময় রসুলকে কেটে ছিল। আর চনুর দাদুর পেয়ারের লোক। বাড়ীওয়ালা চনুর দাদু সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। নিত্য গীতা পড়েন। অথচ আগে নাকি যুদ্ধের বাজারে লোকটা গরীব দুঃখীকে খাওয়াত— কাঙালি ভোজন।

অন্ন শেষকালে একটা প্লাষ্টিক কারখানায় কাজ নিয়েছে। এখন সরির বিয়ের তোড়জোর চলছে। সরির বিয়ে করতে বড় ভয়। কে জানে কেন। আর সন্তু ছাড়াগরুর মতো ক্যাওড়াপাড়ার গলুর সাথে বিনাটিকিটে উধাও হয়ে যায় রেল চড়ে। শেষকালে গলু ধরা পড়ল একদিন। সন্তু ভয়ভয়ে মরে। একবার গলুর ঠাকুরমার কাছে যায়। একবার ওর দাদার কাছে। গলুর দাদা শ্যামের ব্যাঞ্জো কি এক আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয় পাড়াটার বুকে। সেই সুর ছেলেটাকে টানে।

॥ ৫ ॥

পাক্কা দেড়মাস পরে গলু খালাস পেল।

দিন কতক নাওয়া খাওয়া শিকেয় তুলে শ্যাম আঁতিপাতি করে খুঁজেছে। শেষে ক্যাওড়াপট্টীর যা রীতি—আল্লার নামে ছেড়ে দিয়েছিল। জানে বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন ঠিক ফিরবে। আর যদি লাইনে কাটা পড়ে থাকে, তবে তো সব ল্যাঠা চুকেই গ্যালো। বাগ্দী পাড়ায় তো হামেশাই শোনা যায় : অমুকের চ্যাংড়া টাকে পাওয়া যাচ্ছে নি কো। খোঁজ খোঁজ পড়ে যায়। কিন্তু না, দুটো পয়সা কামাতে কাঠগোলা বস্তীর ক্যাবলার সাথে ভোর ভোর গেছিল কোরনে কাজ করতে। তারপর চাবুকের মতো কড়া রোদের কালি, কার বুক কাটা কান্নায় কালশিটে অন্ধকার ধান দুর্ব্বো দিয়ে ডেকে আনে। শেতলা তলায় ডালি চাপায়, মানত করে।

তারপর পোড়া জীবনের নির্মম টানে ধীরে ধীরে সব যখন ভুলে মানুষটার কথা ভুলতে বসেছে। তখন হঠাৎ একমাথা চুল আর খুস্কি নিয়ে ফিরে আসে। ছেলেটা আরও খানিক ঢ্যাঙা হয়েছে তদ্দিনে। ফিরে আসে সর্বাঙ্গে ঘা কোপ নিয়ে। কটা দিন হল্লা করে কাটায়। খেঁদি বোনটার নাকে ফুল বানিয়ে দেয়। ভাই সোহাগী বোঁচানাকী মেয়েটা সারাটা পাড়ায় নাক দেখিয়ে কুল পায় না।

তারপর মাস না পুরতে মেয়েটা ছুপা ছড়িয়ে, পাড়া মাথায় করে কাঁদতে বসে। নাকে টান পড়েছে। ফুলে টান পড়েছে। ছোট্ট এক রত্তি ফুল। কি বাহার তার! ফুলের সাথে মেয়েটার প্রান যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে। তারপর গুণধর ভাই হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। তখন আর খোঁজ পড়ে না, ছেলেটার ভালাই চিন্তা করে কাতর হয়না কেউ। তেলের অভাবে ডিব্‌রির কালো বিষন্ন শিখাটা অমনিই কাঁপতে পায়না। ভুলেও কেউ মহল-লার উদাসীন বিবাগী মানুষটার খোঁজ করে না আর।
যদ্দিন না পুলিশ আসে।

দেড় মাসেই গলুর কথা ভুলতে বসেছিল ক্যাওড়াপট্টি। ভাঁতের মতো শান্ত, কাদা কাদা পাড়াটার এই নিষ্ঠুর চক্রান্তে সন্তু ভেতর ভেতর ফুঁসছিল। ওরা ভেবেছে গলুও অমনি। কোথায় ইলেকট্রিক তার না পেতল চুরি করতে গেছিল কে জানে! আর ভাববে নাইবা কেন কেউ তো আর কিছু জানেনা। ক্ষেমি পিসিও মুখ খোলেনি। মাঝে মধ্যে খটকা লাগলে সন্তুকে ডেকে জিজ্ঞেস করে : হাঁরে সন্তু ঠিক দেখিছিলি তো!
—হুঁ।

—তবে চিন্তে নেই···যেমন তেল হয়েছিল মজুক একটু।

যা হবার তা তো হয়েইছে। এখন ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়। এর আগেও গলু একবার ধরা পড়েছিল। আর দশটা মদ্দোর সাথে চালান গেছিল। কিছুই না, ক্যাওড়াপট্টির পাঁচালী। ছেলে ছেলে করে লেগেছিল, শেষে ঘোঁট পাকিয়ে ঝামেলা। প্রথমে তড়পানি, কোমর ঝাঁকানি, শেষে দাঙ্গা। ক্ষেমি পিসি গালমন্দ করে মাথার

উকুন খসিয়ে ফেলছিল। জঙ্গলের ভেতর পড়ে গলুও চালান গ্যালো। এই তো সেদিনের কথা।

আর এবার গলু ফিরল থুতনির ওপর লম্বা একটা কাটা দাগ নিয়ে। ঝাঁকড়া দিয়ে চুল বেড়েছে। কুচকুচে কালো মুখ খানায় কেমন একটা ছাতা। ক্যাকাসে, ক্যাকাসে।

উঁচু রেললাইন আর সরির রুক্ষু চুলের বেনীর মতো পিচের রাস্তার মাঝখানে ন্যাড়া মাঠটায় কারখানাটা দিব্যি গজিয়ে উঠেছে। হাতীর মতো প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে। অবিকল হাতীর মতো, শেডের পর শেড। কেবল যা ঐ শুঁড়টা লাগানো হয়নি এখনও। মেশিন এলেই চোঙটা বসাবে। গলু ধরা পড়ার বিত্তান্ত বলতে বলতে সন্থকে কারখানাটার দিকে টেনে নিয়ে চলল।

—লপ্‌সী খেতুম বুঝলি·· যা বিচ্ছিরি মুখে ছোঁওয়ানো যায় না।

আর ও কত কথা! সন্থর খেদ আসে। আহা কেন গেলুম না!

সন্ধ্যে বয়ে গ্যাছে কখন। গলুর নাকের সামনে নীল এক ফোঁটা আলো নিয়ে জোনাক পোকা ফুট কাটছিল। হাতের মুঠোয় পোকাটাকে ধরে গলু সেই সামান্য একফোঁটা আলো থেঁৎলে শেষ করল। শেষবার পোকাটা ফুটকাটল। আর সেই মরা আলোর গলুর থুতনির কাটা দাগটা লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গ্যালো।

—ফেলে পালালি কেন সেদিন?

—বাহ্‌রে! কখন!

—ন্যাকা!

—এই গলু!

—দেখাচ্ছি দাঁড়া...।

দঙ্গল বেঁধে, কোদালি চালিয়ে ওয়ারকাররা গর্ত খুঁড়েছিল। গোল একটা খোদল। টানাটানিতে দুজনেই খোদলটার ভেতর মুখ থুবড়ে পড়ল। সাদা ডবল পয়সার মতো গলুর চোখ দুটো চকচক করছে, ক্যাওড়াপট্টীর প্রতিহিংসা নিয়ে। জিলিক দিয়ে উঠছে—শ. শা. লা। সাঁৎসেতে ভিজে মাটিতে শুধা ঠোঁট ঘষটাতে ঘষটাতে সন্থ নেতিয়ে পড়ল।

গলুর চোখের কোনেও ছড়ে গ্যাছে একটু, এখন ওর গলায় অদ্ভুত মায়া: ওঠ্‌।

সন্থ কাহিল, ফিনফিনে ঠোঁটে হিক্কার কাঁপন: ন্...ন না।

থাবলা দিয়ে গলু সন্থর কাঁধ চেপে ধরল: ননীর পুতুল!

জীবনের প্রথম লড়াইর বিচিত্র স্বাদ সন্থর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। লড়বে বলে তো আর লড়েনি। জান বাঁচাতে হাত পা ছুঁড়েছিল। তাতেই শরীরের আড় ভেঙেছে। এখন আর ভয়ডর নেই। কোথায় যেন ছড়ে থেঁৎলে গ্যাছে অন্ধকারে ঠাহর হয় না। গলুর শান্ত অবছা মুখখানা ছাড়া কিছুই ঠাহর হয় না।

কারখানাটার লম্বা টানা শেডের গায়ে, ন্যাড়া মাঠের বিশাল শূন্যতার ভেতর ওদের ছায়ার মতো শরীর। কচি শরীরের ছায়া। দুহাতের চেটো থাবড়ে গলু ধুলো ঝাড়ল। আর আশ্চর্য্য গলুর মুখে দরদের একটা কথা শোনার জন্য, রুক্ষু, কর্কশ, খ্যাসখ্যাসে গলার একটা শব্দের জন্য, আহত শরীরে শীতের আলস্য কামড় খেয়ে মরছে সন্থ। গলু তার ধার কাছ দিয়েও গেল না: শুনেছিস!

—কি?

—সামনের মাসে কারখানা চালু হবে।

—কে বলল!

—কে আবার কানাইদা. ওই তো সব ঢোকাবে. এখন থেকে লিষ্টি বানাচ্ছে...।

—কানাইদার কথা মালিক শুনবে?

—ওকে হাতে না রাখলে লাল বাত্তি জ্বলবে....এবার ভোটেও দাঁড়াবে।

—কানাইদা!

—হ্যাঁ। শালা আমাদের পাড়ার 'উন্নতি' (গলু মুখ ভেংচে উচ্চারন করল)-র জন্যে চেষ্টা করছে।

—ভালই তো, তুই শালা বলছিস কেন?

—হারামী!

কেন?

—তোর সেই টিউকলের কথা মনে নেই?

মনে আছে সন্থর। বোকা হাবা লোকগুলোকে দিয়ে সই দিইয়ে একটা কল বসিয়েছিল, দু দিনের ভেতর কলটা বেকল হল। তিন দিনের দিন উধাউ। তারপর ঐ সরু পিচের রাস্তাটা হল। চন্দুর দাদু তো কানাইদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ: করিৎকর্মা লোক, এবার পাড়াটার হিল্লে হবে। আর বছর না ঘুরতে যখন ট্যাক্স দিতে হল তখন সব জানাজানি হল। কি সব ফন্দী ফিকির করে টাকা মেরেছে কানাইদা। আর সেই বোঝা এখন সকলের পিঠে। ঠাণ্ডা মানুষ গলুর দাদাই ক্ষেপেছিল বেশী। রাতের বেলা চোলাই টেনে নিতাই ক্যাওড়া কানাইদার মা মাসীউদ্ধার করেছিল।

সব জেনে শুনেও কানাইদা পরের দিন সকালেই ক্যাওড়া পাড়ায় গেছিল। ক্ষেমি পিসির জিভ শুকিয়ে কাঠ বিশাল নাকখানা কি যেন শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসছে। আর নিতাই ক্যাওড়ার খ্যাপলা জালের মতোই ছড়ানো সংসারটা আগলে ক্ষেমিপিসি পিরীত করতে লাগল: কানাইবাবু যে।

—হুঁ।

—খপর কি বাবু?

—এলাম এক কাজে

হঠাৎ রসুলের মুখখানা মনে পড়ে যাওয়ায় ফেমি পিসি আঁৎকে উঠেছিল : কি ! ল্যাটা মাছের মতো চোখ দুটো সরসর করতে লাগল : ইস্কুল একটা বানালে কেমন হয় ফেমি। চোখ দুটো খালি পিছলে যায় ক্যাওড়াপট্টির মঙ্গল সাধনের এক সাংঘাতিক ইচ্ছের। কি জন্তে যেন কানাইদা পাড়াটাকে চটাতে চায় না। সেদিন দুপুরেই নিতাইকে ধরে কড়া মিঠে কিসব বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করল।

গোপনে গোপনে কিসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে। চন্দুর দাদুর কাছে সেই ষড়যন্ত্রের গেঁড়ো খুলেছিল কানাইদা : ক্যাওড়াপট্টিকে বিশ্বাস নেই!

চন্দুর দাদুর তেল চকচকে মুখে প্রশান্ত হাসি : পয়সা খরচ করে একটু উপকার কর্তে পারো না .....এই ধরো কাপড় বিলোলে একদিন...।

গদুর চোখ দুটো অন্ধকারে জলছে। রনর ঠাকুমার সাধা জিনিষের জন্ত রন যেমন ক্ষেপে ওঠে। সম্ভাব্য উন্নতির আশঙ্কায় গদুও তেমনি গর্তটার কানা থেকে চাপ্ড়া চাপ্ড়া মাটি ভাঙতে লাগল গোঁয়ারের মতো রাগে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল কারখানার ফাঁকা মাঠের ওপর পা ফেলে দুজন হাঁটতে লাগল।

—কারখানাটা চালু হলে ঢুকে যাবো।

—কেন?

—দাদার কষ্ট হচ্ছে, আর ভালো লাগছে না ফালতু পাখী মেরে ··।

—বাঃ!

—হ্যাঁ।

সদু বাড়ী ফিরে দেখল রুটি বানিয়ে অন্ন বারান্দায় আলগা হয়ে বসেছে। চদু আর সরি অন্নর গা ঘেঁষে বসেছে। অন্ন কটা চোখ জোড়া বড় বড় করে নাটাই মঙ্গলের ব্রত কথা শোনাচ্ছে।" মরা চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে অন্নর বেঁকা থুতনি থেকে : তা...রানীর হইছে কি...কিছুতেই সুখ নাই...সইরে ডাইকা কয়...সইলো আমার কান্দন কান্দন গাও করে কানতে ইচ্ছা করে...।

শেষ কালে, খানিক চুপ থেকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে : সংসারে কর্তব্য পালনই হইল গিয়া সুখ...। উপসংহারটুকু শোনার আর ধৈর্য্য থাকেনা চদুর : পিসি যাই...মা ডাকছে।

(ক্রমশঃ)

# বাস-ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে জনসাধারণ

## —জনৈক বাস-যাত্রীর দিনলিপির কয়েকটি পাতা

সম্প্রতি (১লা ডিসেম্বর, '৭৩ থেকে) ক'লকাতা ও শহরতলীতে ৫ পয়সা করে বাস ভাড়া বৃদ্ধির সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনসাধারণ কি ভাবে দৃপ্ত প্রতিবাদ ও সক্রিয় প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন, নীচের রচনাটি তারই একটি বিশ্বস্ত দলিল। বাস ভাড়া বৃদ্ধির পরের অল্প কয়েকদিন ধরে যাতায়াতের পথে লাভ করা প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে একজন সাধারণ বাসযাত্রী যে ভাবে তাঁর দিনলিপিতে ব্যক্ত করেছেন তাই আমরা এখানে অপরিবর্তিত ভাবে উদ্ধৃত করে দিয়েছি। স্বভাবতঃই এই আন্দোলনের কোন সামগ্রিক সাধারণ চিত্র বা বিশ্লেষণই এই রচনা থেকে পাওয়া যাবে না। বরং চরিত্রের দিক থেকে রচনাটি আন্দোলনের কয়েকটি খণ্ডচিত্রের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু এই আংশিক, অসম্পূর্ণ চিত্র থেকেই আন্দোলনের কয়েকটি শিক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য একান্ত প্রাণবন্তভাবে বেরিয়ে এসেছে : (১) ভাড়া বৃদ্ধির যে অজুহাত সরকার দেখিয়েছেন—অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষতি—তার জন্ত, রাষ্ট্রীয় পরিবহনে ঢালাও দুর্নীতি ও লুট এবং সেই লুটের কারবারের সক্রিয় অংশীদার ও পৃষ্ঠপোষক সরকার নিজেই যে দায়ী একথা অধিকাংশ যাত্রীই বুঝতে পেরেছেন এবং তাঁদের রক্তজল করা অর্থে কর্তাদের লুটের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলতে অস্বীকার করেছেন। (২) সুসংগঠিত কোন নেতৃত্বের অভাব থাকার ফলে যাত্রীরা প্রথম দিকে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করলেও অতিক্রান্ত

তাঁরা বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং সৃজনশীলতার সাথে আন্দোলনের এমন সব কার্যকরী কৌশল বার করেছেন যার সামনে সরকারকে সাময়িকভাবে হলেও হার মানতে হয়েছে। (৩) অধিকাংশ যাত্রীরাই এটা বুঝেছেন যে তাঁদের শত্রু কর্তাব্যক্তি ও তাদের সশস্ত্র প্রহরীরা এবং ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার ইত্যাদি বাসের সাধারণ কর্মচারীরা তাঁদের বন্ধু। (৪) দল-মতের পার্থক্য যৌথ আন্দোলনে অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারে নি। (৫) যৌথ সংগ্রামের স্বার্থে সাময়িক অসুবিধাকে তাঁরা স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছেন। (৬) আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ ও জোরালো চেহারা অল্পসংখ্যক দ্বিধাগ্রস্ত যাত্রীর দ্বিধা কাটিয়ে দিয়েছে। (৭) অবরোধের সময়ে চিকিৎসকের গাড়ী চলতে দিয়ে যাত্রীরা তাঁদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সাময়িক উত্তেজনা থেকে যে তাঁরা আন্দোলনে নামেন নি একথা প্রমান করেছেন।

"জনপ্রিয়" সরকারের বিভিন্ন জন-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলি আমাদের সবারই কাজে লাগাতে পারে এই বিশ্বাস থেকেই রচনাটি আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি।

সবশেষে এ' ধরণের আরও রচনার জন্য আমরা পাঠকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। —সঃ মঃ বীঃ।

(১।১২।৭৩) **শনিবার :**

আলমবাজার থেকে ধরমতলা হয়ে বালিগঞ্জ গন্তব্য স্থান। আজ থেকে ভাড়া বাড়লো—প্রতি টিকিটে ৫ পয়সা সরকারী বেসরকারী ছুটোতেই। 'এল' ৩৪ (L 34) এ উঠলাম। পেছনের কণ্ডাক্টার একটু জোরালো ভাবেই ভাড়া চাইছে। লোকে যেন নতুন টিকিট দেখবার জন্য পয়সা বের করে দিতে লাগলো। আমি ও আমার স্ত্রী (চাকুরীজীবী) বাড়তি ভাড়া দেবোনা ঠিক করলাম। ভয় একটু করছিলো অন্যান্য যাত্রীরা আপত্তি করবে। কণ্ডাক্টার না'ও নিতে চাইতে পারে। কণ্ডাক্টার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা চলে :

—"কোথায় যাবেন ?"

—"ডালহৌসী !"

—"দু'টো টিকিট সত্তর পয়সা। আর দশ পয়সা দিন।"

—"৬০ পয়সার বেশী দেবোনা।"

—"সকলে ত' দিচ্ছে।"

—"সকলে দিলেও আমরা দেবো না !"

কণ্ডাক্টার টিকিট দিলেন ৩০ পয়সার দুটো। কিছু লোক একটু কেমন ভাবে তাকাতে লাগলো। মনে মনে ভাবলাম ; আর কত-কাল এভাবে পড়ে পড়ে মার খাবো। একের পর এক অন্যায় করেই চলেছে। দেখা যাক না ! আজ নয় আমি একা ·····সংখ্যা ত' বাড়তেও পারে।

*       *       *       *

টালা ব্রীজে উঠতে গিয়ে বাস ব্রেক ডাউন হ'লো। লোকের মুখে কথা বেরোতে শুরু করে। দু'জন লোক কণ্ডাক্টারের চামড়া তোলার কথা বলে, আশেপাশের লোক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে :

—"উইথড্র করুন মশাই—কণ্ডাক্টারের উপর বাড়তি ভাড়ার আক্রোশ মেটাবেন নাকি ?

—"বাড়তি ভাড়া নিচ্ছে····· ঠিক মত বাস চালাবে না কেন ?"

—"কণ্ডাক্টার কি করবে ? মামার বাড়ী পেয়েছেন নাকি ?"

কে একজন বলে ওঠে—'আহা চামড়া যদি ওঠাতেই হয় ত' সরকার নয়ত নিদেন পক্ষে সরকারের প্রতিভূ বাসের চামড়া তুলুন !"

—"যা বলেছেন মশাই ! কণ্ডাক্টার কি করবে। ওত আমাদের মতই লোক, আমরা চাকরী করি, ওরাও চাকরী করে।"

ইতিমধ্যেই নানান বাস ধরে লোকে এগোবার চেষ্টা করে। আমিও কোনরকমে একটা ৩০ বি-তে উঠলাম। যাত্রীদের উত্তেজিত কথাবার্তা কানে এল-

—"শালা ! এই দু'দিন আগে 'এল' (L) বানিয়ে ৫ পয়সা মেরেছে। আবার পাঁচ পয়সা !"

—"আমরাই ত' মশাই দোষী। দিচ্ছি তাই নিচ্ছে।"

—"ক'দিন না দিয়ে থাকবেন মশাই······তেল, ডাল, কাপড়, কেরোসিন সবই ত' উঠছে।"

—"আসলে ব্যাপার কি জানেন : আমরা বড্ড ভদ্র হয়ে পড়েছি···   ।"

—"ওটা ভদ্রতা নয় মশাই ! স্বীকার করুন আমরা কাপুরুষ হয়ে গেছি।"

—"Exactly !"

কণ্ডাক্টার টিকিট চাইলে অনেকেই দেখলাম পুরানো ভাড়া দিচ্ছে। কণ্ডাক্টার আমাদের কাপুরুষতার একটা নমুনা রাখে : মাসখানেক

আগের কথা। পাইকপাড়া টার্মিনাস। ডবলডেকার বাসের ওপরে প্যাসেঞ্জাররা তথাকথিত ফার্স্ট ক্লাশ এর ভাড়া দিতে অস্বীকার করায় স্থানীয় বেসরকারী "রক্ষীবাহিনী" পুলিশ ডাকে—পুলিশ অফিসার হাতে রুল নাচাতে নাচাতে কণ্ডাক্টারকে এসে জিজ্ঞাসা করে কে ভাড়া দিচ্ছে না···কণ্ডাক্টার বলে কেউই দেবেন না। অফিসার টিকিট চেক্ করতে শুরু করে—অনেকেই ভাড়া বার করে দেয়। কয়েকটি যুবক ভাড়া দেয়না। অফিসার বলে—সোজা রাস্তা ধরে নেবে যাও··· আর নয়ত ভাড়া কাটো—সমস্ত লোক মাথা নীচু করে থাকে। যুবক কয়টি নেমে যায়। কিন্তু ভাড়া দেয়না··· । তারপরও কি নিজেদের জন্ম বলে পরিচয় দেবেন : ৩০ বি-র কণ্ডাক্টার বলে!

এসপ্লানেডে নেবে গেলাম.....তারপর কিছু কাজ সেরে উঠলাম ৪১/১ নং বাসে। উঠেই শুনলাম একজন বলছে : বাড়তি ভাড়া দেবেন না আপনারা। পুরানো ভাড়া দিন—আপনারা নিজেরাই যদি নিজেদের ব্যাপার না দেখেন তাহলে কে দেখবে! ১৫ পয়সার টিকিট কেটে বালীগঞ্জ এলাম। কণ্ডাক্টার বেশ খানিক দেখলো আমায়, জানি না কেন কিছুই বললো না।

ফেরার পথে দেখলাম লোকজন আরও একটু এগিয়ে গেছে। আমার মত পুরানো ভাড়া দেওয়ার লোকের সংখ্যা একটু বেড়েছে। বাসের সংখ্যা নগণ্য। বহুলোক বাসের আশা ছেড়ে শেয়ালদার দিকে হাঁটছে—আমিও হাঁটতে লাগলাম। সব জায়গায় যেন একটা ছন্দপতন। সবই স্বাভাবিক অথচ কোথায় যেন একটা অস্বাভাবিকতার সুর ...

(২।১২।৭৩) রবিবার :

ছুটী। তবু দুচারটা কথা কানে আসে...লোকের প্রতিক্রিয়া ঠিক বোঝা যাচ্ছে না...

(৩।১২।৭৩) সোমবার :

যথারীতি বাসস্টাণ্ডে এসে দাঁড়াই। সকালে কাগজে পড়েছি......বাড়তি ভাড়া না দিলে বাস থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে...এবং 'Passengers are persuaded to pay new fare' অর্থাৎ কিনা 'যাত্রীদের নতুন ভাড়া দিতে রাজী করানো হচ্ছে'...মনে পড়ে যায় কণ্ডাক্টারের মুখে শোনা ঘটনাটি—'persuade' কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করি।

...অর্ডিনারী ৩৪-এ উঠলাম। আমার সঙ্গে ওঠা একটি মেয়ে অন্য মেয়েদের জিজ্ঞাসা করে কোন ভাড়া দিচ্ছে তারা···উত্তর আসে, 'নতুন ভাড়া দেবেন না।' সাহস পেয়ে আমিও পুরানো ভাড়াই কাটবো ঠিক করি। শনিবার দিন যারা নতুন ভাড়া দিয়েছিল আজ তারা সব পুরানো ভাড়াই দিচ্ছে... ।

"—কি হবে মশাই...দু'দিন বাদে নতুন ভাড়াই দিতে হবে... সবই ত' আমরা দিচ্ছি।"—একজন বলেন। আরেকজন উত্তর দেন, " কিছুই হবে না...তবে হাগল হাড়িকাঠেও মাথাটা নাড়াবার চেষ্টা করে...। প্রতিবাদ জানায়...যতক্ষণ জ্যান্ত থাকে। মরে গেলে আর জানায় না।" লোকটার দিকে চেয়ে লোকটার কথা বোঝার চেষ্টা করি...।

চিড়িয়ামোড় দিয়ে কাশীপুর—সেখান থেকে সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে বাস এগিয়ে চলে, শ্যামবাজার, সার্কুলার রোড অবরোধ, বৌবাজার মোড়ে এসে বাস ডালহৌসীর দিকে এগোয়, রাস্তার দুপাশের লোক-স্রোত যেন অন্যদিনের চেয়ে বেশী।

বাসের মধ্যে কয়েকজন রাস্তার উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে "ও দাদারা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটেন না—তাহলে আমাদের বাসটা থেমে যায়..."

"আরে নামুন না মশাই...সকলে হাঁটছে আর আমরা...।"

বাসটা লালবাজারের আগের একটা গলিতে বাঁক নেয় ; আমাকে ৪১ নং বাস ধরতে হবে তাই ওখানেই নেমে পড়ি।

লোকে লোকারণ্য জায়গাটা...কয়েক পা এগিয়ে সামনে দেখি বেশ কয়েকটা ডবল ডেকার আর একতলা বাস রাস্তার উপর বেখাপ্পা ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখানে ওখানে জটলা—পুলিশ অফিসারদের ঘিরে। কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে যাই। টুকরো টুকরো কথাবার্তা কানে আসে :

"—কি আইন দেখাচ্ছেন মশাই"

"—আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন"

"—রাখুন মশাই আপনার আইন"

"—ভেবেছেন যা ইচ্ছে তাই করে যাবেন আর আমরা মুখ বুজে সহ্য করবো..."

আশেপাশের লোক হাত তুলে চীৎকার করে সমর্থন জানায়...

পুলিশ অফিসার ভীড় কাটাতে চেষ্টা করে...

যাত্রীরা দাবী জানান—ডাকুন মন্ত্রীদের...দেখে যান তাঁরা আমরা কি করতে পারি...

এক পুলিশ অফিসার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা 'এল' ওসি বাস চালাবার জন্য ড্রাইভারকে জোর করে ধরে এনে বাস চালাবার চেষ্টা করলে জনা দশেক লোক বাসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে...

প্রথমে জনাদুয়েক ছেলে ড্রাইভারকে তেড়ে যায়...কিন্তু আশেপাশের লোক ছেলেদের উপরেই তেড়ে যায়...

—"খবরদার! ড্রাইভারকে কিছু বলবেন না...ও'ত আমাদের লোক...ওর কোন দোষ নেই।"

তারা আড়াল করে অত্যন্ত ভদ্রভাবে ড্রাইভারকে নামতে সাহায্য করে...ড্রাইভার নেমে ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়...

লোকের ভীড় বাড়তে থাকে...

হঠাৎ আওয়াজ ওঠে 'বাসের চাকা বন্ধ।'

আরও একজন চীৎকার করে 'বন্ধ'...

বহু লোকেই গলা মেলায় 'বন্ধ'...

লোকের বিক্ষোভ শ্লোগানের রূপ নেয়...হতচকিত অফিসাররা ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে আসে...আওয়াজ থেমে ছড়িয়ে পড়ে...অল্পক্ষণ বাদেই তা আবার একটু দূরে আওয়াজ তোলে, 'বাড়তি ভাড়া দিচ্ছি না দেবো না' আশে পাশে তাকিয়ে কোনো ব্যানার, বা পার্টির ফ্লাগ চোখে পড়ে না...লাল দীঘীর দিকে তাকিয়ে সব ট্রাম থেমে গেছে...লোকেদের আজ যেন অফিস যাবার তাড়া নেই...

রাজপথ ধরে এগোতে থাকি, এসপ্ল্যানেডের দিকে...

রাজপথের মাঝখান দিয়ে লোকে হেঁটে চলেছে...

এখানে ওখানে বাস ( সরকারী ও বেসরকারী ) অদ্ভুতভাবে এঁকে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে—এবং তা অবশ্যই ফাঁকা···

আবার জটলা···

ট্রাফিক পুলিশ ও অফিসার বাস চালাবার চেষ্টা করলে লোকে আওয়াজ তোলে : " 'দশ পয়সার' পুরানো টিকিট না দেখাতে পারলে বাস চালাতে দেবো না ....." এর মধ্যেই দেখি আশে পাশে গলিতেও একই অবস্থা—প্রাইভেট গাড়ীগুলোকে লোকে অনুরোধ করে থামিয়ে দেওয়ায়...জনতার দাবীতে তারা হার মানে...

'আজ কলকাতার রাস্তায় চাকাবাবু ঘুরবে না'

শ্যামবাজারের সামনে থেকে শুরু করে কার্জন পার্ক অবধি একই অবস্থা ..বালীগঞ্জ যেতে হবে তাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই...এসপ্লানেড ট্রাম গুমটিতে এসে দেখি ট্রাম চলছে...কালীঘাট...বালীগঞ্জ ভায়া পার্কসার্কাস...চৌরঙ্গী—বাস ট্রাম কম থাকলেও চলছে আর প্রাইভেট গাড়ী, স্কুটার এসবের ত' কথাই নেই ·····

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট-এ এক জায়গায় দরকারী কাজ সেরে বালীগঞ্জ যাবার জন্য আবার রাস্তায় নামি···

একি ! মনে হলো কে যেন জাদুর কাঠি বুলিয়েছে...সব থেমে গেছে ট্রাম, বাস, প্রাইভেট কার, ট্যাক্সী...মিনিবাস···

'লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ক্রশিং-এর ট্রাফিক পুলিশ বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে আর তার চারপাশে খানতিনেক গাড়ী ·বেটপ ভাবে দাঁড়িয়ে... রাস্তায় অনেক-অনেক লোক·· একটা লোক পাশ দিয়ে গুনগুন করতে করতে বলে...'

"প্রতিবাদে প্রতিরোধে

কলকাতার ঘুম ভেঙেছে রে ভেঙেছে···'

—'দেখছেন কি অবস্থা মশাই !'

...অথচ

"সকালে চালু বাস বিকালে বাতিল, বিক্রি

সকালে চালু দুটি বাসকে বিকালে কনডেমনড করে সঙ্গে সঙ্গে নীলামে বেচে দিয়েছেন কলকাতা রাজ্য পরিবহন করপোরেশন দুটি বাসই কিনেছেন শ্রীঅবতার সিং নামে এক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী।

একতলা ঐ বাস দুটির নম্বর ডবলিউ বি এস ১৯০৬ ও ডবলিউ বি এস ১৯০৩। প্রতিটির দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা। ১৯৬৫ সালের মারচে রাস্তায় নামানো হয়েছিল। দুটি বাস ১২ হাজার টাকা করে বিক্রী করা হয়েছে

খোঁজ নিয়ে জানলাম, কোনও বাস একেবারে চলাচলের অনুপযোগী হলে কনডেমনড করা হয়ে থাকে। এটি ঠিক করার জন্য একটি কমিটিও রয়েছে। তাঁরা খুঁটিনাটি সব কিছু পরীক্ষা করে দেখার পরই গাড়িটি কনডেমনড ঘোষণা করা যাবে কিনা সিদ্ধান্ত নেন। সেই অনুযায়ী যদি কোন বাস কনডেমনড ঘোষণা করা হয় তারপরই বিক্রীর প্রশ্ন ওঠে। যাতে ন্যায্য দাম পাওয়া যায় এজন্য নীলামে বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়।

ঐ দুটি বাসের ব্যাপারে কোন নিয়মই মানা হয় নি। উপর মহলকে খুশী করার জন্যই এটি করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কেননা, দুটি বাসই সকালে যথারীতি তাদের রুটে চলাচল করেছে। বিকালে হঠাৎ জরুরী নির্দেশ দিয়ে বাস দুটি রুট থেকে তুলে নেওয়া হয়, বেলঘরিয়া ডিপোতে পৌছানো মাত্রই নীলামে বিক্রী হয়ে যায়। এত তড়িঘড়ি সবকিছু চুকিয়ে দেওয়া হয় যে, বিভাগীয় কর্মীরা অনেকেই হতবাক। কেননা, বাস দুটি যে অবস্থায় ছিল তাতে স্বচ্ছন্দে আরও তিন চার বছর চালু রাখা যেতো বলে অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। গত মারচে এই ঘটনা ঘটে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা।

২।১১।৭৩

---

অল্প হেসে উত্তর দিই...হ্যাঁ, তাই দেখছি ত'·· প্রশ্ন করি আচ্ছা বালীগঞ্জ যাবো কি ভাবে বলতে পারেন·· লোকটা হো হো করে হেসে ওঠে···

—'পা গাড়ীতে আজ পুরো কলকাতা অচল···" বলতে বলতে আরও দুচারজন লোক সঙ্গ নেয়...

—"এটাই দরকার ছিল"

—"ভেবেছিলো আমরা খালি মুখবুজে সহ্য করে যাবো..."

"সোহনপালের বক্তব্য পড়েছেন—more than 95% have paid new fare ( শতকরা ৯৫ জনের বেশী নতুন ভাড়া দিয়েছেন )।

বাস-ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে জনসাধারণ'তেত্রিশ

যেখে যাক একবার। স্টেশনে খাবার নেই—যা দিচ্ছে, জানোয়ারের খাবার নয়...শীতের বাজারে লোকে সবজী কিনতে পারছে না..."

—"তার উপর আবার বাসের ভাড়া বাড়ানো"।

—"কিন্তু এরকি আর কমবে !"—প্রশ্ন করি।

—"কমবে কি না সেকথা পরে, কিন্তু একথা তো আজ প্রমাণ হলো যে আমরা একজোট্টা হয়ে প্রতিবাদ করতে পারি।"

—"ঠিক বলেছেন দাদা।"

হঠাৎ হল্লা কানে আসে...

লোকে ছুটে যায়...পরক্ষণেই রাস্তা আবার পরিষ্কার হয়ে যায়...

কে যেন চীৎকার করে ওঠে—"ডাক্তার যাচ্ছে, আপনারা আটকাবেন না" গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে স্কুটারে চেপে ডাক্তার চলে যায়... কিন্তু পেছনের আর দুই স্কুটার যাত্রীকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়...।

মেট্রোর সামনে দিয়ে চৌরঙ্গীর মোড়ে গিয়ে দাঁড়াই—যতদূর দৃষ্টি যায় সব অচল...শুধু মানুষের পা ছাড়া। বুঝলাম আজ বালীগঞ্জ যেতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হবে...।

সব লোকেরই মুখে এক কথা...

এই সরকার নিপাত যাক্...

বাড়তি ভাড়া দিচ্ছি না দেবো না...

কলকাতা অচল করেছি—অচল করবো...

পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করি, "কিরকম বুঝছেন দাদা ?"

—"একে বলে বন্ধ্ মশাই।"

—"আমরা সাধারণ মানুষ কলকাতা অচল করে দিয়েছি..." পথচারীদের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে...এ ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে না...নিজেদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতায় খুশী হয়ে উঠেছে।

একজন আরেক জনকে বন্ধুভাবে তার মনের ক্ষোভের কথা জানাচ্ছে, সাহস পাচ্ছে প্রতিবাদ করতে...আমিও অবস্থা বুঝে শিয়ালদায় ট্রেন ধরার জন্য হাঁটতে থাকি...

একা নয়, আরো অনেক অনেক লোক...

হাঁটতে হচ্ছে বলে তারা দুঃখিত নয়...ক্ষুব্ধ নয়...ক্রুদ্ধ নয়...

হাসিমুখে এ ওকে ডেকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলে...

# পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ

## আশ্চর্য জীবনী শক্তি !

● ভারত, নাইজেরিয়া, কলম্বিয়া ইত্যাদি দরিদ্র দেশগুলিতে মাথা পিছু বার্ষিক ভোগ্য-শস্যের পরিমাণ ৪০০ পাউণ্ড। আমেরিকা ও কানাডাতে এর পরিমাণ একটন।

—স্টেটসম্যান, ১৪.১.৭৩

## লোকসান বনাম স্বাস্থ্যবৃদ্ধি

● জন্মের পর থেকে '৭০ সালের ৩১শে মার্চ অবধি হিন্দুস্থান স্টিল লিঃ-এর ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষতির পরিমান ছিল ১৭২ কোটি টাকা যা পরবর্তী ৩ বছরে বাড়তে বাড়তে ২২৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

—স্টেটসম্যান, ৫.৬.৭৩

## ভেজালে সুক্ষ্মতা

● দিল্লীর হেলথ অফিসারদের দ্বারা পরীক্ষিত বেসমের ৪৩টি নমুনার মধ্যে ৩৪টিতে ৫% থেকে ৮% ভাগ খেসারীর ভেজাল থাকতে দেখা গেছে, যা মানুষের শরীরে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে। ভোগ্য বস্তু হিসেবে খেসারীর অনুপযুক্ততা চারটি রাজ্য বাদ দিলে সারা ভারতে ঘোষিত হয়েছে। এই ধরণের ভেজালের উপস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ক্রোমাটোগ্রাফ যন্ত্র যুক্ত পরীক্ষাগার ছাড়া ধরা অসম্ভব।

—স্টেটসম্যান, ১.১.৭৩

## বৈদেশিক সাহায্যে'র প্রকৃতি

● ২৮০ কোটি ডলারের যে 'বৈদেশিক সাহায্যের' বিলটি হাউস অফ রিপ্রেসেন্‌টেটিভ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে তার মধ্যে ৫৫ কোটি ডলার হলো কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্‌স, জর্ডান ও তুরস্ককে দেয়া মার্কিনী সামরিক সহায়তা।

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩.৩.৭৩

## উত্তর পুরুষের ঋণ

● ১৯৭২-৭৩' এর শেষের দিকে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের কাছে ভারতের ঋণ-দায়ের পরিমাণ হলো ৮২৭'০৭ কোটি টাকা। '৭২-৭৩ সালের মধ্যে যে ঋণ শোধ করা হয়েছে তার পরিমাণ ২২'৯৭ কোটি টাকা।

যে পরিমাণ ঋণ-দায় এখনো বর্তমান তা' আশা করা যাচ্ছে ১৯৯৭-৯৮ সাল নাগাদ পুরোপুরি শোধ করা সম্ভব হবে।

—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৮.৮.৭৩

**'ফুটপাথ'—একটি স্বীকৃত বাসস্থান**

● ফুটপাথে যাদের ঘরবাড়ী এমন সব লোকের সংখ্যা সব চাইতে বেশী বোম্বাইয়ে। মোট ৫৯ হাজার।

এর পরেই কলকাতার স্থান। মোট ৪৯ হাজার। তারপর মাদ্রাজ (৯ হাজার) এবং সবার শেষে দিল্লি। মোট ৭ হাজার।

—আনন্দ বাজার, ২ ৮ ৭৩

**পুনঃ কৃত্য......**

● লোকসভায় কেন্দ্রীয় রেল দফতরের উপমন্ত্রী শ্রীমহম্মদ কুরেশী জানান, কলকাতায় পাতাল রেলের জন্য ২৪ থেকে ২৫ কোটি টাকার সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে।

শ্রীকুরেশী লোকসভায় এইচ. এন. মুখোপাধ্যায়কে জানান যে এই আমদানি করা সরঞ্জামের ব্যাপারে সোভিয়েট দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হচ্ছে।

—আনন্দ বাজার, ৮.৮.৭৩

পত্র-পত্রিকার দর্পণে

# বিশ্ববিদ্যালয়—গবেষণাগারগুলিতে দুর্নীতি

—জনক সিং

দিল্লী, ১২ই নভেম্বর :

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ্. ডির জন্য ভর্তি হন, এরকম প্রতি চারজন ছাত্রের মধ্যে অন্ততঃ একজন কাজ শেষ হবার আগেই খসে পড়েন। বাকীরা অনিয়মিতভাবে তাঁদের গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য কাজ করেন এবং সম্পূর্ণ মনযোগও দেননা। মাসিক ৩০০ টাকা বৃত্তি হিসাবে পান বলেই তাঁরা গবেষণার কাজে টিকে থাকেন। বিজ্ঞান এবং কলা-র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাই থিসিস শেষ করতে চার থেকে ছয় বছর অথবা তারও বেশী সময় নেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের চারটি এবং কলা-র দুটি উচ্চতর কেন্দ্র ( Advanced centre ) আছে। প্রতিটি কেন্দ্র নিয়মিত অনুদান ছাড়াও বছরে দুলাখের বেশী টাকা পেয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারগুলি প্রায় প্রতীক্ষালয়ের ( waiting room ) মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন পি. এইচ্. ডি. ছাত্ররা অপেক্ষা করে থাকেন, যতক্ষণ না চাকরীর ট্রেনটি এসে উপস্থিত হচ্ছে বা নির্দিষ্ট সময় সীমার বেশী থাকার জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে তাঁদের বের করে না দেওয়া হচ্ছে।

চারশোরও বেশী ছাত্র গবেষণার জন্য প্রতি বছর ভর্তি হন। ১৯৬৭-৬৮ তে যে ৩৬৪ জন কলা বিভাগে পি. এইচ.ডি-র জন্য ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭৪ জন এযাবৎ সাফল্যের সঙ্গে থিসিস শেষ করেছেন। বাকীরা কাজ ছেড়ে দিয়েছেন অথবা এখনও তাঁদের প্রবন্ধ নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন। বিষয়গত ফলাফল ব্যাপারটা বুঝতে আরও বেশী সাহায্য করবে। অর্থনীতির ৪৭ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৫ জন, অঙ্কের ৭৮ জনের মধ্যে ১৬ জন, সংস্কৃতের ৫৩ জনের মধ্যে ১৫ জন তাঁদের পি. এইচ. ডি লাভ করেছেন,—ইংরাজীর ছয় জনের মধ্যে একজনও নয়।

একজন অধ্যাপক বলেছেন : "মজবুরিকা এক নাম রিসার্চ হ্যায়" ( অসহায়তার আর এক নাম গবেষণা )। যে ডিগ্রীতে আর চাকরীর কোন ভরসা নেই, তার জন্য কেউই গবেষণাগারে পাতন (Distillation) অথবা প্রশমন ( titration ) করতে চান না অথবা পাঠাগারের ধুলো মাখা মোটা মোটা বই ঘেঁটে ঘর্মাক্ত হতে চাননা। আজকাল সবচেয়ে ভাল ছাত্ররা প্রতিযোগীতামূলক কাজে অথবা কোম্পানীর চাকরীতে চলে যান। বাকারী ছাত্রদের অধিকাংশই কলেজগুলিতে চাকরী নেন। আর যাঁরা তখনও বেকার, তাঁরা আর কিছু ভাল না পেয়ে গবেষণা করেন।

বিজ্ঞানে গবেষণারত প্রায় সমস্ত ছাত্র, এবং কলাবিভাগে গবেষণারত ছাত্রদের একটা বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়, UGC, CSIR,

ICSSR অথবা অন্য কোনও সংস্থার দেওয়া বৃত্তি যোগাড় করে নেন। ডিপার্টমেন্টগুলিতে বিদেশী সংস্থার দেওয়া প্রকল্পগুলির জন্য PL-480 ফাণ্ড বা অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া অনুদানগুলির ফলে শিক্ষকরা আরও বেশী বৃত্তি দিতে সক্ষম হন। একটা বৃত্তির মেয়াদ তিন বছর। অধিকাংশ অনুদানকারী সংস্থাই বৃত্তির মেয়াদ একবছরের জন্য বাড়াতে রাজী থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের সর্বত্র অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের ঘরের তাক ও আলমারীতে সাজিয়ে রাখা বছরের পর বছর ধরে ছাত্রদের তৈরী মোটা মোটা থিসিসগুলো দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার একটা জঘন্য দিককে লুকিয়ে রাখে। অনেক বিশেষজ্ঞ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ অনেক শিক্ষকও অকপটে স্বীকার করেন যে অনেক থিসিসেরই প্রচ্ছদের আড়ালে যা থাকে তার দাম—যে কাগজগুলিতে লেখা হয়েছে—তাদের দামের চাইতেও কম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর কেন্দ্রগুলি আত্মনির্ভরতা এবং সামাজিক তাৎপর্য্যপূর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণার কাজ বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক অধ্যাপক অনুভব করেন যে সেই প্রত্যাশা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। একজন অধ্যক্ষ আক্ষেপ করেছেন, "আমরা এমনকি একটাও ওষুধ বার করতে পারিনি বা তথ্য আবিষ্কার করতে পারিনি যা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়েছে।" অভিযোগ এই যে গত দুই দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে ব্যয় করা লাখ লাখ টাকা স্রেফ জলে গেছে।

অনতিকাল আগে, খুব ঘটা করে ঘোষণা করা হয়েছিল যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিজ্ঞানী "পারভোসাইড" নামে এমন একটি ওষুধ বার করেছেন যা হার্টের রোগীদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হবে। জার্মানী এবং অন্যান্য জায়গায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করে দাবিটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। দেখা গেছে, ওষুধটির বিষক্রিয়া অত্যধিক। একই ভাবে, জনৈক প্রাণীতত্ত্ববিদের আবিষ্কৃত প্রজননতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আস্ফালন করা আর একটি দাবি ও নাকচ হয়ে গেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট প্রাণীতত্ত্ববিদটি এখনও দাবি করে যাচ্ছেন যে তাঁর তত্ত্বটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) প্রয়োগ করে দেখছেন।

একজন উঁচুদরের বিজ্ঞানী বলেন, এত বেশী 'সন্দেহজনক' পি. এইচ. ডি. তৈরী হয়েছে যে তার হিসেব রাখা মুস্কিল। কখনো কখনো অনেকগুলো কারণের ফলে, যেমন রিসার্চগাইডের অমনোযোগ, প্রত্যাশিত ফলাফলে পৌঁছানোর অসুবিধা এবং 'যেনতেন প্রকারেণ' একটা পি. এইচ. ডি. বাগাবার উদ্বেগের তাড়নায় ছাত্ররা গোঁজামিল দিয়ে তাঁদের কাজগুলি বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত করে থাকেন। দেশে অথবা বিদেশে কেউ এসব আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলবার আগেই ছাত্রটি তাঁর পি. এইচ. ডি ডিগ্রীটি হাতিয়ে নিয়ে প্রস্থান করেন।

কিন্তু জানা গেছে, 'গোঁজামিল' দিয়ে ফল বার করা, অনেক আগে প্রকাশিত থিসিস থেকে ধার করা চিন্তাধারার ব্যবহার এবং অন্যান্য অনেক দুর্নীতি কলা বিভাগে অনেক বেশী মাত্রায় প্রবল। নিম্নমানের থিসিসের অনুমোদন পাওয়ার একটা সাধারণ পদ্ধতি হল সেটাকে এমন পরীক্ষকদের কাছে পাঠানো যাঁদের সহজেই প্রভাবিত করা যেতে পারে বা যাঁরা পাণ্ডিত্যের জন্য খুব একটা খ্যাত নন। দুর্নীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একজন অধ্যাপক হতাশভাবে মন্তব্য করলেন—"যখন অন্যান্য সমস্ত পরীক্ষায় এটা একটা প্রায় সাধারণ প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন পি. এইচ. ডি. স্তরে দুর্নীতি নিয়ে আপনারা এত উদ্বিগ্ন কেন?"

কিন্তু সরকারী মুখপাত্ররা বলেন—গত দুই দশকে রিসার্চ স্কলারদের তৈরী শত শত প্রবন্ধ ভারতে এবং ভারতের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং পেশাদারী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রসায়ন বিভাগে প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্বের বিভাগগুলি থেকে বেরিয়ে আসা পি. এইচ. ডি-রা দেশের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে একজন প্রধান বলেন "আমাদের গবেষণাগারগুলির কাজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি করা। আত্মনির্ভরতা অথবা সামাজিক তাৎপর্য্যের মাপকাঠিতে এটাকে দেখলে ভুল হবে, যদিও এই হিসাবেও আমরা কিছুটা এগিয়েছি। আমাদের ছাত্রদের প্রকাশিত বহু গবেষণাপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

এটা সন্দেহাতীত যে পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব এবং প্রাণীতত্ত্বের বিভাগগুলি এবং কলা-র বিভিন্ন শাখা থেকে বেরিয়ে আসা পি. এইচ. ডি-দের পাঁচ থেকে দশ শতাংশ তাঁদের প্রকাশিত গবেষণা কর্মের উৎকর্ষের জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পান, কখনো কখনো এইসব ছাত্রদের কাছে তাঁদের ডক্টরেট উপাধির জন্য কাজ শেষ হবার আগেই চাকরীর প্রস্তাব এসে থাকে। কিন্তু বাকীদের ভাগ্যে কি ঘটে? তাঁরা চাকুরি প্রার্থীদের সংখ্যা বাড়ান, এবং সাধারণতঃ এমন চাকরী পান যাতে তাঁদের প্রশিক্ষণ অতি সামান্যই কাজে লাগে।

## নিশ্চিত আয়

ছাত্রদের বৃত্তি হিসেবে পাওনা মাসিক ৩০০ টাকার নিশ্চিত আয় এবং পি. এইচ. ডি পাবার পরও চাকরির অনিশ্চয়তা গবেষণার আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছে। বৃত্তিটা একজনের প্রয়োজন মেটাবোর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। শুধু এই নয় যে এই অঙ্কটা একজন কলেজ

লেকচারের প্রারম্ভিক মাইনে যা ৬৫০ টাকারও বেশী, তার চাইতে কম। এমনিতেই লেকচারার পদের যোগ্য M. A. M. Sc.-ডিগ্রী ধারী গবেষণারত ছাত্ররা সবসময় এইসব চাকরী অথবা অন্য কোন কাজের সন্ধানে থাকেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীধারী লেকচারারদের দু'তিনটে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দিতেন। এখন একজন অধ্যক্ষের উপদেশে এটা বন্ধ করা হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন যে চাকরীর শুরুতে বেতনের সমতা থাকা উচিত এবং কোনও অতিরিক্ত ভাতা বৃদ্ধি পরে হওয়া উচিত। ফলতঃ 'ডিগ্রীর জন্য কাজ করার একটা বড় আকর্ষণ এখন আর থাকছে না। এখন পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর একমাত্র সুবিধা হল এই যে একজন ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সিলেকশন গ্রেড পাবার যোগ্যতা অর্জন করেন। একজন পি. এইচ. ডি. দশ বছর চাকরীর পর অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন। যেখানে পি. এইচ. ডি নন এমন একজন ব্যক্তির লাগে পনের বছর।

এটা পরিষ্কার যে গবেষণারত ছাত্রদের থিসিস শেষ করে তৎক্ষণাৎ বাস্তব কিছু লাভ করার খুব সামান্যই আশা থাকে। যতক্ষণ তাঁরা তাঁদের প্রবন্ধের কাজ করছেন, ততক্ষণ তাঁরা তাঁদের নির্দেশকের (গাইড) হাতের মুঠোয় থাকেন। নির্দেশকের কাছ থেকে একটা প্রগ্রেস্ রিপোর্ট না পেলে বৃত্তি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র ছাত্রের বৃত্তির ক্ষেত্রেই নয়, তাঁদের থিসিস চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও নির্দেশকের একটা সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা রয়েছে এবং নির্দেশকই থিসিস পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞদের মনোনীত করেন।

## দুর্নীতি

গবেষণারত ছাত্রদের উপর নির্দেশকদের 'অবাধ ক্ষমতা' দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে। অনতিকাল আগে দুজন মহিলা অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের নির্দেশক তাঁদের ক্রমাগত অযথা হয়রান করছেন। কিন্তু এটার মানে এই নয় যে, সব নির্দেশকই খারাপ। যাই হোক, কয়েকজন অন্যায়ভাবে তাঁদের পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে থাকেন।

আরও অনেক কারণ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ ব্যাহত করে থাকে। যেমন, জানা গেছে, উচ্চস্তরের গবেষণার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির অনেকগুলি বিকল হয়ে পড়ে আছে। এইসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় অংশ এদেশে পাওয়া যায় না। যে যন্ত্রাংশ "ভারতে তৈরী হয়না" তা আমদানী করার জন্য অনুমতি পত্র, করমুক্তির সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য অনেকরকম কালক্ষেপকারী আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। গবেষণাগারের অনেক যন্ত্রপাতিই সেকেলে।

অনেক সময়ই গবেষণাগারগুলিতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি থাকে না। যেসব রাসায়নিক দ্রব্যাদি বাইরের থেকে আমদানী করতে হয়, সেগুলির অভাবে গবেষণার কাজ অনেক বেশী বিলম্বিত হতে পারে। একজন রসায়নের অধ্যাপক বলছিলেন, স্কটল্যাণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে কাজ করার সময়ে তিনি তিনমাসে তিনটে গবেষণা-পত্র তৈরী করেছিলেন। ভারতে, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি পাওয়ার অসুবিধার কারণে তিন বছরেও তিনটে গবেষণাপত্র তৈরী করার আশা তিনি করতে পারেন না।

তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সমস্যার মোকাবিলার জন্য এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ধারার বিশ্লেষণের জন্য গাণিতিক গণনা গবেষণারই একটা অংগ। আজকাল, এইসব গণনা করা হয় কমপিউটারের সাহায্যে কিছু ছাত্রের অভিযোগ, কমপিউটার কেন্দ্রের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের চাপ থাকার দরুণ তাঁরা তাঁদের কাজ তাড়াতাড়ি করতে পারেন না। আরও অনেকের অভিযোগ যে ছাত্রদের অপেক্ষা করিয়ে বাইরের সংস্থাগুলি কমপিউটারটি ব্যবহার করে থাকে।*

---

* [টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় (১৩-১১-৭৩) প্রকাশিত জনক সিং এর লেখা Marking time in Delhi University Labs প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ। ভাষান্তর—সুশান্ত রায়]।

# বিক্ষুব্ধ শিক্ষা জগৎ

## ছাত্র

**দেশ :**

**মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র শহরে মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রদের** আন্দোলনকে 'প্রশমিত' করার উদ্দেশ্যে পুলিশ ১৭ ঘণ্টার কার্ফু জারী করেছে। গত পয়লা ডিসেম্বর শহরের সমস্ত দোকান ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল, বাস চলেনি। নিকটবর্তী অঞ্চল ঝাবুয়া থেকেও ছাত্রবিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে, সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। দশদিনের জন্য সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২রা ডিসেম্বরও ছাত্র আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ছাত্রদের 'ছত্রভঙ্গ' করার চেষ্টায় পুলিশ কাঁদানে-গ্যাস 'প্রয়োগ' করে। ছাত্ররা প্রতিটি বিষয়ে সম্মিলিত তিন বছরের উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। পাঁচই ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশ সরকার তিন বছরের কোর্স আংশিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়। ইতিমধ্যে **জব্বলপুরে** প্রায় দু হাজারেরও বেশী ছাত্র শহরের রাস্তায় মিছিল বের করেন ও স্লোগান দেন। তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ গড়ে তোলেন ও পুলিশ তা' অপসারণ করার চেষ্টা করলে, সংঘর্ষে নামেন। তাঁদের মূল দাবি শুধুমাত্র দশক্লাশের সিলেবাস চালু রাখতে হবে। **গোয়ালিয়র, ঝাবুয়া, মোরেনা, ইন্দোর, রায়পুর, দান্তিভা** শহরে স্কুল ছাত্রদের আন্দোলন চলতে থাকায় সরকার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেন। তবে সরকার ছাত্রদের দাবি আংশিকভাবে মেনে নিলেও ছাত্ররা আন্দোলন থামাননি। সাতই ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের আরো অনেক জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। **বালাঘাটে** ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও যোগ দেন। তাঁরা যৌথভাবে পুলিশথানার উপর 'আক্রমণ' চালান। **বারহানপুর, দুরগ, কৈাজনর, সেহোর, বারয়ানী, ইটারসী, রায়গড় ও বিলাসপুরে** ছাত্ররা ধর্মঘট করেন ও মিছিল বের করেন। জব্বলপুরে নিষেধাজ্ঞা 'অমান্ত' করার ফলে নয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এগারোই ডিসেম্বর, সরকার ছাত্রদের সব দাবি মেনে নেয়।

● **উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের** একদল ছাত্র গত ২৪শে নভেম্বর ন'ঘণ্টারও বেশী সময় উপাচার্যকে 'ঘেরাও' করে রাখেন। কর্তৃপক্ষ গ্রেস নম্বর দেবার দাবি অগ্রাহ্য করলে, তৃতীয় বর্ষ আইন পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্ররা আন্দোলনে সামিল হন। উপাচার্য ছাত্রদের জানান যে তাঁদের দাবি বোর্ড অব্ স্টাডির সভায় 'সহানুভূতির' সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

পয়লা ডিসেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা সারা প্রদেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের ডাক দেন। সারাদিন ধরে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলে। কয়েকদিন আগে ছাত্রদের উপর পুলিশের বলপ্রয়োগের প্রতিবাদে শহরের সমস্ত দোকান-বাজার বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের সভাপতি শ্রীব্রজেশ কুমার ও অন্যান্য ছাত্রনেতারা এক বিবৃতিতে জানান যে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অংশে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা ছড়িয়ে পড়বেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবহুগুণার সামনে ছাত্রবিক্ষোভের আয়োজন করবেন। তাঁরা অভিযোগ করেন যে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী ছাত্রসংসদের সভাপতিকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। এলাহাবাদের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্র-আন্দোলনের ফলে ঐদিন বন্ধ ছিল।

গত ১৪ই নভেম্বর পুলিশ **কানপুর সরকারী পলিটেকনিকের ছাত্রদের** উপর গুলি চালায়। ৪২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। পঁচিশ তারিখে সরকার বিচারবিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেয়।

● **নয়াদিল্লীর শ্যামলাল কলেজের ছাত্রদের** উপর পুলিশ গুলি ছোড়ে। একুশে নভেম্বরের এই ঘটনায়, কলেজের ছাত্রসংসদের সভাপতি শ্রীনরেশ মেহেতা আহত হন। এর আগে পুলিশ ২৭ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ফাটায়। এর আগের দিন একটি স্থানীয় হিন্দী দৈনিক পত্রিকা'অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর সময়, আটজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরেরদিন সকালে ছাত্রদের এক প্রতিনিধিদল সাহদারা পুলিশ থানায় গিয়ে ধৃত ছাত্রদের মুক্তি চান। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার এব্যাপারে তাদের 'অক্ষমতার' কথা জানালে, প্রায় ১০০০ ছাত্র কলেজ গেটের বাইরে এক পুলিশ দলকে ঘিরে ফেলেন। ছাত্ররা অভিযোগ করেন যে কিছু পুলিশ কলেজের মধ্যে জোর করে

ঢুকে ভাঙচুর করে।' তারা দরজা, জানলার কাচ ও ব্ল্যাকবোর্ড ভেঙে ফেলে ও অধ্যক্ষের ঘরেরও ক্ষতি করে। ফলে কয়েকজন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হন। অধ্যক্ষ এই অভিযোগ সমর্থন করে বলেন যে পুলিশ কলেজ চত্বরে ঢুকে যাকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি স্বচক্ষে দেখেন যে কিছু পুলিশ একটা ক্লাসঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। কয়েক জন অশিক্ষক কর্মচারীকেও মারধোর করা হয়। ঐদিন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অন্তর্ভুক্ত ৪৮ কলেজ দু'দিনের জন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (DUTA) বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন কলেজ বন্ধ করা সামগ্রিক সমস্যা সমাধানের কোনও রাস্তা নয়, এড়ানোর চেষ্টা মাত্র।

● রাজস্থানের বিড়লা ইনস্টিট্যুট অব্ টেক্নোলজী এ্যাণ্ড সায়েন্স অনির্দিষ্টকালের জন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৪ই নভেম্বর লোকসভায় জানানো হয় যে পরেরদিন (১৫ই নভেম্বর) শিক্ষামন্ত্রকের একজন অফিসার, কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে 'আলোচনা' শুরু করানোর উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিভ্রমণ করবেন। উনিশে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে ধর্মঘটী ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে 'চুক্তি' হয়েছে। এর ফলে অনশনরত কয়েকজন ছাত্র তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ছাত্রদের মুখ্য দাবি ছিল—কলেজ পরিচালন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

● মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে ৬৩ জন ছাত্রকে আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে 'অভিযোগ'—তাঁরা নিম্নআয়ভুক্ত পরিবারের সন্তানদের বৃত্তির দাবিতে পিকেটিং করছিলেন। গত ৩০শে নভেম্বর থেকে ছয়দিন ধরে এই আন্দোলন চলেছে। মণিপুর রাইফেলস ও সি, আর, পি; শহরের রাস্তায় টহল দেয়। রাজ্য পরিবহন সংস্থার বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবার ফলে স্কুল পরীক্ষাও স্থগিত হয়ে রয়েছে।

● কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে ৫১ জন ছাত্রকে পুলিশ হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। গত ৪ঠা নভেম্বর ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। সাতই নভেম্বর শ্রীনগরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র অসন্তোষের খবর পাওয়া যায়। পুলিশ বারবার কাঁদানেগ্যাস ছোঁড়ে ও লাঠি চালায়। ছাত্রছাত্রীরা একটি স্থানীয় কলেজের নাম বদলে 'নেহেরু মেমোরিয়াল কলেজ' করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন; তাঁরা নেহেরু-ইন্দিরা বিরোধী স্লোগান দেন। আটই নভেম্বর, ছাত্র অসন্তোষ কাশ্মীরের আরো দু'টো শহর—অনন্তনাগ ও সোপুরে ছড়িয়ে পড়ে। অনন্তনাগে ছাত্ররা নিষেধাজ্ঞা 'অগ্রাহ্য' করে মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ কাঁদানে-গ্যাস চালায়। তাঁরা শ্রীনগরের ছাত্রদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছিলেন। বারবার লাঠিচালনা সত্ত্বেও ছাত্ররা মিছিল বের করেন। বারোই নভেম্বর শ্রীনগরে কলেজ ছাত্ররা গত পাঁচ তারিখে আটক ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে মিছিল বের করেন। পুলিশ আবার কাঁদানেগ্যাস 'প্রয়োগ' করে। চোদ্দ তারিখে অশান্ত ছাত্রজনতাকে 'ছত্রভঙ্গ' করার প্রয়োজনে পুলিশ কাঁদানেগ্যাস ফাটায়। ছাত্ররা নিষেধাজ্ঞা 'অমান্ত' করে নিউ সেকরেটারিয়েট এলাকায় ঢুকতে চেষ্টা করেছিল। সামরিক বাহিনীকে সরকার 'সতর্ক' করে দেয়। উধমপুরে ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করেন।

● গত ২৮শে নভেম্বর তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ শহরে নিষেধাজ্ঞা 'ভঙ্গ' করার ফলে, ৫০০ জন ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। তাঁরা সরকারের পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছিলেন। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে গত বছরের তিরুচিরাপল্লী ও প্রেমামকোট্টাই ঘটনার জন্ত পুলিশকে দায়ী করা হলে, ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বয়কট করেন। ভেল্লোরে প্রায় ২০০০ ছাত্র মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে মিছিলে সামিল হন। আটাশে নভেম্বরের এক ঘটনায় একটা কলেজের কয়েকজন ছাত্র আহত হলে, পরেরদিন ছাত্ররা মিছিল করে উক্ত ঘটনার জন্ত বিচার-বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন। ছাত্ররা অবস্থান ধর্মঘট করার ফলে, অধিকাংশ কলেজে ক্লাশ হয়নি। ছাত্ররা সেক্রেটারিয়াট অভিমুখে অভিযান চালান। ঐ মিছিলে স্কুল ছাত্ররাও যোগ দেন।

● বিহারের পাটনায় গত দশই ডিসেম্বর বিধানসভার সামনে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশ ১৭ রাউণ্ড কাঁদানেগ্যাস ফাটায়। তাঁদের দাবি ছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোকে সমাজ-বিরোধীদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে ও মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো নিজ নিজ কলেজে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সামনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের দাবি সরাসরি প্রত্যাখান করলে 'গণ্ডগোলের' সূত্রপাত হয়। এর আগেই ছাত্ররা ১৪৪ ধারা 'ভেঙে' ছিলেন। পুলিশের অভিযোগ—"ছাত্ররা মুখ্য-মন্ত্রীর উপর পাথর ছুঁড়ছিল।" জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের লাঠি চালনার কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন—"পুলিশ ছাত্র-জনতার পেছনে 'ষ্টীক' (stick) হাতে তাড়া করেছিল, লাঠি হাতে নয়।" ২জন ছাত্রকে আটক করা হয়েছে।

● মহীশূর প্রদেশব্যাপী ছাত্রবিক্ষোভের ফলে মহীশূর মন্ত্রীসভার সব মন্ত্রী পদত্যাগ করেছে। কানাড়ী ভাষা সম্বন্ধে একজন মন্ত্রী বাসব লিঙ্গাপ্পা-র মন্তব্যের বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করেছেন।

● অত্যাবশ্যক জিনিষের আকাশছোঁয়া দামের প্রতিবাদে গত সাতাশে নভেম্বর আসামের করিমগঞ্জের সমস্ত স্কুল-কলেজের প্রায়

৪০০ ছাত্র ক্লাস বর্জন করেন। পরে প্রায় ৩০,০০০ ছাত্র খুলনা

শত পণ্য তাব্য মূল্যের দোকান সরকার কর্তনের দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন।

গত ২৪ শে নভেম্বর নিখিল ত্রিপুরা ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রস্তাবে নেপালী ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দাবি জানান।

● **পশ্চিমবাংলা:** গত ৩১ শে নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্ররা সহকারী পরীক্ষা নিয়ামককে 'ঘেরাও' করেন। তাঁরা গত জুন মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন ঘোষণা করতে বলেন। সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক আশ্বাস দেন যে উনত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে পুরনো ও নতুন সিলেবাসের আইন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।

সরকারী হিন্দি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কতকগুলো দাবির ভিত্তিতে গত পয়লা ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের দাবি স্টাইপেণ্ড প্রদান, বি. এড কোর্সের মার্কশীট সহ ডিগ্রী প্রদান ইত্যাদি। বাইশে ডিসেম্বরের খবর— আন্দোলন চলছে।

গত পঁচিশে নভেম্বর বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা স্তূপীকৃত জঞ্জাল রাস্তায় ছড়িয়ে দেন। নোংরা সরানোর ব্যাপারে পৌর কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে তাঁরা স্লোগান দেন, রাস্তা অবরোধ করেন। পরে পৌরসভা গাড়ী পাঠিয়ে জঞ্জাল সরিয়ে দেয়।

**বিদেশ:**

১৪ই নভেম্বর থেকে চারদিন ধরে হাজার হাজার ছাত্রের বিক্ষোভের পর গ্রীসে সামরিক আইন জারী করা হয়। ছাত্রদের দাবি: প্রেসিডেন্ট পাপাদোপোলাসের সামরিক সমর্থনপুষ্ট সরকারকে গদী ছাড়তে হবে। ষোলই নভেম্বর রাতে এথেন্স-র শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড লড়াই হয়। 'বিদ্রোহ' দমনে সরকার সৈন্য ও ট্যাংক নামিয়েছে। সাঁজোয়া গাড়ি দিয়ে সতেরো তারিখের সকালে পলিটেকনিক স্কুল ঘিরে ফেলা হয়। কয়েকহাজার ছাত্র অবরোধ তৈরী করে অবস্থান করছিলেন। তারপরে ছ'ঘণ্টারও বেশী ধরে তুমুল সংঘর্ষ চলে। শিক্ষাক্ষেত্রে আরো স্বাধীনতা, ছাত্রদের ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের অবসান ইত্যাদি দাবিতে ছাত্ররা পলিটেকনিক দখল করেন। পরেরদিন সেনাবাহিনী পলিটেকনিক স্কুলে ছোট ছোট দলকে 'ছত্রভঙ্গ' করার জন্য মেশিনগান থেকে গুলি ছোঁড়ে। ছাত্র-সমেত প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্যান হেলেনিক মুক্তিসংস্থার ইতালীয় সেল থেকে প্রকাশিত এক ইস্তেহারে জানানো হয় যে এথেন্সে ২০০ জন নিহত ও ২০০-রও বেশী আহত হন। সৈন্যরা মার্কিন সংস্থাগুলোর প্রতি সংগ্রামী সংহতি ঘোষণা করা হয়। আরো বলা হয় যে এই ঘটনার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ পেয়েছে, এবং অন্যদিকে গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত যে কোন মূল্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য গ্রীসের বীর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। একুশে নভেম্বর সামরিক সরকার ২১টি ছাত্রসংস্থাকে 'বেআইনী' ঘোষণা করে ও তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। শত শত ছাত্রকে 'জিজ্ঞাসাবাদের' জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর এথেন্সের এক চলন্ত বাস থেকে ৩০ জন ছাত্রকে আটক করা হয়। তাঁরা সরকারবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিলেন—"স্বাধীনতা চাই", "আমরা অভুক্ত, আমরা তোমাদের খাব"। তাঁরা জিনিষপত্রের আকাশছোঁয়া দামের জন্য সরকারকে ব্যঙ্গ করছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় পুলিশ ৪০০০ ছাত্রীর উপর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। গত আটাশে নভেম্বর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দাবীতে এই ছাত্রীরা সিউল মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে গণ অবস্থান করছিলেন। আন্দোলনের তৃতীয় দিনে (৩০শে নভেম্বর) কয়েকশত ছাত্র নাগরিক অধিকারের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে পুলিশের সঙ্গে 'লড়াই' করেন। দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা মিছিল বের করবার চেষ্টা করলে, পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। দশই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট শ্রীপার্ক-চাঙ-হি ছাত্রদের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেন এবং অক্টোবর মাস থেকে বন্দী সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে মুক্তির আদেশ দেন। এইসব ছাত্ররা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এমন কি প্রেসিডেন্টের বার্তায় আরো জানা যায় যে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের যে শাস্তি দিয়েছেন, তাও যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

● পাকিস্তানের করাচীতে গত ৩০শে নভেম্বর পুলিশের বুলেটে একজন নিহত ও আরো অনেকে আহত হয়েছেন। বাসভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই আন্দোলন গত চারদিন ধরে চলেছে। মোট ৩০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছাত্রদের এই বিক্ষোভের ফলে সিন্ধু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাসভাড়া কমানোর কথা ঘোষণা করে জানান যে সর্বাধিক বাসভাড়া ৭০ পয়সা থেকে কমিয়ে ৫৫ পয়সা করা হয়েছে।

---

[সূত্র: আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড, সত্যযুগ, টাইম্‌স অব্ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও সংবাদ (বাঙলাদেশ)]

* বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলন এবং হাউসস্টাফ-ইন্টার্ণ-ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কিত আলোচনা অন্য জায়গায় দেওয়া হল। স্থানাভাবের দরুণ শিক্ষক ও কর্মচারীদের আন্দোলনের খবরগুলি দেওয়া গেল না।) সং: মু: পীঃ

## ঃ নিয়মাবলী ঃ

- প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 'বীক্ষণ' বেরুবে।
- 'বীক্ষণ'-এর সমস্ত বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ, সুস্থ এবং বলিষ্ঠ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য রচনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।

★ লেখা পাঠানোর সময় লেখক-লেখিকারা, 'বীক্ষণ' প্রধানতঃ যাঁদের জন্য সেই কিশোর-যুব-ছাত্র-সমাজের কথা মনে রেখে লেখা পাঠাবেন বলে আমরা মনে করি।

★ 'বীক্ষণ'-এর পাঠক-পাঠিকারা আশা করি এ' ব্যাপারে একমত হবেন যে শুধু বিষয়বস্তুই নয়, রচনার প্রকাশ-ভঙ্গীও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচ্য। প্রকাশভঙ্গী যত সরল হয় ততই ভালো। কিন্তু সাথে সাথে তাকে প্রাণবন্তও হতে হবে। সরল করতে গিয়ে যেন তা স্লোগানধর্মী হয়ে না পড়ে।

★ 'বীক্ষণ'-এর প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে ও কিশোর-যুব-ছাত্র-সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপারে পরামর্শ, মতামত—এসবের জন্যও আমরা আবেদন রাখছি। এগুলি 'চিঠি-পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হবে।

★ সমস্ত ধরণের রচনাই কাগজের এক পৃষ্ঠায়, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখে পাঠানোর জন্য আমরা অনুরোধ করছি।

★ উপযুক্ত ডাকটিকিট সহকারে পাঠালে অমনোনীত রচনা, অমনোনীত হবার কারণ দেখিয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে।

★ 'বীক্ষণ' সম্পর্কে 'বীক্ষণ'-এর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা—এঁদের মতামতের জন্যও আমরা সাদর-আহ্বান রাখছি।

★ 'আমাদের কথা' বিভাগটি ছাড়া অন্য রচনাগুলিতে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব রচনাকারীদের।

★ যোগাযোগের ঠিকানা :—

"বীক্ষণ কার্যালয়"

৫৯সি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪

সাক্ষাতের দিন ও সময় : রবিবার বাদে যে কোন দিন ;

সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

★ ডাকযোগে টাকা পয়সা পাঠানোর ঠিকানা :

বীক্ষণ ( প্রদীপ মুখার্জী )

৬৯, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কিশোর ও যুব-ছাত্রদের মুখপত্র **বীক্ষণ**

প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংকলন ঃ ফেব্রুয়ারী, '৭৪

## সূচী ঃ



'সম্পাদকমণ্ডলী-বীক্ষণ'এর পক্ষে প্রদীপ মুখার্জী কর্তৃক 'বীক্ষণ কার্যালয়'—৫৯সি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত ও 'মুদ্রণী' ১৩১বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ফোন : ৩৫-০৩০৪ হইতে মুদ্রিত।

দাম—এক টাকা

আমাদের কথা——————

# বর্ষশেষের নিবেদন

'বীক্ষণে'র বয়স এক বছর পূর্ণ হ'ল। ঐতিহাসিক সময়ের মাপকাঠিতে যদিও 'একটি বছর' কিছুই নয়, তবু নব-জাতকের 'গঠন-কাল' হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই একটি বছরের মূল্যবান শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই 'বীক্ষণের' ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনাকে নির্দ্ধারিত করবে। সুতরাং, জন্মলগ্নেই কিশোর ও যুব-ছাত্র সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মক্ষেত্রের নির্ভরযোগ্য সহচর হবার যে মহান ও গুরু দায়িত্ব নিজের অপরিনত কাঁধে তুলে নেবার শপথ নিয়েছিল 'বীক্ষণ', স ই শপথের নিরিখেই আজকে দেখা প্রয়োজন, আমাদের সাফল্য-অসাফল্যের বার্ষিক খতিয়ানটিকে।

পশ্চিমবাংলার ছাত্র-আন্দোলনে সাময়িক ভাঁটা পড়ার সুযোগ নিয়ে অশুভ সামাজিক শক্তিগুলি যখন সচেতন, ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয়ভাবে ছাত্রদের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কর্মকে গলাটিপে হত্যা করার জন্য তৈরী হচ্ছিল, তখন ঐতিহাসিক তাগিদেই তার বিরোধী ধারা হিসাবে জন্ম নিয়েছিল 'বীক্ষণ'। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাসের অপ্রতুলতা, একাকীত্বের অসহায়তা এবং অনভিজ্ঞতা আভ্যন্তরীণভাবে তার বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বার বার। তাই আমরা হোঁচট খেয়েছি অনেক; তবে, হোঁচট খেয়েই পা আমাদের শক্ত হয়েছে। এখনও যে বাধাগুলো আর নেই—এমন নয়, তবে বাধাগুলোর সাথে আরও দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি আমরা। একাকীত্বের অসহায়তাও আর আগের মতো পীড়াদায়ক নয়—এখন 'বীক্ষণে'র আরও অনেক সহযোদ্ধা এগিয়ে আসছেন লড়াইয়ের সারিতে। বহু শুভার্থী বন্ধু এবং সমমর্মী সাথী এগিয়ে দিয়েছেন তাঁদের সাহায্যের হাত, যুগিয়েছেন উৎসাহ ও প্রেরণা এবং উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদের অকৃপন প্রীতি ও ভালোবাসার দাক্ষিণ্য। এই দিশেহারা, হতাশাময়, অন্ধকার সংকট-মুহূর্তে এই দান অনেক। 'বীক্ষণে'র আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বছরের শেষে দাঁড়িয়ে আজ আমরা অন্ততঃ পক্ষে এইটুকু প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করত পারি—আকস্মিক কোন বিপর্যয় যদি না ঘটে, তবে 'বীক্ষণ' তার ঘোষিত আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম করে যাবে। 'সূতিকা-গৃহে অকাল-মৃত্যুর 'ফাঁড়া' সে কাটিয়ে উঠেছে।

অসাফল্যের দিকগুলি সম্পর্কে আমাদের থেকে বেশী ভালো করে বলতে পারবেন 'বীক্ষণে'র পাঠক-পাঠিকারা। তবে, আমরা নিজেরা যেটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি, সেগুলি হ'ল মুখ্যতঃ (ক) 'কিশোর ও যুব ছাত্রদের মুখপত্র'—এই কথাটি ঘোষিত হওয়া সত্বেও, প্রধানত আঙ্গিকের দুর্বলতার জন্য কিশোরদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনি 'বীক্ষণ'। এই একই কারণে, ছাত্র ও যুব সমাজের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে 'বীক্ষণ' এখনও বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। অর্থাৎ 'সরল ক থাগুলোকে জটিল করে বলা'র 'বুদ্ধিজীবীসুলভ প্রবণতাকে, সচেতনভাবে ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও 'জটিল কথাকে সরল করে বলা'র মতো দক্ষতা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি।

(খ) 'বীক্ষণে' প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে গঠনমূলক, শিক্ষণীয় (Educative) দিকটি এখনও অপ্রধান। এবং এই দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও, প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানের ওপর লেখা রচনাগুলিকে, একটি সুশৃংখল ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার অধীন করে, নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার মতো একটি বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করতে এখনও সক্ষম হইনি আমরা।

(গ) 'বীক্ষণ' যাঁদের, উদ্দেশ্য নিবেদিত তাঁদের সাংস্কৃতিক-ক্ষুধা মেটাবার মতো যথেষ্ট শিল্প সাহিত্যমূলক রচনা আমরা পাচ্ছিনা।

(ঘ) আলাদা করে একটি 'কিশোর বিভাগ' খোলার যে কথা আমরা আগে বেশ কয়েকবার ঘোষণা করেছি, তাকে এখনও আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারিনি।

এগুলি ছাড়াও আরও কিছু কিছু অসাফল্য ও ব্যর্থতার বোঝা জমেছে এই এক বছরে। তবে সেগুলিকে পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে সঠিক দেখা হবে। তাই 'বীক্ষণে'র সমস্ত বন্ধু, শুভার্থী ও পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন 'বীক্ষণে'র গত এক বছরের সব কটি সংকলনের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন আমাদের কাছে পাঠান। এই বার্ষিক-মূল্যায়নের দর্পণে 'বীক্ষণ' নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে দেখতে পাবে এবং সেগুলির থেকে মুক্ত হবার পথটিকে খুঁজে পাবে।

কবিতা

## হুগলী জেলের দুই নং সেলে বসে

সুজন সেন

বন্ধ সেলে ভেতর বুকে
পাই রে সাড়া,
হতাশাকে আঘাত করে
যে বোধগুলো সর্বহারা !!

রাত বিরেতে শেকল ছেঁড়ে
মনের ভেতর সাহসগুলো,
ইতিহাসের মুষলঘায়ে
ভাঙছে কারার দেওয়ালগুলো !!

ঠাণ্ডা সেলে ভর দু'পুরে
বুকের ভেতর বাজছে বাঁশী,
ডাকছে বাহির—ভয় কিরে তোদের
এই চেয়ে ছাখ আমরা আছি।

সূর্য্য চোঁয়া রক্ত ঝরায়
দিনের শেষের রক্ত খেলা,
মুক্তি সূর্য্য সম্ভাবনায়
গর্ভবতী রাত্রিবেলা !!

পাঠক-পাঠিকাবন্ধুরা,

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও সংকটের চরিত্র, তার কারণ ও সমাধানের সম্ভাব্য পথ সম্পর্কে আপনাদের মতামত পাঠান। এ ব্যাপারে, শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নয়, শিক্ষক, অভিভাবক শিক্ষালাভে বঞ্চিত বা শিক্ষান্তে কর্মপ্রার্থী তরুণ—সবার কাছেই আমরা রচনার জন্য আবেদন করছি। রচনা প্রকাশের ব্যাপারে, রচনার তথ্যনিষ্ঠতা ও আপাতঃ যুক্তিগ্রাহ্যতাই একমাত্র বিবেচ্য হবে, রচনাকারীর সাথে পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর মতৈক্য নয়।

—সঃ মঃ বী

## 'বীক্ষণে'র সভ্য হোন

চাঁদার হার :

**এক বছর : ১২ টাকা**
**ছয় মাস : ৬ টাকা**

- বছরের যে কোন মাস থেকে সভ্য হওয়া যায়।
- রেজিষ্ট্রির জন্য অতিরিক্ত খরচ না দিলে পত্রিকা বুক-পোষ্ট করে পাঠান হয়।

### সভ্য আবেদন পত্রের নমুনা

কার্যসচিব,
বীক্ষণ,
৫৯সি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪।

আমি এক বছর/ছয় মাস-এর জন্য 'বীক্ষণে'র সভ্য হতে চাই। সভ্য চাঁদা বাবদ............টাকা মনিঅর্ডার/ বাহক মারফত পাঠালাম। ইতি—

নাম..........................................................................

ঠিকানা......................................................................

বিঃ দ্রঃ মণিঅর্ডার-এ টাকা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রদীপ মুখার্জী ( বীক্ষণ ), ৬৯ গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

# দর্শন প্রসঙ্গে

ব্রজেন মণ্ডল

(২)

## দর্শন-এর সংজ্ঞা (১)

আগের সংখ্যায় ( 'বীক্ষণ', বিশেষ শারদ সংকলন, '৭৩ ) আমরা আমাদের জীবনে দর্শনের এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছিলাম যে দর্শন-এর আওতার বাইরে আমরা কেউই নই। দর্শন-মুক্তভাবে আমরা কোন কিছুই করতে বা ভাবতে পারিনা। যে সব সমস্যা আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে, সেগুলি যে কমার বদলে ক্রমেই বেড়ে চলেছে তার কারণ এই যে, সেগুলিকে কেন্দ্র করে আমাদের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ ভাবনা চিন্তা ও কাজ হচ্ছে, সেগুলি ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে না। আর অন্তহীনভাবে যে আমরা ভুল পথে চলছি তার কারণ আমরা চালিত হচ্ছি ভুল দর্শন-এর দ্বারা। কাজেই, আমরা যদি এই সমস্যাগুলির সমাধান চাই তবে আমাদের এই বেঠিক দর্শন-এর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক দর্শন-এর আশ্রয় নিতে হবে। আর সেজন্যে সঠিক দর্শন-টা কি আমাদের জানা দরকার এবং তারও আগে জানা দরকার 'দর্শন' কাকে বলে। দর্শন সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্তগুলি সবই এখনও পর্যন্ত মন্তব্য হিসাবেই উপস্থিত হয়েছে। এবারে আমরা আমাদের মূল আলোচনা অর্থাৎ দর্শন-এর সংজ্ঞা, দর্শন-এর শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদির মধ্যে যাব এবং দেখব যে আমাদের এইসব মন্তব্য কতদূর গ্রহণযোগ্য।

'দর্শন' কাকে বলে? অর্থাৎ, দর্শন-এর সংজ্ঞা কি?—অত্যন্ত সহজ একটি শব্দে, যা আমরা অহরহ ব্যবহার করে থাকি, দর্শন-এর সংজ্ঞা দেওয়া যায়। শব্দটি হ'ল 'দৃষ্টিভঙ্গী'। অর্থাৎ, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরই অপর নাম দর্শন।

কিন্তু এই সংজ্ঞা সহজ হলেও আদৌ পরিষ্কার নয়। যদিও কথায় কথায় আমরা এ শব্দটির ব্যবহার করে থাকি, তবু দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কি বোঝা যায় এটা যদি জিজ্ঞেস করা যায়, তার কোন স্পষ্ট স্বচ্ছ সংজ্ঞা দেওয়া আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। এবং আরও যেটা গণ্ডগোলের ব্যাপার, এই ব্যাখ্যাগুলিও এক এক জনের কাছ থেকে এক এক রকম পাবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই, এই বহু অর্থ সম্পন্ন এক-শব্দের সংজ্ঞার বদলে দেখা যাক, এমন কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় কিনা যা বহু-শব্দ ও বাক্য সম্পন্ন হলেও, যার অর্থ একটাই।

জ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির ( যেমন, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি ) সাথে দর্শন-এর বিষয়বস্তুর তুলনা করলেই দর্শন-এর এই সবচেয়ে স্পষ্ট সংজ্ঞাটা পাওয়া যাবে। জ্ঞানের এইসব বিভিন্ন শাখাগুলির বিষয়বস্তু কি?—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের। বিশেষ বিশেষ ধরণের ঘটনার বা বিশেষ বিশেষ দিককে ব্যাখ্যা করা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সবচেয়ে সাধারণভাবে যে দুটি নিবিড়ভাবে পরস্পর নির্ভর ভাগে ভাগ করা যায়, তা হ'ল প্রকৃতি ও সমাজ। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যত ঘটনা তা নিয়েই হ'ল সমাজ! তা ছাড়া আর যা কিছু, অর্থাৎ আর যে সমস্ত ঘটনার উৎপত্তি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের আওতার মধ্যে পড়ে না, তা'ই হল প্রকৃতি। এর মধ্যে সমস্ত জড় ও জীব জগৎ পড়ে। জীব জগতের অংশ হিসাবে মানুষও পড়ে। অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণী-র সাথে মানুষের যেখানে মিল ( যেমন, আহার নিদ্রা, জন্ম-মৃত্যু, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি ) সেটাও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অংশ। অবশ্য বহু সময়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতি—শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে আমরা এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রকৃতিকে এতটা ব্যাপক অর্থে না ধরে, একটু সীমাবদ্ধ অর্থে ধরছি। যে কথা বলছিলাম—এখন, প্রকৃতি ও সমাজের এক একটি বিশেষ ধরণের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়েই জ্ঞানের এক একটি বিশেষ শাখার জন্ম হয়েছে। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বক্তব্যটা পরিষ্কার হবে।

যেমন, ধরা যাক পদার্থবিদ্যার কথা। প্রকৃতির অচেতন অংশের যে সব ঘটনাবলীতে বস্তুর উপাদানে কোন পরিবর্তন না হয়ে শুধু তার বাইরের চেহারা বা অবস্থানের নানা রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করাটাই পদার্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। যেমন বরফ, জল ও বাষ্প—এই তিনটি জিনিসই একই বস্তুর বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন রূপ, সেজন্য এগুলির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করাটা পদার্থবিদ্যার বিষয়। বোঁটা থেকে খসে গেলে, আম যখন নীচে পড়ে তখনও আমটা আমই থাকে, অন্য কিছু হয়ে যায় না। কিন্তু মাটি থেকে উঁচুতে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে মাটিতে এসে পড়াটায়, তার একটা অবস্থানগত পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করাটাও পদার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুর রূপের যে এইসব নানা পরিবর্তন ঘটে তার পিছনে যে কারণগুলি কাজ করে, সেগুলি কোন না কোন শক্তি। যেমন, তাপ, বিদ্যুৎ, আলো ইত্যাদি। এই শক্তিগুলির প্রকৃতি, ধর্ম ও তাদের সাথে বস্তুর রূপ ও অবস্থানের পরিবর্তনের সম্পর্কগুলিকে ব্যাখ্যা করাটাও পদার্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

অর্থাৎ যা যা জিনিস যে সে অনুপাতে মিশে বস্তুটি তৈরী হয়েছে, সেটাতেই পরিবর্তন হয়ে যায় এবং একটা জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা আর একটা জিনিস হয়ে যায় এবং এইভাবে নতুন নতুন জিনিসের জন্ম হয়—সেগুলির ব্যাখ্যার সমষ্টিই হ'ল রসায়নবিদ্যা। যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হ'ল দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের জিনিস, যারা পৃথিবীর সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। এখন, এই দুটি জিনিসকে নির্দিষ্ট পরিমান তাপ ও চাপের মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশালে, তা থেকে জন্ম হয় জলের, যা প্রকৃতিতে ঐ দু'টি জিনিসের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তেমনি মোমবাতি জ্বালালে, মোমবাতি যা যা উপাদান দিয়ে তৈরী অর্থাৎ কার্বন ও হাইড্রোজেন আলাদা হয়ে যায়, বাতাসে যে অক্সিজেন আছে তার সাথে কার্বন মিশে তৈরী হয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন মিশে তৈরী হয় জলীয়বাষ্প! দু'টি জিনিসই তখন বাতাসে সাথে মিশে যায়—আমরা দেখি মোমবাতিটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই শেষোক্ত দু'টি জিনিসই—মোম এবং তার উপাদান কার্বন ও অক্সিজেন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মোমবাতি পোড়ার এই গোটা প্রক্রিয়াটাকে বোঝার চেষ্টা করাটা রসায়নবিদ্যার কাজ এবং এই প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা আমরা দিলাম, সেটা রসায়নবিদ্যা থেকেই নেওয়া। যে কোন স্কুলপাঠ্য রসায়নবিদ্যার বই-এই এই বর্ণনা পাওয়া যায়। এই রকম আরও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অগুন্তি ঘটনা সারা বিশ্বজগৎ জুড়েই প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে এবং সেইসব ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েই জন্ম হয়েছে রসায়নবিদ্যার।

তেমনি প্রকৃতির আর এক আশ্চর্য ঘটনাবলীর সমষ্টি হচ্ছে, তার প্রানের জগৎ। জন্ম, বিকাশ, প্রজনন ও মৃত্যু—এই বিশাল ঘটনা-স্রোতকে নিয়ে তৈরী, এই জগতের যে বৈচিত্র তাকেই বোঝা ও ব্যাখ্যা করাটাই প্রাণবিজ্ঞানের (লাইফ-সায়েন্স) বিষয়বস্তু। আবার এই প্রাণের জগতেরই সাধারণভাবে যে দুটি আপাতঃ শ্রেণীবিভাগ রয়েছে—উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ, তাদের প্রাণধারণের পদ্ধতির মধ্যেই যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েই জন্ম হয়েছে প্রাণবিজ্ঞানের অন্যতম দুটি শাখা—উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার।

প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ছে, ততই প্রকৃতির নতুন দিক মানুষের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে এবং ততই জ্ঞানের নতুন নতুন শাখা ও উপশাখার জন্ম হচ্ছে। অন্যদিকে জ্ঞানের গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে প্রকৃতির বিভিন্ন ধরণের ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং ফলে বিভিন্ন শাখা-উপশাখার পুরোন আপাতঃ সীমারেখা মুছে গিয়ে, সেগুলির একটার মধ্যে আর একটার অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং এইভাবে জন্ম হচ্ছে আরও নতুন নতুন শাখা ও উপশাখার উপাদানে রয়েছে। যেমন, আধুনিক প্রাণ-রসায়ন (বায়োকেমিষ্ট্রি)। জৈবিক ঘটনাবলীর মধ্যে রসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ার ফলে প্রাণবিজ্ঞান ও রসায়নবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলিকে নিয়েই গড়ে উঠেছে জ্ঞানের এই আধুনিক শাখাটি। একই সাথে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও প্রাণবিজ্ঞান ইত্যাদির উপাদনে সমৃদ্ধ জ্ঞানের আর একটি শাখা হ'ল ভূবিদ্যা (জিওলজি)। ভূপৃষ্ঠের উপরে ও নীচে নানা পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে (পাহাড়, নদী, খনি, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদি) অনুসন্ধান করাটাই হ'ল এর বিষয়বস্তু। একই রকমভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নতুন নতুন বিষয়ের আরও উদাহরণ হ'ল ভৌতরসায়ন (ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি), ইত্যাদি। অন্যদিকে, এইসব অর্জিত জ্ঞানকে মানুষের উপকারে অথবা অপকারে লাগাতে গিয়ে (জ্ঞানকে কেন অপকারে লাগানো হয় এবং কারা লাগায়, সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো) তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে জ্ঞানের আরও নতুন নতুন শাখার, যেগুলির মধ্যে উপরে বর্নিত প্রায় সমস্ত শাখাগুলির উপাদানই কোন না কোন ভাবে উপস্থিত রয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, কারিগরিবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, সামরিক অস্ত্রপোকর সংক্রান্ত বিজ্ঞান—এগুলি সবই এই ধরণের শাখার উদাহরণ।

একই রকমভাবে, মানবসমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে নানান সমাজবিদ্যার। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে তার প্রয়োজনের জিনিস উৎপাদন করতে হয়। সেই উৎপাদিত জিনিসগুলি আবার সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে বিতরিত হয়। উৎপাদন ও বন্টনের বিভিন্ন পদ্ধতির ফলে পৃথিবীর কোন কোন দেশে (যেমন আমাদের দেশ) বেশীর ভাগ লোকের ভয়াবহ দারিদ্র, বেকারী, দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিপুল বিলাস বৈভবের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আবার কোন কোন দেশে, শোনা যাচ্ছে, যেমন উত্তর ভিয়েতনাম, চীন ইত্যাদি) দারিদ্র, বেকারী এসব একেবারেই নেই। এখন মানব সমাজের এইসব বৈচিত্রময় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাকে ঘিরেই জন্ম হয়েছে অর্থনীতি নামক সামাজিক-জ্ঞানের শাখাটির। তেমনি, মানুষের সমাজের অতীত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করতে গিয়েই জন্ম হয়েছে সামাজিক ইতিহাস নামক আর একটি সামাজিক জ্ঞানের শাখার। তেমনি, মানুষের মনের বিচিত্র লীলাখেলা, তার আনন্দ-বেদনা, হাসিকান্না, ভালবাসা ঘৃণা ইত্যাদির ব্যাখ্যাই হচ্ছে মনস্তত্ত্বের বিষয়বস্তু।

সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ছে, ততই সমাজ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের নানা দিকও আবিষ্কৃত

হচ্ছে এবং উভয় প্রকৃতি ও সমাজের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানের আপাতঃ নির্দিষ্ট সীমারেখা মুছে গিয়ে, সেগুলির সংমিশ্রণের উপরেই তৈরী হচ্ছে জ্ঞানের এমন নতুন নতুন শাখার, যাকে প্রকৃতি বা সমাজবিজ্ঞান-কোন একটি শাখার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এধরণের শাখার একটি আদর্শ উদাহরণ হ'ল নৃবিজ্ঞান, যাতে অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রাণ-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন শাখারই উপাদান আছে। এধরনের শাখার আরও উদাহরণ হ'ল—ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি।*

এখন, জ্ঞানের এইসব বিশেষ বিশেষ শাখাগুলির সাথে (যেগুলিকে বলা হয় বিশেষবিজ্ঞান) দর্শন-এর পার্থক্য হচ্ছে এইখানে, যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশেষ বিশেষ ধরণের ঘটনাগুলির জায়গায় দর্শন গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকেই একসাথে, সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন দিককে আলাদা আলাদা খণ্ড খণ্ড করে যখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি, তখনই তা হ'ল জ্ঞানের এক একটি বিশেষ শাখার কাজ। আর এই দিকগুলিকে তার সমস্ত জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসহ একটা একক, অখণ্ড ঘটনা হিসাবে দেখে, তার প্রকৃতি ও চরিত্রকে যখন বোঝার চেষ্টা করি আমরা, তখনই সেটা চলে আসে দর্শন-এর মধ্যে। অথবা অন্যভাবে বললে, দর্শন-এর কাছে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই হ'ল একটা ঘটনা, বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়াগুলি হল যার বিভিন্ন দিক মাত্র।

এখন, কোন ঘটনা বা ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করার অর্থ হ'ল, কি অথবা কি কি নিয়ম (law) অনুযায়ী সেগুলি চলছে তা আবিষ্কার করা, খুঁজে বার করা। জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখাগুলি সংশ্লিষ্ট ঘটনা-বলীর ক্ষেত্রে এই ভূমিকাই গ্রহণ করে, অর্থাৎ সেই সেই ঘটনাগুলি কি কি নিয়ম অনুযায়ী চলছে, সেগুলি খুঁজে বার করে। এক একটি বিশেষ ধরণের ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত সূত্রগুলিকে নিয়েই সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের শাখাটি গড়ে ওঠে। যেমন, পদার্থবিদ্যায় নিউটন আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বা আর্কিমিডিসের ভাসমানতার নিয়ম, প্রাণ-বিজ্ঞানে কোষ-বিভাজনের নিয়ম, অর্থনীতিতে মজুরী ও মুনাফা, মূল্য ও দামের, চাহিদা ও যোগানের নিয়ম ইত্যাদি।

দর্শন যখন গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকেই ব্যাখ্যা করতে চায়, তখন তারও কাজ হ'ল গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই কি কি নিয়মে চলছে, সেটা খুঁজে বার করা। অর্থাৎ গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে যে যে নিয়মগুলি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলির সমষ্টিই হ'ল দর্শন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটাও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কারণ এ থেকে মনে হতে পারে যে, এটাই যদি দর্শন-এর সংজ্ঞা হয়, তবে তো জ্ঞানের সমস্ত শাখার সূত্রগুলিকে এক জায়গায় জড় করে দিলেই, তা দর্শন হয়ে গেল। কারণ সেগুলিতেই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দিকগুলির সূত্র রয়েছে। সেক্ষেত্রে আর তা হলে আলাদা করে দর্শন বোঝার কি আছে! জ্ঞানের সমস্ত শাখার নিয়ম-গুলিকে কেউ যদি শিখে ফেলে (যা ক্ষুদ্র মানবসন্তানের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়) তা হলেই দর্শন শেখা হ'ল।—না, ব্যাপারটা তা নয়। দর্শন হ'ল একমাত্র সেই সেই নিয়মগুলির সমষ্টি, যার ভূমিকা বা উপস্থিতি, যার প্রযোজ্যতা প্রতিটি বিশেষ ঘটনাতেই সরাসরিভাবে রয়েছে, এবং এতটা সরাসরিভাবে রয়েছে যে জ্ঞানের প্রতিটি বিশেষ শাখার নিয়মগুলি, দর্শন যে যে নিয়মগুলিকে নিয়ে তৈরী, তার বিশেষ রূপ মাত্র।

একটা তুলনামূলক উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হবে। নির্দিষ্ট পরিমান চাপ ও তাপে আয়তনের দিক থেকে দুই ভাগ হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে একভাগ অক্সিজেন গ্যাস মেশালে, জল পাওয়া যায়। আবার আর এক নির্দিষ্ট পরিমানের তাপ ও চাপের উপস্থিতিতে একভাগ কার্বনের সাথে দু'ভাগ অক্সিজেনের সংমিশ্রনে পাওয়া যায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এখন এই দুটি ঘটনাই রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে পাঁচটি** সাধারণ নিয়ম আছে, সেগুলি অনুযায়ীই ঘটে। কিন্তু ঘটনাগুলি আলাদা এবং তাদের রাসায়নিক বিক্রিয়ার শর্ত, উপাদান, অনুপাত, অর্থাৎ তাদের বিশেষ নিয়মগুলির সবই আলাদা। এক্ষেত্রে ঐ দু'টি রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে যদি গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে তুলনা করা যায়, তবে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাধারণ সূত্রগুলি নিয়ে তৈরী হবে দর্শন, যার বিশেষ রূপ হচ্ছে ঐ বিশেষ প্রতিক্রিয়ার নিয়মগুলি। শুধু এটুকুই খেয়াল

---

* এখানে মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃতি ও সমাজ সংক্রান্ত জ্ঞানের, অর্থাৎ প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শ্রেণী-বিভাগ যে পদ্ধতিতে এখানে করা হ'ল, তা খুবই ভাসাভাসা, যথাযথ-ভাবে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ বস্তু ও ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত কারণ অনুযায়ীই করতে হয়। কিন্তু এখানে শ্রেণীবিভাগ মূলতঃ বস্তু বা ঘটনাবলীর বাইরের চেহারার ভিত্তিতেই করা হয়েছে। আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ পরে সুযোগ পেলে করার চেষ্টা করবো। তবে, অন্যান্য শাখার সাথে তুলনায় দর্শন-এর বিষয়বস্তু সহজে বোঝাবার জন্যই আপাততঃ এই অসম্পূর্ণ শ্রেণীবিভাগেই আমরা আমাদের অলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি।—লেখক।

** এই নিয়মগুলি হ'ল: (১) ভরের নিত্যতা সূত্র (২) স্থিরানুপাত-এর সূত্র (৩) গুনানুপাত-এর সূত্র (৪) বিপরীতানুপাত-এর সূত্র এবং (৫) গ্যাসীয় আয়তনের সূত্র।—লেখক

করতে হবে যে, দু'টির জায়গায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আরও অনেক অনেক বেশী জটিল, অণুভূতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি আর ঐ রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মগুলি, দর্শন যা নিয়ে তৈরী সেই সাধারণ সূত্র-গুলিরই বিশেষ একটি রূপ মাত্র।

এই উদাহরণে উল্লিখিত রসায়নের সাধারণ সূত্রের মত জ্ঞানের প্রতিটি শাখা ও উপশাখাই এক বা একাধিক সাধারণ নিয়মের উপর গড়ে উঠেছে। যেমন আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কোন কঠিন বস্তুর যান্ত্রিক গতিবেগ যতক্ষণ আলোকরশ্মির গতির চেয়ে কম থাকে, ততক্ষণ সেগুলি নিউটনের বিখ্যাত তিনটি গতির সূত্র ***অনুযায়ী চলে। আমাদের প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে যান্ত্রিক গতিবেগের যে সব বিভিন্ন উদাহরণগুলি আমরা দেখি (কোন জিনিস গড়িয়ে দিলে সেটা কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়, কোন ভারী জিনিসকে সোজাসুজি ওঠান'র বদলে নততল বেয়ে অথবা কপি কলের সাহায্যে ওঠান সহজ, ইত্যাদি) তার সবগুলিই আলোকরশ্মির গতিবেগের চেয়ে অনেক কম। সেজন্য সেগুলির সব কটিরই বিশেষ নিয়মগুলি (অর্থাৎ যথাক্রমে ঘর্ষন, নততল ও কপি কলের নিয়ম) নিউটনের ঐ তিনটি মূল নিয়মেরই বিভিন্ন রূপ।

এখন, বিশেষ বিশেষ শাখার এইসব সাধারণ নিয়মগুলি সবই, দর্শন যে নিয়মগুলি নিয়ে তৈরী তারই বিশেষ বিশেষ রূপ মাত্র। বলা বাহুল্য, কোন বিশেষ শাখার নিয়মই এই সাধারণ ভূমিকা নিতে পারেনা। কারণ সেগুলির মধ্যে এমন কোন নিয়ম নেই, অন্যগুলি যার বিশেষ রূপ মাত্র (যদিও এইসব বিশেষ নিয়মগুলি নিবিড়ভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত)। কারণ, এগুলির প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ শাখার **বিশেষত্বকেই** সূচিত করছে—অন্য সমস্ত শাখার সাথে তাদের **সাধারণ দিকগুলিকে** নয়। সেজন্যই, তাদের কোনটিই দর্শন-এর নিয়মগুলির—যা সবগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়মেরই সাধারণ দিকগুলিকে সূচিত করছে- অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। সুতরাং বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে দিলেই তা 'দর্শন' হয়ে যায় না। অর্থাৎ **দর্শন হ'ল প্রকৃতি ও সমাজের বা অন্য কথায় গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে সাধারণ যে নিয়মগুলি তাদেরই সমষ্টি।** এবং এটাই হ'ল দর্শন-এর সবচেয়ে স্পষ্ট, সহজবোধ্য ও দ্ব্যর্থহীন সংজ্ঞা।

কিন্তু এই সংজ্ঞা থেকে আমাদের জীবনে দর্শন-এর প্রভাব বা উপযোগিতা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন কিছুই বোঝা গেল না। আগামী বারে এ সম্পর্কে আমরা আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাবার চেষ্টা করব। (ক্রমশঃ)

---

*** নিউটনের গতি-সূত্রগুলি হ'ল নিম্নরূপ :

প্রথম গতিসূত্র—বাইরে থেকে কোন বল প্রয়োগ না করলে, স্থির বস্তু স্থির অবস্থায় থাকে এবং গতিশীল বস্তু অপরিবর্তিত বেগ নিয়ে একই সরলরেখায় চলতে থাকে।

দ্বিতীয় গতি-সূত্র—ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সঙ্গে সমানুপাতিক এবং বাহ্যিক বল যে দিকে ক্রিয়া করে ভরবেগের পরিবর্তনও সেই দিকে ঘটে থাকে।

তৃতীয় গতি-সূত্র—প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।—লেখক

---

ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুরা,

আপনারা যে বিভিন্ন 'শিক্ষা' প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়াশুনো করছেন, তার আভ্যন্তরীন চেহারা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ চিঠিপত্র পাঠান। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষই এইসব 'জ্ঞানের মন্দির'গুলির ভিতরকার দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাণহীন অবস্থার কথাটা জানেন না। আপনাদের এই ধরণের চিঠিপত্র প্রকাশিত হ'লে, তাঁদেরই কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে, তাঁদের সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনদের কেমন আবহাওয়ার মধ্যে কি 'শিক্ষা' দেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন তাঁরা। এর ফলে তাঁদেরই স্নেহাস্পদদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে, তাঁদের উত্তেজিত করার যে অপচেষ্টা চলে, তার বিরুদ্ধেও এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ হবে। তা ছাড়া, এতে আপনাদের পারস্পরিক খবর আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম হয়ে উঠে 'বীক্ষণ' ছাত্র হিসাবে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার কাজেও সাহায্য করতে পারবে। —সঃ মঃ বীঃ

# ডাঃ নরমান বেথুন

বিশ্ব-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয়
নায়কের জীবনালেক্ষ্য

**রঞ্জন দেবনাথ**

●[ কানাডার মানুষ, ডাঃ নরমান বেথুনের নাম আমাদের দেশে খুব একটা পরিচিত নয়। অথচ গোটা মানবজাতির জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, এই মানুষটিকে যিনি তাঁর মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত একটি নিপীড়িত জাতির সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবন দান করেন—পৃথিবীর বিরাট এক অংশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। মানব জাতিকে যারা দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের মধ্যদিয়েই যে প্রকৃত মানব-সেবা সম্ভব—এই শিক্ষাই আমরা পাই ডাঃ নরমান বেথুনের জীবন থেকে। আর বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় দক্ষতাকে পর্যন্ত কেমন করে সেই সংগ্রামের শানিত অস্ত্রে পরিণত করা যায়, তার এত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। এই দৃষ্টান্ত, এই শিক্ষা আমাদের দেশের যুব-সমাজকে, বিশেষতঃ যাঁরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁদেরকে একটা সঠিক পথের সন্ধান দেবে, এই বিশ্বাস থেকেই আমরা এই জীবনকাহিনী পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থিত করছি।—সঃ মঃ বীঃ ]

**॥ পূর্বানুবৃত্তি ॥**

১৮৯০ সালের মার্চ মাসে গ্রাভেনহার্সট-এর উত্তর ওন্টারিও সহরে (কানাডা) হেনরী বেথুনের জন্ম। বাবা রেভঃ ম্যালকম বেথুন ও মা অ্যান গুডউইন। বালক বয়সেই হেনরী বেথুনের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ভালোবাসা, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও দৃঢ় সংকল্পের মনোভাব প্রকাশ পায়। স্কুলের পড়া শেষ হলে বেথুন বিভিন্ন পেশা নিয়ে টাকা জমাতে শুরু করেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চালানোর জন্য। এই সময়ে শিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। এম. ডি. পরীক্ষার আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বেথুন যোগ দেন মিলিটারীতে। যুদ্ধের পর ডিগ্রী নিয়ে তিনি যান ইংলণ্ডে—যুদ্ধের হতাশা ও তিক্ততা থেকে মুক্তি পেতে। এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁর আলাপ হয় এক ধনী পরিবারের কন্যা ফ্রান্সেসের সঙ্গে। পরীক্ষার পরই বিয়ে করেন তাঁরা। সৌভাগ্যের আশায় বেথুনদম্পতী লণ্ডন ছেড়ে আসেন ডেট্রয়েটে। কিন্তু পসার জমে না। এই প্রচণ্ড হতাশার সময়ে বেথুনের বন্ধুত্ব হয় বিখ্যাত ডাক্তার ডাঃ মার্টিনের সঙ্গে। তাঁর সহায়তায় ভোজবাজির মতো বেথুনের কাছে ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। বিত্তবান রোগীরা তাঁর চেম্বারে ভীড় জমাতে থাকে। কিন্তু মানসিক ভাবে সুখী হতে পারেন না তিনি। প্রচলিত চিকিৎসা-ব্যবস্থার নীতিহীনতা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও তীব্র সমালোচনার ঝড় তোলেন বেথুন।

অত্যধিক কাজের চাপে বেথুনের স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে যেতে থাকে। ক্রমশ: ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবনের আশা ছেড়ে দেন বেথুন। ফ্রান্সেসকে বলেন তাঁকে ডিভোর্স করতে। স্থানীয় ডাক্তারদের দ্বারা প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসিত হবার পর গ্রাভেনহার্স্টের ক্যালিডর স্যানেটোরিয়ামে যান বেথুন : শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন তিনি। কিন্তু স্যানেটোরিয়াম-ট্রিটমেন্টের পথিকৃৎ ডাঃ লিভিংস্টোন ট্রুডো—প্রতিষ্ঠিত ট্রুডো-স্যানেটোরিয়াম থেকে আসা একটি চিঠি তাঁর মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। ট্রুডো-তে ভর্তি হন তিনি। একটু সুস্থ হতেই তাঁকে নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে পাঠানো হয় 'লী' নামের একটি কটেজে। সেখানে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁরই মতো আরও তিনজন ডাক্তারের সঙ্গে। 'মৃত্যুর জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত' চার বন্ধু মৃত্যুর সামনে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে যথেচ্ছাচার করে মহানন্দে দিন কাটাতে থাকেন। বসন্ত আসে; সাথে করে নিয়ে আসে ফ্রান্সেসের লেখা একটি চিঠি : ডিভোর্স ঠিক হয়ে গেছে, তিনি ফিরে যাচ্ছেন এডিনবরা। এই সংবাদ বেথুনকে হঠাৎ বিচলিত করে তোলে। আবিষ্কার করেন তিনি —এখনও জীবনের প্রতি ভালোবাসা, ফ্রান্সেসের প্রতি ভালোবাসা তাঁর মনে আগের মতই অটুট রয়েছে। এ যাবৎ আত্ম-প্রবঞ্চনা করেছেন তিনি। এই ভয়ংকর উপলব্ধিকে জোর করে মন থেকে সরিয়ে দেবার জন্য গ্লাসের পর গ্লাস মদ্য পান করে চলেন বেথুন। তারপর গ্রামোফোনের ডিস্কের ওপর চাপিয়ে দেন তাঁদের অতিপ্রিয় গানটি—'দি লোনসাম রোড'।

। 8 ।

বিদায়ী গ্রীষ্মের একটি উষ্ণ সন্ধ্যা। চার বন্ধু বিছানায় শুয়ে বই পড়ছেন; লাইব্রেরী থেকে বইয়ের বোঝা নিয়ে এইমাত্র 'কটেজে' ফিরে এসেছেন তাঁরা। নতুন উপন্যাসটার পাতা উল্টে ক্লান্ত হয়ে পড়েন বেথুন। তাক থেকে ডাঃ জন আলেকজাণ্ডার-এর লেখা The Surgery of Pulmonary Tuberculosis বইখানা তুলে নিয়ে অলস ভাবে পাতা উল্টাতে শুরু করেন, তারপর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ান। বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "শোন এ জায়গাটা"—

"এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে ফুসফুসের ক্ষয়রোগ সম্পর্কে পথিকৃৎ হবার মতো কাজ থেকে কত পিছনে পড়ে রয়েছি আমরা? আমেরিকার ডাক্তারদের যে বিরাট অংশটি এই বইখানি পড়বেন, তাঁরা জেনে আশ্চর্য হবেন যে 'থোরাসিক সার্জারী'তে ক্রমবর্ধমানভাবে এমন অগ্রগতি হচ্ছে যা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে—নতুন করে আশার সঞ্চার করছে আশাহতদের মনে"। বেড-ল্যাম্পটাকে ঠিক করে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন বেথুন। বইটির প্রারম্ভিক কথাটির মধ্যেই একটা বিপ্লবী সুর ফুটে উঠেছে : "বিংশ শতাব্দির শল্যচিকিৎসা পালমোনারি টি. বি.'র সার্জারীর অগ্রগতিতে যতখানি গর্ববোধ করতে পারে, অন্য কোন সার্জারীর ক্ষেত্রে ততখানি করতে পারে না।"

ফুসফুসের ক্ষয়রোগের সার্জারী! কে করেছেন? কই মনে তো পড়েনা। ভাগ্যের হাতে নিজেকে স'পে দিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিছানায় শুয়ে থাকার বদলে সরাসরি সার্জারীর প্রয়োগ! তিনি নিজেই কি 'শুধুমাত্র বিশ্রাম'—চিকিৎসা-পদ্ধতি'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি? উত্তেজিত হয়ে উঠলেন বেথুন :

"এমন কি কয়েক বছর আগেও এই ধরণের রোগে যে কোন প্রকারের শল্য চিকিৎসাকে ক্ষতিকর বলে মনে করা হত। এক্স্ট্রা প্যারা ভার্টিব্রাল থোরাকোপ্লাস্টি ( যাতে ক্ষয়গ্রস্ত ফুসফুসটিকে চুপসে দেবার জন্য আংশিক ভাবে পঞ্জরাস্থি তুলে ফেলা হয় )-এবং অন্যান্য সহযোগী পদ্ধতি এখন বিরাট সংখ্যক রোগীকে, যাঁদের একদিকের ফুসফুসে ক্ষয়রোগ সংক্রামিত হয়েছে, প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে এবং তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাময় লাভ করতে পারেন।"

বেথুন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই জায়গাটা আবার পড়লেন। এক দিকের ফুসফুসের ক্ষয়রোগ তাহ'লে সার্জারীর ফলে সারতে পারে? কিন্তু তাঁর নিজের রোগটাতো ঠিক তাই-ই—বাঁ-দিকের ফুসফুস অকেজো হয়ে পড়েছে!

পাতার পর পাতা উল্টে চলেন বেথুন। ডাঃ আলেকজাণ্ডার পরিমিত শব্দের সাহায্যে, কোন রকম উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে, ঘোষণা করেছেন—"সার্জারীর প্রয়োগে এই রোগকে যে সম্পূর্ণ ভাবে সারানো যায় তার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া সম্ভব এবং আমেরিকাতে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার আসল কারণটি হ'ল—ব্যাপক অজ্ঞতা।"

অন্যরা ঘুমিয়ে পড়েছে। কটেজের' ছাদের গায়ে চঞ্চল ছায়া ফেলে জলছে বেথুনের বেড-ল্যাম্পটি। হাতে-ধরা বইটার দিকে চিন্তান্বিত ভাবে তাকিয়ে থাকেন বেথুন। কেন তিনি এ সম্পর্কে আগে কিছু শুনতে পান নি? পাতা উল্টে বইখানির প্রকাশ-কাল দেখলেন বেথুন : ১৯২৬; ঠিক এক বছর আগে।

তাহলে সত্যি সত্যিই কি একটি অনাবিষ্কৃত পথের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনবে হাজার হাজার অমূল্য জীবন, নিরাশ হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেবে নতুন আশার আলো?

ভোর হ'ল। বেথুনের বাতি তখনও জ্বলছে। বইটা হাত থেকে ফেলে দিলেন বেথুন। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ঘুম এলো না। একটা চিন্তা ধীরে ধীরে আকার নিচ্ছে তাঁর মনের মধ্যে; একটা পিচ্ছিল, ছলনাময় আশার আলেয়া - যাকে স্বীকৃতি জানাতে ভয় পাচ্ছেন তিনি।

আশা? না, এখনও নয়,—নিজেকে বলেন বেথুন; এখন শুধু প্রয়োজন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা।

সকালের নরম আলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলেন বেথুন। ডাঃ জন আলেকজাণ্ডারের বইখানা পাশে পড়ে আছে, অনেক কটা পাতা জুড়ে পেন্সিলের দাগ, ভবিষ্যতে ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, তাঁর জীবন নিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

পরের কয়েকদিন কারো সাথে বিশেষ কথাবার্তা বললেন না তিনি। অধিকাংশ সময় লাইব্রেরীতেই কাটাতে লাগলেন। খুঁজে বেড়ালেন পালমোনারি টি. বি. সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। জড় করা সমস্ত তথ্য গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন বেথুন। 'লী'র বাতাস নিউমোথোরাক্স ও থোরাকোপ্লাস্টি শল্য চিকিৎসার বিরামহীন আলোচনায় মুখরিত হয়ে উঠলো।

"হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে", বলেন বেথুন, 'কারণ উপযুক্ত হলেও সেই সার্জারীর সুযোগ পাচ্ছে না তারা! বিশ্বাস করতে পারো?" উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করেন বেথুন, "এটা শুধু অজ্ঞতা বা রক্ষণশীলতা নয়—এটা নগ্ন বর্বরতা! আর আমরাই বা করছিটা কি? তোমরা কি মনে কর, অনন্তকাল ধরে 'শয্যা-বিশ্রাম' নিলেও কি আমাদের বাঁচার বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা আছে?" হাতে ধরা বইটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলেন বেথুন "আমি এই ভাবে মরতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। 'কম্প্রেশন ট্রিটমেন্ট'ই নিতে চাই আমি। ডাঃ আলেকজাণ্ডার আমাকে নিঃসন্দেহ করেছেন। আমি 'কৃত্রিম নিউমোথোরাক্স' চাইতে যাচ্ছি।"

সেইদিনই বিকেলে হাসপাতালের প্রশাসন দপ্তরে ঝড়ের মতো ঢুকলেন বেথুন। হাসপাতাল কর্মীদের মিটিং চলছিল, কোন কিছুর পরোয়া না করেই বেথুন দাবি জানালেন, তাঁর ওপর কৃত্রিম 'নিউমো-থোরাক্স' করা হোক এবং এই মুহূর্তে। ট্রুডোর কর্মীরা তাঁর কালবৈশাখীর মতো মেজাজটিকে ভালো রকমই চিনতেন। অবস্থা সামলাবার জন্য একজন ডাক্তার এই পদ্ধতির বিপদের কথা জানালেন বেথুনকে। হাসলেন বেথুন। শার্ট খুলে বিস্ময়ের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন: "ভদ্রমহোদয়, আমি বিপদকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

তখন পর্যন্ত এই পদ্ধতিটিকে শুধুমাত্র অন্তিম অবস্থায় অনুমোদন করা হতো এবং ট্রুডো হাসপাতালে এটা কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ডাঃ আলেকজাণ্ডারের পদ্ধতি স্বীকৃতি পেতো নিশ্চয়ই, কিন্তু এই ব্যাপারে বেথুনের ভূমিকা, ট্রুডো হাসপাতালে 'ক্ষয়রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পদ্ধতি-প্রয়োগের' কাজটিকে বহুগুন ত্বরান্বিত করেছে। বেথুনই প্রথম এগিয়ে এসে নিজেকে 'গিনিপিগ' হিসেবে উৎসর্গ করেছিলেন, হাজার হাজার মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের বুকে আশার সঞ্চার করতে।

নিউমোথোরাক্স চিকিৎসার ফল হলো যেমন দ্রুত তেমনি নাটকীয়। কাশি ধীরে ধীরে সেরে গেল। কফ ওঠাও বন্ধ হলো এক মাসের মধ্যে। বেথুন অনুভব করলেন—নতুন প্রাণশক্তির বন্যা আসছে তাঁর মধ্যে। নতুন শক্তি ও আশা কর্মোদ্যমে চঞ্চল করে তুললো তাঁকে। যে সমস্ত ক্ষয়-রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য একটি কর্মসূচী তৈরি করে ফেললেন বেথুন। তাঁর যুক্তি ছিল: টি. বি. রোগীদের সমস্যা, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সৈনিকদের অনুরূপ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তাঁরা এবং সুস্থ হয়ে যখন ঘরে ফিরছেন, তখন যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি থাকছেনা তাঁদের মধ্যে, যাতে পুরনো জীবনের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন বা আবার নতুন করে শুরু করতে পারেন সব কিছু। বেথুন তাঁর পরিকল্পনাতে বললেন, স্যানেটোরিয়ামের মধ্যেই যেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয় যার অধ্যাপক হাসপাতালের রোগীরাই থাকবেন এবং ছাত্র হবেন আরোগ্যলাভরত রোগীরা। এ সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ্য হবে আবার সমাজিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য রোগীদের মানসিক ভাবে প্রস্তুত করা। এই পরিকল্পনাটিকে তখন 'আকাশকুসুম' বলে বিবেচনা করা হলেও পরবর্তীকালে এটিকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছে।

শুধু পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না বেথুন। ভবিষ্যতের বুকে শক্ত পায়ে দাঁড়ানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন তিনি এই সময়ে। নিউমোথোরাক্স পদ্ধতির প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়ার 'নোট' নিতে লাগলেন বেথুন, ক্ষয়রোগ নিরাময়ের শল্যচিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে হারিয়ে ফেললেন নিজেকে, গাদা গাদা চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন বন্ধুদের এবং স্যানিটোরিয়ামের পরিচালনাধীন একটি নার্সিং স্কুলের ছাত্রদের শারীর-বিদ্যার ক্লাসও নিতে শুরু করলেন রীতিমতো।

দু'মাস পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন বেথুন।

প্রত্যেক সন্ধ্যায় ডাক্তার ও রোগী-বন্ধুরা 'লী'র কটেজে আসতে লাগলেন বিদায় জানাতে। তাঁরা চলে যাবার পর চার বন্ধু একা পড়ে থাকতেন কুটীরে।

"তোমার অনুপস্থিতি আমরা খুব অনুভব করবো বেথুন।"—সরলভাবে বলেন ফিশার। "লী আর আগের মতো থাকবে না।" "এবং সেটা খুব ভালোই হবে, তাই না?" হাসেন বেথুন। "আমারও তোমাদের কথা খুব করে মনে পড়বে, তবে তোমাদের স্মৃতি সত্যি সত্যিই অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার মনে যদি তোমরা সবাই আমার মতো "নিউমোথোরাক্স' করিয়ে নাও।"

ডাঃ নরমান বেথুন/এপার

পরের দিন সকালে সকলের সঙ্গে দৃঢ় করমর্দন করে বিদায় নিলেন বেথুন। স্টেশনে এসে 'তার' পাঠালেন ফ্রান্সেসকে : সম্পূর্ণ সুস্থ। ট্রুডো ছেড়ে যাচ্ছি। ঠিক আগের মতোই অনুভব করছি তোমার অভাব। আমাকে আবার বিয়ে করবে?

হাতে মাত্র এক মিনিট সময় আছে। বেথুন ফিরে তাকান 'সারনাক' হ্রদের দিকে; ট্রুডোতে আসার প্রথম দিনটির মতো বরফে সাদা হয়ে আছে।

ট্রেনের জানালায় মুখ চেপে ধরে চোখ বুঁজলেন বেথুন। ট্রুডো থেকে ফিরে যাচ্ছেন তিনি—এটা স্বপ্ন নয়, সত্য। মৃত্যু পরাজিত হয়েছে তাঁর কাছে। ডেট্রয়েট তাঁর মনুষ্যত্বকে টেনে নীচে নামিয়েছিল কিন্তু ট্রুডো তাঁকে দিয়েছে বাঁচার আগ্রহ, নতুন জীবনের প্রেরণা। ডেট্রয়েট—গর্বোদ্ধত প্রাসাদ, রূপোর ঝঙ্কার, দারিদ্র, অসহায়তা আর মার্কিনী মিথ্যার মোহাঞ্জন। নিজেকে 'একমাত্র বিদ্রোহী' ভেবে, নিজের মনুষ্যত্বকে খর্ব করেছিলেন তিনি। নিজের কাছে নিজেকে অপমানিত করেছিলেন—চোখ ধাঁধানো প্রাচুর্যেরমধ্যে গাঢেলে দিয়ে; দু'টুকরো সোনা কুড়োতে গিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে নিজের সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে। খুশীর সাথে ভাবেন বেথুন, এখন আর সে সমস্ত কিছুর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাননা তিনি। যে সিংহাসনে একমাত্র চিকিৎসাবিদ্যার আসন হওয়া উচিত, সেখানে মুখস্ত-করা বুলি কপচিয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত উন্নতি ও যশের আকাঙ্খাকে স্থান দিয়ে, সেই পবিত্র স্থানটিকে কলঙ্কিত করেছিলেন তিনি। কিন্তু এই ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হবে না। আর কোন দিন কেউ তাঁর সার্জারীর ছুরির তলায় কেবল একটি 'বিচ্ছিন্ন যান্ত্রিক সমস্যা' হিসাবে পড়ে থাকবে না। একটি প্রাণ শুধুমাত্র রক্ত মাংসের সমষ্টি নয়, তার ভেতরে পাপড়ি মেলে আছে অফুরন্ত স্বপ্ন। তাঁর ছুরি রক্ত-মাংসের সাথে ওই স্বপ্নগুলোকেও বাঁচাবে।

সাঁইত্রিশে পা দিতে চলেছেন তিনি। কি দীর্ঘ সর্পিল সময়ের ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকলো তাঁর পিছনে! তবু ভালো, সে সব ই এখন অবলুপ্তির গহ্বরে; মৃত-অতীতের ছলনাময়ী হাজার হাতছানি ডজন খানিক সহরে সুন্দর ভাবে সমাধিস্থ। অনিশ্চয়তা, শঙ্কা, সব কিছুরই অবশেষকে বিসর্জন দিয়ে এসেছেন তিনি ট্রুডোতে। বিদায় ট্রুডো, বিদায়।

(ক্রমশ:)

বিজ্ঞান-শিক্ষা এদেশে

# আই. আই. টি.'র চিঠি

● [দেশকে কারিগরী দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, বৃটেন ও আমেরিকা ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের আর্থিক "সহায়তা" ও "পরামর্শ" অনুযায়ী, এই শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আই. আই. টি. নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয়। নানা দিক থেকেই, এই আই. আই. টি. গুলি হ'ল আমাদের দেশের "সেরা" শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করার পর, "যোগ্যতার" সুক্ষ্মতম ছাকনী দিয়ে বাছাই করে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের "সেরা মেধাবী" ছাত্রদেরই এখানে পড়বার সুযোগ দেওয়া হয়। সমাজ জীবনের বিভিন্ন "ব্যধি" (যেমন ভুখা নাঙ্গা কর্মহীন মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের দাবিতে আন্দোলন ইত্যাদি) যাতে এই সব "সেরা মেধাবী" তরুণদের উপর কোন "ক্ষতিকর" প্রভাব সৃষ্টি না করতে পারে, সে জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে সাধারণত: লোকালয় (আর লোকালয় মানেই তো ভুখা নাঙ্গা মানুষের মিছিল) থেকে একটু দূরে। অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ছাত্রাবাসে থাকাটাকে করা হয়েছে বাধ্যতামূলক। আর যাতে, সমাজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাঁরা শৃঙ্খলিত বোধ না করেন এবং কোন ধরণের অভাববোধ তাদের পড়াশুনায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, সে দিকে নজর রেখেই (দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করা সত্ত্বেও) এই আই. আই. টি.গুলির অভ্যন্তরে গড়ে তোলা হয়েছে এক একটি নকল পশ্চিমী দুনিয়া। (যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, খড়্গপুর আই. আই. টি.তে এই নকল দুনিয়ার খরচ, প্রতি ছাত্র পিছু বছরে ৬ থেকে ৮ হাজার টাকা। —যুগান্তর, ১২।১২।'৭৩)

অথচ, কারিগরী দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, দেশের যে কোন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সুক্ষ্মতম কারিগরী জ্ঞানের জন্য আজও আমরা পশ্চিমের মুখাপেক্ষী (যেমন, 'বীক্ষণে'র পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত 'দ্বিতীয় হুগলী সেতু……' এবং নবম সংকলনে প্রকাশিত 'সাঁওতাল ডিহি……' রচনাগুলি দ্রষ্টব্য) স্বভাবত:ই, এই দরিদ্র দেশের বুকে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয়ে (যার উৎস জনসাধারণের কাছ থেকে নানাভাবে আদায় করা কর), "সেরা" ইঞ্জিনীয়ার তৈরীর নামে, এই আই. আই. টি.গুলিতে যে

রাজসূয় যজ্ঞ চলে, তার প্রকৃতি কেমন—তা জানবার অধিকার প্রতিটি ভারতীয়ের আছে।

নীচের রচনাগুলিতে এই রাজসূয় যজ্ঞের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। প্রথম রচনাটি আমরা নিয়েছি খড়্গপুর আই. আই. টি.র ছাত্রদের পত্রিকা 'ALANKAR', vol, XII, No. 2, Dec. 1971 থেকে। এটির লেখক কৃষ্ণ ভেদুলা বোম্বে আই. আই. টি. থেকে বি. টেক্. পাশ করে আমেরিকা যান এম. এস. পড়তে এবং রচনাটি লেখার সময় তিনি খড়্গপুর আই. আই. টি.তে এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ গবেষণা করতেন। আর দ্বিতীয় রচনাটি দিল্লী আই.আই টি.'র বিজ্ঞানী, শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার ও ছাত্রদের তরফ থেকে প্রচারিত একটি সাইক্লোস্টাইল্ড ইংরাজী প্রচার-পত্রের অনুবাদ। উভয় রচনার রচনাকারই, তাঁদের রচনাগুলির মধ্যদিয়ে আই. আই. টি.গুলি সম্পর্কে নানা তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিয়ে দেশপ্রেমিক কর্তব্য করেছেন। আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

প্রসঙ্গতঃ এ সম্পর্কে আরও তথ্যসমৃদ্ধ রচনার জন্য আমরা আই. আই. টি.গুলির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন রাখছি।

—সঃ মঃ বীঃ ]

## ১

# যাওয়া উচিত হবে কি'না......

এটাই হ'ল প্রশ্ন। .....

এটা এমন একটা সময় যখন অনেক আশা-প্রত্যাশা নিয়ে, আই. আই. . টি.'র শেষ বছরের অনেক ছাত্র পশ্চিমের দিকে তাকাতে শুরু করে। আর জুনিয়ার ছাত্ররা তাদের হিংসার চোখে দেখে এবং সেই দিনের স্বপ্ন দেখে, যেদিন তারাও আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে পারবে।

একই রকম অনুভূতি নিয়ে সেখানে গিয়ে এবং একজন লক্ষণীয় পরিবর্তিত মানুষ হিসেবে দেশে ফিরে এসে, আমি কয়েকটি মন্তব্য রাখতে চাই।

যদি তোমাদের কেউ "উচ্চ-শিক্ষার" উজ্জ্বল ধারণা নিয়ে বিদেশে (আর বিদেশে মানেই তো আমেরিকা) যাবার সংকল্প ক'রে থাক, তা'হলে তা ত্যাগ কর। আই. আই. টি. সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই তোমাদেরকে আমাদের সমাজে অনুপযুক্ত হিসাবে তৈরী করেছে, আর আমেরিকা সে কাজ সম্পূর্ণ করবে। আই. আই. টি. তোমাদের কি ভাবে গড়ে তুলেছে, সে বিষয়ে, তোমাদের কারুর মনে যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে, তবে একবার বুকে হাত দিয়ে বলতো, এখানকার শিক্ষা তোমাকে কতখানি সমাজসচেতন করে তুলেছে এই দেশে, যেখানে দারিদ্র্যই হচ্ছে বেশীর ভাগ মানুষের বেঁচে থাকার রাস্তা। এমনকি কাজের দিক থেকেও আমরা এমন ধরণের ইঞ্জিনীয়ার, যারা আমার সঙ্গে একটা সামান্য নাট্‌ও আটকাতে পারি না। মাটিতে আমাদের পা পড়েনা, কারণ আমাদের ক্রমাগত বলা হয়ে থাকে, আমরা নাকি সমাজের "সেরা অংশ"। আমেরিকার উচ্চশিক্ষা সুনির্দিষ্টভাবেই সেখানকার অতিযান্ত্রিক এবং স্বয়ংক্রিয় শিল্পব্যবস্থার চাহিদা অনুযায়ী তৈরী। এই রকম উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরলে কেবল সেই সমস্ত যান্ত্রিক কসরৎ এবং শিল্পকৌশলেই পণ্ডিত হওয়া যায়, যা আজকের ভারতে বেমানান। এমনকি যেসব প্রতিষ্ঠান এশিয়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চশিক্ষা দেয় বলে দাবি করা হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানগুলিও আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ কিভাবে দেখা-শোনা করতে হয়—কেবল এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে।

এ তো গেল শিক্ষার কথা। সামাজিক দিক থেকেও ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয়। আই. আই. টি. তোমাদেরকে একদল জেটে চড়া 'এলিট' (Jet-Set Elite) * হিসেবে তৈরী করতে ব্যস্ত। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের নামে তোমরা এমন সব মেকি সাহেবে পরিণত হচ্ছ, যারা কেবল পাশ্চাত্য ঢং অনুকরণ করেই ক্ষান্ত সত্যিকারের পড়াশুনা যাদের জীবনে গৌন। "আমেরিকার যৌন জীবন কেমন? ...সুবিধে টুবিধে কিরকম ..?"— এসব প্রশ্ন এখানকার ছাত্রদের কাছ থেকে শুনি। (দুঃখিত, শূণ্যস্থান পূরণ করা গেল না, সেন্সর আটকাতে পারে)। বুঝি। আই. আই. টি.'র মতন জায়গায় যে সব ছাত্র পাঁচ বছরের জন্য আটকা পড়ে, তাদের অসুবিধেটা বুঝি। তবে, যদি তোমরা বিদেশে যাওয়া ঠিক করেই ফেলে থাক, আমার পরামর্শ তথাকথিত এই উত্তেজনাকর ব্যাপারটি থেকে বেশী কিছু আশা কর না। ভাগ্যে কেবল 'ঝড়তি পড়তি' জুটতে পারে। আর 'ঝড়তি পড়তি' নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাক তবে শেষে কিছু সস্তা উত্তেজনার খোরাক ছাড়া আর কিছু নাও জুটতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানসিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। (এক কথায় বলতে গেলে শেষ পর্যন্ত ক্ষ্যাপাটে হয়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশী—অবশ্য এসব স্বীকার করতে তোমার "কেমন কেমন" লাগবে)। অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারেও আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য হই। যাই কর না কেন, সূক্ষ্ম এবং কোন কোন সময় সরাসরি বৈষম্যমূলক ব্যবহার থেকে রেহাই পাবে না।

আর চাকরীর ব্যাপারে, মার্কিনী পুঁজিবাদী অর্থনীতি এক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বেকারী দিন দিন বাড়ছে। স্বভাবতঃই

* 'এলিট' শব্দের অভিধানিক অর্থ হ'ল—সেরা দল বা সার ভাগ

—সঃ মঃ বীঃ।

এর প্রকোপ প্রথমে এসে পড়ে বিদেশীদের ওপরে। আমি আই. আই. টি 'র এক ভারতীয়কে জানি, আমেরিকায় এম. এস. পাশ করার পর একটা গোটা বছর যে গোটা আমেরিকা চষে বেড়িয়েছে, শুধু একটা কাজের জন্য—যে কোন কাজ। এটা কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। অনেকেই ট্যাক্সি-ড্রাইভার, ঘণ্টা বাজান'র কাজ কিম্বা কাফেটেরিয়াতে হামবার্গার * ভাজার কাজ নিয়েছে। যারা কারিগরী কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তারা আসলে মার্কিনী গবেষনা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সস্তায় দক্ষ কারিগরের যোগান দিয়ে থাকে। একজন আমেরিকান সমপরিমান যোগ্যতায় যে মাইনে পায়, তার থেকে মাইনে-পত্র অনেক কম। অল্প কয়েকজন অবশ্য ভালো কাজ পেতে পারে, কিন্তু এই কাজের যে অভিজ্ঞতা তারা যোগাড় করবে, দেশে ফিরে তা কোন প্রয়োজনেই আসে না। অবশ্যই ভারতীয় মানের তুলনায়, যে কোন কাজে এমনকি ঘণ্টাবাজানোর কাজেও মাইনে অনেক বেশী। খুব সহজেই একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ী কিনতে পারা যায়, বাড়ীতে 'বার' এর সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। যোগ্যতার তুলনায় এসব সুখ সুবিধে কি যথেষ্ঠ? যথেষ্ঠ যদি মনে কর তা'হলে অবশ্য স্বাগতম্।

এতক্ষনে তোমরা যদি ভেবে থাক, তোমাদের আমেরিকা যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য, তা'হলে বলব ঠিকই ধরেছ। যারা ইতিমধ্যেই বিদেশ যাত্রা ঠিক করে ফেলেছ, তারা অবশ্য আমাকে পাগলাটে ভাবতে পার। তা বেশ, সেটাই বোধ হয় ঠিক। আমি তো তোমাদের আগেই সাবধান করেছি, আমেরিকায় থেকে এসে, সে রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। তোমরা এও বলতে পারো যে আমি তো আমার "ভাগের মজা" লুটে এসেছি, কাজেই এখন অন্যদের নিবৃত্ত করায় আমার কি অধিকার আছে? সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও তোমরা ঠিক বলছ। আমি নিশ্চিত, যারা যাওয়া ঠিক করেছ, তারা যাবেই। আমি কেবল তাদের একটু ভেবে দেখতে বলছি, আর তারা যদি ভারতেই ফিরে আসতে চায়, তবে তারা এদেশে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় অংশ নিতেই যেন ফিরে আসে। আর যারা পরবর্তী কালে বিদেশ যাত্রা ঠিক করেছ, আমি তাদের "সুখস্বপ্নে" নিরুৎসাহিত করতে চাই এবং জোরের সাথে এই ভাবনা থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলছি।

তোমাদের মতন মানুষদের অনেক কিছু করার আছে এদেশে। প্রকৃতপক্ষে, সেগুলিই করা দরকার! তার জন্য যা দরকার তা হ'ল একটু সাহস, প্রচুর আত্মসমালোচনা এবং সর্বদা সমাজের নিরাপদ আরামদায়ক কোনটিতে আশ্রয় নেবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করা। আমি নিশ্চিত, জীবন আমাদের অনেক কিছু দিতে পারে, কোমল, আরামদায়ক, উদ্ভিদসুলভ জীবনের চাইতে যা অনেক অনেক বড়।

—কৃষ্ণ ভেমুলা

# ২

# আই. আই. টি.তে শিক্ষা

১৯৫৯-৬০ সালে বৃটিশ সহায়তায় দিল্লী আই. আই. টি. স্থাপিত হয়। তবুও, ভারত সরকার, এই সহায়তাকে যাতে আরও 'কার্যকরী ভাবে' ব্যবহার করা যায় তার জন্য, আরও ২০-২৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। সেই 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যকরীতা'র একটি জীবন্ত প্রমান তুলে ধরেণ এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক একটি সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে, যেখানে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, এই ধরণের জাতীয়-গুরুত্ব বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি 'রপ্তানীযোগ্য' ইঞ্জিনীয়ার উৎপাদনে যেভাবে সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে, তাতে তিনি সত্যিই পুলকিত বোধ করছেন। কিন্তু যে কথাটি তিনি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হন, তা হ'ল, এই সব ইঞ্জিনীয়াররা, সামর্থে কুলায় না এমন একটি দেশের জনসাধারণের খরচে প্রশিক্ষণ লাভ করে, ইতিমধ্যে উন্নত দেশগুলিতে রপ্তানী হয়ে যাচ্ছেন।

এটাই স্পষ্টতঃ তার মূখ্য কারণ, কেন এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়তে আসা অসংখ্য ছাত্রই দেখেন যে, তাঁদের জাতীয়-গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচুর বড় বড় কথা বলা সত্বেও, পাঠ্যসূচীতে এমন জিনিষ খুব কমই থাকে যা জাতির প্রয়োজনের দিক থেকে প্রাসঙ্গিক, গুরুত্ব দেওয়া তো দূরের কথা। আমরা যদি বি. টেক্. পাঠক্রমের দিকে তাকাই তা হ'লে এমন জিনিষ খুব অল্পই খুঁজে পাব, যেখানে ছাত্রদের নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি, আবিষ্কারের ক্ষমতা—যা একটি অনুন্নত দেশের বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োগের বিন্দুমাত্র সুযোগ আছে। যে ভাবে বিদেশী বই থেকে ও বিমূর্তভাবে এবং ভারতীয় পরিস্থিতির সমস্যাবলীর সাথে সেগুলিকে সম্পর্কিত করাবার কোন চেষ্টা না করেই, সমগ্র পাঠ্যসূচীটি এখানে পড়ানো হয়, তা থেকেই এটা পরিষ্কারভাবে দেখানো যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমরা গথিক স্থাপত্য কিম্বা এ্যাংলো স্যাক্সন দুর্গ দেখতে কেমন তা খুঁজে বার করার চেষ্টায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেদের ব্যস্ত রাখি, অথচ উত্তর প্রদেশের একটি ছোট সহর কি রকম দেখতে, সে সম্পর্কে কোন আবছা ধারণাও আমাদের নেই।

এম. এস. সি. এবং এম. টেক্. স্তরেও অবস্থা এর চাইতে বিন্দুমাত্র উন্নত নয়। বি. টেক্ পাঠ্যসূচীর অপ্রয়োজনীয় পুণরাবৃত্তির কথা বাদ দিলেও, পঠনপ্রণালী সজীবতাহীনতার কি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে, তা

* হামবার্গার—একরকমের খাবার, অনেকটা আমাদের "চপের," মতন।—সঃ সঃ বীঃ।

বুঝতে পারা যায়, যখন আমরা নিজেদের মিসিসিপি নদীর ভূ-কারিগরী গুণাবলী অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে দেখি, অথচ যমুনা নদীর তীরে বাস করে তার সম্পর্কে কিছু মাত্র জানি না যদিও ছাত্রাবাসে আমাদের প্রত্যেকেই সারা বছর জলকষ্টের শিকার হই। এই পরিস্থিতিতে, এই অবাস্তর শিক্ষাসূচীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ, এম. টেক্‌ 'স্ট্রাকচার কোর্সে'র প্রথম বর্ষের সমস্ত ছাত্রের দলবদ্ধভাবে ইনস্টিট্যুট ছেড়ে চলে যাওয়াটা অবাক হওয়ার মত কিছু কি?

এবার এখানে গবেষনাকর্মগুলি কি ভাবে পরিচালিত হয় সে দিকে তাকানো যাক। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—এই নিয়ে অনেক বড়.বড় কথা বলা হয়ে থাকে যে, আমরা নাকি সুসংবদ্ধ তড়িৎ বর্তনী (integrated circuits) প্রস্তুত করতে পারি, অথচ আমরা না পারি এই বর্তনীর জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় কাঁচামাল—বিশুদ্ধ সিলিকনের কুঁচো তৈরী করতে, না আছে আমাদের এই বর্তনীর উপাদান তৈরীর জন্য নিজস্ব কোন বুনিয়াদী কারিগরী জ্ঞান। আমাদের বিজ্ঞানীরা পি. এল. ৪৮০ র সাহায্যপুষ্ট মহাকাশ গবেষনার বিমূর্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অযথা সময় নষ্ট করে চলেছেন অথচ বিদ্যুৎ সংকট এবং সেচ সমস্যার মোকাবিলায় ভারত সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার মূলে এঁদের অযোগ্যতার প্রশ্নটি রীতিমতো প্রকট।

পরিশেষে, আমাদের খেয়াল করা প্রয়োজন, যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে জীবনযাত্রার যে কৃত্রিম মান বজায় রাখতে আমরা বাধ্য হই, সেটাই আমাদের সবাইকে, সর্বোচ্চ নিলামদারের, যে সাধারণতঃ ভারতের বাইরেরই হয়ে থাকে, চাপের কাছে মাথা নোয়াবার পক্ষে উপযোগী করে তোলে। যে কেউ অনুমান করতে পারেন যে, আই. আই. টি.গুলিতে প্রচলিত ইংরাজী ভাষা এবং পশ্চিমী কায়দার জীবনযাত্রার উপর জোর দেওয়াটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় বরং পাঠ্যসূচীর অন্তর্বস্তুতে যে প্রবনতা আমরা দেখতে পাই, তারই আর একটি প্রতিফলন মাত্র।

এই প্রসঙ্গে সি. এস. আই. আর. এর জনৈক উচ্চপদস্থ বিজ্ঞানীর একটি মন্তব্য খুবই প্রনিধানযোগ্য, যিনি লক্ষ্য করেছেন যে "বিদেশ থেকে শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে আসার পর অধিকাংশ বিজ্ঞানীই সেই সব ক্ষেত্রের সমস্যাগুলির উপর সাধারণতঃ গবেষণা চালিয়ে যান, যে ক্ষেত্রগুলিতে তাঁরা বিদেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।" তিনি এই কথাটির উপর জোর দেন যে "এ রকম করার মধ্যদিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই মেকি আন্তর্জাতিকতাবোধকেই দৃঢ়তর করছেন, যাতে উন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে চালু গবেষনা ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে, সব দেশের বিজ্ঞান-গবেষনার সাধারণ এবং বিশেষ ক্ষেত্রগুলিকে গুলিয়ে ফেলা হয়।"

আমরা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কেবলমাত্র বিদেশে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরাই নন, আই. আই. টি.'র মতো সরকারের "সেরা" প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও এই একই নীতি অনুসরণ করে থাকেন। এই ধরণের অনর্থক এবং অবাস্তর কাজকর্মের সমাপ্তি এবং 'আত্মপ্রবঞ্চনার জন্য বিজ্ঞানে'র পরিবর্তে 'আত্ম নির্ভরতার জন্য বিজ্ঞানে'র প্রয়োজনের সংগ্রামের জন্য আমাদের সম্মিলিত হওয়ার সময় আজ সমাগত।

—সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার ও ছাত্রবৃন্দ

## শুভার্থী পাঠকদের প্রতি

প্রিয় বন্ধুরা,

'কাগজ খারাপ', এই অভিযোগ গত সংখ্যায় আপনাদের অনেকেই আমাদের কাছে করেছেন। আসলে, ছাপার কাগজের বাজারে যে "সংকট" এর কথা, রোজকার খবরের কাগজে আপনারা পড়েন, তারই শিকার "বীক্ষণ"ও। কাগজের দাম বর্তমানে দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি, এই খারাপ কাগজের দামও আমাদের আগের ভাল কাগজের দ্বিগুণ। এই পরিস্থিতির শিকার হয়ে প্রায় সবকটি প্রগতিশীল সাময়িক পত্রিকাই, পত্রিকার দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি দাম না বাড়াবার। স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। আর্থিক সাহায্য করে এবং দীর্ঘ মেয়াদী সভ্য হয়ে, এই সংকটের মোকাবিলায় 'বীক্ষণ'কে সাহায্য করুন।

—সঃ মঃ বীঃ।

# শৈশব

ধারাবাহিক উপন্যাস

শঙ্কর বসু

**পূর্ব্বকথাঃ**

অবোধ শিশু সন্তান দুটো নিয়ে অন্নর দুঃখের ডেরা। সন্থু আর সরি। সন্থুর বাবা বৃটিশের খিলাপে লড়েছিল। সেই লড়াইয়ের গোপন ক্ষত বুকে বাসা বেঁধেছিল। তাতেই মানুষটা গ্যাছে। এখন ছেলেমেয়ে দুটো নিয়ে সাত ধান্ধায় সংসার চলে। অন্ন প্লাষ্টিক কারখানায় কাজ নিয়েছে। সরি শাক লতা পাতা কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনে। আর সন্থু কানাই মাষ্টারের পাঠশালায় পড়ে। রায়টের সময় লোকটা রসুলকে খুন করেছিল। পাড়াটার ভালো করার নামে মানুষ ঠকায়। আর দাপট বাড়ায়। চমুর দাদুর সাথে তার বেজায় ভাব। এই পাড়াটাব হাভাতি বাসিন্দে ক্ষেমিপিসি, গনু, রণর ঠাকুমা। এখন পাড়াটার বুকে কারখানা গজিয়েছে। গনু কাজ নেবে কারখানায়। ও আর বিনা টিকিটে উধাউ হবে না। ওদিকে সরির বিয়ের জন্য অন্ন হেঁদিয়ে মরছে।

॥ ৬ ॥

দুর্গা প্রতিমা জলে পড়লে, বিসর্জনের বাজন বাজলে—তয় শীত আসে।

সেই শীত চামড়ার খড়ি উড়িয়ে তাড়িয়ে এখন যাই যাই করছে এক শীত এসে আরেক শীত গ্যালো। অথচ সরির বিয়ের ফুল ফুটল না এখনও। বিয়ের না'কি ফুল ফোটে, অন্ন বলে। কথাট কানে গেলেই সরির নাকের নীচে আঁশ আঁশ রেখাটা দগদগে ঘায়ের মতো ফুলে ওটে। সরি হাসে। অদ্ভুত এক হাসি।

কাকের মুখে সম্বাদ পেলে অন্ন সমন্ধ দেখতে ছোটে। নানান জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে যায়: আমি বাপু অতো দূরে মাইয়া দিমু না। তখন অন্নকে চেনা যায় না। কেমন যেন আদুরে শিশুর মতো। তারপর এক ভরি সোনা আর নগদ পাঁচশ এক টাকার জন্য সেই সমন্ধ ভেঙে গেলে চমুর মা ছড়া কাটে: জন্ম মিত্যু বিয়া বিধাতারে দিয়া।

হয়ত অন্নকে শক্ত করার জন্যই চমুর মার পানসে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ছড়াটা সুরসুর করে বেরিয়ে আসে। টেনে টেনে ছড়া আওড়ায় চমুর মা। অন্নর বিলাই চোখ সন্থুর ঘোলা মার্বেলের মতো কোন এক অজানা গর্ত্তের দিকে গড়িয়ে চলে। চমুর মার ছড়া, আর শোকে গন্ধ নিয়ে লম্বা শ্বাসটার কিছুই অন্নর হদিশ পায় না।

দু'চারদিন বাদেই অদ্ভুত কাণ্ড। সন্থু প্রথমটায় টের পায়নি। যে মানুষটা জরজালা ঝড়ঝাপটা মানে না, ঠিক সকাল বেলা প্লাষ্টিক কারখানায় হাত পোড়াতে ছোটে। সেই অন্ন কামাই করল। ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করল দিনভর। বাবুর ফটোখানা দেয়াল থেকে টেনে আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে সরিকে বলল: তর বাবার টিবি হইছিল, কইস না জানি! তারপর মরা পেয়ারা গাছটার তলায় একগুচ্ছ কাপড়কাচা সাবান দিয়ে সরির ঘাড়ে মুখে ঘষতে লাগল: রঙ্ করছোস একখানা বাবাঃ! আর জোরে জোরে ডলতে লাগল। যে ছালচামড়া তুলে ফেলবে। একবার মাস্তর সরির চিকন গলা শোনা গেল: আস্তে, মাইরা ফ্যালবা নাকি?

: হ, মারুম।

সন্থু হঠাৎ ফাল দিয়ে উঠল: কেন? কেন মারবে?

অন্ন আজ সন্থুর অহল্যা, হঠাৎ হেসে ফেলল: বেশ করুম আমি তগো শত্তুর কি'না তাই।

বিকেল মরামরা হলে ওরা এল। রেললাইন, পচাডোবা আর সুলতান আলম ষ্ট্রীটের সন্থুদের বেঁটে ঘরটায় ফিকে আলো মিটমিট করতে লাগল। এরপর সরির ঘাড়ের ময়লার মতো অন্ধকার ঝুপ করে নামবে। এসেছিল তিনজন। ছেলের মা (দেখেই সন্থু আঁৎকে উঠেছিল, মুখের একপাশ জুড়ে নীল জড়ুল, আর গা থেকে মাংস যেন ফেটে পড়ছে) তার সাথে একটা ল্যাংড়া ঘোড়ামুখো লোক, আর সন্থুর বয়েসী একটা ছেলে। ঘোড়ামুখো লোকটা খরখরিয়ে কথা বলে: মাইয়া কাম জানে নি? আমাগো ভেশাল সংসার, দুই বেলা তিরিশ খান পাত পড়ে, পারবো তো? অন্নর গলা গোড়ার দিকে বাধো বাধো হলেও পরে গড়গড়িয়ে বইতে লাগল: শিখাইয়া লইবেন, মাইয়া আমার অবাধ্য না। সন্দেশ দুটো ঘোড়া মুখে একসাথে গলায় পুরে দিল। তারপর একঢোক জল গিলে প্লাস্টার মাটিতে উপ্টে দিল: হাঁটো দেখি।

সরির চোখ দুটো টলটল করছিল।

অন্ন তাড়া দিল: হাঁট, হাঁইটা যা জলের উপর দিয়া···।

সরির ক্ষুদি ক্ষুদি পায়ের ছাপ মাটিতে ফুটে উঠল।

রসগোল্লা গালে ঢুকিয়ে, নীল জুড়ুল ছড়িয়ে ফাটিয়ে, ছেলের মা পায়ের ছাপের ওপর ঝুঁকে পড়ল: খড়ম পাও মনে হয়?

খরখরে গলায় আপত্তি উঠল: নন্ না···ত্যামন কিছু না।

তারপর রূপোর টাকায় সিঁদুর মাখিয়ে লোকটা চোখা জিভ বের করে একফালি সাদা কাগজে ছাপ দিল। নাকের ডগায় ভিজিটে ঠেকিয়েই রাখল: কন দেখি···কল্যাণীয়া কুমারী···সহিত···ফরিদপুর

তারপর নামতার মতো দেনা পাওনার হিসেব পড়ে

গাছের আঁশের মতো এক চিকচিকে বিকেলে সন্থ কানাই মাষ্টারের পাঠশালা থেকে ফিরে দেখে অন্ন ধনুকের মতো শরীরটা বেঁকিয়ে রেখেছে। সন্থর মনটা উড়ু উড়ু ছিল। গরমেণ্টের লোক এসেছিল ইস্কুলে (কানাইদাই বলে দিয়েছে: ইস্কুল বলবি হতভাগা, তোর গুষ্টিতে তো কারো পেটে কালির অক্ষর নেই!)। সন্থ ভেবেছিল পুলিশের লোক। কানাইদা বুঝিয়ে দিয়েছিল, পুলিশ নয়.দেশ চালায় যারা, দেশের মাথা। তাকেই গরমেণ্ট বলে। রোগাপ্যাটকা একটা লোক, গরমের-মধ্যে গলায় একটা মাফলার। বারোমেসে সর্দিতে নাকে হাজার মতো ঘা। সে সই দিলে নাকি ইস্কুলটা বড় হবে। রুমালের ভেতর নাক ঝাড়তে ঝাড়তে সন্থকে জিজ্ঞেস করেছিল: ক্যাট মানে কি এ্যাঁ? সন্থ ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছিল: বেড়াল। ব্যাস তাতেই মাত। ইস্কুল ছুটির পর কানাই মাষ্টারের গরুর মতো ডেলা ডেলা চোখে খুশী উথলে উঠল: এবার ক্লাশে উঠলে তোর সব বই আমি কিনে দেবো। পড়াশুনো করার ত্যামন কোন টান নেই সন্থর। কিন্তু তবু ওর বেজায় আনন্দ লাগল। ঝুলনের মেলায় লটারীর ঘুঁটি তুলে একবার সেই ন্যাংটো কালীর ছবি পাওয়াতে যেমন মেজাজ খুলে গেছিল, হুবহু তেমনি। লাফ মারতে মারতে ছেলেটা ফিরেছিল 'ক্যাট' শব্দটার মানে বলতে পারার আনন্দে। একবার মনে হয়েছিল— ধুস বই তো সেই কবে দেবে, তার চেয়ে যদি আরেক থান ন্যাংটো কালীই তখ্খন তখ্খন দিত!

চৌকাঠের গোড়ায় অন্ন বসেছিল। উবু হয়ে। ধনুকের মতো। চন্নর মা পাশে বসে পান চিবোচ্ছিল। কেমন একটা শব্দ ওঠে। পিক কেটে থুতু ফেলল চন্নর মা: থাউক গিয়া আপনে দিয়া ছ্যান...বেধবা মানুষ ..সমথ মাইয়া নিয়া কই যাইবেন...দোজবর তো কি হইছে?

—দিনরাত্তোর তাই ভাবি...সমথ মাইয়া, প্যাট ভইরা. খাইতে দিতে পারিনা...আবার ভাবি মাইয়ার মনে বুঝি দাগা লাগে...।

॥ ৭ ॥

লালমুখো সাহেবটা বেপাত্তা হয়ে গ্যাছে।

এখন কালো কুচকুচে শিঙের মতো চিমনি দলা দলা ধোঁয়া নিয়ে খেয়ালা করে। আলাদীনের চিরাগের মতো, রূপকথার দৈত্যের মতো, জলাবাদার বুকে কারখানাটা হুস্ করে একদিন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শিং নিয়ে। চিমনি নিয়ে।

কারখানার গেটে, বর্শার মতো ছুঁচোলো লোহার রডের ওপর সাইনবোর্ড ঝুলছে। সাদা জমির ওপর মিশমিশে কালো গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'গ্রেট ইণ্ডিয়া জুটমিল'। গেটের বাঁ দিকে চোয়া কুঠরীর মতো ঘর। খাকি হাফপ্যাণ্ট সার্ট আর কোমরে ছুরি ঝুলিয়ে নাটা দারোয়ান টুলে বসে ঝিমোয়। আর থেকে থেকে খিঁচুনি দিয়ে চমকে ওঠে। কারখানাটা চালু হতেই জানা গেল: সাহেবটা আর কোনদিন আসবে না। এদেশে থেকে লাল মুখখানা কালি মেরে যাচ্ছিল তাই ভয় পেয়ে ভেগেছে। মুখে মুখে নানান কথা রটতে থাকে। ক্ষেমিপিসি শুধু মুখ টিপে টিপে হাসে. রা কাটে না। তারপর একদিন গলু আর সন্থকে ডেকে বলল: শোন তাহলি...। বুকের পাটকাঠির মতো হাড় গুঁড়িয়ে শ্লেষ্মার ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ উঠল। জিনরাজের আত্মা নাকি ভূত হয়ে সাহেবটার গলা টিপে ধরেছিল। জান নিয়ে সাহেব তাই পগার পার। কারখানাটা নাকি গরমেণ্টকে দিয়ে গ্যাছে। তবে বচ্ছর বচ্ছর ট্যাকা পেয়ে যাবে মুলুকে বসেই।

ক্ষেমিপিসির নিষ্ঠুর আক্রোশ আর জিনরাজের ভূতের তাড়ায় লালমুখো সাহেবটা মুলুক চলে গ্যাছে সন্থ ভেবে পায় না গাঁটের কড়ি খরচা করে সাহেবটার কি দায় পড়েছিল এই জলাভূমির দেশে কারখানা বানানোর! ক্যাওড়াপট্টির হানাপোনা হাড়গিলে নাঙ্গা হাতপা খেলিয়ে ডোবার জলে বেশ তো ধামসে বেড়াত। পচা পাঁকের গন্ধ বুকে নিয়ে অশথগাছটার সুতলীর ফাঁসের মতো ঝুরি সরিয়ে. ঘরকে যেত। আর পাঁচবাড়ীর কাজ সেরে এসে ক্যাওড়াপট্টির সতেরো বছরের মা চোয়ালের গহ্বরের ভেতর থেকে গলা ফাটাত, গর্তের ভেতর থেকে গালের মরাচাম পুঁটি মাছের মতো ফুট কাটত: চ, তোকে দে আসবো...ক্যাওড়াতলায় দে আসবো...। দু-পাটি হলুদ ছ্যাদলা পড়া দাঁতের নীচে অসহ্য একটা রাগ আর জ্বালা পিষতে পিষতে চোয়ালের গর্তটা আরো গভীর হয়ে অন্ধকারে ডুবে মরত। সতেরো বছরের শরীরটার এক খাবলা ছিঁড়ে নিয়ে যে শিশুর জন্ম মায়ের চোটে নীল হয়ে যেত সে। তারপর কখন আনমনে, বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রনা হামা দেয়। ক্যাওড়াপট্টির মা তখন অবোধ ছেলেটার জন্য খুঁদ ফোটাতে বসে। মাটির হাঁড়িটায় পোড়া কাঠের আগুনে চাবুকের দাগ পড়তে থাকে। কে যেন ভাতের হাঁড়িটাকে নিষ্ঠুর আক্রোশে চাবকে চলে। সপ্ সপ্ সপ্। সাত বছরের ছেলেটার আধখানা দাঁতের আগায় হাসি ফোটে। আর এক হাতা লেই লেই খুদ সেদ্ধ ঢেলে দিয়ে তার মা বিড়বিড় করে: নে গিলে মর। কালো যম ছেলেটা এ সোহাগের সবটুকু চেটেপুটে নেয়। পরের দিন আবার ডোবার ঘোলা জলের রহস্যির ভেতর গলা অব্দি ডুবিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতো. কিসের এক টানে। এই সাঁৎসেতে জলোটান এড়ানোর ক্ষমতা ক্যাওড়াপট্টির নেই। বাগ্দীর ছেলেকে জলায় টানবে না তো টানবে কিসে! বিনি পয়সার চুনোমাছ, কাঁকড়া, শামুক, গুগলী

আর কোথায় পাওয়া যায় ! সাপেখোপে কাটেনা এমন মা, কিন্তু সে আর কতক্ষণ। জলপড়া তুকতাক আর কি একটি শেকড় বাটা খেলেই নিশ্চিন্তি। বাঁচার হলে বাঁচল, আর যাওয়ার হলে কারো হাত নেই। মা মনসার কোপ।

সেই ডোবা আর জলার বুকে লোহার বীম ঢুকিয়ে দিল। তার টানই বা কম কিসে? ডাক এল নিশুতিরাতে, পোড়া পেটের টানে। মিলের ডাক: ভোর থেকে লোক নেওয়া শুরু হবে। ক্ষেন্তিপিসি কাঁপছিল পদ্মপাতার জলের মতো। জাত ব্যবসার দোহাই পেড়ে: দুই পদ যাসনি। আর পেটের খিদে বুকে নিয়ে মরদ্গুলা হন্যা করে ছুটল। মরদরা ছুটেছিল পিসির চোখের ছানি কাটিয়ে। পাকা চাকরী আর মাসকাবারী মাইনের নিশ্চিন্তিতে। রেললাইন, লাইনের ঢাল, ওষুধকোম্পানীর রঙিলা পানি, সুলতান আলমষ্ট্রীটের ভেজা ভেজা কানাগলি, আর বুড়ো অশথ গাছের গুঁড়ি বুকের ভেতর নিয়ে সারাটা ক্যাওড়াপট্টি নেচে উঠল বালির মতো চকচকে এক দুর্লভ আশা চোখে নিয়ে।

জেঠুর কথাটা সন্তুকে দাগা দিয়েছিল। আর সেই গভীর এক ক্ষত বুকের ভেতর নিয়ে পাগলের মতো কি যেন হাতড়ে চলে। সন্তুর দৌরাত্ম্য আগের চেয়ে কমেছে। ঢের কমেছে। কখন যে ছুটো খেয়ে যায় সরিও হদিশ পায় না। কপাটের মাথার ওপর ভেঙে পড়া ওদের বেঁকি ঘরটার চার হাত জমির মধ্যে থেকেও সন্তুর নাগাল পাওয়া যায় না আজকাল। সরির বিয়ে নিয়েই জেঠু আরেকবার মুখ খুলেছিল। জেঠুর চেহারাটা সন্তুর চোখের সামনে ভাসছে: বেঁটেখাটো ছোট্ট মানুষ, চকচকে পামসু পায়ে (বাঁপায়ের পাতা একজিমায় গিলেছে), পাতলা চুলে গন্ধতেল, বেলের মতো ছোট্ট মুখখানায় ঘোলা ঘোলা চোখ আর দুপাটি বাঁধানো দাঁত। কথা তো বলে না, যেন চিবিয়ে খায়: তা কে তোমাকে বারমাস দেখবে মেজবৌ, মেয়ের বিয়ের খরচা আমি একা আর কত দেবো বলো...পাড়ার লোকজনের কাছ থেকে কিছু চাও...।

"ভিক্ষা করতে কয়···বড়লোক হইলে গরীবরে কেউ পোছেনা··· তিনকুলে আমাগো কেউ নাই বুঝলি সরি···আইজ সে থাকলে ভিখ মাগনের কথা কে কয় আমারে!...কার বুকের পাটা হইত?

অন্নর চোখে একফোঁটা জল নেই। দারুণ খর রোদ চোখের জল টেনে নিয়েছে। মনি দুটো খটখটে শুকনো। করকর করছিল। তখন রাতের সবে শুরু, জেঠুর কাছ থেকে ফিরে অন্ন দাওয়ায় থ্যাবড়ে বসে পড়েছিল। মাথায় ঘুরনি লেগেছিল। সরি গিয়ে সাথে সাথে তেলেজলে মিশিয়ে তালুতে ঘষতে লাগল। আর অন্নর চুনোচানা শুঁটকি মাছের মতো ঠোঁটে ফিস ফিস করে শব্দ হল: আমি ভিক্ষুক... ভিক্ষা চাইতে গেছি...সন্তু!

: উঁ।

: বুইনের বিয়া দিতে পারবিনা?

সন্তুর চোখ জোড়া আকুল বিস্ময়ে ফুটে আছে: মা!

: হ। নাকি তর মার পাঁচ বাড়ী ভিক্ষা করতে যাইবো...ক...ক কিরে সন্তু!

অন্ন যেন আর সর্ব্বোনাশে ভর পায় না: ক...সন্তু!

: ঠিক আছে, আর কখখনো জেঠুর বাড়ী যাবে না, মরে গেলেও না···।

তারপর শ্যামলা ছিপছিপে ছেলেটার কোঁকড়াচুলো মাথা আস্তো একটা ঝড় নিয়ে হু হু করে নড়তে লাগল। পাগলের মতো কিসব বলে চলল চোখের কালো মণিজোড়ায় ঘন বাষ্প নিয়ে। সরি পাথর। সরি পাথর না হলে যে আর বাঁচবে না! আর অন্ন সন্তুর দিকে কটা চোখে ঠায় তাকিয়ে আছে: সন্তু যেন নিরুদ্দেশে যাবে। এরপর সাংঘাতিক এক পণ নিয়ে ছেলেটা যেন কোথায় চলে যাবে! আশ্চর্য এক আশঙ্কায় ওদের অসাড় জিভ নাড়াতে পারে না।

'গ্রেট ইণ্ডিয়া মিলে' লোক নেবে। খবরটা ক্যাওড়াপট্টি আর কাঠগোলাবস্তী ছাড়িয়ে, পাঁক আর কচুরিপানার গন্ধ ছাড়িয়ে, লম্বা লুললুল বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে গরীব গরবার মহল্লায় হানা দেয়। গোঁয়ার গোবিন্দ নিতাই ক্যাওড়া হাওলাত শোধ করার স্বপ্ন দেখে। ভোলামুদীর কাছ থেকে বন্ধক দেওয়া থালাখানা ছাড়িয়ে আনার আশা জাগে। বৌর পাছায় একখানা ডুরে শাড়ী, কোলেরটার জন্যে ইজের। কত আশা। 'গ্রেট ইণ্ডিয়া মিল' মরাহাজা রুক্ষু পাড়াটার মানুষগুলোর কলজেয় আশার ফুল ফুটিয়ে চলেছে।

স্বপ্ন দেখেছিল সন্তুও। চোয়ালের হাড় উঁচিয়ে, দুপাটি দাঁত পিষে। ক্যাওড়াপাড়ার স্বপ্ন। চন্দুদের লম্বা রকওয়ালা বুদ্ধের মতো টালির চালাটায় সন্তুরা, বাবা মারা যেতেই এসে উঠেছিল। এখন সন্তু সব জেনে গ্যাছে। মার মুখে, সরির মুখে, চন্দুর মার কথায়। কোন এক সাহেবকে মারার মামলায় সন্তুর বাবা একটানা আট বছর জেল খেটে সারাটা বুক ঝাঁঝরা করে ফিরে এসেছিল। কুন্তিবোনের কচি বুক সেই ধকল সামলাতে না পেরে এক বছরের মধ্যে রক্তবমি করে শেষ হয়ে গ্যালো। আর সন্তুদের ছোট্ট পরিবারটা শ্যাওলাদামের মতো ভাসতে ভাসতে সুলতান আলম ষ্ট্রীটে এসে উঠল। ক্যাওড়াপাড়ার সিনার ভেতর থেকেও সন্তুর মা পাড়াটাকে এড়িয়ে চলত স্ফূর্তিবাজ, হল্লাবাজ, সরল মজবুত মানুষগুলোকে অন্ন বড় ভয় করত: সন্তু কপালের ফেরে এইখানে আইসা পড়ছি, তাই বইলা তো মানসম্মান বিসর্জন দিতে পারিনা।

আজ বাদে কাল গ্রেট ইণ্ডিয়া মিল চালু হবে। তারই তোড়জোড় চলছে। ট্রাকের পর ট্রাক আসছে ধুলোর ঝড় তুলে। মিলের বয়লার চালু হয়ে গ্যাছে। ফিকে ধোঁয়া উঠছে লাগাতার। ধুঁয়ো আর ধুলোর জালির ভেতর অশথ গাছের মান্ধাতার আমলের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সন্থু রণকে বলল : আমিও লাগবো।

রণর চোখেমুখে বিস্ময়, বিস্ময়ের পর গভীর খুসী : সত্যি!

: হুঁ।

গলু ফস্‌ফস্‌ করে টেনে গোটা একটা সিগারেট শেষ করে ফেলল। গালের কাটা দাগটা মিলিয়ে এসেছে। মেজাজটাও অনেক গলেছে। কেমন শান্ত শান্ত। শ্যাম নাকি পাখিপড়ানোর মতো কিসব বুঝিয়েছে কথায় কথায় ও এখন দাদার কথা এনে ফেলে। সিগারেট ফেলে দিয়ে পিক কেটে থুতু ফেলল : লেখাপড়া করবি না!

: আগে তো গিলতে হবে!

রণ গম্ভীর ভাবে মাথাটা বুকের দিকে টেনে আনল : হুঁ। বাবা বলে, মানুষের শরীলটাও ইঞ্জিনের মতো। পেট হল গিয়ে বয়লার। বয়লার বন্ধ থাকলে পোড়াকপা্ন চুলোয় যাবে।

(ক্রমশঃ)

ডাক্তার ও ডাক্তারী ছাত্রদের আন্দোলনের রিপোর্ট

# সারা বাংলার ভাতাপ্রাপ্ত ডাক্তার ও ডাক্তারী-ছাত্রদের সাম্প্রতিক আন্দোলন

**জনৈক ডাক্তারী-ছাত্র**

●[ ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবিতে পরিচালিত, জনসাধারণের প্রতিটি বিশেষ আন্দোলনই তার সফলতা ও বিফলতা, উভয়ের মধ্য-দিয়েই এমন কতগুলি সাধারণ শিক্ষা বহন করে আনে যার উপযোগিতা শুধু সেই বিশেষ আন্দোলনটিতেই সীমাবদ্ধ নয়, যা সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। প্রকৃতি সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে গবেষণাগারের যে ভূমিকা, সমাজ সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে আন্দোলনগুলিরও ভূমিকা ঠিক তাই। গবেষণাগারে জানার পদ্ধতি হ'ল, বিভিন্ন সজীব বা নির্জীব পদার্থের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়া ঘটিয়ে, তার থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা। আন্দোলন চলার সময় আন্দোলনকারীরা তাঁদের সামাজিক পরি-বেশের সাথে (যার মধ্যে রয়েছেন তাঁরা নিজেরা, তাঁদের শত্রুপক্ষ, তাঁদের যাঁরা বন্ধু হ'তে পারেন অর্থাৎ ব্যাপক জনসাধারণ ইত্যাদি) তীব্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আসার ফলে তাঁদের চিন্তার জগতে যে আলোড়ন ওঠে, সেটা সমাজ সম্পর্কে (অর্থাৎ, তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে, শত্রু সম্পর্কে ও বন্ধু সম্পর্কে) এমন অনেক কিছু প্রত্যক্ষভাবে শেখায়, যেটা অন্য পরিস্থিতিতে সম্ভব হ'ত না। আন্দোলনের অভিজ্ঞতালব্ধ এই শিক্ষাগুলির যদি সঠিক সারসংকলন করা যায়, তবে তা সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিধির বাইরেরও ব্যাপক মানুষের উপকারে লাগতে পারে। আন্দোলনকারীদেরও ভবিষ্যত আন্দোলন-গুলির ক্ষেত্রে তা মূল্যবান দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারে।

নীচের রচনাটিতে ডাক্তার ও ডাক্তারী ছাত্রদের সাম্প্রতিক (নভেঃ—ডিসেঃ '৭৩) আন্দোলনটির এ ধরণের একটি বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে। আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী জনৈক ছাত্র, রচনাটি আমাদের দপ্তরে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমরা এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে সমস্ত ধরণের মতামতের জন্য সাদর আহ্বান রাখছি। অন্যান্য জায়গায় যেসব যুব-ছাত্র আন্দোলন চলছে সেগুলির বিবরণ ও বিশ্লেষণ পাঠান'র জন্যেও অনুরোধ করছি —সঃ মঃ বীঃ]●

## পটভূমি

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী হাসপাতালগুলোর প্রকৃত অবস্থা হল—চিকিৎসা করার পক্ষে এগুলো অত্যন্ত অনুপযুক্ত। রোগ নির্ণয়ের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং ওষুধপত্রের অভাব এই হাসপাতাল-গুলিতে আজ অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। এক্স-রে, ই. সি. জি. ইত্যাদি করার যন্ত্রপাতির সংখ্যা নিতান্তই কম এবং রোজ মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য সেগুলি চালু থাকে। অথচ হাসপাতালে যাঁরা দেখাতে আসেন, তাঁদের অধিকাংশেরই বাইরে থেকে এক্স-রে, ই. সি. জি. ইত্যাদি করিয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, ওষুধ কিনে খাওয়ার মত আর্থিক সঙ্গতিও থাকে না। ফলে তাঁদের অপেক্ষা করে থাকতে হয় দিনের পর দিন, রোগের অবস্থা যাই হোক না কেন।

ব্লাড ব্যাঙ্কের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় জরুরী অনেক অপারেশনও বহুক্ষেত্রে স্থগিত রাখতে হয় শুধুমাত্র রক্তের অভাবে ফলে বলাই বাহুল্য, মুমূর্ষু রোগীর অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত ভয়ানক—অনেকে মারা যান।

অন্যান্য বিভাগের অবস্থাও তথৈবচ। প্রয়োজনীয় ওষুধের বেশীর ভাগই হাসপাতালে পাওয়া যায় না। অথচ ছাত্রাবস্থায় ডাক্তারদের পড়তে হয় অনেক কিছু, অনেক টাকা খরচ করে, অনেক বছর ধরে। রোগ নির্ণয় করার অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতির কলকব্জা সম্বন্ধে

ওয়াকিবহাল হতে হয় তাঁদের। অনেক ভাল ভাল আর নামী দামী ওষুধের নামও তখন তাঁদের মুখস্থ থাকে। কিন্তু পুরোপুরি হাসপাতাল জীবন শুরু করার পর ওগুলো তাঁদের ভুলে যেতে হয়। কারণ সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার রোগী যাঁদের দেখতে হবে শুধুমাত্র 'স্টেথোস্কোপ' দিয়ে; চোখ কান বুজে সেই ওষুধই দিতে হবে যা হাসপাতালে আছে, অপারেশন টেবিলে রোগী মারা যাবে, রক্তের অভাবে, যন্ত্রপাতির অভাবে। এহেন অবস্থায়, ছাত্রাবস্থায় শেখা সেই সব ভাল ভাল ওষুধ আর রোগ নির্ণয়ের আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলোকে মনে জায়গা দিয়ে ব্যস্ত করতে দেওয়ার চাইতে, ভুলে যাওয়াইতো শ্রেয়।

অথচ, আগেই বলেছি, তাঁদের কাছে অর্থাৎ এই হাসপাতালগুলিতে যাঁরা রোগ দেখাতে আসেন তাঁদের অধিকাংশই আমাদের সমাজের সেই বৃহত্তম অংশের মানুষ, ওষুধ কিনে খাওয়া তো দূরের কথা, দুবেলা পেট ভরে খাবার মত আর্থিক সঙ্গতিও যাঁদের নেই। ফলে হাসপাতালে এসে তাঁরা ওষুধ একটা পান বটে, কিন্তু রোগ তাঁদের সারে না। হাসপাতাল সম্পর্কে আস্থাহীন হয়ে পড়েন তাঁরা। হতাশা তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় 'ভূত, প্রেত, অপদেবতা' আর মন্দির, মসজিদ এবং ওঝা মাদুলী ইত্যাদি কুসংস্কারের জগতে। ডাক্তার আর রোগীর পারস্পরিক সম্পর্ক (যা ভাল না হলে রোগ সারার সম্ভাবনা থাকে না) তিক্ত হয়ে ওঠে। একে অন্যের থেকে দূরে সরে যান।

ছাত্রাবস্থা শেষ হওয়ার পর চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত জীবনও আর্থিক ভাবে অত্যন্ত অসচ্ছলতার মধ্যে কাটে। মাসিক ভাতা হিসাবে তাঁরা যা পান, বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্যের হিসাবে, তা নিতান্তই কম। থাকার কোন সুব্যবস্থা নেই। আর ছুটি বলতে আছে বছরে সাকুল্যে ৩৫ দিন।

### আন্দোলনের বিকাশ ও পরিণতির বিবরণ

হাসপাতালগুলির এই অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে এর আগে বহুবার আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। বহুবার তাঁরা "আশ্বাস"ও দিয়েছেন। কিন্তু একবারও তা কার্যে পরিণত হয়নি। ক্রমশ: হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই এটা উপলব্ধি করতে পারেন যে, একমাত্র সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কর্তৃপক্ষের (সরকার) কাছ থেকে তাঁদের ন্যায়সংগত দাবিদাওয়াগুলি পাওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবাংলার সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হাউসষ্টাফদের প্রতিনিধি ও ছাত্র প্রতিনিধিদের (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা হলেন ছাত্রসংসদগুলির সম্পাদক, সভাপতি ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় সংগ্রাম সমিতি' (সংক্ষেপে—সি. এ. সি.)।

গত ১৪ই নভেম্বর (১৯৭৩) সি. এ. সি-র মাধ্যমে ছয় দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। দাবিগুলি হ'ল :—

**ভাতা-বৃদ্ধি :** ইনটার্নী, জুনিয়র ও সিনিয়র হাউসষ্টাফরা মাসিক ভাতা হিসাবে পান যথাক্রমে ১৯৩ টাকা, ২৫০ টাকা, ও ৩০০ টাকা। এই ভাতা যথাক্রমে মাসিক ৩৫০ টাকা ৫০০, টাকা ও ৫৫০ টাকা করতে হবে।

**বসবাসের সুবন্দোবস্ত :** ইনটার্নীদের নির্দিষ্ট কোন থাকার ব্যবস্থা নেই; হাউসষ্টাফদের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং অস্বাস্থ্যকর। প্রত্যেক হাউসষ্টাফ ও ইনটার্নীর বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

**নিরাপত্তা :** বর্ত্তমান অবস্থায় নিরাপত্তা বলতে বোঝায় প্রধানত: দুটো জিনিষ।

(এক) হাসপাতালের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। যার মধ্যে পড়ে ২৪ ঘণ্টার জন্য এক্স-রে মেশিন, ই. সি. জি. মেশিন, বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগ ও ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু করা।

(দুই) হাসপাতালের ভেতর উপযুক্ত পুলিশী ব্যবস্থা।

**ছুটি :** ভাতাপ্রাপ্ত ডাক্তাদের সারা বছরে ২৩ দিনের 'আর্ণ লিভ' ও ১২ দিনের 'ক্যাজুয়াল লিভ' ছাড়া আর কোন ছুটি নেই। এক্ষেত্রে দাবি হ'ল সপ্তাহে অন্তত: ১ দিন ছুটি দিতে হবে।

**উন্নততর টেলিফোন ব্যবস্থা :** জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে টেলিফোন-যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্মারকলিপিতে এও জানানো হয় যে, ২১ দিনের মধ্যে দাবি মানা না হলে তাঁরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হবেন।

স্মারকলিপি পেশ করার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩০শে নভেম্বর সকাল দশটায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আহ্বানে 'সি. এ. সি'র সদস্যরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে একটি আলোচনায় বসেন। আলোচনায় ভাতাবৃদ্ধির দাবি সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান : Unbudgeted liability" (বাজেট বহির্ভূত দায়!) অন্যান্য দাবি সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেকটা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁকে জানাতে, যাতে —অর্থদপ্তরকে না জড়িয়েই যদি কোন ব্যবস্থা করা যায় ("..... if any local arrangement is possible" without involving finance")। তিনি এও জানালেন যে পরবর্তী কেবিনেট মিটিংএ দাবিগুলি তিনি উত্থাপন করবেন, এবং পরবর্তী কেবিনেট মিটিং এর তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর (অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে

বে) স্থির হয়ে আছে। জরুরী কোন কেবিনেট মিটিং ডাকা যায় কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান : জরুরী কেবিনেট মিটিং কেবল মাত্র জরুরী প্রয়োজনেই ডাকা যায় ("...যেমন কোন বড় ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করতে হলে")। এই দাবিগুলি তেমন জরুরী নয় যার জন্য জরুরী কেবিনেট মিটিং ডাকা যেতে পারে। সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে এই নিষ্ফল আলোচনার পর তিনি জানান যে, নীতিগতভাবে তিনি নিজেও এই দাবিগুলি সমর্থন করেন এবং সেগুলি পূরণ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই আলোচনার কথা সাধারণ ছাত্র ও ডাক্তারদের জানানো হয় এবং এই সময় থেকেই তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে অংশ নিতে শুরু করেন।

একুশ দিনের দিন অর্থাৎ ৪ঠা ডিসেম্বর একটি চিঠিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সি. এ. সির সদস্যদের আরেকবার আলোচনায় বসার জন্য ডাকেন। সি. এ. সির তরফ থেকে জানানো হয় যে, ৫ই ডিসেম্বর সাধারণ ছাত্র ও ডাক্তারদের নিয়ে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ থেকে মিছিল করে, তাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

ঐদিনই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আবার একটা চিঠি আসে (পত্রবাহক : বহুবাজার থানার ও. সি. এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের জনৈক অফিসার) যার সারমর্ম হ'ল : মিছিল করার ব্যাপারটা তিনি স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী চান না এরকম কোন মিছিল বার হোক (কারণ মহানগরীর তৎকালীন অবস্থা!) অবশ্য পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় তিনি (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) সি. এ. সির সদস্যদের তাঁর সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হতে বলেন।

পরদিন সকালের এই বৈঠকে তিনি জানান ভাতা-বৃদ্ধি ছাড়া অন্যান্য দাবিগুলি মেনে নেওয়া হয়েছে (কখন? কোথায়?) এবং সেই দিনই বেলা বারোটায় ভাতা-বৃদ্ধির ব্যাপারে একটা জরুরী কেবিনেট মিটিং ডাকা হয়েছে (যদিও তিনি বলেছিলেন এ ব্যাপারে জরুরী কেবিনেট মিটিং ডাকা সম্ভব নয়)। কেবিনেটের সিদ্ধান্ত জানার জন্য সি. এ. সির সদস্যদের তিনি বেলা ৪-৩০ টায় তাঁর সাথে দেখা করতে বলেন।

বেলা দুটো। পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্র, ইনটার্নী ও হাউসস্টাফরা মিছিল করার জন্য নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে জড়ো হচ্ছেন এমন সময় পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে এই মর্মে একটা চিঠি পাওয়া গেল : মিছিলের উদ্দেশ্যে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে জমায়েত নিষিদ্ধ করা হোল (Assembly inside N. R. S. Hospital for the purpose of procession is prohibited under section 62 (4) of Calcutta Police Act & 39 (4) of Calcutta Suburban Police Act)। উপস্থিত ছাত্র ও ডাক্তাররা আলোচনার পর ঠিক করলেন "আইন" ভেঙে মিছিল তাঁরা করবেন না।

বিকাল ৪-৩০টায় কেবিনেট মিটিংএর সিদ্ধান্ত জানা গেল : স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটা কমিশন গঠন করবেন যার সভাপতি হবেন ডা: অজিত কুমার বসু ; অন্যদুজন সদস্য হবেন— ডা: কে. সি. বসুমল্লিক (Director of Health Service) এবং অর্থদপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। এই কমিশন ভাতা-বৃদ্ধি সম্পর্কিত দাবিটিকে অনুসন্ধান করে দেখবেন। কমিশনের রায় তিন মাসের আগে জানা সম্ভব হবে না। এই রায় অনুমোদন বা খারিজ করার পূর্ণ অধিকার সরকারের থাকবে।

সন্ধ্যা ৬টা। কলকাতা মেডিকেল কলেজে আহূত ছাত্র ও ডাক্তারদের একটি সাধারণ সভায় কেবিনেট সিদ্ধান্ত সকলের বিবেচনার জন্য পেশ করা হ'ল "আইন" দিয়ে মিছিল নিষিদ্ধ করার ঘটনায় ইতিমধ্যেই তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কেবিনেটের এই সিদ্ধান্ত শোনার সাথে সাথেই সেই ক্ষোভ বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ে এবং ঘৃণার সঙ্গে তাঁরা তা প্রত্যাখান করেন।

পরদিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর মিছিল বার করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে সমস্ত মেডিকেল কলেজে ছাত্রধর্মঘট পালিত হয়। হাউস-স্টাফ এবং ইনটার্নীরাও হাসপাতালের বহির্বিভাগে সকাল ৮-৩০ মি: থেকে ১০টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন। অবশ্য ১০টার পর থেকে অতিরিক্ত কাজ করে বহির্বিভাগের সমস্ত রোগীকেই তাঁরা দেখে দেন।

দলমত নির্বিশেষে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আওয়াজ উঠে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের এই ডাক সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বেশীর ভাগ অংশকেও, এ পর্যন্ত আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক খবরাখবর যাঁরা রাখতেন না আর রাখলেও অত্যন্ত নিস্পৃহ ছিলেন, স্পর্শ করে। সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসতে শুরু করেন তাঁরা। ৭ই ডিসেম্বর সমস্ত মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও ডাক্তাররা সামিল হন বিশাল এক মিছিলে (কলকাতার রাজপথে এর চাইতে অনেক বড় মিছিল অহরহ চোখে পড়লেও, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলির এই রকম সম্মিলিত মিছিল সম্ভবত: এর আগে হয়নি)। শ্লোগান উঠে : "জনসাধারণ, ডাক্তার, ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ", "রোগীদের স্বার্থে ডাক্তাররা লড়ছে লড়বে"।......অনভিজ্ঞ আর সংকোচে ভরা কণ্ঠস্বরগুলি ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণতা লাভ করে..."ডাক্তাররা পথে কেন, সরকার তুমি জবাব দাও"...আরও দৃঢ় আরও শানিত হয়ে উঠতে থাকে মিলিত কণ্ঠের

এই আন্দোলনের ইতিবাচক অবদানগুলি হ'ল :

এক) আমাদের দেশের অন্যান্য পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মত, মেডিকেল কলেজগুলিতেও কর্তৃপক্ষেরই হাতে তৈরী এবং সযত্নে সংরক্ষিত এমন একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ আছে যা ছাত্রছাত্রীদের সৎ এবং সুস্থ মানবিক গুণগুলির বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, অসুস্থ ও বিকৃত মূল্যবোধের জোয়ারে তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অসচেতন ভাবে অনেক ছাত্রছাত্রীই এর শিকার হ'ন; তাঁদের সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়ে যায়। গড়ে ওঠে ভিত্তিহীন অহমিকা ও ঘৃণ্য স্বার্থপরতার একটি কলুষিত পরিবেশ, পরবর্তীকালে যা গোটা চিকিৎসক সমাজকে সাধারণ মানুষদের থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। চিকিৎসক তাঁর সামাজিক কর্তব্যকে ভুলে যান, ডাক্তার ও রোগীর পারস্পরিক সম্পর্ক একটা তিক্ত চেহারা নেয়।

ডাক্তার ও ডাক্তারী-ছাত্রদের সাম্প্রতিক এই আন্দোলন এই কলুষিত পরিবেশের প্রতি সরাসরি আঘাত হেনেছে। নিজেদের ও রোগীদের স্বার্থে এই আন্দোলনে সামিল হবার পর ডাক্তার ও ছাত্রদের এক বিরাট অংশ উপলব্ধি করেন—ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন ছাড়া এ আন্দোলন এক পাও এগোতে পারে না। সি. এ. সি-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রচারপত্রগুলির ('বীক্ষণ', নবম সংকলন দ্রষ্টব্য) সবকটিই তাঁদের এই নবলব্ধ উপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করে। এই উপলব্ধির তাঁদের পথে নামিয়েছিল, বিভিন্ন পথসভার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন তাঁরা। গড়ে উঠতে শুরু করে ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে একটা নতুন সম্পর্ক, অদ্ভুত ঐক্য।

একসাথে কাজ করার মধ্য দিয়ে, শুধুমাত্র নিজেদের কলেজের মধ্যেই নয়, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের সাধারণ ছাত্র ও ডাক্তাররা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মেডিকেল কলেজগুলিতে বর্তমান স্বার্থপরতা ও হীন প্রতিযোগিতার কলুষিত পরিবেশের পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের একটা নির্মল পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন।

দুই) এ আন্দোলন বিশেষ কোন রাজনৈতিক মত বা গোষ্ঠীর অনুগামীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমস্ত দল ও মতের ছাত্র ও ডাক্তাররাই এতে সামিল হয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলার ছাত্র আন্দোলনে আজ যেখানে দল ও মতের প্রশ্নটির এত প্রাধান্য এবং যার অবিশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ছাত্র সমাজ আজ পারস্পরিক হানাহানি ও কলহের শিকার—সেখানে ডাক্তার ও ডাক্তারী ছাত্রদের আন্দোলনে ঐক্যের উপরোক্ত চেহারাটা নিঃসন্দেহে পশ্চিমবাংলার ছাত্রসমাজের সামনে একটা আদর্শ উদাহরণ স্বরূপ।

তিন) দাবি ন্যায়সঙ্গত হওয়াটাই যে তা পূরণ হওয়ার যথেষ্ট শর্ত নয়, সংগ্রামই তা পূরণ হওয়ার একমাত্র শর্ত—এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে অংশগ্রহণকারীরা এটা উপলব্ধি করেছেন। একটা করে দিন গেছে আর একটু করে এই উপলব্ধি তাঁদের মনের গভীরে শেকড় গেড়েছে, লড়াইয়ের মনোভাব হয়ে উঠেছে আরও আপোষহীন : "Our Demands Are Just, We Hate Consideration".

কিন্তু এত সম্ভাবনা, এত ইতিবাচক দিকের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই আন্দোলন যে শেষ পর্যন্ত এই লজ্জাজনক পরিণতি লাভ করলো, তার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল, নেতৃত্বের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অন্য অংশের দৃঢ়তার অভাব।

সি. এ. সি. যাঁদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, তাঁদের কেউই সংগ্রামের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়ে যান নি। কি ছাত্র, কি ডাক্তার, প্রায় সব ক্ষেত্রেই এঁরা ছিলেন মনোনীত ব্যক্তি (নির্বাচিত নয়)। আর এই মনোনয়নও কোন ধরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে হয়নি। ফলে একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই নেতৃত্বের ভূমিকায় এমন অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রবেশ ঘটেছিল, প্রতি পদক্ষেপেই যাঁরা ভেতরে থেকে আন্দোলনকে দুর্বল করার অপচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যে সব কলেজ থেকে মূলতঃ এ ধরণের ব্যক্তিরাই সি. এ. সি. তে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সেইসব কলেজগুলিতে সাধারণ ছাত্র ও ডাক্তারদের আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনার ব্যাপারে ঐ নেতৃত্বের কোন ভূমিকা ছিল না। গোড়ার দিকে নেতৃত্ব সেখানে পুরোপুরি নিষ্ক্রয়ই ছিলেন। এমন কি সেক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্র ও ডাক্তাররা যখন তাঁদের নিজেদের উদ্যোগেই এগিয়ে এলেন তখনও ছাত্র ও ডাক্তারদের পরিচালিত করার ব্যাপারে এইসব সদস্যদের ভূমিকা ছিল একই রকম।

আর অপর অংশটির চরিত্রে যথেষ্ট সততা থাকা সত্ত্বেও, বিপুল এই আন্দোলনকে তার সফল পরিণতির দিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো অভিজ্ঞতা এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন না তাঁরা। নিজেদের অনভিজ্ঞতার জন্যই তাঁরা কখনও শত্রুর শক্তিকে ছোট করে নিজেদের শক্তিকে বড় করে দেখেছেন আবার কখনও উল্টোটাই করেছেন। আন্দোলনের গোড়া থেকে শত্রুকে ছোট করে দেখার ফলে—তাঁদের মধ্যেই শক্তি সমাবেশের মধ্য দিয়ে শত্রু যে তাঁদের আন্দোলনকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করবে, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক

ছিলেন না তাঁরা। আর শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা এটা খেয়াল করলেন তখন শত্রুর শক্তিকে এত বেশী বড় করে দেখতে লাগলেন যে সাধারণ ছাত্র ও ডাক্তারদের শক্তির উপর তাঁদের আর আস্থা রইলো না। ফলে সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে, সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে শত্রুর হুমকি আর ভীতিপ্রদর্শনের মুখে তাঁদের সমস্ত দৃঢ়তা, সমস্ত মনোবল অমোঘ নিয়মেই যেন ভেঙে পড়লো। "বাঁচাবার" এবং "বাঁচবার" দাবিতে সংগঠিত এই আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত "বাঁচবার" দাবি আংশিকভাবে পূরণ হলেও "বাঁচাবার" দাবিগুলিকে শুধুমাত্র ভিত্তিহীন অস্পষ্ট "আশ্বাস" আর "বিবেচনার" ওপর ছেড়ে দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হ'ল। ফলে সাধারণের চোখে অবস্থাটা যা দাঁড়াল তা অত্যন্ত দুঃখজনক—"বাঁচবার" দাবিগুলিকে পাওয়ার জন্যই যেন "বাঁচাবার" দাবিগুলিকে হাজির করা হয়েছিল—কর্তৃপক্ষ যা বারবার এ আন্দোলন সম্পর্কে প্রচার করেছে।

অবশ্যই নেতৃত্বের এই দুর্বলতাগুলি সাধারণভাবে মেডিকেল কলেজগুলির সাধারণ ছাত্র ও ডাক্তারদের পেছিয়ে থাকা চিন্তারই প্রতিফলন মাত্র। নেতৃত্বের মতন তাঁদেরও কোন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে তাঁরা নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। নেতৃত্বের ভুল পদক্ষেপগুলিকে দেখিয়ে দিয়ে সেগুলি দৃঢ়তার সঙ্গে সংশোধনের চেষ্টা বা নেতৃত্বের বিপথগামী অংশকে অপসারিত করে সফল বিকল্প নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি তাঁরা।

আন্দোলনের বর্তমান পরিণতির আরেকটি অবশ্যম্ভাবী কারণ, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলির চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারী, নার্স এবং সাধারণ কর্মচারীদের এই আন্দোলনের স্বপক্ষে টেনে আনতে পারা যায় নি। শেষের দিকে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে এই প্রচেষ্টা শুরু হলেও, মাঝপথে আন্দোলনের এই পরিসমাপ্তির ফলে, কোন রকম নির্দিষ্ট চেহারা নেবার আগেই অঙ্কুরেই এই প্রচেষ্টার ছেদ পড়ে

কোন সামাজিক আন্দোলনই শেষ বিচারে পুরোপুরি ব্যর্থ হতে পারে না। পরিণতির দিক থেকে যতই লজ্জাজনক হোক না কেন, সেই একই বিচারে ডাক্তার ও ডাক্তারী-ছাত্রদের সাম্প্রতিক আন্দোলনও পুরোপুরি ব্যর্থ হতে পারে না। বর্তমান আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ও ডাক্তারী-ছাত্ররা, আগামী দিনের আন্দোলনগুলির ক্ষেত্রে সেগুলিকে সফলভাবেই কাজে লাগাবেন তাঁরা—এবারের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি তখন আর হবে না। এ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে সেই প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের জন্ম অবশ্যম্ভাবীভাবেই দিতে পারবেন তাঁরা, যে নেতৃত্ব শত্রুর হুমকি, প্রলোভন আর ভীতিপ্রদর্শনের মুখে আজকের মত ভেঙে পড়বে না। বাঁচাবার এবং বাঁচবার দাবি সেই দিনগুলিতে অবশ্যই সমান গুরুত্ব লাভ করবে।

# বিক্ষুব্ধ শিক্ষা জগৎ

**দেশ :**

"শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়" পাঞ্জাব পুলিশ গত ৭ই জানুয়ারী কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। আন্দোলনরত কৃষি-ইনস্পেক্টারদের সমর্থনে ছাত্ররা রাজ্যব্যাপী একদিনের ছাত্রধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন।

## ছাত্র

গত ১০ই জানুয়ারী চণ্ডীগড়ে এক হাজারেরও বেশী ছাত্রের একটি মিছিলকে 'ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ দু'বার লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস চালায়। ১১৭ জন ছাত্রকে পুলিশ হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন পাতিয়ালায় ৬০০ জন বিক্ষোভকারী ছাত্র থানা 'আক্রমণ' করেন। এ ক্ষেত্রে পুলিশ লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে।

● প্রধানমন্ত্রীর সফরের সময় "নিরাপত্তার" জন্য বারাণসীর সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সরকার-বিরোধী আন্দোলন চলানোর জন্য গত সপ্তাহে আয়ুর্বেদ কলেজের ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে
৭ই জানুয়ারী বেরিলী শহরে কার্ফু জারী করা হয়। 'রোহিলখণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে'র দাবি জানিয়ে এক ছাত্রজনতা মুখ্যমন্ত্রী বহুগুণার একটি সভা পণ্ড করে দেয়। ছাত্র সমেত ৩৬ জনকে আটক করা হয় বেরিলীতে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে বাদায়ুণের ছাত্ররা জেলাকংগ্রেস কমিটির অফিস ভেঙে দেন। ১২ই জানুয়ারী-চান্দুসী শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। পুলিশের অভিযোগ ছাত্ররা চারটি রাইফেল, ১০০ রাউণ্ড গুলি-বারুদ "দখল" করেছে।

● বোম্বাই ভেটেরিনারী কলেজ ছাত্রদের ধর্মঘট গত ১৫ই ডিসেম্বর প্রত্যাহৃত হয়েছে। শিক্ষার সুব্যবস্থার দাবিতে তাঁরা এর আগের দিন ৯৫টি ভেড়াকে 'ঘেরাও' করেন। এই প্রাণীগুলিকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে মরিসাস পাঠানো হচ্ছিল। ছাত্ররা বলেন—তাঁরা জনগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার জন্য এই আন্দোলন করেছিলেন, কারণ তাঁরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য একটি ভেড়াও পান না।

● এক চুক্তির পর ২৭শে ডিসেম্বর মারাথাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংস্থা (MUSA) তাঁদের ১৫ দিনব্যাপী ছাত্রধর্মঘট তুলে নেন। গত ১৪ই ডিসেম্বর উপাধ্যক্ষকে তিন ঘন্টারও বেশী সময় ধরে ঘেরাও

করে এ বছরের কি মজুবের দাবি জানান। কারণ ১৯৭২ সালের এই এলাকা খরায় দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

● গত ৩০শে ডিসেম্বর রাতে এক বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিলচর সার্কিট হাউস ঘিরে ফেলেন, সেখানে আসামের শিক্ষামন্ত্রী অবস্থান করছিলেন। "ইট ছোঁড়া" ও ছাত্রমিছিলে নেতৃত্ব দেবার 'অভিযোগে' পুলিশ একজন ছাত্রী ও দুজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ইঁট ছোঁড়ার ঘটনাকে অস্বীকার করে, কাছাড় ছাত্র ইউনিয়ন সরকারের ভাষানীতির নিন্দা করেন। তিনজন ছাত্রী সমেত বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আহত হন।

● বিহারের তিনটি মেডিকেল কলেজ—পাটনা, রাঁচি ও দারভাঙ্গার হাউসস্টাফদের আন্দোলনের ফলে স্বাস্থ্যমন্ত্রক উক্ত কলেজগুলিতে ছুটি ঘোষণা করেছে। গত ৬ই ডিসেম্বর ধর্মঘট শুরু হলে, ছাত্ররাও এই আন্দোলনে যোগ দেন। সরকার অধিকাংশ দাবি মেনে নিলে, ৬ই জানুয়ারী এই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়।

● **পশ্চিমবাংলা :** ৫ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে **উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের** ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ১৪টি বাসকে আটকে রাখেন। ১২ই জানুয়ারী ছাত্ররা জানান যে সাটেল বাস প্রত্যাহার করার ফলে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় যেতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। খবর পেয়ে সংস্থার উচ্চপদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে এসে সাটেল বাস চালু করার আশ্বাস দেন। **কল্যাণী** বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের ছাত্র ও কর্মচারীরা ২০শে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বিভক্তিকরণ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন। **কলকাতা** বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র গত ৯ই জানুয়ারী বিক্ষোভ দেখান। অসম্পূর্ণ ফল প্রকাশের দাবিতে তাঁরা পরে উপ-উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৮ই জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ **বিষ্ণুপুর** বেসিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে অনশন করছেন। **উত্তরবঙ্গ** বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মতান্ত্রিক অচলাবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে **মালদহ** কলেজের ছাত্ররা অনশন ধর্মঘট করেন। **দুর্গাপুর** অঞ্চলে নিয়মিত বাস চলাচলের দাবি জানিয়ে স্থানীয় ছাত্ররা গত উনিশে ডিসেম্বর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

**বিদেশ :**

১৪ই জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে **ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায়** একজন ছাত্র মারা যান। কেবল মুনাফা লোটার জন্য জাপানী কোম্পানীগুলির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করছিলেন। ৫০০০ ছাত্র যখন প্রেসিডেন্টের মারদেকা প্রাসাদ অভিমুখে এগুচ্ছিলেন (সেখানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তানাকা সুহার্তোর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন) পুরোপুরি যোদ্ধসাজে সজ্জিত ১০০০ সৈন্য ট্রাকে চড়ে তাঁদের বাধা দেন। ১৯৬৫ সালের পর এই প্রথম কার্ফু জারী করা হয়। তানাকা তাঁর সফরসূচী বাতিল করতে বাধ্য হন।

● "ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী ফিরে যাও" ধ্বনিতে মুখরিত হাজার হাজা ছাত্র ব্যাংককের রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ দেখান। গত ৯ই জানুয়ার জাপানের প্রধানমন্ত্রী তানাকা এই ছাত্র-প্রতিবাদের মুখোমু হন। ছাত্রদের মতে এই বিক্ষোভ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা পোষ্টার হাতে হোটেল ও বিমান বন্দরের রাস্তা অবরো করেন। পরে ৭ জনের এক প্রতিনিধিদল জাপানী রাষ্ট্রদূতের হাে দাবিপত্র পেশ করেন। ঐদিনই থাই ছাত্ররা মার্কিন দূতাবাসে সামনে একটি কালো মালা প্রতীক হিসেবে রেখে আসেন। মাতৃভূমি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সিয়ার (CIA) হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দেন।

● ছাত্রসংসদ গঠনের দাবিতে **পাকিস্তানের** পেশোয়ার বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখান। গত ১৪ই জানুয়ারী প্রদেশে রাজ্যপাল প্রতিশ্রুতি দেন যে ছাত্রদের দাবি বিবেচনার জন্য একা কমিটির কাছে পেশ করা হবে।

**শিক্ষক**

গত ১৪ই জানুয়ারী বেতনসীমা নির্দ্ধারণ, মহার্ঘভাত বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিতে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ২৩০টি কলেজের ২০০ জনেরও বেশী শিক্ষক-শিক্ষিকা সহাকরণ অভিযানে সামিল হন। পরেরদিন **সারা ভারত বিশ্ববিদ্যাল ও কলেজ শিক্ষক ফেডারেশনের** আহ্বানে কর্মবিরতি পাল করা হয়। WBCUTA-র পক্ষ থেকে জানানো হয় যে পরবর্তী ধাপ অনুযায়ী যদি শিক্ষকদের আইন অমান্য, অনির্দিষ্টকালে জন্য কর্মবিরতি করতে হয়, সেক্ষেত্রে সব দায়িত্ব সরকারের উপ বর্তাবে। **উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, দিল্লী, পাঞ্জাব, রাজস্থান হরিয়াণার** কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঐদিন ক্লাসে যোগ দেননি।

● **পাঞ্জাব** সাবঅর্ডিনেট সার্ভিস ফেডারেশনের সরকারী স্কু শিক্ষকরা গত ৯ই জানুয়ারী প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। ছাত্ররাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

● **নদীয়া** জেলার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রায় ১০০ জন বেকার শিক্ষক ১১ই ডিসেম্বর থেকে তেরোদিন ধরে পালাক্রমে অনশ চালিয়ে যাচ্ছেন। **যাদবপুর** প্রিন্টিং টেকনোলজির লেকচারার ও অশিক্ষক কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী আচরণের বিরুদ্ধে গত ৭ই জানুয়ারী থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন শুরু করেছেন

**কর্মচারী**

গত ৪ঠা জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা সিন্ডিকেট সদস্যদের কাছে গণডেপুটেশন করে যান। ছুটির দিন সাতাশ থেকে সাড়ে ছেচল্লিশ দিন করা বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানান।

[দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গুজরাট-ছাত্রদের আন্দোলন এখন চলতে থাকায় তা' পরবর্তী সংকলনে প্রকাশিত হবে।]
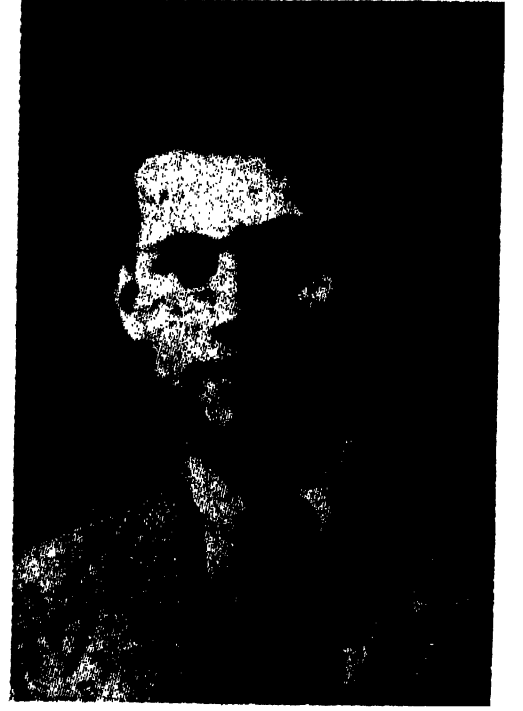
# ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস

জাতির এক মহান সন্তানের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র

দানিয়েল লতিফি

[ 'বীক্ষণে'র পাতায় ধারাবাহিকভাবে ডাঃ নরমান বেথুনের জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু বেথুনের মতোই নিপীড়িত মানবজাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ভারতেরই এক মহান সন্তানের নাম আজো আমাদের স্বদেশবাসীদের কাছে প্রায়-অপরিচিত থেকে গেছে; তিনি হলেন ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস। যে আদর্শবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বেথুন একটি পরাধীন জাতির সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন সেই আদর্শবোধই ডাঃ কোটনিসকে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর চীনে। যে প্রক্রিয়া বেথুনকে রূপান্তরিত করেছিল কিংবদন্তীর নায়কে সেই একই প্রক্রিয়া ডাঃ কোটনিসকে আমূল পাল্টে একটি ভিন্ন দেশের কোটি কোটি জনগণের হৃদয়ে অক্ষয় স্মৃতির আসনে বসিয়েছে। কোটনিস মারা গেছেন, কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন, দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অগণিত জনগণের হৃদয়ে, প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ববোধের অনির্বাণ শিখা!

ডাঃ কোটনিসের জীবনকে আদর্শ হিসাবে সামনে রেখে আমাদের দেশের কিশোর ও যুব-ছাত্ররা এগিয়ে যাবেন —এই বিশ্বাস থেকেই আমরা বর্তমান রচনাটি প্রকাশ করছি। — সঃ মঃ বীঃ ]

কোটনিস, আমাদের সব অসুখ সারিয়ে দেবেন—এমন, প্রতিশ্রুতি কখনো দেননি, এমন দাবিও তিনি করেননি। কিন্তু এমন এক দরজার চাবি আমরা তাঁর কাছে পাই, যার ওপারে রয়েছে এক পথ—খাড়া আর পাথুরে, তবু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চললে সেই পথই আমাদের পৌঁছে দিতে পারে এর চাইতে অনেক ভালো অবস্থায়।

১৯১০ সালের ১০ই অক্টোবর, মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে দ্বারকানাথ কোটনিসের জন্ম হয়। তাঁর বাবা, শান্তারাম কোটনিস স্থানীয় একটি 'মিল'-এ কাজ করতেন। এছাড়াও, তিনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের হয়ে বিনা বেতনে কাজ করতেন। অনেক বছর ধরে শোলাপুর-পৌরসভার সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি।

শান্তারামের ইচ্ছে ছিল ছেলেকে ডাক্তার করার। শেষ পর্যন্ত তাঁর ছেলে-মেয়েদের তিনজন, দ্বারকানাথ আর দুই মেয়ে ডাক্তার হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

তাই, প্রথমে গোবর্দ্ধন দাস সুন্দরদাস এবং পরে গ্রান্ট মেডিকেল কলেজ, বোম্বে প্রেসিডেন্সীর তখনকার দিনের এই দুই নাম করা মেডিকেল কলেজে দ্বারকানাথের পড়ার খরচ চালানোর জন্য শান্তারাম কোটনিস অনেক কষ্ট করে কিছু টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন।

## চীনের উদ্দেশ্যে মেডিকেল মিশন

যথা সময়ে দ্বারকানাথ চিকিৎসা বিদ্যায় স্নাতক হলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর

গৌরবময় সভাপতিত্বের সময়ে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু চীনে একটি ভারতীয় মেডিকেল মিশন পাঠাবার যে প্রস্তাবটি করেছিলেন কংগ্রেস তা' গ্রহণ করে।

বাবার আশীর্বাদ নিয়ে দ্বারকানাথ স্বেচ্ছায় এই মিশনে যোগ দিলেন। বৃদ্ধ শান্তারাম জানতেন দ্বারকানাথ চলে গেলে তাঁর উপর সংসারের বোঝা আরো ভারী হবে। কিন্তু ছেলেকে কোনভাবেই তিনি নিরুৎসাহ করেন নি।

১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে 'পি এণ্ড ও এস্‌· এস্‌. রাজপুতান' জাহাজে মিশনটি চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। বিদায়-সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শান্তারাম এলেন বোম্বাইয়ের বালার্ড জেটিতে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করলেন সরোজিনী নাইডু। জাহাজ ছাড়ার আগে ছেলেকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন শান্তারাম। মিশনের সদস্য ছিলেন—(১) এলাহাবাদের ডাঃ এম. অটল, দলনেতা ; (২) নাগপুরের ডাঃ এম. চোলকার, সহ-নেতা ; (৩) ডাঃ ডি. এস্‌. কোট্‌নিস · এবং কোলকাতার (৪) ডাঃ ডি মুখার্জী ও (৫) ডাঃ বিজয় বসু।

মিশনটিকে নিয়ে জাহাজ এসে ভীড়লো হঙ্‌কঙে।

### বাবার মৃত্যু

দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল যাত্রার শেষে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে মেডিকেল মিশনের সাথে ডাঃ কোটনিস ক্যান্টন হয়ে চীনের যুদ্ধ-কালীন রাজধানী চুঙ্‌কিঙে-এ পৌছালেন। সেখান থেকে যখন তাঁরা ইয়েনানের সীমান্তবর্তী যুদ্ধ-অঞ্চলগুলির দিকে অগ্রসর হতে যাবেন সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ডাঃ কোটনিস শোলাপুরে তাঁর বাবার মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদটি পেলেন। চতুর্দিকেই মৃত্যু। তাঁর চারপাশের নির্যাতিত মানবতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে পারেন না কোটনিস। তাঁর এই মানবতাবোধ ১৯৩৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী তাঁর ভাই মঙ্গেশকে লেখা তাঁর চিঠিখানিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে,—এই দিনটিতেই তিনি বাবার মৃত্যুর সংবাদটি পেয়েছিলেন :—

"মর্মান্তিক এই সংবাদ সহ্য করা আমার পক্ষে খুব একটা কষ্টকর হয়নি।"

ডাঃ কোটনিস লিখছেন—

"এই তো গতকালই, প্রথম বার এই শহরে বোমা পড়লো—আর সাথে সাথেই মৃত্যু হ'ল ৫০ জনের। নারী, পুরুষ আর নিষ্পাপ শিশুদের এই মৃতদেহগুলো ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে টেনে বার করতে দেখলাম আমি। তারা কি এমন দোষ করে ছিল বলো, যার জন্ত এই মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হতে হ'ল তাদের? 'অনুগামী মেষশাবকের জন্ত যিনি ঠাণ্ডা বাতাসকে দমন করেন' সেই পরমপুরুষটি তখন কোথায় ছিলেন? নিঃস্বকে একমাত্র কম্বলখানি দান করে যে মহান মানুষটি প্রবল শীতে কাঁপতে কাঁপতে মারা গেল, তাকে রক্ষা করার জন্ত কি করেছেন তিনি? সব চাইতে দুঃখিনী আমাদের মাকে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করো।"

দলনেতা ডাঃ অটল তাঁকে ভারতে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলে তিনি এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন, "চীনে অন্ততঃ এক বছর কাজ করবো বলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরে যেতে পারি না।" ১৯৩৯ সালের ২১শে জানুয়ারী ইয়েনান সীমান্ত এলাকার পথে উত্তর-গামী এক সারি ট্রাকে এই মিশন চুঙ্‌কিঙ্‌ ছেড়ে যায়। ডাঃ বসু বলেন, সেই দিনটিতে কোটনিসের বিষাদ-মাখা মুখ আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

### সীমান্ত অঞ্চলে

১৯৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর—মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত ডাঃ কোটনিস চার বছর ধরে চীনে কাজ করে গেছেন। তাঁর কাজের রেকর্ড থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই ক' বছরে ডাঃ কোটনিস চিকিৎসক হিসেবে, চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে এবং নেতা হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছিলেন। বিশ্বের একটি সুবিখ্যাত সেনা-বাহিনীর সেবায় নিয়োজিত একটি মেডিক্যাল সংগঠনের সচেতন স্থাপতি হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

তাঁর সহজাত মেধা, নিঃসন্দেহে যা বিকশিত হয়েছিল তাঁর বোম্বাইয়ের শিক্ষকদের দ্বারা ; প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর মানবতা-বোধের চেতনার স্পর্শে, গভীর হয়েছিল বিখ্যাত অষ্টম রুট-বাহিনীর সঙ্গে ক্ষেত্রের অমিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যুদ্ধ-পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছিল চীনে। বিপ্লবী যুদ্ধের আগুন আর বুলেট তরুণ এই মারাঠী চিকিৎসকের মধ্যে এনে দেয় এক দৃঢ় মানসিকতা. চিকিৎসা আর শল্য-বিজ্ঞানের কলা-কৌশলে তাঁকে নিপুন পারদর্শী করে তোলে।

### চিকিৎসকের ভূমিকায়

চীনা কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ১৯৪১ সালে তাঁকে উত্তর চীনের আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতালের প্রধান এবং চীনা জনগণের সংগ্রামে আত্মদানকারী কানাডার ডাক্তার, বীর নরমান বেথুনের নামে গড়া বেথুন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করা হয়।

১৯৪২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী কোটনিস তাঁর বন্ধু ডাঃ বসুকে লেখেন :—

"সার্জিক্যাল বেডের রোগীদের দেখা শোনা করা ছাড়াও হাসপা-তালের প্রধানের পদে নিযুক্ত থাকার সূত্রে আমাকে পরিচালনার

কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে, যা বেশ ভালো রকমই ব্যস্ত রাখছে আমাকে। আমার ডাক্তারী কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে—সার্জিক্যাল বেডের রোগীদের দেখাশোনা করা, অপারেশনের কাজগুলো করা এবং অপারেশন থিয়েটারে ছাত্রদের প্র্যাক্টিক্যাল-কাজে সাহায্য করা। গড়ে আমরা দিনে দুটো করে অপারেশন করছি, এবং স্বভাবতঃই হাসপাতালে রোগীদের আসা-যাওয়ার হার যথেষ্ট বেশী। সারা বছরে আমরা মোট ৪৩০টি সার্জিক্যাল অপারেশন করেছি, তার মধ্যে ছিল ৪৫টি অঙ্গ-বিচ্ছেদ, ২০টি হার্নিয়া, ৩৫টি লাম্বার প্রিসাক্রাল প্যারা-মিস্‌প্যাথেকেটামিস এবং গোটা কয়েক স্ত্রী-রোগ সংক্রান্ত অপারেশন। আমি যে কাজটা এখানে করছি তা' সংক্ষেপে হ'ল এই...যদিও চিকিৎসাবিদ্যার বৈজ্ঞানিক দিকটিতে বিশেষ কিছু অগ্রগতি করার উপায় নেই এখানে, তবুও সার্জিক্যাল কৌশলের ক্ষেত্রে আমি নেহাৎ কম এগোইনি।"

চিকিৎসা বিদ্যার বৈজ্ঞানিক দিকটিতে বিশেষ কিছু অগ্রগতি করতে পারেননি বলে যে কথা কোটনিস বলেছেন সেটা নেহাৎ বিনয়ের কথা। তত্ত্ব ও প্রয়োগের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলেই বিজ্ঞান এগোয়। যে ধরনের অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে ডাঃ কোটনিসকে কাজ চালাতে হতো, তা নিঃসন্দেহে তাঁকে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও তত্ত্বের সৃজনশীল প্রয়োগের পথে এগিয়ে দিয়েছিল, যদিও গোড়ার দিকে তিনি সম্ভবতঃ এ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। দু'জন ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক লিখেছেন :—

"এই সব হাসপাতালগুলিতে অত্যন্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলিকে যে রকম নিপুনভাবে ভালো কাজে লাগানো হচ্ছে তা' দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর বিছানাগুলি আর কিছুই না, ধ্বংসপ্রাপ্ত কুঁড়েঘরগুলোর ভাঙা দরজার চার কোনে ইঁট রেখে সেগুলো বানানো হয়েছে আর খড়ের পুরু আস্তরণ মাদুরের জায়গা করে নিয়েছে। ওষুধপত্রের গুঁড়ো আর বড়িগুলো রাখা হয়েছে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ক্যানভাসের মোড়কে। বোতলগুলো রাখা হয়েছে বিশেষভাবে তৈরী ভাঁজকরা বাক্সে' যাতে বাক্সটা বন্ধ করলে খচ্চরের পিঠে চাপানো যায়। যখন কাজে লাগানো হচ্ছে না তখন যন্ত্রপাতিগুলো প্যাকিং বাক্সে রাখা থাকে। সঙ্কেত পেলেই পুরো হাসপাতালটিকে বেঁধে-ছেঁদে আধঘণ্টার মধ্যেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।" ("ক্লেয়ার ও উইলিয়াম্‌স ব্যাণ্ড এর লেখা 'ড্রাগনের দাঁত', লণ্ডন, ১৯৪৭ থেকে উদ্ধৃত)

## রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ

জীবন-ধারাকে পরিবর্তিত করার দৃষ্টিকোন থেকে ১৯৪১ সালটি ছিল ডাঃ কোটনিসের জীবনে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বছর। ১৯৪২ সালের ৪ঠা জানুয়ারীতে ডাঃ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে একথা তিনি উল্লেখ করেছেন :—

"গত বছরে আমার সব চাইতে বড় সাফল্য হ'ল আমার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। তুমি তো খুব ভালো করেই জানো, ইয়েনানে আসার আগে রাজনীতিগতভাবে কত পিছিয়ে-পড়া ছিলাম আমি। বিপ্লবী আবেগে ভরপুর হলেও আমার মাথাটা ছিল বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণায় ঠাসা। বিপ্লবী কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না আমার। এক বছরেরও বেশী কাল ধরে এখানে থাকার সময়, অষ্টম রুট বাহিনীর একজন সৈনিকের জীবন যাপন করতে গিয়ে এবং মিটিং ও ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার সময় সদা সর্বদা আমার সহযোদ্ধাদের সমালোচনার ফলে আমার ধ্যান-ধারণা ও চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন নিজেই অনুভব করতে পারছি আমি। তাই আমি ১৯৪১ সালটিকে আমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বছর বলে মনে করি।"

চীনারা এত দিনে ডাঃ কোটনিসের সম্বন্ধে খুব উঁচু মূল্যায়ন করতে শুরু করেছে। তাঁকে পরবর্তী যে কাজের ভার দেওয়া হ'ল তার থেকেই এটা বোঝা যায়। ১৯৪২ সালের জুন মাসে ডাঃ কোটনিস বসুকে লিখছেন :—

"সম্প্রতি আমাকে 'ডাক্তারী ক্লাসের' জন্য সার্জারীর উপরে একটা বই লিখতে বলা হয়েছে স্কুল থেকে। প্রতিদিন আমার সময়ের বেশ খানিকটা বেরিয়ে যাচ্ছে এই কাজটাতে; কারণ আমাকে শুধু যে লিখতে হচ্ছে তা নয়, চীনা ভাষায় অনুবাদও করতে হচ্ছে।"

কোটনিস সম্পর্কে এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে ক্লেয়ার ও ব্যাণ্ডস লিখছেন—

"নিয়মিত চীনা ভাষায় বক্তৃতা দেবার মতো ভালোরকম ভাষাটাকে রপ্ত করেছেন তিনি। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের লাগোয়া এলাকার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে বিরামহীন ভাবে হাসপাতালের কাজ ও শিক্ষকতা দুটই তিনি কঠোর পরিশ্রমের সাথে চালিয়ে যাচ্ছেন চার বছর ধরে। এই কাজে একমাত্র বিরতি তিনি দিয়েছিলেন যখন জাপানীরা একবার আগা-পাস্তলা 'ঝাঁকুনি দিতে' এসেছিল এই অঞ্চলটাতে। কিন্তু সেটা যে, তাঁর পক্ষে 'পিকনিকের' মতো সুখকর বিশ্রাম ছিল তা নিশ্চয়ই বলা যায় না।" (ক্লেয়ার ও উইলিয়াম ব্যাণ্ডস)

কোটনিসের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাণ্ডসরা লিখেছেন :—

"কোটনিস ছিলেন একজন সুদক্ষ তরুণ ডাক্তার। উন্নাসিকতা আর স্বার্থপরতা—এ দুটো জিনিসকে তাঁর চারিত্রিক গঠনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যেতো না। জাতি, বংশ বা কৌলিন্যের কৃত্রিম বেড়া স্বীকার করতেন না তিনি। সাহসিকতাপূর্ণ জীবনের মধ্য দিয়ে যে মানবিক সত্ত্বা গড়ে ওঠে, তাকেই তিনি সর্বাধিক মূল্য দিতেন।"

(ক্লেয়ার ও ব্যাণ্ডস্)

## বিবাহ

এই সময়ে অন্য একটি ঘটনা ঘটলো, যা ব্যক্তিগত হলেও যে আন্তর্জাতিকতাবোধের আদর্শে এই 'মিশনটি' উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তারই সাঙ্কেতিক প্রকাশ ঘটেছিল ঘটনাটিতে।

একজন চীনা মহিলার প্রেমে পড়লেন ডাঃ কোটনিস, যাঁকে তিনি পরে বিবাহ করেন। তিনি হলেন কুও চিঙ্ লান। ডাঃ বসু তাঁকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবে :

প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চতার, চাঁদের মতো মুখ, পুরু চশমা চোখে হাসি-খুশী, আকর্ষণীয় সপ্রতিভ মেয়েটি। ডাঃ কোটনিস যে মেডিকেল স্কুলটির অধ্যক্ষ ছিলেন তার নার্সিং বিভাগের শিক্ষিকা ছিলেন তিনি।

এখনকার পিকিং-এর এক ধনী পরিবারের মেয়ে ছিলেন কুও চিঙ্ লান। শিক্ষা পেয়েছিলেন ইউনিয়ন মেডিকেল কলেজ থেকে। যুদ্ধ শুরু হবার পর অন্যান্য হাজার হাজার মানুষের মতো পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তিনি এবং জাপানীদের হাত এড়াতে কয়েকশো' মাইল হেঁটে শেষ পর্যন্ত অষ্টম রুট বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি এবং ডাঃ কোটনিস ১৯৪১ সালের ২৪ শে নভেম্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কুও চিঙ্ লানকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে আসার সম্পর্কে ১৯৪২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী ডাঃ বসুকে ডাঃ কোটনিস লিখছেন :—

"এই সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে আমাকে যে পরিমান ভাবতে হয়েছে তা শিরঃপীড়া ঘটবার পক্ষে যথেষ্ট। সব থেকে মজার কথা, বিয়ের সপক্ষে যে যুক্তিটি পাল্লা ভারী করছিল সেটি হ'ল, তুমি যাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলে এবং সীমান্ত-অঞ্চল সরকারের কাউন্সিলার নিযুক্ত হয়েছিলে—ইয়েনানে গঠিত সেই 'প্রাচ্য-জাতি সমূহের ফ্যাসীবিরোধী সমিতি' ( Anti Fascist Association of Eastern Nations )।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—এই বিবাহকে প্রেরণা জুগিয়েছে, মুক্তির জন্য সংগ্রামরত প্রাচ্যের জাতিগুলির সংহতি-চেতনার উষ্ণ আবেগ।

চীনে বিয়ে করলেও ডাঃ কোটনিস কিন্তু ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র এবং মাতৃভূমির প্রতি তাঁর ভালোবাসা হারান নি।

১৯৪২ সালের জুন মাসে ডাঃ বসুকে লিখছেন ডাঃ কোটনিস—"ভারতের অবস্থার দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হচ্ছে, চীনে বেশী দিন থাকাটা ঠিক হবে না। ভারতীয় ফ্রন্টে দরকার হবে আমাদের ; তোমারও কি তাই মনে হয় না ?"

১৯৪২ সালের ২৩শে আগষ্ট উত্তর-চীনে ডাঃ কোটনিসদের একটি শিশু সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তাঁদের এই সন্তান চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে মারা যায় সে।

১৯৪২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর-চীনের শেনসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতাল থেকে তাঁর শেষ চিঠিগুলির একটিতে ডাঃ কোটনিস্ ছিরুকে অষ্টম রুট বাহিনীর রণনীতি সম্পর্কে লিখছেন, "তুমি জানো যে সমস্ত উত্তর-চীন জাপদের দখলে থাকার কথা, কিন্তু বস্তুতঃ যা তাদের দখলে আছে তা' হ'ল কেবলমাত্র বড় শহর, রেল লাইন আর প্রধান সড়কগুলো। বাকী জায়গাগুলো অষ্টম রুট বাহিনীর দখলে চীনাদের নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে। সুবিধার জন্য অষ্টম রুট বাহিনী এই জায়গাগুলোকে ভারতীয় জেলাগুলোর মতো বড় বড় এলাকায় ভাগ করে দিয়েছে, প্রত্যেকটি এলাকায় রয়েছে প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য। শেনসি-চাহার হোপেই সীমান্ত অঞ্চল হ'ল এমনি একটি এলাকা যা এই তিনটি প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত।

এই এলাকা ভেদ করে যে সব প্রধান প্রধান রাস্তা গেছে সেগুলি শত্রুদের দখলে রয়েছে আর পুরো এলাকাটা জুড়ে ছড়িয়ে আছে জাপানী মিলিটারি স্টেশনগুলো। ইয়েনান ও চুঙ্কিঙ্-এর তুলনায় যদিও আমার 'ফ্রন্টে' থাকার কথা, তবুও আমাদের সেনাবাহিনীর তুলনায়—যারা জাপানী স্টেশনগুলোর এক মাইল-দু'মাইলের মধ্যে অবস্থান করছে, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রের পশ্চাৎভূমিতে রয়েছি। এখান থেকে শত্রুর নিকটতম ঘাঁটি হ'ল প্রায় ১৫ মাইল দূরে। বর্তমান এখানে যে যুদ্ধ চলছে তা' জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যেকার যুদ্ধের থেকে অনেক আলাদা ধরণের। সাধারণতঃ আমরা শত্রুর সাথে বড় সংঘর্ষে যাই না। আমাদের সৈন্যরা অনবরত রেললাইনে আক্রমণ করে, শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়, শত্রুর ঘাঁটিগুলোর ওপর আচমকা আক্রমণ চালিয়ে খুব বেশী হলে দশ-বিশ জন শত্রুসেনা খতম করে। কিন্তু এই ধরণের লড়াইয়ে—যাকে গেরিলা যুদ্ধ বলা হয়, নিজস্ব কতগুলো সুবিধা রয়েছে। তাছাড়া এতে আমাদের দিকে প্রাণের কোন হানি হয় না বললেই চলে অথচ শুধু আমাদের জন্যই শত্রু-সেনার একটা বড় অংশকে এখানে আটকে থাকতে হয়। শত্রুকে এটা দুর্বল করে দেয় আর ওদের কাছ থেকে কামান ও মেশিনগান ছিনিয়ে নিয়ে, আমরা আমাদের অস্ত্রের ভাণ্ডার বাড়িয়ে চলি। এই যুদ্ধ কৌশল একদিকে যেমন শত্রুকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে দেয়না বা তাদেরকে এই এলাকার কাঁচামাল ব্যবহার করার সুযোগ দেয় না, অন্যদিকে তেমনি চূড়ান্ত বিজয়ের উপর জনগণের আস্থা অটুট রাখতে সাহায্য করে আমাদের। আর জাপানীরা কি করে ? প্রথমতঃ তারা তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য কৌশল, যেমন গর্ত, কাঁটাতারের বেড়া ইত্যাদি, উদ্ভাবন করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পিঙ্হার রেললাইনের দুপাশে দুটো টানা গর্ত রয়েছে, প্রত্যেকটা ১০ ফুট করে গভীর আর প্রত্যেকটা

গর্তের পাশে বরাবর রয়েছে প্রায় সমান উচ্চতা দেয়াল। দ্বিতীয়তঃ, বছরে প্রায় দুবার করে শত্রুরা বিরাট সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে আমাদের 'ছাঁকনি দিয়ে' তুলতে আসে। এই 'ছাঁকনি আক্রমণের,' সময় পিঠে বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে সরে পড়তে হয় আমাদের আর প্রায় বলতে কি, ওই সময় পাহাড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকি আমরা। এই ধরণের আক্রমণের সময়, যা প্রায় দুমাস ধরে চলে, প্রতিরাত্রে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে বেড়াতে হয় আমাদের আর দিনের বেলায় লুকোতে হয় পাহাড়ের মাথায়। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে, তিক্ত-বিরক্ত হয়ে শত্রুরা ফিরে গেলে, আমরাও ফিরে যাই যে যার কাজে।"

এই বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারা যায়, অষ্টম রুট বাহিনীর যুদ্ধ কৌশল কি চমৎকার ভাবে ধরতে পেরে ছিলেন ডাঃ কোটনিস।

নিজের ডাক্তারী কাজের কথা বলতে গিয়ে একই চিঠিতে কোটনিস লেখেন চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হওয়ার দরুণ ডাক্তারী জিনিস পত্রের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে আমাদের; আর তাই ব্যাপক হারে চীনের দেশীয় ওষুধ-পত্র ব্যবহার করে থাকি আমরা। তারা (চীনারা) এমনকি কুইনিনেরও একটা চমৎকার বিকল্প বার করে ফেলেছে, যা আমাদের হাসপাতালের পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুযায়ী শতকরা প্রায় ৮০টি ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া সারিয়ে দেয়। আমাদের স্কুল-কর্মীদের মধ্যে ভিয়েনাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন ডাক্তারকে আমরা পেয়েছি।"

১৯৪২ সালের ১৫ই অক্টোবর হিকুকে তিনি তাঁর শেষ চিঠিটি লেখেন—"দশ মাইল দূর থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় রয়েছি আমরা এখানে। শত্রুরা আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়, তাই আমরাও সব সময় তৈরী থাকি ওদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য; তৈরী থাকি এক মুহূর্তের 'নোটিশে' ওই জায়গা থেকে সরে পড়তে—লুকিয়ে ফেলতে আমাদের রোগীদের পাহাড়ের মধ্যে, যেখানে ঢুকতে সাহস পায় না শত্রুরা। এই যুদ্ধ ৫ বছর ধরে চলছে কিন্তু চীনারা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে—আর শুধু তা'ই নয় চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসও রয়েছে তাদের।"

১৯৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর ডাঃ কোটনিস তাঁর নিয়মিত কাজ-কর্মের মাঝেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। উত্তর চীনের একটি অজ্ঞাত কুটিরে মৃত্যু এসে তাঁকে সরিয়ে নেয় এই পৃথিবী থেকে। খুব বেশী পরিশ্রম আর অপুষ্টিজনিত এক ব্যাধির শিকার হয়ে মারা যান তিনি। যুদ্ধের আগের সারির কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দীর্ঘ চার বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছিলেন তিনি। যে কুটিরে মারা গেছেন কোটনিস তার সামনে এসে দাঁড়ালেন শোক-স্তব্ধ চীনা অফিসার ও সৈনিকরা। তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেই সমস্ত মানুষরা, চিরকালের শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি হিসাবে যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

ব্যাগুস্‌রা লিখছেন—"তাঁর মৃত্যু-সংবাদে শোকের বন্যায় ভেসে গেল সীমান্ত অঞ্চল। সহকর্মী ও শত শত রোগীদের বন্ধু ডাঃ কোটনিসের মৃত্যু শোকাহত করল সবাইকে। গেরিলা অঞ্চলে মৃত্যু কোন বিশেষ ঘটনা নয় কিন্তু গোটা যুদ্ধ এলাকায় এমন একটিও উপত্যকা ছিল না যেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতির অনুভূতিতে শোক পালিত হয়নি...

গেরিলা যুদ্ধ ঘাঁটির অফিসার ও সৈনিকরা শুধু যে মৃত বন্ধুর প্রতি শোক প্রকাশ করলেন তাই নয় তাঁরা শোক প্রকাশ করলেন সেই কোটনিসের জন্য যিনি ছিলেন ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে চীনের সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সহানুভূতির প্রতীক। তাঁরা সব চাইতে বেশী শোকাহত হলেন এই জন্য যে কোটনিস ছিলেন একজন ডাক্তার। তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করার মতো আর কেউ ছিল না।"

(ক্লেয়ার ও উইলিয়াম ব্যাগুস্...)

সুদূর ভারতে 'তার' মারফৎ এই মর্মন্তুদ সংবাদ পেলেন তাঁর মা, দুভাই আর পাঁচ বোন।

দুটি জাতি শোক জানালো তাঁর মৃত্যুতে। চীনের জনগণের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও-ৎ সে তুঙ্ লিখলেন:—

"জাপ-বিরোধী যুদ্ধের দিনগুলিতে- আমাদের যখন চিকিৎসার জন্য লোকজন ও সুযোগ-সুবিধার ভীষণ দরকার তখন কোন সুদূর ভারত থেকে ডাঃ কোটনিস এসেছিলেন আমাদের দেশে; মহান মানবিক কাজ করেছিলেন আমাদের জনগণের জন্য। কর্তব্যের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে অনুগত থেকে এবং সমস্ত রকমের ক্লেশের বাধা অতিক্রম করে তিনি সুস্থ করে তুলেছেন আহতদের, মৃত্যুর থেকে রক্ষা করেছেন আমাদের বহু সহযোদ্ধাকে। বিপ্লবী চীনা জনগণের হৃদয়ে তিনি চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকবেন।"

---

* রচনাটি, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি, বোম্বে—প্রকাশিত ড্যানিয়েল লতিফির লেখা 'ডাঃ কোটনিস' প্রবন্ধটির নির্বাচিত অংশের বাংলা অনুবাদ। লেখক সুপ্রীম কোর্টের একজন এ্যাড্‌ভোকেট এবং 'কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি—দিল্লী'র সম্পাদক। অনুবাদক: শিশির ঘোষ।

# পত্র-পত্রিকার দর্পণে

## শস্য সংগ্রহ অভিযান—২৪ পরগণা ঃ একটি আদর্শ নমুনা

●[ একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠিত হয় তার প্রশাসনিক ব্যবস্থা। একদিকে যেমন সেই সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থাকে চালু রাখে অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি উদ্দীষ্ট থাকে, সম্পর্কিত সমাজ ব্যবস্থাটিকে অব্যাহত রাখতে। তাই, যে সমাজ ব্যবস্থার মূল কথাটি হ'ল 'শোষণ' সেখানে রাষ্ট্র আপাতভাবে কল্যান-মূলক যে কোন কর্মসূচী নিক না কেন, তা শোষণের স্বার্থে যেতে বাধ্য। কারণ কর্মসূচীটির বাস্তব রূপায়ণে সেই সমাজ ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আশ্রয় করতে হবে যার সংগঠনটিই হ'ল শোষণমূলক। এই সত্যটিই প্রতিফলিত হয়েছে লেভি সংগ্রহের ওপর লেখা নীচের রচনাটিতে।

লক্ষ্যের দিক থেকে যে শুধু এই অভিযান ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, যাদের কল্যানের জন্য এই অভিযান, তারাই আরো বেশী করে বঞ্চিত হচ্ছে এর মাধ্যমে। এই শোচনীয় পরিণামের জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংগঠন দায়ী নয়—এটা আমাদের সমগ্র সমাজ ব্যবস্থারই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

নীচের প্রবন্ধটি ২১ ও ২২শে ডিসেম্বরের ('৭৩) হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত স্টাফ রিপোর্টারের লেখা 'Operation procurement' প্রবন্ধটির নির্বাচিত অংশের বাংলা অনুবাদ।—সঃ মঃ বীঃ ]●

### কথার খৈ ফুটেছে, কাজ এগোয় নি এক পাও

...ঘাটতি জেলা হলেও ২৪ পরগণার কিছু কিছু জায়গা রাজ্যের অন্য যে কোন উদ্বৃত্ত জেলার থেকেও বেশী উর্বর। বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমাকে পশ্চিম বঙ্গের শস্য-ভাণ্ডার বলে অভিহিত করা হয়, যেখানে একর-প্রতি আমন ধানের সাধারণ উৎপাদন-মাত্রাই হ'ল ২৫ মণ। এবছরে আশা করা যাচ্ছে, ফসল আরো ভালো হবে। আর সম্ভবতঃ এই কারণে সরকার এই জেলায় সংগ্রহের লক্ষ্য ৩৫,০০০ টন-এ রেখেছেন যা গত বছরের তুলনায় সাতগুণ বেশী।

দেখে মনে হচ্ছে, জেলা প্রশাসন এই লক্ষ্যে পৌঁছতে দৃঢ় সংকল্প। পুরো জেলাকে চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগ থাকছে একজন অতিরিক্ত জেলা শাসকের অধীনে যাঁর কাজ-কর্ম সরাসরি দেখবেন জেলা-শাসক স্বয়ং।

...অদ্ভুত মনে হলেও, ব্লক হিসেবে সংগ্রহের লক্ষ্য, সরকারীভাবে ঘোষিত সমগ্র জেলার লক্ষ্য-পরিমাণের চাইতে অনেক বেশী। এটা এই জন্য করা হয়েছে, যাতে প্রশাসনের নীচের স্তরের অফিসাররা পুরো ব্যাপারটার গুরুত্ব ভালো করে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সংগ্রহের কাজে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। ধান-চালের চোরা-কারবার বন্ধ করার জন্য তিনটি সংগ্রহ-বিভাগের অন্তর্গত সুন্দরবনের বিশাল অঞ্চলকে জেলার বাকী অংশ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। ২৫টি চেক-পোষ্ট বসিয়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এই বিশাল জায়গা জুড়ে।

সুতরাং কেউ বলতে পারবেন না যে সংগ্রহ ব্যবস্থাতে কোন কিছু কমতি থেকে গেছে। কিন্তু দুঃখের কথাটা হলো এই যে, এ সত্বেও এযাবৎ সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ৩৫০ টন চাল। অবশ্য, জেলা প্রশাসন এই মর্মান্তিক ব্যাপারটার জন্য একটা তৈরী-উত্তর খাড়া রেখেছেন। তাঁরা বলছেন, এই জেলায় ফসল তোলার কাজটা সবে মাত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক এবং বেসরকারী সূত্র অনুযায়ী এই জেলাতে ফসল তোলার ৫০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

...এর জন্য একজন ব্যক্তি বা পার্টির ওপর দোষ দেওয়া যায় না; এর অংশীদার সবাই—যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সংগ্রহ অভিযানের সংগে যুক্ত আছে।

রাজ্য সরকার দুটো উৎস থেকে শস্য সংগ্রহ করবেন বলে আশা করছেন জমির মালিক এবং চাল-কলের মালিকদের কাছ থেকে লেভি আদায় করে।...এখন পর্যন্ত এদের কাছ থেকে সংগ্রহের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয় এবং ভবিষ্যতে এই অবস্থার কোন উন্নতি হবে বলেও মনে হয় না। ১৯৫২ সালে লেভি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই রাজ্যের জমির মালিকরা, তা সে ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, কোন দিনই লেভির বাধ্য-বাধকতার কাছে নতি স্বীকার করে নি।

২৪ পরগণায়, বিশেষত সুন্দরবন এলাকায়, অধিকাংশ জমির মালিকরাই স্বনামে অনুপস্থিত এবং যে পরিমাণ জমি এদের মালিকানায় রয়েছে তা 'সিলিং'-এর অনেক ওপরে। সদর মহকুমার বাসন্তী থানা এলাকার জনৈক জোতদার, যিনি আবার কলকাতা হাই কোর্টের এড্‌ভোকেটও, ৫৫০০ বিঘা বেনামী জমির মালিক। স্থানীয় লোকেরা বলে, তিনি নাকি তাঁর চাকর-বাকরদের নামেও জমি রেখেছেন, যদিও অদৃষ্টের পরিহাস—সে বেচারীরা মাসে বড়জোর ৩০ টাকা মাইনে পেয়ে থাকে। বাসন্তীর এই জোতদার ছাড়াও আরো অন্তত পক্ষে দু-ডজন পরিবারের কয়েক হাজার করে বেনামী জমি রয়েছে এবং এদের কেউই লেভির বাধ্য-বাধকতা পালন করেনি।...

রাজ্য সরকার যে দিন থেকে পরিবার ভিত্তিক লেভি চালু লেন, সেই দিন থেকেই বহু জমির মালিক বিশেষতঃ বড় মালিকরা, দের পরিবার যে বেশ কয়েকটা অংশে' ভাগ হয়ে গেছে এটা প্রমাণ র জন্য, ভুয়া রেশন কার্ড দেখিয়ে আসছে (...খাদ্য দপ্তরের কিছু চারীদের অসাধু কারসাজি ছাড়া এধরনের ব্যাপার সম্ভব নয়। ীয়তঃ যে লেভি তালিকার ওপর ভিত্তি করে সংগ্রহ অভিযান ানো হয়ে থাকে, সেটাই ভুলে ভরা থাকে, এমন কি তথ্যগত ত্রুটিও ক তার মধ্যে।

কথনো কথনো দেখা যায়, জমির মালিক, বিশেষতঃ জোতদাররা— র জমির কাঁচা ফসল নিজে নষ্ট করে দিয়ে মিথ্যা মামলা জুড়ে দিচ্ছে গ-চাষীর নামে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—লিভি ফাঁকি ওয়ার একটা কায়দা। মাত্র কয়েক দিন আগে বাসন্তী থানার কালা জরাতে এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন জোতদার তার বিঘা জমির ফসল নষ্ট করে দিয়ে একজন নির্দোষ ভাগ-চাষীর ঘাড় পুরো দায়টা চাপিয়ে দিল। বসিরহাট থানার অন্তর্গত খড়মপুর কেও এই ধরণের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এই দুটো ঘটনার জ সংযুক্ত জোতদারদের কু-কীর্তি শুধু এখানেই শেষ হয়নি। খুবই প্রতি সদর মহকুমার এস. ডি. ও.কে শিলিগুড়িতে বদলি করা হয়েছে। াত-মহলরা বলেন, কালাহাজরা-ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত জোতদারটি, নৈক তরুণ উপমন্ত্রী এবং ২৪ পরগণার একজন এম.এল.এ. এই বদলী াদেশের পিছনে রয়েছেন। সব শেষে রয়েছে জমিদারদের পুরনো তিয়ার—হাই কোর্টের ইন্‌জাংসান। ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার ন্তর্গত পাথরপ্রতিমার জনৈক গরীব ভাগচাষী এক সময় বলেছিলেন, মের 'ব্রহ্মাস্ত্রের' চাইতেও বেশী শক্তিশালী হ'ল—ইন্‌জাংশন; বন যদি এটাকে ব্যবহার করতো তাহলে তাকে আর মারতে হতো ...

## স্থ কর্মচারীরা বড় জোতদারদের দলে

আমলাতন্ত্র বিশেষতঃ এর তলার দিকের কর্মচারীরা যেমন ব্লক ডেভালাপমেণ্ট অফিসার, জে. এল. আর. ও. তহশীলদার এবং অন্যরা ৪ পরগণার জমির মালিকদের সাথে সক্রিয় সহযোগিতায় লিপ্ত। াধারণ মানুষরা মনে করেন, এই পদস্থ কর্মচারীদের কারোরই বার্ষিক ায় গড়ে ১০,০০০ টাকার কম হবে না। সাধারণতঃ তহশীলদাররাই েভির তালিকা তৈরী করে থাকেন.আর. জে. এল. আর. ও.রা তাঁদের াজ দেখাশোনা করেন। শোনা যায়, সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক ায়গায় তহশীলদাররা জমির মালিকদের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করেছে, ফলতঃ লেভির পরিমাণ নির্দ্ধারণ একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

কিছু কিছু তহশীলদার, জে. এল. আর. ও বা বি. ডি ও'র যাই সন্দেহজনক ভূমিকা থাক না কেন, আসলে সরাসরি-ক্রয়ের দালালরাই (ডি পি এ—ডিরেক্ট পারচেজিং এজেণ্ট) এই সংগ্রহ কর্মসূচীর সব থেকে বেশী ক্ষতি সাধন করছে।...ফুড কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়ার নিয়ম অনুযায়ী, ডি. পি. এজেণ্টকে তিনি যে চাষীর কাছ থেকে ধান বা চাল কিনবেন তাকে একখানা রসিদ দিতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই রসিদগুলোর শতকরা মাত্র দশটি প্রকৃত বিক্রেতাকে দেওয়া হয়। বাকীগুলো কাটা হয় বড় জোতদারদের নামে যাতে তাঁরা লেভির থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন।

"খুব বেশী ভিড়ে" এই অজুহাত দেখিয়ে ডি পি. এজেণ্ট অজস্র চাষীর শস্য প্রত্যাখ্যান করছে, এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। গরীব লোকটি, যে কিনা কয়েক মণ ফসল মাথায় বয়ে ১০-১৫ মাইল হেঁটে এসেছে বা দূরের কোন গ্রাম থেকে গরুর গাড়ীতে ধান নিয়ে এসেছে এজেণ্টের বাড়ীতে, নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাবে না। সুতরাং সে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না 'প্রভুর' কৃপা হচ্ছে .. সুতরাং যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে এজেণ্ট মহাশয় তাকে 'তার জঞ্জাল গুলো' দাঁড়ি-পাল্লায় চাপাতে বলেন। তিনি তারপর এফ. সি. আই. নির্দ্ধারিত হারের তুলনায় অনেক কম দামে পুরো শস্যটা কিনে নেন এবং রাতারাতি পৌঁছে দেন মিল-মালিক বা চোরা-কারবারীদের হাতে

গ্রামের দিকে অতি-উৎসাহী পুলিশ আর চৌকিদাররা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। গ্রামের সাপ্তাহিক হাট ও বাজারে ধান-চাল বেচা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এই সময়টাতে গরীব কৃষকরা তাদের উৎপন্ন শস্য বিক্রি করে গৃহস্থালীর কিছু অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র কেনার আশা করে থাকে। পুলিশের এই বাড়াবাড়ি তাই তাদের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু জায়গায় তাদের শস্য আটক করা হয়েছে কিন্তু পরিবর্তে তারা টাকা বা রসিদ কিছুই পায়নি। পুলিশের এই ধরণের কাজকর্মের ফলে গ্রামগুলোতে ধান-চাল জমে থাকছে। কিন্তু না গ্রাম-বাসীরা না মফস্বল শহরের অধিবাসীরা—কেউই এর থেকে উপকৃত হতে পারছেন না।

...রাজ্য সরকারের 'কর্ডনিং' নীতি, গ্রামাঞ্চলে যে বিশৃংখল অবস্থা ইতিপূর্বেও ছিল, তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আংশিক রেশন এলাকা এবং 'ফ্রিঞ্জ' এলাকার অধিবাসীরা দুর্গতির শিকার হয়েছেন সব চাইতে বেশী। খোলা বাজারে চালের মহার্ঘতা এবং সাপ্তাহিক

রেশনে দেওয়া চালের পরিমাণের নগণ্যতা, পরিস্থিতিকে একদিই দুঃস্থ করেছে যে এই, এলাকাগুলোর অধিবাসীদের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী লোক দিনে দুবেলা খাবারও পাননা।

..চাল-কল মালিকদের কথা, বেশী কিছু বলার নেই। তাঁদের কাছ থেকে ২৫,০০০ টন চাল সংগ্রহ করার আশা মরিচিকা মাত্র। ...জমির মালিকদের মতো মিল মালিকরাও লেভি দিতে নারাজ।

বিপরীত দিকে, তারা ডি. পি. এজেন্ট, অসাধু ব্যবসায়ী, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারী এবং চোরা-কারবারীদের সঙ্গে সন্দেহজনক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন।..

এই অবস্থায় ২৪ পরগণাতে সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে যদি লক্ষ্য পরিমাণের, এমন কি অর্ধেকেও পৌঁছতে হয় তবে তা কেবল মাত্র গরীব, নিঃসহায় কৃষকদের বঞ্চিত করেই সম্ভব হবে ..

# পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ

## ● "ঋণ-দান" না সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ?

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে ভারতের পরিশোধ্য বৈদেশিক "ঋণের" পরিমাণ ৮,৩৫১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সভায় এই খবরটি জানান অর্থমন্ত্রী শ্রীওয়াই. বি. চ্যাবন।

একটি লিখিত উত্তরে তিনি ও. পি. ত্যাগীকে জানান, ওই ঋণের সুদ হিসাবে যে পরিমাণ টাকা গত ৫ বছরে শোধ দেওয়া হয়েছে তা হ'ল নিম্নরূপ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯৬৮-৬৯ সালে | — | ১৩৯ | কোটি টাকা |
| ১৯৬৯-৭০ ,, | — | ১৪৪ | ,, ,, |
| ১৯৭০-৭১ ,, | — | ১৬০ | ,, ,, |
| ১৯৭১-৭২ ,, | — | ১৮০ | ,, ,, |
| ১৯৭২-৭৩ ,, | — | ১৮৮ | ,, ,, |

—সূত্র : হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৫. ১২. ৭৩

## ● জাতীয় অর্থনীতি : সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণী

১৯৭৩ সালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পর্ষদ বলেছেন, ১৯৭৩ সালে জিনিসপত্রের দাম যে রকমভাবে বেড়েছে, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এমনটি আর দেখা যায়নি। মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছে অবাধ গতিতে। একে রোধ করার যাবতীয় প্রয়াসও কার্যত নিষ্ফল। পর্ষদের ধারণা, ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ৮৫ কোটি দেখানো হলেও কার্যত ঘাটতির পরিমাণ এর দশগুণ না হয়ে উপায় নেই। অন্যান্য বছরের মত এই বছর কোন সময়ই দ্রব্যমূল্য এক ধারের জন্যও স্থিতিশীল থাকেনি। ফসল ওঠার সময় স্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য কিছুটা নরম হয়। এ বছর তাও হয়নি। সত্যি বলতে কি, গত তিন মাসে, ফসল ওঠা সত্ত্বেও দাম তো কমেইনি বরং দ্রব্যমূল্য দশ পয়েন্ট বেড়ে গিয়েছে।

দাম বাড়ারও কোন সমতাব নেই। খাদ্যদ্রব্যের দামের সূচক সংখ্যা ১৯৭৩ সালের জানুয়ারীতে ছিল ২৪৫.৫। ডিসেম্বরে বেড়ে হয়েছে ৩০০.৮। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ২৩.২ শতাংশ। পর্ষদ বলেছেন, খাতার কলমে মূল্যবৃদ্ধির যে হিসাব দেখানো হয়েছে আসলে বৃদ্ধির হার হবে তার চেয়েও বেশী।

টাকার যোগান বেড়েছে সাংঘাতিক ভাবে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে টাকার যোগান তিন হাজার কোটি টাকা বেড়েছে। সরকার এই সংকট রোধ করার অনেক চেষ্টা করেছেন, ফল হয়নি কিছুই।

গত নভেম্বর মাসে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭১ কোটি টাকা। এটাও একটা অভূতপূর্ব ঘটনা।

—সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২.২.৭৪

## ● একমাত্র বন্দুকের গুলি ছাড়া সবেতেই ভেজাল !

(ক) পশ্চিম বাংলায় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের মাত্রা এক বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। রাজ্য স্বাস্থ্যপর্ষদ—পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারী, অ-মাদক পানীয়তে (non-alcoholic drink)

ভেজালের মাত্রা হল শতকরা ৫০ ভাগ। অন্যান্য বস্তুতে ভেজালের মাত্রা নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| কল থেকে তৈরী খাদ্য বস্তুতে | —৫৫·০৩% |
| দুধে | —৭০·৩৫% |
| মাখন, ঘী, আইসক্রীম ইত্যাদি | —৪০·০৬% |
| দুগ্ধজাত সামগ্রীতে | |
| খাদ্য শস্যে | —২১·৪% |

—সূত্র : হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৫.১.১৭৩

(খ) ভেজালকারীরা এই বছরে আজ পর্যন্ত কম করে ১,০৫০ জনকে 'খুন' করেছে। কনজিউমার কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া—পরিচালিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, এ বছর সর্বমোট ৪,০৮৭ জন অসুস্থ খাদ্য বিষক্রিয়ার শিকার হন। এই একই কারণে সর্বাধিক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় পশ্চিমবাংলা থেকে যেখানে গত বছরের ১৫০টি মৃত্যুর তুলনায় এ বছরে মারা গেছেন ২৫৬ জন। মৃত্যুর তালিকায় ওড়িষ্যার স্থান দ্বিতীয় (১৫০ জন), তারপর যথাক্রমে জম্মু ও কাশ্মীর (১২০ জন) উত্তর প্রদেশ (১০৯ জন) এবং বিহার (১০৫ জন)। একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই কাউন্সিল বলে যে উক্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে, টুথ পেস্ট থেকে জন্ম নিরোধক সামগ্রী পর্যন্ত প্রায় সব কিছুতেই ভেজাল দেওয়া হচ্ছে। ভেজালের মাত্রা এত বেশী যে, যে সব মালমশলা দিয়ে ভেজাল দেওয়া হয়, বাজারে তারই ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

—সূত্র : হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ৫.১২.৭৩

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

## অক্টোবর-নভেম্বর ('৭৩)—এই দুই মাসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁচে থাকার দাবিতে আন্দোলন ও সরকারী জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

**ত্রিবান্দ্রম :** গত ৩রা অক্টোবর আকানকোরের টিটানিয়াম কারখানায় স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে ২০০০ জনের একটি বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালায়। এতে চার ব্যক্তি নিহত হন।

স্থানীয় ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে বাইরের থেকে কারখানায় লোক নিয়োগের চেষ্টা হলেই গোলমাল শুরু হয়ে যায়। পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে। কিন্তু এতে অবস্থা আয়ত্বে না আসাতে, পরে গুলি ছোঁড়ে। জনতার হাতে একটি তেলের ট্যাংক পুড়ে যায়।

সূত্র : হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৪।১০।৭৩

**হাজারীবাগ :** গত ৩০শে অক্টোবর হাজারীবাগের কাছে চারহি নামে এক জায়গায় ন্যাশনাল কোল ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশন অফিসের সামনে একদল লোক স্লোগান দিতে থাকলে এবং ইট ছুঁড়তে থাকলে পুলিশ তাঁদের ওপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে দুজন আহত হন।

সূত্র : স্টেটসম্যান ২।১১।৭৩

**দিল্লী :** দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ৬ই নভেম্বর জনসংঘ সমেত বামপন্থী পার্টিগুলি যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে জনতার যে সংঘর্ষ হয় তাতে পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে ৫০ জন আহত হন।

সূত্র : স্টেটসম্যান ৭।১১ ৭৩

**শ্রীনগর :** মেয়েদের একটি কলেজের "নেহেরু মেমোরিয়্যাল কলেজ" নামকরণের বিরুদ্ধে ৭ই নভেম্বর শ্রীনগরে একটি ছাত্র-আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলন ৮ই নভেম্বর অনন্তনাগ শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ছাত্রদের ওপর লাঠি চালায়।

এই আন্দোলনের আঁচ জম্মুতে গিয়েও লাগে। স্থানীয় ছাত্ররা আন্দোলন সংগঠিত করেন। গত ১৫ই নভেম্বর ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের কয়েকটি বেশ বড় ধরণের সংঘর্ষ হয়। ছাত্ররা একটি পুলিশ পিকেটের ওপর ইঁট ছোঁড়েন, ৫টি সরকারী বাস পুড়িয়ে দেন। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় মোট ১৫০ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাসের সেল ছোঁড়ে। এ পর্যন্ত জম্মুতে ৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সূত্র : স্টেটসম্যান : ৮।১১।৭৩, ৯।১১।৭৩
হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড : ১৬। ১।৭৩

**শ্রীনগর :** বাস ভাড়া ১০% কমানোর সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে বেসরকারী বাসের কর্মীরা গত ১৮ই নভেম্বর ধর্মঘট পালন করেন। তাঁরা সরকারী পরিবহন ব্যবস্থা অচল করে দেবার জন্য ঐদিন রাস্তায় নেমে পড়েন। এই আন্দোলন-বিরোধী একটি কার্টুন আঁকার "অপরাধে"র তাঁরা একটি উর্দু প্রাত্যহিক কাগজের অফিস আক্রমণ করেন। রাস্তায় পরিবহন ব্যবস্থা অচল করে দেবার সময় পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাধে।

সূত্র : স্টেটসম্যান : ১৯।১১।৭৩

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড : ১৯।১১।৭৩

**ধানবাদ :** গত ১৫ই নভেম্বর ভারত কোকিং লিমিটেড কোলিয়ারির ৩০০০ জন শ্রমিকের ওপর CISF ৫০ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে ৫ জনকে নিহত ও ৮ জনকে আহত করে। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা শ্রমিকও আছেন।

খবরে প্রকাশ, ঐ ৩০০০ শ্রমিক তাঁদের অভিযোগগুলি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে পেশ করার জন্য তাঁর বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করলে CISF তাঁদের ওপর গুলি চালায়।

সূত্র : স্টেটসম্যান : ১৬।১১।৭৩

**কলকাতা :** গত ১৫ই নভেম্বর কলকাতায় নয় বাম পার্টির আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে ৬০০ জন ব্যক্তি, গ্রেপ্তার বরণ করেন এর মধ্যে ৫০০ জনকে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রেখে বাকী সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সূত্র : হিন্দুস্থান : স্ট্যাণ্ডার্ড ১৬।১১।৭৩

**উত্তরবঙ্গ :** দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে নয় বাম পার্টির ডাকে গত ১৭ই নভেম্বর উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের হাঙ্গামায় পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন।

সূত্র : স্টেটসম্যান : ১৮।১১।৭৩

**কানপুর :** তিনদিন ব্যাপী ছাত্র-আন্দোলনের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২৪শে নভেম্বর আন্দোলন ভয়াবহ আকার নেয়। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধও হয়।

একজন পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টরের জামিনে মুক্তির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। ঐ পুলিশ সাব-ইন্‌সপেক্টরটিকে গত ১৪ই নভেম্বর পলিটেকনিক ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর (যার ফলে একজন নিহত ও সাতজন আহত হন) অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়।

সূত্র : হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড : ২৫।১১।৭৩

**অক্টোবর ('৭৩) নভেম্বর ('৭৩) মাসগুলিতে বিভিন্ন আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত ও আহতের তালিকা (অসম্পূর্ণ)**

| তারিখ | স্থান | নিহত | আহত | উপলক্ষ্য | নিহত বা আহতের পরিচয় | সূত্র | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩।১০।৭৩ | ত্রিবান্দ্রম | জানা যায়নি | ৪ | কারখানায় স্থানীয় ব্যক্তিদের চাকরির দাবিতে | সাধারণ লোক | হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড | ৪।১০।৭৩ |
| ১৫।১০।৭৩ | পাটনা | ৩ | ৩ | জানা যায়নি | সাধারণ লোক | হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড | ১৬।১০।৭৩ |
| ২৮।১০।৭৩ | নয়া দিল্লী | জানা যায়নি | ১ | এক ব্যক্তির গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে | সাধারণ লোক | হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড | ৩০।১০।৭৩ |
| ৩০।১০।৭৩ | হাজারীবাগ | জানা যায়নি | ৬ | জানা যায়নি | সাধারণ লোক | স্টেটসম্যান | ২।১১।৭৩ |
| ৬।১১।৭৩ | দিল্লী | ,, | ৫০ | দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে | সাধারণ লোক | স্টেটসম্যান | ৭।১১।৭৩ |
| ১৪।১১।৭৩ | কানপুর | ১ | ৭ | জানা যায়নি | ছাত্র | হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড | ২৫।১১।৭৩ |
| ১৫।১১।৭৩ | ধানবাদ | ৫ | ৮ | দাবিদাওয়া ভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন | শ্রমিক | স্টেটসম্যান | ১৬।১১।৭৩ |
| ১৭।১১।৭৩ | উত্তর বাংলা | ৩ | জানা যায়নি | দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন | সাধারণ লোক | স্টেটসম্যান | ১৮।১১।৭৩ |

মোট নিহত—১২, মোট আহত—৭৯

# চিঠিপত্র

**মতামতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নয়**

## হামলাবাজির বিরুদ্ধে বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের ছাত্র সমাজ

বিগত ৪.৮.৭৩ তারিখ বিকালে বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের হোষ্টেলের কয়েকজন ছাত্র বাঁকুড়া শহরের বাসষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে একটি বাসে চড়তে গেলে কিছু স্থানীয় মস্তান যুবক বাধা দেয়। ফলে সেই ছাত্রদের সাথে কথা কাটাকাটি হতে হতে মস্তানরা নোংরা গালিগালাজ দিয়ে মারতে উদ্যত হয়। সেই ছাত্ররা তখন সেইখানে অসহায়ভাবে আহত অবস্থায় হোষ্টেলে ফিরে এসে আরও বন্ধুদের এ ঘটনার কথা জানালে, হোষ্টেলের সমস্ত ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে হামলাকারী যুবকদের খোঁজ করেন ও তাদের এরকম খারাপ ব্যবহারের জবাব চান। ইতিমধ্যে ফল যা ঘটল তা আরও মর্মান্তিক। হোষ্টেলের ছাত্ররা দলবেঁধে আসছে শুনে সেই হামলাকারী মস্তানদের আরও 'বন্ধুবাহিনী' এসে কলেজের হোষ্টেলের ওপর চড়াও হয়ে প্রচণ্ডভাবে ছেলেদের মারধোর করে। কিছু গুরুতরভাবে জখম হলেন, কিছু ছাত্র আত্মরক্ষার জন্য ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে থাকেন। সেদিন রাতে হোষ্টেলগুলিতে বেশ আতংকের সৃষ্টি হয়। যে ছাত্ররা এ ঘটনায় বেশী মুখোমুখি হয়েছিলেন, তাদেরকে হোষ্টেল থেকে 'তুলে নিয়ে যাবার' ভয় দেখান হয়েছিল। হোষ্টেল ছেড়ে সে রাত্রে কোন কোন ছাত্র বাড়ি চলে যেতে থাকেন।

কিন্তু, ঘটনা হ'ল, এখানেই ছাত্ররা মুখ বুজে পিছিয়ে যাননি সেদিন। তাদের প্রতিবাদী চেতনায় সক্রিয় হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে এই অন্যায় ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিকারের দাবি নিয়ে দাঁড়ালেন। হামলাকারী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বললেন ও তাদেরকে গ্রেপ্তার করানোর দাবি জানালেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তো প্রথমে এ রকম ঘটনার সঙ্গে ছাত্রদের জড়ানোর জন্যেই উল্টে ছাত্রদেরই একগাদা জ্ঞান দিলেন ও তার স্বভাবসুলভ বাকচাতুরী দিয়ে ছাত্রদের ন্যায়সংগত দাবিকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। পরে ৭.৮.৭৩ তারিখে প্রতিটি ছাত্র এ ঘটনার প্রতিবাদে কলেজে ক্লাস বর্জন করেছিলেন। সফল করেছিলেন সেদিনকার ছাত্র ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের মধ্যে একটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করার মত ছিল, যে এই ছাত্র ধর্মঘটকে অন্যসব রাজনৈতিক দল, উপদল বা গোষ্ঠী তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে কৃতিত্ব ফলানোর যে অপচেষ্টা করেছিল এবং পরে নানাভাবে ছাত্রদের সংগঠিত মনোবল ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল, সচেতন ছাত্ররা তাদের সে হীন চক্রান্তকে প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন ও এ ধর্মঘটকে গৌরবময় ছাত্রসমাজের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লড়াই এ রূপ দিতে পেরেছিলেন। ছাত্রদের সংগঠিত কোন ন্যায্য প্রতিবাদে সরকারের 'শান্তি শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী'দের সামান্য একটুতেই বেশ বিচলিত হতে দেখা যায়, যেমন দেখা গিয়েছিল ধর্মঘট পালনের দিন। সেদিন প্রচুর পুলিশের গাড়ি ঘনঘন টহল দিতে ব্যস্ত ছিল কলেজের চারপাশে।

—বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের জনৈক ছাত্র।

## মেডিকেল পরীক্ষা : একটি অভিমত

১৯৭২ সালের জুন মাসের মেডিকেল পরীক্ষা তৃতীয়বার তারিখ পরিবর্তনের পর অবশেষে ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে আরম্ভ হবে ঠিক ছিল। এই তারিখ মেডিকেল ছাত্রদের দাবি অনুযায়ী ছাত্রদের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকালটির ডীন ডাঃ অজিত বসু কর্তৃক ঠিক হয় এবং পরীক্ষা আরম্ভ হবার তিনমাস আগে এই তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন। ফাইনাল এম. বি. বি. এস পরীক্ষার্থী অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের অ্যাডমিট কার্ডসহ বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে যথাসময়ে উপস্থিত হন—কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সর্বতভাবে প্রস্তুত; পরীক্ষা শুরু হবার ঘণ্টাও বেজে ওঠে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, কোন পরীক্ষার্থীই হলের ভেতর প্রবেশ করলেন না। পরীক্ষার্থীরা—যাঁরা এই পরীক্ষার পাশ করতে পারলে চিকিৎসক হবার অধিকার অর্জন করবেন, তাঁরা শুধু মৌন থেকে পরীক্ষা বয়কট করলেন। পরীক্ষা বয়কট প্রসঙ্গে তথাকথিত ছাত্রনেতারাও (বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ছাত্রসংসদের প্রতিনিধিবৃন্দ) কোন বক্তব্য রাখলেন না—পূর্বে এই প্রসঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের মতামত নেয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু এই মৌন পরীক্ষা বয়কটের কারণ কি? কারণ এই পরীক্ষা বয়কটের মূলে রয়েছে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী শিক্ষকে'র অদৃশ্য হস্তক্ষেপ। এই শিক্ষক-চিকিৎসকরা আবার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সুস্থ পরিবেশ, শিক্ষক ছাত্রদের মধুরতর সম্পর্ক আর উন্নততর আবহাওয়া যা কিনা শিক্ষাকে কলুষমুক্ত করতে পারে, তা বিস্মৃত হয়ে এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও ডীন নির্বাচনে নিজেদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ব্যবহার করলেন একশ্রেণীর ছাত্রদের।

বর্তমান পরীক্ষা বয়কটের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর পেছনে রয়েছে (১) কিছু শিক্ষকের ক্ষমতা লিপ্সা (২) মুষ্টিমেয় ছাত্রের সাধারণ ছাত্র-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ (৩) ছাত্রদের অসংগঠিত অবস্থা ৫

(৪) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সংকট। উচ্চপদে আধিষ্ঠিত শিক্ষক-চিকিৎসকরা সমগ্র সমাজের মুখে কলঙ্ক লেপন করে আমদানী করলেন নোংরা রাজনীতি। মেডিকেল পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এঁদের দুর্নীতির বিভিন্ন নমুনা বিভিন্ন সময়ে পেয়ে থাকলেও তা নিয়ে আলোড়ন তুলতে ভয় পান।

মেডিকেল ছাত্রদের অনেকেই বহুকষ্টে এই ব্যয়বহুল মেডিকেল শিক্ষা নিতে এসেছেন—এই ব্যয়ের পরিমান ক্রমাম্বয়ে বেড়ে যাওয়ায় এঁরা অনেকেই আজ দুর্দশাগ্রস্থ। স্বাভাবিকভাবে একজন মেডিকেল ছাত্রর পেছনে প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়ে থাকে (সরকারী হিসাবে ছাত্রপিছু সরকারী ব্যয় ৯০,০০০ টাকা) সত্যি কথা ব'লতে এই অর্থ, আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জনসাধারণের কাছ থেকেই আসে। আবার ক্রমাম্বয়ে পরীক্ষা না হবার ফলে এই ব্যয়ের পরিমান কল্পনাতীত হয়ে উঠেছে। এই ব্যয়ের পরিবর্তে দেশ ও তার জনসাধারণ কি পাচ্ছে, তা আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। এমনকি ওয়ার্ল্ড্ হেলথ্ অরগানাইজেশন তাদের প্রতিবেদনে বলেছেন আধুনিক মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থা ব্যয় বহুল হওয়ায় ও দেশের স্বার্থে তার নূন্যতম মান বজায় রাখার জন্ত একটা মেডিকেল কলেজ তৈরী করার আগে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে তা ঘটছে না। কায়েমী স্বার্থের ফলে এখানে একদিকে মেডিকেল শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে—তা প্রতিকারের চেষ্টা হচ্ছে না, অন্তদিকে শিক্ষাদানের উপযোগী হাসপাতাল না থাকাতে মেডিকেল কলেজের তৃতীয়বর্ষের ছাত্ররা তাঁদের প্র্যাকটিক্যাল করার জন্ত কলকাতার হাসপাতালে প্রেরিত হন! তার প্রতিকারের জন্ত মেডিকেল বিশ্ববিত্তালয় গঠন ক'রে বর্তমানে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিত্তালয়ের অধীনস্থ মেডিকেল কলেজগুলিকে এর অধীনে নিয়ে আসতে হবে—বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পাঠক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্ত বিধান করতে হবে।

বিশ্বের এই অংশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের জনসাধারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবহেলিত। বিদেশ থেকে ভিক্ষালব্ধ মেশিনের দ্বারা বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্তৃক হার্টের সূক্ষতম অপারেশন করলে তা দেশের চিকিৎসার মানের উন্নতি প্রকাশ করে না। বিভিন্ন দেশ যে সব ব্যধিকে নির্মূল করেছে (কলেরা, বসন্ত, মেলেরিয়া ইত্যাদি) তার সংখ্যাধিক্য আমাদের চিকিৎসাব্যবস্থার মৌলিক দৈন্তের কথাই প্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে আমাদের দেশের গ্রামীন চিকিৎসাব্যবস্থা (হাসপাতালে) চরম দুর্দশার পরিচায়ক মাত্র। আপনারা সকলেই জানেন সেখানে ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি, শয্যা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও চিকিৎসকের কী নিদারুণ ঘাটতি, এ সম্পর্কে মাঝে মধ্যেই অনেক বাগাড়ম্বর পূর্ণ বক্তৃতা শোনা গেলেও কার্যকরী কোন ব্যবস্থা আজও গ্রহণ করা হয় নি!

তার ওপরে, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণভাবেই এক তীব্র সংকটের সম্মুখীন। পরনির্ভরশীল জাতির দৈন্তদশা সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠে—দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্তদশাও আজ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে; এই শিক্ষাব্যবস্থার একটি অঙ্গ মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থাও তাই আজ হতশ্রী ও গতিহীন। শুনলে অনেকে আঁতকে উঠবেন যে আজকের দিনের নবীন চিকিৎসকদের একটা অংশ (যাদের ওপর অনেক মানুষের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে) ফাঁকি দিয়ে টোকাটুকির মাধ্যমে তাদের ডিগ্রী অর্জন করেছেন। কিন্তু কেন এরকম হ'ল? সত্যি কথা ব'লতে কি আজকের দিনে আমাদের ছাত্রসমাজের এক বৃহৎ অংশ এই অন্তঃসার শূন্ত ব্যর্থ শিক্ষাব্যবস্থার চাকার নিষ্পেষিত হয়ে তাদের জীবনের সদবৃত্তিগুলি হারিয়ে ছাত্রজীবনেই অন্তায়-এর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন। তাই দেখা যায় সারা বছরের পাঠের মূল্যায়ন মাত্র চারিটি প্রশ্নের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ায় অনেকেই Text Book না প'ড়ে সাইক্লোষ্টাইল্ড নোট হাতে নিয়ে পরীক্ষা দিতে যান। প্রসঙ্গত: প্রি-মেডিকেল কোর্সের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই এক বছরের পাঠক্রমে ছাত্ররা একটা বিরাট অবকাশ পায় মাত্র—তাদের মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আভাষও দেওয়া যায় না। জীবনের একটি মূল্যবান বছর নষ্ট হয়. প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। এই পচন আজ আর সংস্কার বা পরিমার্জন দ্বারা রোধ করা নয়। চাই নতুনভাবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে যুগোপযোগী মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন। যেমন ছাত্রদের ছুটিতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করে সেই অঞ্চলের চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্যা ও মান উন্নয়নে নিয়োজিত করতে হবে।

মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন ভিত্তিক আধুনিকরণ না করলে এই শিক্ষাব্যবস্থা অন্তঃসারশূন্ত হয়েই থাকবে। আমাদের দেশের মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থা আজ দেশের মাটির সাথে, দেশের জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কৃত্রিমভাবে গড়ে উঠেছে। practical training ভিত্তিক না হওয়ার এই শিক্ষাব্যবস্থা আজ ছাত্রদের উৎসাহ যোগাতে পারে না। মেডিকেল পাঠক্রম আজ অপ্রয়োজনীয়ভাবে ছাত্রদের অনেক কিছু মুখস্থ করতে বাধ্য করে, যেমন Anatomy class-এ ছাত্ররা অনাবশ্যকভাবে অনেক কিছু মুখস্থ করে যা চিকিৎসাক্ষেত্রে আদৌ কোন প্রয়োজনে আসবে না।

পরিশেষে, বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করে Semistar প্রথায় পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মেডিকেল কলেজগুলি থেকে পরীক্ষক নিয়োগের নীতি একেবারে তুলে দিয়ে বিশ্ববিত্তালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষক এবং অন্তপ্রদেশ থেকে পরীক্ষক এনে পরীক্ষা পরিচালনা করলে পরীক্ষা ব্যবস্থার ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও মেডিকেল কলেজের মধ্যে পাশের হার নিয়ে ফটকাবাজি কমবার একটা সম্ভবনা আছে। আর তার আগে চাই সুস্থ ও দৃঢ় ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলা, যা কিনা ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়াকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

জনৈক মেডিকেল-পরীক্ষার্থী
কলিকাতা

**বীক্ষণ**

**কিশোর ও যুব-ছাত্রদের মুখপত্র**

**প্রথম বর্ষ ( মার্চ '৭৩—ফেব্রুয়ারী '৭৪ )**


# বর্ষসূচী।

● ভিয়েতনাম ॥ মানবতার বধ্যভূমি-ভিয়েতনাম : বিমান দাস : ১ম সংখ্যা : পৃ—৯ / ভিয়েতনামের জনগণের জন্য বিজ্ঞান প্রকল্পগুলি—বি. জেড : ১ম সংখ্যা : পৃ—২৪ / নগুয়েন থাইবিনের হৃদয় : ভিয়েতনাম জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন : ৫ম সংকলন পৃ—৪ / দক্ষিণ ভিয়েতনামের ছাত্র-আন্দোলনের কয়েকটি অধ্যায় ( ১৯৫৪-'৬৫ ) : তো মিন ত্রাঙ : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ—৬৭

● বিশেষ রচনা ॥ জীবন মাষ্টারের পাঠশালা : অর্নব বন্দ্যোপাধ্যায় : ১ম সংখ্যা : পৃ—৩৪ / পোলো কওরেও টেট্ উৎসব : লে ট্রাঙ : ১ম সংখ্যা : পৃ—৩৬ / কলকাতার Bobany এবং রূপক এবং অব্যর্থ ফাঁদ : সাধন মণ্ডল : ২য় সংখ্যা : পৃ—১০ / লাল সবুজের দেশে : নবীন সেন : ২য় সংখ্যা : পৃ—২২ / 'অপারেশন ফ্লাড' : প্রণব রায় : ৩য় সংখ্যা : প—১৫ / একটি শিক্ষা পর্যটনের অভিজ্ঞতা : জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ : ৮ম সংকলন : পৃ—১৪ / বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে জনসাধারণ : জনৈক বাসযাত্রীর দিনলিপির কয়েকটি পাতা : ৯ম সংকলন : প—৩০

● বিশ্বসাহিত্য

( গল্প ) টানেল : ম্যাক্সিম গোর্কি : ১ম সংখ্যা : পৃ-১৪ / জেনি : ভিক্টর হুগো : ২য় সংখ্যা : পৃ-৬ / বিচিত্র উইল : এন্তয়েন ছ লা সেল : ৩য় সংখ্যা : পৃ-১২ / বহুরূপী : আন্তন. পি. চেকভ : ৪র্থ সঙ্কলন : পৃ-২৯ / মানুষের জন্য : ম্যাক্সিম গোর্কি : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৩৩ / পট্ থিয়েটারের কেল্লা : লুইস কোসি : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৪৭

(কবিতা) চন্নকার গুঞ্জন : গিয়াং নাম : ১ম সংখ্যা : পৃ-২ / 'একদিন তারা প্রশ্ন করবে'...'আমৃত্যু আমরা উত্তর দেব' : অতো রেনে কাস্তিয় ও জন ম্যাথু : ২য় সংখ্যা : পৃ-৪ / আমি একজন যোদ্ধা ( ভিয়েতনামের কবিতা ) হোয়াং হিয়েন নান : ২য় সংখ্যা : পৃ-৯ / আলম-১৫৯২ ( জার্মানীর কবিতা ) : ব্রেটল্ট ব্রেখ ট : ২য় সংখ্যা : পৃ-১৩ / সবুজ পাতারা পুড়ে গেল : নাওয়াল আহ্মদ ( প্যালেষ্টাইন ) : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৪ / শিক্ষার প্রশস্তি : ব্রেখট্ ( জার্মানী ) : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৫ / আমাদের শিক্ষক কিয়েত কে : দাও ভ্যান মিউ ( ভিয়েতনাম ) : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৭

● গল্প ॥ যান্ত্রিক : শংকর বসু : ১ম সংখ্যা : পৃ-৬ / স্থিরচিত্রকলা প্রদর্শনী : দেবনারায়ণ চক্রবর্তী : ১ম সংখ্যা : প-২১ / পটুয়া : শংকর বসু : ২য় সংখ্যা : পৃ-১৪ / পাশাপাশি : ময়ূরবাহন দেব : ৩য় সংখ্যা : প-৫ / সভ্যতার উদ্দেশ্যে : বিমল মুখোপাধ্যায় : ৩য় সংখ্যা : পৃ-৯ / ।

● ছড়া ও কবিতা

কবিতাই শেষ অস্ত্র নয় : দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : ৩য় সংখ্যা : পৃ-৪ / অনেক ক'টা দিন কেটে গেছে : পলাশ দাস. ৩য় সংখ্যা : প-৪ / আমার মাথা ঠেকেছে অনন্ত আকাশে : অমলেন্দু ভট্টাচার্য : ৪র্থ সংকলন : পৃ ৯ / উত্তর পুরুষকে : সব্যসাচী দেব : ৪র্থ সংকলন : পৃ-৫ / ওলোট পালোট : সুজয় সেন : ৪র্থ সংকলন : পৃ-৪ / ঋতু মঙ্গল : কিশলয় সিংহ : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৪ / আয় বোন খুকুমণি : সমীর রায় : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৫ / তফাৎ : অমিত দাস : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৬ / প্রিয়জনের স্মরণে : আবু ইস্ক্রা : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৮ /...২নং সেল থেকে : সুজন সেন : ১০ম সংকলন : পৃ-৪ / কাঁধের থেকে নামাও বোঝা মাথাটাকে জোর খাটাও : সুজন সেন : ৮ম সংকলন : পৃ-৪

● ধারাবাহিক রচনা ॥ ডাঃ নরমান বেথুন : রঞ্জন দেবনাথ : বিশেষ শারদ সংকলন ( পৃ-৯ ), ৮ম সংকলন ( পৃ-৯ ), ৯ম সংকলন ( পৃ-১৪ ), ১০ম সংকলন ( পৃ-৯ ) / দর্শন প্রসঙ্গে : ব্রজেন মণ্ডল : বিশেষ শারদ সংকলন ( পৃ-৫২ ), ১০ম সংকলন ( পৃ-৫ ) / শৈশব (ধারাবাহিক উপন্যাস) : শংকর বসু : ৪র্থ সংকলন ( পৃ-১৬ ), ৫ম সংকলন ( পৃ-১৫ ), বিশেষ শারদ সংকলন ( পৃ-২১ ), ৮ম সংকলন ( পৃ-১৭ ), ৯ম সংকলন ( পৃ-১৪ ), ১০ম সংকলন ( পৃ ১৬ )

● বিবিধ ॥ নাট্যকার ব্রেশট পরিচিতি : সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় : ২য় সংখ্যা : পৃ-২০ / পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সাম্প্রতিক আন্দোলন : জনৈক অধ্যাপক : ৩য় সংখ্যা : পৃ-২৭ / কবি সুকান্ত-জীবন ও সাহিত্য : অলক বসু : ৫ম সংকলন : পৃ-৯ / পাবলো পিকাসো : উমাশংকর চট্টোপাধ্যায় : বিশেষ শারদ সংকলন : পৃ-৪০ / প্রতিবেশী চীন ( চীন প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসু ও শ্রীমতী ইন্দিরা বসুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ) : ৮ম সংকলন : পৃ-২৫ / আকুপাংচার ( চীন প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার ) : ৯ম সংকলন : পৃ-৯ / পত্রিকা পর্যালোচনা ( পল্লব ) : ৯ম সংকলন : পৃ-২৬ / ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস : দানিয়েল লতিফি : ১০ম সংকলন : প-১৭ ।

● চিঠিপত্র ● বিক্ষুব্ধ শিক্ষা জগৎ ● পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ ● পত্র-পত্রিকার দর্পণে ইত্যাদি ।

[ একমাত্র প্রথম সংখ্যা ছাড়া, অন্য সংখ্যা ও সংকলনগুলির কিছু কপি এখনও পত্রিকার কার্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে । দাম পূর্ববত । ডাক খরচ সতন্ত্র । পত্রিকার কার্যালয় যোগাযোগ করুন—সঃ মঃ বীঃ ]

## ঃ নিয়মাবলী ঃ

- প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 'বীক্ষণ' বেরুবে।
- 'বীক্ষণ'-এর সমস্ত বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ এবং বলিষ্ঠ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য রচনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।
- লেখা পাঠানোর সময় লেখক-লেখিকারা, 'বীক্ষণ' প্রধানতঃ যাঁদের জন্য সেই কিশোর-যুব-ছাত্র-সমাজের কথা মনে রেখে লেখা পাঠাবেন বলে আমরা মনে করি।
- 'বীক্ষণ'-এর পাঠক-পাঠিকারা আশা করি এ' ব্যাপারে একমত হবেন যে শুধু বিষয়বস্তুই নয়, রচনার প্রকাশ-ভঙ্গীও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচ্য। প্রকাশভঙ্গী যত সরল হয় ততই ভালো। কিন্তু সাথে সাথে তাকে প্রাণবন্তও হতে হবে। সরল করতে গিয়ে যেন তা শ্লোগানধর্মী হয়ে না পড়ে।
- 'বীক্ষণ'-এর প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে ও কিশোর-যুব-ছাত্র-সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপারে পরামর্শ, মতামত—এসবের জন্যও আমরা আবেদন রাখছি। এগুলি 'চিঠি-পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হবে।
- সমস্ত ধরণের রচনাই কাগজের এক পৃষ্ঠায়, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখে পাঠানোর জন্য আমরা অনুরোধ করছি।
- উপযুক্ত ডাকটিকিট সহকারে পাঠালে অমনোনীত রচনা, অমনোনীত হবার কারণ দেখিয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে।
- 'বীক্ষণ' সম্পর্কে 'বীক্ষণ'-এর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা—এ'দের মতামতের জন্যও আমরা সাদর-আহ্বান রাখছি।
- 'আমাদের কথা' বিভাগটি ছাড়া অন্য রচনাগুলিতে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব রচনাকারীদের।
- যোগাযোগের ঠিকানা :—


"বীক্ষণ কার্যালয়"

৫৯সি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪

সাক্ষাতের দিন ও সময় : রবিবার বাদে যে কোন দিন ;

সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।


- ডাকযোগে টাকা পয়সা পাঠানোর ঠিকানা :


বীক্ষণ ( প্রদীপ মুখার্জী )

৬৩, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২



**কিশোর ও যুব-ছাত্রদের মুখপত্র**

**দ্বিতীয় বর্ষ : বিশেষ শারদ সংকলন, ১৯৭৪**


## সূচী ঃ

যখন আর
যেখানেই থাকুন—
উৎসবে আর আনন্দে
আপনাদের সঙ্গে
ইউকো ব্যাঙ্ক
ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে
সাহায্য করছে।

# আমাদের কথা

সারা দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। কাতারে কাতারে মানুষ—মানুষ বলে যাঁদের আর চেনাই যাচ্ছেনা—খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। যে কোনো খাদ্য, তা মানুষের উপযুক্ত হোক আর না-ই হোক—হ'লেই তাঁদের চলবে। কিন্তু তাও পাওয়া যাচ্ছেনা। নিঃশব্দে তাঁরা মারা যাচ্ছেন। নিঃশব্দে কারণ ক্ষুধা নামক এক বীভৎস 'ব্যাধি', করুণ অসহায় আর্তনাদ ছাড়া তাঁদের শরীর থেকে অন্য সমস্ত প্রতিবাদের শক্তি কেড়ে নিয়েছে।

অনাহারে মৃত্যু অথবা খাদ্যের জন্য অসহায় করুণ আবেদন এবং শিয়াল কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ি করে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা অবশ্য আমাদের দেশে কোনো নতুন ঘটনা নয়। জন্ম থেকেই আমরা এসব শুনতে এবং দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আর যত দিন যাচ্ছে, আমাদের চোখের সামনেই দুইয়েরই পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে উঠছে। কিন্তু অন্য সময় যা কিছুটা ব্যতিক্রমমূলক ঘটনা হিসাবে দেখা দেয়, আজকে হঠাৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেটাই নিয়ম হয়ে উঠেছে। হঠাৎই জনপদের পর জনপদ শ্মশান করে দিয়ে, মানুষ যেন মৃত্যুর এক অন্তহীন মিছিলে সামিল হয়েছে। কিন্তু শুধু মৃত্যুর পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দুর্ভিক্ষকে বোঝা যাবেনা। তার ভয়াবহ অন্তর্বস্তুকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সেটা কি?—অন্য সময় অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানুষের মনে সেই প্রতিকূলতাকে জয় করার যে অদম্য আকাঙ্খা এবং ইচ্ছা তাকে সেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিচালিত করে, দুর্ভিক্ষের সময় সেগুলির সম্পূর্ণ অপমৃত্যু ঘটে। মানুষ সম্পূর্ণভাবে পরাজয়বাদী হয়ে ওঠে। পরাজয়ের এই মানসিকতা তার আত্ম-মর্যাদাবোধ ও অন্য সমস্ত মানবিক অনুভূতিগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। তার সমস্ত চিন্তা-চেতনা জুড়ে তখন যা বিরাজ করে তা হ'ল ক্ষুধা—সন্তান, স্ত্রী, মা-ভাই-বোন কিম্বা অন্য কারও ক্ষুধা নয়—শুধু তার নিজের ক্ষুধা। অর্থাৎ মানুষ আর তখন মানুষ থাকেনা। অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও যে জননী হাসিমুখে তাঁর নিজের মুখের গ্রাস সন্তানের মুখে তুলে দেন, তিনিই তখন সন্তানের খাবার কেড়ে খেয়ে নেন। একজন দু'জনের ক্ষেত্রে নয়, লাখো লাখো মানুষের জীবনে এটা ঘটে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলগুলিতে মানুষের সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের সমাধি রচিত হয়। এই মূহুর্তে আমাদের দেশে তাই হচ্ছে।

কিন্তু কখন হয় এটা? কখন মানুষের প্রতিকূলতাকে জয় করার আশা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়?—যখন প্রতিকূলতার শক্তি তার সংগ্রামের শক্তিকে বহুগুণ ছাড়িয়ে যায় তখনই এটা ঘটে। আমাদের দেশে এই প্রতিকূলতার শক্তি কি? বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং তারই ফলে খাদ্যাভাব?—এগুলি প্রতিকূলতা নিশ্চয়ই। কিন্তু এরাই যদি একমাত্র কারণ হোত তবে তো দেশের কারুরই খাবার পাবার কথা নয়। তাহলে বড় বড় সহরের বিলাসবহুল হোটেলগুলিতে খাদ্য ও পানীয়ের স্রোত বয়ে চলেছে কি করে? এমনকি সহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের সংগঠিত এবং সরব অংশটিও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েননি (যদিও তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা নিঃসন্দেহে ক্রমাগতই বেড়ে চলছে) কেন?—স্পষ্টতই অবস্থাটা সবার পক্ষে সমানরকম প্রতিকূলতা নিয়ে আসে নি। স্পষ্টতই ক্রয় করার মতো ক্ষমতা যাঁদের আছে, এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁদের খাদ্য জুটছে। তাঁরাই এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন,, ন্যূনতম আর্থিক অবলম্বনও যাঁদের নেই। কারা তাঁরা?—যাঁদের পরিশ্রমের অন্নে আমাদের দেহমন গড়ে উঠেছে, ভারতবর্ষের সেই বিপুল কৃষকসমাজ। কেন তাঁদের হাতে অর্থ নেই?—অর্থতো প্রকৃতি সৃষ্টি করেনা, মানুষের সমাজই অর্থের জন্ম দিয়েছে। সুতরাং অর্থের বন্টনে এই অসাম্যের কারণকে খুঁজতে হবে আমাদের সমাজেরই গভীরে। কোথায় লুকিয়ে রয়েছে সেই কারণ? তাকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

দুর্ভিক্ষের এই ধ্বংসলীলা আমাদের সেই খোঁজার প্রচেষ্টাকে জোরদার করুক। আমাদের অন্নদাতাদের এই বিপুল বিপর্যয়ের দিনে আমরা যদি উদাসীন থাকি, তবে তার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। আসুন, আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের বেদনাকে যথাসম্ভব লাঘব করার জন্য ত্রাণকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সাথে সাথে সেই পথ সন্ধানেও বেরিয়ে পড়ি, যে পথে গেলে আমাদের দেশের সমাজটাকেই এমনভাবে বদলে দেওয়া যাবে যাতে এই অসহনীয় অসাম্যকে, যা এই দুর্ভিক্ষের জন্ম দিচ্ছে চিরকালের মতো দূর করা যায়। বৃটিশ-শাসনের সময় থেকে আজও পর্যন্ত, দুর্ভিক্ষের যে ধারাবাহিকতা আমাদের দেশের অগণিত মানুষকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, শ্মশান সৃষ্টি করে চলেছে গ্রামে ও গঞ্জে, সে-দুর্ভিক্ষের দিন শেষ করতে গেলে, এ দেশের মাটি থেকে দুর্ভিক্ষকে চিরতরে নির্বাসন দিতে গেলে—ত্রাণকার্য নয়, সমাজটাকেই কি করে বদলে দেওয়া যায়, তা আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

কবিতা

## তিন প্রেমিকের গান

**সুজন সেন**

মঙ্গলবার (২রা জুলাই) রাত্রে হুগলি জেলার মগরা থানা এলাকায় ব্যানডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে গঙ্গার ধারে নকশাল-পুলিশ সংঘর্ষে তিনজন নকশাল (সামসুল ওরফে কাবুল, মনোতোষ চক্রবর্তী এবং তুষার ব্যানারজি) ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন॥—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা জুলাই॥

সেদিন ছিল গভীর রাত ফুটন্ত বৃষ্টির,
বুকের মধ্যে উথাল পাতাল হৃদয়টা অস্থির,
তিন প্রেমিকের

তিন প্রেমিকের বুকের মধ্যে গভীর ভালোবাসা,
ঘরে ঘরে রোদ বিলানোর জমাট বাঁধা আশা,
সেই আশাতে

সেই আশাতে ঘুরতো তারা সহরে প্রান্তরে,
বুকে বুকে জ্বালাতো ক্রোধ প্রেমের মন্তরে,
শত্রুরা সব

শত্রুরা সব ভালোবাসার আতঙ্কেতে কাঁপে,
খুঁজে বেড়ায় তাঁদের তারা পুরতে লোহার ঝাঁপে,
কোথায় তাঁরা?

কোথায় তাঁরা? পাগলা কুকুর যা নিয়ে তার ঘোরে,
ওরা কিন্তু ঘুরে বেড়ায় জ্যোৎস্না ও রোদ্দুরে,
জ্যোৎস্না প্রেমের

জ্যোৎস্না প্রেমের, রৌদ্র ঘৃণার, শিশির স্নেহমায়ার,
বহন কোরে বুকের ভেতর ওরা পার হয় পাহাড়,
ঝঞ্ঝা ঝড়ে

ঝঞ্ঝা ঝড়ে দুর্বিপাকে দারুণ শীতের রাতে,
তিন প্রেমিকের চলছে চলা মরণ লয়ে হাতে,
(আহা) অমর মরণ

আহা অমর মরণ, সূর্যকিরণ না পোহাতে রাত,
হুগলী নদীর বালির পারে মুক্তির সংঘাত,
বারুদ গন্ধে

বারুদ গন্ধে বাতাস মাতে, কাটে হুতাশ,
তিন প্রেমিকে জনম্ দিল নূতন ইতিহাস,
তিনটি বুলেট্

তিনটি বুলেট্ ছিটকে গেল ব্যর্থ হাহাকারে,
ফুল্ ফুল্ ফুল্ ছড়িয়ে পড়ে হুগলী নদীর ধারে!
কুল্ কুল্ কুল্

কুল্ কুল্ কুল্ গাইছে নদী তিন প্রেমিকের গান,
প্রেমের গান, ঘৃণার গান, শেকল ছেঁড়ার গান!

## সুখা ভুখার পদ্য

**—সুজয় সেন**

(১)

সারা বছর—
করে হ্যাচ্চোর করে প্যাচ্চোর বুকটা,
বুঝি কংসরা করে ধ্বংসবা
গণতন্ত্রের সুখটা।

লোটাকম্বল
নেই সম্বল, খুঁদকুড়ো নেই সন্ধান
তবুও ওদোম না হয় উদোম—
বললেই যাবে গর্দান।

চোখ খুলে রোজ
পড়তো কাগজ? জিনিষের দামে ক্রন্দন।
তবু সান্ত্বনা, গণতন্ত্র না
এইভাবে যারে লম্ফন।
স'ছটাতে
গভীর নিশীথ হে। যাছি মচ্ছর হামলার
বুঝি বিদ্যুৎ ক্ষেতে ক্ষীরদুগ্ধ
চলে গেছে গ্রাম বাংলার।

জনগণ না,
জাবাতো পারেন না, তাইতো বসল ট্যাকসো
জনতা বাজেটে, দুধেতে আমেতে
রামরাজ্যের মকসো।

আঁধারে বন্ধ,
ছেড়েই ছন্দ, দুত্তোর বলি শেষটা

বিনা ত্যায়লে, জোড়া ব্যায়লে
চষে খায় সারা দেশটা।

( ২ )

আগড়ম বাগড়ম ঘরগম ভাজে,
দিভি মিসা করতাল বাজে—
কিলো পাঁচ চালের দাম
সবুজ বিপ্লব, স্বর্গধাম।
আয় ভাইলো মাইলো খাই
মা বইলছেন তৈল নাই
পরতে কাপড় বসন কর

নাজা বাপের টাজা চড়।
সাতাইশ বর্ষের শিশুটি
গণতন্ত্রের যীশুটি।

( ৩ )

এক পেয়াদা, দুই পেয়াদা কিন্তু রাজা কইরে?
রাজা ভাগল, রাণীই আসল দেখরে নয়ন ভইরে।
প্যায়দা যখন প্যাদায় তখন, রাণীর আদর বইতো
চাল ফুরুলে কাঁদিস কেন অন্তত পাস খইতো।
এ খৈ তো বৈ ঠোঁটেই ফোটে নয়তো কড়াই মধ্যে
তাই তো সে খই ভাজিয়ে নিলাম শুখা ভুখার পদ্যে।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

# স্বাধীন চিন্তার জন্য শিক্ষা

মানুষকে কোনো একটি বিশেষ বিষয় শেখানোটাই যথেষ্ঠ নয়। এর মধ্য দিয়ে সে এক ধরণের কার্যকরী যন্ত্রে পরিণত হতে পারে কিন্তু সুষমভাবে বিকশিত একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে না। এটা আবশ্যিক যে ছাত্র মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে একটা উপলব্ধী এবং প্রানবন্ত অনুভূতি অর্জন করবে। কোনটা নৈতিকভাবে ভালো এবং কোনটা সুন্দর সে সম্পর্কেও সে অবশ্যই একটা প্রগাঢ় ধারণা লাভ করবে। অন্যথায়—তার বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে-সুষমভাবে বিকশিত একজন ব্যক্তির চেয়ে একটি সুশিক্ষিত কুকুরের সাথেই তার মিল থাকবে বেশি। তার আশ-পাশের ব্যক্তি-মানুষদের সাথে এবং সমাজের সাথে একটা উপযুক্ত সম্পর্কে স্থাপনের জন্য সে অবশ্যই কি কি উদ্দেশ্য ও প্রেরণা মানুষকে চালিত করে, কি কি তাদের মোহ এবং কি কি তাদের দুঃখ-বেদনা এগুলিকে উপলব্ধী করতে শিখবে।

বহুমূল্য এই জিনিষগুলি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় যারা তাদের পড়ান তাদের সাথে ব্যক্তিগত সংস্পর্শের মধ্য দয়ে, টেক্সটবইয়ের মধ্য দিয়ে নয়—অন্তত প্রধানত তো নয়ই। এটাই হল সেটা, প্রাথমিকভাবে যা সংস্কৃতিকে গঠন করে এবং রক্ষা করে। ইতিহাস কিম্বা দর্শন সংক্রান্ত নিছক শুষ্ক বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নয়, 'হিউম্যানিটিস্'কে যখন আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে সুপারিশ করি তখন এটাই আমার মাথায় থাকে।

আশু প্রয়োজনে লাগবে—এই যুক্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি বা অপরিণত অবস্থায় বিশেষজ্ঞান অর্জন করার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া সেই উদ্দেশ্য বা মানসিকতাকেই হত্যা করে যার উপর সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবন নির্ভর করে, বিশেষজ্ঞের জ্ঞানও তারই মধ্যে পড়ে।

তরুণ মানুষের মধ্যে স্বাধীন বিশ্লেষণমূলক চিন্তার বিকাশ ঘটুক—এটাও মূল্যবান একটি শিক্ষার ক্ষেত্রে আবশ্যক। অত্যন্ত বেশি পরিমাণে এবং বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলি বিষয় (point system) চাপিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত করে তুললে এই বিকাশ অত্যন্ত বেশিরকমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মাত্রাতিরিক্ত বোঝা স্বাভাবিকভাবেই অগভীরতার জন্ম দেয়। পড়ানোটা এমন হওয়া চাই যাতে যা শেখানো হ'ল ছাত্র তাকে মূল্যবান উপহার হিসাবেই গ্রহণ করবে, কঠিন দায়িত্বভার হিসাবে নয়।

# দুর্ভিক্ষ—আজকের ও অতীতের : কিছু পরিসংখ্যান ও বিবরণ

## আজকের ছবি : সোনার বাঙলা আর কতদূর ?

( সংবাদপত্রের ডায়েরী )

**খাদ্যাভাবে কাউকে মরতে দেবো না**

"বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন শনিবার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, খাদ্যসংকট যত তীব্রই হোক না কেন, পশ্চিম বাঙলায় কাউকে না খেয়ে মরতে দেবো না।

—আনন্দবাজার পত্রিকা ; ৫. ৫. ৭৪

সতেরোই সেপ্টেম্বর

"জলপাইগুরি জেলায় ৪০০-র উপর অনাহারে মৃত্যু...আরও মরছে। জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীজগদানন্দ রায় সাংবাদিকদের একথা জানান এবং মণ্ড রন্ধনশালা খুলতে দেরি করার জন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।" ( দি স্টেটসম্যান )

"যদিও জেলায় এবছর খরা হয়নি এবং খোলাবাজারে চাল ও গম পাওয়া গেলেও, বাঁকুড়ার বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ খাদ্যাভাবে দিন কাটাচ্ছেন। ...খাদ্যের অভাব নয়, চড়া দামই এই সংকট সৃষ্টি করেছে। বীজ রোয়ার সময় পার হয়ে যাওয়ায়, দিনের রোজগার শূন্যে এসে ঠেকার ফলে হাজার হাজার ক্ষেতমজুরের হাতে খাবার কেনার কোনো পয়সাই নেই।...দুর্গতির কারণ হিসাবে খরার যে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তা ভুল, কেননা এবছর বৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্ঠ।" (ঐ)

উনিশে

"১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৬'২৫ লক্ষ দুর্গত মানুষকে খাদ্য সরবরাহের লক্ষ্যের জায়গায়, সোমবার পর্যন্ত মাত্র ৫০,০০০ মানুষ চীপ ক্যান্টিন ও লঙ্গরখানা থেকে খাদ্য পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। (ঐ)

বিশে

"দিনহাটা। সারা দিন ভিক্ষার পর শিশুপুত্রকে নিয়ে গ্রামের অসহায় মা ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার ভিক্ষায় বেরোবে।...রাত ভোর হল। শিশু দুটির ঘুম ভাঙল। ঘুম ভাঙল না শুধু মায়ের। শিশু দু'টির বয়স ৩ ও ৬। বেলা বেড়ে চলে, ওরা তখনও জানে না যে ওদের মা আর কোন দিন জাগবে না"।

( যুগান্তর )

"সফরান্তে সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র মোহন বলেন যে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ১২ জন অনাহারে মারা গেছে। হাজার হাজার উপজাতি ঘাস ও গাছের মূল খেয়ে জীবন ধারণ করছে।" (ঐ)

"কৃষ্ণনগর। প্রতিদিন দলে দলে না খেতে পাওয়া, হাত পা ফোলা, রক্তাল্পতার রোগী নানা জায়গা থেকে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে ভিড় করছেন।...বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনশনে মৃত্যুর খবর আসছে। শহরে আবার ফ্যান দাও রব শোনা যাচ্ছে। এছাড়া শহরে ভাত চুরিও শুরু হয়েছে। চোরে ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে।"

( আনন্দবাজার পত্রিকা )

"রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায় বলেন, সাড়ে ৪ কোটি লোকের মধ্যে দেড় কোটি লোক অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। এঁদের বেশির ভাগ ভূমিহীন কৃষক। সন্তোষবাবু স্বীকার করেন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বহু লোক মারা গিয়েছেন। যদিও দেড় কোটি লোক বিপন্ন তবু আড়াই লক্ষ লোকের বেশি লোককে লঙ্গরখানায়-খাওয়ানো সম্ভব হবে না।' (ঐ)

একুশে

"কোচবিহারের লঙ্গরখানায় আজ বন্যার্তদের খিচুড়ি পরিবেশন করা হচ্ছিল। কয়েক লোক ক্ষুধার্ত মানুষের দীর্ঘ কিউ। তার মধ্যে এক মা তাঁর শিশুকে পাশে বসিয়ে রেখেছেন। দাবি করছেন, তাঁকেও তার ভাগ দিতে হবে। খিচুড়ি দেওয়া হল। তখন নির্বিকার মুখে মা তাঁর শিশুকে ফেলে রেখে চলে গেলেন। দেখা গেল শিশুটি আসলে মৃত। এই মৃত শিশুকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মা অপেক্ষা করেছেন। বাড়তি এক থালা খিচুড়ির জন্য। (ঐ)

"শাপলা, শালুক, বুনো ওল, কচুও আর জুটছে না। প্রকৃতির ভাণ্ডার উজাড়। গোটা তমলুক মহকুমা জুড়ে উপোষী মানুষের কান্না। একটু ভাতের ফেনের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা চলেছে অনেক

পর্যন্ত। রোগে অনাহারে রাস্তাঘাটে পড়ে মরছে কেউ কেউ। প্রশাসনিক কর্তারা বিস্ফোরণের ভয়ে শহরকে শান্তি রাখতে ব্যস্ত। গ্রামের কান্নায় কান দেয় কে?...উৎপাদন যা হয়েছে সরকারি হিসাবেই তাতে জেলা জুড়ে হাহাকারের কথা নয়। তবু কেন এই সংকট? লরি ও নৌকা বোঝাই ধান চাল উধাও হচ্ছে ভিন রাজ্যে। দিনের আলোয় রাতের অন্ধকারে নির্ভয়ে। যা যেতে পারছে না লুকোনো থাকছে। ফলে কৃত্রিম অভাব বাড়ছেই।" (ঐ)

"জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র পরিষদ সভাপতি অভিযোগ করছেন যে এই জেলায় ৬০০র ও বেশি লোক অনাহারে মারা গেছেন।"

(দি স্টেটসম্যান)

বাইশে

"ধানে চালে উদ্বৃত্ত বর্ধমান জেলায় অনেক মানুষের মুখে আজ দানা শস্য জুটছে না। মানকচু, কচুশাক, শালুকডাটা, গুগলি, শামুক, শুশুনি, ঘাসের গোড়া—আধসিদ্ধ এই দিয়ে অনেকে উদরপূর্তি করছে। দানাশস্যের অভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে।...শাকপাতা, গুগলি, কচুডাটাসিদ্ধ করে খাবার মতো জ্বালানিরও প্রচণ্ড অভাব অনেকের ঘরের চালে খড় নেই। খুদকুটো কেনবার পয়সা যাদের নেই, লজ্জা নিবারণের কাপড়ও তাদের নেই। শতছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা অনেক যুবতী মেয়ে কুলবধূ দিনের আলোয় ঘরের বাইরে যেতে পারেন না। সন্ধ্যার পর কখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে তারই অপেক্ষায় বসে থাকেন অনেকে।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

"প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন যে অনাহার ও বিভিন্ন রোগে কম করে ১০০০ লোক মারা গিয়েছেন।"

(দি স্টেটসম্যান)

"লোকসভার সদস্য কৃষ্ণপদ হালদার দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে এসে জানিয়েছে যে বাঁকুড়া জেলায় অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে।" (ঐ)

তেইশে

"না খেতে পাওয়া আধপেট খাওয়া কঙ্কালসার মানুষের ঘর থেকে পুলিশ দিয়ে জোর করে কৃষিঋণের টাকা উশুল করে নেওয়া হচ্ছে নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে। দেনার দায়ে ক্রোক করে নেওয়া হচ্ছে তাঁদের অস্থাবর সম্পত্তি।...'স্বয়ংসম্পূর্ণতায়' নদীয়া জেলা এবার প্রথম হয়েছে। কঙ্কালের মিছিলের নদীয়া কি করে 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা'র রেকর্ড করলো? গ্রামে পা দিতেই সমাধান পেলাম। বছরের পর বছর অভাবের তাড়নায় এবং সময়মত সার, বীজ না পেয়ে জমি বেচেছেন অল্পবিত্ত চাষীরা। সে জমি বেনামে সেনামে কিছু লোকের হাতে জমেছে। অন্যদিকে ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়েছে।...ভালুকা যোয়ানো অঞ্চলে সাপ, কাঠবিড়ালী মেরে খাচ্ছেন মানুষ। সাপ অবশ্য সাঁওতালরা আগেও খেয়েছেন। তবে বুনো বাগদীরা এবার কাজ হারিয়ে এমন আকালে পড়েছেন যে বনের কাঠবিড়ালী পর্যন্ত শেষ।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

"পশ্চিম দিনাজপুরের সর্বত্র ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়। ক্ষুধার তাড়নায় ধুঁকছে নেংটী পরা শীর্ণকায় অভুক্তদের দল। কঙ্কালসার শিশুর দল কাঁদছে খিদের জ্বালায়। লঙ্গরখানায় খিচুড়ি বলে যা দিচ্ছে তা স্রেফ হলুদ রংয়ের জল। পরিমাণ তাও আবার মাথাপিছু আধ হাতা।" -(ঐ)

"ক্যানিং শহরে হাজার হাজার অভুক্ত মানুষের ভীড় হচ্ছে। ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। বর্তমানে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৬ হাজার। (যুগান্তর)

"গত মাস থেকে এ পর্যন্ত আসানসোল মহকুমায় মোট ৬টি অনাহার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় এম. এল. এ. জানিয়েছেন।" (ঐ)

চব্বিশে

"মেদিনীপুরের একাংশ পরিদর্শন করে সংগঠন কংগ্রেসের দুই নেতা বলেছেন যে অধিকাংশ মানুষ বনকচু ও চালকুমড়ো খেয়ে আছে। ত্রাণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় প্রচণ্ড কম। (দি স্টেটস্‌ম্যান)

'কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅমিয় কিসকু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মেদিনীপুর জেলার ৭৫% মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। অনেকেই তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছে।' (ঐ)

"২৪ পরগণার সাগরথানায় ২½ বছরের এক শিশুর পিতা তাঁর সন্তানকে খালের জল চুবিয়ে হত্যা করেছে।" (ঐ)

পঁচিশে

"শিল্পী ও তাঁতির দেশ মুরশিদাবাদের গ্রামে আজ 'কাপড়েরও দুর্ভিক্ষ'। কাপড়ের অভাবে একসঙ্গে শাশুড়ি ও বউ ঘর থেকে বের হতে পারেন না।" (আনন্দবাজার পত্রিকা)

ছাব্বিশে

"হাওড়ার দেউলটি স্টেশনের কাছে চাল বোঝাই ট্রেন লুঠ হয়। রাত দুটোয় লাল সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটির পাঁচটি ওয়াগনের তালা ভেঙে ফেলে কয়েকশো মানুষ।" (ঐ)

"সাংবাদিকের প্রশ্ন: এটা দুর্ভিক্ষ কি? রাজ্যপাল: চরম দুর্গতি। আমি সস্তা ক্যানটিন, লঙ্গরখানাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখেছি।

সর্বত্র বুভুক্ষু, বস্ত্রহীন যুবক-যুবতী, শিশুবৃদ্ধ সহায়সম্বলহীন লোকের ভীড়। চোখেমুখে ত্রাস, আতঙ্কের ছাপ।" (ঐ)

"কুচবিহার শহরের রেল প্ল্যাটফরম থেকে মৃতদেহ উদ্ধার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। গত ৫ দিনে ১৬টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। শুধু রেলস্টেশনে নয় কুচবিহার হাসপাতালে প্রায় ৮৮টি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী খবর দিয়েছেন—আগের মাসে কালামাটি গ্রামে ১১ জন লোক না খেতে পেয়ে মারা গেছে।"

(অমৃতবাজার পত্রিকা)

সাতাশে

"মালদহ—খাদ্যাবস্থা ভয়াবহ! অভাব অনটনে খেটে খাওয়া মানুষ ধুঁকছে।...মহিলাদের লজ্জা নিবারণের কাপড় পর্যন্ত জুটছে না।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

অমৃতবাজার পত্রিকায় ছবি—"মর্মান্তিক মৃত্যু। বাঁকুড়া জেলার-রাজগ্রামের এক তরুণ মৃৎশিল্পী ও তাঁর স্ত্রী খিদের জ্বালা এড়াতে কীটনাশক ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শিল্পির বৃদ্ধা মা পাশে বসে দু'হাত চাপড়ে কাঁদছেন।"

"তিন ভাই, ৬ থেকে ১২ বছরের মধ্যে, খেতে পাবার আশায় নিজেদের গ্রাম থেকে মেদিনীপুর শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু ক্লান্তি ও অনাহারে পথের মাঝখানে একজন প্রাণ হারায়। অপর দুজন শহরে কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।" (ঐ)

আটাশে

"কোচবিহার সৎকার সমিতির কর্মীরা দাহ করবার জন্য পয়সা ভিক্ষা করছেন। সৎকার সমিতির কর্মীরা জানালো এমনি পথ ভিক্ষার পয়সা দিয়ে ২।৩টি করে পড়ে থাকা বে-ওয়ারীশ মৃতদেহের সৎকার রোজই করছে।...পয়সা ও খাবার যাদের ভাগ্যে জুটছে না তারাই রাস্তার পাশেই কাতরিয়ে মারা যাচ্ছে। পরিবারের লোকেরা এই মৃত্যুতে কিছুটা কান্নাকাটি করলো, তারপরেই সমস্ত শোক ভুলে পেটের জ্বালায় এগিয়ে চললো লোকালয় বা বাজারে দিকে।... কঙ্কালসার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে ভাতরুটি যদিওবা কোন বাড়ী থেকে পেল—তা আর ঐ ছেলেমেয়েদের মুখে উঠলো না, বড়রাই খেয়ে ফেলছে। ছেলেমেয়েদের খাবার বা-মাকে কেড়ে খেতে অনেক দেখেছি।" (যুগান্তর)

## অতীত

● ইংরেজ সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'—

বাংলা ও বিহারের মহাদুর্ভিক্ষ (১৭৬৯-৭০)

"চাষীরা ক্ষুধার জ্বালায় 'তাহাদের সন্তান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাদের কে কিনিবে, কে খাওয়াইবে? বহু অঞ্চলে জীবিত মানুষ মৃতের মাংস খাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নদীতীর মৃতদেহ ও মুমূর্ষু দেহে ছাইয়া গিয়াছিল। মরিবার পূর্বেই মুমূর্ষু দেহের মাংস শিয়াল কুকুরে খাইয়া ফেলিত।' মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট বেকার সাহেবও এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন। ইংলণ্ডে 'ডাইরেক্টরস্' বোর্ড-এর নিকট লিখিত কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিলের পত্রেও এই দুর্ভিক্ষের এক লোমহর্ষক চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে: 'দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশময় মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, সকল মানুষ ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছে। ইহা বর্ণনার কোন ভাষাই নাই। পুর্ণিয়ার (বিহার) মত একটা প্রাচুর্য পূর্ণ প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়াছে, অন্যান্য স্থানের অবস্থাও সমান ভয়ঙ্কর'।" [সু. রা. ১৪]

"বাংলা ও বিহারের এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক ইংরেজ বণিক-রাজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে প্রাণ আহুতি দিয়া কেবল ইংরেজদের নহে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বণিকরাজের সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের ফলে, বাংলাদেশ, বিশেষত ইহার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি জনমানবশূন্য ও নরকঙ্কালপূর্ণ শশ্মানে এবং ঐ জেলাগুলি বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া হিংস্রজন্তুর আবাস-স্থলে পরিণত হইয়াছিল। এই দুইটি প্রদেশের কারিগর-শ্রেণী মরিয়া প্রায় নিশ্চিহ্ন হইবার ফলে শিল্প প্রভৃতিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই দুই স্থানের মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় আত্ম-বিক্রয় করিয়া প্রাচীন যুগের মত ক্রীতদাসশ্রেণী ও দাস-ব্যবসায়ের সৃষ্টি করে।" [সু. রা. ১৫]

"ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া মহাদুর্ভিক্ষের আবির্ভাব। প্রত্যেকটি দুর্ভিক্ষ ব্যাপকতায়, স্থায়িত্বে ও জীবন-নাশে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দিয়াছে। বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ভারতবর্ষ যেন স্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত হইয়াছে।

"বৃটিশ শাসনের পূর্বেও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে কোন কোন সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু উহাদের প্রায় সকলগুলিই ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে যে সকল অঞ্চলে শস্যহানি ঘটিত এবং অনাবৃষ্টির জন্য যে সকল অঞ্চলে অজন্মা হইত সেই সকল অঞ্চলেই তাহা সীমাবদ্ধ থাকিত। যান-বাহনের সুব্যবস্থা থাকিলে সেই সকল দুর্ভিক্ষ অনায়াসেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হইত। বৃটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম-সমাজের নিয়ন্ত্রনাধীনে বিশেষ অবস্থার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া শস্য ভাণ্ডার থাকিত এবং তাহাদ্বারা দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা পাইত।

"কিন্তু বিজাতীয় বৃটিশ শাসন প্রাচীন ভারতের সকল সামাজিক ও ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়ায় এবং তাহার

পরিবর্তে কোন রক্ষামূলক সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জন-জীবনে দারিদ্র্য ও অন্নাভাবই স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। তাহার ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-নাশকারী মহাদুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। প্রত্যেকটি দুর্ভিক্ষের সময় লক্ষ লক্ষ কৃষক জমি বিক্রয় করিয়া বা ঋণের দায়ে জমিহারা হইয়া কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হইত এবং তাহারাই পরবর্তী দুর্ভিক্ষে সর্বাধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে প্রাণ হারাইত।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেলপথ স্থাপিত হইবার পর হইতে এইরূপ মহাদুর্ভিক্ষের আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সকল সমাজ-বিধ্বংসী মহাদুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহা ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বৃটিশ শাসনের আরম্ভকাল হইতেই দুর্ভিক্ষও নূতন রূপে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান অবদান হইল দুর্ভিক্ষ। নিম্নোক্ত খতিয়ান হইতেই তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধী করা যায়।

### "ভারতের দুর্ভিক্ষের খতিয়ান

| কাল | | স্থান ও বর্ণনা | কারণ ও মৃত্যুসংখ্যা |
|---|---|---|---|
| **বৃটিশ শাসনের পূর্বে** | | | |
| একাদশ শতাব্দী | (দুইটি) | স্থানীয় | অনাবৃষ্টি |
| ত্রয়োদশ ,, | (একটি) | দিল্লীর নিকট | অজ্ঞাত |
| চতুর্দশ ,, | (তিনটি) | স্থানীয় | যুদ্ধের জন্য শস্যহানী |
| পঞ্চদশ ,, | (দুইটি) | ঐ | ঐ |
| ষোড়শ ,, | (তিনটি) | স্থানীয় | অনাবৃষ্টি |
| সপ্তদশ ,, | (তিনটি) | প্রায় সর্বত্র | অরাজকতা, সেচের অভাব ও অনাবৃষ্টি |
| অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ | (চারটি) | স্থানীয় | ঐ |
| **বৃটিশ শাসনের প্রথম ভাগ (১৭৫৭—১৮০০)** | | | |
| ১৭৬৯-৭০ | | "ছিয়াত্তরের মনন্তর" —বিহার ও বঙ্গদেশ | ইংরেজ বণিকদের খাদ্যশস্যের ব্যবসা, অনাবৃষ্টি—বঙ্গদেশে এককোটি ও বিহারে ত্রিশ লক্ষাধিক নর-নারীর মৃত্যু। |
| ১৭৮৩ | | মাদ্রাজ ও বোম্বাই | মৃত্যু সংখ্যা অজ্ঞাত |
| ১৭৮৪ | | উত্তর ভারত | ঐ |
| ১৭৯২ | | মাদ্রাজ, হায়দারাবাদ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, গুজরাট ও মারবাড় | ঐ |

**ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ**

| | | |
|---|---|---|
| ১৮০২ | বোম্বাই | মৃত্যুসংখ্যা অগণিত |
| ১৮০৩-৪ | উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানা | অজ্ঞাত |
| ১৮০৫-৭ | মাদ্রাজ | মৃত্যুসংখ্যা বিপুল |
| ১৮১১-১৪ | ঐ | সামান্য |
| ১৮১২-১৩ | রাজপুতানা ও পাঞ্জাব | বিশ লক্ষাধিক |
| ১৮২৩ | মাদ্রাজ | বিপুল সংখ্যা |
| ১৮২৪-২৫ | বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | অজ্ঞাত |
| ১৮৩৩-৩৫ | মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোম্বাই | অগণিত |
| ১৮৩৭-৩৮ | উত্তর ভারত | দশ লক্ষাধিক |

**ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ**

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৫৪ | মাদ্রাজ | অজ্ঞাত |
| ১৮৬০-৬১ | উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব | পাঁচ লক্ষ |
| ১৮৬৫-৬৬ | উড়িষ্যার ছয়টি জেলা, বিহার, উত্তর-বঙ্গ ও মাদ্রাজ | যথাক্রমে ১লক্ষ ৩০ হাজার, ১লক্ষ ৩৫ হাজার, ৪লক্ষ ৫০ হাজার। |
| ১৮৬৮-৬৯ | রাজপুতানা | ১২ লক্ষ ৫০ হাজার |
| | উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ২ লক্ষাধিক |
| | পাঞ্জাব | ৬ লক্ষ |
| | মধ্য-ভারত | ২ লক্ষ ৫০ হাজার |
| | বোম্বাই | অজ্ঞাত |
| ১৮৭৩-৭৪ | বঙ্গদেশ, বিহার, অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ঐ |
| ১৮৭৬-৭৭ | বোম্বাই | ৯ লক্ষ |
| | হায়দারাবাদ | ৭০ হাজার |
| | মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অযোধ্যা | মোট ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার |
| | মহীশূর | ১১ লক্ষ |
| ১৮৮০ | দাক্ষিণাত্য, বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, হায়দারাবাদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল | |
| ১৮৮৪ | বঙ্গদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর ও মাদ্রাজের কতিপয় জেলা | |

| | | |
|---|---|---|
| ১৮৮৬-৮৭ | মধ্য ভারত | |
| ১৮৮৮-৯০ | বিহার, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, মাদ্রাজ, কুমাউন ও গাড়োয়াল | ১৫ লক্ষ |
| ১৮৯১-৯২ | মাদ্রাজ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও ব্রহ্মদেশ | ১৬ লক্ষ ২০ হাজার |
| ১৮৯৫-৯৭ | বুন্দেলখণ্ড, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, ব্রহ্মদেশ ও মধ্য ভারত | ৫৬ লক্ষ ৫০ হাজার |
| ১৮৯৯-১৯০০ | ভারতের প্রায় সর্বত্র | ২৫ লক্ষ |
| ১৯০১ | গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের দক্ষিণাঞ্চল | ৭ লক্ষ ৫ হাজার |

"ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৪-১৯০১—এই সাতচল্লিশ বৎসরে) বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার।" [সু. রা.; ১৭৫-১৭৮]

পরিসংখ্যান শুধু পরিমাণগত দিকটির পরিচয় দেয়। কিন্তু যে মর্মান্তিক ঘটনাগুলি এর অন্তর্বস্তু, তাকে উপলব্ধি করতে অষ্ট্রেলিয়ার দুইজন মানব দরদী লেখক লেখিকার ১৯৬৭-র বিহারের দুর্ভিক্ষের সময় লেখা একটি উদ্ধৃতি আমাদের সাহায্য করবে।

"ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেবার জন্য পরিসংখ্যানকে কাজে লাগাবার প্রয়োজন আছে। তাই বলে ক্ষুধা যেন একটি পরপর সাজানো সংখ্যার মতো বিমূর্ত ব্যাপার বা প্রোটিনের 'গ্রহণযোগ্য' মানের শতকরা হিসেব দেওয়া একটি তালিকা, এরকম ভাবার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

"অপুষ্টি-পীড়িত জননীর শরীরের অস্থি থেকে যে অজাত শিশুটি ক্যালশিয়াম শুষে নিচ্ছে, তারই নাম ক্ষুধা; ক্ষুধা হল সেই কিশোরটি যে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয় কাশছে; পিতার দুশ্চিন্তা ও তিক্ত হতাশ, মাতার আতঙ্ক ও নৈরাশ্যকে বলা হয় ক্ষুধা। সারা জীবন ধরে, মাঠে-ঘাটে, বাসগৃহে, সর্বত্রই এ উপস্থিত রয়েছে,—কারণ ক্ষুধার্ত মানুষ একজন ব্যক্তি, একটি সংখ্যা নয়। ক্ষুধা একটি শত্রু—যে তোমার যোঝবার সমস্ত শক্তিকে হরণ করে নেয়, যে তোমাকে এমনভাবে নিঃশেষ করে দেয় যার ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, আনন্দ বা আকাঙ্খা কিম্বা মর্যাদাবোধ কোনটাই আর অবশিষ্ট থাকে না। ক্ষুধা মানুষকে কলঙ্কিত করে। ক্ষুধা মানুষের আত্মার প্রতি এক চূড়ান্ত অপমান।" [[illegible] ও [illegible] বিহার দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট, ১৯৬৬]

● অতীতের ক্ষুধার ছবি

১৮৯৫-৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ : মিরপুর অনাথ আশ্রম

"ভারতীয় শিশুরা সাধারণত প্রাণবন্ত, বুদ্ধিমান, এবং সুন্দর। তাদের চোখগুলি দামী পাথরের মত উজ্বল।

"অফলে ঢোকার পর প্রথমে আমার চোখে পড়ল একটি পাঁচ বছরের শিশু, যে একটি দরজার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতগুলি আমার বুড়ো আঙুলের চেয়েও সরু, পাগুলি তার চেয়ে মোটা নয়। মাজার হাড়গুলি খোলাখুলি দেখা যাচ্ছে, বুক ও পিঠের হাড়গুলি তাদের খাঁচার মতো চামড়ার ভেতর দিয়ে যেন ঠেলে বেরুতে চাইছে। নিশ্চল ও শুষ্ক দৃষ্টি, হাড় বের করা মুখের ভাবটি গম্ভীর, বিষণ্ণ একজন বৃদ্ধের মতন। এই ছোট্ট কঙ্কালটির মধ্যে, যে একটি হৃষ্টপুষ্ট, সুখী শিশু হতে পারত—সমস্ত ইচ্ছা, আবেগ এবং প্রায় সমস্ত অনুভূতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তাকে কথা বললে সে কিছু শুনতে পাচ্ছিল না বলেই মনে হচ্ছিল। আমি আমার বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে তাকে তুলে নিলাম। তার ওজন ৭ বা ৮ পাউণ্ডের বেশি হতে পারে না। ক্ষুধাই সম্ভবত তার সবথেকে পুরাতন স্মৃতি এবং সে কখনও একবারের পুরো খাবার পেয়েছে, এটা হতেই পারে না। আজ, যারা তাকে এই পৃথিবীতে এনেছিল তারা হয়ত তাকে ছেড়ে চলে গেছে বা মারা গেছে। দুই একদিনের মধ্যে তার জীবনও শেষ হয়ে যাবে। তার গায়ের চামড়া রীতিমত শীতল, শুকনো এবং কর্কশ। প্রথম থেকে যন্ত্রণাই হচ্ছে তার একমাত্র অভিজ্ঞতা। শিশুরা যে আরাম পায় তা সে কখনও জানেনি কিম্বা কল্পনাও করেনি।" ['এ ট্যুর থ্রু দি ফেমিন্ ডিস্ট্রিক্টস্ অফ ইণ্ডিয়া'—এফ. এইচ. এস. মারওয়েদার]

**দুর্ভিক্ষের আরেকটি ছবি**

৭৫ বছর আগে (স্টেটসম্যান—৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯)

"লাহোরের সংবাদপত্র লিখছে যে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষের উপর পড়তে শুরু করেছে, এবং মাঝে মাঝেই শস্য লুঠ হবার ঘটনা কানে আসা সম্ভবত আশ্চর্যের কিছুই নয়। ২৮শে আগষ্ট রাত আটটা থেকে নটার মধ্যে গুরগাঁও থেকে ১৩ মাইল দূরে ধানাউলা গ্রামের কাছে একদল লুটেরা শস্যের বস্তা ভর্তি এক সারির শকটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ছয়টি বস্তা নিয়ে সরে পড়ে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষা দুটিরই জন্য লাঠি ব্যবহার করা হয়, যদিও কেউই নিহত হয় নি।" (দি স্টেটসম্যান—৫. ৯. ৭৪)

সূত্র : সুপ্রকাশ রায় [সু. রা.], ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ১৯৬৬।

**ছাত্রআন্দোলনের রিপোর্ট**

# বিহারের বর্তমান ছাত্রআন্দোলন : পটভূমি, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র

**—ছাত্র প্রতিনিধি**

## প্রস্তুতি পর্ব

সারা দেশ আজ মূল্যবৃদ্ধি আর বেকারী সমস্যার বিরুদ্ধে ফুঁসছে। আর এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ, রেলস্ট্রাইক হোক আর ছাত্র আন্দোলনই হোক, সব সুযোগেই জন-অসন্তোষের চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু বিহারের বর্তমান ছাত্রআন্দোলনের সূত্রপাত পূর্ণাঙ্গ এই উদ্দেশ্য নিয়ে হয় না—পরিস্থিতিই তাকে এদিকে টেনে নিয়ে গেছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ইউনিয়ন সব ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে একটি কনভেনশনের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা এবং আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করা। কনভেনশনে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সম্বন্ধীয় ১৮ দফা দাবির ভিত্তিতে ১৮ই মার্চ থেকে বিহার বিধানসভা ঘেরাও করার প্রস্তাব আনা হয়। মূল্যবৃদ্ধি, ভ্রষ্টাচার আর বেকারীর বিরুদ্ধে দাবি তখনও প্রধান হয়ে ওঠে নি। কিন্তু আন্দোলন যতো বিস্তারলাভ করেছে অন্যান্য দাবির চাইতে এই দাবিই ততো বেশী আলোচিত হয়েছে—এবং ধীরে ধীরে এটাই মূল দাবিতে পরিণত হয়েছে। আর তারই ফলে, পরবর্তীকালে শিক্ষা সংস্কারের অধিকাংশ দাবি গফুর-সরকার মেনে নিলেও, আন্দোলনের তীব্রতা বিন্দুমাত্র কমেনি।

* রিপোর্টটি জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের হাতে এসেছে। স্বভাবতই রিপোর্টটি অসম্পূর্ণ। কারণ আন্দোলন এখনও চলছে। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের উপর আরও লেখা প্রকাশের ইচ্ছা রইল।—সঃ মঃ বীঃ

যাহোক, এই কনভেনশনে সব কটি ছাত্রসংগঠনকে নিয়ে মিলিত, মোর্চা গঠনের একটা প্রয়াস থাকলেও তা সফল হয়নি। দক্ষিণপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলি অযথা কমিউনিষ্ট-বিরোধী প্রচারের মধ্যে গেলে এ আই এস এফ, এস এফ আই, বি এস এ-সহ অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র-সংগঠনগুলি কনভেনশন বয়কট করে। অবশিষ্টরা তারপর ১৮ই মার্চ থেকে উপরোক্ত দাবির ভিত্তিতে সমস্ত বিহারে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮ই মার্চ রেডিয়াতে পুলিশের গুলী চলে। প্রায় ১৬ জন মারা যান। ১৮ই মার্চের পর একমাত্র এ আই এস এফ ছাড়া প্রায় সব ছাত্রসংগঠনই এই আন্দোলনের সমর্থনে নেমে আসে। এ আই এস এফ সরকারের সমর্থকের ভূমিকা নেয়।

## সরকারী দমন- সংগঠনের অভাব

১৮ই মার্চের বিধানসভা ঘেরাও এবং তার পরবর্তী ঘটনা প্রশাসনযন্ত্রের ব্যর্থতা, সহরে কয়েক ঘন্টার জন্য গুণ্ডাদের রাজত্ব, অগ্নি-কাণ্ড, লুটপাট এবং সি আর পি ও মিলিটারীর যথেচ্ছ গুলী চালনায় প্রায় ৬০-৭০ জনের মৃত্যু - প্রায় সকলেরই জানা। পরদিন থেকেই আন্দোলন সারা রাজ্যের সব সহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথেই প্রায় সবকটি বড় সহরে দিনরাত কার্ফিউ বলবৎ হয়ে যায়। এবং পাশাপাশি চলে রাজ্যের সর্বত্র পুলিশ, সি আর পি, বি এস এফ এর প্রচণ্ড দমন অভিযান।

প্রায় দশ দিন ধরে এই কার্ফিউ এবং পুলিশ-রাজ চলে। ছাত্র এবং জনতা সম্পূর্ণ অসংগঠিত থাকায় কোথাও কোথাও সামান্য স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধ ছাড়া দমন অবাধভাবে চলতে থাকে। এছাড়া ছাত্রসংঘর্ষ সমিতির বেশিরভাগ নেতাই ছিলেন কাগজ কলমে নেতা, কাজে অপদার্থ। ফলে তারা উল্লেখযোগ্য কিছু করতে সক্ষম হননি। এই দমনই প্রকৃত পক্ষে জন-আন্দোলনের রাস্তা প্রস্তুত করে দেয়।

প্রতিবাদের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল যে সামান্য সময় কার্ফিউ থাকে না তখন ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে প্রতিবাদ মিছিল বের করা বা সভা করা। কিন্তু সংগঠনের অভাবে কোনো পার্টিই যথেষ্ট পরিমান শক্তি সমাবেশ করতে পারে না। পুলিশও এ জাতীয় সব প্রচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করে এবং রামানন্দ তেওয়ারী, কর্পুরী ঠাকুর প্রভৃতি অনেক নেতাকেই ১৪৪ ধারা ভাঙার 'অপরাধে' গ্রেপ্তার করে।

মুজঃফরপুর, ভাগলপুর ইত্যাদি সহরে পুলিশী দমন চরমে পৌঁছায়—এবং বহু নেতৃস্থানীয় ছাত্র গ্রেপ্তার এড়াতে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। এছাড়া স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়াতে ছেলেরা গ্রামে ফেরে এবং এভাবে গ্রামেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

বিহারের বর্তমান ছাত্রআন্দোলন/নয়

কার্ফিউর মধ্যে দোকানদাররা জিনিষের দাম যথেচ্ছভাবে বাড়াতে সুরু করে। তখন কোনো কোনো জায়গায় স্থানীয় ছাত্র-তরুণরা দোকানের উপর অভিযান চালিয়ে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার প্রচেষ্টা চালায়। স্বতস্ফূর্ত এই অভিযানগুলির মধ্যেই ছিল পরবর্তী সময়ের ছাত্রদের 'নিগরাণী' সমিতির (ভিজিলেন্স কমিটি) বীজ।

**জন-আন্দোলন**

প্রথম প্রতিবাদ মিছিল বার করতে সমর্থ হন জয়প্রকাশ নারায়ণ। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাঁর নেতৃত্বে দশ হাজার ছাত্র, জনতা, সর্বোদয়ী ও মহিলাদের এক মৌন মিছিল বের হয়। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় তাঁরা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মুখে কাপড় বাঁধতে ও হাত পিছনে রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুলিশের অনুমতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই মিছিলকে উপলক্ষ্য করে প্রায় সমস্ত পাটনার লোক রাস্তায় নেমে আসে। জনতার বিক্ষোভ কোন স্তরে পৌঁচেছে তা পরিস্ফুট হয়ে পড়ে।

খুব শীঘ্রি জন-আন্দোলনের জোয়ার শুরু হয়। এপ্রিলের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সপ্তাহে সারা রাজ্যে অজস্র মিছিল সংগঠিত হয়—নানা বর্ণের, নানা ধরণের মিছিল—সাধারণ মিছিল, মৌন মিছিল, মশাল জুলুস, সাইকেল জুলুস, মহিলাদের জুলুস, ইত্যাদি ইত্যাদি। জয়প্রকাশের এবং ছাত্রসংঘর্ষ সমিতির আহ্বানে মহল্লা মহল্লায় বারো ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টার অনশন শুরু হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই হাজার হাজার অনশন শিবির শুরু হয়ে যায়—এক পাটনা সহরেই এক সময় প্রায় দেড়শো অনশন শিবিরে প্রায় এক হাজার জন অনশন করেছেন। বাড়ীর মেয়েরা বউয়েরা রাস্তায় অনশন শিবিরে এসে বসেন। আট-দশ বছরের বাচ্চারা দল বেঁধে 'ধরণা' দিতে থাকে দাদাদের দরজায়: একদিন তাদের অনশনে বসতে দিতে হবে। রিক্সাওয়ালারা, অন্য মজুদুররা অনশনে বসেন, প্রেস কর্মচারীরা, অফিসের চাকুরেরাও। গুজরাটের অনুকরণে তিন রাত্রি থালা বাজিয়ে 'মৃত্যুঘণ্টা''র কার্যক্রম নেওয়া হয়। তাও প্রচণ্ড সমর্থন পায়।

এবং জন-আন্দোলনের এই বিস্তৃতির মাধ্যমে পুরানো ছাত্রনেতাদের জায়গায় মহল্লায় মহল্লায় দেখা দেয় নতুন নতুন মুখ—তাঁরা অবশ্য তখনো শুধুমাত্র মহল্লারই সংগঠক।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে রাজ্য ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি সরকারী অফিসগুলোয় সত্যাগ্রহ করার কার্যক্রম নেয়। রাজ্যের অনেক সরকারী অফিসের কাজই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই কার্যক্রমও, অহিংস সত্যাগ্রহের পদ্ধতির বিফল হওয়ায় এবং সংগঠনের অভাবে, ধীরে ধীরে ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই সময় গয়ায় পুলিশ, সি আর পি বর্বর দমন অভিযান চালায়। যারা রাস্তার উপর এবং অফিসে পিকেটিং করছিল তাদের এবং মহিলাদের উপর সি আর পি বর্বরভাবে আক্রমণ করে। জনতা প্রতিরোধ করতে এলে বেপরোয়া গুলী চলে এবং তারপর ঘরে ঘরে ঢুকে গুলী, লাঠি এবং মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়। এ ঘটনায় প্রায় ৩০ জন মারা যায়। সমগ্র বিহার, বিশেষ করে ছাত্র সমাজ গর্জে ওঠে। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে জয়প্রকাশ চিকিৎসার জন্য ভেলোরে চলে যান। তার আগে তিনি ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির হাতে পাঁচ সপ্তাহের কার্যক্রম দিয়ে যান। এই কার্যক্রম অনুসারে ২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে প্রচার চলে। পথসভা, প্রভাতফেরী, সভা, মিছিল, পোষ্টার, কবি সম্মেলন, চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে অন্তত রাজ্যের সমস্ত সহরই অন্য চেহারা নেয়। গ্রামেও বিভিন্ন জায়গায় এ আন্দোলন পৌঁছায়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সক্রিয় ছাত্রদের মনে প্রশ্নের উদ্ভব হয়—এসব কেন? শুধু প্রচার করে কি হবে? লড়াই কই? কেন জয়প্রকাশের কার্যক্রমে বুড়োবুড়ীদেরও যা কাজ, নওজোয়ান ছাত্রদেরও তাই? জনসাধারণ প্রশ্ন করতে শুরু করেন—এসব করে হবে কি—দাম ত সেই একই রকমভাবে বেড়ে চলেছে। গয়ায় পুলিশের বর্বর অত্যাচারে সবাই উত্তেজিত—জয়প্রকাশের 'হামলা চাহে জৈসা হোগা, হাথ হমারা নহী উঠেগা'র বদলে শ্লোগান ওঠে 'খুন কা বদলা খুন সে লেংগে', 'জিনা হৈ তো মরণা শিখো, কদম কদম পর লড়না শিখো'।

বহু সক্রিয় ছাত্র এবং যুবক ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে সরে যেতে থাকে—আর তাদের মধ্যেকার অপেক্ষাকৃতভাবে এগিয়ে থাকা অংশ ধীরে জয়প্রকাশের কার্যক্রমের অসারতা সম্বন্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে এবং জঙ্গী কার্যক্রমের দিকে পা বাড়ায়। মনে রাখতে হবে এই সব ছাত্রের কাছেই মাত্র কিছুদিন আগেও জয়প্রকাশ অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন।

**নতুন সংগঠন**

জয়প্রকাশের কার্যক্রমের দ্বিতীয় সপ্তাহ (১-৭মে) ছিল 'সংগঠন সপ্তাহ'। সারা সপ্তাহ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে ৬ই এবং ৭ই তাদের শিক্ষণ শিবির করার কথা ছিল। কিন্তু লোকের চিন্তাধারা অন্য

থাত নেওয়ায় এ সপ্তাহে খুব সামান্যই স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় হয় এবং শিক্ষণ শিবির আর করা সম্ভব হয় নি।

বিপরীতে নতুন নেতৃত্বের আত্ম প্রকাশ ঘটতে থাকে। পাটনা এবং ভাগলপুরের ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি রেল স্ট্রাইকের সমর্থনে ৮ই মে পাটনা এবং ভাগলপুর বন্ধের ডাক দেয়। বন্ধ অনেকাংশে সফল হয়।

কিন্তু সর্বোদয়ী নেতারা, জয়প্রকাশের প্রতিনিধি আচার্য রামমূর্তি, বিহার রাজ্য ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি—সকলেই এই বন্ধের বিরোধিতা করেন। এরা জয়প্রকাশের কার্যক্রমের বাইরে কাউকে যেতে দিতে রাজী নন—এবং রাজী নন নতুন নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিতে। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন—পাটনা বা ভাগলপুর স্থানীয় ছাত্র সংঘর্ষ সমিতিগুলো স্থানীয় সক্রিয় ছাত্র-তরুণদের নিয়ে তৈরী, যারা প্রধানত আন্দোলনের মাধ্যমে উঠে আসছে। বিপরীতে বিহার রাজ্য ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি "ঝানু" "ঝানু" ছাত্রনেতাদের নিয়ে তৈরী। সাংগঠনিক বিচারে স্থানীয় কমিটিগুলো এরই শাখা, আর জয়প্রকাশ এবং সর্বোদয়ীরা এর সহযোগী।

কিন্তু রামমূর্তি বা রাজ্য ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির এই বিরোধিতা সত্ত্বেও, আংশিকভাবে হলেও, এই সফল বন্ধ উদীয়মান নতুন শক্তির ইঙ্গিত বয়ে আনে। সর্বোদয়ী বা "ঝানু" ছাত্রনেতারা বন্ধের কার্যক্রমের বিরোধিতা করে সক্রিয় ছাত্রদের আরো বিরাগভাজন হন, এবং এইভাবে জয়প্রকাশের অনুগামী এবং লড়াকু ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্যটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে এবং পরে বিহারের আরও অনেক জায়গায় ছাত্ররা রেলস্ট্রাইকের সমর্থনে বন্ধ এবং হরতাল করে।

জয়প্রকাশ এবং তার সহযোগীদের নেতৃত্বের উপর আস্থা আরও কমে যায় মে'র দ্বিতীয় সপ্তাহে, যখন 'বিধানসভা বিঘটন সপ্তাহে'র কার্যক্রম শুরু হয়। অনুরোধ এবং সত্যাগ্রহমূলক কার্যক্রমের ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন 'জয়প্রকাশ-অনুরাগী' এবং জনসংঘী সদস্য ছাড়া আর কেউই 'ইস্তফা' দেন না এবং সমগ্র কার্যক্রম স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়। সক্রিয় ছাত্রদের প্রবল বিরোধিতার মুখে জয়প্রকাশের কার্যক্রমের শেষ দু'সপ্তাহের কাজ ভেসে যায়। ছাত্র-যুবকরা জঙ্গী লড়াইয়ের কথা বলতে থাকে। সবচেয়ে সক্রিয় কর্মীরা ছাড়া অন্য প্রায় সবাই আন্দোলন থেকে সরে যায়।

আর তারই সুযোগে শাসকদল এবং তার অনুগামীরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সি পি আই মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে, প্রকৃত পক্ষে 'বিধানসভা ভঙ্গ করতে দেব না' এই চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে। কংগ্রেসের তরফ থেকে 'ইন্দিরা ব্রিগেড' প্রভৃতি গুণ্ডাশক্তির মহড়া শুরু হয়। পাটনা 'ইন্দিরা ব্রিগেড' অফিসে একদিন তাদেরই রক্ষিত বোমা ফাটে। ছাত্ররা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে এই সব গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে জয়প্রকাশের অহিংস নীতি চলতে পারে না। রাজ্যের বেশ কয়েক জায়গায় আন্দোলনকারী ছাত্রদের সাথে এই সব গুণ্ডাদের সংঘর্ষ হয়ে যায়। গোটা মে মাসের তৃতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহ জুড়ে খালি এই খবর।

জয়প্রকাশ এবং ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের ডাক দেয়। এই সময় কাগজে বিধানসভার অধিবেশন জুনে ফের বসার কথা ঘোষণা হয় এবং ফের একবার বিধানসভা অভিযান করার প্রস্তাব ওঠে। ঠিক হয় ৫ই জুন জয়প্রকাশের নেতৃত্বে বিধানসভা অভিযান করা হবে।

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হ'ল ছাত্রদের 'নিগরানী সমিতি'র কাজ ও তার বিস্তার। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সমতা রাখায় এই কাজ খুবই সমর্থন লাভ করে। এ সম্বন্ধে পরে আসছি।

**বর্তমান অবস্থা**

৫ই জুন যদিও জয়প্রকাশের কার্যক্রম ছিল সারা বিহারের ছাত্রদের মিছিল নিয়ে রাজ্যপালের হাতে সংগৃহীত স্বাক্ষরগুলো দিয়ে আসা। কিন্তু জনতা এটাকে শক্তি প্রদর্শন হিসাবেই নেয়। সরকার একে বানচাল করার অনেক চেষ্টা করে—ট্রেন থেকে ছাত্রদের নামিয়ে দেয়। বাস বন্ধ করে রাখে, লরীতে ছাত্রদের দেখলে পেট্রল পাম্প পেট্রল দিতে অস্বীকার করে—সি আর পি দিয়ে পেট্রল পাম্পগুলো ঘিরে রাখা হয়, এসব সত্ত্বেও সেদিন প্রায় চার-পাঁচ লাখ জনতা, বিশেষ করে ছাত্রদের জমায়েত হয়—যাদের মধ্যে শুধু বিহারের সব কোণ থেকেই নয়, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরাও ছিল। ৫ই জুনের পর থেকে অনেক বড় মিছিল পাটনায় হয়েছে—কিন্তু এত বড়, এত জঙ্গী মেজাজের মিছিল খুব কমই হয়েছে।

কিন্তু পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো সেদিন এই বিশাল প্রদর্শন শুধু রাজ্যপালের কাছে কাগজের বস্তা জমা দেওয়ার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায়। রাজ্যপাল তখনই একে কোনো গুরুত্ব না দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেদিনই জয়প্রকাশ সভায় নতুন কার্যক্রম ঘোষণা করেন—বিধানসভার সামনে এবং সদস্যদের বাড়ীর সামনে সত্যাগ্রহ এবং ধর্ণা দেওয়া, বাই-ইলেকশন হতে না দেওয়া, এক বছর স্কুল-কলেজ বন্ধ রেখে আন্দোলনে যোগ দেওয়া, ট্যাক্স বন্ধ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে জয়প্রকাশ সমগ্র আন্দোলনকে শুধুমাত্র বিধানসভা ভঙ্গ করার দিকে ঠেলে দিতে চান।

৭ই জুন থেকে বিধানসভার সামনে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। কার্যক্রম পছন্দসই না হওয়ায় সত্যাগ্রহীর সংখ্যা প্রথম থেকেই খুব কম ছিল—ধীরে ধীরে আরও কমে আসতে থাকে। কোনো বিশদ রূপ-রেখা না থাকায় ট্যাক্স বন্ধ করার কার্যক্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার, পক্ষে ছাত্রদেরও সমর্থন পাওয়া যায় না। এক কথায় জয়প্রকাশের কার্যক্রম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

আর অন্যদিকে এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত নতুন শক্তিগুলো কোনো কার্যক্রম ঘোষণা করেননি—যদিও এ সম্বন্ধে তারা বিচার করছেন এমন রিপোর্ট আছে। তারা যদি উপযুক্ত নতুন কার্যক্রম না দিতে পারেন তবে এ আন্দোলনের অপমৃত্যু হবে। আর যদি তারা তা দিতে পারেন তবে বিহারের মাটিতেই ধীরে ধীরে জয়প্রকাশের সমাধি রচিত হবে।

## ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

এ আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে আন্দোলন এখনও থামে নি—বা থামতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে এটা শুধু বিধানসভার লড়াই মনে হলেও, তা নয়। জনসাধারণ সমস্যার চাপে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। জনসঙ্ঘ এবং জয়প্রকাশ ইত্যাদিরা মিলে গফুর ইন্দিরা-সি পি আই ইত্যাদি "রাশিয়ার দিকে ঝোঁকা" নেতা এবং পার্টিদের এই সুযোগে অপদস্থ করতে চেয়েছে—এবং ইন্দিরা-সি পি আই-রাও তাই প্রাণপণ বাধা দিয়েছে। বিধানসভা ভেঙে দিলে ব্যবস্থার তো কোনো ক্ষতি হয় না। কাজেই ইন্দিরা এবং জয়প্রকাশ মিলে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে জন-আন্দোলনকে হয়ত সাময়িকভাবে থামিয়ে দিতে পারত—গুজরাটের মতো, অবস্থার উন্নতি হয় কিনা দেখবার জন্য জনতা তখন আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াত। কিন্তু বিধানসভা ভঙ্গের এই দাবি এখন আর শুধু এটুকুতে দাঁড়িয়ে নেই—জয়প্রকাশজীদের মতে এর সাথে ইন্দিরা, সি পি আই ইত্যাদি "রাশিয়া পন্থী" ব্লকের শক্তির প্রশ্ন জড়িত। অন্য দিকে ইন্দিরা এবং তার সমর্থকরা মনে করেন এটা ভাঙতে অকৃতকার্য হলে জয়প্রকাশ জনসংঘ ইত্যাদি "আমেরিকাপন্থী গোষ্ঠীর" অনেক দুর্বল হয়ে যাবে। এজন্য দুপক্ষই একে অন্যকে "আমেরিকা" এবং "রাশিয়ার" দালাল বলে সোরগোল করছে এবং বিধানসভা এদের শক্তি পরীক্ষার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যে আন্দোলন লক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেছে বলে ইন্দিরাদের খুশী হওয়া উচিত ছিল তার বিরুদ্ধেই তারা প্রচণ্ড দমননীতি চালাচ্ছে। ৫ই জুনের মতো শুধুমাত্র কাগজ জমা দেওয়ার মিছিলকে বানচাল করার জন্য এরা বিরাট আয়োজন করেছে। শতাধিক ভ্যান এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাটনা শহরের উপর দিয়ে সি আর পির মিছিল (সরকারী ঘোষণা অনুসারে) বার করে এরা সারা ভারতের মধ্যে কুৎসিত শক্তিপ্রদর্শনে নীচতম উদাহরণ রেখেছে। "ইন্দিরা ব্রিগেডকে" দিয়ে ৫ই জুনের শান্তিপূর্ণ জনতার উপর গুলী চালিয়েছে। ৫ই জুনের সমান্তরাল ৩রা জুন সি পি আই 'বিধানসভা ভঙ্গ হতে দেব না' এই দাবিতে মিছিল বের করেছে। এমনকি হাজারীবাগে, আরায় এরা নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের গুপ্তহত্যা পর্যন্ত করিয়েছে।

সরকারী দমনযন্ত্রের তুলনায় জনসংঘ ইত্যাদিদের শক্তি কম। কিন্তু পরিমিত সামর্থ্যের মধ্যেও এরা কম যায় না। ১৮ই মার্চের লুঠতরাজ, অগ্নিকাণ্ডের পিছনে যে সি আই এ-র হাত ছিল এটা প্রায় নিশ্চিত। জয়প্রকাশ আহ্বান করেছেন যে বাই-ইলেকশনে যেন একটা ভোটও না পড়তে পায়। অবশ্যই এটা লাঠিবাজী ছাড়া হবে না। বিশেষত নেতারা যখন বিধানসভার সদস্যতার উপরেই বাঁচেন, তখন বিধানসভা ভঙ্গ না হলে ইতিমধ্যে যারা ইস্তফা দিয়েছেন তাঁরা বসে বসে আঙুল চুষবেন না—এবং রাজনীতিতে টিকে থাকার তাগিদেই এরা অহিংস পথ ছাড়তেও রাজী।

অর্থাৎ বিধানসভা ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত, "রাশিয়াপন্থী" বা "আমেরিকাপন্থী" একপক্ষের চরম জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরাও আন্দোলন থেকে সরে সমঝোতা করতে রাজী নন। কাজেই আন্দোলন চলবে দরকার হলে হিংসাশ্রয়ী পথেও। এবং সবচেয়ে বড় কথা আন্দোলন যতো দির্ঘস্থায়ী হবে ততই নতুন নতুন কর্মী এবং নেতৃত্বের জন্ম হবে—তা যে কিভাবে হয় তা আমরা আগেই দেখেছি। লড়াই দীর্ঘস্থায়ী এবং জঙ্গী হলে এভাবে নতুন জঙ্গী সংগঠনও আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে জনতার উৎসাহ খুবই কম—তাদের প্রধান উদ্দেশ্য মূল্যবৃদ্ধি, ভ্রষ্টাচার, বেকারীর বিরুদ্ধে লড়াই। তাই জয়প্রকাশ ৫ জুনের ঘোষিত কার্যক্রমে এ কাজ থেকে আন্দোলনকে দূরে সরাতে চাইলেও তা সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে তিনি জনসমর্থন হারাতে বসেছেন, এবং ঠিক পথ না ধরতে পারলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। এই জনসমর্থনের প্রশ্ন সি পি আইকেও তার "কার্যক্রমের আন্দোলন" ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে। তাই এই সমস্ত পেশাদার নেতারা ইচ্ছা থাকলেও মূল দাবি থেকে বেশি দূরে যেতে পারবে না। এবং আজ যদি কোনো সংগঠন মূল দাবির ভিত্তিতে আপোষহীন লড়াই চালাতে পারে তবে সে পুরো জনসমর্থন পেয়ে যাবে। লড়াইয়ের ময়দানে যে নতুন নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটছে তা মূলত জনতার নেতৃত্ব, এবং তাদের মূল দাবি "বিধানসভা ভঙ্গ করো" নয়, "মূল্যবৃদ্ধি, ভ্রষ্টাচার, বেকারীর অন্ত করো"। রাজনীতি এবং সংগঠনের

ভাবে এই দিশা এখনও খুব স্পষ্ট হচ্ছে না উঠছেও ভ্রণাবস্থায় রয়েছে। এ সম্বন্ধে বিবরণের জন্য এখানে বিহার প্রদেশ ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি, পাটনা নগর (অর্থাৎ স্থানীয় কমিটি)'র বুলেটিন 'মুক্তি' তৃতীয় সংখ্যা থেকে কিছু উদ্ধৃত করলাম :

আন্দোলনের অনুসরণযোগ্য খবর

ছাত্রদের 'নিগরাণী সমিতি' কি করবে ?

"বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে যে ভ্রষ্টাচার, চোরাবাজারী ও মুনাকাখোরীর বিরুদ্ধে নিজেদের লড়াই চালাতে ছাত্ররা নিগরাণী সমিতি গঠন করছে। এই সব সমিতি প্রতিদিন বাসে চেকিং, হাসপাতালে পরিদর্শন, বর্ডার এলাকায় চুরি বন্ধ করা এবং খাদ্যশস্য, সাবান, তেল, দেশলাই ইত্যাদি জরুরী দ্রব্যগুলো বাজেয়াপ্ত করে সঠিক দামে সেগুলো বিতরণ করবে।"

পাটনা নগর ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির এ বিষয়ে কাজ সম্বন্ধে তাঁরা লিখেছেন—

"ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, বার্মা শেল ইত্যাদির উপর নজর রাখার জন্য নয় জন সদস্যের এক উপসমিতি গঠন করা হয়েছে, যা প্রতিদিন দেখবে ডেপোগুলো খুচরা বিক্রেতাদের সঠিক মূল্যে এবং সঠিক পরিমাণে কেরোসিন তেলের সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে কিনা।

"রোহতাসের 'হনুমান' ছাপ ডালডার নির্মাতা সাহু-জৈন কোম্পানী ২ আর ৫ কিলোর টিনে ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম 'কম' ডালডা প্যাক করে বাজারে সাপ্লাই করত। তাদের এরকম না করতে ওয়ার্ণিং দেওয়া হয়েছে।

"ভূতপূর্ব রাজ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব সিংহের পি এ শ্রীরাজেশ্বর প্রসাদ তার ভাইদের···নামে দানাপুরে তিনটি রেশন দোকান চালাত। নিগরাণী সমিতি তার বাড়ীতে তল্লাসী করে···সম্বন্ধীয় কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে···

"পাটনার এক বড় ফার্ম 'অটো ডিস্ট্রিবিউটার' এর বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ আছে, (১) ওখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ছদ্মনামে গাড়ির রেজিস্ট্রী করে (২) এবং ৩৫০০ টাকার স্কুটার ৮০০০ টাকায় বিক্রী। ...কেন্দ্রীয় নিগরাণী সমিতি অনুসন্ধান শুরু করেছে।"

পাটনার বাইরে এ জাতীয় কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট—

"বেগুসরায় ছাত্রদের সাহায্যে 'আদর্শ' ছাপমারা মুদী দোকানে তল্লাসী করা হয়েছে। ২৩,৪০০ দেশলাই, ৪১৪ বোনাস আর বার সাবান, ৪৪টিন Glaxo বেবী ফুড, ২০টি ব্যাটারী আর ১৬ কিলোর ২৯ টিন সরষের তেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

"পূর্ণিয়ার ছাত্ররা গোলাববাগ বাজারে তল্লাসী করে ৬৫,০০০ সানলাইট, ২০০০ লাইফবয়, ৫০০০ লাক্স সাবান আর হাজার হাজার দেশলাই বার করে এনেছে।

"দেওঘরের ছাত্ররা ৩০,০০০ নকল রেশন কার্ড রদ করিয়েছে।

"ধানবাদ আর ঝরিয়ার ছাত্ররা সাবান ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করে বাজারে মুনাকাখোরদের দ্বারা চালু দামের চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগ কম দামে বিক্রী করেছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছাত্ররা এই জাতীয় কার্যক্রম চালাতে পারবে কিনা তার উপরই নির্ভর করছে বর্তমান আন্দোলন কোন্ ধারায় বইবে—ছাত্রদের মধ্যে দিয়ে এক নতুন সঠিক শক্তির উদ্ভব ঘটবে না বিধানসভার খেয়োখেয়ীতে বিশাল এই জন-আন্দোলনের অপমৃত্যু হবে।

## গ্রামের দিকে

চলতি জীবনের আসা যাওয়ার পথে প্রতিপদে আমাদের কেমন সব নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয় তা দিয়েই শুরু করি।

বাস থেকে নেমে চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেতে ঢুকলাম। পরে হয়তো আর দোকানই পাব না।

গলায় কণ্ঠি, কপালে চন্দনের টিপ—দোকানের মালিক বুড়ো ঠাকুদ্দা বেগুনী ভাজতে ভাজতে জিজ্ঞাসা করল—"বাবুরে যেন নতুন দেখছি? যাবেন কোথায়?"

বললাম—"যাব আবীরপুর"।

"তা বেশ, বেশ— একটা রিক্সা নিয়ে নিন। আর আলপথে গেলে-তো মোটে দশ মিনিটের রাস্তা। তা এয়েচেন কোত্থেকে?" তারপর আরও দু'চারটে প্রশ্ন।

চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম। পেছনে মৃদু আলোচনা—"কোন্ পার্টির বলে মনে হ'ল?"

বিহার হলে শুনতাম—"কৌন জাতবা?"

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

# আমাদের দেশ ঃ একটি অর্থনৈতিক পরিচয় (৩)

—নবীন সেন

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

আলপথেই এগোলাম। বাঁকের মাথায় দুজন চাষী বসেছিল। এই খা খা রোদ্দুরেও আদুড় গা। একফালি ময়লা কাপড় পরনে। তাও হাঁটুর ওপর। ঘামে চিক্‌চিক্ করছে শরীর। এখানে ওখানে মাটি-মাখা। সামনে সদ্যকাটা ধানের সোনালী স্তূপ। আমায় ডেকে বসাল—"কোত্থেকে আসছেন? কি কাজ?"

গ্রামের ক্ষেতমজদুরের সাথে এই আমার প্রথম পরিচয়। এরা যে কত গরীব তখনই তার মোটামুটি একটা আন্দাজ করে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

ও হরি···! একটু বাদেই কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে আর একটি লোক এসে উপস্থিত। ওদেরই "বাবু" বলে ডেকে হাতে হুঁকো দিয়ে নিজে ধানের আঁটি বাঁধতে লেগে গেল। বুঝলাম ওই আদুড় গা মাটিমাখা লোক দু'জন মজদুর নয়, জোতদার। পরে জানতে পেরে-ছিলাম মজদুর হলে তাড়াতাড়ি ধানকাটা শেষ করে বাড়ী ফেরার তাড়া থাকত, বসে বসে গল্প করার ফুরসত পেতো না।

এরপর আবীরপুরে পৌঁছুলাম। দোচালায় খোড়ো ঘর। মাটির দেওয়াল আর গোবরে নিকানো দাওয়া। এরই মাঝে মাঝে খাপ-ছাড়া গোটাকয়েক পাকাদেওয়ালের বাড়ী চিনিয়ে দেয় এ গ্রামে ধনী কারা। কুঁড়েঘরগুলো সব ছোট বা মাঝারী কিষাণদের, ওদের মধ্যে কেউ কেউ বা ভাগচাষী। আর মজদুররা?—চওড়া রাস্তা ধরে এলে ওদের বসতি পাওয়া যায়না। ওদের বস্তিতে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেছে সরু পায়ে চলা পথ, পৌঁছেছে গ্রামের এক কোণে "ওদের এলাকায়"।

এদেশে প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ গ্রাম। তারও বৈচিত্র অনেক—বাংলাদেশের দোচালা-আটচালা কুটীর, গুজরাট-উড়িষ্যায় সাজানো গ্রাম আর বেনারসে এলোমেলো সোজা-ছাদের বাড়ী, আবার রাঁচী-পলামৌয়ে দেখা যাবে অনেক দূরে দূরে কয়েক ঘরের টোলা। কোনো কোনো গ্রামে সবার আছে ধানের মড়াই। আবার কোনোটা বা শুধু "ছোটলোকের" গ্রাম। ঐ চওড়া রাস্তা আর ইটের পাকা-দেওয়াল বাদ দিলে এই গ্রামগুলোর মধ্যে কিন্তু সাদৃশ্য আছে আর তা এক হাজার বছর আগেও যেমন ছিল আজও প্রায় তেমনিই আছে।

তাই গ্রামের মানুষকে বুঝতে হলে সহরের চোখ দিয়ে দেখলে চলবে না। কারণ এখানকার মজদুর সহরে নয় আর মালিকও সহরের মালিক নয়।

স্কুলে-পড়া ছেলেরা আজকাল "ডাং-গুলি" "ক্লাপ খেলে, "আগডুম-বাগডুম" প্রায় ভুলেই গেছে। কিন্তু এই সেদিনও এদেশে এছড়ার চলছিল আর তা প্রায় হাজার বছর পেরিয়ে এসেছে। এর আসল রূপ ছিল—

> "আগে ডোম, বাগে ডোম, ঘোড়া ডোম সাজে
> ঢাক, ঢোল, শিঙা বাজে।"

হাজার বছর আগের সৈন্যসামন্তদের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা—সামন্ত-রাজা তার সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে চলেছেন। সেই সেকালের সামন্ত-রাজাদের সময় গ্রামের অবস্থা যা ছিল (যাকে আমরা 'সামন্তব্যবস্থা' বলব) আজ তা কিছুটা পরিবর্তিত হলেও তার অনেক খানিই রয়ে গেছে। তাই গ্রাম আর গ্রামের মানুষদের অবস্থা বোঝাতে আমরা এক কথায় **"অর্ধসামন্তী"** প্রথাবলি আর সহরে-সভ্যতা বা কলকারখানার সভ্যতাকে বলি **"পুঁজিবাদী"**

### পার্থক্যটা কোথায়?

সামন্তদের ডোমরা শুধু যুদ্ধই করত না। সময়মত তারা চাষবাস বা অন্য কাজও করত। দরকার পড়লেই সামন্ত রাজারা এদের নিয়ে যুদ্ধে যেত। ভাবুনতো আজকের দিনে টাটা-বিড়লারা তাদের মজদুর-

দের নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে! ভাবা যায় না। তোমরা ছিল সামন্তদের "প্রজা"। কিন্তু টাটা কোম্পানীর মজদুরদের কেউ কি বলবে ওরা টাটার "প্রজা"? মালিক-শ্রমিকে প্রজাতুল্য সম্পর্ক হ'ল সামন্তী প্রথার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর মালিক-শ্রমিকে আধুনিক-মজদুর জাতীয় সম্পর্ক হ'ল পুঁজিবাদী প্রথার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চলতি কথাতে আমরা এই লোকটা 'ওমুকের জমিদারীর প্রজা' না বলে বলি 'ওমুক জমিদারের প্রজা', আবার 'টাটার মজদুর' না বলে বলি 'টাটার কারখানার মজদুর'। কিছু না ভেবেই কিন্তু আমরা আসল পার্থক্যটা করে বসি—এই "বলা-না-বলা"র মধ্যদিয়েই পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসছে প্রজা হচ্ছে মালিকের আর মজদুর মালিকের কারখানার। সামন্তী সম্পর্কের বিশেষত্ব হচ্ছে মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, কিন্তু পুঁজিবাদী সম্পর্কের ক্ষেত্রে মজদুরের সাথে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে না; তার সম্পর্ক মালিকের পুঁজির সাথে। সামন্তী আর পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের এই হচ্ছে মুল পার্থক্য।

কালের স্রোত বেয়ে এসে সেই সামন্তরাই হয়েছে আজকের দিনের জমিদার-জোতদার। এরা কিন্তু আবার ঠিক একরকম নয়। জমিদার হচ্ছে সামন্তদের "ঠুটো জগন্নাথ" সংস্করণ—এখন সেই ডোম-সৈন্যও নেই, শিঙ্গা ফুঁকে যুদ্ধযাত্রাও আর হয় না। কিন্তু মালিক-শ্রমিকে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল তা, অনেক কমে গেলেও সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়নি। তাই জমিদারী-প্রথা সামন্তী-প্রথাও নয় আবার পুঁজিবাদী-প্রথাও নয়—এ দুয়ের মাঝামাঝি স্তর, যাকে "অর্ধসামন্তী" প্রথা বলা যায়। আজকের গ্রামের ভাগচাষীরা পুরোনো "প্রজা"রই নতুন সংস্করণ, কিন্তু সেই আগেরদিনের প্রজা আর নয়। মজদুর লাগিয়ে উৎপাদনের পদ্ধতি হচ্ছে পুঁজিবাদী পদ্ধতি। কিন্তু এদেশের গ্রামের বিশেষ অবস্থার দরুণ তার মধ্যেও সামন্তী প্রথা বেশ ভালভাবেই থেকে গেছে। তাই এদেশের কৃষিব্যবস্থাকে এক কথায় "অর্ধসামন্তী" বলে চিহ্নিত করা যায়।

একদম পিছিয়ে-থাকা গ্রামে সামন্তী-বাঁধন অনেক জোরদার। আর উন্নত এলাকার গ্রামগুলোতে এ বাঁধন কমতে কমতে কোনো কোনো জায়গায় প্রায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে মালিক আর জমিদার নয়, ক্ষেতমজদুরও প্রায় কারখানার মজদুরের মতই স্বাধীন। সেখানের কৃষিকে পুঁজিবাদী সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বুঝতে হবে।

আগের সংখ্যায় আমরা যে সব শ্রেণীর কথা আলোচনা করেছি তাদের মধ্যে একমাত্র সবচেয়ে ধনীদের বাদ দিলে বাকী সব শ্রেণীর দেখা গ্রামেও পাওয়া যায়। শিল্প-এলাকার পাশের গ্রামে "ডেলী প্যাসেঞ্জার" শিল্প শ্রমিকও থাকে। আবার কুলী, রিক্সাওয়ালা-মজদুর, ছোট দোকানের মালিক পেটিবুর্জোয়ারাও গ্রামে থাকে। লুম্পেনদের সর্বত্রই পাওয়া যায়। আর তাছাড়া গ্রামে তো ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের চাকুরে বা ডাক-পিওন খুবই পরিচিত। কিন্তু এরা সবাই মিলে গ্রামের লোকসংখ্যার মাত্র পাঁচভাগের একভাগ হয়, আর বাকী চারভাগই হচ্ছে কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবীদের মধ্যেও অবশ্য অনেক শ্রেণী আছে।

গ্রামে সহরে-মজদুরের শ্রেণীভাই হচ্ছে ক্ষেতমজদুররা আবার সাথে সাথে তারা অর্ধসামন্তী ব্যবস্থারও মজদুর। তবে পার্থক্যটা কোথায়?

বুধন মাঝি, যার কথা আগেই বলেছি (বীক্ষণ, ২ বর্ষ, ২ সংকলন), মাত্র দেড়শ টাকা ধার নেওয়ার জন্য আজীবন "কামিয়া" হয়ে রয়েছে। মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোনো কাজ করতে পারে না। শুধু "কামিয়া" নয়, দেশের নানা জায়গায় নানানভাবে এরকম প্রথা টিকে আছে। যেমন গুজরাটে "হালী" শ্রমিকরা বংশানুক্রমিকভাবে দাস-মজদুর হয়ে থাকতে বাধ্য হত, সম্প্রতি এই প্রথার অনেকটাই উচ্ছেদ হলেও সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়নি। মহীশূরে পাওয়া যায় "হোলিয়া" মজদুর, এদের নাকি "মালিক-মহাজন" অন্যের কাছে ভাড়াও খাটাতে পারে। এই সব উদাহরণগুলো কিন্তু আইনের সম্মতি ছাড়াই চলে আসছে। "আইনী দাসত্বের" উদাহরণও যথেষ্ট পাওয়া যায়—যেমন মাদ্রাজের "পান্নাইয়াল" ক্ষেতমজদুররা কোনো মালিকের কাজ এক-বছরের নোটিশ না দিয়ে ছাড়তে পারে না। কিন্তু শিল্প-মজদুরদের ক্ষেত্রে এরকমটা ভাবা যায় কি?

অবশ্য এখানে যে-সব প্রথার কথা উল্লেখ করা হ'ল সেগুলো চরম উদাহরণ। সাধারণ ক্ষেতমজদুরের ক্ষেত্রে গোলামী এতদুর পৌঁছায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত-বাঁধনটা সর্বত্রই থাকে। ক্ষেতের কাজ যখন থাকে না তখন পেট চালাবার জন্য, রোগ-ভোগ, শ্রাদ্ধ, বিয়ে বা আকালের সময় মজদুরদের মালিকের কাছে হাত পাততেই হয়। মালিকও এ সুযোগ হাতছাড়া করে না—ঋণ দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখে এবং পরে ইচ্ছামত মজদুরদের নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজনের সময় এই মালিকই মজদুরের "ভরসা", তাই তাকে চটিয়ে মজদুররা কিছু করতে সাহস পায় না। তাই মালিকের কাছে মহাজনী-ব্যবসা শুধু আয়ের রাস্তাই নয়, মজদুরের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব রাখারও এক মস্ত হাতিয়ার। যেখানে মজদুররা খুব দুর্বল এবং মালিক শক্তিশালী সেখানে এই প্রভাব বাড়াতে বাড়াতে মালিক তাকে "কামিয়া" প্রথার

মতো দাস-প্রথায় দাঁড় করায়। আর যেখানে মজুররা মালিকের তুলনায় শক্তিশালী সেখানে নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ কম। তাই তখন সেখানে মজুরের দুর্দশার সময় মালিক তাকে ঋণ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা প্রায় বন্ধ করে দেয়।

ক্ষেতমজুরদের মজুরী দেওয়ার ধরণে এবং হারে জায়গায় জায়গায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। কোথাও মজুরী দেওয়ার ধরণ নগদ টাকা, কোথাও ফসলের ভাগ, কোথাও বা এক টুকরো চাষের জমি। হরিয়ানায় মজুরীর হার দিনে প্রায় দশ টাকা, বিহারের "কামিয়া" পায় দিনে দেড় টাকা। মোটামুটিভাবে বলা যায় দেশে প্রায় সর্বত্রই দৈনিক মজুরীর হার তিন-সাড়েতিন টাকার মতো বা তার কম।

কিন্তু বছরে অনেকটা সময়েই এদের হাতে কাজ থাকে না।* ফলে মাথাপিছু গড়ে দৈনিক আয় দাঁড়ায় ৭০/৮০ পয়সার মতো, অনেক সময় এরও কম। এরা তাই দেশের সবচেয়ে গরীবদের স্তরে পড়ে।

এরপর ভাগচাষী বা বর্গাচাষীদের কথায় আসা যাক। এক্ষেত্রে কৃষিতে সাধারণত তিন ধরণের চাষের পদ্ধতি প্রচলিত। একদল মজুর লাগিয়ে চাষ করে, একদল চাষীদের হাতে জমির কাজ ছেড়ে দেয়, আরেক দল আবার তাদের জমি কম থাকার জন্য মজুরও লাগায় না বা ভাগচাষীদেরও দেয় না, নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করে। সোজা-কথায় বললে, ভাগচাষীরা হচ্ছে "সামন্তপ্রথার প্রজাদের" আজ-কালকার রূপ। কারণ সেকালে জমিদাররা প্রজাদের হাতে নিজের অধিকৃত জমির চাষের ভার দিয়ে আরাম করতেন। আর চাষের শেষে ফসল তুলে চাষী-প্রজা জমিদারের পাওনা তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসত। ভাগচাষীদের কাজও সেই একই, শুধু তফাৎ এইটুকু যে সামন্তী প্রথা আজ অনেকটা ভেঙে গেছে, ফলে ভাগচাষীও একেবারে সেই আগেকার দিনের প্রজার স্তরে আর নেই।

পার্থক্যটা বুঝতে আমাদের হাজার বছর আগে যেতে হবে না, শুধু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার জমিদারদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে দু-একটা উদাহরণ দেখলেই বোঝা যাবে।

"একজন ঠাকুরাণী তালুকদারের পায়ে একটা ফোঁড়া পেকে গিয়েছিল। সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য তিনি ফকিরদের প্রচুর দান-খয়রাত করেন। এতে মোট খরচ হয় ১৫,০০০ টাকা। এ টাকাটা চাষী-প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। তারা এটার নাম দেয় "পাকোয়ান" (পেকে ওঠার থেকে)। [ ১৮৮৩ খ্রীঃ উত্তরপ্রদেশের এক অফিসারের রিপোর্ট, মালভিয়া, "ল্যাণ্ড রিফর্ম ইন ইণ্ডিয়া" ]

এই জাতীয় করকে "আবওয়াব" বলা হত। বিয়ে উপলক্ষে, সামাজিক অপরাধের জন্য জরিমানা করে, বা চাষী জমিতে কুয়ো খুঁড়তে চাইলে, জমিদারের হাতী বা মোটরগাড়ী কেনা ইত্যাদি নানা কারণে এই কর বা নজরানা আদায় করা হত। একজন চাষীর জমির খাজনা যখন ছিল ১০ টাকা ১৫ আনা তখন এই জাতীয় কর ছিল ১১ টাকা ১ আনা (ডঃ রাধাকমল মুখার্জীর উদ্ধৃতি)।

এখনকার জমিদাররা এজাতীয় কর ভাগচাষীদের কাছ থেকে আদায় করতে পারে না।

"জমিদাররা প্রজাদের উপর একটা অধিকার রাখত যে তাদের বেগার খাটিয়ে নেওয়ার অধিকার সর্বত্রই স্বীকৃত ছিল। এমনকি ১৯৩০ সালেও উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ৩ থেকে ৫ দিন জমিদারের জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খেটে দেওয়া "প্রজার" অবশ্য-কর্তব্য ছিল।" (ড্যানিয়েল থর্নার, "ল্যাণ্ড এণ্ড লেবার ইন ইণ্ডিয়া")।

আজ কিন্তু জমিদার ভাগচাষীকে দিয়ে এমনটা খাটিয়ে নিতে পারে না। পরিবর্তন আরও অনেক বিষয়ে হয়েছে, জমিদারের নিয়ন্ত্রণও অনেকখানি কমে গেছে। তাই মালিক-শ্রমিক সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে "সামন্ততান্ত্রিক" বলা যাবে না, বলতে হবে অর্ধসামন্তী।

ভাগচাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন?

সাধারণ প্রথামত ভাগচাষীরা যে ফসল ফলায় তার অর্ধেক তার প্রাপ্য আর অর্ধেক জমির মালিকের। কিন্তু যেখানে উৎপাদনের হার ভাল এবং জোর তুলনায় বেশি সেখানে মালিক প্রতি দশ ভাগের ছয় বা সাত ভাগ পর্যন্ত অধিকার করে নেয়। আবার কোনো জায়গায়, যেখানে মালিকের জোর কম, সেখানে প্রথামত মালিকের পাওনাও হয় অর্ধেকের কম। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের ভাগচাষীরা ফসলের 'প্রতি তিনভাগে দুইভাগ তাদের পাওনা' এই দাবিতে এক বিরাট আন্দোলন করেছিল। সেই আন্দোলন "তেভাগা আন্দোলন" নামে বিখ্যাত।

ভাগচাষীরা সাধারণত একজন তিন-চার একর জমি চাষের কাজ পায়। এদের মধ্যে কারো অবশ্য একটুকরো নিজস্ব জমি থাকে আবার কারো থাকে না। মোটামুটিভাবে বলা যায় কৃষিকাজ থেকে এদের মাসিক আয় ১৫০ টাকার মতো বা তার থেকেও কম*। এরাও তাই

"পুরুষ ক্ষেতমজুররা গড়ে বৎসরে মাত্র ১৯০ দিন কাজ পায়, এবং স্ত্রীরা পায় বৎসরে ১২০ দিন।"—এগ্রিকালচারাল লেবার এনকোয়ারী (ইন্‌টেন্‌সিভ সার্ভে রিপোর্ট), ১৯৫৪।

* আলোচনার সুবিধার জন্য আমাদের দেশে কৃষিতে উৎপাদনের হার সম্বন্ধে কিছু ধারণা রাখা দরকার।

দেশের [illegible] পড়ে এবং অবস্থার ফের ঘুরে এরাও ক্ষেতমজুরের সমপর্যায়ভুক্ত।

তবে এদের মধ্যে অনেকেরই আয়ের একটা অন্য উৎস আছে। সহরে পানের দোকানদারকে পান, সিগারেট বিক্রী করার সাথে সাথে বিড়ি বাঁধতেও হামেসাই দেখা যায়। দোকানদারী ছাড়াও বিড়ি-বাঁধা তার আয়ের অন্য উৎস। গ্রামের অনেকেই এইভাবে আয় করে। বিড়ি-বাঁধা, লাক্ষা-তসরগুটি সংগ্রহ, মধু সংগ্রহ অথবা খাদিগ্রামোদ্যোগের কুটীর শিল্পের আয় এদের অনেক পরিবারকেই বাঁচিয়ে রেখেছে। শুধু ভাগচাষীরাই নয়, অনেক মজদুর-ছোটকিষাণ পরিবারও কৃষির আয় ছাড়া এ জাতীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকার মতো রোজগার করে। এদের অনেকেরই কৃষি থেকে আয়ের পরিমাণ এত কম যে এ জাতীয় রোজগারের যদি ব্যবস্থা না থাকত তবে পেট চালানোর জন্য তাদের রোজগারের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকত না।

তাই দেখা যাচ্ছে অর্ধসামন্তী ব্যবস্থার সাথে কুটীরশিল্পেরও একটা সম্পর্ক আছে। রাজা-মহারাজাদের আমলেও লাখ লাখ টাকার মালিক ধনীদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তবে কিছু লোকের হাতে পুঁজি থাকলেই তো ব্যবস্থা পুঁজিবাদী হয় না। পুঁজিপতিদের সাথে এই ধনীদের পার্থক্যটা হচ্ছে—এই ধনীরা তাদের টাকা দিয়ে মসলীনের কাপড় আর মেহগিনির পালঙ্ক কিনত আর পুঁজিপতিরা তাদের টাকা দিয়ে কেনে মজদুরের শ্রমশক্তি। তাই শ্রমশক্তি বেচতে চায় বা বেচার মতো একদল লোকের অস্তিত্বও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। এই শ্রমশক্তি বেচনেওয়ালারা কারা? —ছোটকিষাণ বা ভাগচাষী পরিবার ভেঙে গিয়ে এদের উৎপত্তি হয়, জীবিকার সন্ধানে যাদের চাষবাস ছেড়ে আসতে হয়, যাদের গ্রাম ছেড়ে সহরে উঠে আসার ফলে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রী করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এরাই "সর্বহারা" (ইংরাজীতে "প্রোলিতারিয়েত", এদের পরিবার ছাড়া অন্য কিছুই নেই)। কুটীরশিল্প জাতীয় অন্য আয়ের উৎস না থাকলে গ্রামের অনেক পরিবারকেই সর্বহারা হয়ে উঠতে হত। এইভাবে কুটীরশিল্পগুলো এদেশের অর্ধসামন্তী কৃষিব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সাহায্য করছে। অন্যদিকে এই শিল্পগুলোই কিন্তু অনুন্নত ধরণের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। পুরোনো সামন্তী ব্যবস্থায় এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে ক্ষেতমজদুর বা ভাগচাষীরা মালিক নয়। এবারে আসা যাক মালিকদের কথায়। মালিক বললেই বেশ টাকা-পয়সাওয়ালা লোক মনে হয়। কিন্তু এদেশে দু-এক একরের মালিক দু বেলা পেটভরে খেতে পায় না, এমন লোকের সংখ্যাও কয়েক কোটি।

ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় কিন্তু আমাদের মতো ছোট ছোট ক্ষেত দেখা যায় না, দেখা যায় না রাশিয়াতেও। এটাও তাই আমাদের দেশের অর্ধসামন্তী কৃষি ব্যবস্থার একটা অঙ্গ। দুর্গাপুর বা টাটা কারখানার মতো আয়তন না হলে যেমন ইস্পাত তৈরীর মেশিন চালানো যায় না তেমনি উন্নত কৃষিব্যবস্থার জন্যও চাই অন্তত কিছুটা বড় আয়তনের ক্ষেত। ছোট ক্ষেতে না পারা যায় পাম্প বসাতে আর না পারা যায় ট্রাক্টর চালাতে। উন্নত কৃষির জন্য চাই বড় বড় ক্ষেত (পুঁজিবাদী পদ্ধতি) অথবা ছোট ছোট ক্ষেত সমবায় প্রথায় চাষ (সমাজবাদী পদ্ধতি)। এদেশে ছোট ছোট ক্ষেতের প্রাধান্য তাই অনুন্নত অর্ধসামন্তী কৃষিব্যবস্থার লক্ষণ।

এরপর মালিকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের কথায় আসা যাক। ৪ একর সাধারণ জমি বা দেড়'দু একর ভাল জমি সহ উন্নত-চাষ পদ্ধতির মালিক চাষীর আয় দাঁড়ায় মাসে প্রায় দু'শ টাকার মতো। এদের আমরা বলব ছোট কিষাণ। দেশের প্রায় অর্ধেক লোকের অবস্থা এদের থেকে ভাল, কিন্তু সামান্য কিছু লোক বাদ দিয়ে এদের

---

এদেশে সাধারণ জমিতে সাধারণ চাষের পদ্ধতিতে ধান হয় একরে ১৫ মণের মতো, অর্থাৎ চাষের খরচ বাদ দিলে এবং মজদুর লাগাতে না হলে চাষী-পরিবার প্রতি একরে সাত আটশ টাকার মতো আয় করতে পারে (বাৎসরিক)।

জমি উর্বর হলে, জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে, দুটো বা তিনটে ফসল হলে আর উচ্চফলনশীল বীজ এবং সারের বন্দোবস্ত থাকলে বছরে একর প্রতি দু'হাজার-আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

কিন্তু জমির পরিমাণ একটু বেশি হলে মজদুর না লাগিয়ে উপায় নেই। সেক্ষেত্রে জমি থেকে আয়ের পরিমাণ থেকেই মজদুরের খরচ বাদ দিতে হবে। তাই প্রতি একরে আয়ও নিশ্চয়ই কিছু কমে যাবে।

উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে সাধারণতঃ ধনী কিষাণরা বা মাঝারি কিষাণরা। এদের একর প্রতি আয়, মজদুর লাগানোর পরেও, হাজার টাকা বা তারও বেশি। ভাগচাষী বা ছোট কিষাণদের ক্ষেতের উৎপাদনের হার ১৫/২০ মণের মতো, আর জমিদারদের অবস্থাতো আরো খারাপ।

বিশেষভাবে বড় জমিদারদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের অনেক পতিত জমি পড়ে থাকে, এমনকি চাষের জমিও ভালভাবে দেখাশুনা করা হয় না। তাই এদের উৎপাদনের হারও কম। বড় জমিদারদের একর প্রতি আয় বছরে দু-তিনশ টাকা বা তারও কম হতে পারে।

সকলের অবস্থাই প্রায় ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষীদের অবস্থায় থেকে ভাল।

ছোট কিষাণরা নিজের জমি নিজেরাই চাষ করে, কচিৎ কখনো মজুর লাগায়। মজুর লাগাবার পিছনে অনেক সময়েই একটা বিশেষ কারণ থাকে, যেমন আমাদের দেশে 'উঁচু জাতের' লোকেদের লাঙল ধরলে 'জাত' যায়। তাই অনেক জায়গায় ছোটকিষাণরা লাঙল চালাবার জন্য 'নিচু জাতের' মজুর লাগায়, ক্ষেতের বাদবাকী কাজ নিজেরাই করে। তাছাড়া এদের অনেকেই, শুধু নিজের জমির কাজ করে দিন চালাতে না পারায়, সাথে সাথে মজুরী বা ভাগচাষের কাজও করে থাকে। ভাগচাষের কাজে যাদের একদম জমি নেই তাদের তুলনায় এদের বেশি পছন্দ করা হয়, কারণ এদের একটু আধটু জমি থাকায় এদের নিজেদেরই লাঙল, কোদাল ইত্যাদি থাকে, তাও অবশ্য সবার কাছে থাকে না।

ক্ষেতমজুর, ভাগচাষী আর ছোট কিষাণরা হ'ল গ্রামের গরীব সম্প্রদায়। এদের উপরের স্তরে আসে মাঝারী কিষাণরা। মাঝারী কিষাণ তাদেরই বলব যাদের ১৫/২০ একর সাধারণ জমি বা ৮/১০ একর ভাল চাষের জমি আছে এবং সাথে সাথে ভাল চাষের পদ্ধতিও কাজে লাগায়। এদের মাসে জমি থেকে আয়ের গড় সাত আটশ টাকা পর্যন্ত।

তবে শুধু এই পরিমাণ জমি থাকলেই হবে না, কারণ যদি সে চাষের কাজ না করে তবে তাকে মাঝারী কিষাণ বলা যাবে না। সেরকম লোকেরা পরজীবী জমিদার শ্রেণীর মধ্যে আসে। মাঝারী কিষাণ একমাত্র তারাই যারা নিজেরা জমিতে কাজ করে। তবে শুধু পারিবারিক শ্রমে সম্ভব নয় বলে (জমির পরিমাণ বেশি থাকায়) এদের অনেককেই মজুর লাগাতে হয়। কিন্তু মোট কাজের হিসাবে এদের পারিবারিক লোকেদের শ্রমের ভাগটাই প্রধান হয়ে থাকে। আমরা আগেই আধা-মজুরদের কথা বলেছি। ৮/১০ একরের মতো যাদের জমি তাদের সবাই কিন্তু মাঝারী কিষাণ নয়, তাদের অনেকেই আধা-মজুর। তারা কারখানায় কাজ করে ৫০০ টাকা মজুরী নেয় আবার নিজের জমি ভাগচাষীর হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে বসে ১০০ টাকার মতো মাসে রোজগার করে। এইভাবে নিজে হাতে চাষ করলে পরে যা আয় করত তার থেকে বেশি আয় করে। এদের শ্রেণীচরিত্রও তাই আংশিকভাবে জমিদারের আর আংশিকভাবে মজুরের। শুধু যে মজুরী করে তা নয়, অনেকে কেরানীর চাকরী, ছোট কোর্টের ওকালতি, এমনকি ছোটখাট ব্যবসাতেও ঢোকে। এইভাবে দেশের কৃষিতে একটা বিরাট "পরজীবী শ্রেণীর" সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষিজীবীদের মধ্যে এই চারটি শ্রেণীরই আয়ের প্রধান উৎস নিজেদের পরিশ্রম বা পরিবারের লোকজনের পরিশ্রম। এই রকম লোকেদের সংখ্যা* প্রায় ১৪ কোটি। প্রধানত অন্যের পরিশ্রমে যারা আয় করে অর্থাৎ যাদের পরজীবী বলা যায় (যাদের সবাই ধনী নাও হতে পারে) তাদের মধ্যেও দুটো ভাগ দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে এদেশে কৃষি ব্যবস্থায় মোটামুটি দুটো প্রথা চলছে—কোথাও অর্ধসামন্তী কৃষিব্যবস্থা আবার কোথাওবা কৃষিতে পুঁজিবাদ এসেছে। এই পুঁজিবাদী কৃষি যারা করে তাদের আমরা "ধনী-কিষাণ" বলব, আর অন্যদের ফেলব জমিদার শ্রেণীতে।

"হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু"—বর্ষা শুরু হওয়ার আগে জমিদার রবীন্দ্রনাথের মাথায় আসত এই জাতীয় ভাব। পদ্মাপারে ছিল তার জমিদারী, খুব অত্যাচারীও ছিলেন বলে শোনা যায় না, শুধু জমির ব্যাপারে সব দায়িত্ব নায়েব-গোমস্তার হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্যান্য কাজে মাথা খাটাতেন। এই হচ্ছে আসল জমিদার, শুধু চাষীদের দেয়া খাজনাটুকু ছাড়া চাষের সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনাচিন্তা যার নেই।

আর ধনী-কিষাণ? বর্ষা তার হৃদয়ে অন্য ডমরু বাজায়। "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" সে সকাল সকাল ট্রাক্টর চালিয়ে ব্লক অফিসে পৌঁছায় সারের জন্য। যেতে যেতে সে ভাবে গত বছর অমুকের জমিতে "জয়া" (উন্নত ধানের বীজ) ধান বড় ভাল ফলেছিল। "পদ্মা" আর "জয়া" বীজের পার্থক্যগুলো কি কি খোঁজ নিতে হবে। চণ্ডীটা বুড়ো হয়েছে। হোক না বাপের আমলের "মুনীষ", এবার ওকে বিদায় করতেই হবে। ধনী কিষাণ যে সব সময় নিজের হাতে কাজ করে তা নয়, কিন্তু কারখানার পুঁজিপতি মালিকদের মতো চাষের ব্যবস্থার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সব রকম ব্যবস্থাই সে নিজে করে। অন্যদিকে আবার জমিদার এটাও জানে না গ্রামে তার জমিটা কোন-দিকে, চাষবাসের কথা ছেড়েই দিলাম।

ছোটখাট জমিদাররা অবশ্য একেবারে রবীন্দ্রনাথের মতো নয়, তারা একটু আধটু চাষের কাজও বোঝে। ট্রাক্টর রাখলেই আবার ধনী কিষাণ হয়ে যায় না, অনেক জায়গায় এটা আজকাল সম্মানের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে অর্ধসামন্তী জমিদার এবং পুঁজিবাদী ধনী চাষীর মধ্যে ঠিক স্পষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। এরই সাথে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার, যারা অন্যদের হাতে চাষের কাজ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়, শুধু সেই সমস্ত পরজীবী জমির মালিকদেরই জমিদার বলছি। সেই হিসাবে ২/৩ একর জমির মালিক জমিদারও হতে পারে।

---

* কাজের লোকেদের সংখ্যা, পরিবারের মোট লোকসংখ্যা নয়।

গত ত্রিশ বছরে কৃষিতে রাসায়নিক সার, উন্নত বীজ, ট্রাক্টর-এর ব্যবহারের বহু প্রচলন হয়েছে আর তার সাথে সাথে একদল ধনী কিষাণেরও সৃষ্টি হয়েছে। হাওড়া থেকে দিল্লী যেতে সপ্তগ্রামের কলাবন পেরিয়ে চোখে পড়বে মেমারীর বড় বড় কোল্ডস্টোরেজ আর দিগন্তজোড়া সবুজ ক্ষেত। পাটনা ষ্টেশনে ঢোকার ঠিক আগে চোখে পড়বে বিহারশরীফের আলুর ক্ষেত আর অজস্র বোরিং (নলকূপ), তারপর কানপুরের আগে রায়বেরিলীর দিগন্তজোড়া আখক্ষেতগুলো সবগুলোই ধনী কিষাণদের কাজ**।

জমিদার বা ধনী কিষাণদের আয়ের উৎস শুধু কিন্তু জমি নয়, একটু পয়সাওয়ালা যারা তাদের প্রত্যেকেরই সুদের কারবার আছে। ধনী কিষাণরাও কিন্তু সুদের কারবার থেকে আয় করে। শুধু যে জমিদাররাই সুদের কারবার করে তা নয়। তফাৎ শুধু ধনী কিষাণদের ক্ষেত্রে মহাজনীটা শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করার অস্ত্র নয়, কেবল আয়েরই উৎস। এছাড়া জমি বন্ধক রাখার বদলে গয়না বন্ধক রেখেও অনেক মহাজন ঋণ দেয়, এরা জমির মালিক নাও হতে পারে, গ্রামের "ব্যাংক মালিক" হয়েই থাকতে পারে। তবে এদের সংখ্যা খুব কম। মহাজনী প্রথা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী প্রথার একদম প্রাথমিক স্তর। চড়া হারে সুদ দিয়ে মহাজনেরা পুঁজি জমায়। বৃটেন বা ফ্রান্সে এই পুঁজিই পুঁজিবাদের বিকাশে সহায়তা করেছিল। এদেশের গ্রামীন অর্থব্যবস্থায় এই মহাজনী প্রথার প্রচলনও তাই সামন্তবাদ ভেঙে যাওয়া এবং পুঁজিবাদের রাস্তা তৈরী হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত—এটাও অর্ধসামন্তী প্রথার অঙ্গ।

সহরের ছেলেরা ব্যাংকের সুদের হারের সাথে পরিচিত। গ্রামের সুদখোর-মহাজনদের সুদের হার এর সাথে তুলনাই করা যায় না। সহরের কাবুলিওয়ালারা বরং কাছাকাছি যায়—বছরে ৫০% সুদ তো সাধারণ ব্যাপার, সুদের হার ২০০ বা ২৫০%ও হতে পারে। এছাড়া নানান রকমের জুয়াচুরি তো আছেই। সুদের মাধ্যমে জমি অধিকার করে নেওয়া, বসতবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করা বা গোলাম বানিয়ে রাখার উদাহরণ সহজেই পাওয়া যায়। গ্রামের বড়লোকদের, অর্থাৎ বড় জমিদার বা ধনী কিষাণদের আয়ের একটা বড় অংশই আসে এই সুদ থেকে।

গ্রামের দিকে ধনী বা অবস্থাপন্নদের সংখ্যা কেমন?

আগের হিসাব মতো দেখা যায়, ১০/১২ একর উন্নত জমি উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে, তেমন ধনী কিষাণ বা ৫০ একর জমির মালিক জমিদারের আয় দাঁড়ায় মাসে প্রায় ৭/৮শ টাকার মতো। এই রকম বা এর থেকে বেশি আয় করে, এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ, অর্থাৎ গড়ে প্রতি গ্রামে ৭,৮ জন। এরা গ্রামের জনসংখ্যার প্রায় ৭%, অথচ দেশের প্রায় ৫৩% জমিই এদের কব্জায়।

মাসে প্রায় ৫০০০ টাকা বা তারও বেশি যাদের আয়, তাদের মধ্যে আসে ৩০/৪০ একর বা বেশি জমির মালিক, ধনী কিষাণ থেকে শুরু করে ২৫০/৩০০ একর বা তারও বেশি জমির মালিক জমিদাররা। এদের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার অর্থাৎ প্রতি দশটি গ্রামে একটি পরিবার।

এদের সবচেয়ে উপরের স্তরে আছে চার-পাঁচশ পরিবার—জমির পরিমান যাদের এক হাজার একরেরও বেশি। এর মধ্যে আসে কুরসেলা রাজাদের মতো বারো-হাজারী একরের জমিদারেরা বা শংকর রাও মোহিতের মতো ধনী চাষীরা। এদের আয় মাসে ৫০ হাজার টাকার মতো বা তারও বেশি। এরা শুধু গ্রামেরই নয়, দেশের সবচেয়ে ধনী এক হাজার পরিবারের মধ্যে আসে।

** এ জায়গাগুলোর সাথে লেখকের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই—সেই কারণে ভুল হলেও হতে পারে। যদি কেউ সঠিকভাবে জানেন তবে অবশ্যই এ সম্বন্ধে আলোকপাত করে বাধিত করবেন।

### গ্রামীন পরিবারের শতকরা হিসাব

| এলাকা | অ-কৃষিজীবী | ভাগচাষী ইত্যাদিরা (টেনান্ট) | জমির মালিক | ক্ষেত মজদুর | মোট | ক্ষেতমজুরদের মধ্যে: জমি আছে যাদের | ক্ষেতমজুরদের মধ্যে: জমি নেই যাদের |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল | ২৩ | ২৫ | ৪২ | ১০ | ১০০ | ৩ | ৭ |
| উত্তর ,, | ২২ | ৫৬ | ৮ | ১৪ | ১০০ | ৫ | ৯ |
| পশ্চিম ,, | ১৬ | ১৮ | ৪৫ | ২১ | ১০০ | ৯ | ১২ |
| পূর্ব ,, | ২১ | ৩০ | ১৬ | ৩৩ | ১০০ | ১৯ | ১৪ |
| মধ্য ,, | ১৬ | ২২ | ২৫ | ৩৭ | ১০০ | ১৫ | ২২ |
| দক্ষিণ ,, | ২১ | ৬ | ২৩ | ৫০ | ১০০ | ২৭ | ২৩ |
| সারা দেশে | ২০ | ২৮ | ২২ | ৩০ | ১০০ | ১৫ | ১৫ |

"এগ্রিকালচারাল লেবার এনকোয়ারী রিপোর্ট", ১৯৫৪.

সবশেষে আমরা একবার গ্রাম এবং শহর মিলিয়ে সারাদেশের ধনী-গরীবের সংখ্যাটা নাড়াচাড়া করি।

দেশের সবচেয়ে গরীব যে ১০% তাদের মাথাপিছু দৈনিক আয় মাত্র ৫০/৬০ পয়সা।

প্রায় অর্ধেক লোকের পরিবার পিছু মাসিক আয় ১৫০ টাকার মতো বা তারও কম। এদের উপরে যে ৪৪% লোক তাদের আয় মাসিক ১৫০ থেকে ৫০০ টাকা, অর্থাৎ পরিবার পিছু মাসিক আয় ৫০০ টাকার উপর তেমন লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০%।

মাসে ৭/৮ শ টাকার মতো আয়, তেমন লোকের সংখ্যা জনসংখ্যার মাত্র ৫%।

জনসংখ্যার প্রতি হাজার জনে একজন ( ০·১% ) আয় করে মাসে ৫০০০ টাকা বা তারও বেশি।

দেশের সবচেয়ে বড়লোক হাজারখানেক পরিবার, মাসিক আয় যাদের ৫০,০০০ টাকা বা তারও বেশি। দেশের সবচেয়ে গরীব ১০%-এর আয়ের তুলনায় এদের আয় এক হাজার থেকে দশহাজার গুণ বা তারও বেশি, জনসংখ্যায়ও এরা মুষ্টিমেয় ধনীদের তুলনায় প্রায় ৫০০০ গুণ বেশি।

একদিকে টাটা-বিড়লা, সুরসেলা রাজেরা আর অন্যদিকে ছুটান-শিবাই-কাগজওয়ালী বুড়ীরা, তার মাঝে অসংখ্য স্তর—এই নিয়েই আমাদের এই বিরাট দেশ*।

## আমরা গরীব কেন?

নানান মুনির নানান মত। চোখে ছানিপড়া ভাঙা কুঁড়েঘরের ক্ষেতমজুরকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে—"ভগবান যারে যেমন করে পাঠান। কাউরে করেন গরীব, কাউরে করেন ধনী।" আর বুড়ী ঠাকুরমা বলেন—"কর্মফল···বাবারে কর্মফল। আগের জন্মে অনেক পাপ করেছিলাম, এজন্মে তার ফল ভুগছি"।

হাসছেন আপনারা? কোট-প্যান্ট-টাই পরা, আমেরিকা ঘোরা ইঞ্জিনীয়ার যখন বললেন—"এরা কাজ করতে চায় না বলেই না এত গরীব? উদ্যম থাকলে কিনা হয়? আমাদের কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শংকরভাই যখন প্রথম সহরে এসেছিল তখন তার কাছে ছোলাভাজা কেনারও পয়সা ছিল না। আর আজ ?" অথবা যখন বিদেশকেরত খুব বুদ্ধিমানের মতো বলেন—"ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা মূলত জনসংখ্যার সমস্যা।···ভারতে প্রতিবছর প্রায় ১ কোটি লোকের মতো ভয়ংকর বৃদ্ধি তার উন্নয়নমূলক সমস্ত কার্যক্রমকে—শিক্ষাক্ষেত্রে, জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে অথবা গ্রামপুনর্গঠনে বহু বিলম্ব [illegible] ব্যর্থ করে দেয়।**" তখন কিন্তু আপনারা হাসেন না, খুব গম্ভীরভাবে চিন্তা-বিচার করেন।

বুড়ো ক্ষেতমজুর কিংবা বুড়ী ঠাকুমাও কিন্তু সত্যি [illegible] বলেন নি। বুড়ো যদি সংস্কৃত জানত, তবে ওরকম গেঁয়ো ভাষায় না বলে বলত—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা। মা গৃধঃ কস্যচিত্ ধনম্" অর্থাৎ "তিনি" যা দিয়েছেন তাই নাও। বুড়ী যদি ভারতীয় দর্শনের উপর লেখা বড় বড় বইগুলো পড়ে থাকত, তবে বলতে পারত—"হেসোনা বাবারা, এটা বুদ্ধদেবের কথা, যারে কেষ্টঠাকুরের অন্ত অবতার কয়"।

বাস্তবিকই তাই। একদিকে যখন অসংখ্য লোক গরীব, তখন মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে কেন অজস্র ধনসম্পদ জমে থাকবে—এর সমর্থনে দার্শনিকেরা যুগে যুগে নতুন নতুন কারণ খুঁজে বার করেছে এবং তা প্রচার করেছে, বিনিময়ে রাজা আর অন্য ধনীরা এই দার্শনিকদের মাথায় করে রেখেছে। আজও ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার মতো ধনী দেশের দার্শনিকেরা আর আমাদের দেশের ধনীদের ঘুষখোর দার্শনিকেরা এর নতুন নতুন কারণ খুঁজে বার করছে, চলছে তা নিয়ে প্রচণ্ড রকম প্রচার। বিনিময়ে এই দার্শনিকদের, অর্থনীতি-সমাজ-বিজ্ঞানের এক্সপার্টদের নাক-মুখে এবং ধনসম্পদে মুড়ে দিচ্ছে আজকের ধনীরা। পরিবার পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রসংঘের অফিসে পাচ্ছেন চাকরী। আর আমরা রোজ কাগজে দেখছি ভয়ংকর সব তথ্য—"এদেশে প্রতি মিনিটে ৪৪টি শিশু জন্ম নিচ্ছে"। এইভাবে ভারতের জনসংখ্যা ৩১ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে***। "চলতে ফিরতে দেখতে পাচ্ছি 'লাল ত্রিকোনে'র বিজ্ঞাপন। বিদেশী বিশেষজ্ঞ, গাদাগাদা উপাধি পাওয়া বিজ্ঞানী, আর সেই সাথে "দায়িত্বশীল" মন্ত্রীরা বলছেন—"দেশের গরীবির এটাই কারণ।"

তবু প্রশ্ন করব, দেশের দারিদ্র্যের এটাই কি সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক কারণ?

ক্রমশঃ

---

* পরিসংখ্যানগুলো হুবহু ঠিক নয়। পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

** চন্দ্রশেখর "ইণ্ডিয়াজ পপুলেশন, ফ্যাক্টস্, প্রব্লেম এ্যাণ্ড পলিসি", ১৯৬৬।

*** ড্রাফ্‌ট ফিফ্‌থ প্ল্যান।
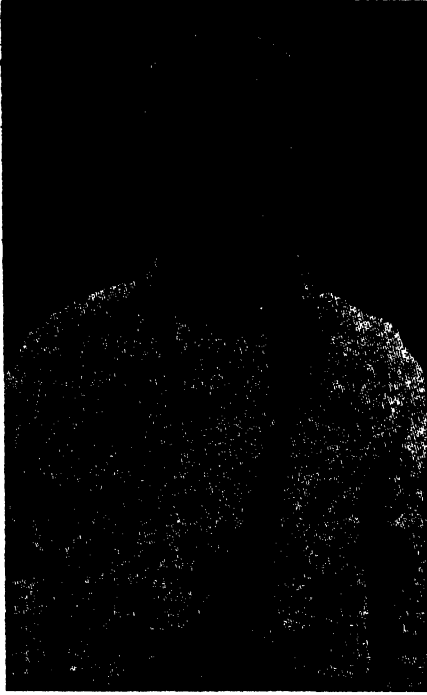
# ডাঃ নরমান বেথুন

বিশ্ব-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয়
নায়কের জীবনালেখ্য

রঞ্জন দেবনাথ

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুশমন—যক্ষ্মা

৪

সোবিয়েত ইউনিয়ন। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে মেহনতী মানুষ দাসত্বের শৃংখল ছিঁড়ে ফেলে সারা দুনিয়াজোড়া এক শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল লেনিন-স্তালিনের পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে। স্বপ্ন দেখেছেন বেথুনও—সেই নতুন সমাজের কোটি কোটি কারিগরকে দেখার, যারা ক্ষয়গ্রস্ত এক পুরাতন সমাজের দেহে অস্ত্রোপচার করে তাকে দিয়েছে নতুন জীবন, নতুন স্বাস্থ্য, নতুন সম্ভাবনা।

অবশেষে রাশিয়া যাবার সুযোগ এলো। ১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে লেনিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শারীর-বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলেন বেথুন। তিনি ছাড়া কানাডার আর যে সমস্ত বিজ্ঞানী প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান পেয়েছিলেন, তাঁরা হলেন: স্যার ফ্রেড্রিক বেন্টিং, ডাঃ জন ব্রাউন এবং ডাঃ হানস্ সিলে। চার্লস্ বেস্ট-এর সঙ্গে এক সাথে ইনসুলিন আবিষ্কার করে বেন্টিং অল্পদিন আগে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। ডাঃ সিলে তখনও 'অ্যাডাপ্টেশন সিনড্রোম'-এর ওপর তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধটি প্রকাশ করেন নি। ডাঃ সিলের কাছে লেনিনগ্রাদ যাবার অর্থ ছিল পাভ্‌লভের সাথে সাক্ষাৎ করা যাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ডাঃ ব্রাউনের কাছে শারীর বিজ্ঞান কংগ্রেসের অর্থ ছিল, অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে তাঁর গবেষণার ব্যাপারে আলোচনা করে, প্রাণ-রসায়নে তাঁর নবলব্ধ তথ্যগুলোকে সমৃদ্ধ ও সুসংহত করা অর্থাৎ সেই সাধারণ প্রস্তুতিরই একটা পর্ব যা পরবর্তীকালে তাঁকে কানাডাতে মেডিসিন-এর একজন অনন্য সাধারণ অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রয়্যাল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের প্রধান হবার সুযোগ এনে দেবে। আর বেথুনের কাছে এই কংগ্রেসের অর্থ ছিল—'সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা' বাস্তবে কি ভাবে কাজ করছে তা চাক্ষুষ দেখার একটা মস্তো সুযোগ।

লেনিনগ্রাদে এসে বেথুন ঠিক করে ফেললেন, কংগ্রেসে যে নিবন্ধ-গুলো পড়া হবে সেগুলো তিনি পরে নিজেই পড়ে নেবেন। আর তাই, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিয়েই নিজের রাস্তা ধরলেন বেথুন। পাভলভের সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার শেষ করেই তিনি বাকি সময়টুকু 'সোবিয়েত দুনিয়ার মানুষদে'র দেখতে লেগে গেলেন। আর অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন ক্ষয়রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে। পাভলভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জনৈক সহকর্মীকে লেখা চিঠিতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন বেথুন:

কংগ্রেসে যোগ দিতে এসে পাভলভকে দেখা এবং তাঁর কথা শোনার একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেছি। চেহারার দিকে তাকালে যে কোন লোকেরই জর্জ বার্নার্ড শ'এর কথা মনে পড়ে যাবে। আমার মনে হয় পাভলভ মানব আচরণ-বিজ্ঞানে যে অবদান রেখেছেন তা আমরা বর্তমানে একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছি মাত্র। রোগের মৌলিক সমস্যাটাকে কি ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে সে সম্পর্কে তিনি একটা সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগী তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। এমন কিছু নতুন ঘটনা তিনি তুলে ধরেছেন যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে

রোগকে সারাতে হলে একটা সঠিক পটভূমিকায় তাকে দেখা দরকার। এই দৃষ্টিকোণটি হল: পরিবেশের ওপর মানব শরীরের প্রতিক্রিয়াগুলোর নির্ভরশীলতা; শুধু মাত্র আমাদের পরাবর্ত ক্রিয়াগুলোই (Reflexes) নয়, এমন কি আমাদের টিস্যু, রক্ত কনিকা…"

রুশ জনস্বাস্থ্য পরিষদের (Russian Commissariate of Public Health) মাধ্যমে হাসপাতাল ও স্যানেটোরিয়াম পরিদর্শন করার এবং ক্ষয়রোগ সারাবার রুশী পদ্ধতি অধ্যয়ন করার অনুমতি পেলেন বেথুন। যে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল নিয়ে তিনি এসেছিলেন তার নিবৃত্তি হল—সঠিক দিশার সন্ধান পেয়ে আনন্দ ও উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন তিনি।

ক্ষয়রোগকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব বলে যে কথাটা এ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে শুধু মাত্র একটা বিশ্বাসের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাকেই মূর্ত বাস্তব হিসেবে দেখতে পেলেন বেথুন রাশিয়ায়। বিপ্লবের মাত্র ১৮ বছরের মধ্যে, যার প্রায় অর্ধেকেরও বেশী সময় লেগেছে দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষয়রোগের ঘটনা শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে। যতই অনুসন্ধান চালান ততই নতুন নতুন বিস্ময়ের সম্মুখীন হন বেথুন। রোগীদের বিশ্রাম-কুটীর, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্র, ও স্যানেটোরিয়ামগুলো এমনই বিলাসবহুল যা তিনি এর আগে কোথাও দেখেন নি আর এ সমস্ত কিছুরই সুযোগ প্রথমে পান শ্রমিকরা—ব্যাপারটা বেথুনের পরিচিত দুনিয়ার ঠিক বিপরীত। চিকিৎসা কেন্দ্র এবং স্যানেটোরিয়ামগুলোতে রোগীদের একটা পয়সাও খরচ করতে হয় না;—দাক্ষিণ্য নয়, এটা হ'ল অসুস্থ ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার। রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসেবে সরকারীভাবে খুব কম বয়স থেকেই শিশুদের 'টুবার কুলিন' পরীক্ষা করা হয়ে থাকে যা তিনি স্বদেশে বহুবার চিন্তা করেছেন এবং এ নিয়ে প্রচারও করেছেন।

এক দশক আগে—ট্রুডোতে থাকার সময় বেথুন সেরে ওঠা টি. বি রোগীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা নেবার কথা বহুবার বলেছিলেন। এখন রাশিয়াতে এসে তাঁর কল্পনাকে বাস্তবের আকারে দেখতে পেলেন তিনি। পুনর্বাসন ব্যবস্থার বিশালতা এবং কর্ম-দক্ষতা দেখে তৎক্ষনাৎ তিনি এটাকে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা' বলে ঘোষণা করে ফেললেন।

দেশের অন্যান্য স্যানেটোরিয়াগুলো ঘুরে দেখার মতো সময় ছিল না; তবে যেটুকু দেখেছেন সেটুকুই তাঁর মনে প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। বেথুনের ভীষণ ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দিন থেকে গিয়ে রাশিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে বোঝার চেষ্টা করেন এবং দেশের বাকি অংশগুলো ঘুরে দেখেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। ইতিমধ্যেই তাঁর ছুটির সীমা পেরিয়ে গেছে। অগত্যা বই-পত্র, পুস্তিকা, ডাক্তারী জিনিষপত্র ইত্যাদিতে 'বোঝাই' হয়ে ছ' মাস পরে দেশে ফিরলেন বেথুন। তাঁর সেই সাথে নিয়ে এলেন নবঅর্জিত এক অনুভূতি—অস্পষ্ট অথচ বাস্তব: এমন নতুন কিছুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে প্রাচীন রাশিয়ায় যা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে অদূর ভবিষ্যতে।

যে সময়কার কথা, সে সময় কানাডা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কোন রকমের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না এবং 'সোভিয়েত এক্সপেরিমেন্ট' সম্বন্ধে কৌতূহল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ফলতঃ রাশিয়া থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই বেথুনের কাছে বক্তার বেশে আমন্ত্রণ আসতে লাগল—বিভিন্ন জনসভায় তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরার অনুরোধ নিয়ে।

যতগুলো আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব, করলেন বেথুন। ছাত্র, চিকিৎসক সংঘ এবং বিভিন্ন স্বার্থের রাজনৈতিক সংগঠনের সামনে তিনি তুলে ধরলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। বক্তা হিসেবে বেথুন কোন সংস্কারের পরোয়া করতেন না। শ্রোতার সংখ্যা যতো বিশালই হোক না কেন এমন সাধারণ আলাপী ঢংএ তাঁর কথাগুলো বলে যেতেন যেন নিজের ঘরে বসে খোশ মেজাজে আড্ডা দিচ্ছেন জনা কয়েক বন্ধুর সাথে। বক্তৃতার সময় কখনো কখনো সভাপতির টেবিলে উঠে বসতেন বেথুন; আবার কখনো কখনো নিজের চেয়ারখানা মঞ্চের সামনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা হাঁটু হাতলের ওপর চাপিয়ে কথা বলা চালিয়ে যেতেন—'বক্তৃতা দেওয়ার' কেতাবী নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই।

বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সরল নীতি অনুসরণ করতেন তিনি: তথ্য এবং ঘটনাগুলোকে সোজাসুজি উপস্থিত করা এবং শ্রোতাদের আত্মতৃপ্তিরভাবকে সজোরে আঘাত করা। ফাঁপা শব্দের সস্তা বাগবিন্যাস বেথুন ঘৃণা করতেন। আর সব চাইতে বেশী যা তাঁকে আনন্দ দিত তা হ'ল—অসচেতনভাবে মানুষ যে দৃষ্টিভংগীকে মেনে নিয়েছে সেটিকে চ্যালেঞ্জ করে তাকে চিন্তা করতে বাধ্য করা। ইতিমধ্যেই বেথুন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর জলন্ত সংবাদ পরিবেশন করে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন টরন্টোতে। দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন তিনি, সোভিয়েত-সফর হ'ল তাঁর জীবনের সব চাইতে উত্তেজক অভিজ্ঞতা। প্রবন্ধ ও ভাষণের ভেতর দিয়ে রাশিয়াকে তিনি উচ্ছসিত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই বলে: নতুন জেগে ওঠা এই দেশ "বিজ্ঞান ও গবেষণার শক্ত ভিতের ওপর এক বিশাল ইমারত গড়ে তুলেছে পৃথিবীর অন্য কোন জায়গার মানুষ এতো সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে না যে আজকের বিজ্ঞান হ'ল গতকালের গবেষণা এবং আজকের গবেষণা হ'ল আগামীকালের বিজ্ঞান।" কানাডার জাতীয়

নায়ক বেটিংএর এই ধরণের বিভিন্ন বক্তব্য বেথুনের মতামতের যথার্থ সন্ধান পাবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

নিজের সোভিয়েত সফরের অভিজ্ঞতাগুলোকে ঢেলে সাজালেন বেথুন। সংগৃহিত তথ্যগুলোর অর্থ সারসংক্ষেপ করলেন। তারপর মনট্রিলে আয়োজিত চিকিৎসাবিদদের এক সভায় আমন্ত্রিত হয়ে যাত্রা করলেন তাঁর রিপোর্ট পেশ করতে।

১৯৩৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। ডাক্তার, তাঁদের পরিবারের লোকজন এবং কিছু সাধারণ নাগরিকের ভীড়ে সভাকক্ষে আর তিল ধারণেরও জায়গা নেই। সভার কাজ শুরু হ'ল। মাইকের সামনে প্রথমে এলেন ডাঃ সিগে। বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ এবং লেনিনগ্রাদ-কংগ্রেসের কিছু আলোচনা ছাড়া তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আর কিছুই ছিল না। পরবর্তী বক্তা হিসেবে উঠলেন ডাঃ ব্রাউন। কংগ্রেস সম্পর্কে আলোচনা ছাড়াও খুব রসিয়ে রসিয়ে শোনালেন তাঁর 'রাশিয়া-অ্যাডভেঞ্চারের' গল্প—'ও দেশে সিঙ্ক-এ (Sink) 'প্লাগ' না থাকায় তাঁকে কি 'সাংঘাতিক' অবস্থায় পড়তে হয়েছিল', 'ওখানকার 'গাইড'রা ইংরেজি না জেনেও কি রকম জানার ভান করে থাকে', 'আমলাতান্ত্রিক লালফিতের কাণ্ড', 'ওখানে রেলের টিকিট পেতে হলে কি রকম ঝক্কি পোয়াতে হয়' মজাদার গল্প শুনে শ্রোতারা ভীষণ খুশী। প্রচুর হাততালি কুড়িয়ে বক্তৃতা শেষ করলেন ব্রাউন। এবার মঞ্চে উঠলেন ডাঃ বেথুন। সিগে ও ব্রাউনের বক্তব্যের মর্মবস্তু কি হবে, তা তিনি আগের থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। বক্তার আসনে দাঁড়াবার সাথে সাথে মৃদু করতালির নম্র অভিনন্দন এলো সভাকক্ষ থেকে। সভাপতি সপ্রশংস শ্রদ্ধার সাথে 'পৃথিবীর প্রথম সারির থোরাসিক সার্জনদের একজন' এই মন্তব্য করে বেথুনের পরিচয় রাখলেন শ্রোতাদের সামনে। এবার বলার পালা। একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করলেন বেথুন :

"স্বেচ্ছাকৃতভাবেই আমি আজকের সান্ধ্য আসরের শেষ বক্তা হিসেবে থেকেছি।"—সাধারণ কথাবার্তার ভংগীতে বলেন বেথুন। "গোড়ার থেকেই ঠিক করে ছিলাম—লেনিনের-স্কুল-থেকে-ফিরে-আসা আমার সতীর্থ বন্ধুদের বিপরীত চরিত্রে নামবো আমি।" সভাকক্ষের মধ্যে একটা মৃদু হাসির ঢেউ ছড়িয়ে যায়। "আমি বেশ ভালো করেই জানতাম তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে একমত হবেন। আর আমি পূর্বাহ্নেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাঁরা যদি রাশিয়াকে নিন্দা করেন তবে আমি তাকে প্রশংসা জানাবো; যদি তাঁরা প্রশংসা করেন তবে তাকে খর্ব করে দেখাবো আমি। দয়া করে ভুল বুঝবেন না যেন, এটা কোন নির্ভেজাল বিকৃতির মানসিকতা থেকে করা নয়—বাস্তব সত্যকে উপস্থিত করার তাগিদ থেকেই আমাকে তা করতে হতো; কারণ সত্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাস্তবতার দুটো আপাতঃ সঙ্গতিহীন দিকের সীমারেখায় লুকিয়ে থাকে।"

অপ্রত্যাশিত মুখবন্ধে বিস্মিত ও কৌতূহলী শ্রোতাদের ওপর চোখ ঘুরিয়ে সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে প্রসঙ্গে ফিরে আসেন বেথুন।

"অজানা দেশ থেকে ফিরে আসা অভিযাত্রীদের যে ভ্রমণ কাহিনী আমরা শুনে থাকি তা মূলতঃ নিজেকে বা নিজের ভ্রমণকে বিরাট করে দেখানোর কাহিনী এবং তা প্রকৃতিগতভাবে আত্মজীবনীমূলক। আর তাই তাঁদের সমালোচনাটাও (কথাগুলোকে শাণিত ভংগীতে উচ্চারণ করেন বেথুন) একজন স্নেহচক্ষু পেশাদার সমালোচকের সমালোচনাকেও হার মানায়। বাইবেলের সেই ভদ্রলোকেদের থেকে শুরু করে, যারা ফিরে এসে প্যালেস্টাইনকে 'দুগ্ধ ও মধু-প্লাবিত দেশ' বলে বর্ণনা করেছিল—আদপে যা মোটেই সেরকম নয়, মার্কোপোলো-কলম্বাস-ব্যারণ মাঞ্চুসেন পর্য্যন্ত স্থান-কাল নির্বিশেষে সমস্ত ভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রেই এই কথাটা খাটে।" এই জায়গায় একটু হাসেন বেথুন। কৌতূহলী শ্রোতা এবং পূর্ববর্তী বক্তারা নড়ে চড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন—এর পরে বেথুন কি বলবেন তা শোনার উত্তেজিত প্রত্যাশা নিয়ে।

"এখন খোলাখুলি বলতে গেলে, আমি কিন্তু অন্যদের মতো শারীরবিজ্ঞান সম্মেলনে যোগ দেবার এক এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে রাশিয়া যাই নি। আমার যাবার পেছনে এর চাইতেও অনেক বড় কারণ ছিল। আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার মানুষদের দেখা আর গৌণ উদ্দেশ্য ছিল—সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় গিয়ে দেখা, সব চাইতে সহজে যাকে নির্মূল করা সম্ভব সেই সংক্রামক ব্যাধি—টি. বি কে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে তারা কি করছে। ওখান থেকে ঘুরে আসার দরুণ অন্ততঃ এইটুকু আমি বলতে পারি—যদি যথেষ্ঠ উদ্যম এবং টাকা পয়সার প্রাথমিক সর্ত পূরণ হয় তবে কি ভাবে এখানেও সেই কাজটা শুরু করা সম্ভব সে সম্পর্কে এখন আমার কিছু সুনির্দিষ্ট ধারণা হয়েছে। কংগ্রেস সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না; কারণ মাত্র একটা অধিবেশনেই আমি হাজির ছিলাম—শুধু উদ্বোধনের দিনটাতে। আর এর পরবর্তী সময়টা 'নেভা'তে সাঁতার কেটে, রাস্তাঘাটে অবাধে ঘুরে বেড়িয়ে, অন্যের জানালায় উঁকি দিয়ে, ছবিঘরগুলোতে ঢুঁ মেরে—সত্যি কথা বলতে কি, ভীষণ ব্যস্ততার ভেতর দিয়ে কেটেছে..." সিগারেটে টান দিতে একটু থামলেন বেথুন। তারপর আবার রসিকতার মেজাজে ফিরে এলেন :

"বোধহয় আমার বক্তৃতার শিরোনামটা হওয়া উচিৎ : রিফ্রেকশন থ্রু এ লুকিং গ্লাস *। এটা মনে রাখা দরকার, রাশিয়াকে একটা

* লুইস ক্যারলের লেখা একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম, যেখানে ছোট্ট মেয়ে এলিসের চোখ দিয়ে দেখা এক আজব দুনিয়ার কথা বলা হয়েছে।—লেখক

'উলটপুরানের দেশ' বললে (যে প্রচারটা আকছার শুনতে পাই) পরে একটা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ দেখা দিতে পারে—সত্যি সত্যি ওখানে সবকিছুকে উল্টো দেখায় কি না! কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে এটা নেহাৎই একটা দৃষ্টি-বিভ্রম এবং ব্যাপারটা আর কিছুই না দর্শক স্বয়ংই নিজের পা দুখানা আকাশের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলেই এই বিভ্রাটটা ঘটেছে! হয়তো বিদেশী ভদ্রলোকটি "ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে পুরাতন ধ্যান-ধারণা বর্জন কর"—সিংহ দরজার ওপর অদৃশ্যভাবে লেখা এই নির্দেশটা খেয়াল না করেই রাশিয়াতে ঢুকে পড়েছিলেন!

সিগারেটটা নিবিয়ে অবশিষ্ট টুকরোটাকে পকেটে পুরলেন বেথুন। তাঁরপর তাঁর প্রিয় "এলিস"-এর বই থেকে সোবিয়েত রাশিয়ার প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপমা এক এক করে তুলে ধরতে লাগলেন। সোবিয়েত রঙ্গমঞ্চে তাঁর পরিচিত চরিত্রগুলো পাল্টে গিয়ে হল: হোয়াইট নাইট, হোয়াইট কুইন, রেড কিং, হাম্পটি-ডাম্পটি, ম্যাড হেটার, টুইড্‌ল ডাম, টুইড্‌ল ডি...

"আজকের রাশিয়াতে যা ঘটছে তার সাথে এলিসের অনেক অভিজ্ঞতাই সত্যি সত্যি মিলে যায়"—বলেন বেথুন। "যেমন, সেই ঘটনাটার কথা ধরা যাক, যেখানে 'হোয়াইট কুইনের' (White queen) কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে এলিস বলছে:

"ওঃ! অসম্ভব!—আমি একদম বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"পারছো না?" রাণী বললে, "আবার চেষ্টা করতো; হ্যাঁ, বেশ ভালো করে একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করবে।"

হাসলো এলিস। "কেউ কি অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করতে পারে কখনো?

রাণী গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, "আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি যথেষ্ট অভ্যাস করনি। কেন, এই তো আমার কথাই ধরনা—রোজ সকালে খাওয়ার আগে আমি এমন কি কখনো কখনো ছ'-ছ'টা অসম্ভব ব্যাপার বিশ্বাস করে থাকি।"

'লুকিং গ্লাস'-এর রাণীর মতো রাশিয়ার মানুষদের কাছেও, অনেক অসম্ভব জিনিসকে বিশ্বাস করতে পারা খুবই সহজ একটা ব্যাপার; অন্ততঃ সেই জিনিষগুলো যেগুলোকে আমরা অসম্ভব বলে ভেবে থাকি।

কিম্বা "লুকিং গ্লাসের" আরেকটা জায়গার কথা ধরা যাক যেখানে এলিস ছোট্ট একটা পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে তাকিয়ে দেখতে পেলো—পুরো দেশটা একটা দাবার ছক হয়ে গেছে আর জীবনটাই হয়ে গেছে দাবার খেলা। মুগ্ধ হয়ে এলিস বলে "এই খেলায় যে কুইনটা জিতবে আমি সেই 'কুইন' হবো।" এর উত্তরে রাণী বললো, ওটা আর কি এমন শক্ত ব্যাপার? তুমি শুরুতে দু নম্বর ঘরে 'কুইন'-এর বোড়ে হয়ে বসে যাও। তারপর যেই আট নম্বর ঘরে গিয়ে উঠবে অমনি দেখবে তুমি 'কুইন' হয়ে গেছো। আর তখন আমরা সবাই রাণী হয়ে যাবো - তাই না?"—এবং এই কথাটা হল সংক্ষেপে সাম্যবাদের আশা ও বিশ্বাস।

শ্রোতারা যখন বেথুনের বাক্‌-চাতুর্য মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করছেন, তখন হঠাৎ তাঁর ভংগী ও স্বর পাল্টে গেল। পরিহাসের ভংগী ত্যাগ করে, এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন বেথুন:

নিজের জীবন-কাহিনী বলতে গিয়ে ইসাডোরা ডানকান তাঁর জননী হবার কথা লিখছেন ..."(ওখানে) তার আছি আমি—রক্ত, দুধ আর অশ্রুর এক উৎসারিত প্রস্রবনের মতো।"

যন্ত্রণার কারণটা যদি অজানা থাকে তা'হলে কেউ একজন এই নারীকে দেখে কি ভাববে? রক্ত, যন্ত্রণা, সাহায্যকারীদের আপাতঃ নিষ্ঠুরতা এবং প্রসব করানোর গোটা বিভৎস পদ্ধতি কি তাকে আতঙ্কিত করে তুলবে না? সে কি চিৎকার করে উঠবে না, "থামাও! পুলিশ! খুন!" কিন্তু তাকে যদি বলা হয়: সে এক নতুন প্রাণের আবির্ভাব দেখছে, যদি বলা হয়: এই যন্ত্রণার পর্ব শিগ্রীই শেষ হয়ে যাবে, যদি বলা হয়: এই যন্ত্রণা ও কুশ্রীতার প্রয়োজন ছিল এবং নতুন জীবনের জন্ত চিরদিন তাই থাকবে—তখন ওই প্রসূতী মায়ের সম্পর্কে কি বলবে সে? ও কি কুশ্রী নয়?—হ্যাঁ, তাই। ও কি সুন্দরী নয়? হ্যাঁ, তাই। ও কি করুণ, উদ্ভট, ভয়াল এবং অবাস্তব নয়?—হ্যাঁ, তাই। ও কি সুন্দর পবিত্র নয়?—হ্যাঁ, তাই! আর এই সব ক'টা কথাই সত্যি।

বর্তমানে রাশিয়া মা হতে চলেছে। আর ধাত্রীরা এখন নব জাতককে বাঁচাতে এতো বেশী ব্যস্ত যে চার দিকের নোংরা সাফ করার সময়ই পাচ্ছে না তারা। এই নোংরা, এই কুৎসিত ও অস্বস্তিকর অবস্থাই সেই সব ভীরু পুরুষ ও অক্ষত যোনি নারীদের চোখ বন্ধ ও নাক উঁচু করার কারণ, যারা আঘাতে ব্যাঘাতে ভুগছে, যারা রক্তের আড়ালে প্রাণের আবির্ভাবের তাৎপর্য আবিষ্কার করার কল্পনাশক্তি থেকে বঞ্চিত।"

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। মনট্রিল আর্ট গ্যালারিতে ছবির প্রদর্শনী দেখতে এসে একজন অপরিচিত শিল্পীর আঁকা একটা ছবির প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হন বেথুন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন—এই অদ্ভুত প্রতিভাধর শিল্পীর নাম ফ্রিৎস ব্রান্টনার (Fritz Brandtner), হিটলারের শাসনকে ঘৃণা করে মাতৃভূমি জার্মানী ছেড়ে সম্প্রতি কানাডায় এসেছেন। ব্রান্টনারকে চিঠি লিখলেন বেথুন। বন্ধুত্ব হতে বেশী সময় লাগল না। এবং এই বন্ধুত্বের ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নিল অভূতপূর্ব এক ঐতিহাসিক পরিকল্পনা।

একদিন দুই বন্ধুতে মিলে গল্প হচ্ছে। কথায় কথায় ব্রান্টনার তাঁর ইউরোপের কাজকর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বেথুনকে ডঃ সিজেক-এর কথা

বলেন—'শিশুদের শিল্প শিক্ষাদানের প্রগতিশীল তত্ত্বের' আবিষ্কর্তা ডাঃ সিজেক যাঁর কাছে তিনি নিজেই ভিয়েনাতে বেশ কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলেন।' নতুন বিষয়টাতে ভীষণ কৌতূহলী হন বেথুন। সিজেক-এর তত্ত্ব সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অজস্র প্রশ্ন করেন বন্ধুকে। এবং পরের দিনই ব্রান্টনারকে পুরোপুরি অবাক করে দিয়ে তাঁর সামনে মেলে ধরেন একটা 'শিশু শিল্প স্কুল' ( Children's Art School ) গড়ে তোলার খসড়া।

'যে সমস্ত শিশুরা সহরের অন্ধকার গলিতে বেড়ে উঠছে তাদের জন্য কি করবেন তিনি'—এই প্রশ্নটা দীর্ঘদিন ধরে অস্থির করে তুলছিল তাঁকে। এখন নিজের অজান্তে তাঁর শিল্পীবন্ধু তাঁকে প্রশ্নের উত্তরটা জুগিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানতেন—তাঁর ছোট্ট কাজটা বর্তমানে একটা সূচনা মাত্র এবং ভবিষ্যতে এর থেকেই বিরাট অনেক কিছু গড়ে উঠতে পারবে।

বেথুনের পরিকল্পনাটা খুব সরল ছিল: ডঃ সিজেক-এর পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিশুদের শিক্ষা দেবার মতো একটা আর্ট স্কুল খুলবেন তাঁরা। শিক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব থাকবে ব্রান্টনারের ওপর আর স্কুল চালাবার পুরো দায়িত্ব নেবেন তিনি নিজে। বেতনের কোন বালাই থাকবে না তাঁদের স্কুলে এবং সম্পূর্ণ বিনা খরচে শিক্ষা পাবে শিশুরা। তাঁর বাড়ীটা সাময়িকভাবে স্কুল হিসেবে কাজ করবে। প্রতিটি শিশুকেই স্বাগত জানানো হবে এই স্কুলে। প্রতিষ্ঠানটি যদি ভবিষ্যতে বড় হয় তবে উৎসাহী নাগরিকরাই এর ব্যয়ভার বহন করবেন। আপাততঃ আর্থিক ব্যাপারটা তিনি নিজেই দেখবেন। এইভাবে শুরু হল এই জাতীয় প্রকল্পের পথিকৃৎ—মনট্রিলের 'চিলড্রেনস্ আর্ট স্কুল' যা নিজেকে উৎসর্গ করেছিল, বস্তির অন্ধকারে শিল্পের সৃজনশীলতা ও আনন্দ ছড়িয়ে দেবার কাজে।

হাসপাতালের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত জীবন এবং বাইরের অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে একটু খানি ফাঁক পেলেই বেথুন একবার বাড়ী থেকে ঘুরে যেতেন; দেখে যেতেন তাঁর প্রিয় স্কুলটি কি রকম চলছে। এক রাশ আনন্দ নিয়ে স্টুডিওতে ঢুকেই হাঁক পাড়তেন, "আমার বাচ্চারা কেমন আছে আজকে?" তাঁর ব্যর্থ পরিণয়ের করুণ স্মারক হিসেবে যে প্রাণহীন পুতুলটাকে এতো দিন ধরে তিনি নিজের কাছে রেখে আসছিলেন, সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বেথুন। বাস্তব জগতেই তাঁর সন্তানদের খুঁজে পেয়েছেন তিনি।

'চিলড্রেনস্ আর্টস্কুল' চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৃহত্তর সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বেথুন। জনস্বাস্থ্যের ওপর একটা কর্মসূচীর খসড়া তৈরী করার উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় শুরু হল। কর্মসূচীটা যেমন তেমন হলে চলবে না, কাজে রূপ দেওয়ার মতো সরল এবং ব্যাপক সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ও সম্পূর্ণ হতে হবে। উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপ দিতে কাজে লেগে গেলেন বেথুন। চিকিৎসা বিদ্যার সমগ্র ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়া এবং পৃথিবীতে যত ধরণের চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো তন্ন তন্ন করে পরীক্ষার কাজ শুরু হল। পরিকল্পনাটা এতোই বিশাল যে বেথুনের সব চাইতে সহানুভূতিশীল বন্ধুরাও তাঁকে উৎসাহ দিতে খুব একটা ভরসা পেলেন না। আমেরিকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্তা আই. এস ফাল্ক-এর ( I. S. Falk ) সাথে এ নিয়ে কথা বললেন বেথুন। ফাল্ক-এর সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন বটে, তবে এই কাজে যে পর্বত-প্রমাণ গবেষণার সমস্যা রয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য ফাল্ক তাঁকে যে অসংখ্য সতর্কতা, পরামর্শ ও হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, তা যে কোন সাধারণ মানুষের উৎসাহ প্রশমিত করার পক্ষে যথেষ্ট! ফাল্ক-এর 'সংখ্যাতীত' পরামর্শের উত্তরে বেথুন একটাই জবাব দিয়েছিলেন: "সমস্যাটা শুধু 'কেতাবী গবেষণা' নয়। সমস্যাটা হল, গত সাত বছরের সংকট, মন্দা এবং লোভ ও বোকামি যে বিরাট আকারের ব্যাধিটার জন্ম দিয়েছে—তার সমাধান কিভাবে করা যায়।"

বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে কাজ শুরু করলেন বেথুন। কানাডা ও আমেরিকার বিভিন্ন মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের যা কিছু দলিল-পত্র যোগাড় করা সম্ভব, সমস্ত কিছু জড় করে এক এক করে খুঁটিয়ে পড়লেন। যে সমস্ত বন্ধুরা লণ্ডনে কাজ করতেন, তাঁদের কাছে চেয়ে পাঠালেন জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যাপারে ব্রিটেনের অভিজ্ঞতা। যোগাযোগ করলেন এ বিষয়ে উৎসাহী ওটাওয়া'র বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সাথে। বিশাল মহাদেশের যে যেখানে এ ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করছেন, সবাইকার সাথে চিঠির মারফৎ মতামত বিনিময়ের একটা স্থায়ী সেতু গড়ে তুললেন বেথুন। কয়েকশো বই ও পুস্তিকার তালিকা তৈরী হ'ল অবিলম্বে। আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস এবং লীগ অব নেশনস্-এর বিভিন্ন শাখা থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন বেথুন। প্রতিটি দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধ্যয়নের সাথে তিনি যুক্ত করলেন সেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার গবেষণা, গড় মজুরী, সরকারের কাঠামো এবং রাজনৈতিক দল ও জনতার সমাজচেতনার মান। এইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে বেথুন যখন বুঝলেন যে কাজে নামার ভিতটা মোটামুটি নির্ভরযোগ্য হয়েছে তখন তিনি আর দেরী না করে কয়েকজন ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীকে নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে সকলের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিগত মতামত। এই আলোচনা

সত্তা থেকেই গড়ে উঠলো—কানাডার চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাসের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় : মনট্রিল গ্রুপ ফর দি সিকিওরিটি অব দি পিপলস্ হেলথ্। চিলড্রেন্স আর্ট স্কুল যেমন নিজেকে উৎসর্গ করেছিল বঞ্চিত শিশুদের কাছে নতুন আশা ও আনন্দের আলো পৌঁছে দিতে ঠিক তেমনি, এই নতুন সংগঠন আত্ম-নিবেদন করলো অগণিত দরিদ্র সাধারণ মানুষ, যাদের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী, তাদের কাছে উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ এনে দিতে।

বেথুনকে সম্পাদক করে এই সংগঠনে যোগ দিলেন একশ'জন ডাক্তার, নার্স ও সমাজসেবক। বেথুন এবং সরকারপক্ষের মধ্যে কিছু প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর বেথুনের সাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র প্রচারিত হ'ল সংগঠনের পক্ষ থেকে। ঘোষণা পত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল কুইবেক প্রদেশের হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের ভয়াবহ অবস্থার প্রতি এবং দাবি তোলা হল—সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যকে যদি সুরক্ষিত করতে হয় তা হলে স্বয়ং সরকারকেই এই ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে হবে। এর সাথে সাথে থাকলো, অবিলম্বে জনস্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থাকে উন্নত করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে যে কর্মসূচীর প্রস্তাব বেথুন রেখেছিলেন যদিও তা মোটেই সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মতো নয়, তবুও তিনি ঘোষণা করতে একটুও দ্বিধা করেন নি যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমেই চিকিৎসা বিজ্ঞান মুক্তি পেতে পারে এবং সেই সাথে পেতে পারে- নিজের সমস্ত সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করার যথার্থ সুযোগ।

যে কোন সংগঠনে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য এবং মতের ভিন্নতা থাকবেই। পিপলস হেল্থ গ্রুপ-এর মধ্যে যে পার্থক্যগুলো গোড়ার দিকে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, সেগুলি সংগঠনের মূলনীতিগুলোর ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা হয় তাতে এই প্রথম স্পষ্টভাবে লক্ষিত হ'ল। এই মত পার্থক্যের মীমাংসার জন্য Montreal Medico-Chirurgical Society এক প্যানেল আলোচনার অনুষ্ঠান করে। বহুদিন থেকে এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন বেথুন।

মনট্রিলের সব চাইতে খ্যাতিমান তিনজন ডাক্তার অংশ গ্রহণ করলেন এই আলোচনায় : ডাঃ এ. এইচ গর্ডন, ডাঃ বি. কুস্তি এবং বেথুন। ডাঃ গর্ডন যে দৃষ্টিভংগী থেকে তাঁর বক্তব্য রাখলেন তা হলঃ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিতে সরকার বাধ্য হবে, সংগঠনের পক্ষ থেকে এমন যে কোন প্রচেষ্টাই চিকিৎসকদের পেশার ভিত্তিকে বিপন্ন করবে। ডাঃ কুস্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন : অর্থনৈতিক সংকট নতুন ব্যবস্থার দাবি করছে। ডাক্তাররা সর্বত্র ক্রমেই সঙ্গতিহীন হচ্ছেন। এ সমস্ত কিছুরই সমাধান হ'ল, এমন এক পরিকল্পনা—যাতে সরকারের হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

ডাঃ বেথুনের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি সরাসরি সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বললেন। আগের দুজন বক্তাই এর বিপক্ষে বিভিন্ন তীব্রতায় আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কিছু তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন বেথুন :

"আজকের সান্ধ্য সভার আলোচ্য বিষয়টাকে এক কথায় বলা যেতে পারে : জনগণ বনাম চিকিৎসক। বলা বাহুল্য, এমন চিত্তাকর্ষক একটা বিষয় এর আগে আর কখনো এই সোসাইটিতে আলোচনার জন্য আসে নি। এই সঙ্গে বাহুল্য মনে হলেও একটা কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আজকের আলোচ্য বস্তুটা আমাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন বিমূর্ত বিষয় নয়, এখানে স্বয়ং চিকিৎসকদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে আলোচনার ভিত্তিতে। অর্থাৎ আমরা একই সাথে অভিযুক্ত এবং বিচারক—দুই-ই। সুতরাং আত্মগতভাবে বিষয়টাকে বিচার করলে মারাত্মক ভুল করা হবে।

সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অধীনে 'ব্যক্তিগত পেশার কি মারাত্মক অবস্থা হতে পারে'—ডাঃ গর্ডন আগেই সে প্রশ্নের আলোচনা করেছিলেন। এর উত্তরে বেথুন বললেন :

"এই সমস্যাটাকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা দরকার। কারণ জাতির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই প্রশ্নটির সাথে, 'একজন ডাক্তারের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ কি হবে না হবে'—তার চাইতেও অনেক বড় প্রশ্ন জড়িত আছে। যে সমস্যাটা আজকে আমাদের সামনে এসেছে তা শুধুমাত্র 'ডাক্তারি অর্থনীতি'র নয়—সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতিরই নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্ন। চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে সমাজ-ব্যবস্থারই একটা অংশ হিসেবে দেখতে হবে। এটা হ'ল একটা প্রদত্ত সামাজিক পরিবেশেরই ফল।

যে কোন সমাজব্যবস্থারই একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকে ; আর কানাডার ক্ষেত্রে এই ভিত্তিটা হল ধনতন্ত্র বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, প্রতিযোগিতা, ও ব্যক্তিগত মুনাফার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন একটা অর্থনৈতিক সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে—এবং এই সংকটটা এমন একটা মারাত্মক ব্যাধির মতো যার চিকিৎসা একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ছাড়া অসম্ভব। অনেকে আছেন যাঁরা এই কাঠামোগত ব্যাধিটাকে শুধুমাত্র একটা সাময়িক অসুস্থতা মনে করে সারাবার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, এঁদের প্রচেষ্টা

ব্যর্থ হতে বাধ্য। স্বাস্থ্যরক্ষার সপক্ষে বক্তৃতা করে যারা এই অবস্থাটাকে উপশম করার দাওয়াই বাতলাচ্ছেন আমাদের সেই অধিকাংশ 'রাজনৈতিক হাতুড়ে ডাক্তাররা' কার্যতঃ সিফিলিস্-জনিত শিরঃপীড়ার ওষুধ হিসেবে 'অ্যাসপিরিনের' বড়ি খাওয়ার ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন; ওষুধটা সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে—সারাতে পারে না।

আমাদের দেশের "যত পারো লুটে নাও" ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা একচেটিয়া পুঁজির রূপ নিয়ে ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তির ওপর নিজেকে চালু রেখেছে সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা হ'ল [ বাগ্মীতার ওপর জোর না দিয়ে যে কথাগুলো বলছেন তার ওপর বেশী নির্ভর করে স্থির, শান্তভাবে বলে চলেন বেথুন ]—একটা এলোমেলো ভাবে সংগঠিত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্প বিশেষ। সুতরাং এই চিকিৎসা ব্যবস্থাও যে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বাকি অংশের মতো একই সংকটের ধারা অনুসরণ করবে এবং প্রায় একই ধরণের মজার এবং অস্বস্তিকর ঘটনার জন্ম দেবে—সেটা অবধারিত। চিকিৎসা ব্যবস্থার এই সংকটের রূপটাকে যদি সংক্ষিপ্ত করে বলতে হয় তাহলে বলা যায়, "একটা ব্যাধির দেশে বিজ্ঞানের প্রাচুর্যের মধ্যে স্বাস্থ্যের দুরবস্থা।" যে অদ্ভুত কারণে—প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খাদ্য উৎপাদনকারী একটি দেশে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে থাকছে ( আমরা এমন কি কফি পুড়িয়ে দি, শুয়োরগুলোকে শুধু শুধু মেরে ফেলে দি এবং তুলো-গম চাষ না করার শর্তে চাষীদের টাকা দিয়ে থাকি ), কাপড় তৈরীর বিপুল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক প্রায় বিবস্ত্র হয়ে থাকছে, সেই একই কারণে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ অসুখে ভুগছে, লক্ষ লক্ষ লোক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, হাজার হাজার লোক অকালে মারা যাচ্ছে—যেহেতু উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও সেটা কেনার মতো পয়সা তাদের নেই!

চিকিৎসা ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সমস্যা, বিশ্ব-অর্থনৈতিক সমস্যারই একটা অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য অংশ। চিকিৎসার নামে আমরা যে জিনিসটা চালাচ্ছি সেটা একটা বিলাস-দ্রব্যের ব্যবসারই নামান্তর। হীরা-জহরতের দাম নিয়ে এক টুকরো রুটি বিক্রি করছি আমরা। আমাদের জনসংখ্যার অর্দ্ধেকেরও বেশী দরিদ্র—এই 'চিকিৎসা-বিলাস' তাঁদের সামর্থ্যের বাইরে। ফলতঃ যথেষ্ট 'ক্রেতা' না থাকায় আমাদের ব্যবসাও 'আর্থিকভাবে' নিরাপত্তাযুক্ত নয়। অর্থাৎ একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নেই, অপরদিকে তেমনি অর্থনৈতিকভাবে আমরা নিরাপত্তাহীন। সমস্যার দুটো দিকের মিলন-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।

বন্ধুগণ, এখন আমি যে কথাগুলো বলতে যাচ্ছি সেগুলো আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা। কিন্তু তাই বলে এগুলোকে অর্থহীন মনে করে উড়িয়ে দেবেন না যেন—কারণ বোধগম্যতার ক্ষেত্রে [illegible] বিশ্বাসেরও কিছু ভূমিকা থাকে।

জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার সব চাইতে কার্যকরী পদ্ধতি হল: যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা অস্বাস্থ্যের জন্ম দিচ্ছে, সেটাকে আমূল পাল্টে ফেলা আর তারই সাথে সাথে নির্মূল করা—অজ্ঞতা, দারিদ্র ও বেকারীকে। 'ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসার সুযোগ ক্রয় করার' প্রথা সমস্যার সমাধান করতে পারে না। শুধু তাই নয়, এটা অন্যায়, অক্ষম ও অপচয়মূলক একটা পুরনো প্রথা। ব্যক্তিগত দয়া-দাক্ষিণ্য, 'জনহিতকর প্রতিষ্ঠান' এবং ডাক্তাররা এটাকে যতদিন বাঁচানো সম্ভব, বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজকের থেকে এক'শ বছর আগে—ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন শিল্পবিপ্লব এলো, তখনই এই প্রথার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটা উচিৎ ছিল। আমাদের মতো একটা আধুনিক শিল্প সমাজে 'ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য' বলে কোন কথা থাকতে পারে না—এখানে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে কোন সমস্যাই সমগ্র জনতার সমস্যা। এখানে জনতার একটা ক্ষুদ্রতম অংশও যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ হয় তবে তার প্রভাব জনতার বাকি অংশের ওপরও পড়তে বাধ্য। তাই সরকারের উচিৎ—জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নটাকে, নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হিসেবে দেখা।

চিকিৎসাকে 'ব্যক্তিগত পেশা' হিসেবে নেবার এই প্রথাকে উচ্ছেদ বা খর্ব করে সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন করাই এই বিরাট সমস্যার একমাত্র বাস্তব সমাধান হতে পারে। আসুন, আমরা চিকিৎসার পবিত্র আদর্শকে ব্যক্তিগত মুনাফার ক্লেদ থেকে মুক্ত করে, ঘৃণ্য আত্মকেন্দ্রিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই পেশাকে পরিশুদ্ধ করি। আমাদেরই স্বদেশবাসীদের দুর্দশার বিনিময়ে বড়লোক হওয়ার আকাঙ্খাকে—আসুন, আমরা ঘৃণা করতে শিখি। আসুন, আমরা সংগঠিত হই—যাতে 'পেশাদার রাজনীতিবিদরা' আর আমাদের প্রতারিত না করতে পারে।

আসুন, আমরা চিকিৎসার নীতিশাস্ত্রের নতুন সংজ্ঞা দি—ডাক্তারদের নিজেদের মধ্যে পেশাদারী ভদ্রতার বিধি হিসেবে নয়, এমন একটা বিধি হিসেবে—যা চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং জনগণের মধ্যে মৌলিক নীতিবোধ ও ন্যায়ের প্রতীক হবে।

চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে আমূল পাল্টে পুনর্বিন্যাস করা দরকার। আর এর জন্য চাই—ডাক্তার, নার্স, যন্ত্রবিদ, এবং সমাজ-কর্মীদের এক বিরাট সংঘবদ্ধ সেনা-বাহিনী। ব্যাধির ওপর দুর্জয়, সম্মিলিত আঘাত হানবে এই বাহিনী এবং এই লক্ষ্যে প্রযুক্ত হবে প্রতিটি যোদ্ধার আয়ত্তাধীন সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। "তোমার পকেটে কত আছে?"—এই কথাটা না বলে, আসুন, আমরা জনগণকে বলি, "বলুন, কি ভাবে সব থেকে বেশী সেবা করতে পারি আপনাদের?"

নরমান বেথুন/সাভাশ

যে 'সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার' কথা আমি বার বার উল্লেখ করছি, এখন সেটাকে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অর্থ হল :

প্রথমতঃ – স্বাস্থ্য নিরাপত্তার প্রশ্নটি, পোষ্ট অফিস, সেনাবাহিনী, বিচারালয় এবং স্কুলের মতোই, জনসাধারণের হাতে থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ—সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থা জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত হবে।

তৃতীয়তঃ—আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে নয়, প্রয়োজনের ভিত্তিতে সবাই এর থেকে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। কিন্তু এটা কোন দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়। 'দাক্ষিণ্য' ব্যাপারটাকে তুলে দিয়ে তার জায়গায় 'ন্যায়'কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 'দাক্ষিণ্য' দাতাকে চরিত্রহীন এবং গ্রহিতাকে নীতিভ্রষ্ট করে।

চতুর্থতঃ—এই ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বেতন-ভার সরকার বহন করবে।

পঞ্চমতঃ—স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে।

২৫ বছর আগে সমাজতন্ত্রী হওয়াটাকে অবজ্ঞাজনক মনে করা হতো; আজকে সমাজতন্ত্রী না হওয়াটাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

চিকিৎসা-সংস্কার, যেমন লিমিটেড হেলথ ইনসিওরেন্স স্কীম ইত্যাদি এবং সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা—এক জিনিস নয়। ওগুলো হ'ল : তীব্র প্রয়োজনের তাগিদে, বিলম্বিত মানবতাবাদের উৎপাদিত সন্তান—সমাজতন্ত্রের জারজ রূপ।

সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসার বিরোধী পক্ষরা এর বিরুদ্ধে যে তিনটে প্রধান আপত্তি তুলে থাকেন সেগুলো হল :

**১নং : ব্যক্তিগত উদ্যোগ হ্রাস পাবে**

যদিও অনেকে মনে করে থাকেন যে 'এই আধুনিক বর্বরতার যুগে মনুষ্যরূপী গর্দভটির নাকের সামনে এক গোছা সব্জি ঝোলানো প্রয়োজন,' তবু আমার বিশ্বাস, এই সব্জির গোছাটা সোনার গাজর না হয়ে সম্মানের পুষ্পস্তবক হলেও একই ভাবে কাজ দেবে।

**২নং : আমলাতন্ত্র**

এই সম্ভাব্য বিপদটাকে, সংগঠনের তলা থেকে ওপর পর্যন্ত গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রোধ করা যেতে পারে।

**৩নং : ডাক্তার বাছাই করার ক্ষেত্রে রোগীর নিজস্ব পছন্দের প্রয়োজনীয়তা**

এটা একটা রটনা—ঘটনা নয়। আর এই অলীক তত্ত্বটি তৈরী করেছেন—রোগীরা নন, ডাক্তাররা স্বয়ং। পছন্দের সুযোগটা কম করে দেওয়া হোক—ধরুণ দু'জন বা তিন জন ডাক্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো? আর কোন রোগী যদি তাতেও সন্তুষ্ট না হয় তবে তাকে প্রথমে মানসিক চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে। শতকরা ৯৯ জন রোগীই ফল চান, ডাক্তারের লম্বা-চওড়া খেতাব নয়। স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে উপলব্ধি করে আমাদের পেশাকে আজ 'কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা চর্চা'র স্তর থেকে মুক্ত করতে হবে এবং সমাজমুখী করে তুলতে হবে।

আসুন, আমরা পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধকে বিসর্জন দিয়ে বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকটের বাস্তব অর্থকে বোঝার চেষ্টা করি। আজ আমাদের চোখের সামনেই দুনিয়াটা পাল্টে যাচ্ছে। এক নতুন বিশ্ব-ব্যাপী আন্দোলনের প্রচণ্ড ঢেউ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মুছে যাচ্ছে পরিচিত মানচিত্র, পুরাতন দৃশ্যপট। হয় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে ঢেউয়ের সাথে, অথবা আলিঙ্গন জানাতে হবে অনিবার্য ধ্বংসকে।

* * *

কয়েক দিন পরে বেথুনের ডায়েরির পাতায় দেখতে পাওয়া যায়, তাড়াহুড়ো করে লেখা একটা জরুরী কাজের তালিকা :

"১. স্পেনের যুদ্ধের ওপর সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে...।

২. মন্তব্য সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য 'সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা' সম্পর্কিত লেখাটা নতুন করে 'টাইপ' করতে হবে।

৩. স্যানেটোরিয়াম থেকে ছাড়া পাওয়া রোগীদের পুনর্বাসনের জন্য যে আদর্শনগরের কথা ভাবা হচ্ছে, তার 'প্ল্যান' যাদের কাছে পাঠানো হবে তাদের নামের তালিকা তৈরী করতে হবে।

৪. বাচ্চা মেয়েটির অবস্থার সাথে মিল রয়েছে এমন কোন অভিজ্ঞতার কথা 'মেডিক্যাল লিটারেচারে' খুঁজে দেখতে হবে"

যুদ্ধ, রাজনীতির জটিল আবর্ত, ভেঙে পড়া জীবনকে আবার জোড়া দেওয়ার পরিকল্পনা, দুনিয়ার ভবিষ্যৎ এবং একটি শিশুর ভবিতব্য।

অন্য কারো চোখে ওপরের লেখাগুলো অদ্ভুত এবং সম্পর্কহীন বলে মনে হতে পারে। এক সময়ে বেথুন নিজেও লেখাগুলো এক সাথে না লিখে আলাদা আলাদা বিষয় হিসেবে সাজাতেন। কিন্তু এখন তাঁর কাছে এগুলো আর বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়—যেন একই সুতো দিয়ে বাঁধা পরস্পরের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া কিছু সমস্যার অখণ্ড বিন্যাস। এবং একই বিন্যাসের বিভিন্ন অথচ পরস্পর-আশ্রয়ী অংশের মতো সব কটা সমস্যাই একই সাথে চিন্তা ও কাজের দাবি জানাচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে বহু রাত্রি কাটিয়েছেন বেথুন একটা পুরো শহরের নক্সা বানাতে গিয়ে। 'চিলড্রেন্স আর্টস্কুল'-এর কর্মী শিক্ষিকা এবং শিল্পী-বন্ধু মারিয়ান

তাকে নক্সাগুলো দেখান বেথুন। তার পরিকল্পনার এমন একটা বিশেষ আবেদন ছিল যা স্থাপত্যবিদের শিল্পী-চোখে ধরা পড়ে। শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে বেথুন বান্ধবীকে প্রমাণ করে দেখান—কিভাবে সাধারণ মানুষের জন্য সবার মনোরম পরিবেশে আবাস গড়ে তোলা সম্ভব। সুন্দর ছোট্ট একটা বাড়ী—পিছনের দিকে থাকবে একটা বাগান আর জানলার ভেতর দিয়ে খেলা করে বেড়াবে সূর্যের আলো…।

কিন্তু তাঁর এই স্বপ্ন কল্পনাতেই থেকে গেল। কার্য-কারণের অনিবার্য শৃংখলে বাঁধা পড়ে, আগের বহু পরিকল্পনার মতো এই পরিকল্পনাটিও তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারলো না। একদিন জনৈক বন্ধু এই পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে খবরের কাগজটা খুলে 'হেড লাইনের' দিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বেথুন ; তাতে বড় বড় হরফে লেখা : INSURGENT PLANES BOMB MADRID. "আমার পরিকল্পনার যা ঘটেছে—তা হ'ল এই"—আত্মগতভাবে জবাব দেন বেথুন। 'যে শহর নিজের স্বপ্নকে মেলে ধরতে একবারের মতোও সুযোগ পেলো না, তার ধ্বংসাবশেষের তলায় চাপা পড়ে থাকছে ভবিষ্যতের অনেক শহর। আমার একটা বাচ্চা হাসপাতালে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। কেন জানো?—মানুষের ফুসফুস বস্তীর বিষাক্ত হাওয়া সহ্য করার মতো তৈরী হয়নি বলে। যদি আমি সেই মুমূর্ষু শিশুটির পক্ষ থেকে আমার একটা আর্জি নিয়ে অটোওয়ার 'কর্তাদের' গিয়ে বলি :—'এই হল একটা শহরের পরিকল্পনা—যেখানে আমার শিশুটি বাঁচতে পারে এবং নির্ভয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে,' তাহলে…কিন্তু কার কাছে আমি আর্জিটা রাখছি?—সেই লোকগুলোর কাছে, যারা একটা 'উদ্বেগহীন' বিবেক নিয়ে 'সুখকর' আহারের সামনে দু'বেলা বসছে এবং রোগে-ভরা শহরের কথা দূরে থাক, যে শহরগুলো বোমার আগুনে ঝলসে মরছে এমন কি সেগুলোর জন্যও একটা কানাকড়ির মূল্য দেয় না!"

তাই সমস্যাগুলো ভিন্ন হলেও আসলে একটাই : হাসপাতালের একটি মৃত্যুপথ যাত্রী শিশু—শিল্পী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীর স্বপ্ন—বোমা বর্ষণ—উদাসীন রাজনীতিবিদ—স্পেনের অসংখ্য শহর, যেগুলো এখন আকুলভাবে সাহায্য প্রার্থনা করছে সারা দুনিয়ার কাছে।

খবরের কাগজের সেই অভিশপ্ত হেড্‌লাইন এবং একটি শিশুর করুণ মুখ বার বার উঁকি দেয় বেথুনের স্মৃতিপথে। ফ্যাসিস্টরা এগিয়ে চলেছে মাদ্রিদের দিকে আর sacre coeur হাসপাতালের একটি রোগশয্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে এক নিষ্পাপ শিশু। শিশুটির মুখের দিকে তাকালে কিম্বা স্পেনের কোন মারাত্মক সংবাদ পেলে একই রকম তীব্র হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন বেথুন।

বেথুনের হতাশা সহকর্মীদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভীষণ অবাক হন তাঁরা। অবশেষে তাঁদের একজন মানসিক দুশ্চিন্তার কারণ জানতে চান বেথুনের কাছে। সহকর্মীর প্রশ্নের উত্তরে অন্যমনস্কভাবে জবাব দেন বেথুন, "আমার বাচ্চা মেয়েটার অবস্থা ভীষণ খারাপ। বাঁচানোর সম্ভাবনা খুবই কম।"

"দুঃখিত। আমি জানতাম না আপনার কোন ছেলেমেয়ে আছে।"

"না না, আমার নিজের নয়," অপ্রতিভভাবে জবাব দেন বেথুন, "একটা ছোট্ট মেয়ে…এই হাসপাতালেই রয়েছে। ভীষণ অসুস্থ…"

মেয়েটির নাম রেভ্‌টি। দশ বছরের একটি শিশু। মারা যাচ্ছে সে। তার বাবা ক্রেক ইস্ট এণ্ড-এর একজন গরীব দোকানী। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। হাসপাতালের অপরিচিত পরিবেশে নিজেদের বেখাপ্পা দুর্দশাগ্রস্ত চেহারাটা যে নিতান্তই বেমানান সেটা বুঝতে পেরে মানসিক স্থিরতা বজায় রাখার চেষ্টায় প্রাণান্ত হচ্ছিল তারা। কিন্তু বেথুনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজেদের আর সামলাতে পারলো না—কান্নায় ভেঙে পড়লো রেভ্‌টির বাবা-মা। এক বছর হল রেভ্‌টিকে তিলে তিলে মরে যেতে দেখেছে তারা। দামী ডাক্তারকে দেখানোর সঙ্গতি তাদের নেই। বাচ্চাটাকে তারা এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে নিয়ে ছুটেছে—কিন্তু কোন ফল হয় নি। এখন তারা শেষ চেষ্টা হিসেবে এসেছে বেথুনের কাছে। শুনেছে, তিনি বিরাট ডাক্তার, যিনি গরীবদের ঘরে যেতে সংকোচ বোধ করেন না, যিনি টাকা নেন না তাদের কাছ থেকে যাদের দেবার ক্ষমতা নেই, যিনি সবজায়গায় প্রকাশ্যভাবে বলেছেন—ধনীদের মতো গরীবদের স্বাস্থ্যও সমান মূল্যবান।

তীক্ষ্ণস্বরে রেভ্‌টির বাবা বলে, "বিশ্বাস করুন, আমরা দয়া চাইছি না। যা কিছু আমাদের আছে সমস্তই বিক্রি করে দেবো আমরা। শুধু আমাদের মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দিন"। ছেঁড়া-কাটা পোষাক পরা মা কোলে হাত রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে, "আমাদের একমাত্র সন্তান…ডাক্তারবাবু…"

ক্লিনিকে বেকারদের দীর্ঘ লাইনে বহুবার দাঁড়িয়েছে তারা—বিরক্ত ডাক্তারকে একটিবার দেখাবার প্রত্যাশা বুকে নিয়ে। বহু 'ডায়াগোনেসিস্' হয়েছে। কেউ বলেছেন "গোলমালটা পেটে, নিজের থেকেই সেরে যাবে।" অন্যজন বলেছেন, "শ্বাসঘটিত ব্যারাম—ব্রোঙ্কাইটিস, বিপজ্জনক কিছু নয়।" কেউ বলেছেন, "সাদী কাশি। আমি একটা কাশির ওষুধ দিচ্ছি, সেরে যাবে।" আবার কেউ বা রেভ্‌টির শীর্ণ বুক ও হাতের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠেছেন, "কি আশা করেন আপনি? অপুষ্টি।"

নরম্যান বেথুন/জিনজিগ

বাচ্চা মেয়েটিকে পরীক্ষা করলেন বেথুন। একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। বুক এক্স-রে করার নির্দেশ দিয়ে মেয়েটিকে শুইয়ে দিলেন বিছানায়।

"এক্স-রে নিলে কি ভালো হয়ে যাবে ডাক্তার বাবু?"—মেয়েটির বাবা আশান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

বেথুন কোনো জবাব না দিয়ে বাইরে নিয়ে আসেন তাদের। জোর করে আত্মবিশ্বাসের সুর গলায় এনে ব্যাখ্যা করেন—এক্স-রে নিলে বোঝা যাবে গন্ডগোল কোথায়। সম্পূর্ণ পরীক্ষা না করে আপাতত তিনি কোনো চিকিৎসা করবেন না। একজন নার্স এসে মেডটির বাবা-মাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন…

সন্ধ্যাবেলা চিন্তামগ্নভাবে বাড়ী ফিরলেন বেথুন। মেডটির গর্তে-ঢোকা কালো চোখ দুটোর স্মৃতি বিষাদাচ্ছন্ন করে তুলছে তাঁকে। এক্স-রে কি তাঁর আশঙ্কাকে সত্যি বলে প্রমাণিত করবে? প্রার্থনার মতো আকুলভাবে কামনা করেন বেথুন—যেন তা না হয়। একটা পূর্ব-প্রকাশিত, পরিণত ক্ষয়রোগও এর চাইতে অনেক অনেক ভালো।

দরজা খুলেই একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খান বেথুন। বাইরের যে ঘরটাতে শিশুদের ক্লাস হয় সেখানে কিছুক্ষণ আগে যেন ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেছে। বাচ্চাদের আঁকা ছবিগুলো কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড আক্রোশে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়েছে তাঁর অসমাপ্ত ভাস্কর্যগুলো। সুন্দর আসবাবপত্রগুলোর একটাও অক্ষত নেই। সমস্ত দেয়াল জুড়ে কালো স্বস্তিকার ছাপ- এখনো তা শুকোয় নি।

পুলিশে খবর দিলেন বেথুন। কয়েকজন গোয়েন্দা-পুলিশ তদন্ত করতে এসে প্রশ্ন করলেন, তাঁর কোনো ব্যক্তিগত শত্রু আছে কিনা। দেয়ালে আঁকা স্বস্তিকা চিহ্নগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন বেথুন, "ওগুলো দেখে কি কোনো 'ব্যক্তিগত শত্রুর' কাজ বলে মনে হচ্ছে আপনাদের?" ওঃ, হ্যাঁ…তাই তো! বুঝতে পেরেছে তারা। ঠিক আছে—তদন্ত করে দেখতে হবে। আর খুব ভালো হয়, আপাতত বেথুন যদি কোনো বন্ধুর সঙ্গে কয়েকটা দিন থাকেন—মানে একটু সাবধানে থাকা ভালো, এই আর কি? গোয়েন্দারা বিদায় নেয়। তাদের উদ্দেশ্য করে পেছনে থেকে চেঁচিয়ে বলেন বেথুন, "স্থানীয় ঝটিকা বাহিনীর* আখড়াগুলো একটু খোঁজ করলেই ওই হারামজাদাগুলোর সম্বন্ধে বেশ কিছু খবর জানতে পারবেন আপনারা।" তিনি জানতেন, তদন্তের এখানেই সমাপ্তি—এরপর আর পুলিশের কাছ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাবে না।

পরের দিন সকালবেলা হাসপাতালে গিয়ে তাঁর আশঙ্কা যে সত্যি—তার প্রমাণ পেলেন বেথুন। এক্স-রে প্লেট থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল, মেডটির ডানদিকের গোটা ফুসফুসটাই পুঁজে ভর্তি হয়ে ফুলে উঠেছে। গভীর মনযোগ দিয়ে প্লেটটা পরীক্ষা করলেন বেথুন। তারপর ডাঃ দেশারিসকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। ফটোর দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়েন দেশারিস। সহকারীর দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন বেথুন, "এই ফুসফুস নিয়ে মেয়েটি বাঁচতে পারবে না। বাঁচতে হলে, ফুসফুসটাকে সরানো দরকার।"

"আর আপনি কি তাই করার চেষ্টা করবেন?" বেথুন নড়ে চড়ে বসেন চেয়ারে। "জানি না…এখনো কিছু ঠিক করে উঠতে পারছি না।" তারপর অকস্মাৎ ক্রোধে ফেটে পড়েন তিনি, "কি জঘন্য, নোংরা একটা ব্যাপার।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করতে শুরু করেন বেথুন। এক বছর আগে হলে সহজে সুস্থ করে তোলা যেতো মেয়েটাকে এখন একটা পয়সা ছুঁড়ে হেড-টেল করার মতো! যদি অপারেশন করতে গিয়ে মারা যায় তা হলে সবাই বলবে মেয়েটিকে তিনিই হত্যা করেছেন। কিন্তু আসল হত্যাকারীটা কে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব ডাক্তারের নয়। কিন্তু তাই কি? না, তা নয়। এর উত্তরটা ডাক্তারকেই দিতে হবে। "আমি বলবো কে একে খুন করেছে। তুমি আমি, আমরা সবাই—যারা পৃথিবী রসাতলে গেলেও নিজের সংকীর্ণ রাস্তা থেকে এক চুলও সরে আসি না…" আচ্ছন্নের মতো পায়চারী করে বেড়ান বেথুন। কিছুক্ষণ পড়ে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে নির্দেশ দেন সহকারীদের, "ঠিক আছে, কালকের জন্য অপারেশন থিয়েটার তৈরী রেখো…যদি দরকারে লাগে…"

সারা সন্ধ্যা একা ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেথুন। অপারেশন করাটা কি ঠিক হবে? তিনি করতে পারবেন তো? ফুসফুসকে চুপসে দেওয়াটা খুব সোজা ব্যাপার—সব জায়গাতেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাকে বুক থেকে সরিয়ে ফেলা! অবশ্য কয়েক বছর আগে নিসেন (Nissen) বার্লিনে এ ধরনের অপারেশন করেছেন। খুব সম্ভব মোট ২০ টার মতো এ জাতীয় অপারেশন এ যাবৎ করা হয়েছে। কিন্তু দশ বছরের শিশুর ওপর করা হয়নি কখনো। 'শক'

*Storm Troopers, স্থানীয় গোপন ফ্যাসিস্ট সংগঠন—ফ্যাসিবাদের প্রচার ছাড়াও যাদের কাজ ছিল ফ্যাসি-বিরোধী নির্ভিক গণতান্ত্রিক মানুষদের ভীতি প্রদর্শন করা বা প্রয়োজন হলে গুপ্ত হত্যা করা।

সামলাতে পারবে তো? এধরণের পরীক্ষা করার কোনো অধিকার কি তাঁর আছে?

আবার শতাব্দীর পুরনো সেই প্রশ্নটা শানিত বর্শার মতো উঠে এসে বিদ্ধ করে তাঁকে: মৃত্যু হতে পারে জেনেও অপারেশন করে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করা, না কি কোনো কিছু না করে মরতে দেওয়া—কোনটা ঠিক?

সহসা নিজের বোকামির জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বেথুন। কি অদ্ভুত যুক্তি দিচ্ছিলেন তিনি? নিজে যখন কৃত্রিম নিউমোথোরাক্স দাবি করেছিলেন, তখন কি তিনি একই রকম অর্থহীন সতর্কতার মুখোমুখি হন নি! তা হলে কি তিনি ভয় পাচ্ছেন?

ভোর চারটে বাজে। মনস্থির করে ফেলেছেন বেথুন। তিনি ভীষণভাবে চান—য়েভ্‌টি বেঁচে উঠুক। আর এর অর্থ হ'ল, যে কোনো পরিণতির জন্য তাঁকে সাহস রাখতে হবে। তা না হ'লে, আজ পর্যন্ত তিনি যা কিছু বলেছেন, লিখেছেন বা প্রয়োগে রূপ দিয়েছেন—সব কিছুই একটা পর্বত প্রমাণ ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুয়ে পড়লেন বেথুন। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। মনের মধ্যে ছবির মতো সুস্পষ্ট আঁকা হয়ে থাকলো অপারেশনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি, পাঁজর, প্ল্যুরাল ব্যাগ, ফুসফুস, ব্রঙ্কিয়াল টিউব, ধমনীর জাল···বেলা আটটায় ঘুম ভেঙে গেল বেথুনের। বুঝতে পারলেন, মনের মধ্যে সেই 'শক্ত' অনুভূতিটা ফিরে এসেছে—যা তাঁকে দুপুর পর্যন্ত ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ রাখবে।

পোষাক পরে প্রথমেই বেথুন ঢুকলেন খুব বড় একটা দোকানে। তারপর সব চাইতে বড় পুতুলটা কিনে হাসপাতালে য়েভ্‌টির পাশে শুইয়ে দিয়ে অপারেশনের শেষ নির্দেশগুলো জানিয়ে দিলেন সহকারীদের।

'গাউন' ও 'মাস্ক' পরে বেথুন যখন অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলেন, য়েভ্‌টি তখন নতুন পুতুলটাকে জড়িয়ে ধরে অ্যানাস্থেশিয়ার নেশায় ধীরে ধীরে চেতনা হারাচ্ছে। চেষ্ট-রেষ্টের ওপর বুকের ভর রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে য়েভ্‌টি। মাথাটা একদিকে হেলানো। ঠোঁটের একটা পাশ অল্প ফাঁক হয়ে আছে। অপারেশনের সংবাদটা হাসপাতালের চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। ডাক্তারদের ভীড়ে বোঝাই হয়ে গেছে ঘরটা। মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্ত Sacre Coeur হাসপাতালে কোনো রকম সার্জারী হত না। আর আজ 'চীফ' এমন একটা অপারেশন করতে যাচ্ছেন, যা গোটা দেশে কেউ করতে সাহস পায়নি। সহকারী, ডাক্তার এবং দর্শকদের স্নায়ু উত্তেজিত প্রতীক্ষায় টান-টান হয়ে আছে। তরুণ শিক্ষার্থী ডাক্তাররা একে অপরকে ফিস্‌ফিস করে জানিয়ে দিচ্ছে "Le Chef, আজকে একটা 'অটোপ্সি' করবেন।"

অ্যানেস্থেটিস্ট শেষবারের মতো দেখে নিলেন, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। ফার্স্ট সিস্টার চাদরটা সরিয়ে নিলেন। য়েভ্‌টির সরু পিঠ, করুণ, শীর্ণ কাঁধের হাড় দুটোর দিকে তাকালেন বেথুন। সার্জারীর ছুরিটা হাত দিয়ে অনুভব করলেন। থমকে দাঁড়ালেন একটা মুহূর্ত। ওই ওখানে, ডান কাঁধের নীচে একটু পাশের দিকে ঢুকবে তাঁর ছুরিখানা। অগনুতি মানুষের ভীড়ে ভর্তি অপারেশন থিয়েটারের ছবি ধীরে ধীরে মুছে যায় বেথুনের চোখ থেকে। যে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দোল খেতে খেতে ভেসে চলেছে য়েভ্‌টি, তারই ভেতর দিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলে তাঁর একাগ্র চিন্তা।

মনে মনে বলেন বেথুন, "অন্ধকার এখন তোমাকে আঁকড়ে ধরে আছে য়েভ্‌টি। কিন্তু আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনবো বসন্তের সূর্যালোকে!"

ভাখো, কতো লোক দেখতে এসেছে তোমাকে? ওরা আমার হাত দুটোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো কখনো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে ভীষণ অসুবিধা হয় আমার। শুধুমাত্র হাত দুখানা দিয়েই তো আমি অনুসন্ধানী ছুরিটাতে চাপ দিই না; অন্য কিছু দিয়ে করে থাকি—এমন একটা জিনিস দিয়ে যা প্রচণ্ড শক্তিশালী, দৃঢ়তায় উদ্ধত, মায়ের গর্ভেই যা আমার সাথে জন্মেছিল, যা সর্বত্র আক্রান্ত হয়েছে—লাঞ্ছনা খেয়েছে কিন্তু তবুও সত্তার গভীরে আঁকড়ে ধরে আছে আমাকে। এটাকে মনে রেখো য়েভ্‌টি। যখন তীব্র যন্ত্রণার জোয়ার আসবে আর তোমার কচি মন ঠিক মতো বুঝতে পারবে না কেন তোমার ডাক্তার তোমার ওপর এমনটা করলো—তখন একবারটি একে মনে করো। আমি এই কাজটা করছি তোমাকে ভালোবাসি বলে—যে পবিত্র আবেগময় শব্দটা ওরা নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে দিতে চাইছে দুনিয়া থেকে, যেমন নিষ্ঠুরতার সাথে সরিয়ে দিতে চাইছে তোমায়।

এখন 'রিট্রাক্টারের' (Retractors) পালা।—কৃত্রিম, ধাতব হাত যা দানবীয় ক্ষীপ্রতায় 'কোস্টাল সিথ' (Costal Sheath) টেনে ফাঁক করে ধরবে।

মরুভূমির প্রাকাণ্ডগুহা থেকে তৈরী মদের মতো যে গাঢ় রক্তস্রোত তরল গড়িয়ে আসছে—মুছে ফেলো ওটা। এই তো এখানে পাঁজরের হাড়গুলো; কি অদ্ভুতভাবে বাঁকানো কিন্তু কতো সুন্দর! এবার 'রিব

শিয়ার্স' (Rib Shears) তার কাজ করবে—দৃঢ়, শক্তিশালী—পরিষ্কারভাবে কেটে যাবে।···তারপর প্ল্যুরা, আর যে ছবিটা আমি সকাল থেকে মনের ভেতরে বয়ে বেড়াচ্ছি সেই ক্যানভাসটার মতো, সব কিছু নিজেকে মেলে ধরবে আমার চোখের সামনে।

এবার খুব হুঁশিয়ার! আগের পর্যটুকু নেহাৎ প্রবেশের প্রস্তুতি ছিল। এখন আমরা খোলা ফুসফুসের ওপর হাত রাখছি—নরম একটা শিশু যেখানে চুঁইয়ে-ঢোকা পুঁজ বহুদিন আগেই জীবনের বাতিটাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে। এখানে আর কোনো আশা নেই। একে বেরিয়ে আসতেই হবে।

হুঁশিয়ার! ফুসফুস আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। কিন্তু এখনো ওটা আঘাত করতে পারে। দুষ্ট ক্ষত জীবন্ত টিস্যুগুলোকে ঘিরে ফেলেছে। সারা দুনিয়া জুড়েও তাই—তীব্র আকুলতায় যা কিছু জীবনের আলো দেখতে চাইছে, তারই মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত ধুলো। এখনও ওটা হিংস্র এবং প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা রাখে।

সাবধান! এটাই হ'ল সত্যিকারের প্রতিযোগিতা। 'অ্যাড্-হিশনে'র (Adhesion) ভেতর দিয়ে কাটো। যে রক্ত বেরিয়ে আসছে এখন, পৃথিবীর কোনো মদই তার মতো দেখতে নয়। উঃ! কাটা-মাংসের ভেতর দিয়ে মৃত্যু যখন বারবার ভেংচি কাটছে তখন মোটে এই দুখানা মাত্র হাত?

কি? ওঃ হ্যাঁ, নাড়ী খুব আস্তে চলছে। অক্সিজেন! প্রথম ফুসফুসটা 'কেভিটি'তে (Cavity) অর্ধেক কাটা অবস্থায় রয়েছে। আর হার্ট'এর মধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতির কর্মক্ষমতা আরো বাড়িয়ে তুলবো আমরা। আরো বেশি অক্সিজেন! জলদি ..

কটা বাজে? ইস্, অনেক সময় চলে গেছে!

"আরো অক্সিজেন!"

ইস্পাতের মতো শক্ত হও এখন।

এবার তোমার একটি মাত্র ফুসফুসে হাওয়া ঢুকছে মেয়েটি। এই মুহূর্ত থেকে তোমার একটি মাত্র ফুসফুসই অক্সিজেনের স্বাদ পাবে।

এখন তোমার বাঁচার কামনা করতে হবে মেয়েটি। এক্ষুনি এবং এর পরেও, কারণ আকাঙ্খা ছাড়া জীবন হয় না।

তীব্রভাবে বাঁচার কামনা করো, আর তাহলেই আমরা সেই খুনীদের মুখে থু থু ছিটিয়ে দিতে পারবো—যারা আমার ঘর ভেঙে ঢুকেছে...ঘর ভাঙতে চাইছে আমার সন্তানদের!

'ফুলকালো কল'-এর চিহ্ন তারা ফেলে দিচ্ছে আকাশ থেকে শিশুদের মাথার ওপর। শয়তানের গলায় চিৎকার করছে তারা: তোমার বেঁচে থাকার কোনো বিশেষ অধিকার নেই। রক্তপায়ী বাদুড়ের ডানা থেকে তারা ঝরিয়ে যাচ্ছে বোমা। ধ্বংসকে পুজো করছে ফুলের মতো।

কিন্তু এখানে তাদের জবাব দিচ্ছি আমরা। প্রতিটি যন্ত্রণাময় নিশ্বাসের সাথে আমরা তাদের মৃত্যুপূজার জবাব দিচ্ছি। এই জবাব দিতে যদি কখনো ব্যর্থ হই, তাহলে আর কোনো শিশু থাকবে না, থাকবে না কোনো হাসি—দুঃস্বপ্নের মতো পড়ে থাকবে তাদের ভয়ংকর নরকের আগুনে-ফুল—বস্তি আর বোমার গর্ত···

এই তো হয়ে গেছে।

এখন মুক্ত তুমি। ছুতোরের কাজ দেখতে যে-সব ভদ্রলোকেরা এখানে এসেছিলেন তাঁরা সবাই খুশী। কিন্তু আমি শুধু তাকিয়ে দেখছি, মিটমিটে জীবনের আলোটা কিভাবে ফুটে উঠছে তোমার মুখে! নব-সঞ্চালিত সেই জীবন ঠেলে তুলছে 'টিউবের' পারদ-স্তম্ভটাকে, যা এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত বোমার থেকেও ভারী।

অসভ্যের শূন্যতার প্ল্যুরাটা কি রকম হাঁ করে আছে। হৃদ্‌পিণ্ড, ডিসেরা এবং বাম ফুসফুসটা একটু পরেই এই শূন্যতা পূরণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। এখন কাজটা হ'ল, এই জটিল অরণ্যের ফাঁক দিয়ে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা। জীবন অবিভাজ্য: শিরা-ধমনী—স্নায়ুর লতানো ঝোপে আলাদা আলাদা শয়তানীর চক্রান্ত লুকিয়ে আছে। সব চাইতে নগণ্য অংশটাকেও চূড়ান্ত যত্ন দিয়ে তুষ্ট করতে হবে।

এবার যন্ত্রণার কাতর হাঁ-করা ফাঁকটা সোজাই হয়ে গেল। রিট্রাক্-টারগুলো আহত টিস্যুকে ছেড়ে দিচ্ছে। আর সূক্ষ্ম ছুঁচটা পরম ক্ষমতায় জুড়ে দিচ্ছে পরম সুকুমার মাংস...

অপারেশনের কয়েক ঘন্টা পরে জল চাইলো মেয়েটি। এক টুকরো ভেজা কাপড় সযত্নে তার ঠোঁটদুটোর ওপর বুলিয়ে দিলেন বেথুন।

বারান্দায় আশা ও আশঙ্কা বুকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মেয়েটির বাবা-মা। বাইরে বেরিয়ে আসেন বেথুন: "ভয় নেই, ও সেরে উঠবে।" এক মুহূর্ত বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন বাবা। তারপর অসহ্য আবেগে জড়িয়ে ধরলেন ডাক্তারকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মা।

সেই রাত্রে ক্লান্ত, উৎফুল্ল বেথুন একটা ছোট্ট চিঠি লিখলেন শিল্পী-বন্ধু দারিয়ান কটকে:

আমার মেয়ে ভালো আছে। খুব চমৎকার অপারেশন হয়েছে। কয়েকটা খারাপ মুহূর্তের কথা বাদ দিলে—কাজটা করে ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। ডানদিকের পুরো ফুসফুসটা বার করে দিতে হয়েছে—কানাডায় দশ বছরের শিশুর ওপর এজাতীয় অপারেশন এই প্রথম...খুব চমৎকার তাই না? কালকের রাতটা ভীষণ বিচ্ছিরিভাবে কেটেছে—করতে পারবো কি পারবো না তা নয়, করা উচিৎ হবে কি না তাই ভেবে···কিন্তু এখন তো আমার বাচ্চা সম্পূর্ণ নিরাপদ...আর তাই, প্রচুর ঘুমুবো আজকে।

শুভরাত্রি—

—বেথ

মেয়েটির অপারেশনের এক সপ্তাহ পরে অপ্রত্যাশিতভাবে বেথুনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এলেন এক ব্যক্তি—'এইড্ স্প্যানিশ ডেমো-ক্রাসি' কমিটির জনৈক মুখপাত্র। কমিটির প্রধান কার্যালয় খোলা হয়েছে টরন্টোতে। চেয়ারম্যান—রেভারেণ্ড বেন স্পেন্স। সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন কিছু মিশনারী সন্ন্যাসী, শ্রমিক নেতা এবং গণ্যমান্য নাগরিক। স্প্যানিশ রিপাব্লিককে সাহায্য করার প্রথম ধাপ হিসেবে কমিটি ঠিক করেছে, কানাডার জনসাধারনের অর্থ-সাহায্যে একটা মেডিক্যাল ইউনিট পাঠানো হবে মাদ্রিদে। আর কমিটি এই মর্মে একমত যে এই ইউনিটকে নেতৃত্ব দেবার মতো এক জনই আছেন কানাডায়—ডাঃ-নরম্যান বেথুন।

আগন্তুক বিদায় নিয়েছেন। গভীর চিন্তায় ডুবে যান বেথুন। অন্যমনস্কভাবে গিয়ে বসেন ডেস্কের সামনে। তারপর একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করেন:

"স্পেন? গত সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল—শিশুটির ওপর অপারেশন করবো কিনা? এখন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে—স্পেনে যাবো, কি যাবো না। আমি বিস্মিত, সম্মানিত—এবং বিহ্বল। আমি কি উপযুক্ত? আমি কি প্রস্তুত? গতকালের উত্তরগুলো নতুন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে আজকে। আর আগামীকাল—? সময় কিভাবে আমাদের ওপর নিষ্ঠুর অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়!

মনস্থির করার জন্ত 'এইড্ স্পেন কমিটি' বেথুনকে সময় দিলেও, স্পেনের যুদ্ধ কিন্তু একটুও সময় দিতে চায় না। 'ন্যাশনালিস্ট' বাহিনীর** অবরোধ এবং মাদ্রিদের দিকে ফ্যাসিস্টদের এগিয়ে আসার বেশি বেশি খবর আসতে থাকে প্রতিদিন। কি করবেন তিনি? খুবই কঠিন প্রশ্ন। টি. বি-কে নির্মূল করার যে সমস্যা শত শত বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছিল তার সাথে নয় বছর ধরে লড়াই করেছেন তিনি। এবং তাঁর অনুমান, একটা সমাধানের ইংগিতও দেখতে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু এর জন্ত চাই আরো বেশি পরিশ্রম, অধ্যবসায়, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, অনবরত লাগানোর জন্ত সংস্কারমুক্ত এক পদ্ধতি। এই শুরু-করা প্রক্রিয়াকে বিসর্জন দেওয়া কি ঠিক হবে? তাছাড়া, তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা? ধরা যাক তিনি স্পেন-এ গেলেন? কিন্তু পরে কোথায় থাকবেন তিনি? এখন তাঁর বয়স ৪৬; সার্জন হিসেবে সাধনে আর বেশি সময় নেই। ৩৯ বছর বয়সে থোরাসিক সার্জারি সবে মাত্র শুরু করেছেন তিনি, যে বয়সটায় সাধারণ ডাক্তাররা তাদের প্রতিষ্ঠাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যায়!

এখন তিনি Sacre Coeur হাসপাতালে থোরাসিক সার্জারির প্রধান, ডমিনিয়ন ডিপার্টমেন্ট অব পেনসনস্ অ্যাণ্ড ন্যাশনাল হেল্থ-এর কনসাল্টিং সার্জন, কনসাল্টিং সার্জন—মাউন্ট সিনাই স্যানেটো-রিয়াম এবং গ্রেস ডার্ট হোম হসপিটালের। তিনি এখন তাঁর পেশার সব চাইতে উপার্জনশীল ব্যক্তিদের একজন। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আসেন Sacre Coeur হাসপাতালে—তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে। বহু ডাক্তার, যাঁরা এখন কানাডা ও আমেরিকায় থোরাসিক সার্জন হিসেবে চিকিৎসা করছেন, তাঁরা সবাই তাঁর ছাত্র। এখন তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সর্বোচ্চ সংস্থা—'কাউন্সিল অব দি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর থোরাসিক সার্জারি'র একজন পদস্থ সদস্য। আগে যাঁদের তিনি নিজের নায়ক বলে ভাবতেন তাঁরাই এখন বেথুনের দিকে তাকিয়ে থাকেন সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায়। এ সমস্ত কিছু এবং সম্ভবত থোরাসিক সার্জন হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার সমস্ত স্বপ্ন ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে তাঁকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। বেথুন প্রশ্ন করেন নিজেকে: কোন সেই বিন্দু, যেখানে ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলো বৃহত্তর বিচারের সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়?

কিন্তু বৃহত্তর প্রয়োজন তাঁকে ব্যক্তিগত পাওয়া-না-পাওয়ার মাপ-কাঠিতে ভেবে দেখার সুযোগ দিল না। স্পেন থেকে সাহায্যের ডাক আরো তীব্র, জরুরী হয়ে উঠলো। বাইরের সাকল্যে দেশীয় ফ্যাসি-স্টরা খোলাখুলিভাবে নেমে পড়তে লাগলো রাস্তায়। ফ্রাঙ্কো মাদ্রিদের দিকে এগুনোর সাথে সাথে আক্রান্ত হ'ল মন্ট্রিলের ইহুদী নাগরিকেরা। লুঠ হতে লাগলো ইহুদীদের দোকান। ছড়িয়ে পড়তে

** সেনাদলের যে অংশ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর সাথে যোগ না দিয়ে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্ত লড়াই করছে।

ম্যাপসে।—বার্লিন থেকে আমদানী করা ফ্যাসিস্ট প্রচার। "পাগলামীটা ভীষণ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে"—বন্ধুদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কখনো কখনো ক্রোধে ফেটে পড়েন বেথুন, ওরা জার্মানীতে শুরু করেছে, শুরু করেছে জাপানে; আর এখন স্পেনে। চারদিক থেকে খোলাখুলি তাড়ে বেরিয়ে লাগছে ওরা। স্পেনে যদি আমরা ওদের না ঠেকাই—চেষ্টা করলে হয়তো যেটা এখনো সম্ভব, ওরা গোটা দুনিয়াটাকে একটা কসাইখানায় পরিণত করবে।"

এক দিন রাত্রে জানলার পাশে একা দাঁড়িয়ে আছেন বেথুন। তাকিয়ে আছেন নীচের 'স্কোয়ার'টার দিকে। সময় গড়িয়ে যায়। অনেকক্ষণ পরে ডেস্কের সামনে ফিরে এসে কয়েকটা কাগজ টেনে নিয়ে দ্রুত চোখ বোলান বেথুন। একটা পদত্যাগপত্র লেখেন কর্তৃপক্ষের কাছে। তারপর খসড়া করেন উইল-এর। যতদিন না চিলড্রেনস আর্ট স্কুল সাধারণের থেকে নিজেকে চালাবার মতো অর্থ সাহায্য না পাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নিয়মিত টাকা নিতে পারবে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে। তাঁর আর্থিক ব্যাপার পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকবে ফ্রান্সেসের হাতে। যদি তাঁর মৃত্যু হয়, সেক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ফ্রান্সেসই পাবেন।

ঘুমোতে গেলেন বেথুন। ডেস্কের উপর পড়ে থাকলো একটা টাইপ করা কবিতা:

আর আজো সেই রক্তহীন চাঁদ
শান্ত পরিচ্ছন্নভাবে উঠে আসে—
পাণ্ডুর যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট আমাদের দৃষ্টির দর্পণে,
উঠে আসে কানাডার হিমেল আকাশে।
কাল রাত্রে স্পেনের আকাশে
বিধ্বস্ত পাহাড় ছুঁয়ে হিংস্র মাদ্রিদের
সেই চাঁদ উঠেছিল—
মৃতদের রক্তমাখা মুখ এঁকে রূপোলি থালায়।
(সেই) পাণ্ডুর চাঁদের প্রতি উত্তোলিত রুদ্ধ মুষ্টি
কঠিন এ প্রতিজ্ঞা আমার
সেই সব নামহীন মৃতদের প্রতি
এ আমার পুনরঙ্গিকার—
যে সব কমরেড আজ মৃত প্রাণ সক্রোধে একাকী
গেয়ে গেলে জীবনের গান
আমার সত্তার সাথে—আমারি হৃদয়ে রবে
তোমাদের মৃত্যুহীন প্রাণ।

তিন সপ্তাহ পরে স্পেনের পথে পা বাড়ালেন বেথুন। শুরু হ'ল বেথুনের সংগ্রামী জীবনের নতুন অধ্যায়—এক ঐতিহাসিক দৃপ্ত, দীর্ঘ পদক্ষেপ।

(ক্রমশ)

**● শিক্ষাকে দেশগঠনের উপযোগী করে তোলো … দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্খার সাথে শিক্ষার সমন্বয় সাধন করো … শিক্ষা সর্বজনলভ্য হোক … শিক্ষা মহৎ, পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টির মাধ্যম হোক…**

ব্রিটিশরা চলে যাবার পর থেকে তাদের প্রবর্তিত (ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার পরিপূরক) শিক্ষাব্যবস্থার অগৌরবময় ধারার অবসান কল্পে দেশের মানুষরা নানা সময়ে নানাভাবে দেশ ও জাতির "কর্ণধার"দের কাছে এই দাবিগুলি রেখে আসছেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ, ভিতটাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, কাঠামোতে কিছু সংস্কার (এগারো ক্লাসের ইস্কুল আর তিন বছরের ডিগ্রী পাঠক্রম চালু) করা হয়েছিল। জাতির দাবিও সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়েছিল। কিন্তু ষাটের দশকের শেষ দিকে শিক্ষার গোটা ভিতটাই কেঁপে ওঠে। কারণ চাকরী নেই। গোটা ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবি ওঠে। কেরাণী তৈরীর কারখানাগুলি পরিণত হয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পিঠস্থানে। অবস্থার সামাল দিতে নানা মুনি নানা দাওয়াই বাতলালেন। সর্বশেষ দাওয়াই হিসাবে দেশবাসীর সামনে এলো আর একটি পাঠ্যসূচী—১৯৭৪-এর নতুন সিলেবাস।

সঙ্গত কারণেই ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক এবং দেশবাসী সকলের মনেই প্রশ্ন উঠছে—এই পাঠ্যসূচী উপরোক্ত লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে তো। নাকি পাঁচ/দশ বছরের মাথায়, নতুন করে সামাল দেওয়ার জন্য, আবার একটা সিলেবাসের আবির্ভাব হবে।

নীচের রচনাটিতে লেখক এই জিজ্ঞাসারই জবাব অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। রচনায় প্রকাশিত মতামত তাঁর নিজের। আমরা চাই—এই রচনাটিকে কেন্দ্রে করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং প্রচলিত শিক্ষানীতির উপর বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত হোক—সঃ মঃ বীঃ ●

# ন তু ন সি লে বা স

এ ক টি আ লো চ না

প্র বী র পা ল

১৯৭৪ থেকে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এগারো বছরের শিক্ষাব্যবস্থা উঠে গিয়ে আবার দশ বছরের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটা সিলেবাসও (১ম খণ্ড) পাওয়া গেছে। খুব সম্ভবত অধিকাংশ অভিভাবক, ছাত্র এমনকি অনেক শিক্ষকের পক্ষেও জানা সম্ভব হয়নি—কি পরিবর্তন হ'ল। আর কেন এই পরিবর্তন, সেকথা জানেন একমাত্র এর স্রষ্টারা। সাধারণের অগোচরে থেকে গেছে এর রহস্য। সিলেবাসের বইটিতে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয় পড়াবার একটা উদ্দেশ্যের কথা লেখা থাকলেও সামগ্রিকভাবে এই পরিবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি হবে তার ব্যাখ্যা কোথাও পাইনি—সুতরাং একথা বলতে বাধা নেই—এই শিক্ষা লক্ষ্যহীন এবং উদ্দেশ্যবিহীন। জানি না ফল লাভ দেখে পরে এর উদ্দেশ্য ঠিক হবে কিনা। অথচ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়াই একটা কাঠামো স্থির হয়ে গেল; যে কাঠামো ছিল তাকে ভেঙে ফেলার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ দেখান নেই, যা গড়া হ'ল তারও কোনও লক্ষ্য স্থির নেই—"মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠিত রূপ"-এর মলাট নিয়ে স্কুলের দরজায় দরজায় ৭৪ এর জানুয়ারী থেকে নতুন হুকুমনামা বলবৎ হ'ল। সিলেবাসের বইটি খুললে এর ভেতরে এই নতুন ব্যবস্থার আরও দুটো 'ব্যাখ্যান' পাওয়া যাবে—(১) "সংশোধিত কাঠামোগত রূপ অনুযায়ী পুর্নগঠিত" (পৃষ্ঠা ৩) এবং (২) "মাধ্যমিক শিক্ষার অনুমোদিত রূপ" (পৃষ্ঠা ৫)। অর্থাৎ কর্তারা দিশেহারা হয়ে কিছুতেই আর নবজাতকের একটি নাম নির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না। কারণটা কি? অদ্ভুত এবং অভিনব বলে, নাকি এমনই অতুলনীয় সৃষ্টি যে তাঁর নামকরণ সম্ভব নয়, কোনও নামেই একে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। হয়ত বা ভাষাজ্ঞানের অভাবও হতে পারে। কারণ মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ওঁরাই বলেছেন—"ভাষার উপর সাবলীল অধিকার ছাড়া চিন্তার যথাযথ প্রকাশ বা মনের ভাবের স্বচ্ছতা কখনই সম্ভব নয়।" আমাদের ধারণা সর্বশেষে উল্লিখিত নামটিই যথাযথ (যদি ছাপার ভুল না হয়)—কর্তারা অনুমোদন করলে মেনে না নেয় কার এমন বুকের পাটা আছে? বিশেষ করে যদি চালাও পাঠ্যপুস্তক রচনার আর 'নাফা' লুটোবার পদ্ধতি পরিষ্কার থাকে, তবে তো কথাই নেই। বহু প্রগতিশীল খ্যাতিমান ব্যক্তির এবং প্রতিষ্ঠানের নামই তো দেখছি পাঠ্যপুস্তকের উপর জ্বল-জ্বল করছে। এর মধ্যে আবার এক প্রগতিশীল শিক্ষক-সংস্থাকে

দেখছি পুরো দাম ছাত্রদের কাছে আদায় করে নিয়ে হাফ বই গছিয়ে দিয়েছেন, বাকীটা রেশনের চাল-গম-চিনির মতো 'ডিউ' থাকল। আমাদের এ অভিজ্ঞতা আছে যে আমাদের দেশে বহু আজগুবি জিনিসের মতোই বিনা প্রয়োজনে শুধু পরিবর্তনের খাতিরেই পরিবর্তন ঘটে, শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন অদূরদর্শী আমলাতন্ত্রী ব্যক্তির ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীতে, নয়ত সচেতন ষড়যন্ত্রকারীর অপচেষ্টায়। তাই কোনও জিনিষ চেয়ে চেয়েও মেলে না, আবার না চাইতেই অপুষ্ট দুর্বল দেশে টি. বি. রোগে ধরে (যেন মাঠে-ঘাটে মিছিলে জনতার দাবি এটাই)।

আমরা জানি অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করেই এই সিলেবাস রচিত হয়েছে। এই সিলেবাসকে কেউ বলেছেন 'অবৈজ্ঞানিক'; বাস্তব-ভিত্তিক বা জীবন কেন্দ্রিক নয় বলেছেন কেউ। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা উৎপাদনমুখী নয় বলেও কঠোর সমালোচনাও হয়েছে। যে দেশে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাটাই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সেখানে উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হবে চিন্তার বিষয়। আমরা কিন্তু বিশেষজ্ঞের চোখে দেখছি না—দেখছি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, ছাত্রদের ক্ষমতা ও অগণিত সমস্যাপীড়িত অভিভাবকদের এবং আর্থিক সঙ্কট জর্জরিত বেশিরভাগ বিদ্যালয়গুলির দিক থেকে বিবেচনা করে। এগারো বছরের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ছাত্রদের পক্ষে বোঝা স্বরূপ—সুতরাং নতুন ব্যবস্থায় ছাত্রদের কাঁধ থেকে বোঝা কতটা নেমেছে দেখতে গেলে দেখা যাবে এই নতুন ব্যবস্থাও ভাষা ও বিষয় ভারাক্রান্ত এবং পুঁথি-সর্বস্ব জ্ঞান এবং মুখস্থ বিদ্যাকেই প্রশ্রয় দেবে। একথা অত্যন্ত সত্য যে, যে-শিক্ষাব্যবস্থা পুঁথি নির্ভর এবং মুখস্থ করার প্রবণতাকে উৎসাহিত করে—তা ছাত্রের কাছে বিরক্তিকর এবং তার জ্ঞান-পিপাসা চিরতরে লুপ্ত করার সাহায্যকারী এবং শিক্ষকের কাছেও সে ব্যবস্থা আনন্দহীন এবং যোগ্যতা অপহরণকারী। বোর্ডের প্রকাশিত সিলেবাসের বইটি থেকে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে এখানে আলোচনা করলে দেখা যাবে পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এই সিলেবাসের পিছনের দৃষ্টিভঙ্গীর এতটুকু পার্থক্যও নেই—পরিবর্তনের জন্যই এই পরিবর্তন।

মাতৃভাষায় নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য নম্বর রাখা হয়েছে ২০০। মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার থেকে দু'একটি লাইন উদ্ধৃত করছি—"ভাষা ভাবচিন্তার ধারক এবং ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই অনুভূতি, মনোভাব, রূপকল্পনা মৌখিক লিখিত বা অন্যান্য অন্য প্রকার প্রকাশের ভিতর দিয়া যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে।" ভাষার অন্য প্রকার প্রকাশটি কি জানতে ইচ্ছে করে। আর একটি উদ্ধৃতি দিই—"ভাষার মাধ্যমেই শিশুকে তাহার দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তাভাবনার সহিত পরিচিত করানো হয়।"—এই দুটি ক্ষেত্রে "প্রধানতঃ" কথাটা ব্যবহার করা উচিত। কারণ একটি নির্বাক চি[ত্র] বা মূর্তিও অনুভূতি, ভাবনাচিন্তাকে পরিস্ফুট, প্রভাবিত এ[বং] সঞ্চারিত করতে পারে। খুব সম্ভবত পুঁথিসর্বস্ব সিলেবাস রচয়িতার[া] সেটা মন থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করেছেন। সুতরাং এঁদে[র] অনুমোদিত এবং পরিকল্পিত পাঠ্যপুস্তকগুলি শিশুর কাছে কত[টা] আকর্ষণীয় হবে সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রে[ণী] পর্যন্ত মাতৃভাষা শেখানোর যে উদ্দেশ্য দেখানো হয়েছে (১ থেকে ৭ তার মধ্যে ব্যাকরণ শেখানোর কথা নেই, পরিষ্কার বলা হয়েছে-"উপরের শ্রেণীতে মাতৃভাষার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে-(১) মাতৃভাষার বোধ গঠন, ব্যাকরণের মূল রীতি ও বাধিবিধির সহি[ত] ছাত্রছাত্রীর পরিচয় সাধন।" উপরের শ্রেণী অর্থে নবম ও দশ[ম] শ্রেণী নিশ্চয়ই—আর এর পয়লা নম্বর উদ্দেশ্য হল 'ব্যাকরণ'। নি[ম্ন] শ্রেণীর উদ্দেশ্যের মধ্যে এই ব্যাকরণ শেখানোর কথা না থাকলে ষষ্ঠ শ্রেণীর মাতৃভাষায় ২০ নম্বর ব্যাকরণের জন্য নির্দিষ্ট হ'ল কো[ন] উদ্দেশ্য সামনে রেখে! আর ব্যাকরণে কি নেই—স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন ব[র্ণ] বর্ণ বিভাগ, সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ব বিধান, সাধু-চলিত রীতি সব কিছুই। উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমে এই পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য হ'ল কি করে? ত[বে] কি বুঝতে হবে "উদ্দেশ্য" ও "পাঠক্রম" এক সম্পর্কিত নয়, না [কি] উদ্দেশ্য থেকে পিছিয়ে পড়ার একটা নজীর সৃষ্টি করে রাখা হ['ল] গুরুতেই। উঁচু ক্লাসে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ৪র্থ উদ্দেশ্যে ব[লা] হয়েছে—"সৎ সাহিত্যের রস আস্বাদন, তাহা হইতে আনন্দলা[ভ] এবং তাহাতে নিহিত মহৎভাব ও আদর্শ গ্রহণে নিজের জীবনে[ক] সুন্দর ও সার্থক করিতে ছাত্রছাত্রী যেন উৎসাহী হয়।" সুতর[াং] এটা আশা করা অন্যায় হবে না যে ওঁদের পরিকল্পিত ও সংকলি[ত] পাঠ্য পুস্তকে নিশ্চয় মহৎভাব ও আদর্শ আছে এমন দু-একটা রচনা নমুনা মিলবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে রচনাগুলি নির্বাচন লেখক নির্ভর, বিষয়বস্তু নির্ভর নয়—এমন একটি রচনাও নে[ই] যাতে যুগোপযোগী মহৎভাব ও আদর্শের কথা আছে। "ঠাকুরদাসে[র] বাল্যশিক্ষা" এমন একটি রচনা যা পড়ে ছাত্ররা না পায় আনন্দ, [না] পায় কোনও আদর্শ, না পায় বিদ্যাসাগরের বা তাঁর পিতার কোন[ও] কৃতিত্বের পরিচয়। "হিমালয় ভ্রমণ" ভ্রমণ কাহিনীর নমুনা হিসা[বে] অতি নিকৃষ্ট রচনা—ঈশ্বরে আস্থা বৃদ্ধি করে অদৃষ্টবাদী হতে এ রচনা হয়ত বা কিছুটা সাহায্য করতে পারে। ... ১০০ ... পড়া ছাত্রের কাছেও ... গাঁজাখুরী ... হয়। "... প্রতি ... " পাঠ্যাংশে ... ন ... বাতিল ...

যুক্তিই কিশোরদের প্রভাবিত করবে। "দুই বিঘা জমি" যত ভাল কবিতাই হোক প্রভু সেবার এই সামন্ততান্ত্রিক আদর্শ মোটেই সুখকর নয়। তালিকা দীর্ঘ না করে আর একটি উদাহরণ দিই—'মেঘনাদ বধ কাব্য' থেকে যে অংশটি নির্বাচিত করা হয়েছে তাতে 'অসহায়-হত্যা'র যে বীরত্ব আছে তা কি বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রের কাছে খুব আদর্শ-স্থানীয় হবে?

পাঠক্রমে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে বিষয়বস্তুর নির্দেশ দেওয়া আছে তাতে "ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি", "প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি কথা", "মহাপুরুষ", "ধর্ম-সমাজ রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষী তথা মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্ত"—প্রভৃতিতে পাদরী সাহেবের স্কুলের মতো, ধর্ম যেন সব কিছুতেই ছুঁয়ে আছে। 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' রাষ্ট্রের বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এত ধর্ম-ধর্ম কেন? আমরা তো জানি ধর্ম-নিরপেক্ষতা বলতে এইটাই বোঝায় যে, নৈতিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্কুলের কাজ হবে ধর্মকে বাদ দিয়ে ঐ কাজটি সমাধা করা—নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি ধর্মকে অবলম্বন করে রচিত হবে না। আরও আছে—'জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন-বৃত্তান্ত ও সংগ্রামের কথা ( সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে মুখ্যত উনবিংশ শতক হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়ের কথা )।' একথা বলা বাহুল্য, পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায়ীরা খুব ভালভাবেই জানেন কোন্ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন বৃত্তান্ত কিভাবে লিখলে পাঠ্যপুস্তক অনুমোদিত হয়।

এবারে সবচেয়ে বেশি লোকঠকানো হয়েছে দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় ভাষা প্রধানত ইংরাজী—পরীক্ষা দিতে হবে ছাত্রকে ১০০ নম্বর। পূর্বে ২০০ নম্বর পরীক্ষা দিতে হত। সুতরাং অভিভাবক ছাত্র অনেকেই খুশী—বিদেশীভাষা শেখার বোঝা, ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠজীবনের ৬০% সময় অপহরণকারীর গুরুত্ব বোধহয় কমলো। সত্যই ২০০ থেকে ১০০, অঙ্কের দিক থেকে একেবারে অর্দ্ধেক—কিন্তু বাস্তবে কি তাই? নম্বর কমিয়ে দিলেই কি একটা ভাষার ভার কমে যায়, না তা শেখাটা সহজ হয়ে যায়? বিশেষ করে যেখানে দ্বিতীয় ভাষা শেখার প্রধান উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে—"ছাত্রের ভাষাবোধ, ভাষা-বিভাগত দক্ষতার উন্নতি এবং 'জেনারেল ইংরাজী' বোঝা, বলা, পড়া এবং লেখার সামর্থ্য বৃদ্ধি" ( to develop the students' language sense and linguistic skill and his ability to understand, speak, read and write general English )। জানতে ইচ্ছা করে নম্বর কমিয়ে ভাষা শেখার কাঠিন্য এবং ভাষার ভার কমাবার এই অভাবনীয় আবিষ্কারটি কার মাথা থেকে বেরিয়েছে। এই General English ( পাঠ্যক্রমে যার দাপট প্রায় 'Major-general' এর মতো ) শেখাবার জন্য কর্তৃপক্ষ, তাঁদের সুচিন্তিত বিচার বিবেচনায়, সময় ধার্য করেছেন সপ্তাহে ৪টি ক্লাস—এই ৪টি ক্লাসে বৎসরের ২৭টি সপ্তাহে পড়াতে হবে ( ষষ্ঠ শ্রেণীর কথাই ধরা যাক্ ) ১৭টি গদ্যের lesson, ১৪টি পদ্য, গ্রামার-এর Parts of speech, Number, Gender, simple tenses, Division of simple sentences, sub-classification of nouns, case, verbs, use of capital letters কিছুটা punctuation; আর শেখাতে হবে free translation, composition-এর মধ্যে comprehension, letter writing, paragraph-writing, summary এবং গড়ে দিতে হবে ইংরাজীতে কথাবার্তা চালাবার সামর্থ্য।

Chapter III তে প্রথম ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় উল্লিখিত—"যথাযোগ্যভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানই সব শিক্ষার ভিত্তি" এই অতিমূল্যবান কথাটিকে সম্পূর্ণ উপহাস করছে ঐ দ্বিতীয় ভাষার সিলেবাসটি এবং ঐ মহান উদ্দেশ্যটিকে শিকেয় তুলে দিয়েছে আর একটি তৃতীয় ভাষা ছাত্রদের শিখতে বাধ্য করার পরিকল্পনা। এই তৃতীয় ভাষাটি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক-সংস্থা প্রভৃতি অনেক শিক্ষাবিদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও চেপে বসল ছাত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের ঘাড়ে। ভাষা শেখা সহজ নয় বলেই ভাষা ভারাক্রান্ত এই পাঠক্রম ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস ধ্বংস করতে খুব বেশি সময় নেবেনা, নিম্নশ্রেণীতেই ঐ কাজটি সমাধা করে, তার মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করে তাকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলবে গোটা লেখাপড়ার উপরই, আর তার ফল যা হবে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

ইতিহাসের যে পাঠ্যক্রম স্থির করা হয়েছে তা শুধু অত্যন্ত মামুলীই নয়, ইংরাজ-শাসনকৃত পথকেই প্রভুভক্তের মতো অনুসরণ করা হয়েছে। এই পাঠক্রম রচনার দৃষ্টিভঙ্গী পুরাতন, মোহগ্রস্ত এবং অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস অস্বীকৃত। 'রেনেসাঁ ইন্ বেঙ্গল'-এ যাঁদের নাম আছে তাঁদের দেশকে জাগাবার প্রচেষ্টা এবং দেশপ্রেম সম্পর্কিত বিতর্কে না গিয়েও বলা যেতে পারে, যেমন রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে 'রেনেসাঁ'র সম্পর্কটা কি? রামকৃষ্ণাদর্শ যদি মূর্ত হয়ে থাকে বিবেকানন্দে তবে আরও দুটো অধ্যায় পার হয়ে বিবেকানন্দের আবির্ভাব কেন? বাংলার বিপ্লবীদের অধ্যায়ে ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের সঙ্গে কি মাতঙ্গিনী হাজরা স্মরণীয়? শহীদ হলেই তিনি বিপ্লবী হবেন না কি? বাংলাদেশের উত্থান কি আমাদের বাংলার ইতিহাসের অন্তর্গত? ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র পড়বে ১৯৭০-৭১ এর সাম্প্রতিক ইতিহাস আর উঁচু শ্রেণীতে ( নবম-দশম ) ছাত্র পড়বে প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ ( ১৯৫০ ) পর্যন্ত—এরই বা কারণটা কি? বঙ্গ-ভঙ্গে ( ১৯০৫ ) নাম রয়েছে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের, কিন্তু সত্য কথা এই দেশবন্ধু বিখ্যাত ব্যারিষ্টার হিসাবে উচ্চ মহলে পরিচিত থাকলেও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মামলা পরিচালনার পরই (১৯০৮) ইনি দেশবাসীর কাছে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, তাঁর খ্যাতি বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের জন্ত নয়। অথচ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও, দ্বীপান্তরিত অশ্বিনীকুমার স্থান পেলেন 'বিংশ শতাব্দীতে বাঙলার পুনরুজ্জীবন' অধ্যায়ে। এই পরিবর্তনগুলি এবং যত্রতত্র যেখানে যাকে খুশী বসিয়ে দেবার পেছনে কোন্ যুক্তি কাজ করছে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। রাজভক্তি জাগাবার জন্ত এবং রাজার ও শাসক কুলের মহিমা প্রকাশের পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা-প্রচেষ্টা-সংগ্রাম এবং গুরুত্বকে অস্বীকার করে, ইতিহাস লেখার যে পদ্ধতি বিদেশী শাসনকালে রাজভক্ত পুরুষেরা করেছিলেন সেই ধারাকে ভাঙার এতটুকু প্রতিশ্রুতি এই পাঠক্রমে নেই, নেই ছাত্রদের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা, ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী মানসিকতা গড়ে তোলার এতটুকু সদিচ্ছা। এমনকি ঐ সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলিকে বানচাল করার যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে ঐ পাঠ্যক্রমের মধ্যেই। কার্যতও, যে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক চোখে পড়েছে, তার থেকে দেশপ্রেমের পরিবর্তে ব্যক্তিপূজার প্রবণতা গড়ে উঠে ঐতিহাসিক-চেতনার অকাল মৃত্যু ঘটাবে এবং অতীত-গৌরব (reverence for its past)-এর পরিবর্তে রাজমহিমা এবং বিদেশী শাসকদের প্রতি আকর্ষণই বৃদ্ধি পাবে। পাঠ্যক্রম যা রচিত হয়েছে তাতে এমন কোনও ব্যবস্থা নেই যার দ্বারা শিশুর মন দেশের গৌরবময় ইতিহাস জানার জন্ত আগ্রহী হয়ে উঠবে, আকর্ষণ বোধ করবে সে ইতিহাসের প্রতি। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠক্রমের শেষে উপদেশ দেওয়া হয়েছে বাংলার মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতির উপর বেশি গুরুত্ব দিতে। অথচ সারা সিলেবাসটি জুড়ে গুচ্ছের ব্যক্তিবিশেষের নামের তালিকা এবং পাশে নির্দিষ্ট সংখ্যার পাতা বরাদ্দ-এর মধ্যে বাংলার মানুষের জীবন-সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দেবার সুযোগ কোথায়?

এবারের নতুন সিলেবাসে সবচেয়ে যা আকর্ষণীয় তা হ'ল—'হাতে-কলমে কাজ', 'শারীর-শিক্ষা' এবং 'সমাজসেবা'। এই তিনটিই সম্পূর্ণ নতুন জিনিস—সিলেবাসের এবং পরীক্ষার ব্যাপারে। এদের জন্ত নম্বর রাখা হয়েছে ১০০ (৫০+৩০+২০)। উদ্দেশ্য মহৎ এবং পাঠক্রমও বিরাট এবং ব্যাপক, কিন্তু সমস্তটুকুই কালি-কলমে, কার্যক্ষেত্রে এর না আছে পূর্ব প্রস্তুতি না আছে একে কার্যকর করার কোনও প্রচেষ্টা। ফলে গোটা ব্যাপারটাই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। সামান্যতম অভিজ্ঞতা এবং দূরদৃষ্টিই বলে দিচ্ছে—এর সবটুকুই হবে একটা বিরাট ফাঁকি এবং লোক-দেখানো, কাগজে-অক্ষরে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং বাস্তবে একটা বিরাট শূন্য মাত্র। 'হাতে-কলমে কাজ' জিনিসটা যদি এই পুরাতন কাঠামোতেই আপনি গড়িয়ে চলত তবে, এটুকু বলতে পারি, এতদিন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতেন না, সিলেবাসের অপেক্ষা না রেখেই স্কুলে স্কুলে এর প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যেত। কিন্তু এর জন্ত যে আর্থিক-সঙ্গতি, স্থান-সঙ্কুলান এবং দক্ষ-শিক্ষক এর সমস্যা এবং পুঁথি-সর্বস্ব সিলেবাসের গুরুভার কমানোর যে প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং এগুলি ছাড়া 'হাতে-কলমে কাজ' কিছুতেই সফল হবে না জেনেও বিনা প্রস্তুতিতে একটি কলমের খোঁচায় কেন যে এটি চালু হ'ল ভাবতে আশ্চর্য লাগে। একমাত্র কয়েকটি উচ্চ-বেতনের ধনীদের বিদ্যালয় ছাড়া সাধারণ বিদ্যালয়গুলির বর্তমান আর্থিক অবস্থায় এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এছাড়াও 'হাতে-কলমে কাজে'র সিলেবাস সম্পর্কেও বলার আছে। 'হাতে-কলমে কাজ'কে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে, ঐগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে সিলেবাস রচিত হলে বিষয়গুলো পুঁথির পাতা ছেড়ে ছাত্রদের কাছে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠত—এতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান সংগ্রহের পথও প্রশস্ত হত। শিক্ষা হয়ে উঠত অনেক বেশি আনন্দদায়ক, কৌতূহল উদ্রেককারী, এবং বাস্তব-ভিত্তিক। শিক্ষা মানেই পুঁথির ছাপা অক্ষরগুলো, জ্ঞান মানেই তা একমাত্র পণ্ডিতদের মগজজাত জিনিস এবং জ্ঞান একমাত্র কাজে লাগে পরীক্ষা পাশ করতে—এই ভুল ধারণা চূর্ণ করার একমাত্র সহজ রাস্তা হাতে-কলম কাজের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতাকে পুঁথির জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস উৎপাদন করা। জ্ঞান সংগ্রহের পথগুলো ছাত্র-ছাত্রীকে চিনিয়ে দিলে তবেই স্বাধীন-ভাবে জ্ঞান সংগ্রহের প্রবৃত্তি জাগে। আমাদের দেশের বয়স্কদের মধ্যেও এই ভুল ধারণা আছে, তাই তারিফ করা মন্তব্য হরদম শুনতে পাওয়া যায়— লোকটা অনেক পড়াশুনা করেছে। এই শিক্ষা জগতেই তো দেখতে পাচ্ছি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের চেয়ে পুঁথি-পড়া জ্ঞানের আদর কত বেশি।

'শারীর-শিক্ষা'র অবাস্তব এবং হাস্যকর সিলেবাস সকলকে যোগাড় করে পড়ে দেখতে বলি। মনে হবে আমরা প্রাচীন স্পার্টায় ফিরে গেছি। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে খেলাধুলার ব্যবস্থা বহুদিনের দাবি—এর ওপর ভিত্তি করে যা দেওয়া হয়েছে তা ক্ষুধার্ত জনগণকে মেরী আঁতোয়ানেতের "কেক" খাওয়ার উপদেশের সমতুল্য। আমাদের স্কুলগুলোর যেখানে সামরিকভাবেও স্পোর্টস করার জন্ত কোনও মাঠ মেলে না, মেলে না বছরে একবার এই অনুষ্ঠান করার মতো পয়সা, সেখানে এই রাজকীয় ব্যবস্থা কাদের জন্ত? আগে ছুটোছুটি করার

মতো একটু আয়না কি এর থেকে বশি বাস্তবানুগ ছিল না। লোকে তো জমি কিনেই বাড়ী করে, বাকি শূন্যে বাড়ী করে জমির ওপর বসায়। যোগব্যায়াম থেকে, জিম্‌ন্যাষ্টিক্, লাঠি, জুডো, কুস্তি, ভ্রমণ; তাছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল ইত্যাদি তো আছেই, এর উপর দেশী-বিদেশী লোকনৃত্য। সিলেবাসটিতে পাণ্ডিত্যের ও স্বপ্নের যতটা ছড়াছড়ি, তার একচুলও যদি বাস্তববুদ্ধির পরিচয় এবং আন্তরিকতা থাকত তাহলেও শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্রের তরফ থেকে অভিনন্দনের বান ডেকে যেত। যাদের জন্ত এই সিলেবাস, আমাদের দুর্ভাগ্য, এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনটা তারা এখনও পর্যন্ত টেরই পেলো না। ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতেই পারল না, তাদের জন্ত কর্তৃপক্ষ কি উদারভাবে খেলাধূলার বিলি-ব্যবস্থা করেছেন, তাদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্ত তাঁরা কত উদ্বিগ্নচিত্তে ছক-কাটাকাটি খেলেছেন। আমাদের মনে হয়, এই তো সবে ছ'মাস, 'স্বাধীনতা'র ২৭ বছরেও যেমন মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে পারেনি। তেমনি ভাবেই, সাধারণ স্কুলের ছেলেমেয়েরা, ভোজ শেষ হয়ে যাবার পরেও, এই নতুন পরিবেশিত জিনিসগুলির আস্বাদন তো দূরের কথা চোখে দেখার সুখও পাবে না, যদি না কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে ইতিমধ্যে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিতও তো চোখে পড়ছে না।

কিন্তু কেন এমন হল? এক কথায় এর সোজা উত্তর হ'ল—পাকিস্তানে যেমন 'ঐস্লামিক গণতন্ত্র', ভাসানী সাহেবের যেমন 'ঐস্লামিক সমাজবাদ', তেমনি আমাদের দেশেও ধাপে ধাপে উচ্চ-বিত্তদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গণতন্ত্রের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এখনও পর্যন্ত, যা সুযোগ-সুবিধা তার বেশির ভাগটাই ভোগ করে ঐ উচ্চ-বিত্তদের ঘরের ছেলে-মেয়েরা—একথা অস্বীকার করার চেষ্টা দৈহিক শক্তিতে মাথা-ঝাঁকানো হবে মাত্র। অন্ন-সংগ্রহে ব্যস্ত সাধারণ মানুষেরও হয়ত এদিকটা তলিয়ে দেখার অবসর ঘটেনি, সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টাও বড় একটা দেখা যায় নি, এমনকি শিক্ষক-সংস্থাগুলির তরফ থেকেও না। এ ব্যাপারে শিক্ষক-সংস্থাগুলির উদাসীনতা এবং অসাড় মনোভাব লক্ষ্যণীয়—অথচ আমাদের দেশে শিক্ষক এবং শিক্ষার অবস্থার উন্নতি একমাত্র সম্ভব সাধারণ মানুষের কাছে এর যথাযথ চিত্র উপস্থিত করে তাঁদের সচেতন করার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেই বাকী সব ঠিক হো যায় গা'—এ ধারণা যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা-বিভাগ ভেঙে দিয়েছে। আমাদের নতুন সিলেবাস সম্পূর্ণরূপেই ঐ উচ্চ-বিত্তদের ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ক্লাস-এর সংখ্যা কমানোর অর্থই সাধারণ ছাত্রের সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দেওয়া, বিদ্যালয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যও ঐ একই। আমাদের শিক্ষা জগতে কিন্তু এই ব্যবস্থাই চালু হচ্ছে—বিদ্যালয় যাঁরা কতোয়া জারি করে এম. এ. পাশ শিক্ষকদের নিয়োগ বন্ধ করে দিলেন—এই কারণে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্ত বি. এ. পাশ শিক্ষকই যথেষ্ট—তাঁদের বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের গৃহশিক্ষকের জন্ত কিন্তু তাঁরাই খোঁজেন প্রথমে অধ্যাপক, পরে এম. এ পাশ; বি. এ. পাশ কদাচ নয়। আবার তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা যে স্কুল যাওয়া আসা করে সে বিদ্যালয়ের শিক্ষক তালিকা কিন্তু সাধারণ গ্র্যাজুয়েটে ঠাসা নয়। সোজা কথা; কাঙালী-ভোজনের জন্ত যেমন ধনদাতা 'পদে'র (item) চিন্তা করে না, একটা কিছু হলেই হ'ল, বিশেষ অতিথিদের জন্ত 'ডিস' নিয়েই চিন্তিত; সরকারী শিক্ষা নীতির ক্ষেত্রেও ঠিক সেই মনোবৃত্তিই কাজ করছে। আমাদের খুব শঙ্কা বোর্ড এর সিলেবাস বইটির প্রথমের দিকে বিভিন্ন বিষয় পড়াবার জন্ত যে সময় ধার্য করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যাও কমে যাবে। সুতরাং আলোচনার শুরুতে যে বলা হয়েছে—এ সিলেবাস উদ্দেশ্যহীন, এই পরিবর্তন বিনা কারণেই ঘটেছে—সেটা হয়ত ঠিক নয়। এই সিলেবাস মুষ্টিমেয়'র স্বার্থে রচিত শিক্ষা সঙ্কোচের প্রচেষ্টায় একটা সুকৌশল ধাপও হতে পারে। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, এই সিলেবাস দরিদ্র ছাত্রদের এবং সাধারণ বিদ্যালয়গুলিকে অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে।

# শৈশব

ধারাবাহিক উপন্যাস

শংকর বসু

**পূর্বকথা**

সন্তুর বাবার কথা মনে নেই। সবটাই মার মুখে শোনা। বাঁচার হদিশ খুঁজে অন্ন হন্তে। সন্তুর বাবা স্বাধীনতার জন্তে লড়েছিল। মার মুখে ছেলেটা সে গল্প শুনেছে। অথচ ও দেখেছে স্বাধীনতা দিবস পালন করার সময় কানাইদা একটা ক্যাঙালীর ছেলেকে নিষ্ঠুরভাবে মারল। আর অন্ন আজ অব্দি নির্বাতিত রাজবন্দীর স্ত্রীর সাহায্যটুকুও পায়নি।

এখন সরি ফুলকি আর কচুরলতি আনে। আনে শাকলতা। তাই দিয়ে পেট ভরানো। সরির সম্বন্ধ দেখছে অন্ন। বিয়ে হয়ে যাবে সরির। ভাবলেই সন্তুর বুকটা খা খা করে। আর আছে ক্যাওড়াপট্টি, ক্ষেমিপিসি, গনু, সাইকেল ফ্যাক্টরীর ওয়ারকার শ্যাম। আর পাড়াটার মাথার ওপর শনির মতো বিচরণ করে কানাইদা। সমাজসেবী দাদা নেতা কানাইদা।

**১১**

ক্যাওড়াপট্টির জবল বাঁশের সাঁকোটা পানাপুকুরের গাঢ় সবুজ এক থাবলা রঙের ওপর দিয়ে গনুদের মেটে ঘর অব্দি খোঁচার মতো চলে গ্যাছে। গনুদের ঘরের কাছে এসে বাঁশদুটো পায়ের চাপে চাপে কেটে গ্যাছে। এখন শতমুখী চোঁচ বেরিয়েছে।

সন্ধ্যা ফুটে উতলে গ্যাছে মেলাই আগে। তরল অন্ধকার এখন। আর অন্ধকারের বুদবুদ। টালীগঞ্জ ব্রীজ, চারু মার্কেট, শেওলার থান, লোহাপট্টির ট্রামরাস্তা আর মা কালীর একহাত জিভের টসটসে লাল রঙের নীচে ছেলে ছুটো ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ছুটে মরছে। কোথায় গেল জলজ্যান্ত মানুষটা। গ্রহণ তো কোন জন্মে ছেড়ে গ্যাছে। খানিক আগেও গনু এসে টু মেরে গ্যাছে : ফিরেছে ?

: নাহ্‌ !

: গেল কোথায় !

: চ্যান করে উঠেই আর দেখতে পাইনি।

গনু যেতে না যেতে এসেছে শ্যাম : আসেনি ? ক্যাওড়াপট্টির একতাল কালো মাংসের ভেতর থেকে শুকনো ঠোঁট গভীর দুঃখে নড়ে উঠেছে : নাহ্‌ ! যে গ্যালো, যার সন্ধান মিলছে না সেই ক্ষেমিপিসির চুলের পুরোন পিজল জট স্মরণ করে রণ আর সন্তুও চিড়িয়ার মতো বুকে হাঁক ধরিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। উকীলদাদু থানায় গেছিল কেস লেখাতে, আর কানাইদার গোল্লা গোল্লা চোখ ক্যাওড়াপট্টির বুকে পাক্‌কা দেড় ঘন্টা ভাটার মতো জলতে লাগল : তখনই বলেছিলুম শামুকে···কি দরকার বুড়ো হাড়ে এ্যামন কেত্তন করে বেড়ানোর...।

রাত গাঢ় হলে এক এক করে সব উঠলো। গনুদের দাওয়ায় এখন বৌ ঝি চুনোচানার দল বেড়ালের মতো পড়ে আছে। আর মাটির দেয়ালে চুণ সিদুঁরের ফোঁটা আঁকা খাপে মিটমিট করছে সরা পিদিমের আলো। অন্ন বাঁ হাতে একটা হ্যারিকেন নিয়ে দুলতে দুলতে নড়বড়ে সাঁকো বেয়ে দাওয়ায় এসে উঠেছিল। কানাইদার কথাটায় বোধহয় তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। গনুর দিদির নোলক দুলে উঠল ফোঁস করে : দরদ দেখাতে এয়েচেন ! কত ক্ষ্যামতা !

একথায় সেকথায় বয়সের কথা এসে গেল। জীবন আর মৃত্যুর কথা। যৌবন আর বার্দ্ধক্যের কথা। আর ক্যাওড়াপাড়ার দাওয়ায় বসে বাঙালদিদি অন্ন ছড়া কাটতে লাগল :

এই যে দন্ত তেজমন্ত
পড়লে হবেন খোঁতা
এই যে কেশ দেখতে বেশ.
পাকলে পাটের দড়ি
এই যে মাজা হবেন কুঁজা
যাবেন গড়াগড়ি......

পানাপুকুরটায় কেউ কোনদিন একটা ছায়া দেখেনি। না খুঁড়ে সাঁকোটার, না একটা উড়ন্ত বকের ডানার। না চিল, না শকুন। তবু যে এমন ছায়া পড়ল, শবযাত্রার মতো একটা ছায়া যে হাঁটতে লাগল সবুজ পানার বুকে টেঁকির পাড় দিয়ে, হম্‌ হম্‌ শব্দে, তার কারণ গনুর দিদি হ্যারিকেনটা হাতে করে ছুটেছিল। সে আলোয় ওদের শরীরের ছায়া দেখা গ্যালো। আলোর ছায়া।

: ক্ষেমি ফিরেছে !

: ওই তো পিসি !

: ক্ষেমিপিসি !

রাতদুপুরে শ্যাম আর গদু যখন ফেবিপিসিকে পাঁজাকোলা করে, বাঁশের গাঁটে সাবধানী থ্যাবড়া পা ফেলে, বুকের ভেতর শ্বাস আটকে সাঁকোটা পেরিয়ে এল তখন ক্যাওড়াপাড়াটির জুবুথুবু অশ্বত্থ গাছটার কোটরে শুয়োরের পেটের মতো অন্ধকার। আর গদুদের দাওয়ার খুঁটিতে শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে কে যেন নখ দিয়ে গলা চিরে ফেলল : পিসি গো !

পানাপুকুরের ডাগর পাতা কেঁপে উঠল সেই শব্দে। চিৎকার। কান্নায়। সরসরিয়ে নেমে গ্যালো মেটে রঙা একটা ঢোঁড়া সাপ। পুকুরের জলে একটা শব্দ হল। ছলাৎ করে। কি যেন ডুবে গেল ! পিসি ই·· ই !

চোট লেগেছিল মাথার ঠিক চাঁদিতে। লিকি আর উকুন সমেত জটটা মাথার এক চিলতে সাদা মাংস নিয়ে উঠে গ্যাছে। দোতলা বাস বলে কথা, কি করে যে তবু ধিক্ ধিক্ প্রানটুকু ধরে রেখেছে তাই আশ্চর্য। বিস্ময়। মানুষের বাঁচার বিস্ময়।

দু দুটো দিন বেহুঁশ কেটে গেল। গলা দিয়ে এক ঢোঁক জল অব্দি নামাতে পারেনি। ঝিনঝিনে ঘাম আর আগুন। গদু আর শ্যাম দুজনেই নাগা করে বসে থাকল। কোত্থেকে যোগাড় যন্তর করে শ্যাম লাল একটা মিক্‌চার নিয়ে এল। আর সন্থু নাওয়া খাওয়া ছিকেয় তুলে দিনরাত্তির পিসির মাথার কাছে বসে আছে। অন্ন এখন সরিকে একলা ছাড়ে না। সোমত্থ মাইয়া বইলা কথা...শ্যাষে কি অঘটন ঘটে । তবু সরি আসে। অন্নর বিলাইচোখ এড়িয়ে সরি এসে জলপটি দেয়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ফেমির মুখের হিজি-বিজি অস্পষ্ট রেখার দিকে। মাঝে মাঝে ভাতের মতো সাদা চোখ জোড়া মেলে পিসি কি যেন খোঁজে। আকুলি-ব্যাকুলি করে কি যেন খোঁজে। হাপড়-টানে শ্বাস নিয়ে নিংড়ে বের করে দেয়। আর চোখেমুখে ফুটে ওঠে সেই নিরুদ্দিষ্ট উদাস ভাব : জনম আমার বৃথাই গেল···। গানটা যে পিসি কতবার গাইত। অথচ এখন গলায় একটা শব্দ ফোটাতে পারছেনা। পরের দুটো দিনও জরো আগুনে পুড়ে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গ্যালো।

মেলগাড়ী চেপে ঝড়ভাঙানিয়া বাতাস এসে আছাড়ে পড়ল জড়-ভরত অশ্বত্থ গাছটার জটিল ডালপালা শেকড়-বাকড়ে। অন্ধকার লাফ দিয়ে উঠল সাত বাসী গন্ধ নিয়ে, ক্যাওড়াপাড়াটির বুক ফাঁক করে : এবার যাবে, এইবার গ্যালো বলে।

ঝিকার এলো সাহেব-সুবোর হাটকোট চাপিয়ে অদ্ভুত কস্তা রঙ নিয়ে। কোন এক ফিরিঙ্গি সাহেব নাকি ফেমিকে হ্যাঁচড়ে টেনে নিয়ে গেছিল জংলা বাদায়। কবে যেন সহর পত্তিতে পান চিবিয়ে টিং টিং শব্দে জুড়িগাড়ী, ছ্যাকড়াগাড়ী ছুটত। ছিপটি দিয়ে বাতাস চাবকে।

...তারপর হল গিয়ে লড়াই। তাক তাক গায়ে কাঁটা দিচ্ছে এখনও ! বাপ রে ! যে-সব বাবুরা তখন মিটিন করে গান গেয়ে লড়াইর কথা গোবরজলের মতো ছিটোত, তাদের আমি পেন্নাম কত্তাম দূর থেকে। কি যেন সব নাম ..হ্যাঁ, গাঁধী বাবার এক চেলা এসেছিল একবার ।

: হক বলছি ক্যামন ভক্তিছেদ্দা আসত। কথায় বলে...যারে না দেকেছি সে বড়ো সুন্দরী, যার রান্না খাইনি সে বড়ো রাঁধুনী।

ফের কাঁপুনি দিয়ে জর এল। গদু ছেঁড়া ধুতির কাঁথাটা পিসির গায়ে চাপিয়ে দিল। শুনাশুন সন্থু শুনেছে পিসি মরে যাবে। মরবে। মরে কোথায় যেন যাবে। সন্থুর বুক ধুকধুক করছিল : মানুষ কেন মরে ? কেন ? কেন ? চন্থুর মা, অন্ন, রণর ঠাকুমা, এ্যামন কি এঁচোড়ে পাকা চন্থুটা অব্দি মন-মেজাজ খিচড়ে গ্যালে, দুঃখ পেলে মরার কথা বলে। সরিও। নিজের কথা মনে হয়। কতবার সন্থু ভেবেছে মরে জ্বালা জুড়োবে। চোদ্দবছরের সন্থুর কিসের এত জ্বালা যে জুড়োনোর জন্য চাই শীতল মৃত্যু। আচ্ছা, মৃত্যু কি শীতল ?

ভয়ঙ্কর একটা জিনিষ চোখে দেখার লোভে সন্থু রাতটা গদুদের ঘরেই থেকে গ্যালো, এক ফাঁকে গিয়ে দুখানা রুটি চিবিয়ে এসেছিল অন্নর ভয়ে। ক্যাওড়াপাড়ার অদ্দেক মানুষ জেগে। ক্যাওড়াপাড়ায় আজ ঘুম নেই। কে যেন চলে যাবে, তাই সব আলগা। ঢিলে।

রাত কাবার হয়ে এলো পচা ডিমের মতো আকাশটা ফাটিয়ে, পিসির চোখের আলগা পানিতে। গদু আঁচলটা তুলে ফোলা ফোলা চোখদুটো মোছাতে গেছিল, দুখিয়ার মা হাতটা ধরে ফেলল খপ্ করে : মোছাসনি।

: কেন ?

: কাঁদতে দে।

: কেন ?

: টাইম হয়েছে এবার যাবে, এ হল তার চেন্ন। মায়া কান্না। য্যাতোক্ষণ না এই কান্না আসে যমে ছুঁতে পারেনা কো। মায়া কাটছে, এবার যাবে।

বোঁচা নাকের সাদা পুঁথি নাড়িয়ে ক্যাওড়াপাড়ার বৌ, দুখিয়ার মা নিজের চোখের কোণ মুছতে থাকে। আর সেই ফাঁকে আকাশের গাঢ় নীল রঙ নিয়ে গদুদের মেটে ঘরে লাফ দিয়ে পড়ল থলথলে মৃত্যু।

মৃত্যু হরিধ্বনি দিল।

তোরে দেইখ্যা ক্যামন খুশী হয় দেখিস…তর বাপের ছোটকালের বন্ধু, হোগলার বেড়ার আবডালে লুকাইয়া রাখছিল দুইজনারে। দারোগা আইতেই চিক্‌খইর দিয়া উঠল : বন্দে মাতরম্‌। বাপরে সেকি নেশা। বন্দেমাতরমের নেশা। আর তর দাদু গায়ের জ্বালায় থাবলা দিয়া পড়ল : অভিসাইরা! হারামজাদা! আমার আর তখন বয়স কত! বড়জোর চোদ্দ হইব। হাসতে হাসতে গেল গিয়া দুই বন্ধুতে।

সুলতান আলম স্ট্রীটের তেলচিটে ফিতের মতো গলিটার মাথায় ধোঁয়ার চক্কর। ক্যাওড়াপাড়া পেছনে ফেলে ওরা জিরিয়ে জিরিয়ে হাঁটছিল। গলিটা দমবন্ধ করে আছে। ধোঁয়ায়। মিলের পাঁচিলে। কাঁটাতারের বেড়ায়। পাটের ফেঁসোয়। অন্নর সাথে নালীর মতো সেই গলি ধরে হাঁটছিল সন্তু।

মাথায় একথাবলা তেল দিয়ে অন্ন আজ সন্তুকে নাইয়েছে। আর ভিজে গামছা দিয়ে রগড়ে ঘষে কানের ময়লা তুলতে তুলতে সেই মানুষটার কথাই বলেছে : একলগে পিকেটিং করছে…পুলিশের গুতা খাইছে…জেল খাটছে।

এতো কথার ফেনায় সরিও গেঁজে উঠেছিল পেয়ারা গাছের ছাড়া ডালের তলায় : আমিও যামু মা।

অন্নর কানে তখন পেনসনের টাকার ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ, কালুবাবু (অন্ন বলে : কালু ঠাকুরপো) যেন আবার পদ্মাপাড়ের বেতবন, হোগলাবন ছাড়িয়ে আকাইলাপিসির সুপারী বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে টাকার একটা থলের মতো। আর শব্দ হচ্ছে। ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ।

: শুনি এখনও নাকি সুতা কাটে চড়কায়। সপ্তায় একদিন মৌন পালে। আর ছাগলের দুধ হইল আহার।

একটা হলে কথা ছিল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। অমন জলজ্যান্ত একটা মানুষ দেখার জন্যে সরির পাগল না হয়ে উপায় কি। হলই বা সন্তুর থেকে বড়ো? না হয় সে ছেঁড়া কাঁথার মতো সংসারটার কষ্টদুঃখ বোঝে? কিন্তু সরি তো মানুষ, ঈশ্বর দর্শনের লালসা তার জিভেও তো চ্যাট চ্যাট করে?

: আমারেও লগে নেওনা মা!

: তর কি বোধাবোধ নাই সরি!

: ক্যান?

: হা কপাল! ত্যানা পইড়া যাবি ক্যামনে? কোন্ চুলায় যাবি, হইক বিয়া যাইস তখন যে চুলায় খুশী।

আর সরি পাথর। পেটের ধান্ধায় বগল-ছেঁড়া ফ্রক পরে কচু ঘেঁচু হাতড়ে বেড়ানো এক কথা, তাই বলে তো আর ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়ে বাসে ট্রামে যাওয়া যায় না। সরি কি আর তা বোঝে না। খুব বোঝে। তবু তো সরির ইচ্ছে করে আশ্চর্য এমন একটা কিছু দেখতে যা ও কোনোদিন দেখেনি।

সুতরাং সরি আসেনি। অন্ন আর সন্তুই গ্যালো মহাপুরুষের কাছে, যার সহি না হলে অন্ন পেনসন পাবেনা, যে ছাগদুগ্ধ পান করে।

কত গলিঘুঁজি বাসরাস্তা ট্রামরাস্তা পেরিয়ে, আঁচলের গেরো খুলে খালি একটা কাগজ অচেনা অজানা মানুষের চোখের সামনে মেলে ধরেছিল অন্ন : ত্যাখেন তো দাদা কই হইব? তারপর কত সরু মোটা লিকলিকে আঙুল এক অনির্দিষ্ট নির্দেশে ওপরে উঠেছে আর উত্তেজিত অন্নর বিড়বিড়ানির ভেতর দিয়ে সন্তু এগিয়েছে : পেনসন! টাকা! টাকার শব্দ! কি বিচিত্র শব্দ! টাকার গায়ে মানুষের কাটা মুণ্ডু। মানুষের না রাজার? রাজা কি মানুষ নয়?

: সন্তু!

: উঁ!

: দ্যাখ দেখি ঐ বাড়ীটা নাকি।

স্লিপ পাঠাতে হল। দরকারটাও লিখে দিতে হল। সন্তুই লিখল : স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীর স্ত্রী সরকারী সাহায্যের বিষয়ে সাক্ষাত করিতে চাহেন। একটা ভুল বানান সমেত কথাটা লিখে সন্তু গম্ভীর হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর গম্ভীর।

আর অন্নর বিপুল বিলাপ : তর বাবায় জীবিত থাকলে কি আইজ এই মড়ার দশা হয়! সে কইত ত্যাশের জন্য কাম করছি তার আবার টাকা কিসের! ঘেন্না, ঘেন্না। আর তার বৌ হইয়া আইজ সেই টাকার জন্য আমি ধর্ণা দিয়া পড়ছি, সেই মানুষ কোথায়?

কোনোমতে অন্নকে চুপ করাতে পারলে হত। মাঝে মাঝে যখন অন্ন লজ্জা ঘেন্না কষ্ট ইত্যাদিতে জবজবে হয়ে মরে যাওয়ার দাখিল হয়, পদ্মাপারের বাঁকা বেত অন্নর পিঠে আছড়ে পড়ে সপ্‌ সপ্‌ শব্দে, আর অন্ন অঘোরে বেঘোরে যা নয় তাই বলতে থাকে, তখন সন্তুর মনে হয়—মা কেন বোবা হল না?

: আমাগো বাড়ীতে দুইবেলা অমন বিশখান পাত পড়ছে…।

: চুপ করো।

: হ…বাবা গোলার ধান বাইর কইরা দিছে ভাখের অভে, ইস্কুল খুলছিলো…কাকায় স্বদেশী কইরা তিনবার জেল খাটছে…একবার তো…।

: চুপ করো মা।

: ক্যান চুপ করুম? ক্যান?

ভাগ্যি সেদিন মৌন ছিল না। নাহলে অতটা পথ ঠেঙিয়ে আসাই মাটি হত। মেঝেতে একটা কার্পেটের টুকরো পাতা। তাতে বাঘের মুখ, মোচ ইত্যাদি আঁকা। এবং তিনি সেখানে শিথিলভাবে বসে চরকা কাটছিলেন। এককালি কাপড় পরণে, গায়ের কালিটা জুর করে রেখেছেন পাশে! চোখে নিকেলের চশমা, রূপর ঠাকুমার মতো। মুখ চোখও রূপর ঠাকুমার মতো। শুধু গায়ের রঙটা ফেটে পড়ছে এই যা। পিঠের বেঁকা শিরদাঁড়াটার গাঁটগুলো জেগে আছে অতন্দ্র পাহারায়।

: বলুন!

মিহিগলায় শব্দটা উচ্চারণ করেই বাঁ হাতখানা চরকায় ঘোরাতে লাগলেন। কেমন একটা শব্দ হচ্ছিল। তাঁর অনাবৃত পিঠ, নির্লোম সাদা বুক, গ্রীক নাক আর ফিনফিনে ঠোঁটের মিহিগলার দেবত্বের সামনে মানুষের জিভ যেন আপনি শুকিয়ে আসে। দেশ, স্বাধীনতা, মহত্ত্ব, ত্যাগ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর গম্ভীর সব শব্দ কথা হপ্তার একদিনের মৌনতা নিয়ে, ছাগলের দুধের গন্ধ নিয়ে কার্পেটের বাঘের মাথায় শিশুর মতো খেলা করে।

: বলুন!

যেন ঐ অতিশয় দুর্বল মানুষটা সামনে হতাশ এবং বিহ্বলভাবে বসে থাকা এক জননী আর তার শিশু সন্তানের মুখ চরকার সুতোর আঁশের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

: বাবা!

: বলুন মা!

হঠাৎ সন্থর মাথার মধ্যে ঝমি ঝমি ভাব এল। মানুষটার অসহ্য শান্ত আর ধৈর্যশীল মহত্ত্ব বড়ো নিষ্ঠুর মনে হল। অন্নকে কথাবলার ফুরসৎ না দিয়ে সন্থ কর্কশ ভাঙা গলায় একটু জোরে চেঁচিয়ে উঠলো: আপনাকে তো লিখে দিলাম কেন এসেছি?

তেরো চোদ্দ বছর বয়সে কি এক শারীরিক কারণে ছেলেদের গলা হঠাৎ মোটা হয়ে যায়। একটা রুক্ষভাব আসে। এমন রুক্ষ যে অন্নও তা সহ্য করতে পারলো না। বিলাইচোখের ধূসরতা সন্থর সারা মুখে লেপ্টে গ্যালো। ফলে সেই ঝমি ঝমি ভাবটা সন্থর মাথা ঘোলা করে তুলল এবং ও কারো কথা শুনতে পেলো না। না অন্নর, না সেই সন্তবাবাজীর। ও কেবল বাঘের মুখ দেখতে লাগল। চকরা-বকরা দাগ আর মোচ।

কি একটা আশ্বাসের পুলক নিয়ে যখন অন্ন সন্থর সাথে বেরিয়ে এল, তখন ও একবারও মার মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। এই কি তার মা যে বলেছিলো কাল ঠাকুরপো দোয়াইর পাইত। কতো পুঁটি আর খইলসা যে ধইরা আনতো, যে বলেছিল ছোপলার বেড়ার পেছনের বন্দে মাস্তরের কথা, যার টাকা নিতে ঘেন্না হত—বিষম ঘেন্না, যার বাবার গোলা ছিল, গোলার গর্ব ছিল, এই কি সেই মা? সন্থর মা? প্ল্যাষ্টিক কারখানায় গতর খাটিয়ে যে তাদের মানুষ করার স্পর্ধা নিয়ে বাঁচে, সেই মা কেমন করে ছাগলের দুধ খাওয়া লোকটাকে বাবা বলল? আর অন্ন তখন বিড়বিড় করছে: কত বড়ো মানুষ হইয়া গ্যাছে… আইজ বাদে কালই মন্ত্রী হইব।

(ক্রমশ)

●[ অন্যান্য রুশ-বিজ্ঞানীর মতো উদ্ভিদবিজ্ঞানী আইভান মিচুরিনের নামও আমাদের দেশে খুব একটা পরিচিত নয়। কারণ, ছাত্র-অবস্থা থেকেই আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে যে ধারণা গেঁথে দেবার চেষ্টা করা হয় তা হ'ল: বিজ্ঞানের সমস্ত উল্লেখযোগ্য অবদানগুলো হয় ইউরোপ অথবা আমেরিকা থেকে এসেছে। আর এদুটো মহাদেশের বাইরে যা কিছু বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম হয়েছে সেগুলো 'নেহাৎই ধার করা বিদ্যা'...

আইভান মিচুরিন উদ্ভিদবিজ্ঞানে কোনো 'সাড়া-জাগানো' তত্ত্ব রেখে যেতে পারেন নি। তাঁর কাজ-কর্ম ছিল মূলত পরীক্ষামূলক। কিন্তু এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো ছিল বৈপ্লবিক—যা পরবর্তীকালে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছে এবং এমন কিছু মৌলিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে যা এখনো অমীমাংসীত।

কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় অবদানই একজন বিজ্ঞানীকে স্মরণীয় করে না। বিজ্ঞানীকে স্মরণীয় করে তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানকে সচেতনভাবে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে নিয়োগ করার আদর্শ এবং সংগ্রাম, তাঁর বিজ্ঞানী-জীবন ও সমাজ-জীবনের সংগতিপূর্ণতা এবং দেশপ্রেম যা দিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত করেন ভাবি বিজ্ঞানীদের। মিচুরিন ছিলেন এই অর্থেই একজন স্মরণীয় বিজ্ঞানী।

আমাদের দেশের হাজার হাজার বিজ্ঞানী, যাঁরা বিজ্ঞানের 'আন্তর্জাতিকতার' দোহাই দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং 'বিজ্ঞান সেবার যথেষ্ট সুযোগের' বিনিময়ে বিদেশের বাজারে নিজেদের 'নীলাম' করে দিচ্ছেন—তাঁদের বিপরীতে মিচুরিনের জীবন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই স্মরণীয় বিজ্ঞানীর সংগ্রামী জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হল। সঃ মঃ বীঃ ]●

# উদ্ভিদবিদ্ মিচুরিন ও তাঁর স্বদেশপ্রেম

১৮৫৫ সালে রিয়াজানের 'একদা-জমিদার অথচ এখন গরীব'—এমন এক পরিবারে আইভান মিচুরিনের জন্ম। গরীব হলেও তাঁর পরিবার ছিল আত্মমর্যাদাপূর্ণ ও অনমনীয়। তাঁরা মাথা নোয়াত না কারও কাছে। শৈশব থেকেই অনমনীয়, দৃঢ় প্রকৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছিলেন এই ভাবি বিজ্ঞানী। মিচুরিনের বয়স যখন খুবই কম তখনই মৃত্যু ঘটলো তাঁর বাবার যিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ভয়াবহ দারিদ্র্যের নিষ্করুণ থাবায় কবলিত হল তাঁর পরিবার। কিন্তু এই আঘাতই তাঁর স্বাধীনতাও আত্ম-মর্যাদাবোধকে খর্ব করার পরিবর্তে বরং আরো প্রখর করে তুললো। গোড়া থেকেই অনেক আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। স্কুলে অল্প কিছুদিন পড়ার পরেই তাঁকে স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল—গুরুজনদের প্রতি 'উপযুক্ত শ্রদ্ধা' না দেখানোর 'অপরাধে'। কিন্তু এ সমস্ত আঘাত তাঁকে ভেঙে ফেলতে পারেনি; বরং আরো সংগ্রামী করেছিল,—নিপীড়িত মানুষের মর্যাদার স্বপক্ষে দাঁড়াবার মতো মানসিকতা গড়ে তুলেছিল তাঁর মধ্যে।

সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব মাথায় নেবার পর, বছরের পর বছর ধরে চললো একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য—অফিসের কাজ, দারিদ্র্য আর মাসে ১২ রুবল উপার্জন দিয়ে পরিবার প্রতিপালনের করুণ প্রচেষ্টা। ফল-মূল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে স্বপ্ন তিনি ছোটবেলা থেকেই দেখতেন প্রচণ্ড দারিদ্র্যের চাপ কিন্তু তাকে ভাঙতে পারেনি। নিদারুণ অভাব-অনটন স্বীকার করে ফলের বাগান করার জন্য ছোট্ট একটা জমি তিনি ইজারা নিলেন কোনো মতে। 'মাটিকে নতুন করে গড়ার' ভাবনাটা অবশ্য তখনো আসে নি।

স্ত্রী, শ্যালিকা আর ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে মিচুরিন মাঝরাত্তির পেরিয়ে যাবার পরও অনেক সময় ধরে কাজ করতেন প্রতিদিন। কাজ করতেন আপিসে, বাড়ীতে। মেরামত করতেন ঘড়ি এবং আরো নানান যন্ত্রপাতি। কিন্তু অধিকাংশ সময়টাই দিতেন বাগানের পেছনে। জীবনের এই পর্বে গাছ-পালা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে তিনি এসেছিলেন তা হ'ল: স্বভাবজ অবস্থায় কোনো উদ্ভিদ যা ফলন দেয় তা তার ক্ষমতার তুলনায় বহুগুণ কম। তাই উদ্ভিদের উন্নতি সাধন করা দরকার। একদিকে যেমন বিভিন্ন আকাঙ্খিত গুণগুলো তাতে আরোপ করা দরকার, অন্যদিকে তেমনি—তার অবাঞ্ছিত গুণগুলোকে নষ্ট করা প্রয়োজন।

উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মিচুরিনকে পেয়ে বসলো। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সংস্থান এতোই কম যে, মিচুরিন তাঁর কাজ-কর্ম সম্বন্ধে হতাশ বোধ করতেন মাঝে মাঝে। ছোট্ট জমিটাতে ছ'শ-রও বেশি রকমের গাছ গাছড়া। আর সেগুলো এতো ঠাসাঠাসি যে তাদের অনেকগুলোই 'শ্বাসরুদ্ধ' হয়ে মারা যেতে লাগলো। সাহায্যের জন্য

---

* এই লেখাটি 'আমাদের জীবনে লেনিন' বইটিতে 'যে সাক্ষাৎকার কখনো ঘটেনি' শীর্ষক রচনাটির নির্বাচিত অংশের পুনর্লিখন।

জার-এর আমলাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করলেন মিচুরিন। কিন্তু সাহায্য তো পেলেনই না, উপরন্তু উপহাসই তাঁকে হজম করতে হ'ল। বছরের পর বছর ধরে অসম্ভব পরিশ্রম ও ধৈর্যের সাথে মিচুরিন যে হিম-সহ, সুস্বাদু অধিক ফলনশীল বৃহদাকার আপেল, ন্যাসপাতি, চেরি, খুবানি, জাম ইত্যাদি উৎপন্ন করেছেন সেগুলো শত চেষ্টা সত্ত্বেও জারের আমলাদের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি।

কর্তৃপক্ষ, গীর্জা আর সরকারী বৈজ্ঞানিক মহলগুলোর মত ছিল: সব কিছুই অপরিবর্তনীয়, সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। কেবল গোলযোগ সৃষ্টিকারী আর বিপ্লবীরাই প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান বদলাবার চেষ্টা করে;... মিচুরিনের আপেল আর ন্যাসপতি দেখা, অনুভব করা চলতে পারে, সেগুলো চেখে দেখা যেতে পারে কিন্তু সেগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরের 'স্বর্গীয়' সৃষ্টি-ক্ষেত্রে মানুষের হস্তক্ষেপ করাটা গোস্তাকি। মিচুরিন এই দুষ্কর্ম করে 'প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান'কে ক্ষুণ্ণ করেছেন!

এই প্রসঙ্গে পরে মিচুরিন লিখেছিলেন—"বিপ্লবের আগে অর্বাচীনরা তাদের রায় জারি করে বার বার আমাকে অপমানিত করতো। তারা বলতো, আমার সমস্ত কাজ অর্থহীন, 'নিছক ভাব-বিলাস', 'বাজে'। কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা আমাকে দাবড়ে বলতো 'এসব চলবে না'! সরকারী বিজ্ঞানীরা শঙ্কর-গাছগুলোকে বলতো 'বেজন্মা'। পাদ্রীরা ভয় দেখাতো: খবরদার ঈশ্বরের প্রতি এমন অভক্তি দেখিয়ো না...।" দেশের কাছে তিনি তুলে ধরেছিলেন প্রাচুর্য, সম্পদ আর গৌরবের চাবি-কাঠি কিন্তু পরিবর্তে পেলেন অবহেলা, ঔদাসীন্য, উপহাস।

যন্ত্রণাময় এই বছরগুলোতে তাঁর পরিবারের নিত্য-আহার্য ছিল বাগান থেকে পাওয়া অল্প কিছু শাকসব্জী, রুটি, পেয়াজের স্যুপ নোন্তা আর দু'কোপেকের সস্তা চা। কয়েক বছর পরে মরীয়া হয়ে মিচুরিন যা কিছু ছিল, সব বিক্রী করে দিয়ে কিনলেন একটা বড় জমি। তখন ঠেলাগাড়ী ভাড়া করার মতো পয়সাও তাঁর কাছে নেই। তাই তিনি নিজে আর তাঁর পরিবারের লোকজন মিলে সাত কিলো মিটারের মতো পথ গাছপালাগুলোকে পিঠে বয়ে নিয়ে গেলেন।

থাকবার বাড়ীটাও বিক্রী করা হয়ে গেছে। তাই দু'বছর ধরে পরিবারটিকে মাথা গুজতে হ'ল ছোট্ট একখানা কুঁড়েঘরে। কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর নতুন কেনা সেই জমিটা হয়ে উঠলো একখানা জমকালো ফলের বাগান, যার কোনো জুড়ি মেলে না—সে-বাগান গাছে ভরা আর সে-সব গাছে যে-সব ফল ফলে তা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী হ'ল না। জার-শাসনের যৌন চক্রান্তে আবার মিচুরিনকে স্থানান্তরিত করতে হ'ল তাঁর নার্সারী! আর, বলাই বাহুল্য, এবারও নিজের হাতেই তাঁকে একাজ করতে হ'ল। এই স্থানান্তরের সময় তার বহুমূল্যবান সংগ্রহের বেশ বড় একটা অংশ খোয়া যায়। ফলে অনেক দিন যাবৎ ভেঙে পড়ার অবস্থায় এসে গিয়েছিলেন মিচুরিন। তবু আবার তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠে কাজ চালিয়ে গেলেন। এমনকি ১৯১৫ সালের বসন্তকালে ফোটালের জোয়ারে যখন তার বাগান ভেসে গিয়েছিল আর দুরন্ত নদীর বরফ যখন তাঁর মহামূল্যবান দু'বছরের শঙ্কর-গাছগুলোকে প্রায় চাপা দিয়েছিল তখনও তিনি হাল ছেড়ে দেন নি। সেই বছরই গরমকালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী আলেকজান্দ্রা—তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহাকারীনী।

রাশিয়াতে মিচুরিনের নাম জানতো মাত্র ডজন কয়েক লোক। কিন্তু ততদিনে তাঁর পরীক্ষাগুলো যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে বিদেশে। ১৮৯৮ সালে কানাডার কৃষি সম্মেলনে মন্তব্য করা হয়েছিল: মিচুরিনের 'উর্বর' চেরি ছাড়া ইওরোপ ও আমেরিকার আর সমস্ত চেরি ফলই সে-বছরের প্রচণ্ড হিম সহ্য করতে পারেনি—পুরো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওখানকার ফার্মের মালিকরা মিচুরিনের কাছে লিখেছিলেন: হিমসহ-ক্ষমতার দিক থেকে দেখা যাচ্ছে আপনার সৃষ্ট চেরি পৃথিবীর সেরা। আশাকরি, আপনার নতুন নতুন সাফল্য আর আবিষ্কার সম্বন্ধে আপনি আমাদের ওয়াকিবহাল রাখবেন।

মিচুরিনের গবেষণা আমেরিকাকে কৌতূহলী করেছিল। এবং এর গুরুত্ব ও সম্ভাবনা লুফ করে তুলেছিল তাকে। ১৯১৩ সালে গোটা নার্সারীটাকে একেবারে ঝাড়ে-মূলে তুলে বিক্রী করার এবং 'অকৃতজ্ঞ স্বদেশভূমি' ছেড়ে 'নতুন মুক্ত দুনিয়ায়' গিয়ে বসবাস করার জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে একটা সরকারী প্রস্তাব পেলেন মিচুরিন। 'লোভনীয়' এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল:

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনার ইচ্ছামত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার জন্ম যে-কোনো অঞ্চলে আপনাকে বিস্তীর্ণ সব বাগিচা দেওয়া হবে। আপনার প্রয়োজনমত ল্যাবরেটরী থাকবে এইসব বাগিচায়। কাজের চাহিদা অনুসারে যত সহকারী, বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য লোকজন আপনি দরকার মনে করবেন তারা সবাই থাকবে আপনার অধীনে। আমেরিকায় আসবার জন্ম একখানা গোটা জাহাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আপনার সমস্ত গাছপালা জিনিষপত্র এবং অন্যান্য যা-কিছু আপনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন, সমস্ত কিছু আপনি নিয়ে আসতে পারেন রাশিয়া থেকে। পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরণের

বীজ এনে দেওয়া হবে আপনাকে। আর আপনি নিজে মাইনে পাবেন বছরে আট হাজার ডলার।

মিচুরিন কিন্তু আমেরিকায় গেলেন না। রাশিয়ায় তাঁর জীবন কঠোর হলেও তিনি দেশেই থাকলেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি লিখলেন :

আপনাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পারার অনেকগুলোই কারণ আছে। কিন্তু প্রধান কারণটা হ'ল এই—দীর্ঘকাল যাবৎ আমি জানি যে একদেশ থেকে একটা উদ্ভিদ নিয়ে অন্যদেশে সেটাকে পুনঃরোপন করলেই জলবায়ু-অভিযোজনের (এ্যাডাপ্টেশন) বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না। আমার অনুমান, মানুষের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

আমেরিকার প্রস্তাব কিছুটা রূঢ়ভাবেই প্রত্যাখান করার পরেই মিচুরিন রাশিয়ার কর্তৃপক্ষকে গালাগাল দিলেন, সরকারী বিজ্ঞানীদের সমালোচনা করলেন এবং আমলাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালালেন।

তারপর এলো অক্টোবর বিপ্লব—১৯১৭ সাল। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে সরিয়ে রাশিয়ার বুকে কায়েম হ'ল মজদুর শ্রেণীর একনায়কত্ব। মিচুরিনের বয়স তখন ৬২।

মফঃস্বলের ছোট সহরগুলো যেমনটি হয় ঠিক তেমনটি ছিল কজলোভ—মিচুরিন যেখানে থাকতেন। অর্থ আর পদ-পদবীর আধিপত্য ছিল এখানে আর এর রীতি-রেওয়াজ সব কিছুই ছিল মান্ধাতার আমলের। অক্টোবর বিপ্লব সম্বন্ধে এখানকার ব্যবসায়ী আর আড়তদারেরা শঙ্কিত ছিল। প্রথমে কজলোভে ক্ষমতা দখল করেছিল 'সোশ্যালিষ্ট রেভলিউশনারীরা' কিন্তু পরে এল বলশেভিকরা।

সারারাত মিচুরিন নিজের কামরার মধ্যে পায়চারী করলেন। মাঝে মাঝে, থেমে, রোজনামচায় লিখলেন : আমি কাজ করবো জনসাধারণের জন্ত। আপন মনে বিড়বিড় করেন মিচুরিন : ওদের সঙ্গে যোগ দিতেই হবে আমাকে। আমার হাত দু'খানাও তো ওদেরই মতো শ্রমে কঠিন। ওরা চায় নতুন দুনিয়া—আমিও তাই চাই...

জেলা সোভিয়েত সবে তখন কজলোভে ক্ষমতা হাতে নিয়েছে। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় তখনও গুলীগোলা বন্ধ হয়নি। জেলা-কমিটির বলশেভিকদের অনেকেই মিচুরিনকে চিনতেন। কিন্তু জলজলে চোখওয়ালা, রোগা পাতলা এই বৃদ্ধ যে কি চান সেটা তাঁরা প্রথমে বুঝতে পারেননি। বলশেভিকরা ক্ষমতা হাতে নেবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিচুরিন গিয়ে বললেন : আমি নতুন রাষ্ট্রক্ষমতার জন্য কাজ করতে চাই।

এটা করা ছিল তাঁর পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। জারতন্ত্র আর পুঁজিবাদের প্রতি মিচুরিনের মতো এতো গভীর আর সচেতন ঘৃণা বোধহয় তখনকার আর কোনো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর ছিল না। কারণ এই প্রাক্তন শাসকরা তাঁর 'বহিঃপ্রকৃতিকে রূপান্তরিত করবার' স্বপ্নটাকে ছোট্ট এক টুকরো জমিতে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। এবং তাঁর আবিষ্কারে জনসাধারণকে শরিক হতে দেয় নি। শ্রমের মূল্য নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধী করেছিলেন মিচুরিন। আর তাই শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব। রাশিয়া জনগণ বিপ্লব সফল করেছে বহু দুঃখ দুর্দশা সহ্য করে। মিচুরিন বিজ্ঞানের সৃজনশীল শ্রমে ব্যাপৃত হবার অধিকারের জন্ত বহু দুঃখ ক্লেশ ভোগ করেছেন। আর এইজন্তই এতো সহজে তিনি বিপ্লবে সাথে, মেহনতী জনতার সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন।

বিপ্লবের গোড়ার দিকে অনেকে অবশ্য মনে করতো—বিপ্লব মানে কেবল ধ্বংস। কিন্তু প্রথম ক'দিনের অপরিহার্য ধ্বংস সত্ত্বেও মিচুরিন সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন বিপ্লবকে। বিপ্লবের সৃজনশীল উপাদানটিকে তিনি দেখতে পেরেছিলেন—বিপ্লব সৃজনশীল কাজের যে বিরাট সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দেয় সেটা তিনি উপলব্ধী করতে পেরেছিলেন। ধ্বংসে তিনি ভয়ও পাননি। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁকে আর তাঁর আবিষ্কারগুলোকে রাশিয়ার ব্যাপক সাধারণ মানুষদের থেকে পৃথক করে রেখেছিল যে পাঁচিলটা, সেটাকেই ভেঙে ফেলছিল এই বিপ্লবী ধ্বংসের প্রক্রিয়া।

প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কজলোভ বিপ্লবী কমিটিকে মিচুরিন দরাজ হাতে দিতে চাইলেন নিজের কর্মক্ষমতা, জ্ঞান এবং তাঁর নতুন নতুন উদ্ভিদের গোটা মূল্যবান সংগ্রহটা, যাতে তিনি নিয়োগ করেছেন চল্লিশ বছরের অমানুষিক শ্রম। বিপ্লবের আগে 'দিন আনি দিন খাই' করে জীবনযাত্রা চালিয়ে অতি অপরিহার্য সব জিনিষ থেকেও তিনি নিজের পরিবারকে বঞ্চিত রেখেছেন। এতে তিনি কষ্ট পেতেন। কিন্তু সেটা এই ভেবে যে—"এ সমস্ত কিছুই বৃথা হচ্ছে।" এবং আরও বেশি কষ্ট পেতেন এই কারণে যে—"তাঁর এতসব ত্যাগ সহ্য করে তিনি যে গবেষণাগুলো করছেন তার ফল তাঁর দেশ পেতে পারছে না।'

'নতুন জীবন' সম্বন্ধে মিচুরিনের আশার যৌক্তিকতা অচিরেই প্রমাণিত হ'ল। ১৯১৮ সালে কৃষি জন-কমিশারিয়েত মিচুরিনের নার্সারীটিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করলো। শুধু তাই নয়, তাঁর নামেই নাম রাখলো নার্সারীটির। জনসাধারণ থেকে মিচুরিনকে একলা পৃথক করে রেখেছিল যে ভীষণ পাঁচিলটা, সেটা ভেঙে পড়লে। গোটা দেশটাই এসে গেল তাঁর কাছে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলোর হাজার হাজার কৃষক প্রতিনিধি নিজেরাই সবকিছু দেখবার জন্ত এলেন তাঁর নার্সারীতে।

এর পরের ইতিহাস—খ্যাতি, স্বীকৃতি ও বিপুল কর্মোদ্যমের। নতুন নতুন জাতের উদ্ভিদ গড়ে তোলার কাজে অসাধারণ অবদানের জন্ত মিচুরিনকে দেওয়া হ'ল 'লেনিন-অর্ডার'। তাঁর জন্মভূমি—সহর কজলোভের নতুন নাম রাখা হ'ল—মিচুরিনস্কি। আর এই মিচুরিনস্কিই হয়ে উঠেছিল তাঁর বাকী জীবনের সদর কার্যালয়, যার মূলমন্ত্র ছিল :

প্রকৃতির অনুগ্রহের আশায় অপেক্ষা করা নয়, আমাদের আদায় করে নিতে হবে তার কাছ থেকে।

●[ অধ্যাপক ব্রিজম্যান একজন নোবেল-বিজয়ী পদার্থ-বিজ্ঞানী। বিদগ্ধ সমাজে 'চিন্তাশীল দার্শনিক' হিসেবেও যথেষ্ট পরিচিত। তাঁর সমাজ-চিন্তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া হ'ল এখানে। মতামতের ভার আমরা পাঠক-পাঠিকাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।—সঃ মঃ বীঃ ]●

# সমাজ প্রসঙ্গে

পি. ডব্লু. ব্রিজম্যান

### বিজ্ঞান ও সমাজ

মননশীল জীবনের এমন একটি দিক রয়েছে এবং সেই দিকটির প্রতি এমন একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে যা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা দরকার। গুরুত্বটা দেওয়া দরকার এই জন্য যে—বিষয়টা সম্পূর্ণ নতুন এবং সমাজের সামনে এই ধরণের সমস্যার কোনো নজিরও নেই যার অভিজ্ঞতা দিয়ে এই নতুন অবস্থার সাথে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে। এই নতুন বিষয়টি হ'ল সমাজে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর স্থান নিয়ে।

মানব জাতির ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে বিজ্ঞানীর আবির্ভাব সাম্প্রতিক কালে ঘটেছে। বিজ্ঞানী হলেন একটু আলাদা জাতের মানুষ। তিনি এমন কিছুতে আকর্ষণ বোধ করেন, সাধারণ মানুষের কাছে যার আবেদন নেই বললেই চলে। বস্তুজগতকে তিনি বুঝতে চান শুধুমাত্র বোঝার জন্যই—তার কোনো ব্যবহারিক মূল্য থাকুক আর নাই থাকুক। সত্যি কথা বলতে কি, কেবল অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক-কালেই সমাজের এমন কিছু বিকাশ ঘটেছে যাতে করে বিজ্ঞানী নিজেকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছেন। এবং এই 'নিজেকে খুঁজে পাওয়ার' মাধ্যমে তিনি একটা নতুন শ্রেয় জিনিষের সন্ধান পেয়েছেন—কেবল জানার জন্যই সত্যকে জানা।

এই রকম একটা শ্রেয় জিনিষের আবিষ্কারের পর, স্বভাবতই, বিজ্ঞানী এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যরা সমাজের ওপরও একটা মানদণ্ড আরোপ করতে চাইবেন। এই মানদণ্ডটা হ'ল—সমাজটা ভালো না খারাপ। বস্তুজগতের রহস্য বোঝার মতো সুযোগ এতে আছে কি নেই এবং এই বোঝার প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হচ্ছে কি না : এ সম্পর্কে সমাজকে যদি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হয় তাহলে স্বয়ং বিজ্ঞানীকেই 'বোঝার জন্যই বোঝা'র আদর্শ এবং জ্ঞানের মর্যাদাকে উঁচুতে তুলে ধরতে হবে। এটা অপরিহার্য, কারণ একমাত্র তিনিই সমগ্র সমস্যাটা উপলব্ধি করার অবস্থায় রয়েছেন। পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিবর্তন দরকার। এবং এই পরিবর্তন ঘটাতে হলে যথেষ্ঠ সাবধানে চিন্তা করা প্রয়োজন। এখন, ঘটনা হ'ল, সাধারণ মানুষ সব চাইতে যেটা অপছন্দ করে তা হ'ল—মাথা ঘামানোর ব্যাপারটা। অন্যদিকে, বিজ্ঞানী এবং তাঁরই মতো মানসিকতা সম্পন্ন অন্যরা হলেন ঠিক এর বিপরীত। মাথা ঘামানোর কাজটাকেই তাঁরা সব চাইতে বেশি ভালোবাসেন। এখানেই দুটো বিপরীত মানসিকতার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠছে। তাহলে, এই নতুন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানী কিভাবে আচরণ করবেন? প্রথমত তিনি, সত্যি কথা বলতে কি, নিজের স্বার্থেই—অ-বিজ্ঞানী ব্যক্তিদের বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন, যাতে তারা বুঝতে পারে বিজ্ঞান কি এবং কেন। যে বিজ্ঞানী এই ভাবে বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে সমাজের অন্যান্য মানুষদের শিক্ষিত করে তুলছেন তিনি ন্যায্যভাবেই দাবি করতে পারেন যে এর ভেতর দিয়ে তিনি 'সমাজ থেকে যত নিচ্ছেন তার থেকে বেশি সমাজকে ফিরিয়ে দেবার' কাজটা সম্পন্ন করছেন। এটা অবশ্য কোনো কর্তব্যবোধ নয়, নিজেরই ওপর চাপানো একটা দায় মাত্র। কারণ, তাঁর নিজের মানদণ্ড অনুযায়ী, সমাজ বিজ্ঞানের মূল্য যতো বেশি করে বুঝতে পারবে, ততই বেশি উন্নত করতে পারবে নিজেকে। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষিত করার কাজে একজন বিজ্ঞানী যতটা সময় ব্যয় করবেন তা সব বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে এক না হওয়াই স্বাভাবিক। কিছু বিজ্ঞানী নিজেদের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম খুব বেশি বিসর্জন না দিয়েও এই কাজটা কার্যকরী ভাবে করতে পারেন। আবার অনেকে এই কাজটাকেই তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারেন। বস্তুত এমনও হতে পারে যে একজন বিজ্ঞানী এ ধরণের কোনো শিক্ষা অভিযানে অংশ না নিয়েও 'সমাজ থেকে যত নিয়েছেন' তার থেকে বেশি ফিরিয়ে দিতে পারছেন।

সমাজের জন্য একজন বিজ্ঞানী কতখানি কাজ করবেন, তার কোনো বাঁধাধরা পরিমাণ না থাকলেও, আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর

রচনাটি The Way Things Are বইটির থেকে নেওয়া। অনুবাদ করেছেন অনল রায়।

কাছে একটা ন্যূনতম প্রত্যাশা স্থির করা সম্ভব। গবেষণার যে ফলাফলগুলো জ্ঞানের সাধারণ বিকাশে সহায়ক হতে পারতো—বিজ্ঞানী যদি সেগুলোকে প্রকাশ না করেন, তবে তাঁর পরিশ্রমের কোনো মূল্যই থাকে না। কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানী তাঁর 'গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করার' এই ন্যূনতম সামাজিক প্রত্যাশা পালন করছেন কি না সেটা সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। আর তা যদি তিনি মোটামুটিভাবে করেই থাকেন তাহ'লে সেক্ষেত্রে তাঁর 'সমাজকে ফেরৎ দেবার' কাজটাও নিজের থেকে নিষ্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট নয়, কারণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সব ফলাফলের মান এক নয় এবং শুধু পাতার সংখ্যা দিয়ে তাকে বিচার করা যায় না। উঁচু মানের বিজ্ঞানী যেমন রয়েছেন, আবার তেমনি নীচু ধাপের বিজ্ঞানীরাও রয়েছেন। একটা যথার্থ শিক্ষিত সমাজে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা যে অবদান দেন তার মূল্য দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের অবদানের চাইতে অনেক বেশি। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রে 'সামাজিক ঋণ'টাও সহজে পরিশোধ হয়ে যায়। আমার মনে হয়, এই পরিস্থিতিতে সমস্যাটা সমাধান করার মতো কোনো চরম পদ্ধতি নেই। যাই হোক, আমার বিশ্বাস—এই সমস্যাটাকে বিজ্ঞানীদের ওপরই ছেড়ে দেওয়াটা সমাজের দিক থেকে উচিত হবে। কারণ, যে কোনো বিজ্ঞানীই ভালো বিজ্ঞানী হতে চান, নিজের সহকর্মীদের কাছে দক্ষ প্রমাণিত হতে চান। তাছাড়া, একজন বিজ্ঞানীর কাজের মূল্য, তাঁর সহ-বিজ্ঞানীদের যোগ্য বিচারে যাচাই হওয়াটাই ভালো।

## সামাজিক বশ্যতা ও স্বীকৃতি

ধরা যাক, সমাজ একজন ব্যক্তির কাছে এমন একটা দাবি করে বসলো যা তার দৃষ্টিতে অসঙ্গত। এখন, সে যদি এই দাবি পূরণ করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে প্রশ্ন হ'ল—এ অবস্থায় তার করণীয় কি? ব্যক্তির কাছে সমাজের অর্থনৈতিক দাবি এবং এর থেকেও সূক্ষ্ম সামাজিক চাপ যা কিনা ক্ষেত্র বিশেষে 'বিবেকের' প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে, এ দুটোর মধ্যে কোনো পরিষ্কার সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্রে সে সমাজের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে কিনা তা নির্ভর করছে—এই বশ্যতার জন্য কোন মূল্য তাকে দিতে হবে; অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার না করাটা সেই ক্ষেত্রে তার কাছে লাভজনক হবে কি না। অবশ্য বশ্যতা স্বীকার না করাটা চূড়ান্ত ক্ষেত্রে শহীদ হওয়ার রূপও নিতে পারে। আমার কাছে, শহীদ হওয়ার ব্যাপারটা নেহাৎই একটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। যদি আমার কোনো প্রতিবেশী 'সে যা বিশ্বাস করে, আমিও তাই বিশ্বাস করি' - এই কথাটা বলাবার জন্য আমার ওপর বল প্রয়োগ করে তাহলে আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও কথাটা বলতে রাজী আছি। বরং আমি এইভেবে ওকে মনে মনে ঘৃণা করবো যে ও একটা আস্ত বুদ্ধু। ও ভাবছে—আমি মুখে বললেই বাস্তব ঘটনা এবং আমার সত্যিকারের বিশ্বাস পাল্টে যাবে। গ্যালিলিওর অবস্থায় পড়লে আমি ঠিক তাঁর মতোই করতাম। আমার মনে হয়, যারা শহীদ হতে চায় বা অন্যদের শহীদ হওয়াটাকে যারা প্রশংসার চোখে দেখে, তারা 'বিমূর্ত' নীতিবোধের একটা স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে'—এই প্লেটোনিক ধারণায় বিশ্বাসী।

সৌভাগ্যবশত, বশ্যতার প্রশ্নটা (গেস্টাপোরা* যেখানে রয়েছে সেখানকার কথা বাদ দিলে) আজকাল আর শহীদ হবার মতো চূড়ান্ত অবস্থায় যায় না। তবুও, অসংখ্য উদাহরণ অবশ্যই থাকতে বাধ্য যেখানে একজন ব্যক্তি-মানুষ বাইরে বশ্যতা দেখালেও নিজের ভেতরে কিন্তু মেনে নিচ্ছে না।—আমি নিজের দিকে তাকিয়েই এ কথাটা বলতে পারি। ব্যক্তি-মানুষটির কাছে এখন প্রশ্ন হ'ল, তার এই 'মেনে না নেওয়ার' আভ্যন্তরীণ মনোভাবটা কি ধরণের রূপ নেবে? একটা চরম সীমায় এটা সমাজের বিরুদ্ধে তিক্ততার জন্ম দিতে পারে, যার থেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবার এবং নিরুদ্ধ অসহযোগিতার প্রবণতা আসা অস্বাভাবিক নয়। আবার এর থেকে সক্রিয়ভাবে অন্তর্ঘাত করার মনোভাবও জন্ম নিতে পারে। এখন কথা হ'ল, একজন সাধারণ মানুষের কাছে তিক্ততা একটা সুস্থ মনোভাব হতে পারে না। বস্তুত আমার মতে, একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেটা সব চাইতে দরকারী তা হ'ল তিক্ততা এড়িয়ে চলা। বুদ্ধিমান মানুষ সামাজিক দাবি অস্বীকারের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তিক্ততার থেকে নরম কোনো পথে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেন। যিনি সমাজের অসঙ্গত দাবি মেনে নিতে পারছেন না, তাঁর পক্ষে আইনের কাঠামোর মধ্যদিয়ে সামাজিক দাবিগুলো পাল্টানোর চেষ্টা করা সর্বতোভাবে সম্ভব। জনমত এরকম একটা কাজকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এবং এরকম একজন ব্যক্তিকে সম্মানের চোখে দেখে। আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে কোনো সামাজিক দাবিকে অস্বীকার করলে জনমত কখনো বাধা দেয় না। এই সম্ভাব্য পথগুলো খোলা থাকলে সাধারণ মানুষ আর সমাজের কোনো দাবি মেনে নেওয়াটাকে এমন কিছু বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করবে না—যার জন্য লড়াই করা যেতে পারে বা মেজাজ খারাপ করার ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। আর তাই সে শুধু শুধু চিৎকার-চেঁচামেচি না করে, তার কাছে যা প্রত্যাশা করা হচ্ছে, বাইরে সেরকমই আচরণ করবে।

---

*ফ্যাসিস্ট গুপ্ত পুলিশ

আমাদের দেশের সামাজিক আইনের বহু অনুচ্ছেদই আমার ঠিক বলে মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, এর মধ্যে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষদের ভালো করবার জন্য একটা দয়ার্দ্র মনোভাবের প্রতিফলন রয়েছে। যে ব্যক্তিটি মনে করছেন যে এ ধরণের আইনটা পুরোপুরি ভুল এবং তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধী, তিনিও কিন্তু এ ধরণের আইন বিনা তিক্ততায় সহ্য করতে পারছেন এবং করছেনও। এ জাতীয় আইনের প্রতি এই সহনশীলতার মনোভাবকে, আমার মতে, আমাদের দেশের একটা বৈশিষ্ট্যই বলা যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে, এরকম সহনশীলতার ফল বাঞ্ছনীয় হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

ট্যাক্স

ট্যাক্স হ'ল : বাজারের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থেকে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে বস্তুগত লেন-দেন হয়, সেই প্রক্রিয়ার ত্রুটি সংশোধনের একটা উপায়? বাজার যেহেতু সমাজের সব প্রয়োজনগুলোর পরিপূরণ করতে পারে না তাই এই সংশোধনটা দরকার হয়ে পড়ে। এখন যে কোনো মানবিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে যদিও ত্রুটি সংশোধনটা দরকারী, তবু লেন-দেনের পদ্ধতিটাকে যদি দক্ষতার সাথে ঠিক করা যায় তবে এই ত্রুটিটাকেও কমানো সম্ভব। বস্তুত সব চাইতে বেশি আয়ের ক্ষেত্রে এই ত্রুটির পরিমাণটা এতোই বেশি যে এটা প্রায় আয়টারই সমান হয়ে পড়ে। আর এখানটাতেই রীতিমতো সন্দেহ জাগে—ত্রুটি সংশোধনের প্রচলিত অর্থনৈতিক পদ্ধতিটা (কম করে বলতে গেলে) আনাড়ির মতো ঠিক করা হয়েছে। একজন পদার্থ-বিজ্ঞানী যদি আবিষ্কার করে যে তার গণনার মধ্যে ত্রুটির পরিমাণটা ৯২% এর মতো—উঁচু আয়ের ক্ষেত্রে যেটা অবধারিতভাবেই ঘটে থাকে তাহলে এই মর্মন্তুদ আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়!

যাঁর আয় খুব বেশি ট্যাক্সের ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ সুবিধে দেওয়া উচিত। সাধারণত তিনি নিজের জীবনযাত্রার জন্য তাঁর পুরো আয়টা ব্যয় করেন না বা করতেও পারেন না। আর তাই, তাঁর সঞ্চিত টাকাটা পুঁজির আকারেই ফিরে আসে। এতে সমাজেরই সুবিধে। সুতরাং সাধারণ আয়ের তুলনায় যাঁদের আয় অনেক বেশি, তাঁদের ক্ষেত্রে ট্যাক্সের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে কম হওয়া উচিত।

ট্যাক্স ঠিক করার আর একটা পদ্ধতি রয়েছে যা ওপরের আলোচনার 'quid pro quo'*-নীতির সাথে খাপ খায় না। এই পদ্ধতিটা হ'ল—গ্রেজুয়েটেড ইনকাম ট্যাক্স। ষোড়শ সংশোধনের (16th amendment) পর থেকে এটা আমাদের দেশের জনমানসে এমনভাবে গেড়ে বসেছে যে এর সম্পর্কে কিছু বলা আর না বলা দু'ই সমান। তবু কয়েকটা মন্তব্য করার বিলাসীতা থেকে আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারছিনা। প্রথমত ট্যাক্সের ব্যাপারে এরকম একটা নীতিকে মেনে নেওয়াটা 'কমিউনিস্ট ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর আদর্শকে মেনে নেবার দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়া হবে। আর ওই পথে একবার পা বাড়ালেই মার্কস-এর তত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণ না করা অব্দি থামার উপায় নেই। গ্রেজুয়েটেড ইনকাম ট্যাক্সের পিছনে যে নীতিটা রয়েছে তা হ'ল—"যার যা সামর্থ সেই অনুসারে সে ট্যাক্স দেবে।" এখানে এই "সামর্থ"টাকে মাপা হচ্ছে,—ট্যাক্স দিতে গিয়ে যে পরিমাণ বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হবে, তাই দিয়ে। আসলে এই প্রচ্ছন্ন নীতিটা হল সাম্যবাদী আদর্শ, যেখানে ভোগ্যবস্তু তৈরী করার ক্ষেত্রে কোনো অবদান থাক আর নাই থাক—প্রত্যেকেরই বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যের সমান অংশ পাওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। আর এই আদর্শের প্রয়োজনে গরীবদের দেবার জন্য, ধনীদের সম্পত্তি যদি কেড়েও নিতে হয় তাতেও আপত্তির কিছু নেই। বস্তুত এ ধরণের ট্যাক্সের যথার্থতার স্বপক্ষে হামেশাই এই জাতীয় যুক্তি শুনতে হয় "সামাজিকভাবে কাম্য বস্তুগুলোর জন্য তো কোনো না কোনোভাবে দাম দিতে হবে,—আর তাহলে কোত্থেকেই বা আসবে এই টাকাটা?" আগে কিন্তু আমরা এই ভাবেই চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিলাম, চুরি ছাড়া যদি পাওয়ার উপায় না থাকে তবে অভাবের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে।

গোটা ব্যাপারটাই অন্যায়, অসঙ্গত, অ-ন্যায্য। আর এটাই আমাকে সব চাইতে বেশি পীড়া দিচ্ছে। আমি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করতে পারি না—যেহেতু আমার প্রতিবেশীর প্রয়োজনের তুলনায় আমরা প্রয়োজনটা অনেক বেশি সুতরাং সে আমাকে তার সম্পত্তির কিছুটা অংশ দিয়ে দেবে! তাহলে সমাজই বা কেন আমাকে বাধ্য করবে—আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাকে দিয়ে দিতে? সমাজের প্রয়োজন আমার চাইতে বেশি, বলে তাই? কিন্তু সমাজটা আমার সমস্ত প্রতিবেশীদের নিয়েই তো তৈরী।

ট্যাক্স দেবার সময় প্রতিবারই আমি সেই ভোটাধিকারের সমর্থক জঙ্গী বৃদ্ধা মহিলাটির মতো শিউরে উঠি, যাঁকে শুধু 'নারী' হবার কারণে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে! আমি অনুভব করতে পারি—শোষণ করা হচ্ছে আমাকে, কারণ আমার 'অপরাধ' হ'ল, আমি অন্যদের চাইতে বেশি দক্ষ এবং পরিশ্রমী!

সমাজ প্রসঙ্গে/উনপঞ্চাশ

---

* কিছুর বিনিময়ে বা পরিবর্তে আর কিছু দেওয়া।

## CSIR বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার

# বিজ্ঞান নীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব

[ সারা ভারত বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা (ASWI, স্থাপিত-১৯৪৭) ও তার প্রধান শাখা CSIR বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার (CSIR-SWA, স্থাপিত-১৯৬৯) দুটো প্রধান উদ্দেশ্যের একটি হ'ল—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যান সাধনে বিজ্ঞানের সবচেয়ে কার্যকরী ব্যবহার। বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্বকে প্রাথমিক নীতিগত ভিত্তি হিসেবে গ্রহন করেই "বিজ্ঞান কর্মীদের বিশ্বসংস্থা"—ASWI যার অন্তর্ভুক্ত—১৯৪৬ সালে জন্ম গ্রহণ করে। এবং সেই আদর্শকে অনুসরণ করেই ভারতীয় সংস্থা ১৯৪৭ সাল থেকে এই দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি সঠিক নীতি প্রনয়নের জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের পক্ষে পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত এতটা পরিপক্ক হয়ে ওঠে নি, যাতে তাঁরা বিজ্ঞান সম্পর্কিত নীতির ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা প্রকাশ করতে পারেন। এই অবস্থায়, ASWI-এর সর্ববৃহৎ শাখা CSIR-SWA যারা জামসেদপুরে ৬-৭ জুলাই, ১৯৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের পঞ্চবার্ষিক কাউন্সিল মিটিং-এ নিম্নলিখিত প্রস্তাবের মাধ্যমে দেশের বিজ্ঞান সম্পর্কিত নীতির ব্যাপারে একটা স্পষ্ট ঘোষণা উপস্থিত করেছে, তার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। দলিলটাকে মনোযোগ দিয়ে পড়া ও ব্যাপকভাবে সেটার উপর বিতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ]

স্বাধীনতা ও তার পূর্ববর্তী কাল থেকে আমাদের জাতীয় নেতারা খুব সঠিকভাবেই জাতীয় উন্নতি ও জনসাধারণের মুক্তির জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার (S & T) গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে আসছিলেন। বিশেষ করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উৎসাহব্যাঞ্জক নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা প্রভূত দৃষ্টি আকর্ষণ ও সুপ্রচুর আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিল। বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R & D) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত ২৫ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে অনেক, এবং তা এখন মোট জাতীয় উৎপাদনের .(GNP) শতকরা প্রায় ৫ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

এইসব কিছুই এই ভিত্তির উপর করা হয়েছিল যে (ক) বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার সম্প্রসারণের ফলে সাধারণ মানুষের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আসবে, তাঁরা যুক্তিবাদী ও উন্নয়নমুখী হয়ে উঠবেন এবং একই সময়ে (খ) বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে জিনিষপত্র ও কারিগরি জ্ঞান সরবরাহ করবে।

দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব আশা পূর্ণ হয়নি। যেভাবে আমরা বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণা চালিয়েছি, তাতে সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী এবং নতুন নতুন আবিষ্কার ও যুক্তিবোধের বার্তা পৌঁছে দিতে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি। দেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সম্ভাবনা ও অফুরন্ত শক্তির বিষয়ে আগের মতোই অজ্ঞ থেকে গেছেন। এর প্রধান কারণ সাধারণ মানুষের জীবন ও সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার সাথে কোনোরকম যোগাযোগহীন উচ্চমার্গীয় (এলিটিষ্ট) প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। এমনকি পেশাদার বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও আমাদের বিজ্ঞান পরিচালনা পদ্ধতি যে বিজ্ঞানের "মেজাজ" সঞ্চারিত করতে পারে নি—অযৌক্তিক মনোভাব এবং মূল্যবোধ, সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রতিযোগিতা এবং অন্তহীন কলহ ও চক্রান্ত, এসবই তার সাক্ষ্য দেয়।

বিজ্ঞান ও কারিগরি শাখার বাস্তব অবদানের দিক থেকেও চিত্রটি একই রকম নৈরাশ্যজনক। আসলে আমাদের দেশের সম্পূর্ণ শিল্পব্যবস্থাটাই দাঁড়িয়ে আছে বৈদেশিক কারিগরিজ্ঞান ও বিদেশী জিনিষপত্রের উপর ভিত্তি করে। এমনকি সাধারণ পানীয় (soft drinks), চুইংগাম ও মহিলাদের অন্তর্বাসের মতো তুচ্ছ জিনিষ তৈরী করতেও প্রায়ই বিদেশী 'সহযোগিতা' নেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশের কৃষিও সম্পূর্ণভাবে বিদেশীদের মুঠির মধ্যে এসে গেছে। কৃষিতে যে যান্ত্রিকীকরণ, আধুনিক সার ও কীটনাশক ওষুধের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তা শেষ অব্দি বিদেশী 'সাহায্য' ও 'সহায়তার' উপর নির্ভরশীল। কারণ যা-ই হোক না কেন, আমাদের নিজেদের কারিগরিজ্ঞান কদাচিৎ কোথাও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তবে কারণ অনুসন্ধানের জন্য খুব বেশি খোঁজাখুজিরও দরকার নেই। ডাঃ কে. কে. সুব্রহ্মনিয়ামই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে

ASWI-এর সভাপতি ডঃ কে. আর. ভট্টাচার্য এই দলিলটি 'বীক্ষণে' প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। আমরা তার পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করলাম - সঃ মঃ বীঃ

'সহযোগিতা' এবং বিদেশী নামের মার্কা থাকলে একটা শিল্প খুব সহজেই মূলধন জোগাড় করতে পারে, লাইসেন্স পেয়ে যায়, এবং বাজারের উপর একাধিপত্য স্থাপন করতে পারে। ভূতপূর্ব একজন আই. এ. এস. সেক্রেটারী (শ্রীকে. কে. দাশ) সম্প্রতি প্রকাশ করে দিয়েছেন যে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক যন্ত্রটাই দেশী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এবং 'সাহায্য' ও 'সহায়তা'র স্বপক্ষে কাজ করে চলেছে। কারণ এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের ভাগ্যেই বেশ মোটা কিছু জুটে যায়

বিদেশী 'সহযোগিতা' ( এবং 'সাহায্য' ও বিনিয়োগ ) কি সর্বনাশ করছে তা এখন কয়েকটি ( বিশেষ করে সর্দার প্যাটেল ইনস্টিট্যুট অফ ইকনমিক অ্যাণ্ড সোশ্যাল রিচার্স-এর ডঃ কে. কে. সুব্রহ্মনিয়ামের ) সযত্ন সমীক্ষা থেকে ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এটা দেখান হয়েছে যে এই 'সহযোগিতা' শুধু দেশ থেকে অত্যাধিক হারে সম্পদ বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের শিল্পে দক্ষতার অভাব সৃষ্টি করছে তাই নয়, এটা স্থানীয় শিল্পের বিকাশে এবং দেশীয় কারিগরিবিদ্যার ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে, এবং বিদেশীদের উপর চির নির্ভরশীলতার সৃষ্টি করছে।

সম্পূর্ণ ক্ষতিতে ক্রমবর্দ্ধমান হারে রপ্তানী করে এই বৈদেশিক নির্ভরশীলতার দাম দিতে হচ্ছে, যার ফলে দেশ থেকে ধারাবাহিকভাবে বিপুল সম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশীয় সম্পদকে ক্রমশ বেশি বেশি করে রপ্তানী বাণিজ্যের উপকাঠামো তৈরীর কাজেও ঘুরিয়ে দিতে হচ্ছে। বিদেশীদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধা এই পরিকল্পনার ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সমাজের উঁচু অংশের কিছু স্বল্প সংখ্যক মানুষ লাভবান হচ্ছেন, কিন্তু দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যা ( বিশেষত গ্রামের মানুষ ) এখনও দারিদ্র, নিরক্ষতা, অপরিচ্ছন্নতা ও নিরাশার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। দারিদ্র সম্বন্ধে সাম্প্রতিক নানা সমীক্ষা আমাদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ছোট ছোট দ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই বিদেশ এবং বিলাসদ্রব্যমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও তারই অংশ হিসেবে লাভ ও সুযোগ-সুবিধার জন্য চারিদিকের এক উন্মত্ততা, সমগ্র সমাজ জুড়ে ভয়াবহ রকমের নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দিচ্ছে। যে দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, ভেজাল ও যেন-তেন প্রকারে ধনী হবার চেষ্টা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার উৎস শেষ পর্যন্ত এই বিকৃত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে পাওয়া যাবে।

**স্পষ্টতই কোনো একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। স্পষ্টতই স্বয়ংভরতার একটা সুস্পষ্ট, সচেতন নীতি ছাড়া, শুধুমাত্র**

**"ভারতে বিদেশী প্রযুক্তিবিদ নিষ্প্রয়োজন"**

"কারিগরি ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে আমরা বৈদেশিক সহযোগিতার বিরোধী"। পারমানবিক বিস্ফোরণ থেকে সেতু নির্মান, সব ধরণের কাজে চূড়ান্ত কারিগরি দক্ষতার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির রূপায়ণে ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের ডাক পড়ে না, তাঁদের কপালে জোটে উপেক্ষা। বিদেশী প্রযুক্তিবিদ ও ইনজিনিয়ারদের ওপরই কেন্দ্রীয় সরকারের আস্থা বেশি।—ডঃ জয়কৃষ্ণ, ইনসটিটিউশন অব ইনজিনিয়ারস (ভারত)-এর সভাপতি এবং রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

পঞ্চম যোজনায় সালেং, হসপেট ও বিশাখাপত্তনমে যে ইস্পাত কারখানাগুলি স্থাপিত হবে, তার মধ্যে বৈদেশিক কারিগরি সহযোগিতা নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপভাবে সার কারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি গঠনের জন্য ভারতীয় কারিগরি জ্ঞানই যথেষ্ঠ।—ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য, ইনসটিটিউশন অব ইনজিনিয়ারস (ভারত)-এর পঃ বঃ শাখার সভাপতি ও রাজ্য যোজনা পর্ষদের সদস্য।

॥ সূত্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫।৮।৭৪ ॥

**বিজ্ঞান অথবা একটা গবেষণাগার চালু করা নিস্ফল হয়ে যায় এবং তা জাতীয় উন্নয়নের কোনো কাজেই লাগে না।** বিজ্ঞানের পিছনে একটা পরিষ্কার নিশানা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকতেই হবে।

সুতরাং আমরা যদি চাই যে আমাদের বিজ্ঞান তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করুক তবে স্ব-নির্ভরতাই মূলকথা হিসেবে বেরিয়ে আসছে।

বস্তুত স্ব-নির্ভরতার প্রয়োজন ক্রমশ আরও বেশি বেশি করে এখন বোঝা যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি গিরি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবৃন্দ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ্ থেকে শুরু করে অনেক জাতীয় নেতাই একটা স্ব-নির্ভরতার নীতি নির্দ্ধারণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করছেন। জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি সংস্থা (NSCT) বৈদেশিক 'সহযোগিতা'কে বিগত দিনের একটা অন্যতম ভ্রান্তি বলে চিহ্নিত করেছেন! লোকসভায় 'পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি'ও কদিন আগে বিদেশী 'সহায়তা'র উপর আমাদের সম্পূর্ণ নিভরশীলতাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তো আর বিদেশী 'সহযোগিতা' চলে যাবে না বা আমরা স্ব-নির্ভর হয়ে উঠব না। যার যা ইচ্ছাই

থাকুক না কেন, শেষপর্যন্ত জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যাপারে ধারণা এবং লক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই একটা অথবা অন্যটা থাকবে।

বিদেশী শিক্ষা ও চিন্তাধারার প্রতি 'আমাদের নির্বোধ' আসক্তিই বোধহয় জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে। উন্নতি বলতে আমরা বুঝেছি শুধু বিদ্যুৎ, সার, ইস্পাত, রেডিও, গাড়ী, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর—অর্থাৎ, ভারতে পশ্চিমের ধনী ভোগ্যদ্রব্য কেন্দ্রীক সমাজের একটি অবিকল প্রতিমূর্তি তৈরী করা। স্বভাবতই এটা ছোট দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে ; এবং স্বভাবতই আমাদের 'সাহায্য' ও 'সহযোগিতা'র দ্বারস্থ হতে হয়েছে। এর কারণটা খুবই সহজ—সমমানের অর্থ ও কারিগরীবিদ্যা আমাদের ছিল না। কিন্তু একবার যখন আমরা এই 'ট্রোজান ঘোড়া' নিয়ে এলাম, তখন তার থেকে পালাবার কোনো পথ ছিল না। যত বেশি করে আমরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, নিছক তার সুদ মেটাতেই আমাদের ততো বেশি 'সাহায্যে'র প্রয়োজন বেড়েছে।

এটা পরিষ্কার যে সীমাহীন দারিদ্র এবং কোটি কোটি বেকার ও অর্ধ-বেকার অধ্যুষিত আমাদের মতো এমন একটি বিশাল দেশের উন্নতির জন্য একটা পুরোপুরি অন্য দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে আমাদের মূলধন-কেন্দ্রীক, অভিজাত (sophisticated), কেন্দ্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দরকার নেই, প্রয়োজন হচ্ছে শ্রম-কেন্দ্রীক ছোট ছোট শিল্পকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা বিলাসদ্রব্য চাই না, চাই যা সাধারণ মানুষের কাজে লাগে। আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাকে, উচ্চশিক্ষাকে নয় ; সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষাকে, আধুনিক বিদেশী ওষুধকে নয়। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, উন্নতি বলতে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে বঞ্চিত জনসাধারণের কল্যাণসাধন পরিসংখ্যানগত উন্নতি বা বিলাসের ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে নয়।

এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বিজ্ঞানকে সামনে নিয়ে আসবে। 'সাহায্য' ও 'সহযোগিতা'র প্রয়োজন উধাও হয়ে যাবে এবং সর্বপ্রথম স্বদেশী বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার জরুরী দাবি উঠবে। এবং এই দাবিই (যা এখন একেবারেই নেই) স্বদেশী বিজ্ঞানে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে। এবং এটাই আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুতি পূরণে সমর্থ হবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে এটাই হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞান নীতির সারবস্তু।

ইতিমধ্যে সাধারণভাবে আমাদের বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বিশেষ করে CSIR আর-কে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে পুনর্গঠিত করতে হবে :

১) স্ব-নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং জাতীয় গৌরবই হবে তাদের সমস্ত নীতির মূল দিক। তাদেরকে সচেতন ও সাধারণভাবে এই নীতিটাকে উৎসাহ দিতে যেতে হবে যে—এমন কোনো জিনিষ নেই যা আমরা নিজেরা করতে পারি না ; কিছু কষ্ট স্বীকার করে ও তুলনামূলকভাবে কিছুটা নিকৃষ্ট কারিগরিজ্ঞান নিয়েও স্ব-নির্ভরতা অনেক বেশি গৌরবের এবং তা আগামী দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে অনেক হিতকারী। অন্যদিকে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা অসম্মানজনক ও ক্ষতিকর। তাদেরকে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে—'সহযোগিতা'-মূলক চুক্তি এড়াতে হবে, বিদেশী শিক্ষা ও ফেলোশীপকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। বিদেশী যে-কোনো ব্যাপারকেই সন্দিগ্ধতার সাথে এবং পরীক্ষা করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হবে।

২) তাদেরকে বিদেশী নিয়ন্ত্রিত শিল্প ও সংস্থার সংস্রব ত্যাগ করতে হবে এবং বিদেশী 'সহযোগিতা'র চালু প্রতিষ্ঠানগুলির সরবরাহকারী এজেন্ট হিসাবে কাজ করা বন্ধ করতে হবে। একই রকমভাবে বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিজ্ঞানী এবং শিল্পমালিককে এইসব সংস্থার সাথে কোনোভাবেই যুক্ত হতে দেওয়া চলবে না।

৩) তাদেরকে আরও বেশি বেশি করে অধিকাংশ সুবিধাহীন মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যাবলীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে, জানতে হবে তাদের বর্তমান সমস্যাগুলি কি কি এবং সহজ সরল সমাধানের পরামর্শ দিতে হবে, সহজ সরল প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং কেবলমাত্র পশ্চিমী অভিজাত (sophisticated) কারিগরিবিদ্যার কথা না ভেবে প্রচলিত কলাকৌশলের (techinques) উন্নতি বিধান করতে হবে এবং বিজ্ঞানের বার্তাকে পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে—বড় বড় শব্দওয়ালা অপ্রাসঙ্গিক কিছু তত্ত্ব আউড়ে নয়, বাস্তব জীবনে মূর্ত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে।

৪) সর্বক্ষেত্রেই তাদের ক্রমবর্দ্ধমান হারে স্থানীয় সম্পদ ও শ্রমশক্তির ব্যবহারের উপর গড়ে ওঠা এবং চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা শ্রম-কেন্দ্রীক ক্ষুদ্রশিল্পের উপযোগী কারিগরিবিদ্যাকে (ডঃ এ. কে. এন. রেড্ডি যাকে বলেছেন "অসাম্য দূরীকরণের কারিগরিবিদ্যা") আবিষ্কার ও বিকশিত করতে হবে। এগুলি সবই কর্মসংস্থানের জন্য দেওয়া, আমদানী ও মূলধনের প্রয়োজন কমানো, পরিবহন এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় সামাজিক খরচ কমানো এবং সুসম আঞ্চলিক বিকাশ ও সামাজিক সুবিচারে সাহায্য করবে।

৫) তাদেরকে এমন সব জিনিষের উৎপাদন ও এমন সব প্রক্রিয়ার বিকাশের কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে, যেগুলি জনসাধারণের জরুরী প্রয়োজনগুলিকে মেটাতে পারে। জটিল জিনিষপত্র ও জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন পশ্চিমী ভোগ্যদ্রব্য-কেন্দ্রীক সমাজের আদর্শ তাঁদের পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ এগুলি শুধু বাইরে থেকে বসিয়ে দেওয়া উন্নয়নের ধারণা ও কার্য ক্রমশই চালু রাখে ও তাকে একটা নৈতিক ভিত্তি দেবার চেষ্টা করে।

●[দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফ্যাসিস্ট হিটলার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ওপর। একদিকে সর্বাধুনিক সমর উপকরণে সজ্জিত জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী যার পিছনে রয়েছে শুধু নিজের দেশেরই নয়, ইওরোপের বিজিত দেশগুলোর রসদ ও যুদ্ধ-সম্ভার তৈরীর অসংখ্য কল-কারখানা আর অন্য দিকে যন্ত্রশিল্পে অনুন্নত নিঃসঙ্গ রাশিয়া—গৃহযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ এবং অন্তর্ঘাতের ক্ষত যার শরীর থেকে তখনো মিলায়নি। তবু হিটলারের পরাজয় ঘটেছিল। বিশ্ব-জয়ের নির্লজ্জ স্বপ্নের সমাধি রচিত হয়েছিল ঐতিহাসিক স্তালিন-গ্রাদে। কোথায় ছিল রাশিয়ার অপরাজেয় শক্তির ভাণ্ডার? এই শক্তি নিহিত ছিল রাশিয়ার জনগণের অনন্ত দেশপ্রেমে, তাঁদের আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও ঐক্যে এবং এই শক্তি নিহিত ছিল রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, প্রেরণা জুগিয়েছিল, সংগঠিত করেছিল এবং নেতৃত্ব দিয়েছিল এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে।

আক্রান্ত পিতৃভূমিকে মুক্ত করতে শুধু মেহনতী মানুষরাই এগিয়ে আসেন নি, এগিয়ে এসেছিলেন ছাত্র, কিশোর ও তরুণরা যাঁরা তাঁদের রক্ত দিয়ে গড়েছিলেন এই বিজয়-সৌধ। এই অসংখ্য তরুণ বীরদেরই একজন—আলেক্সি আন্দ্রেভিচ্… সঃ মঃ বীঃ]●

# আলেক্সি আন্দ্রেভিচ্

তপন সেনগুপ্ত

পশ্চিম সীমান্তের একটি যুদ্ধাঞ্চল। পরস্পরের সম্মুখীন রুশ ও জার্মান বাহিনীর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে এক খরস্রোতা নদী। নদীর ওপাড়টা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। ফ্যাসিস্টদের আক্রমণ-প্রস্তুতি এবং আঘাত হানার শক্তির পরিমাণ এ পাড় থেকে কিছুই বোঝা যায় না। 'আক্রমণ করবেন, নাকি ওদেরই প্রথমে আক্রমণ করতে দেবেন'…বুঝে উঠতে পারেন না রুশ বাহিনীর কমাণ্ডার: "ইস্! দুশমনদের শক্তির পরিমাণটা যদি জানা যেতো!"

আকস্মিকভাবেই কিন্তু সমস্যাটার একটা দ্রুত সমাধান হয়ে যায়। আর এভাবে যে হবে—তা লাল সৈন্যরা কেন, এমন কি স্বয়ং কমাণ্ডার পর্যন্ত স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

একদিন জঙ্গলের ভেতর পাহারা দিচ্ছে রুশ বাহিনীর একজন স্কাউট-সেনা। হঠাৎ পিছনে পায়ের খস্‌খস্ আওয়াজ! বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলেই বিস্মিতভাবে নামিয়ে নেয় সে। অদূরে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে বারো-তেরো বছরের একটি কিশোর। খালি পা। সৈন্যটি কিছু জিজ্ঞাসা করতে যেতেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করে থাকতে ইঙ্গিত করে ছেলেটি। তারপর কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, "কমরেড, আপনাদের কিছু খবর দেবার জন্য আলেক্সি আন্দ্রেভিচ্ আমাকে পাঠিয়েছেন।"

বহু পীড়াপিড়ি সত্ত্বেও 'আলেক্সি আন্দ্রেভিচ্ কে,' 'কি করেন', 'কোথায় থাকেন'-এ সব প্রশ্নের উত্তরে সে একটি কথাও বলে না!

স্কাউট সৈন্যটি চুপ করলে গম্ভীরভাবে পকেট থেকে এক গাদা অদ্ভুত জিনিষ বার করে ছেলেটি—সাতটা ছোট্ট সাদা পাথর, পাঁচটা কালো, তিনটে সরু কাঠি, আর একদিকে গেরো-দেওয়া একটা দড়ি!

জিনিষগুলোর দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকতে দেখে নীচু অথচ গম্ভীর গলায় কিশোরটি লাল সৈনিককে বলে, "যা বলছি ভালো করে খেয়াল রাখবেন কমরেড। এই সাদা পাথরগুলো হ'ল ওদের ট্রেঞ্চ মর্টারের সংখ্যা, কালোগুলো হল ট্যাঙ্ক, কাঠিগুলো মেশিন গান, আর দড়ির গেরোগুলো—ফিল্ড ব্যাটারি। মনে থাকবে তো? আচ্ছা কমরেড, আজকে আমি চলি। কাল আবার দেখা করবো…।" সৈন্যটিকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় ছেলেটি।

পরের দিন আবার নির্দিষ্ট জায়গায় সৈন্যটির সাথে দেখা করে সেই কিশোর। যথারীতি বার করে সাদা কালো পাথরের টুকরো, কাঠি, গেরো-দেওয়া দড়ি—পকেট বোঝাই টাটকা তথ্যের বোঝা। এবারে কিন্তু এগুলোর সংখ্যা আগের দিনের থেকেও অনেক বেশি। খবরের পরিমাণ দেখে বিস্ময় চেপে রাখতে পারেনা লাল সেনাটি। এক নিশ্বাসে আবার জিজ্ঞাসা করে—আলেক্সি আন্দ্রেভিচ্ ভদ্রলোকটি কে, কোথায় থাকেন, কিভাবে খবরগুলো পাচ্ছেন? সৈনিকটির অতি-কৌতূহল দেখে বিরক্ত হয় কিশোর। শান্ত অথচ কঠিন গলায় প্রত্যেকটি কথার ওপর ওজন দিয়ে বলে, "ভুলে যাবেন না কমরেড, এটা যুদ্ধের সময়—খুব বেশি কথা বলাটা বিপজ্জনক। আর তাছাড়া আলেক্সি আন্দ্রেভিচ্ আমাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন—এ সম্পর্কে মুখ না খুলতে।"

আলেক্সি আন্দ্রেভিচ/তিগ্রান

* এই কাহিনীটি মরিস হিণ্ডাস-এর লেখা 'মাদার রাশিয়া' বইটিতে উল্লিখিত একটি ঘটনার অবলম্বনে।

এইভাবে দিনের পর দিন সেই ছেলেটি জঙ্গলের মধ্যে এসে লাল সৈন্যদের কাছে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর টাটকা খবরাখবর পৌঁছে দিয়ে যেতো। আর অনিবার্যভাবে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতো, "আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্ আমাকে পাঠিয়েছেন।" শেষপর্যন্ত রুশ বাহিনীর কমাণ্ডার সিদ্ধান্ত করলেন—আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্ নিশ্চয়ই কোনো পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি হবেন, সামরিক গুপ্তচর বৃত্তিতে যাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা নিজের শিবিরে ঢুকতে যাচ্ছেন কমাণ্ডার। এমন সময় তাঁর অর্ডারলি খবর দিল—বারো-তেরো বছরের একজন অজ্ঞাত পরিচয় বালক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। খুবই অবাক হন কমাণ্ডার। বাচ্চা ছেলে! কি দরকার থাকতে পারে তাঁর কাছে? যাই হোক, মনের ভাব প্রকাশ না করে ছেলেটিকে শিবিরের মধ্যে নিয়ে আসতে বললেন অর্ডারলিকে।

কিছুক্ষণ পরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো একটি কিশোর। খাটো প্যান্ট পরা। খালি পা। যথেষ্ট আত্ম-মর্যাদার সাথে কমাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো ছেলেটি, "দয়া করে আমাকে পরিচয় দিতে অনুমতি দিন। আমিই আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্।"

হঠাৎ বিস্ময়ের ধাক্কায় কথা হারিয়ে ফেলেন কমাণ্ডার। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, গল্পের নায়কের মতো কীর্তিমান—সেই রহস্যময় মানুষ আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্ মাত্র চোদ্দ বছরের একটা বালক!

বিচলিত ভাবটা সামলে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন কমাণ্ডার: আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্ হ'ল আটজন কিশোরের একটি ছোট্ট ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন, যারা নদীর এপার থেকে ওপার অর্থাৎ রুশ আর জার্মান লাইনের মধ্যে একটা ফেরি পারাপার করে থাকে। তাদের ফেরিটা আর কিছুই না—কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী একটা বড় ভেলার মতো, যার নাম দিয়েছে তারা—"ফ্যাসিস্টদের কবর"।

এবারের ফেরিতে তারা ফ্যাসিস্টদের পিছনের লাইন থেকে তিনজন আহত রুশ সৈন্যকে নিয়ে এসেছে—জানালো আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্। কিন্তু ভীষণ ভারী বলে শিবির পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আসা ওদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আর সেই জন্যই তারা কমাণ্ডারের কাছে এসেছে—সাহায্যের আশায়।

স্ট্রেচার বওয়ার জন্য কয়েকজন লোক এবং স্বয়ং কমাণ্ডারকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চললো আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্ যেখানে একটা ঝোপের মধ্যে তারা সাবধানে লুকিয়ে রেখেছে আহত সৈন্যদের। তৎক্ষণাৎ স্ট্রেচারে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল ছাউনির হাস-পাতালে। বিদায় নিতে চাইলো আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্। কিন্তু কমাণ্ডার কি অত সহজে তাকে ছাড়তে পারেন? এই 'খুদে ব্রিগেড' সম্বন্ধে অগুনতি প্রশ্ন কিলবিল করছে তাঁর মাথায়। আলেক্সি আস্ত্রেভিচের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমা চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কমাণ্ডার: কোথায় থাকে তারা? দুটো ফ্রন্ট লাইনের মাঝখানে ফেরি চালাচ্ছে কিভাবে? জার্মানদের চোখে ধুলো দিচ্ছে কিভাবে—ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। শান্তভাবে আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্ ব্যাখ্যা করে বোঝালো তাদের কাজকর্মের ধারা এবং কৌশল—নদীর বাঁকের মুখে যে পাহাড়টা রয়েছে তার আড়াল নিয়ে কিভাবে তারা জার্মানদের দৃষ্টি এড়ায়। পাহাড়টার কাছাকাছি যাওয়া যদিও বিপজ্জনক তবু ওরা এই কৌশলটা অনেকবার ব্যবহার করেছে এবং কোনো বারেই শত্রুরা তাদের কাজকর্ম বন্ধ করতে পারেনি।

পরের দিন আবার ছাউনিতে এলো আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্। এবারে সঙ্গে রয়েছে তার দুজন কমরেড। প্রথম দিন যে ছেলেটি পাথরের টুকরো, কাঠি-দড়ি ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে স্কাউট সৈন্যটির সাথে দেখা করেছিল, সেই কোলকা আর অন্যজন হ'ল সেরিওজা। কোলকা 'ব্রিগেডে'র 'হিসাব রক্ষক' এবং সেরিওজা হ'ল তার সহকারী। আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্ এবারে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সাম্প্রতিকতম সৈন্য-সজ্জার একটা নক্সা তৈরী করে এনেছে। নক্সাটা সে কমাণ্ডারকে দেখালো। শত্রু বাহিনীর সামরিক সাজ-সরঞ্জামের পরিমাণ জানতে চাইলেন কমাণ্ডার। কোলকাকে তার পকেট থেকে সাদা ও কালো পাথরের টুকরো, কাঠি এবং গেরো-দেওয়া দড়ি বার করে গোনার নির্দেশ দিল আলেক্সি আস্ত্রেভিচ। "আর ট্যাঙ্ক?"—জানতে চাইলেন কমাণ্ডার।

'ক্যাপ্টেনের' সঙ্কেত পেয়ে ১৩টা শামুকের খোলা বার করে দিল 'সহ-হিসাবরক্ষক'—সেরিওজা। কমাণ্ডারকে ব্যাখ্যা করে বোঝালো আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্: শুধু একজনের কাছে সামরিক তথ্যগুলোর পুরো অংশটা থাকা বিপজ্জনক। কারণ যদি সে জার্মানদের হাতে ধরা পড়ে যায় তাহলে এতো কষ্ট করে সংগ্রহ করা তথ্যগুলো সম্পূর্ণ নষ্ট হবে। তাই ফেরির কয়েকজন 'নাবিকের' মধ্যে খবরগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্ রুশ কমাণ্ডারের হাতে ৮০টা জার্মান-রাইফেল তুলে দিল। কমাণ্ডারের হতবাক অবস্থা দেখে একটু বিস্তারিত বিবরণ দেয় আলেক্সি আস্ত্রেভিচ্: জার্মানদের ছাউনিতে মাঝে মাঝে উৎসব হয়। আর এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে তারা। উৎসবের দিন সাধারণত ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা প্রচুর মদ

গিলে চুর হয়ে থাকে। আর শান্ত্রীরা যদি কিছু সময়ের জন্য না থাকে বা তারাও যদি নেশায় থাকে, তাহলে তারা 'ব্রিগেড' গুঁড়ি মেরে ক্যাম্পে ঢুকে রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র যত পারে হাতিয়ে আনে। একদিন তো তাদের, ফেরি-ভর্তি একগাদা জার্মান রাইফেল নদীতে ফেলে দিতে হয়েছে! আর একটু হলেই তারা ধরা পড়ে যাচ্ছিল—তাই বাধ্য হয়ে ফেলে দিতে হ'ল অতগুলো 'চমৎকার' রাইফেল!

"আমাদের একটা কামানও রয়েছে"—কমাণ্ডারকে জানায় আলেক্সি আব্রেভিচ্। পরে বিশদ ব্যাখ্যা করে: ফ্যাসিস্টরা একটা বিরাট কামান নিয়ে একটা জলা জায়গায় আটকা পড়ে গেছিল। সারাদিন ধরে তারা কামানটাকে কাদা থেকে তুলতে চেষ্টা করেছে—কিন্তু পারেনি। অন্ধকার হতেই ওরা আর ভয়ে ওখানে থাকলো না—যদি গেরিলারা আক্রমণ করে বসে! কিন্তু কামানটা ওখানেই থেকে গেছে। যদি বেশ কিছু লোক তাদের সঙ্গে দেওয়া হয় তবে ওটাকে উদ্ধার করে 'ফ্যাসিস্টদের কবরে' তুলে নিয়ে আসা যেতে পারে। কমাণ্ডার সাতজন সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন কামানটা তুলতে। তারা জলা থেকে ওটাকে তুলে 'ব্রিগেডে'র ভেলাতে চাপালো। প্রায় পুরো রাতটাই লেগে গেল কাজটা শেষ করতে। ফেরার পথে 'সামান্য ঝামেলা' হয়েছিল—নদীটা পেরোবার সময় দেখতে পেয়ে কয়েক পশলা গুলী চালিয়েছিল জার্মানরা। তবে 'সুবিধে' করতে পারেনি—কেননা ভেলাটাকে ওরা তখন পাহাড়ের ওধারের বাঁকটার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ওরা যখন ছাউনিতে ফিরলো তখন সৈন্য এবং কিশোরদের কেউই আর শুকনো নেই। জামা কাপড় সব জলে ভেজা। কাদায় মাখামাখি সারা গা। কমাণ্ডার 'ব্রিগেডের' সবাইকে খাইয়ে নিজের ক্যাম্পে শুইয়ে দিলেন।

অনেক দেরীতে ঘুম ভাঙলো সকলের। বিদায় নেবার আগে ব্রিগেডের সাথে দেখা করতে এলেন কমাণ্ডার। কিভাবে যে তিনি এই 'খুদে বীরদের' ধন্যবাদ জানাবেন বুঝতে পারছেন না। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে 'ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন'—আলেক্সি আব্রেভিচ্‌কে সম্বোধন করে বলেন, "কমরেড, তোমরা লাল বাহিনী এবং আমাদের পিতৃভূমির জন্য যা করেছ তার জন্য কিভাবে তোমাদের আমি পুরস্কৃত করবো বুঝতে পারছি না। তুমিই বল, কি করবো আমি—যাতে তোমরা মনে রাখবে আমাদের?"

এই প্রথম আলেক্সি আব্রেভিচ্ জবাব দেওয়ার মতো কথা খুঁজে পেলো না। চুপ করে থাকলো সে। খাপ থেকে নিজের রিভলবারটা বার করে কিশোরটির হাতে গুঁজে দিলেন কমাণ্ডার। তার সাথীদের মতো লোভার্ত দৃষ্টিতে অস্ত্রটার দিকে এক পলক তাকালো আলেক্সি আব্রেভিচ্। উপহারের সেরা উপহার! তাছাড়া সবে কমাণ্ডারের হোলস্টার থেকে এসেছে! কিন্তু দ্বিধাটা মুহূর্তের। অত্যন্ত মার্জিতভাবে সবিনয়ে কমাণ্ডারের এই 'লোভনীয়' উপহার ফিরিয়ে দিল আলেক্সি আব্রেভিচ্। "এটা রাখায় ভীষণ ঝুঁকি রয়েছে," ক্ষমা প্রার্থনা করে সে জানায় কমাণ্ডারকে, "যদি আমি কখনো ওদের হাতে ধরা পড়ি আর তখন যদি এই রিভলবারটা আমার কাছে আবিষ্কার করে ওরা, তাহলে আমি যে সত্যিকারের একজন গুপ্তচর—তাতে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।"

কমাণ্ডারের সাথে করমর্দন করে একে একে বিদায় নেয় 'খুদে ব্রিগেডে'র আটজন দুঃসাহসী কিশোর। নদীর ওপারের দিকে সন্তর্পণে এগিয়ে চলে 'ফ্যাসিস্টদের কবর'।



আলেক্সি আব্রেভিচ/পিকার

# বিক্ষুব্ধ শিক্ষা-জগৎ

## অশান্ত আসাম

আন্দোলিত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে আসাম চঞ্চল। পুলিশী নিপীড়নের প্রতিবাদে ও ন্যায্য মূল্যে প্রতিটি মানুষের মুখে খাদ্য পৌঁছে দেবার দাবিতে, সমগ্র প্রদেশের ছাত্র-যুব-শিক্ষক-সমাজ আলোড়িত। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী অনৈক্যের সমস্ত অপপ্রচেষ্টাকে বানচাল করে আসামের ছাত্র-শিক্ষকরা দীর্ঘ কয়েক মাস আন্দোলনের যে-ইতিহাস গড়ে তুলেছেন, তা তাঁদের অসীম ধৈর্য, সহনশীলতা ও অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। বিগত কয়েক বছরের আন্দোলন তাঁদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে ঐক্য বিনা বিচ্ছিন্ন, আলাদা আলাদা বিক্ষোভ-আন্দোলনের কোনো মূল্য নেই, প্রয়োজন ইস্পাতদৃঢ় সংহতির। কারণ এর আগে সরকারের প্রতি উত্থিত প্রতিটি আন্দোলনের গতিমুখকে, অসমীয়া ভাষী মানুষের 'স্বতন্ত্র' চরিত্রের জিগির তুলে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও প্রাদেশিকতার চোরাপথে ন্যায়সংগত বিক্ষোভকে চালান করে সরকার নিশ্চিন্ত থেকেছে। কিন্তু এবারের আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বেশ কয়েক মাস আন্দোলন চলার পরেও ছাত্র-শিক্ষকরা সরকারী চক্রান্তের শিকার হন নি। চড়াই-উতরাই-এর পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে আসামের আন্দোলন।

চলতি বছরের প্রথম থেকেই সরকারী নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল। কিন্তু তা প্রথম রূপ পায় জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে, যখন নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন (এই সংগঠন কোনো বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতের অনুগামীদের নিয়ে গঠিত নয়। কিন্তু এটা মনে করা খুবই অসংগত হবে যে দলীয় রাজনীতির প্রভাব এতে পড়ে না। মোটামুটিভাবে, এই সংস্থা বর্তমান রাজনৈতিক বাতাবরণের একটা ক্ষুদ্র মডেল) ২১ দফা দাবিপত্র সামনে ধরে এগিয়ে এলেন। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসাবে ৭ই জুন থেকে শুরু হ'ল ৫ দিন ব্যাপী গণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন। সেইদিন থেকেই সরকার চিরাচরিত কায়দায় সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিলেন। সাথে সাথে 'কার্ফু' বলবৎ, 'নিষেধাজ্ঞা' জারি করায় অন্যতম 'অস্ত্র'ও ছাড়া হ'ল। শিবসাগর শহরে 'ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে' আহত হলেন অনেকে। প্রথম দিনের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল ৪০০০-এ। পরের দিন ছাত্র আন্দোলন প্রদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করল। বিনিময়ে বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস 'উপহার' দিলেন সরকার। নিয়মমাফিকভাবে পুলিশের গুলী ছোঁড়ার স্বপক্ষে 'ওকালতি' করলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎ চন্দ্র সিংহ। পলাশবাড়ী, গৌহাটি, চাইগাঁওকে কার্ফু'র আওতায় আনা হল। সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা দাঁড়াল ৭০০০-এ। ১৬ জন ছাত্রনেতা 'ভারত রক্ষা আইনে' গ্রেপ্তার হলেন, এছাড়া আরো কয়েকশত ছাত্রকে 'নিয়ম-শৃংখলা' ভাঙার 'দায়ে' জেলে চালান দেওয়া হল। আন্দোলনের চতুর্থ দিনে, ডুরবাজার পুলিশের গুলী চালনায় বলি হলেন দু'জন ছাত্র। বেসরকারী সূত্রে অবশ্য মৃতের সংখ্যা ৪ বলে দাবি করা হল। 'শান্তি রক্ষার্থে' নিয়োজিত হ'ল আসাম পুলিশ ব্যাটেলিয়ন, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, সি আর পি সমেত সমস্ত সরকারী বাহিনী। সামরিক বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন প্রশাসন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত করবার জন্য সরকারকে আর দাবি অথবা অনুরোধ জানানোর প্রয়োজন হল না। তবে কমিশন বসানোর সাথে সাথে মুখ্য সচিব একথাও বললেন—"একদল ছাত্র-আন্দোলনকারী বি ডি ও অফিস ও পুলিশের উপর হামলা করলে, পুলিশ গুলী চালাতে বাধ্য হয়।" মরাঁগ, নাহারিঘাট, বড়পূজা, মারিগাঁও' বরপেটা, গোলাঘাট-এ উত্তেজিত ছাত্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যাপৃত হন। পুলিশী নিপীড়নের প্রতিবাদে কামরূপ জেলার জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। পরের দিনেও একই চিত্র। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীলাবন সিংকে "ভেজাল, দুর্নীতি ও কালো-বাজারী রোধে প্রবর্তিত" আইন 'মিসায়' আটক করা হয়। পুলিশী নির্যাতনে স্তম্ভিত আসাম। 'যাকে সামনে পাও, তাকে প্যাঁদানোর' পুলিশী নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়। সরকারী মুখপাত্র 'অসীম ধৈর্য' ও 'সবচেয়ে কম শক্তি' (?) ব্যবহার করা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানান। পুলিশের গুলী চালনার নিন্দা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিবৃতি দেন। ডুরবাজার গুলী চালনার ঘটনাকে 'ঠাণ্ডা মাথায় নিরীহ ছাত্র খুন' বলে অভিহিত করেন সমাজতন্ত্রী দল। এর পরেও ছাত্র আন্দোলন এগিয়ে চলে। ধৃত ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে 'বরপেটা-বন্ধ' পালিত হয় ১৩ই জুন। ধারাবাহিক আন্দোলনের জের হিসেবে ২৫শে জুন প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেন নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন। সম্প্রতিক ধর্মঘট ভেবে 'পুলকিত' প্রশাসনযন্ত্র, ছাত্রদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকেন। হরতালের দিন সকালে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র রাস্তায় গাড়ী থামানোর চেষ্টা করলে, পুলিশ প্রতিটি হোস্টেলে ঢুকে নির্বিচারে

মারধোর শুরু করে। আর্ত ছাত্ররা ভাঙা পাঁজরা আর ফাটা মাথা নিয়ে পালাতে থাকেন। এই বিভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অন্যদিকে সরকারী পদলেহনকারীরা পুলিশী আচরণের যৌক্তিকতা দেখাতে শুরু করে। ঘটনার নিন্দা করে প্রদেশের সর্বত্র জনসাধারণ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন। ২রা জুলাই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এক সভায় মিলিত হয়ে নিঃশর্তে ছাত্র মুক্তি, সি আর পি প্রত্যাহার, আহত ছাত্র-কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ দান ইত্যাদি দাবি জানিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১০ই জুলাই দাবি মেটানোর শেষসময় হিসেবে নির্ধারিত হয়। আকস্মিকভাবে পুলিশ ৬ই জুলাই, এইপ্রস্তাবের মূল প্রবক্তা—বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ডঃ ডি. পি. বড়ুয়াকে 'মিসায়' গ্রেপ্তার করে। নবনিযুক্ত উপাচার্য মশাই শিক্ষকদের নেতৃত্ববিহীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে শেষ সময় পেছোতে থাকেন, সরকারের সঙ্গে আপোষে আসবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে থাকেন। অবশেষে ২৫শে জুলাই সমগ্র গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা পদত্যাগ করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা পুলিশ এর পরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ছেড়ে দিলেও শ্রীবড়ুয়াকে আটকে রাখে। ছাত্ররা তাঁদের প্রিয় শিক্ষকের মুক্তির দাবিতে আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আন্দোলন শুরু করেন।

জুন মাসের পরে বড় বড় খবর কাগজগুলোতে আসাম ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। গুজরাট আন্দোলনের বিষয়ে টুকরো খবর এবং সরকারী বক্তব্যকে প্রাধান্য দেবার পরেও ভারত সরকার সংবাদদাতাদের 'বাড়াবাড়ি' করার জন্য যে ধমক দিয়েছেন তাতেই বোধহয় তারা ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত ঘটনাগুলো ছাপতে নিরুৎসাহিত বোধ করেছেন। ফলে, পরবর্তী কালের আসাম আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র খুঁজে পাওয়াটা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগষ্টের শেষ সপ্তাহে শুধুমাত্র শ্রীবড়ুয়ার মুক্তিদানের ঘটনাটি প্রচার করা হয়।

আমাদের পত্রিকার দপ্তরে আসাম সম্বন্ধে সর্বশেষ যে খবর এসে পৌঁছেছে তাতে জানা যায়—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর 'ছাত্র উশৃংখলতা'র দোহাই দিয়ে পুলিশ ও সি আর পি করিমগঞ্জ কলেজ ছাত্রাবাসের মধ্যে ঢুকে প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। এলোপাথাড়ি লাঠি চালানোর পর, একজন ছাত্রকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। উত্তেজিত ছাত্ররা মহকুমা শাসককে ঘেরাও করে ধৃত ছাত্রের মুক্তি ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। ১৫ই সেপ্টেম্বর রাতের অন্ধকারে একদল দুর্বৃত্ত ছাত্র-শিক্ষক ঐক্যে ফাটল ধরাবার হীন অভিপ্রায়ে করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ও কয়েকজন অধ্যাপককে মারধোর করে। পরের দিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। বিকেলে 'সংযুক্ত ছাত্র-যুব সমিতির' উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় বিভিন্ন বক্তা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তুলতে আহ্বান জানান। ১৮ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক মৌন মিছিলে যোগ দেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

—সংকলক

উদ্ধৃতি

বিদেশী পুঁজির কবল থেকে

# আমরা কতখানি স্বাধীন ?

[ ৩০ জুন, ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করলেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান তৈরী করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার—ব্রিটেনে শিক্ষিত উকিল আর রাজা-মহারাজাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সাংবিধানিক সভা (constituent assembly) গঠন করলেন। ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সালে ভারত 'স্বাধীন' হয়ে গেল !

কিন্তু স্বাধীনতা কতদূর পাওয়া গেল ? ভারতের উপর বিদেশী পুঁজির আধিপত্য কি আদৌ কমে গেল ? আসুন, নিজের জীবনেই দেখুন—আমাদের উপর বিদেশী পুঁজি কিভাবে চেপে বসে আছে আর কিভাবেই বা আমরা এখনও পর-নির্ভরশীল। ]

—প্রত্যেক মানুষকেই দৈনন্দিন জীবনে কোন না কোন কাজ করতে হয়। সাথে সাথেই তাঁকে কয়েকটা জিনিষ ব্যবহার করতে হয়। সকালে টুথ্‌ব্রাশ আর টুথ্‌পেষ্ট ব্যবহার করেন— Ciba (Binaca), Colgate-Palmolive, Forhans, Macleans-এর তৈরী। চান করেন সাবান দিয়ে—Lux বা Lifebuoy—ব্রিটিশ কোম্পানী Hindusthan Lever (Unilevers)-এর। জলখাবার যদি ডালডা দিয়ে হয় তবে সেটাও Unilevers কোম্পানীর। যদি টেরিন-এর কাপড় পরবার ইচ্ছে হয় তাহলে ভুলবেন না, টেরিন Imperial Chemical Industries-এর তৈরী ! সিগারেটের তো কথাই নেই, Imperial Tobacco Co. ( যার নাম আজকাল India Tobacco Co. হয়ে গেছে ) ছাড়া অন্য কোন ব্র্যাণ্ড পাওয়াই মুস্কিল ! আর দেশলাই ?—সুইডেনের কোম্পানী Western Match Co. (wimco)-র।

—খবরের কাগজ বিদেশী Newsprint-এ বিদেশী 'রোটারী' মেশিনে ছাপা হয়। অধিকাংশ পত্রিকাই Bennet Colleman & Co. দ্বারা প্রকাশিত।

—রেডিয়োর সেট Murphy-র হোক বা Philips-এরই হোক বেশীর ভাগই বিদেশী পুঁজির উৎপাদন।

—সন্ধ্যেবেলা কখনও কখনও সিনেমা দেখতে গেলেন।—Eastman Colour Film Kodak, Agfa-র। সিনেমায় কিম্বা দৈনন্দিন জীবনে যে মোটর গাড়ীগুলো দেখলেন, সেগুলোও বিদেশী, কারণ, ভারতীয় নামধারী কোম্পানী Hindusthan Motors আমেরিকান কোম্পানী General Motors-এর ; আর Premier-President—ইটালিয়ান কোম্পানী Fiat-এর সহযোগিতায় চলছে।

—পড়তে পড়তে মাথা ধরলো। Aspro, Anacin, Saridon যা খান সবই বিদেশী ! কিম্বা কিছু ঠাণ্ডা খান—Coca-Cola, Fanta, Limca, Pepino—হয় আমেরিকান, নয় ইটালিয়ান কোম্পানীর তৈরী

—যদি ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন তো মেশিন বিদেশী ; চাষবাস করেন তো ট্র্যাক্টর বিদেশী। কলম বিদেশী (Parker, Pilot ইত্যাদি) কালী বিদেশী (Quink, Waterman ইত্যাদি)। Swiss Made ঘড়ির কেবলমাত্র সময়টাই ভারতীয়। আর যদি HMT হয় তবে ওটাও জাপানী সহযোগিতায় তৈরী।

—যখন আপনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, তখন আপনাকে সাবান দিয়ে ধোয়া হয়েছিল। আর সেই সাবানের নির্মাতা হলেন Johnson অথবা Unilever Company। দুটোই ব্রিটিশ-আমেরিকান।

—বড় হয়ে স্কুলে যেতে শুরু করলেন। স্কুলের অধিকাংশ বই-এর প্রকাশক Orient Longman's & Co. স্কুল যে বাসে গেলেন সে বাসের নির্মাতা হলেন Tata-Mercedez Benz কিম্বা Ashok-Leyland কোম্পানী। যদি সাইকেল ছিল তাহলে সেটা Philips বা Hercules কোম্পানীর তৈরী। জুতো ছিল Bata-র আর কাপড় Buckingham Carnatic (Binny) মিল-এর। যদি আপনি বিদেশী কাপড় পরতে না চাইতেন আর 'স্বদেশী' মিলের কাপড় ব্যবহার করতেন তাহলেও আপনি বিদেশীদের কব্জার বাইরে ছিলেন না ; কারণ এক্ষেত্রে "স্বদেশী" মিলের মালিক হলেন Andrew Yule & Co.

—অসুখ হলে ওষুধ খেলেন। ওষুধের নির্মাতা ছিলেন Pfizer, Roche, Ciba, Sandoz ইত্যাদি।

—মরবার পর পোড়ানোর জন্য যদি কেরোসিন তেল ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা Esso, Burmah Shell এর তৈরী আর যদি ইলেক-ট্রিক এ পোড়ানো হয়, তাহলে তা আমেরিকান General Electric Co.-র মেশিনে রাশিয়ান বিদ্যুতে !

আর এইভাবেই জীবন কেটে যায় ; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত—সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বিদেশী পুঁজির মুঠিতে আটকা থেকে। এটাই কি স্বাধীনতা ?

---

• পাটনা থেকে প্রকাশিত, 'পাটনা প্রদেশ ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি'র' বুলেটিন 'মুক্তি'র ( হিন্দি ) দ্বিতীয় সংখ্যার থেকে এই রচনাটি নেওয়া হয়েছে।

# পরিসংখ্যানে দেশ ও বিদেশ

## হে বিদেশী মূলধন, স্বাগতম !

"কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভারত বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানাবে। ভারত চায় যে বিদেশী পুঁজি উন্নততর কারিগরি বিদ্যার ব্যবহারে সহায়তা করুক।" গত ১৩ই সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন ভারত-জার্মান চেম্বার অব্ কমার্সের অষ্টাদশ বার্ষিক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন। তিনি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেন যে বিদেশী বিনিয়োগ যে স্বল্প হারে (minority) করতে হবে এটা কোনো চূড়ান্ত নিয়ম (absolute rule) হতে পারে না। "যেখানে কারিগরি বিদ্যা প্রয়োজনীয় অথচ দুর্লভ সেই সব ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমের জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হ'ল বিদেশী কারিগরি উন্নয়ন বিদ্যার সাহায্যে দেশীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার।" তিনি আরো বলেন যে—"……**আমরা যখন একবার বিদেশী মূলধন ও সহায়তা অনুমোদন করেছি, তখন আর বিদেশীদের মুনাফা ও লভ্যাংশ থেকে আমরা বঞ্চিত করতে পারি না।" অর্থমন্ত্রী জানান—"রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ৮৭৭টি বিদেশী কোম্পানী (শুধু প্রাইভেট সেকটরে) ২৬২ কোটি টাকা লাভের অংশ হিসেবে ভারতের বাইরে পাঠিয়েছে।"** ভারত ও পশ্চিম জার্মানীর অসম আমদানী-রপ্তানীর উল্লেখ করে তিনি বলেন—"ভারত থেকে রপ্তানীর পরিমাণ পশ্চিম জার্মানী থেকে আমদানীকৃত জিনিষপত্রের এক তৃতীয়াংশও নয়। এমনকি জার্মানীর দেওয়া সাহায্যের কথা ধরলেও, ভারত থেকে পশ্চিম জার্মানীতে প্রচুর অর্থ চলে যাচ্ছে।" তিনি মনে করেন এ ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানীর মতো বড় ব্যবসায়িক দেশের উচিৎ এই বৈষম্য দূর করা। তিনি পরামর্শ দেন—"পশ্চিম জার্মানী ভারতে তৈরী আন্তর্জাতিক মানের ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক দ্রব্য আরো বেশি করে কিনলে, এটা সম্ভব হতে পারে।"

[ অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪. ৯. ৭৪ ]

## চুক্তির আগপাশ

মধ্যপ্রদেশের বইলাদিলা লৌহ খনি থেকে জাপান যে লৌহ আকর নিয়ে যাচ্ছে তার দাম টন প্রতি মাত্র ১০·৩০ ডলার। গত দশ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে এক টন ইস্পাতের দাম ১০০ ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০ ডলারে। অথচ চুক্তিতে আন্তর্জাতিক দাম ও রপ্তানী মূল্য সম্পর্কের উল্লেখ না থাকায়, ভারত পুরোনো দামেই জাপানকে লৌহ আকর সরবরাহ করছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এই চুক্তি অনুসারে ভারত জাপানকে ১৫৬·৭ লক্ষ টন লৌহ আকর চালান দিয়েছে এই পরিসংখ্যান থেকে ভারতের ক্ষতির পরিমাণটা সহজেই অনুমেয়
[ অমৃতবাজার পত্রিকা ১২।৮.৭৪ ]

## শুধু তিন মাসে

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন অব্দি, মোট এই তিন মাসে ভারত ৩২৩·৬৮ মিলিয়ন ডলারের ( ২৫৪·৪১ কোটি টাকার ) বৈদেশিক সাহায্য চুক্তিতে সই করেছে। এই সাহায্যের মধ্যে পরিকল্পনা খাতে ব্যয় করা হবে ১০৩·৭৬ কোটি টাকা, পরিকল্পনা বহির্ভূত প্রকল্পের জন্য ১৩৮·৪১ কোটি টাকা ও দানের পরিমাণ হল ১২·২৫ কোটি টাকা। এ সব ছাড়া এই সময়ে সুইডেন ৬·৫৪ কোটি টাকার কারিগরী সাহায্য দিয়েছে। [ অমৃতবাজার পত্রিকা ২।৯।৭৪ ]

## সিখরচায় বিদেশ ভ্রমণ

কম করে প্রতি এক দিন অন্তর একটি করে প্রতিনিধিদল বিদেশে যাচ্ছে। ১৯৭১-৭২ সালে মাত্র ৫টি মন্ত্রক থেকে বিদেশে ১৮০টি সরকারী প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠান হয়েছে। এর মধ্যে বাণিজ্য দপ্তর থেকে ৬৭টি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে ৬৫টি প্রতিনিধিদল বিদেশ সফরে যান। ৪ঠা সেপ্টেম্বর লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বি. এস. চৌহান এই তথ্য জানান। ( দি স্টেটসম্যান, ৫ ৯. ৭৪ )।

## "সকল দেশের সেরা'

জাতিসংঘের এক রিপোর্টে ৩০টি 'উন্নয়নশীল' দেশের মধ্যে ভারতকে 'সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ বর্তমান বছরে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২০ মিলিয়ন ডলার এবং অনুমান করা হচ্ছে পরের বছর তা বেড়ে দাঁড়াবে ৮৮০ মিলিয়ন ডলারে। এর পরেই বাঙলাদেশের স্থান। অসম বাণিজ্যের ফলে বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার। রপ্তানীর থেকে আমদানী বেশি হওয়ায় পাকিস্তানের ঘাটতি হয়েছে ১৫৫ ডলার, তবে অনুমান করা হচ্ছে পরের বছর তা কমে দাঁড়াবে ৭৮ মিলিয়ন ডলারে। এই সব দেশের মোট ঘাটতির পরিমাণ হ'ল ২২৫৭ মিলিয়ন ডলার। ( অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩. ৯. ৭৪ )।

### তেলের জন্য দেশকে বন্ধক

তেলের জন্য দেশকে বন্ধক—গত ৩০শে আগষ্টের আনন্দবাজার পত্রিকায়, নিরঞ্জন হালদারের লেখা একটি প্রবন্ধের শিরোনাম।

দেখুন তো, এই শিরোনামটির সঙ্গে নিচের খবরটিকে একসাথে পড়লে কোনো খট্‌কা লাগে কিনা: গত ১৮ই মে, '৭৪-এ আমাদের দেশ রাজস্থানের মরুগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে (অবশ্যই শান্তির জন্য !!)। দেশের আপামর জনসাধারণ আমাদের কৃতী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এই অভূতপূর্ব 'সাফল্যকে' মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা জানিয়ে, 'আত্ম-নির্ভরতার' পথে আমাদের এই দৃঢ় পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছে।

কিন্তু এই গৌরবজ্জল ঘটনার মাত্র ছ'দিন পরে, ২৪শে মে ভারত সরকার ঘোষণা করলেন, উপকূলবর্তী তৈলানুসন্ধান কার্যের জন্য দুটি মার্কিন তৈল সংস্থার সঙ্গে আমাদের এক দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে—যে চুক্তির অনেকগুলো তাৎপর্যের একটি হ'ল দেশের বিজ্ঞানীদের উপর, এমন একটি ব্যাপারে আমাদের কোনো আস্থা নেই, যেখানে দেশের অতি গুরুতর স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে।

দু'টি মার্কিন সংস্থা, Reading and Bates Oil and Gas Company আর Carlsberg Group যথাক্রমে কচ্ছ-উপসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলে তেলের অনুসন্ধান চালাবে এবং সেখানে উৎপাদন কার্যে ব্রতী হবে। কিন্তু এটা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য কারিগরি 'সহায়তার' চুক্তি নয়—যেখানে আমাদের বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। দুটি অতীব সম্ভবনাপূর্ণ তেলের উৎকে দু'টি বিদেশী সংস্থার কাছে লীজ দেওয়া হচ্ছে, যেখানে তেল পাওয়া গেলে তারাও সেই তেলের ভাগীদার হবে। বিদেশীদের সাথে প্রধান একটি প্রাকৃতিক সম্পদ ভাগাভাগি করে নেওয়ার কোনো চুক্তি এই প্রথম।

প্রায় ২৫ বছরের জন্য সম্পাদিত এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ঐ দুটি সংস্থা তৈলানুসন্ধানের জন্য সাত বছরের মধ্যে প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার ঝুঁকি পুঁজি (Risk capital) খরচ করবে। তেল না পাওয়া গেলে, এই খরচার জন্য ভারত সরকারের কোনো দায় থাকবে না। কিন্তু তেল পাওয়া গেলে, তারা মোট উৎপাদনের ৬১ শতাংশের মালিক হবে, যতদিন পর্যন্ত না সংস্থা দুটি তাদের অনুসন্ধান ও উন্নয়ন খরচার তিনগুণ পরিমান উশুল করে। তারপর তারা ২৫ শতাংশের মালিক হবে, যার দরুণ কোনো কর বা রয়াল্টি ভারত সরকারের প্রাপ্য নয়। অতএব টাকাকড়ির হিসাবে ২৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে মার্কিন সংস্থা দু'টি, হাজার মিলিয়ন ডলার আমাদের দেশ থেকে লুঠে নিয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত, কচ্ছ উপকূল ও বঙ্গোপসাগরে বিপুল পরিমান তেল পাওয়ার এক সম্ভাবনা আছে। কাজেই, 'বিদেশী কারিগরী সহায়তা' ও 'বিশেষজ্ঞের পরামর্শ'—এসবের স্তর পেরিয়ে এক লাফে এই বন্ধকী চুক্তি, দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে দেবারই নামান্তর মাত্র।

বিদেশীদের কাছে দেশের অতি মূল্যবান সম্পদ এভাবে বিকিয়ে দেবার কথা শুনলে—'স্বনির্ভরতা', 'আত্মবিশ্বাস', 'অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা' ও 'প্রগতির জন্য সংগ্রাম'—ইত্যাদি গালভরা কথাগুলি কেমন ফ াঁকা আওয়াজ বলে মনে হয়—তাই নয় কি?

—সূত্র: 'সায়েন্স টুডে', আগষ্ট '৭৪

# বিজ্ঞানের জন্ম

ইলিন ও সেগাল

প্রায়ই আমরা শুনতে পাই—"এই হ'ল বিজ্ঞানের শেষ কথা।" আচ্ছা, তা না হয় হ'ল ; কিন্তু বিজ্ঞানের প্রথম কথাটা শোনা গিয়েছিল কবে ?

শুনতে আশ্চর্য মনে হলেও, এ প্রশ্নটার একটা সঠিক জবাব কিন্তু দেওয়া সম্ভব।

বিজ্ঞানের একেবারের গোড়ার কথা বলতে যদি আমরা পৃথিবীতে প্রথম যে বিজ্ঞানের বইটা লেখা হয়েছিল তার কথাই ধরি, তবে আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা হ'ল : খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৭ সাল, স্থান—এশিয়া মাইনরের গ্রীক সহর মিলেটাস। এই বইটার নাম ছিল '**প্রকৃতি সম্পর্কে**'। লিখেছিলেন একজন গ্রীক পণ্ডিত। নাম—অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার।

এর একটু আগে, খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালের ২৮শে মে তে একটা সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল মিলেটাসে। অবশ্য ওরকম গ্রহণ এর আগেও মিলেটাসের অধিবাসীরা অনেকবার দেখেছে এবং দেখে ভয়ও পেয়েছে। কিন্তু এবারে তারা গ্রহণটা দেখলো একটা নতুন বিস্ময় নিয়ে। কারণ অনেক আগে থাকতেই তারা শুনতে পেয়েছিল, ওই তারিখে নাকি এরকম একটা ব্যাপার ঘটবে। এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন অন্য একজন মিলেশীয় পণ্ডিত—থেলস।

অন্য এতো সহর থাকতে, মিলেটাসেই বা কেন বিজ্ঞান জন্ম নিল ? ব্যবসায়ী আর হৈ-হট্টগোলে ভরা এই সহর, যেখানে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে সব কটা জল আর স্থল-পথ এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে—শিশু বিজ্ঞানের জন্য এর থেকে কি আর উপযুক্ত জায়গা ছিল না ? আর কি সহর রে বাবা ! সাধারণ সভার দিনে পার্কগুলোতে জেতার জন্য প্রাণপণে লড়াই করছে দুটো দল—একদিকে ধনী ব্যবসায়ী, মহাজন, দাস-মালিক আর অন্যদিকে মজুর, আর্টিজান, নাবিক। হৈ-চৈ, গণ্ডগোল, মাথা ফাটা-ফাটি ! মিশর বা ব্যাবিলনের কোন শান্ত নির্জন মন্দিরে নবজাতক বিজ্ঞানের দোলনাটা টাঙানো হলে এর চাইতে অনেক ভালো হত না কি ?

যে সময়কার কথা, ব্যাবিলনের মন্দিরগুলোতে জ্ঞানিগুণী লেখকরা তখন সকাল থেকে রাত অবধি লিখে লিখে ভরিয়ে ফেলছে মাটির তৈরী ছোট ছোট চাকতিগুলো। বর্ণমালার তখনো আবিষ্কার হয়নি—সংকেত চিহ্ন দিয়ে লেখা হতো। অনেকটা তীরের ফলার মতো দেখতে। এই ছোট্ট চাকতিগুলোতে ভরা ছিল হাজার হাজার বছর ধরে সংগ্রহ করা জ্ঞানের ভাণ্ডার। একটা চাকতি বলছে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য। আবার অন্য চাকতিটা বলছে—সূর্য কিভাবে রাশিচক্রের ভেতর দিয়ে যায়, বছরের দিন আর মাস কি ভাবে গুনতে হয়, কি করে গ্রহণের ভবিষ্যৎবাণী করতে হয়, চাঁদ থেকে গ্রহ আর তারার দূরত্ব—এমনি আরো অগুনতি তত্ত্ব। গণিত বিদ্যার ওপরও চাকতি রয়েছে। সে গুলোতে আছে—গুন আর ভাগ করতে হয় কি ভাবে, ভগ্নাংশ কি, কি ভাবে বর্গমূল নির্ণয় করতে হয়। এতেই শেষ নয় ; চাকতি গুলোর মধ্যে রয়েছে—পৃথিবীর নানা দেশের পাহাড়-নদীর লম্বা তালিকা, শব্দকোষ, সাহিত্য সংকলন, ব্যাকরণ… । রয়েছে চিকিৎসা সম্পর্কিত 'বই পত্রের' খোঁজ খবর, প্রথম মানচিত্র—যেখানে পৃথিবীকে দেখানো হয়েছে সমুদ্র আর নদী দিয়ে চারভাগে ভাগ করা আর সমুদ্র দিয়ে ঘেরা একটা গোলকার জিনিষ হিসেবে।

আচ্ছা, এটা কি বিজ্ঞান নয় ?

ঠিক আছে, আমাদের প্রশ্নের জবাবটা জানার জন্য স্বয়ং ব্যাবিলনবাসীদেরই বরং সাহায্য নেওয়া যাক। এসো, এই চাকতিগুলোর একটা পড়ে দেখি।

"এনুমা এলিস।" "ওপরের আকাশ আর নীচের পৃথিবীর নামও যখন ছিলনা, আদি সৃষ্টিকর্তা আপসু এবং আদি জননী টিয়ামাট, তাঁদের জল মেশালেন এক জায়গায়… । মন্দিরও তখন তৈরী হয়নি, তৈরী হয়নি সমুদ্র, কোনো দেবতা আবির্ভাব হননি তখনো—এমন কি নামও পাননি কেউ, ভাগ্য বলতেও তখন কিছু ছিল না। তারপর সৃষ্টি হলেন দেবতারা · " মাটির চাকতি বলে চলে—কি ভাবে দেবতা আপসু আর তাঁর স্ত্রী টিয়ামাট, যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের সন্তানদের সাথে। ইয়া ( Ea ) নামে একজন দেবতা হত্যা করলেন আপসুকে এবং মাদ্রুক ( Madruk ) নামের অন্যজন টিয়ামাটকে ছিঁড়ে ফেললেন দু টুকরো করে—যেন একটা বলের দুটো ভাগ। একটা ভাগ দিয়ে তৈরী হ'ল আকাশ আর বাকি অর্দ্ধেকটাতে তৈরী হ'ল পৃথিবী।

* এই রচনাটি এম. ইলিন ও ই. সেগালের লেখা Giant at the crossroads বইটির একটি অধ্যায়ের সংক্ষেপ। অনুবাদক—প্রদীপ ঘোষ।

এটাই কি বিজ্ঞান ?

না, এটা বিজ্ঞান নয়। এ ধরণের লেখা যারা লিখেছিল, তারা তখনো—আমরা যেভাবে চিন্তা করি, সেভাবে ভাবতে শেখেনি। তারা নিজেদের কাছে প্রশ্নটাকে এইভাবে রাখে নি : কেমন করে এবং কিসের থেকে সব কিছু এসেছে ? প্রশ্নটাকে তারা অন্যভাবে রেখেছে : কার থেকে সমস্ত কিছু এলো ? কোন বাবা এবং কোন মায়ের থেকে ?

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ভেবে এসেছে : প্রত্যেকটি জিনিষ "বাবা-মা এবং সন্তান"—এই সরল সিঁড়ি বেয়ে পৃথিবীতে এসেছে। আর তাই, দীর্ঘকাল ধরে মানুষ ভাবত—পৃথিবীর এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর সম্পর্ক বাবা-মা'র সাথে সন্তানের সম্পর্ক যেরকম, ঠিক সেই রকমই।

যাক, আমরা যেখানকার কথা বলছিলাম সেই ব্যাবিলনে ফিরে আসি। ব্যাবিলনের অধিবাসীরা বছরের কবে কবে গ্রহণ লাগবে তা গণনা করতে জানতো। কিন্তু তখনো তারা এগুলোকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলে বুঝতে শেখেনি। তারা ভাবতো, এগুলো হ'ল অশুভ সংকেত—আসন্ন বিপদ থেকে মানুষকে সাবধান করে দেবার জন্য দেবতার হুঁশিয়ারী।

অনেক—অনেকদিন ধরে তারা এই ভাবেই বিশ্বাস করে এসেছে। গাদা গাদা মাটির চাকতিতে বোঝাই তাদের লাইব্রেরী। অসংখ্য 'বইয়ে'র তালিকায় ভরা। এগুলোতে প্রচুর জ্ঞান রয়েছে ঠিকই—কিন্তু বিজ্ঞান নেই। প্রাচীন এই বইগুলো ছিল নানান্ ধরণের মন্ত্র আর স্তোত্রে ভরা। পোকা-ধরা দাঁত সারাবার জন্য গাছের আঠার সাথে চক মিশিয়ে মুখে নেবার আগে বিরাট এক লম্বা-চওড়া স্তোত্র আউড়ে নিতে হতো—কি ভাবে ভগবান তৈরী করলেন আকাশ, আকাশ তৈরী করল পৃথিবীকে, পৃথিবী জন্ম দিল নদীর, নদী থেকে জন্ম নিল খাল, খাল জন্ম দিল পোকার আর সেখান থেকে পোকা গিয়ে ঢুকলো দাঁতের মধ্যে। স্তোত্রের শেষের দিকটা এই পোকার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত : "ভগবান তাঁর শক্তিশালী বাহু দিয়ে ধ্বংস করুন তোমাকে।"

বিজ্ঞান সৃষ্টি করার আগে মানুষকে শিখতে হয়েছিল কি করে নতুন ভাবে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু হাজার বছরের অন্ধকারে ভরা মন্দিরের গর্ভে নতুন নির্ভীক চিন্তা মানুষের কাছে আসে না।

আর তাই আবার আমরা ফিরে আসি হৈ-হট্টগোল আর ভীড়ে ভরা মিলেটাসে। এখানে মানুষের ভীড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে গেলেই পৃথিবীর সব কটা ভাষা তুমি শুনতে পাবে। তাদের মধ্যে যেমন রয়েছে বিভিন্ন ধরণের রীতি-নীতি আবার তেমনিই রয়েছে হরেক রকম ধর্ম। দেব-দেবীদের নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প শুনতে পাবে এখানে—ইথিওপিয়ার দেবতাদের গায়ের রঙ কালো, থ্রেসের দেবতাদের মাথার চুল লাল আর চোখ নীল...। আর কি করে তুমি বুঝবে গ্রীকরা যা বলছে তাই ঠিক আর থ্রেস এবং ইথিওপিয়ার লোকদের কথাগুলো সব ভুল ?

মিলেটাসের অধিবাসীরা ছিল আর্টিজান, ব্যবসায়ী আর নাবিক। অনেকদিন আগের থেকেই তারা দেবতা আর রূপ-কথার নায়কদের গল্প সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। বুড়ো যাজকদের সব গল্প-গুলোকেই যদি সত্যি বলে মেনে নিতে হয় তাহলে তো বিশ্বাস না করে উপায় নেই যে সমস্ত অভিজাতরাই হ'ল দেবতাদের সাক্ষাৎ বংশধর ! আর তাই যদি হয়, মিলেশীয় ব্যবসায়ী, বস্ত্র শিল্পী এবং নাবিকদের সাথে অভিজাতদের যখন লড়াই বেধেছিল তখন কেনই বা দেবতারা এলেন না তাঁদের বংশধরদের বাঁচাতে ? সুতরাং মানুষ পুরণো পবিত্র গল্পগুলোকে ভুলোবার দিয়ে নয়, সন্দেহ দিয়েই ধ্বংস করলো। মিলেটাসে এমন মানুষরা ছিল যারা সাহস করলো নতুন ভাবে দেখতে, নতুনভাবে ভাবতে। এঁরাই হলেন পৃথিবীর প্রথম জ্ঞানী মানুষ—থেলস এবং অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার।

কি শেখালেন তাঁরা ? দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের লেখার মাত্র দু-একটা টুকরো ছাড়া কিছুই আর পাওয়া যায় নি—আর তাও প্রতি-পক্ষের রচনায়, আক্রমণের জন্য তুলে দেওয়া উক্তি হিসেবে। কিন্তু কেনই বা পাওয়া যায় না তাঁদের লেখাগুলো ?

এগুলো লেখা হতো প্যাপিরাসের ওপর, যার স্থায়ীত্ব খুব কম। আর, ২৫০০ বছর তো নেহাৎ কম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওগুলোকে রক্ষা করা যেতো। তাহলে আর কে মদত জুগিয়েছিল সময়ের ধ্বংসাত্মক কাজে ? মানুষ নিজেই। কারণ, এই বইগুলো ছিল পুরাতন ধ্যান-ধারণা এবং ধর্মের বিরুদ্ধে রক্তিম চ্যালেঞ্জ। আর পুরাতন যে লড়াই ছাড়া নতুনকে জায়গা ছেড়ে দেয়ে না—এতো জানা কথাই। তাই পুরণো ধ্যান-ধারণার রক্ষকরা তাদের আক্রমণকারী বইগুলোকে পুড়িয়ে শেষ করে দিল। দু-একটা পাতা থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, থেলস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ সেটুকুই। আমরা শুধু এটুকুই জানতে পেরেছি, জন্মের দিক থেকে আপাতঃ দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন ফোনেশীয় আর পুরনো দিনের লোকেরা তাঁকে বলতো "সাতজন জ্ঞানী মানুষের" একজন।

ইতিহাসের পাতায় থেলস-এর নিজের কথা না শোনা গেলেও তাঁর বিরুদ্ধে যারা কুৎসা রটাতো তাদের গলাটা খুব স্পষ্টভাবে শোনা

যায়। তাদের রটানো কাহিনীগুলোর একটা হ'ল এই রকম : থেলস নাকি সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুনতে গুনতে হাঁটতেন। আর একবার নাকি এই রকম হাঁটতে-হাঁটতে, পড়বি তো পড়—সটান একটা কুয়োর নীচে গিয়ে হাজির!

দেখছো তো, বিজ্ঞানের শুরুর সময় থেকেই মানুষ কেমন 'অন্যমনস্ক বিজ্ঞানীদের' নিয়ে গল্প বানিয়ে এসেছে? প্রাচীন কালে কায়িক পরিশ্রমের কাজটাকে ক্রীতদাস, কারিগর আর চাষাদেরই কাজ বলে মনে করা হতো। ব্যবসাটা ছিল বণিকদের ব্যাপার। আর বিজ্ঞানী-দার্শনিক?—তাঁদের তো মনে করা হতো এ জগতের বাইরের লোক! এই জন্যই থেলস, ডিমোক্রিটাস, আর্কিমিডিস এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সব সময়েই দেখানো হয়েছে 'ভীষণ অন্যমনস্ক' বিচ্ছিন্ন এক মানুষ হিসেবে।

থেলস্ তাঁর চারপাশের জগতকে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করে ছিলেন। এই জন্যই তাঁকে আমরা একজন বড় বিজ্ঞানী বলি। পৃথিবীর ওপর কি ঘটছে, সেটা যেমন ভালোভাবে দেখতে পারতেন তিনি, তেমনিই আবার দেখতে পারতেন আকাশের তারার মধ্যে কি ঘটছে। স্থলপথে যেমন তিনি প্রচুর ঘুরে ছিলেন, তেমনি ঘুরে ছিলেন সমুদ্রের বুকেও। থেলস্ একইধারে ছিলেন বণিক, নাবিক এবং যন্ত্রবিদ। নুন কেনার জন্য তিনি সমুদ্রের ওপর পাড়ি দিয়েছিলেন মিশরে। তৈরী করেছিলেন সেতু এবং খাল।

আচ্ছা, নতুন কি এমন আবিষ্কার করে ছিলেন থেলস্? কেন আমরা তাঁকে বলি পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক? ঠিক আছে, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য আমাদের জানা আছে সব এক জায়গায় জড় করা যাক। আমাদের তথ্যগুলো বলছে—৩৬৫ দিনে যে এক বছর হয়, এটা নাকি তাঁরই আবিষ্কার। কিন্তু এটাতো তিনি যেখানে গিয়েছিলেন সেই মিশরের লোকেরা অনেক আগের থেকেই জানতো। আর তিনিও এই ব্যাপারটা সেখানেই জেনেছিলেন। ওয়াগন নক্ষত্র-মণ্ডলী তিনিই আমাদের চিনিয়েছেন বলে শোনা যায়। কিন্তু ফোনেশীয় নাবিকরাও এটা অনেক আগের থেকেই চিনতো আর এই নক্ষত্র-মণ্ডলীর সাহায্য নিয়েই জাহাজের গতিপথ ঠিক করতো তারা। থেলস্ গণনা করে দেখিয়ে ছিলেন, সূর্যের ব্যাস হ'ল আকাশের বৃত্তের ৭২০ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এই আবিষ্কারটাও নতুন কিছু নয়—ব্যাবিলনের পুরোহিতরা বহু আগেই এটা অঙ্ক কসে প্রমাণ করেছিল। আর মিলেটাসে এই আবিষ্কারের খবর পৌঁছনো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিলনা। কারণ মিলেটাস ছিল এমনই একটা জায়গা যেখানে দুনিয়ার যে কোন জাতের যে কোন জ্ঞান শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছবেই।

থেলস্ হলেন প্রথম গ্রীক যিনি জ্যামিতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ছিলেন। ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে পিরামিডের উচ্চতা কি করে বার করতে হয়, এটা তাঁরই আবিষ্কার। কিন্তু মিশরীয়রাও জ্যামিতি জানতো। আর সম্ভবতঃ তাদের কাছ থেকেই থেলস্ এই সূত্রটা পেয়েছিলেন। থেলস্-এর মতে পৃথিবীটা হ'ল একটা চ্যাপ্টা থালার মতো। আর এই থালাটা জলের ওপর ভাসছে। নৌকো যেমন দোল খায়, এই থালাটাও তেমনি দোল খায় মাঝে মাঝে; আর তার থেকেই হয় ভূমিকম্প। কিন্তু ব্যাবিলনের অধিবাসীরাও তো ঠিক একই কথা বলতো!

থেলস্ ভাবতেন সমস্ত কিছুই জল থেকে এসেছে। ব্যাবিলনের পুরোহিতরাও বলতো, এই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে আদিমাতা টিয়ামাট থেকে। আর এই টিয়ামাট ছিলেন জলে ভর্তি বিরাট এক গহ্বর। মিশরীয়রাও বলতো, সৃষ্টির শুরুতে ছিলেন নান্—জল।

তাহলে নতুন কি করে ছিলেন থেলস্?

মিশর, ব্যাবিলন আর ফোনেশিয়াতে হাজার হাজার বছর ধরে জ্ঞানের যে বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল তা সংগ্রহ করে নিজের দেশে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এটা একটা বিরাট কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু এইটুকুতেই যদি তাঁর কাজ শেষ হয়ে যেতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাঁকে পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক বলতাম না। তিনি যে কেবল দুনিয়ার যাবৎ জ্ঞানকে খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করেছিলেন তা নয়, অনেক কিছুই সম্পূর্ণ নতুন জিনিষের সন্ধানও তিনি দিয়েছিলেন তখনকার মানুষকে। একেবারে নতুন একটা দৃষ্টিভংগীতে তিনি দেখতেন বস্তু-জগৎকে। আর পৃথিবীর কাছে এটাই ছিল তাঁর সব চাইতে বড় অবদান। সৃষ্টির রহস্য বুঝতে গিয়ে ব্যাবিলনের পুরোহিতরা যেখানে জল-দেবী টিয়ামাটকে দেখতো, থেলস্ সেখানে দেখলেন বস্তুর এক মৌলিক উপাদান—জল। তারা যেখানে দেখতো অন্তহীন শূন্যের দেবতা আপসুকে, সেখানে থেলসের কল্পনায় ধরা দিল স্থান (space)-এর ধারণা।

মিশরীয়রা যখন আকাশ আর পৃথিবীর ছবি আঁকতো, তখন এদুটোকেই তারা দেখাতো দেবতা হিসেবে। পৃথিবীর ছবির ওপরে থাকতেন বায়ু-দেবতা যিনি আবার নিজের মাথার ওপর দু হাত দিয়ে ধরে থাকতেন স্বর্গের দেবতাকে। আকাশের দেবতার গা ঘেঁসে ঝক্‌মক করতো তারা—তারাতো সূর্য আর চাঁদ। মিশরীয় পুরোহিতের শিষ্য ছিলেন থেলস্। কিন্তু পুরনো সব কিছুরই তিনি ব্যাখ্যা দিলেন একদম নতুনভাবে। সূর্যকে আদৌ দেবতা বলে স্বীকার করলেন না

থেলস ; তিনি বললেন — সূর্য এবং চাঁদ ঠিক পৃথিবীর মতো একই পদার্থ দিয়ে তৈরী। তিনি বললেন, চাঁদ যখনই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এক সরলরেখায় গিয়ে পড়ে তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। প্রথম প্রথম তোমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, 'কে' শব্দটাকে 'কি' দিয়ে সরানো এবং "কার থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হ'ল ?" এই প্রশ্নটাকে পাল্টে "কিসের থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হ'ল ?"—এই কথাটা ব্যবহার করার ভেতর দিয়ে কি আর এমন বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব ?

কিন্তু এই ছোট্ট ত্রুটি সংশোধনটাই ছিল বিজ্ঞানের শুরু।

থেলস বলেছিলেন, জল থেকেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি। জল থেকেই এসেছে পৃথিবী এবং এরই ওপর সে নৌকোর মতো ভেসে আছে। থেলসের এই কথাগুলো আজকে আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। কিন্তু এই কথাগুলোকে আমরা যদি তাঁর আগের মানুষরা যা বলেছে তার সঙ্গে তুলনা করে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো—থেলসের দৃষ্টিভংগী আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভংগীর থেকে খুব বেশি আলাদা ছিলনা।

"জল এমন একটা মৌলিক বস্তু", বলে ছিলেন থেলস, "যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে অন্য সমস্ত কিছুই এবং যাতে শেষপর্যন্ত সব কিছুই ফিরে যায়।" শূণ্য থেকে কোনো পদার্থই সৃষ্টি হতে পারে না এবং পদার্থকে ধ্বংসও করা যায়না।

কি আশ্চর্য ! শিশু বিজ্ঞানের এই প্রথম কথাটা ঠিক তার শেষ কথাটারই মতো—কারণ এটাই তো বস্তু ও শক্তির অবিনশ্বরতার সূত্র।

যে দেবতাদের মিশর ও ব্যাবিলনের মন্দিরে জড়ো করা হয়েছিল, সেগুলো ছিল জড়, গতিহীন, অলস। আর বিশ্বসভ্যতার চৌরাস্তা—এই মিলেটাসে যেখানে সমস্ত ভাষা, বিশ্বাস এবং রীতি-নীতি একসাথে মিলিত হয়েছে, মিশে গেছে পরস্পরের সাথে—সেখানেই আমরা অবশেষে খুঁজে পেলাম নবজাত বিজ্ঞানের দোলনাটাকে !

থেলসের শিক্ষা কঠিন আঘাত হেনেছিল পুরণো ধ্যান-ধারণার মূলে যা স্মরণাতীত কাল থেকে কায়েম রেখেছিল অভিজাত শ্রেণীর শাসন। তিনি নিজে ছিলেন নতুন মানুষদেরই একজন, যারা ব্যবসা করতো—পাড়ি দিতো দুস্তর সমুদ্রে। তারা 'দেবতাদের বংশধর' নয়, কিন্তু তাদের হাতে ছিল ক্রীতদাস, ছিল টাকা। এই নতুন মানুষরাই প্রথম ঘোষণা করেছিল—নাবিকদের বংশধরেরা, অভিজাতদের বংশধরদের তুলনায় কোনো অংশেই কম স্বর্গীয় নয়। দুনিয়াটা দেবতাদের থেকে সৃষ্টি হয় নি। দুনিয়ার সমস্ত কিছুই এসেছে—একই বস্তু থেকে। আর তাই, বিশাল সমুদ্রের অসংখ্য জলকণার মতো রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকই সমান। সমান তাদের অধিকার।

# চিঠিপত্র

মতামতের জন্ত সম্পাদক মণ্ডলী দায়ী নয়

## লেখকদের বিরুদ্ধে সরকারের ষড়যন্ত্র

VIRASAM-এর ( বিপ্লবী লেখক সমিতি ) সদস্য-লেখকদের কারাগারে বন্দী করে রাখাটা একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মাস আগে, ১৯৭৩-এর অক্টোবর-নভেম্বরে ভারভারা রাও, চেরবান্দা রাজু ও এম. টি. খান—এই তিনজন লেখককে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার তার ফ্যাসিস্ট 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার আইনে' আটক করে। এর আগে, ১৯৭১-এ জ্বালামুখী, চেরবান্দা রাজু ও নিখিলেশ্বরকে পি. ডি. অ্যাক্টে বন্দী করা হয়েছিল। কিন্তু এই সব আইনে কাজ হচ্ছে না দেখে সরকার যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বে-আইনী এবং শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করে, লেখকদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবারে নিজেকে ফ্যাসিস্ট, হৃদয়হীন ও জন-বিরোধী বলে প্রমাণ করেছে।

অন্যান্য ষড়যন্ত্র মামলাগুলিতে কানু সান্যাল এবং নাগভূষণ পট্টনায়কের মতো রাজনৈতিক ও বিপ্লবী নেতারা জড়িত। কিন্তু এই তথাকথিত সেকেন্দ্রাবাদ ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী গ্রুপের সাথে লেখকদেরকেও হত্যা, লুঠ ও আইন-সম্মত সরকারকে অস্ত্রের সাহায্যে উচ্ছেদের মামলায় জড়ানো হয়েছে। এইভাবে সরকার জন-সাধারণকে সত্যকথা বলা, লেখা ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দিকে এক 'বিপ্লবী' পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই ষড়যন্ত্র মামলায় VIRASAM-এর সম্পাদক শ্রীমধুসূদন রাও, 'সৃজনা'র সম্পাদক ভারভারা রাও, বিখ্যাত তেলেগু সমালোচক কে. বি. রামানা রেড্ডী, এম. টি. খান এবং বিখ্যাত কবি চেরবান্দা রাজু সহ ছেচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে বিচার চলছে। এই লেখকদের প্রায় সবাই এখন কারাগারে।

এটা এমন একটা ঘটনা যা থেকে দেশের সমস্ত লেখকদেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ব্যক্তিগত স্তরে সারা দেশ জুড়েই এই ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এটা ঘটতে চলেছে সেইসব লেখকের ক্ষেত্রেই, যাঁরা তাঁদের লেখার ভিত্তি হিসাবে বেছে নিয়েছেন সাধারণ নিপীড়িত মানুষের সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট এবং সংগ্রামকে। সরকার ভুলে যাচ্ছেন যে লেখকদের লেখনী এমনই শক্তিশালী যে তা সরকারের এই চক্রান্তকে পুরোপুরি মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং সরকারের উপর প্রচণ্ড আঘাতও হানতে পারে। লেখকরা যদি এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্তে সময়মত একটি ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন না করেন, তবে 'সাহিত্যরক্ষক' পুলিশ রাত্রির যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো নিরপরাধ লেখককে তাঁর বাসভবন থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে কোনো নির্জন স্থানে গুলী করে হত্যা করতে পারে। আর সেক্ষেত্রে তাঁর কণ্ঠস্বর সাহিত্যের ভাষা কিম্বা জনসাধারণের প্রতি বার্তায় পরিণত হবে না।

এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে সভা করতে, প্রচারপত্র প্রকাশ করতে, লিখতে এবং প্রতিবাদ জানাতে আমরা লেখকদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

—ত্রিলোচন শাস্ত্রী, চন্দ্রাবলী সিং, বিজয় মোহন সিং, শিবপ্রসাদ সিং, লালধর ত্রিপাঠী 'প্রবাসী', সদাশিব দ্বিবেদী, বিশ্বনাথ মুখার্জী, শ্যাম তিওয়ারী, কাঞ্চনকুমার, বাচস্পতি, শুকদেব সিং, অজয় কুমার, সুরেশ ভ্রমর, সুকান্ত চ্যাটার্জী, রাজেন্দ্র প্রসাদ দুবে, নরেন্দ্র নিরাভ, হরি নারায়ণ রাঠী, সুরেশ প্রতাপ সিং, জামিল আহমেদ, সংকথা প্রসাদ, এন. ভট্টাচার্য, প্রকাশচন্দ্র জৈন, শঙ্কর চৌধুরী, রাজেন্দ্র প্রসাদ তিওয়ারী, অসিত প্রকাশ সিং, আর. এস. শর্মা, হরেরাম তিওয়ারী, বিজয় কুমার ভোরা, সুরেন্দ্র প্রতাপ, এস. আতিবাল, সুখেন্দু প্যাটেল, যোগেন্দ্র নারায়ণ, বীরেন্দ্র শুক্লা, পি. এন. ঝিজরাণ, সত্যোগি শিবাজী, অরবিন্দ, প্রদীপ কুমার, অর্জুন কেশরী, কমলেন্দু, ভারত বৈশনর, উজ্জ্বল কুমার, অমিতাভ চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ ত্রিপাঠী, সুজিত চক্রবর্তী, জুগনু সরাদেয়া, অরুণ কুমার মিত্র, অশোক মুখার্জী, হীরালাল, সুবীর চ্যাটার্জী, অরুণ দত্ত, সুলতান আব্বাস রাজু, জে. বি. মোহন, ধ্যামরী···বারানসী॥

## নতুন সংগঠন : নতুন দৃষ্টিভঙ্গী

কলেজ-জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ও কর্তৃপক্ষের অন্যায়-অবিচারের মোকাবিলা করার জন্তে, সামগ্রিকভাবে দেশের বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও তাকে বিকশিত করার দায়িত্ব সাধ্যমত নিজেদের কাঁধে নেবার জন্তে আমরা, কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা গত মে মাসে একটি সমিতি গঠন করেছি—

চিঠিপত্র/পরপৃষ্ঠা

'কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশন'— 'CNMCSA'।

উপরোক্ত লক্ষ্য পূরণ করতে হলে, প্রতিটি ছাত্রসংগঠনকেই কতগুলি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে বলে আমরা মনে করি। CNMCSA-এর ক্ষেত্রে সেই মৌলিক নীতিগত ভিত্তি হল :

১) যে কোনো দল বা মতের সমর্থক বা অনুগামীরাই CNMCSA-এর সভ্য হতে পারেন। কারণ দল ও মতের প্রশ্নে যত ভিন্নতাই থাকুক না কেন, ছাত্র হিসাবে আমাদের সকলের স্বার্থ ও সমস্যা এক ও অভিন্ন।

২) CNMCSA কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রচারের মঞ্চ নয়। CNMCSA-এর লক্ষ্য বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেকার মিলের দিকগুলিকে ভিত্তি করে ছাত্রসমাজের সাধারণ সমস্যাবলীর মোকাবিলায় একটি ব্যাপক ছাত্রসংহতির জন্ম দেওয়া এবং সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সেই সংহতিকে আরও নিবিড় এবং আরও বিস্তৃততর করা।

৩) CNMCSA গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। কলেজে সুস্থ ও গণতান্ত্রিক আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে রক্ষা করা CNMCSA-এর একটি মৌলিক দায়িত্ব। ছাত্রস্বার্থে প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকারকে সে সম্মান করে এবং স্বাগত জানায়। CNMCSA বিশ্বাস করে—ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, তাদের সমস্যা, আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদির প্রশ্নে, চিন্তা ও মতামত বিনিময়ের এরকম একটা খোলামেলা পরিবেশই হ'ল ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্বশর্ত।

৪) বিশেষভাবে ছাত্রস্বার্থে এবং সাধারণভাবে হাসপাতালের উন্নতির জন্য CNMCSA আপোষহীন লড়াই চালাবে। এই লড়াইয়ের পথে যে কোনো শক্তির মোকাবিলায়ই CNMCSA প্রস্তুত—তা সে শক্তি যে-ই হোক না কেন।

৫) ছাত্রস্বার্থে পরিচালিত প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই CNMCSA, সাধ্যমত, সমর্থন করবে। কলেজের সমস্ত স্তরের কর্মচারী এবং ছাত্রদরদী শিক্ষকদের সঙ্গেই একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে CNMCSA আগ্রহী।

৬) টিঁকে থাকা এবং বিকশিত হওয়ার প্রশ্নে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং অংশ গ্রহণই CNMCSA-এর একমাত্র মূলধন।

অন্যান্য শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আমাদের এই উপলব্ধিগুলিকে নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবেন—এটাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

CNMCSA-এর পক্ষে—
**ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত,**
যুগ্ম আহ্বায়কদের একজন

## ডাঃ নরমান বেথুন প্রসঙ্গে

'বীক্ষণ', দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংকলনে চিঠিপত্র বিভাগে 'বীক্ষণ' প্রসঙ্গে শ্রীমতী সুজাতা চক্রবর্তীর মতামত পড়লাম। একজন পাঠক হিসাবে তাঁর মতামতের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আমি ভিন্নমত পোষণ করি।

তিনি 'ডাঃ নরমান বেথুন' এই ধারাবাহিক রচনাটি সম্বন্ধে বলেছেন "ডাঃ নরমান বেথুন তাঁর জীবনের এক সময় যথেচ্ছচারিতা এবং উচ্ছৃংখলতায় গা ভাসিয়ে ছিলেন।...একজন বিপ্লবীর জীবনে এই ধরণের কালো দিক থাকতে পারে অতীতে। কিন্তু তা আমরা বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলবো কোন উদ্দেশ্যে ?"

বিখ্যাত মানুষের কর্মজীবনের সফলতা তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। জীবনীপাঠের উদ্দেশ্য হ'ল সেই ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তিনিও যে আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ ছিলেন, প্রলোভন, অসংযম ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁকেও যে সংগ্রাম করেই জয়ী হতে হয়েছিল, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব থেকে তিনিও যে মুক্ত ছিলেন না—সংগ্রাম করেই তা থেকে তাঁকে মুক্ত হতে হয়েছিল, তিনি যে কোনো আলৌকিক উপায়ে রূপকথার দৈত্যহন্তা রাজপুত্রের মতো সমস্ত বাধা-বিঘ্ন জয় করতে পারেননি, সাধারণ মানুষও যে চেষ্টা করলে একনিষ্ঠ সংগ্রামের দ্বারা কিছু পরিমাণে সফলতা লাভ করতে পারে—এটাই এ রচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। (অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মনোবল জোরদার করা) জীবনের অন্ধকার দিক কোনোরকম কলপ্রসূ না হতে পারে কিন্তু যা বাস্তব সত্য তাকে বাদ দেওয়া বা গোপন করা (বা শ্রীমতী চক্রবর্তীর ভাষায় সংক্ষিপ্ত করা) মিথ্যাচারেরই সামিল। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত অধিকাংশ মহাপুরুষের জীবনীতেই সংগ্রামের কথা বাদ দিয়ে তাঁদের জন্মগতভাবে অত্যন্ত ধীমান, প্রতিভাবান হিসাবে বর্ণনা করে, ঈশ্বরের ধারণার ন্যায় দুর্বোধ্য করে, তাঁদেরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাই তাঁদের জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস না জানা থাকায়, আমরা তাঁদের প্রতি প্রকৃতভাবে শ্রদ্ধাশীল হতে পারিনি এবং তাঁদের জীবনী আমাদের মনে কোনো অনুপ্রেরণারও সৃষ্টি করতে পারেনি। দেবপূজার ন্যায় তাঁদের পূজা

প্রভৃতি ব্যয়বহুল অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনই শ্রদ্ধা—এ ধারণাও তাই গড়ে উঠেছে। এই দিক থেকে 'বীক্ষণে' প্রকাশিত বেথুনের জীবনী এক সুন্দর ঐতিহ্য স্থাপন করেছে। এটাই ভবিষ্যত জীবনী-রচয়িতাদের আদর্শ হওয়া উচিৎ।

শিল্পগত দিক থেকেও রংয়ের উজ্জলতার উপযুক্ত প্রকাশ হয়, অপেক্ষাকৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন পশ্চাদভূমির মাধ্যমে। কাজেই বেথুনের জীবনের উজ্জল দিকগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে গেলে তাঁর অতীত জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি সম্বন্ধেও সঠিকভাবে জানা দরকার। এবং তবেই মানুষ হিসাবে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন হওয়া সম্ভব। তাঁর জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি বাদ দিয়ে তাঁকে আমাদের সামনে উপস্থিত করলে তাঁকেও দেবতার মতো 'সর্বগুণসম্পন্ন' 'জীবনের চরম উৎকর্ষতার' উদাহরণ হিসাবে মনে হবে ও তাঁকে আমাদের কাছের মানুষ হিসাবে আর জানতে পারব না। পত্র-লেখিকার মতে, বেথুনের জীবনের পুংখানুপুংখ বিবরণ 'ক্ষতিকারকও হতে পারে'। আমার মনে হয় এ আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক ; কারণ কোনো জীবনী-রচয়িতারই উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নয় যে পাঠক—বিপ্লবী জীবনটিকে যেভাবে আঁকা হয়েছে, সেটির আক্ষরিক অনুকরণ করুক। অন্ধ অনুকরণ করতে গেলে মানুষের মনোবল কমেই যায়। বিপ্লবীকে একজন মানুষ হিসাবে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করলে, তবেই তার জীবনালোকে আমরা নিজেদের সঠিক পথ খুঁজে নিতে পারব। ধন্যবাদান্তে,

অরূপ মিত্র

## বাড়তি ভাড়ার বিরুদ্ধে শিবপুর বি. ই. কলেজ ছাত্রদের আন্দোলন

গত ১২ই আগষ্ট, বাড়তি ভাড়া দিতে অস্বীকার করায়, তিনজন বি. ই. কলেজের ছাত্রকে বাস থেকে নামিয়ে (কলেজের আগের ষ্টপেজে) সাদা পোষাকের পুলিশ মারধোর করে। এই খবর পাওয়া মাত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্ররা বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। দাবি ওঠে - দোষী অফিসারের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল করতে দেওয়া হবে না। ঘটনাস্থলে যে পুলিশ ভ্যানটি ছিল ছাত্ররা সেটিকে ঘেরাও করে কলেজের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। উদ্দেশ্য, কলেজের সমস্ত ছাত্রের সামনে পুলিশকে ক্ষমা চাওয়ানো। কিন্তু কলেজ গেটে ভ্যানটাকে ঢোকানোর মুহূর্তেই কিছু পুলিশ অতর্কিতে ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, লাঠি চার্জ করতে শুরু করে এবং কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করে। ছাত্ররা কলেজের অধ্যক্ষকে কলেজ গেটে নিয়ে আসে এবং তাঁর কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়ায় পুলিশ কলেজে প্রবেশ করতে পারে না।

এই ঘটনার প্রতিবাদে পরের দিন সারা কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের বাড়ী যায়। সেখানে পুলিশ সুপার গত দিনের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন ও দোষী অফিসারের উপর বিচার বিভাগীয় তদন্তের এক লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। জেলা শাসক, বি. ই. কলেজের ছাত্রদের জন্য বাস-কনশেসনের প্রতিশ্রুতি দেন।

জানি না, পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকের কথা কতটা কাজে পরিণত হবে, কিন্তু সেই দিনের ঘটনা আমাদের এক নতুন আলো দেখায়। সেদিনকার আন্দোলন দেখিয়ে দেয়, দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কতখানি জোরদার হয়।

জনৈক ছাত্র,
শিবপুর বি. ই. কলেজ

# ঃ নিয়মাবলী ঃ

- প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 'বীক্ষণ' বেরুবে।
- 'বীক্ষণ'-এর সমস্ত বয়সের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ, স্বচ্ছ এবং বলিষ্ঠ গল্প, কবিতা ও অন্যান্য রচনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।
- লেখা পাঠানোর সময় লেখক-লেখিকারা, 'বীক্ষণ' প্রধানত যাঁদের জন্য সেই কিশোর-যুব-ছাত্র-সমাজের কথা মনে রেখে লেখা পাঠাবেন বলে আমরা মনে করি।
- 'বীক্ষণ'-এর পাঠক-পাঠিকারা আশা করি এ' ব্যাপারে একমত হবেন যে শুধু বিষয়বস্তুই নয়, রচনার প্রকাশ-ভঙ্গিও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচ্য। প্রকাশভঙ্গি যত সরল হয় ততই ভালো। কিন্তু সাথে সাথে তাকে প্রাণবন্তও হতে হবে। সরল করতে গিয়ে যেন তা শ্লোগানধর্মী হয়ে না পড়ে।
- 'বীক্ষণ'-এর প্রকাশিত রচনা সম্পর্কে ও কিশোর-যুব-ছাত্র-সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপারে পরামর্শ, মতামত—এসবের জন্যও আমরা আবেদন রাখছি। এগুলি 'চিঠি-পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হবে।
- সমস্ত ধরনের রচনাই কাগজের এক পৃষ্ঠায়, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখে পাঠানোর জন্য আমরা অনুরোধ করছি।
- উপযুক্ত ডাকটিকিট সহকারে পাঠালে অমনোনীত রচনা, অমনোনীত হবার কারণ দেখিয়ে ফেরৎ পাঠানো হবে।
- 'বীক্ষণ' সম্পর্কে 'বীক্ষণ'-এর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা—এঁদের মতামতের জন্যও আমরা সাদর-আহ্বান রাখছি।
- 'আমাদের কথা' বিভাগটি ছাড়া অন্য রচনাগুলিতে প্রকাশিত মতামতের দায়িত্ব রচনাকারীদের।
- যোগাযোগের ঠিকানা :—

**"বীক্ষণ কার্যালয়"**

৫৯সি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪

সাক্ষাতের দিন ও সময় : রবিবার বাদে যে কোনো দিন ; সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

- ডাকযোগে টাকা-পয়সা পাঠানোর ঠিকানা :

বীক্ষণ ( প্রদীপ মুখার্জী )

৬১, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কিশোর ও যুব-ছাত্রদের মুখপত্র **বীক্ষণ**

তৃতীয় বর্ষ : দুর্ভিক্ষ বিষয়ক বিশেষ সংকলন, নভেঃ ('৭৪)-এপ্রিল '৭৫

# সূচী

'সম্পাদকমণ্ডলী-বীক্ষণ'এর পক্ষে প্রদীপ মুখার্জী কর্তৃক 'বীক্ষণ কার্যালয়', ৫৯সি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত ও 'মুদ্রণী' ১৩১বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ফোন : ৩৫-০৩০৪ হইতে মুদ্রিত।

দাম : দুই টাকা মাত্র

# আমাদের কথা

আমাদেরই ঘোষণা অনুযায়ী বর্তমান সংকলন প্রকাশিত হবার কথা ছিল ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে। এখন ১৯৭৫-এর এপ্রিল। অর্থাৎ ঘোষিত সময়ের দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে 'দুর্ভিক্ষ বিষয়ক বিশেষ সংকলন' প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে পত্রিকার পথপরিক্রমায় আরও একটি বছর কেটে গেছে—গেল মার্চ মাস থেকে বীক্ষণ তৃতীয় বছরে পা দিয়েছে। অস্বাভাবিকরকম এই দেরির জন্যে যে কারণগুলি দায়ী, সেগুলি হল :

এক) 'বিশেষ শারদ সংকলন, ১৯৭৪' প্রকাশিত হবার পর থেকে পত্রিকার দায়িত্বশীল কর্মীরা, অনেকটা যেন পালাক্রমেই, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি নানান দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়েন। ফলে বর্তমান সংকলনের কাজে হাত দিতেই অনেক দেরি হয়ে যায়।

দুই ) পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকাদের কাছে মতামত ও লেখা পাঠানোর জন্যে গত সংকলনে আমারা যে আবেদন রেখেছিলাম—তাতে সাড়া দিয়েছেন খুব অল্প -জনই। ফলে বর্তমান সংকলনকে রূপ দিতে ইতিমধ্যেই যাঁরা পত্রিকার সাথে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন মূলত তাঁদের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

তিন ) দুর্ভিক্ষের মতো বিশাল এবং জটিল বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি সংকলন প্রকাশের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই যে পূর্ব-অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তা আমাদের ছিল না। ফলে বর্তমান সংকলনের জন্য আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছিলাম তার বেশির ভাগটাই বাস্তবানুগ ছিল না—পরিকল্পনাটি আমাদের শক্তি ও সামর্থের অনেক বাইরে চলে গিয়েছিল। একে আমাদের শক্তি ও সামর্থের সীমায় বাঁধতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

চার ) এইসব অনিবার্য কারণগুলির জন্য অবস্থাটা এমন হয়েছিল যে কখনও ছাপাখানার কর্মীদের সাথে আমরা তাল রাখতে পারিনি, অর্থাৎ তাঁদের যখন হাত ফাঁকা আমরা তখন ব্যর্থ হয়েছি পাণ্ডুলিপি জোগান দিতে—আবার কখনও আমরা ঠিকমতো পাণ্ডুলিপি জোগান দিয়েছি কিন্তু ছাপাখানার কর্মীদের হাত তখন ফাঁকা না থাকায়, সেই পাণ্ডুলিপি দিনের পর দিন ফাইলবন্দী হয়ে থেকেছে।

দুর্ভিক্ষের যে তীব্রতার মধ্যে বর্তমান সংকলনের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছিলাম, দীর্ঘ এই দেরির ফলে স্বাভাবিকভাবেই এখন আর তা নেই। কিন্তু আমাদের "সৌভাগ্য"ই বলতে হবে যে, তা সত্ত্বেও বর্তমান সংকলন আদৌ তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। কারণ রোজকার সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ( যেমন ত্রিপুরা, গুজরাট ) দুর্ভিক্ষ যে আবার সেই তীব্রতা নিয়েই ফিরে আসছে তার নানা ইঙ্গিত আমাদের চোখে পড়ে।

পাঠক-পাঠিকা, সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় সহযোগিতায় অনভিপ্রেত এই দুর্বলতাগুলিকে কাটিয়ে উঠে আগামী সংকলন থেকেই বীক্ষণ আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে এই আশা নিয়ে—কৈফিয়তের তালিকা এখানেই শেষ করছি।

## 'বিশেষ ক্রোড়পত্র—দুর্ভিক্ষ : একটি অধ্যয়ন' সম্বন্ধে দু'একটি কথা

দুর্ভিক্ষ আমাদের সামনে সাধারণত একটা 'হঠাৎ ঘটে যাওয়া' দুর্ঘটনার রূপ নিয়েই হাজির হয় এবং অনাহার ও অপুষ্টির ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিকরকম এক বিরাট সংখ্যায় মানুষকে আমরা মারা পড়তে দেখি। দুর্ভিক্ষের এই আপাত আকস্মিক এবং দুর্ঘটনামূলক চেহারাটা প্রায়শঃই, যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে তার জন্ম হয় তা থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়। দুর্ভিক্ষও সাধারণত আমাদের সামনে দেখা দেয় বন্যা, খরা ইত্যাদি 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের' সঙ্গী হিসাবে। এর ফলে এইসব 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়'গুলিকেই আমাদের দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ বলে মনে হয়। অর্থাৎ সবদিক থেকে এই ধারনাটিই জোরদার হতে থাকে যে দুর্ভিক্ষের সমস্যাটি একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা—এমন একটি সমস্যা আগে থেকে যার সম্পর্কে আঁচ করারও উপায় নেই। সরকারী ও অন্যান্য অনেক বেসরকারী সংস্থার প্রচারযন্ত্র এবং এমনকি বহু সরকারী ও বেসরকারী সমালোচকেরাও বহুলাংশে এই ধারনাটিকে জোরদার করতে সাহায্য করেন। ফলে দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধান হিসাবে যেসব বিষয় বা পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা এবং বিতর্ক চলে সেগুলি সাধারণত খাপ খায় মূলত সাময়িক চরিত্রের একটি 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের' সাথে। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পিছনে দেশী-বিদেশী অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক কিছু মানুষের (যারা তাদের শ্রেণীস্বার্থেই দুর্ভিক্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমিকে সৃষ্টি করেছে এবং টিঁকিয়ে রেখেছে) যে একটা সচেতন ভূমিকা আছে সেটা প্রায় গোচরেই আনা হয় না, শুধুমাত্র মজুতদার, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের ঘাড়ে দায়দায়িত্বের গোটা বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া।

কিন্তু দুর্ভিক্ষের সমস্যাটা কি সত্যিই এরকম একটা পটভূমিহীন হঠাৎ 'নীলাকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো ঘটনা', নাকি দীর্ঘদিন ধরে তার পটভূমি ও মঞ্চ তৈরী হয়ে থাকে—যে মঞ্চে তারপর 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' ও 'কালোবাজারী'রা মৃত্যুর দূত হয়ে দেখা দেয়? অন্যদিকে এইসব মৃত্যুর দূতেরা আসছেই বা কোত্থেকে? তাদের জন্ম হয় কি করে? দুর্ভিক্ষ কি যখন তখন সারা পৃথিবীর যেখানে সেখানে দেখা

দেয়? নাকি কোনো কোনো অঞ্চলে তার তীব্রতাকে বিশেষভাবে অনুভব করা যায়?

এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে 'দুর্ভিক্ষ : একটি অধ্যয়ন'—এই বিশেষ ক্রোড়পত্রটিতে। ক্রোড়পত্রটি আদৌ আমাদের মৌলিক গবেষণার ফসল নয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামত ও বিশ্লেষণের সংকলন এটি। সীমাবদ্ধ সামর্থ ও অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে এতে অনেক অসম্পূর্ণতা এবং ফাঁক থেকে গেছে। পাঠক-পাঠিকারা রচনাটিকে কেন্দ্র করে প্রাণবন্ত আলোচনা চালাবেন এবং এই অসম্পূর্ণতা ও ফাঁকগুলি পূরণ করে দেবেন আশাকরি।

॥ বীক্ষণ সমীক্ষা দল ॥

---

# পত্রপত্রিকার ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে

গত ১৭ই মার্চ, 'গণবিপ্লব' কার্যালয়, ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯ এ 'পূর্বতরঙ্গ' ইত্যাদি কয়েকটি পত্রিকার উদ্যোগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—পত্রপত্রিকার উপর আক্রমণ। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'গণবিপ্লব'এর সভাপতি শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য। সভায় যেসব পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন : পূর্বতরঙ্গ, ছাত্রফ্রন্ট, অগ্নিদীপ, অধিকার, দর্পণ, বাঙলাদেশ, গণবার্তা, শ্রমিক দর্পণ, রাষ্ট্র, লোকমঞ্চ, দেশহিতৈষী, সত্যযুগ, গণসংসার, অভ্যুদয়, প্রস্তুতিপর্ব, গণদাবী, অন্যচোখে, ছাত্র-সংহতি, স্টুডেন্টস্ প্রেস, প্রলেটারিয়ান পাথ, স্পন্দন, লালতারা, বীক্ষণ, নান্দীমুখ, শ্রমিক ঐক্য, সম্মুখ, পরিক্রম, যুবসংস্কৃতি, গণশক্তি, মাসিক বাঙলাদেশ, গণবিপ্লব ও প্রলেটারিয়ান এরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কবি শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মুর্শিদাবাদ সাংবাদিক সংঘের একজন প্রতিনিধি। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নীচের প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়।

(১) সংবাদপত্র-পত্রিকার ওপর আক্রমণ সম্বন্ধে

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিবৃন্দের এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে বর্তমানে দেশে সংবাদপত্রের যেটুকু সীমিত স্বাধীনতা আছে সেটুকুও এই রাজ্যে ক্রমশই গভীর বিপদের সম্মুখীন হয়ে উঠেছে। সর্বশেষ, পত্র-পত্রিকাগুলি ও তাঁদের ছাপাখানাগুলিও প্রত্যক্ষ আক্রমণের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে। লক্ষণীয় যে, যে কোন দল মতের কাগজই হোক না কেন, সেই কাগজ যখনই সরকার বা সরকারী দলের বিরুদ্ধে কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করেছে তখনই শাসকশ্রেণীর মধ্যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে এবং সেইসব কাগজের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণীর শাসানি এবং সরাসরি আক্রমণ চলছে। 'বাঙলাদেশ', 'দর্পণ', 'ক্রন্দসীয়ার', শান্তিপুরের 'জনতার মুখ', 'আলিপুর বার্তা' প্রভৃতি আরও অনেক কাগজ এই আক্রমণের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছেন। আরও অন্যান্য কাগজের উপরেও নানাভাবে আক্রমণ চলছে অথচ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসক দল কিংবা মুখ্যমন্ত্রী কোন নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করেননি এবং পুলিশ ও প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করেছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন-ভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মত মৌলিক অধিকার রক্ষার স্বার্থেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই আক্রমণকে রুখবার প্রয়োজন এই সভা গভীরভাবে অনুভব করছে এবং মনে করছে যে সেজন্য একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস গড়ে তোলা উচিত।

(২) দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সাংবাদিক হত্যা সম্বন্ধে

সায়গণস্থিত ফরাসী সাংবাদিক জাঁলে রাসিকে মার্কিন প্রশ্রয়পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার যেভাবে মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে এই সভা তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার এবং নিন্দা জানাচ্ছে। একজন কর্মরত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে সারা দুনিয়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকাগুলির এই সভাও কণ্ঠ মেলাচ্ছে।

---

# "ক্ষুধা"র বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধের একটি কাহিনী

[ বিশেষ ক্রোড়পত্র/পৃ-৭ (৫) এর পর ]

৪০ ভাগ শক্ত শস্য। আগে শাকসব্জি শুধুমাত্র পেঁয়াজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; এখন নিত্যব্যবহৃত শাকসব্জির মধ্যে রয়েছে ২০টি রকমের তরিতরকারী। খাবারের একঘেয়েমি আর নেই। দৈনিক খাদ্যের মধ্যে এখন শুয়োরের মাংস ও ডিম স্থান নিতে শুরু করেছে। রেনেসাঁর আগের ইউরোপের মতো চীনেও, বিপ্লবের আগে কেবলমাত্র ঔষধ পত্রের সাথেই চিনি তৈরী হতো। এখন কৃষকরা প্রয়োজন মতো চিনি খেতে পারছে। অধ্যাপক লি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, "পুষ্টি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন শুধুমাত্র স্বাস্থ্য ও সাচ্ছন্দ্যকেই নির্দ্ধারিত করে তা নয়, তার থেকেও গভীরভাবে নির্দ্ধারিত করে মানুষের বস্তুগত উৎপাদনের ক্ষমতাকে।"

কয়েকটি প্রদেশে খরা-বন্যার প্রকোপ সত্ত্বেও, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে সাম্প্রতিক কালে চীনে—দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। [illegible] বলা যায়, এক কালের ক্ষুধার রাজ্য চীন, বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে নিজেকে এমন এক দেশে রূপান্তরিত করেছে যেখানে 'অভাব' [illegible] অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, দুটো [illegible]দনের ক্ষেত্রে চীন ১৯৫৮ সালেই আমেরিকাকে পিছনে ফেলে [illegible]ছে। এদুটো হল গম এবং তুলো। ওই সালে চীনের গম ও তুলো উৎপাদনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৪ কোটি এবং ৩৫ লক্ষ টন; এর বিপরীতে আমেরিকার উৎপাদন-মাত্রা ছিল, যথাক্রমে ৩·৭ কোটি ও ২৬ লক্ষ টন। এখানে খেয়াল রাখা উচিত, গমই হল আমেরিকার প্রধান শস্য এবং চীনের প্রধান শস্য হ'ল চাল—আর চীনই যে বর্তমান দুনিয়ার বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশ, একটা এখন কোনো নতুন খবর নয়।

## হরির লুটের দেহ

**সমীর রায়**

হরির লুটের দেহ—মরা মানুষটার উপর পয়সা ছিটোচ্ছে
অবশেষে কিছু পুণ্যকাম মানুষ।
মাথার কাছে শুকনো পাঁউরুটি, কিছু পরিষ্কার জামা কাপড়
কপালে, মুখে, বুকে, পেটে মাছির মত ভন্ ভন্ করছে কিছু পয়সা।
কোলকাতার পুণ্যকাম মানুষের কৃপায় মৃত মানুষটি এখন শুকনো পাঁউরুটি
কিছু পরিষ্কার জামা কাপড় আর দু'টাকার মত খুচরো পয়সা
ইচ্ছে হলেই হাত বাড়িয়ে নিতে পারে।
অথচ মানুষটা মুখ্যমন্ত্রী. বিরোধীদলের নেতা, অনেক শিল্পী
কত কবির বাসস্থান এই কোলকাতায় অভুক্ত সাতদিন সাত রাত ফুটপাতে।

চাঁদের আলো লোকটাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে শহরে—
লোকটার বাড়ী ক্যানিং। রাত দুপুর চাঁদনীরাতে
পথ হেঁটেছে, মাঠ পেরিয়েছে, সাঁকো ডিঙিয়েছে
তারপর ইষ্টিশন, ইষ্টিশনের পর ইষ্টিশন
ইষ্টিশনের পর ইষ্টিশন··· ··· ···

চাঁদ আর চাঁদিনীরাত লোকটাকে সিগ্ন্যাল পোষ্টের গায়ে বাড়ি মারতে মারতে
ইষ্টিশনের পর ইষ্টিশন পার করেছে।

হায়, লোকটা দুর্ভিক্ষের আয়নার উপর দাঁড়িয়ে
হায়, লোকটা কোলকাতার ফুটপাতে শুয়ে পৃথিবীর তিনভাগ জলে ডুবে গেল।

লোকটা মরার আগে জেনেও গেল না
হরির লুটের বাতাসা হয়ে জন্মেছিল সে
কোলকাতার তুলসী মঞ্চে পুণ্যকাম মানুষ দাঁড়া
বলো হরিবোল, বলো হরিবোল, হরির লুটের দেহ।

## জনৈক অনাহারীর মৃত্যুতে

**মথুরানাথ কুণ্ডু**

তার ও বিবর্ণ মুখে কোন ক্ষোভ জ'মে নেই
কেবল জমাট আর্তি, প্রস্তরিত, নিঃস্পন্দ, নিথর
যেন বা অম্লান আসে জাঙ্গলের নীরক্ত শাখায়।
আহা মৃত্যু, নির্দয় দু'হাতে তোর সব দুঃখ মুছে নিলি?
জন্মাবধি সৌরতাপ, নালিশ জানাবে কার কাছে?

অথবা সে দুঃখ তার দুঃখ নয়, শুধু মৃত্যু,
শুধু মৃত্যু, নতজানু হবে কার কাছে?
বাল্যাবধি পিপাসার্ত, করপুটে ভিক্ষার বেসাতি, তার
মাথার উপরে বয় বৈশাখের গাঢ় দ্বিপ্রহর
তবুও সে ক্লান্ত নয়, ক্লান্তি তার পরাভূত
সপ্রতিভ উৎসাহের তারে। 'আজ সেই ক্লান্তি নেই তাই'
রসাল দ্রাক্ষার মতো একান্ত সে নিষ্পেষিত মৃত্যুর দুয়ারে।
হায় মৃত্যু, শুধু মৃত্যু, নতজানু হবে কার কাছে?

## লঙ্গরখানার ছড়া

সজল সেন

দুধ খাওয়া বাবুরা সব ভীষণ ভীষণ দেশপ্রেমে
ঠাণ্ডা ঘরে বসে বসে ভেতর ভেতর উঠছে ঘেমে,
চাল ডাল নেই দেশে আহা ! মানুষগুলো পায়না খানা
জলদি ক'রে খুলতে হবে চতুর্দিকে লঙ্গরখানা !

বাজারে সব পত্রিকারা দুর্ভিক্ষের ছাপছে ছবি
উল্লাসেতে নাচছে তারা যাদের ফটো তোলার হবি,
মানুষগুলোর করুণ ছবি দেখা এবং সওয়া যায়না
দেশজুড়ে দাও জলদি খুলে কেবল লঙ্গর লঙ্গরখানা !

পত্রিকাতে অনাহারের করুণ করুণ পত্র দেখে
বালিগঞ্জের ফুলপরীদের হৃদয়গুলো উঠলো কেঁপে,
কালমৃগয়া নাচেন তারা দেশপ্রেমে ধিনৃতা নানা,
লাভের পয়সায় খুলতে হবে গোটা কয়েক লঙ্গরখানা !

মজুতদারে কাঁদতে থাকে দুঃস্থ মানবতার নামে
মহাজনে দিচ্ছে চাঁদা, আসন পেতে স্বর্গধামে,
পচাডালের কন্ট্রাক্ট পান বিধানসভার কেষ্ট জানা
লাট সাহেবে আসেন ছুটে করতে ও'পেন লঙ্গরখানা !

এলেন প্রধান বিচারপতি, লঙ্গরখানায় ধরেন হাতা
স্কুলপিয়ালা ছেলেরা তাঁর মাথায় ধরে ঝালরছাতা,
মজুতদারের ছেলেরা সব মজুতখানায় দিচ্ছে হানা
যা আছে দাও, খুলতে হবে দেশ বাঁচাতে লঙ্গরখানা !

দেশপ্রেমিক মন্ত্রীরা সব দেন প্রেরণা ত্যাগ স্বীকারে
এদেশেতে কেউ মরেনি আর মরবে না কেউ অনাহারে,
অপুষ্টিতে মরলে তারা অনাহার তাই বলতে মানা
অনাহারের মৃত্যু রোখে সমাজবাদী লঙ্গরখানা !

বচনবাগীশ বিপ্লবীরা অনাহারের মৃত্যু দেখে
দৈনিক এবং সাপ্তাহিকে গরম গরম ভাষ্য লেখে,
ডাণ্ডা বাঁধা ঝাণ্ডা হাতে বাজায়ে কাঁসি, কাঁই না নানা,
বলছে তারা, মোদের হাতে দাও তুলে সব লঙ্গরখানা !

দিন দুনিয়ার দু'জন প্রভু করেন ভীষণ মস্করা
চিরটা কাল সবাই মিলে অনাহারে থাক্ তোরা,
হাত পেতে থাক্, আমরা তোদের জোগিয়ে যাবো নিত্য খানা
ভারতবর্ষ থাক চিরকাল মোদের হাতের লঙ্গরখানা !

## সংক্রান্তি

রণজিৎ মুখোপাধ্যায়

আমন ধানের চিঠি এলো,
খুশীতে ভুরভুর করছে সবুজ সুগন্ধ
টইটুম্বর মাঠের পর মাঠ
যুঁই ফুল ফোটার মত পাকা সোনা হেমন্তের রোদ !

দ্রুত ডাকঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকি,
হাঁটছি ত' হাঁটছি, পথ আর ফুরোয় না
একটা ট্রেন দ্রুত ছুটে গেল উত্তর থেকে দক্ষিণে
সামনেই মকর-সংক্রান্তির মেলা !

চিঠি রক্তকরবীর মতো
নেচে গেয়ে উঠল, মনকে শিস্ জানাতেই
সমস্ত আকাশকে কাঁপিয়ে
আমার সমস্ত চোখ স্থির, পাণ্ডুর হয়ে গেল :

যেন জন্মান্তর থেকে জেগে উঠলাম,
স্মৃতি এসে জানান দিয়ে গেল
তোমার সেই ছেলেবেলায়
হারিয়ে যাওয়া মা :

সেই মা যার কোলে স্তন পান করেছি
পৃথিবীর বুকে ঘাস গজাবার মহলা থেকে,
সে-ই মা পূর্ণিমা আর অমাবস্যা
যার চোখে সমান— !
সেই মা-কে ক-ত-দি-ন পরে দেখলাম :
মা শুয়ে আছেন, তার গলা শুকিয়ে
শুকনো আকন্দ কাঠ, তার মুখে
জলটুকুও সরছে না, জিবটা পাথর হয়ে গেছে !

# পদক্ষেপ

সাধন মণ্ডল

সারাদিন হাড়ভাংগা খাটুনির পর মেজাজ ঠিক থাকে না হাফিজের। বাড়ীতে অভাব-অনটন নিয়ে বৌ-এর ঘ্যানঘ্যানানি অসহ্য লাগে তার। প্রথমটায় কথা কাটাকাটি হয় খানিকক্ষণ—তারপর হাফিজ আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ঘা কতক বসিয়ে দেয় বৌ-এর পিঠে, যা পায় হাতের কাছে তাই দিয়ে। হাফিজের বৌ জাহিদা মার খেতে খেতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদে, যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দেয় সোয়ামীকে; আর হাফিজ রাগের মাথায় অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় হাঁকাহাঁকি করতে করতে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী ছেড়ে। তারপর ফিরে আসে একসময়। ক্রমশঃ আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়—দাম্পত্য জীবন আবার শুরু হয় যথারীতি।

"যা চাল আছে কাল সকাল তক্ হব্যাক্—গটা ঘরকন্নায় আর এক ছটাক চাল নাই"—জাহিদা সতর্কবানী শোনায়।

যেন কিছু শুনতেই পায়নি এমন ভাব দেখিয়ে হাফিজ সমানে বিড়ি টানছিল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

এই ঔদাসিন্য জাহিদার সহ্য হয় না। সে তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে, "কী—কথাটা কানে গ্যাল? আমার কী—আমিই কি সংসারের একা খাওকী? হাঁড়ি না চোলুলে আমাক্ দোষ দিয়া চোলব্যাক্ নাই—বোলে দিলম—"

"আমাক্ কিসের শুনানুচু? তুই বুজে কোরগে যা; চালের লেগে আমি কি ডাকাতি কোত্তে যাব-অ? আমি লারবঅ"—হাফিজ চোখ রাঙায়।

এমন চোখ রাঙানিকে জাহিদা বিন্দুমাত্রও গুরুত্ব দেয় না। সে-ও সমান তেজের সংগে জবাব দেয়, "এ্যাঃ, কী আমার মরদ রে! আমি মাগীটা যাব চাল খুঁজতে, আর ওই অমন ধাকাধেড়্যা মিন্সাটা ঘরটায় বসে বিড়ি ফুঁকব্যাক্!"

হাফিজ ঠেস্ দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসেছে মাটির দাওয়ায়। এক হাতে লুঙ্গির উপর দিয়ে উরু চুলকোতে চুলকোতে অন্যহাত নেড়ে বলে, "তুই মাগী, মাগীর মত থাক্‌বি—বেশী চুতবুত করবি ত এখুনি পঁন্দে গড়ালে দূর করে দিব-অ—"

অপমানিত জাহিদা চিৎকার করে, "কী হোইচ্যে? গড়ালবি বইকি? তা ভিন্ন তোর আর মুরাদ কি! কি আমার ভাতার রে! খাও, না খাও—সংসার উচ্ছুক পুড়ুক—কিছুটি বলা চোলব্যাক্ নাই; যা মন যায় উ তাই কোরব্যাক্—মরদ বলে চেক্‌কাটি!"

এবার হাফিজ উঠে দাঁড়ায়। লুংগিটাকে কোমরে গুঁজ করে বাঁধতে বাঁধতে রাগে হুংকার ছাড়ে, 'তুই বেড়ে যাচ্চু জাহিদা—"

সংগে সংগে জাহিদা ধারালো ভাষায় জবাব দেয়, "ক্যানে? তুই মারবি? লে মার দেখি—লে মার—দেখি তোর ঘাড়ে কত রক্ত—"

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হাফিজ সত্যিই মারধোর করে জাহিদাকে। কিছুটা হাঁকাহাঁকি ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টির পর হাফিজ বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। বেচারী জাহিদা মনের দুঃখে কাঁদতে বসে ডোবার ধারে।

তারপর সন্ধ্যা নামে। ডোবার জলে চারপাশের কালো কালো ছায়া পড়ে। দূরে কোথাও শোনা গেল শেয়ালের ডাক।

একরাশ চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল জাহিদার মাথায়। সাদির পর থেকেই অভাব আর অভাব। কতভাবে, কত ফন্দিফিকির করে সংসার চালাবার চেষ্টা করে জাহিদা। চৌখশ গৃহিণীর মত সে চেষ্টা করে দুখের ভাতকে সুখের করে খেতে। কিন্তু হায় আল্লা, ইকি অ্যাক্ রগচটা মরদ!

দুঃখে অভিমানে চোখে জল আসে জাহিদার। আব্‌বা, আম্মা, ছোট ভাই হানিফের কথা মনে পড়ে। পরের সংগে ঘরকরা কী ঝকমারী কাজ—কত কিছুকে মেনে নেওয়ার পরও, কত সাধ-আহ্লাদকে বিসর্জন দেওয়ার পরও তাদের দুজনের মধ্যে অশান্তি ঘুচে না। টাকার চিন্তাই জ্বালা ধরায়, তছ্‌নছ্ করে সংসারটাকে। টাকার কথা মনে হতেই আকর্ষণ বেড়ে যায় জাহিদার হাফিজের উপর। বেশ খাটে 'ত মানুষটা। তবু অভাব কেন যায় না? ভাবে পুরুষ মানুষ, গতর খাটায় সারাদিন—রাগের মাথায় দু'কথা না হয় বলেইছিল, সে চুপ করে থাকলেই সব মিটে যেত। অনুশোচনা হয় জাহিদার নিজের অবিবেচক কাজের জন্য। স্বগতোক্তি করে সে, দোহাই আল্লা; কৃপা কর—লোকটাকে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরিয়ে দাও। রাগের মাথায় কিছু করে না বসে মানুষটা।

সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে হাফিজ।

অনেক চেষ্টায় বহুকষ্টে চালের সামান্য ব্যবস্থা করেছে হাফিজ। গ্রামে এখন কাজকর্মের সুযোগ নেই। যদিবা কখনও কেমনও পাওয়া যায়, মজুরি খুব কম। চালের যা আগুনদাম, সারাদিন গতর খাটিয়েও কিছুই হয় না। সময় সময় চালও অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই ক'দিন হাকিজদের কাটলো একবেলা আটপেটা খেয়ে।

ক্রমশ: ভাত খাওয়াটা হয়ে দাঁড়ালো এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে হাকিজ ঘুরে বেড়ায় কাজের খোঁজে। কিন্তু কোথাও কোন কাজে পাওয়া যায় না। পা চলতে চায় না, শরীর অবসন্ন হয়ে আসে, তবুও জোর করে এগোতে হয় আশার তাগাদায়। লালমাটির ধু ধু প্রান্তর দুপুরের তেজী রোদে ঝিমোয়। নীল আকাশে চোখ ঝলসানো উজ্জ্বলতা—তাকানো যায় না। আঁকাবাঁকা জীর্ণ কতকগুলো খেজুরগাছে দুঃস্থা মায়ের শিথিল স্তনের মত ঝুলছে মাটির হাঁড়ি। সন্তানকে শেষ জীবনরসটুকু উজাড় করে দিতে মায়ের যেমন কোন দ্বিধা নেই, এই রোদজ্বলা জনহীন প্রান্তরেও ক্ষয়িষ্ণু খেজুরগাছগুলো ফোঁটা ফোঁটা রস নিংড়ে দিচ্ছে মানুষকে নিঃশব্দে।

জাহিদার সারাদিন কাটে বনেবাদাড়ে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে হয়রান হয়ে ঘুরে মরে পেটের দায়ে। পাকা তুখোড় অনুসন্ধানী গবেষকের মত জাহিদা উদ্ভিদ রাজ্যে খুঁজে বেড়ায় নিত্য নতুন খাদ্য। শেষ আশ্বিনের কড়া রোদে গা তেতে জ্বালা ধরে—ঘামে জব্‌জব্‌ করে সর্বাংগ। মাথা ভর্তি উকুন চিড়বিড় করে। বিছুটি পাতার রোঁয়া লেগে হাত-পা চুলকোয়। পায়ের তলা থেকে টেনে টেনে তুলতে হয় কাঁটা খোঁচা বার কতক।

গ্রামের একপ্রান্তে বসির মিঞার ভেঙে পড়া পরিত্যক্ত ভিটা। বৃষ্টির জলে মাটির দেওয়াল খেয়ে খেয়ে গেছে। খড়ের চাল, বাঁশের বাতা জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, ধসে পচে বিবর্ণ হয়ে গেছে—একটা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধে স্থানীয় বাতাসটা ভারী হয়ে থাকে। চারদিকে বুনো গাছগাছালির দুর্ভেদ্য জংগল, দু-একটা ভাংগা হাঁড়ি-কুঁড়ি বিশৃঙ্খলভাবে এখানে ওখানে ছড়ানো। কতকগুলো কাঁথাকাপড় পচে শুকিয়ে আছে ঘাসবনে। লোকচলাচল সাধারণতঃ এ এলাকায় হয় না। এসব স্থানই জাহিদার আজ কাম্য—দশজনের দৃষ্টির অগোচরে যেসব স্থান আজও আছে, সেখানেই কিছু পাবার সম্ভাবনা থাকে। তবে যেভাবে সারা গ্রামটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বনেবাদাড়ে, তাতে এমন স্থানও কি আর খুব বেশীদিন গোপন থাকবে?

জাহিদার ধারনা ছিল জায়গাটা এখনও সে ছাড়া আর কারো চোখে পড়ে নি। কিন্তু সেখানে নারাণের বৌ বিমলাকে দেখে সে অবাক। রাগও হল মনে মনে।

মাস চারেক হল চুরির দায়ে নারাণ জেলে। বিমলা আট মাসের পোয়াতী। এই অবস্থাতেও সে ভাংগা পাঁচিল বেয়ে উঠেছে পচা খড়ের স্তূপে। জাহিদা বিস্ফারিত চোখে বিস্ময়সূচক কণ্ঠে বল্‌লো, "হ্যাঁলা বিম্‌লি? তুই কি মেয়্যা লো! অত বড় পেট্‌টা লিয়ে তুন্‌ লোজ্‌জায় অত উব্‌রে উঠেচু! কী কোচ্‌চু উখেনে? পড়ে মরবি যে লো!" বিমলা নেমে আঁচলটা খুলে দেখায় জাহিদাকে। বেশ কয়েকটা ব্যাংএর ছাতা তুলেছে সে। বল্‌লো, "এই পুয়ালছাতু কটা বুন। কুথাও ত কিছু নাই—অত্তর পেট হোইচে গাঁয়ের লোকের—কিছু কি থাকবার জো আছে লা? বনধারকে গেলম্‌। বলি যদি এই কাড়াং, কি কুড়কুড়ি ছাতু পাই। তা কুথা পাবি—হায় হায়, সব শেষ! তাই এই থ্যানুকে এলম্‌—"

একটু পরে বিমলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, "আমার কথা যেমত তেমন—ছা দুটি বুন না খেয়ে থাকতে লারে।"

বিমলা চলে যেতেই জাহিদা পাঁচিলে উঠে দেখ্‌লো ব্যাংএর ছাতা আর নেই।

"সবগুলাই লিয়েচে হারামজাদী" গজরাতে গজরাতে অন্যত্র যাবার উদ্যোগ করে জাহিদা।

পথে দেখা হল শকিলা, তার ছোট ছেলে রাখিব আর হাজিপাড়ার মোতিয়ার সংগে।

"ইদিক্‌ কুথা যাচ্‌চু"—শকিলা শুধায় জাহিদাকে।

মোতিয়ার কোমরে একবোঝা ডগ্‌ডগে শালুকডাঁটা; শকিলার আঁচলে কি যেন বাঁধা খানিকটা। বুনো কচুশাক এক তাড়া ঘাড়ে করে বয়ে আন্‌ছে রাখিব। জাহিদা উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে, "বাব্‌বা, এত কুথায় পেলে গো? ধারে কাছে'ত ইসব কুটিটি নাই।"

মোতিয়া আর শকিলা নিরুত্তর। পরস্পর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। রাখিব হঠাৎ বলে ফেললো, "রাণীসায়েরের মাঠে আছে চাচী—অনেক আছে—"

আর দেরী না করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো জাহিদা।

শকিলা অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বল্‌লো, "দেগ্‌লি মোতিয়া, এর লেগেই বল্‌ছিলম সংগে লিস্‌ না ওই ছোঁড়াটাকে! যা, এবেরে কাল কী করবি দেগ্‌গে যা—"

"জাহি' মাগী মস্ত বজ্জাত—দেগ্‌বি উ সব তুলে আনব্যাক্‌"! পরে শকিলা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে রাখিবকে, "মুকপড়া, তোর মরণ নাই! ছায়ের কী ভেক্‌"।

এভাবে ব্যাংএর ছাতা, শালুক ডাঁটা, কচুশাক, বুনো গাছ-গাছড়া, বুনো ফলমূল, ঘাসের বীজ কিছুই বাদ রাখলে না মানুষের রসনা। গেঁড়ি, গুগ্‌লি, শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি সবই দুষ্প্রাপ্য হল একদিন। সৌন্দর্য্য বিতরনে প্রকৃতি দেবীর সুনাম থাকলেও খাদ্যের ব্যাপারে ক্রমশ: বোঝা গেল তাঁর কৃপণতার কথা।

সন্ধ্যার কিছু পরে ফিরল হাকিজ। সারাদিন ঘুরেছে হাকিজ রোদে। পা ভর্তি ধুলো, কপালের ওপর লেপ্‌টানো তেলহীন চুল, ঘামে চব্‌চবে শরীর, তোব্‌ড়ানো মুখ, ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসা চোখ—

ক্লান্ত অবসন্ন হাফিজকে চেনাই দায়। ধপ্ করে বসে পড়ে দাওয়ায়। হেলান দেয় বাঁশের খুঁটিতে। হাঁপায়।

জাহিদাও ফিরেছে খানিকক্ষন হল। সেও খুব ক্লান্ত—পা ছড়িয়ে বসেছে উঠোনে। দুজনেই চুপচাপ।

"একটুন্ পানি দিবি ?" হাফিজ নীরবতা ভঙ্গ করলো।

"দিই" বলে উঠ্লো জাহিদা।

কাস্তের মত এককালি চাঁদ হেঁটে বেড়াচ্ছে আকাশে। হাওয়া বইছে অল্প অল্প। ডোবার ধারে তালগাছে শব্দ উঠ্ছে পাতা নড়ার। কাছে কোথাও নিমগাছের মগডালে শকুনের বাচ্চাগুলো অবিকল মানবশিশুর মত কাঁদছে থেকে থেকে।

চাঁদের আলোয় হাফিজ দেখ্লো জাহিদাকে। মাথার রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। দুর্বল, শীর্ণ দেহ শুক্‌নো জৌলুষহীন রোদে ঝল্সানো মুখ। চোয়ালের হাড় ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চায়। জীর্ণ ময়লা শাড়ী। বড় মায়া হয় জাহিদার জন্য। মনটা কেমন করে হাফিজের। সে জাহিদার সোয়ামী। সামান্য ভাত কাপড়টুকুও দিতে পারে না তাকে। অথচ কারণে অকারণে জাহিদাকে কত কটু কথা বলে সে। বড় অপরাধী মনে হয় নিজেকে একটা কথা ভেবে আজ। এমন চরম দুর্দ্দিনে জাহিদা এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে যেমন তেমন করেও তার পেট ভরাবার চেষ্টা করে—তাকে ছেড়ে চলে তো যায় নি জাহিদা! আর শুধু কি জাহিদারই এই হাল ? ওই ত হাবিবের বৌ, জহুরের বৌ, আজিজের বেটী, আফ্জলের বুড়ী মা—সবারই এক দশা। সবক'টা মুখ আজ একই আদলে গড়া বলে মনে হয় তার। ক্ষুধায়, যন্ত্রনায়, ক্লান্তিতে, দুশ্চিন্তায়, জর্জরিত সবকটা মুখ—একটা অব্যক্ত বোবা কান্নায় যেন ভারী হয়ে আছে সবার চোখ—অসহায় দৃষ্টিগুলো আজ যেন ব্যঙ্গ করে হাফিজের পৌরুষকে।

কেমন যেন করে সারাটা শরীর। রক্তের মধ্যে কিসের যেন জ্বালা ধরে একটা। সারাদিনের রৌদ্রের ঝাঁঝ এখন ছড়িয়ে পড়ছে হাফিজের শিরায় শিরায়। রক্তের কণিকাগুলো ছুটতে চায় অবাধ্য দুর্বার গতিতে—কেটে বেরিয়ে আসতে চায় শরীর থেকে। পেশী-গুলো যেন শক্ত হয়ে যায়।

"হ্যাঁগা, শুনলম্ যে ইখেনে কুথায় খেঁচড়ী বাঁটা দিচ্চে—" জাহিদার কথায় চিন্তায় বাধা পড়ে হাফিজের। লংগরখানায় একটা দৃশ্য ভেসে উঠ্লো হাফিজের চোখের সামনে। সে, জাহিদা, আফ্জলের মা, হাবিবের বৌ আরও কতজন দাঁড়িয়ে আছে সুদীর্ঘ লাইনে দুরন্ত গরম রোদে ঘণ্টা আকুল প্রতীক্ষায়। সামান্য একটু পচাধসা দুর্গন্ধ চালের খিচুড়ীর জন্য ঝগড়াঝাঁটি, ঠেলাঠেলি এমনকি মারামারি পর্যন্ত হচ্ছে! আর ভাবতে পারে না। বছরের পর বছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখ্ছে হাফিজ। অথচ এভাবেই এতকাল কেটে গেছে—হাফিজের কিন্তু সহ্য হল না আর। মাথার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটলো হাফিজের।

"কুন্ শালা এবেরে রক্তারক্তি না করে! আল্লার কিরা—শুনল্ম, ছিদাম মড়লের ঘরে চাল রোইচে এত;" তড়াক্ করে লাফ দিয়ে নামল দাওয়া থেকে হাফিজ। কোমরে গামছাটা বাঁধতে বাঁধতে চিৎকার করল প্রাণপণে, "এ আফ্জল্যা, আরে হো জহর্যা—সব বেরিই আয়—। আর আজ না বেরাস্ ত মা-মাগ্ করুস্ তরা!"

ঘর থেকে ধারালো কাটারিটা হাতে নিয়ে বেরোতে যাবার উদ্যোগ করতেই জাহিদা হাতটা ধরে ফেলে হাফিজের।

"আমার মাথা খাও, কথা শুন—ইকি কোচ্চ গো!"

হাতটা সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে হাফিজ বল্লে, "ছাড় তুই—আর লয়—আমার মরনই ভাল। না ঘুরে এলে আজ বুজবি মাথা খেয়েচু ভাতারের—"

ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল হাফিজ। বহুবার বহু কারণে রাগতে দেখেছে হাফিজকে জাহিদা। কিন্তু তার আজকের এই রাগ এবং তেজ নতুন লাগে জাহিদার। মানুষটা হঠাৎ পাল্টে গেল নাকি?

কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জাহিদা।

# চন্দ্রকোনার চিঠি

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মেদিনীপুর জেলার উত্তরদিকে প্রায় দেড়শো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে 'চন্দ্রকোনা' থানা। মোট নব্বই হাজার থেকে একলাখ লোকের বাস। কৃষি প্রধান এলাকা। কোনোরকম যন্ত্র শিল্পই এ অঞ্চলে নেই, যা আছে তা হ'ল মুমূর্ষু কুটির শিল্প।

গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবাঙলার গ্রামাঞ্চলে যে ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছে, সেটা এখানে কি রকম তা দেখতে গিয়েছিলাম। ভিন্ন ভিন্ন বর্গের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কথা বললেন। রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের মতামত জানালেন।

স্থানীয় জমিদার মধুসূদন রায় একটু ভেবে বললেন—এটা পুরোপুরি নয়, আংশিক দুর্ভিক্ষ। অবস্থাপন্ন চাষী হরি ভুঞ্যা ধীর গলায় বুঝিয়ে বললেন—"এটা দুর্ভিক্ষ নয়। দুর্ভিক্ষ কাকে বলে? —যখন ধনী গরীব কারো ঘরেই ধান চাল থাকে না, তখনই দুর্ভিক্ষ হয়। আমাদের মতো চাষীর ঘরে এখন ধান-চাল আছে, নেই ক্ষেত মজুরদের ঘরে। কাজেই এটা দুর্ভিক্ষ নয়।" নীচের দিকের মানুষরা মোটামুটি একমত "—হ্যাঁ, এটা দুর্ভিক্ষ এবং তা মানুষের সৃষ্টি।" এই নীচের দিকের মানুষরা হলেন—ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, ছোট এবং মাঝারী কৃষক।

মহকুমা কৃষক কংগ্রেসের সভাপতি ও মহকুমা যুব কংগ্রেসের সম্পাদক প্রশান্ত চৌধুরী বললেন—'সব বলছে এটা দুর্ভিক্ষ নয়। তাই আমরা কৃষক ও যুব-র তরফ থেকে বলেছি এটা দুর্ভিক্ষ।' ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য, স্থানীয় এম এল এ. সত্য ঘোষাল বললেন 'নিদারুণ অবস্থা।' আর ভূতপূর্ব এম. এল. এ. মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ষোড়শী চৌধুরীর মতে 'এটা দুর্ভিক্ষ এবং ধারাবাহিক।'

'এ দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি' এ কথাটা প্রথম শুনলাম বর্গাদার বিমল দাসের মুখে। তিনি বললেন,—'গত বছর ফসল কিছু কম হয়নি, এ বছর আরো ভালো হয়েছে। তবু বর্গাদারের দুঃখ যাবার নয়। লোন (Loan) নেই, সার নেই সময় মতো, খালি লোন শোধের সময় তাড়া।' অন্যান্য মানুষদের কাছেও এ প্রশ্নটা রেখেছিলাম। ক্ষেতমজুর নন্দ দাস বললেন— কালোবাজারী আছে, মজুতদার আছে তাদের দেখবার ঢের লোক আছে। কেউ নেই মজুরদের দেখতে। ভাগে জমি নেই, ন্যায্য মজুরী নেই। তার উপর আবার উপরি আছে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। তাই মজুরদের ঘরে ঘরে অভাব।' দিলীপ বারিক, মধ্য কৃষক পরিবারের ছেলে, গ্রামের বাইরে শহরে থেকে কলেজে পড়েন। তিনি বললেন—'জনসংখ্যার অনুপাতে জমি তো বাড়েনি। খেটে খেতে পারে না এমন শিশুর সংখ্যা প্রচুর। এরা অন্যের উপার্জনে বসে বসে খায়, ফলে ঘরে অভাব দেখা দেয়।' অবশ্য শিশু বলতে তিনি ক্ষেতমজুর এবং বর্গাদারের ঘরের শিশুদের কথাই বললেন। গ্রামের স্কুল শিক্ষকদের একজন বললেন—'এ দুর্ভিক্ষ সরকার সৃষ্ট। অকেজো প্রশাসনের ফলে শস্য মজুত হয় এবং মজুত শস্যের চড়া দাম পাওয়া যায়। ধান ওঠার সময় সরকার সৃষ্ট চাপে ধান-চালের দাম পড়ে যায়। ফলে শস্য চাষীর হাত থেকে মজুতদারের হাতে গিয়ে জমা হয়। এর পরেই দেখা যায় ধাপে ধাপে দাম চড়ছে আর ওই মজুতদাররা মুনাফা লুটছে।' জমিদারের বক্তব্য—'সুষম খাদ্য বণ্টন হয়নি। প্রাকৃতিক কারণে ফসল কম হয়েছে। সরকারের ধান সংগ্রহ মূল্য (কুইন্টাল প্রতি চুয়াত্তর টাকা) বাজারের তুলনায় অনেক কম। ফলে সরকারকে বিক্রি করার চেয়ে খোলাবাজারে বিক্রি করা অনেক লাভজনক। তাও বাজারে সব সময় ঠিক দাম পাওয়া যায় না বলেই শস্য মজুত করে রাখতে হয়।"

সি. পি. আই. মুখপাত্র বললেন—'কাজের অভাব এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তার ফলে মজুত উদ্ধার অভিযানের ব্যর্থতাই এই অবস্থা ডেকে এনেছে। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের নামে ক্ষেতমজুরের অন্ন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যেমন একটা গভীর বা অগভীর নলকূপ প্রায় একশো লোকের জীবিকা কেড়ে নেয়। অন্যদিকে সরকারী লাইসেন্স-প্রাপ্ত সার সরবরাহকারী ফাটকাবাজী করে রোজ হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছেন।' সি. পি. এম. মুখপাত্র বললেন—'সরকারের মজুতদার, জোতদার, কালোবাজারী ঘেঁষা নীতির ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। খাবারের অভাব নেই। বেশী দাম দিলেই খাবার পাওয়া যায়। মজুত উদ্ধারের নামে দোষীদের বাঁচিয়ে রেখে যে সমস্ত মাঝারী চাষী ধার করা টাকায় ধান চালের ব্যবসা করেন, তাঁদের

ওপরেই আঘাত এসেছে।' কংগ্রেস মুখপাত্রের বক্তব্য—'এ দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি।' প্রশ্ন রাখলাম—'এই মানুষেরা কারা?' কংগ্রেসকর্মী বললেন—'এঁরা হ'লেন সরকারী কর্মচারী। সরকার যে প্রকল্প ও পরিকল্পনাগুলো হাতে নিয়েছেন, সেগুলি তাঁরা পালন করছেন না। এই অপরাধে আমরা একজনকে কান ধরে ওঠবোস করিয়েছি।'

জনৈক ক্ষেতমজুরের অভিজ্ঞতা—বছরে চার থেকে সাড়ে চার মাস কাজ থাকে। বাকি মাসগুলো বেকার বসে থাকতে হয়। এই সময়ের খাদ্য শাক পাতা, গেঁড়ি গুগলি, কাঁকড়া। কার্তিক মাসে মাঠে কিছু ল্যাটা, কই, মাগুর মাছ পাওয়া যায়। সেই মাছ ধরে অনেকে অন্নসংস্থান করছেন, তবে মাছের দাম আড়াই টাকা কিলো। গ্রামের স্কুল শিক্ষক বললেন—'আমাদের নিঃস্ব অবস্থা। রোজগার একই। অথচ দ্রব্যমূল্য ক্রমেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে জীবনধারন করাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

একটু বিস্তৃত ছবি পাওয়া গেলো স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা সত্য ঘোষাল জানালেন—মোট জনসংখ্যার ৬০% থেকে ৬৫% অর্থাৎ ক্ষুদ্র, মধ্য কৃষক এবং ভূমিহীনরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ কাজ নেই। পাশের ঘাটাল অঞ্চলের চেয়ে এদিকের অবস্থা কিছুমাত্র ভালো না। গেঁড়ি, গুগলি, কাঁকড়া, কচুর ডাঁটা, শাক, ঘাসপাতা ইত্যাদি অধিকাংশ লোকের নিয়মিত খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চালের চোরাচালান, বেশ কিছু লোকের উপজীবিকা। এক কুইন্টাল চাল সাইকেলে চাপিয়ে চেকপোষ্ট পার করতে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পয়সা লাগে, বেশ কিছু মেয়ে রোজ গ্রাম থেকে মফস্বল শহরে কলেজ করতে যায়। এদের অনেকেই আজকাল ব্যাগে করে চাল পাচার করছে।'

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ষোড়শী চৌধুরী বললেন—'এ অঞ্চলে অন্ততঃপক্ষে একান্ন-বাহান্ন জন অনাহারে মারা গেছেন। ক্ষেতমজুর ক্ষেতে কাজ করার সময়ে কিম্বা ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত-ভিখারী পুকুরে জল খেতে নেমে, সেখানেই মারা গেছে। জনবহুল বাসরাস্তার ওপরেই তিনজন মারা গেছেন। একটি গ্রামে জনসভা করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, উদ্যোক্তারা কেরোসিনের অভাবে লণ্ঠন জ্বালাতে পারেন নি, কাঠকুটোর আগুনে সভা করতে হয়েছে। পরনের কাপড়ের অভাবে অনেকে সভায় আসেন নি। কৃষ্ণপুর গ্রামে ধান চুরির অপরাধে তিন ব্যক্তির ডানহাত কেটে নেওয়া হয়েছে। এক আদিবাসী যুবককে টাকা ও মদ দিয়ে এই কাজ করানো হয়েছে। চুরি করে ভাত খাওয়ার অপরাধে একজন অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে প্রচণ্ড প্রহার করে; পুলিশে দেওয়া হয়েছে।'

কৃষক কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের নেতা প্রশান্ত চৌধুরীর ভাষায় এই অঞ্চলের অবস্থা 'শোচনীয়'। মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে আছে। তবে—'অনাহারে মৃত্যুর কোন খবর নেই।' ওঁর সামনে একজন কৃষক বসে ছিলেন। তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন—'হ্যাঁ, না খেয়ে অনেকেই মরেছে।' প্রশান্তবাবু সংশোধন করে দিলেন—'ওগুলো অখলে মরেছে। কুঁড়ের দল, কাজ করবেনা তো খাবে কী?' কৃষকটি জনৈক মৃতের নাম করলে, প্রশান্তবাবু বললেন 'ও বুড়োটা অকম্মা, কাজে বেরোত না।' কৃষকটি অবাক হয়ে বললেন 'ওর কাজ করার ক্ষমতা ছিল না!' প্রশান্তবাবুর জিজ্ঞাসা—'ক্ষমতা কি আমরা জোগান দেবো?' প্রশান্তবাবু অবশ্য ঘাটালে (চন্দ্রকোনা থানা এলাকার বাইরে) সন্তান বিক্রির খবর রাখেন। সেখানে একজন কৃষক ছ' মাসের একটি ছেলে ও দেড় বছরের একটি মেয়েকে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন।

তবে প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন যে সব থেকে দুর্গত শ্রেণী হলেন ক্ষেতমজুররা। সেচযুক্ত এলাকায় বছরে ছয় থেকে সাত মাস এবং সেচবিহীন এলাকায় বছরে চার থেকে পাঁচ মাস এঁদের কাজ থাকে। বাকি কয়মাস বেকার। টাকা ও জিনিষ দুটোতেই (একসাথে) মজুরী পাওয়া যায়। জিনিষ-মজুরী সর্বত্রই এক—একবেলা ভাত, জল-খাবার (মুড়ি), তেল, তামাক, পান। মজুরীর হার অঞ্চল ভেদে পাল্টায়—কোথাও একটাকা, কোথাও দেড়টাকা, দুটাকা... কোথাও বা তিন টাকা (সর্বোচ্চ)। প্রতি পরিবারে যেখানে অন্ততঃ চার-পাঁচজন পোষ্য, সেখানে এক কিলো চাল কেনাও সম্ভব হয় না। মাইলো ইত্যাদির আটা জলে গুলে প্রাত্যহিক একবেলার খাওয়া সারা হয়।

সি. পি. এম. পরিচালিত ক্ষেতমজুর সমিতি গত জুন মাসে দাবি রেখেছেন - ক্ষেতমজুরদের জন্ত সর্বত্র ন্যূনতম মজুরী আট টাকা (জিনিষ এবং নগদ টাকা মিলিয়ে) বেঁধে দিতে হবে। কৃষক কংগ্রেসের দাবি সর্বত্র ৫.৪০ থেকে ৫.৬০ টাকা ন্যূনতম মজুরী চাই। সি. পি. আই. মুখপাত্রের মন্তব্য—'অনেক রাজনৈতিক দল মুখে ছ'টাকা মজুরীর কথা বললেও, মধ্যচাষীদের ভোট হারাবার ভয়ে কিছু করছেন না।

লঙ্গরখানা, চীপ ক্যান্টিন যথারীতি খোলা হয়েছে। এই দেড়শো বর্গমাইলে মোট পাঁচশোর মতো লোককে খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে লঙ্গরখানাগুলোতে। ঝাঁকড়া গ্রামে আড়াইশো এবং ফুলদো গ্রামে আড়াইশো লোককে রোজ খাওয়ানো হচ্ছে। চীপ ক্যান্টিনেও পাঁচশো লোকের ব্যবস্থা। এ অঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি তিনটি। এই পাঁচশোজনের ব্যবস্থা তাই তিনজায়গায়। চন্দ্রকোনায় দুশো,

রামজীবনপুরে দেড়শো ও ক্ষীরপাইতে দেড়শো,—এইভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বালা গ্রামে সি. পি. আই. এর তরফ থেকে দেড়শোজনকে খাওয়াবার জন্যে একটা লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে।

লঙ্গরখানাগুলোর একটিও আমি দেখিনি। তবে যুব ও কৃষক কংগ্রেস নেতা প্রশান্তবাবু বললেন—'একদিন লঙ্গরখানা থেকে এক হাঁড়ি খিচুরী নিয়ে বি.ডি.ও. অফিসে গিয়ে বি. ডি. ও. কে বলেছিলাম—মশাই, এ খিচুরী যদি আপনি খেতে পারেন, তবেই তা সাধারণ লোককে খাওয়াবেন।'

ক্ষীরপাই-এর চীপ ক্যান্টিনটি দেখেছি। পঁচিশ পয়সার বিনিময়ে চারটি রুটি (মোট ওজন একশো গ্রামের মতো) আর একটু আলু ও ছোলার ডালের তরকারি (জল বাদে যার ওজন কুড়ি-পঁচিশ গ্রাম হবে)। অর্থাৎ মোট ওজন একশো কুড়ি-পঁচিশ গ্রাম। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিলো জল বাদে আড়াইশো গ্রাম খাবার। এই চীপ ক্যান্টিনটির পরিচালনা ভার নিয়েছেন ক্ষীরপাই এর 'নবীন সঙ্ঘ'। সঙ্ঘের সভ্যরাই স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এই ক্যান্টিনটি চালাচ্ছেন। এঁরা জানালেন প্রথমে দেড়শোজন দরিদ্রকে কার্ড দেওয়া হয়। তখনই ষাট-পঁইষট্টি জনের বেশি খাবার নিতে আসতেন না। এখন দশ-পনেরো জনের বেশি আসেন না। কারণ রোজ পঁচিশ পয়সা জোগাড় করে উঠতে পারেন না তাঁরা। ফলে অবশিষ্ট খাবার কার্ড বিহীন দুর্গত ব্যক্তিদের বিক্রি করা হয়।

সরকারের পাক্ষিক ড্রাইডোল দেওয়া হয় কিছু পরিবারকে—পরিবারপিছু এক ইউনিট, অর্থাৎ দুই কিলো করে গম। প্রথমতঃ খুব কম পরিবার এটা পান। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে অভিযোগ করলেন—স্থানীয় জোতদার-জমিদারের বাড়ীতে যেসব মজুর বা ঝি কাজ করেন, একমাত্র তাঁরাই এটা পান।

ধার পাওয়া নিয়ে অনেকেরই অভিযোগ। ধার শোধ নিয়েও আছে অভিযোগ আর ক্ষোভ। জনৈক বর্গাদার জানালেন গ্রুপ লোন (গ্রুপ লোন ব্যবস্থায় আট-দশজন ভূমিহীন কৃষক মাথাপিছু সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকা করে পান। একজনকে গ্রুপ হেড হিসাবে দায়ী থাকতে হয়, যাঁর অন্ততঃ দশ কাঠা জমি থাকতে হবে।)-এ শোধের তাড়াটাই বেশি।

এম.এল. এ. সত্যবাবু বললেন—'এই অঞ্চলের জন্যে দু'টো স্কীম পাশ হয়ে গেছে। মাস দুয়েক ধরাধরির পর একটা চালু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হলে তিনি বলেন, 'আমি তো দুটো স্কীমে সই দিয়েছি; চালু না হলে কি করবো?' সত্যবাবু আরো বললেন—'সি. পি. আই.-এর তরফ থেকে দু'নম্বর ব্লকে দুশোজনকে খাওয়ানো যায় এমন আরেকটি লঙ্গরখানা স্থানীয় ধনীদের সাহায্যে খোলার কথা আছে। ওই ধনীদের সাহায্য পেতে কংগ্রেসের ছেলেদের সাহায্য দরকার, কিন্তু তাঁরা আপাততঃ যাত্রা উৎসব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কিছু করতে পারছেন না। কথা দিয়েছেন, ভবিষ্যতে সাহায্য করবেন।'

এ অবস্থা কী করে পাল্টানো যায়?

মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা—'সরকারকে খাদ্যের সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে, খাদ্যশস্যের ব্যবসা জাতীয়করণ করতে হবে।' কমিউনিষ্ট পার্টির তরফে বক্তব্য—'এ দুর্ভিক্ষ ধারাবাহিক এবং কিছুই করার নেই, সমাজব্যবস্থা পাল্টানো ছাড়া। কিন্তু এ মুহূর্তে সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর স্লোগান বাগাড়ম্বর মাত্র।' কংগ্রেস নেতা জানালেন 'ধানের দাম (বর্তমানে চুয়াত্তর টাকা) একশো টাকায় এবং পাট (বর্তমানে পঁইষট্টি) একশো চল্লিশ থেকে একশো ষাট টাকায় বেঁধে দিতে হবে। কৃষিবীজ চাই এবং সার, জল ও লোনের সমবণ্টন চাই।'

জমিদার মধুসূদন রায় বললেন—'খাজনা একরে ছিয়ানব্বই টাকা কিন্তু জমির পরিমান বাড়লে একর প্রতি খাজনা দুই, তিন, চারগুণ হয়ে যাচ্ছে এবং অবস্থার জটিলতা বাড়ছে। যথেষ্ট কীটনাশক ওষুধ, সার এবং ফসলের ন্যায্য দাম পেলে, বছরে তিনবার চাষ হলে, এ অবস্থা আর থাকবে না। সরকার দাম বেঁধে না দেওয়ায় বাজারে শস্যের দাম ওঠানামা করে, ফলে ধান-চাল মজুত রাখতে হয়।' মজুরী বাড়ানোর প্রশ্নে মধুসূদন রায় বললেন—'সে প্রশ্নই ওঠে না, এক একজন মজুর এতো ভাত-মুড়ী খায়, তার ওপর তেল-তামাকের খরচা। আর মজুরী বাড়ালে পোষাবে না।'

অবস্থাপন্ন চাষী হরি ভূঞ্যা বললেন—'যথেষ্ট সেচ ও সার পেলেই সারাবছর কাজ হবে, মজুররা কাজ পাবে, তাদের অভাব থাকবে না।'

ক্ষেতমজুর নন্দ দাস উত্তেজিতভাবে বললেন—'খাবারের তো অভাব নেই। দিনমানে গিয়ে বেড্ডাবেড্ডি করে ছিনিয়ে আনতে হবে। এদিকে মাঠে যারা ধান ফলালো তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। আর ওদিকে জমিদার বাবুদের দেখুন, পায়ে পা তুলে আয়েসে দিন কাটাচ্ছে। মাঠে যাবার আগে বাবুদের বাড়ীতে ভাত খেতে দেয়, সঙ্গে তরকারি যা দেয় তা দেখলে কান্না পায়। তাও আবার একটুখানি যাতে বেশি ভাত না খেতে পারি। আর মাঠে যখন সারাদিন অসুরের মতো খাটি ওই বাবুদের জন্যে, তখন? আবার বেশি ভাত খেলে পেছন থেকে বলে—রাতে বোধহয় কিছু খায়নি। আরে শালা, খাইনিই তো, জুটবে কোত্থেকে যে খাবো? আমাদের মতো চাষীদের কেউ দেখেনা। না জমিদার, না সরকারীবাবু, না মধ্যবিত্তরা। এবার আমরা নিজেরাই নিজেদের দেখবো।'

# ॥ বিশেষ রচনা ॥

## এক পৃথিবীর দুই মেরু —রামকৃষ্ণ সিংহ

### আজকের দুনিয়া

পত্র-পত্রিকা আর আকাশবাণীর খবরে, দেশ-বিদেশের নেতাদের ভাষণ আর ইউ. এন. ও, এফ. এ. ও-র আবেদনে হঠাৎই এক এক দিন কঙ্গো, কেনিয়া আর বাঙলাদেশের মানুষেরা বিখ্যাত হয়ে ওঠে। খবর হয়—এখানে দুর্ভিক্ষ লেগেছে, অবর্ণনীয় দুর্দশায় কাটছে মানুষের জীবন। বিহারের সমব্যথীর কানে পৌঁছোয় ব্রাজিলের লোকের দুর্দশার খবর। পৌঁছোয় আর্তত্রাণের আহ্বান—মানবিকতার আবেদন।

দুর্ভিক্ষ লাগে প্রতি বছরই, দুনিয়ার কোনো না কোনো এক কোণে। দুর্ভিক্ষ লাগে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী কিম্বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে। দুর্ভিক্ষ লাগে মুনাফাখোরী, মজুতদারী, মূল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধ আর অর্থনৈতিক অবরোধের মতো মনুষ্য সৃষ্ট কারণে। কিন্তু ওগুলো তো আপাত কারণ মাত্র, দুর্ভিক্ষের মূলে আছে আজকের দুনিয়ার সেই ক্রূর সত্য যে কোটি কোটি লোক আজ সাধারণ অবস্থাতেই অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করে। ফলে যখনই এই উপলক্ষ্যগুলি ঘটে, সংকট তীব্র হয়ে ওঠে এবং দুর্ভিক্ষের চেহারা নেয়। দুর্ভিক্ষ সাময়িক মাত্র, দারিদ্র এর মূল কারণ।

আমাদের এই গ্রহে বর্তমানে প্রায় ২,৮৫০,০০০,০০০ লোকের বাস। তার মধ্যে ১,৬০০,০০০, জন পর্যাপ্ত পরিমান খাদ্য পায়। অর্থাৎ রোজ রাতে খালি পেটে শুতে যায় এমন লোকের সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার দ্বিগুণ।

মূল কারণ এই দারিদ্রই সাময়িকভাবে দুর্ভিক্ষের চেহারা নেয়। অপুষ্টি আর অস্বাস্থ্যকর বসবাসের ফলে রোজ কোটি কোটি লোক তিল তিল করে নিঃশব্দে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে প্রতি বছর কোটি কোটি লোক সাধারণ রোগ-ভোগে মারা যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের চাইতে এসব কিছু কম ভয়াবহ নয়।

যেখানে একজন মানুষের দিনে অন্ততঃ ৩০০০ ক্যালরী খাদ্য প্রয়োজন, সেখানে বলিভিয়ার লোক পায় মাত্র ১২০০ ক্যালরী, ইকোয়েডরে ১৬০০। ইরানে শতকরা ৮৫ জন শিশু ১৫ বছরে পা দেওয়ার আগেই মারা যায় ; দক্ষিণ এশিয়ার শতকরা ৯০ জন শিশু ম্যালেরিয়ায়

### পুঁজিপতির রোজনামচা

দুশো বছর আগে কি কেউ ভাবতে পেরেছিল—মানুষ একদিন আকাশে উড়বে। আজ কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে, আর তা হয়েছে আমারই চেষ্টায়। এরোপ্লেন আর রেল, ব্রীজ আর টাওয়ার, রেডিও আর টেলিভিশন, ইলেকট্রিসিটি আর অ্যাটমিক পাওয়ার, বিরাট বিরাট কারখানা—সবই তো আমার কীর্তি। মাত্র দুশো বছরে দুনিয়ার চেহারাটাই আমি পাল্টে দিয়েছি—আমি একজন পুঁজিপতি।

গরীব লোক আছে বৈকি। কিন্তু আমার প্রভাব চলতে থাকলে আমি দুনিয়া থেকে গরীবি হটিয়ে দেবো : যেমন ধর না, এই সেদিনও, ১৯৪৪ সালে আমেরিকায় কোটিপতি ( অন্তত ১০ লক্ষ ডলারের মালিক ) ছিল ১৩.২৯৭ জন। ন' বছর বাদে ১৯৫৩তে তা হ'ল ২৭,৫০২ আর ১৯৬২তে দাঁড়াল ৮০,০০০ জনে। পরবর্তী কালে সংখ্যাটা এতো বড় হয়ে গেছে যে—তা ছাপানোই বন্ধ হয়ে গেছে। 'ফরচুন' ম্যাগাজিন তো লিখেই বসলো—আজকের আমেরিকায় "কোটিপতি হওয়াটা আর সম্মানের ব্যাপার বলে গণ্য হয় না।" সময়ে সারা পৃথিবীকেই আমি কোটিপতি বানিয়ে দেবো।

আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বড় তাদের অবস্থা কেমন ?

আমেরিকার সবচেয়ে বড় দশটি কর্পোরেশনের ( শিল্প ) মোট বাৎসরিক মুনাফা ৭,৩২০,০০০,০০০ ডলার। অর্থাৎ ভারতের সমস্ত লোকের পুরো দুটি বছরের মোট আয়ের পরিমাণ এই দশটি কোম্পানীর এক বছরের মুনাফার থেকে সামান্য কিছু বেশি মাত্র।

কথায় বলে—'উদ্যোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্মীকে পায়'। আমরা অলস নই। দেশগাঁয়ের এককোণে বসে জীবন কাটানো আমাদের আসে না। মুনাফার খোঁজে আমরা নিজের দেশ ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে পাড়ি দিয়েছি, আফ্রিকার গহন অরণ্য চুঁড়ে বের করেছি হীরা আর সোনা। তামার খোঁজে গেছি আন্দিজ পর্বতমালার উঁচু চূড়ায়। পেট্রোলিয়ামের খোঁজে গেছি সাহারা আর আরবের মরুভূমিতে। সাগর পেরিয়ে এসে ভারতকে করেছি পদানত, অষ্ট্রেলিয়াতে তার আদিবাসীদের করেছি নির্মূল।

আমার উদ্যম সীমাহীন। মুনাফাই আমার লক্ষ্য। তাই আজ

ভোগে, শতকরা ৬৫ জন ভোগে যক্ষ্মা রোগে। ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ লোক অপুষ্টিতে ভোগে।

শুধু রোগ-শোক-মৃত্যুই নয়, যারা বেঁচে থাকে তারাও অর্ধমৃত। শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই, আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত নেই, এমনকি অনেক সময় স্থায়ী একটা আস্তানা পর্যন্ত নেই। শুধু গতর খাটাবার জন্যই এরা বাঁচে—জীবনে এদের আর অন্য কিছু নেই।

১৯৬৯ সালে পৃথিবীতে ১৮ কোটি পরিবার ছিল যাদের মাথা গোঁজবার কোনো ঠাঁই ছিল না। ভারতে শতকরা ২৫ জন লোকের ঘরদুয়ার নেই। দুর্ভিক্ষের সময় নয়, সাধারণ অবস্থাতেই এরা অর্ধমৃত।

ভারত, বাঙলাদেশ পাকিস্তান, সিংহল, ইরান থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, মালয়, ফিলিপাইন—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এদের পাওয়া যায়। এদের পাওয়া যায় চীন, আর হয়তো উত্তর ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া বাদে, এশিয়ার প্রায় সব অনুন্নত দেশেই। পাওয়া যায় আফ্রিকার সব দেশে, লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল, চিলি, পেরু, বলিভিয়া, ইকোয়েডর আর উন্নত দেশ আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়াতে। এদের পাওয়া যায় উন্নত দেশগুলোতেও—এশিয়াতে জাপান, ইওরোপের ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী এমন কি খাস আমেরিকাতেও। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সমাজবাদী দেশ বাদে এই হতভাগ্যদের দেখা, আর সব দেশেই পাওয়া যাবে।

আমার দেশ ছেড়ে প্রধানত বিদেশে ঘুরতে হয়। এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলো আমায় যা মুনাফা দেয়, আমার আদিভূমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী বা জাপান তা দেয় না। যেমন, লাতিন আমেরিকার কথাই ধর না কেন।

"১৯৫০ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে আমেরিকার প্রাইভেট কর্পোরেশনগুলো সেখানে ৩৮০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছিল এবং ১৭৮০ কোটি ডলার মুনাফা পেয়েছিল। অর্থাৎ ১৫ বছরে শতকরা ৪৬৯ হারে মুনাফা। ভেনেজুয়েলাতে আমাদেরই একজন একটা কাঁচের বোতলের কারখানা বানিয়ে তা বন্ধ করে দেয়, কারণ তাতে মুনাফার হার ছিল মাত্র ৮০%। এই হচ্ছে বিদেশ, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোয় আমাদের ব্যবসার অবস্থা। আর নিজের দেশে? এখানে জিনিষপত্র এতো সুলভ হয়ে উঠেছে যে নষ্ট না করে ফেললে ব্যবসায় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। কাজেই মুনাফার হার ঠিক রাখতে, দেশে প্রতিবছরই আমায় এই রাস্তা নিতে হয়।

## উন্নত দেশ আমেরিকায়

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কেনেডি একবার স্বীকার করেছিলেন যে ১৭,০০০,০০০ আমেরিকান প্রতি রাতে খালি পেটেই শুতে যায়। ১৫,০০০,০০০ পরিবার বিশ্রী অস্বাস্থ্যকর ঘরে বসবাস করে। ৭,০০০,০০০ পরিবার স্রেফ বাঁচার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।

সেনেটর মোরস্ ১৯৬৭ সালে একবার বলেছিলেন যে আমেরিকায় বহু শিশু খাবারের খোঁজে ডাষ্টবিন ঘেঁটে খায়, আর রাস্তায় কুকুর বেড়ালের মতো বেঁচে থাকে।

"আমেরিকার প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোকই যে অবস্থায় আছে তাকে বলা যায় ভয়ংকর দারিদ্র। এছাড়াও ৩ কোটি লোক অর্ধ-দারিদ্রের মধ্যে বাস করে।"—উইস্কনসিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক লম্পম্যান, ১৯৬৯।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক হেলথ সার্ভিসের ডাঃ আর্নল্ড শেফার একটি অনুসন্ধানের (১৯৬৯) পরে বলেছেন—১২,০০০ লোকের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের অপুষ্টির মাত্রা গুয়াতেমালার লোকেদের মতো নিম্নমানের।

অনুন্নত দেশগুলোতে আমেরিকা তার উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য 'সাহায্য' দিয়ে আসছে। এ বাবদে শুধু ভারতেই পি. এল. ৪৮০—খাতে প্রায় ৩১২৬ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমেরিকার বাজার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪—এই পাঁচ বছরের মধ্যে—

ক) একটি ব্যবসায়ী সংযুক্ত সংস্থা ১৪০,০০০,০০০টি ডিম নষ্ট করে দিয়েছে,

খ) কৃষিমন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী আলুর দাম যাতে কমে না যায় তার জন্য ১,৩৬০,০০০ টন আলু নষ্ট করতে বলেছিলেন,

গ) গম ও ভুট্টা চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ১৭ থেকে ২০ ভাগ কম করতে বলা হয়েছিল,

ঘ) যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট (কংগ্রেস) ১৯৫৪তে গমের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

এবছরও, আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা যে নীতি নিয়েছে তাতে গমচাষের পরিমাণ ২০ কোটি একর থেকে নেমে ৮ কোটি একরে এসে দাঁড়িয়েছে।—'দি ষ্টেটসম্যান' ২৩. ১০. ৭৪।

'বিশেষজ্ঞরা' বলছেন এই সমস্যার মূলে আছে লোকবৃদ্ধির সমস্যা। অর্থনৈতিক উন্নতি যা হয় লোকবৃদ্ধির তুলনায় তা নগণ্য মাত্র।

"এই শতাব্দীর মধ্যভাগের মোট জনসংখ্যাটাই (প্রায় ২,০০০,০০০,০০০) ধরা যাক, এবং এখন যে হারে তা দ্বিগুণ হচ্ছে (৫০ বছরে একবার) তাই নিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ২০০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ প্রায় ৪,০০০,০০০,০০০ লোক হবে, ২০৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ৮,০০০,০০০,০০০ লোক হবে, এবং এরকম...! দশটা শতাব্দী যেতে না যেতে আমাদের বংশধরেরা ২০০ ০০০,০০০,০০০ জন প্রতিবেশী দেখবে—যে সংখ্যাটা দক্ষিণ মেরু, সাহারা মরুভূমি এবং মাউন্ট এভারেষ্ট শুদ্ধ পৃথিবীর মোট স্থলভাগে যত বর্গফুট জমি আছে তার থেকেও কিছু বেশি।"

অর্থাৎ একজন মানুষ তখন দাঁড়াবার জন্য এক বর্গফুট জমিও পাবে না। অবশ্য তার আগেই দেখা দেবে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব—এই অপরিমিত লোককে তো আর খাওয়ানো সম্ভব নয়।

"হাইড্রোজেন বোমা এখনও শুধু জমানোই হচ্ছে, কিন্তু লোকসংখ্যার বোমার আগুন দেওয়া হয়ে গেছে, এবং তা জলছে।... এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার নয়। সেই দুর্বিপাক প্রতিদিন এগিয়ে আসছে। আমাদের জীবনধারা, সম্ভবত আমাদের নিজেদের এবং বংশধরদের অস্তিত্বই—বিপন্ন হয়ে উঠছে।"

— 'দি পপুলেশন বম্ব', হিউ মুর ফাণ্ড

সমস্যার ভয়ংকর রূপ দেখে পল বিরো তো বলেই বসেছেন যে ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে এমনকি এ্যাটম বোমার ব্যবহারও উচিত বলে মনে হয়। সমাজবিজ্ঞানী কিংসেল ডেভিস তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে (যখন লোকসংখ্যা কমে যাবে) এক উজ্জল বিশ্বের সম্ভাবনা দেখেছেন। এমনকি নাৎসীদের দ্বারা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত (ইহুদীদের বিরুদ্ধে) বৃহদায়তন জন্মনিরোধ প্রক্রিয়ার কথাও সযত্নে ভাবা হয়েছে।

যাই হোক, সেই ভয়ংকর পরিণতিকে ঠেকাতে যুদ্ধ, অন্য গ্রহে পাঠানো এবং জন্ম নিরোধ—এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে শেষেরটাই সবচেয়ে বেশি সহজ মনে হয়েছে। আর গরীব দেশগুলোয় প্রাণপাত পরিশ্রম শুরু হয়েছে জন্ম—নিরোধ করার।

## ভয়ংকর খাদ্যাভাব

খাদ্যশস্য নষ্ট করে দিতে হয়, উপায় নেই। দোষটা আমাদের নয়, বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে এবং আজকাল এতো সহজে এতো বেশি উৎপাদন হচ্ছে যে তা বাজার ছাড়লে জিনিষের দাম কমে যাবে এবং স্বভাবতই মুনাফা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ১৯৪০ সালে যেখানে সবচেয়ে উন্নত পদ্ধতিতে একজন কৃষকের পক্ষে দশজন লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব ছিল, বিশ বছর বাদে সেখানে পদ্ধতির এতো উন্নতি ঘটে যে একজন কৃষক ২৪ জনের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে বলেছেন পঞ্চাশের দশকে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের উৎপাদন একর প্রতি শতকরা ২০ থেকে ৭৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তার পরের দশকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

এতো খাদ্য বাজারে ছাড়লে দাম পড়ে যাবে না? মুনাফায় তখন ভাঁটা পড়বে। আজকের দিনের প্রধান সমস্যা এই অতি উৎপাদন।

"এখন যে বিপদ তা কোনো দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা থেকে নয়। বিপদ আসলে হল এই ক্রমাগত প্রাচুর্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্য সমস্যা, বিশেষ করে এই অযাচিত খাদ্যশস্য নিয়ে কি করা যাবে তার সমস্যা।"

—উইলিয়ম ব্যারী ফার্লং, নিউইয়র্ক টাইম্ ৪. ১০. ১৯৫৯।

এই অতি উৎপাদনের ফলটা কি হচ্ছে শুনবেন? আমাদের মুখপত্র ওয়াল স্ট্রীট (আমেরিকার শেয়ার মার্কেট) জার্নাল লিখছে (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৯)—

"নভেম্বরের মাঝামাঝি পুঁজিপতি কৃষকরা (ফার্মার) যে দাম পেয়েছে (অন্য জিনিষের দামের তুলনায়) গত ১৯ বছরের বিচারে তা সর্বনিম্ন। এ বছর তাদের মুনাফার হার গত বছরের তুলনায় ১৫% কম চলছে, এবং অর্থনীতিবিশারদরা বলেছেন যে আগামী বছর তারা যে হারে মুনাফা পাবে তা ১৯৪০ এর পরের সব বছরের হারের চেয়ে কম।"

## ভয়ংকর খাদ্যস্ফীতি

সব রকম চেষ্টা চলছে এই দুর্বিপাক রোধ করার। যেমন গরীব দেশ ভারতের সরকার তো ঘোষণাই করে দিলেন—সরকারী কর্মচারীরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করালে, দু'দিনের ছুটি দিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জানানো হবে। মাদ্রাজের সরকার এক এক জনকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করাতে রাজী করাতে পারলে সমাজসেবীদের দু'টাকা করে সম্মান পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। মহারাষ্ট্র সরকার একদম বিয়ের আসরেই "জন্ম-নিয়ন্ত্রণ রুমাল" দেওয়া শুরু করেন।

ক্যাথলিক খৃষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস জন্মনিয়ন্ত্রণ অনুমোদন করে না। তাদের মুখপাত্র পোপ তাই এই পদ্ধতিকে মানতে পারেন নি। তাঁর মতে খাদ্য সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে একমাত্র পার্থিব সম্পদের যথাযত বণ্টনের মাধ্যমেই।

জস্যুয়া ভ কাস্ত্রো বলেছেন :

"খাদ্যাভাব একটি মনুষ্য সৃষ্ট ব্যধি। খাদ্যাভাবের সৃষ্টি হয়েছে মূলত উপনিবেশবাদী ধনীবর্গের অমানবিক শোষণের ফলে।"

কাজেই খাদ্য সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আর পুঁজিবাদী শোষণের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে, সমাজবাদী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

রাশিয়া, চীন, উত্তর ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া এমন কি কিউবা আর আলবেনিয়ার মতো ছোট দেশেও আজ খাদ্যাভাব নেই। সুষম বণ্টনের ফলে এসব দেশে খাদ্যাভাব দূর হয়েছে।

ফলে মুনাফার সংকোচন। সব রকম চেষ্টা চলছে এই দুর্বিপা[ক] রোধ করার। সঞ্চিত খাদ্যে কেরোসিন তেল ঢেলে জালিয়ে দেও[য়া] অথবা সাগরের জলে ফেলে দেওয়া। প্রতি বছরই মুনাফার হা[র] ঠিক রাখতে এরকম ভাবে কেরোসিন আর রেলের খরচ দিয়ে ব[হু] খাদ্য নষ্ট করতে হয়। এছাড়া আছে সরকার—আমাদের সরকা[র] শস্য কিনে নিয়ে, বাজার থেকে সরিয়ে নিয়ে, লেভি করে, পি. এল [৪৮০]-র নামে বাইরে পাঠিয়ে তা চাষের জমির সংকোচন করেও এ[ই] খাদ্যস্ফীতি রোধ করে।

হ্যাঁ, এভাবে মুনাফা ঠিক থাকলেও বিপদ দেখা দেয় অন্যত্র।

"দুনিয়ার আজ কোটি কোটি লোক বুভুক্ষু। তাদের এই হতা[শ] অবস্থায় তারা সহজেই কমিউনিষ্ট প্রচারের শিকার হয়ে যায়।"

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি মুনাফা ঠিক রেখেও খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে এবং কমিউনিষ্টদের রুখতে। তৈরী করেছি "এ্যালায়েন্[স] ফর প্রোগ্রেস," অর্থাৎ প্রগতির জন্যে জোটের সংগঠন, "শান্তির জ[ন্য] খাদ্যে"র কার্যক্রম। অনুন্নত দেশগুলোয় পাঠিয়েছি 'ফরেন এড' আ[র] 'পীস কর্পস'। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে আমরা ৫৬টি অনুন্ন[ত] দেশে ৩০০০ কোটি ডলার পাঠিয়েছি, অবশ্য হ্যাঁ, তার বিনিমে[য়] সুদ আর মুনাফা পেয়েছি ১৫০০ কোটি টাকা। আসলে দোষ[টা] আমাদের নয়—অনুন্নত দেশের মানুষদের। তারা এতো বেশ[ি] সন্তানের জন্ম দিচ্ছে বলেই তাদের অবস্থার অবনতি ঘটছে আর সে[ই] ফাঁকে কমিউনিষ্টরা ঢুকে পড়ছে।

---

পঁচিশ বছরের উন্নতির ফলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক চীন আজ ৭০ কোটি লোকের কাছে লভ্য ২০ কোটি টন খাদ্যশস্য, আর আধা ঔপনিবেশিক ভারত, আজও তথাকথিত স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও ৬০ কোটি লোককে দেয় ১০ কোটি টন খাদ্যশস্য।

"ভারতের আশু বিপদ এই যে জন সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়তেই থাকলে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগগুলি অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারবে না। এর ফলে অনেকে হতাশা বোধ করবে এবং কমিউনিষ্টদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে উঠবে। —স্পেংলার, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক।

---

তাই খাদ্য সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান খুঁজতে গিয়ে সারা বিশ্বের জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই পৌঁছোয় যুদ্ধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকারীতাকে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সমাপ্তি ঘটিয়ে এক নতুন সমাজ গড়ার সংকল্পে, ধনী-গরীবের বৈষম্য ঘটিয়ে দেবে, প্রগতির রাস্তা খুলে দেবে এমন এক **বিপ্লবে**।

বিপ্লবের ডঙ্কা আজ বাজছে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশেই—

ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ছোট তিনটি দেশ তো সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের মুক্তিতীর্থ হয়ে

কমিউনিষ্টরাই যত নষ্টের গোড়া। সর্বত্রই এই কমিউনিষ্টদে[র] ভয়। হুভার (মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এককালীন প্রধান) সতর্ক করে[ন] দিয়েছেন যে কমিউনিষ্টরা "সব স্তরে সব সংগঠনে" কাজ করছে ওরা চায় সব দেশে একটা না একটা বিপ্লব বাধিয়ে দিতে, আমাদের[ও] তাই মহান দায়িত্ব সবদেশে বিপ্লবকে রোখা, কমিউনিষ্টদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করা। আমরা চাই **প্রতিবিপ্লব**।

"কখনও ভুলো না ৩০০ কোটি লোকের পৃথিবীতে আমরা মাত্র ২০ কোটি। আমরা যা পেয়েছি তারা তাই চায়—আর আমরা ত[া] তাদের দিতে পারি না"—প্রেসিডেন্ট জনসন।

উঠেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আর তার ক্রীড়নকদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনগণের মুক্তিসংগ্রাম চূড়ান্ত বিজয়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে কাম্বোডিয়া, লাওসের জনগণও। বিপ্লবের ডঙ্কা বাজছে ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, বার্মা ইত্যাদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরও অনেক দেশে। বিপ্লবের ডঙ্কা বাজছে মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টাইনে। আফ্রিকার আঙ্গোলা, মোজাম্বিক ইত্যাদি দেশের জনগণও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানকল্পে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। অস্ত্রহাতে তুলে নিয়েছেন লাতিন আমেরিকার বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা ইত্যাদি দেশের জনগণ।

তাই আমরা (অর্থাৎ আমেরিকা-ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা) আজ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যুদ্ধসজ্জা করেছি।

সারা দুনিয়াকে আজ ৩৪০০র বেশি আমেরিকান মিলিটারি বেস্ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ৩০টি ভিনদেশে ৪০০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে এই বেস্‌গুলি আছে এবং এর পিছনে আজ পর্যন্ত খরচা হয়েছে অন্তত ১,০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার অর্থাৎ গোটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোট খরচের চাইতেও বেশি। মিলিটারীর জন্ত একা আমেরিকাই ঘণ্টায় প্রায় এক কোটি ডলার খরচ করে।

কঙ্গোতে আমরা লুমুম্বাকে হত্যা করিয়েছি। বেনবেল্লা, ন্ক্রুমা, সুকর্ণ, দাগান, ... ওগিংগা ওডিংগা আর বেনজকে ক্ষমতা চ্যুত করেছি। এই সেদিনও চিলিতে নির্বাচিত সরকার এ্যালেন্দের পতন ঘটিয়েছি।

---

"ভিয়েতনামের জনগণ মহান। তাঁদের সংগ্রাম এক মহাকাব্য। আসুন, আমরা তাঁদের প্রণাম জানাই।"

—বার্ট্রাণ্ড রাসেল

---

সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যতো বোমা পড়েছিল, তিনকোটি লোকের দেশ ভিয়েতনামে দশ বছরের যুদ্ধে আমেরিকা তার দ্বিগুণেরও বেশি বোমা ফেলেছে।

---

সূর্যের আলো দুই মেরুতে একই সাথে পৌঁছোয় না। সাম্রাজ্যবাদ আর জনতা, শোষক আর শোষিতের উন্নতি একই সাথে হয় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম উন্নতিতে সবাই কোটিপতি হয় না, বরং সামান্ত কিছু লোকের হাতে ধনসম্পদ জড়ো হয়, আর অসংখ্য লোক আরো বেশি বেশি করে গরীব থেকে গরীব হয়। শোষক আর শোষিতের এই দ্বন্দ্ব শ্রেণী-সমাজের একেবারে গোড়া থেকে চলে আসছে—এক মেরুকে অন্ধকার না করে অন্ত মেরু উজ্বল হয় না। সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তি না হলে সারা বিশ্বের দরিদ্র, বুভুক্ষু জনতার উন্নতি হবে না।

এক মেরুতে সূর্যাস্ত অবধারিত। তার সমস্ত পশুশক্তি দিয়েও আজ দানবিক আমেরিকা পারে না ছোট্ট দেশ ভিয়েতনামের বিপ্লবকে ঠেকাতে। না পারে সে মোজাম্বিক, কাম্বোডিয়া আর প্যালেস্টাইনকে শান্ত করতে। সাম্রাজ্যবাদের পতন অনিবার্য। নতুন দুনিয়ার দিকে দিকে আজ নতুন প্রভাতের সূচনায় আগমনী গান বেজে উঠছে, বিপ্লবের ঘোষণায়।

---

★ এই রচনাটি প্রস্তুত করতে যে বইগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে—ক) The Enemy—Felix Green, খ) How Many The Earth Will Feed—K. Malin, গ) The "Population Explotion"—how socialists view it —Joseph Hansen.

# দুর্ভিক্ষ : একটি অধ্যয়ন

বীক্ষণ সমীক্ষা দল

বিশেষ ক্রোড়পত্র

## ১. পটভূমি

আমরা, আজ যারা স্কুলে-কলেজে পড়ছি কিম্বা কিছুদিন আগেও পড়তাম, তাদের কাছে অনাহারে মৃত্যু, ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা বা ছেলেমেয়ে বিক্রি কোনোটাই নতুন ঘটনা নয়। খবরের কাগজের পাতায় এসব কাহিনী প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। কলকাতা কিম্বা আশপাশের ছোট-বড় রেল-স্টেশনে ক্ষুধার তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষের "সংসার" ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখে আসছি। এমনকি মহানগরীর ফুটপাতে এই হতভাগ্যদের কাউকে কাউকে মরে পড়ে থাকতেও দেখেছি আমাদের কেউ কেউ। কিন্তু আজকের মতো এতো ব্যাপকহারে হাজারে হাজারে এসব ঘটনা শুধু আমরা কেন, আমাদের থেকে যাঁরা বয়সে অনেক বড়ো—আমাদের বাবা-মা, বয়জেষ্ঠ অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-পড়শী কিম্বা আমাদের মাষ্টারমশাইরা, কেউই বিশেষ করে পশ্চিমবাঙলায় অন্তত ১৯৪৩ সালের পরে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেননি।

——— চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া: বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং—গ্রামীন পশ্চিমবাঙলার কোনো অঞ্চলই বাদ নেই। 'ঘাস ও গাছের মূল খেয়ে জীবনধারণ করছে' কোনো কোনো অঞ্চলের "মানুষ"। কোথাও 'শাপলা, শালুক, বুনো ওল, কচুও আর জুটছে না'। কোথাও 'চোরে' ভাতের হাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। বাঁকুড়ার মালিয়ন গ্রামের বাউড়িরা (হিন্দু) 'জাতি-ধর্ম' বিসর্জন দিয়ে মরা গরু ও মহিষের মাংস খাচ্ছে (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২০.৯.৭৪)। কাপড়ের অভাবে কোথাও শাশুড়ি এবং বৌ একসাথে বাইরে বেরুতে পারছে না। সব জায়গা থেকেই রোজ রোজ খবর আসছে—সেখানকার অনাহারে মৃত্যুর তালিকায় নতুন আর কত যোগ হ'ল, কতজন আর আত্মহত্যা করলো, কে কে ঘরবাড়ী ছেড়ে পালালো…

একদিন যার 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' হয়ে ওঠার কথা (?), সেই কলকাতা কিম্বা রাজ্যের ছোট-বড় সব শহরেই 'আবার ফ্যান দাও রব শোনা যাচ্ছে'। জনবহুল কোনো রাস্তা বা রেল-স্টেশনে দাঁড়িয়ে কোনো কিছু খাওয়া তো দূরের কথা (আমরা, অর্থাৎ জনসাধারণের যে অংশটি এখনও খেতে পাচ্ছি তাদের কথাই হচ্ছে), এক মুহূর্ত দাঁড়াবার উপায় নেই—'একটা পয়সা'র করুণ আবেদন নিয়ে সাথে সাথেই ''ঘেরাও'' করছে অস্থিচর্মসার, বুভুক্ষু, নগ্ন, অর্ধনগ্ন ''মানুষের'' 'মিছিল', প্রতিমুহূর্তে যে মিছিলের দৈর্ঘ বাড়ছে। এদের চেহারা হাবভাব আর পয়সা চাইবার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়—এই অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে একেবারে নতুন। কিন্তু শহরেই বা কে তাদের ভিক্ষে দেবে আর দিলেও বা কতজনকে দেবে? নিত্য ব্যবহার্য প্রভিটি জিনিষের রকেটের গতিতে বেড়ে চলা দাম, এতদিন যাঁরা তাঁদের ভিক্ষে দিতো সেই নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তদেরও তো খাবি খেতে বাধ্য করেছে—টাল সামলাতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই তাঁরা তাঁদের ব্যবহার্য সামগ্রীর তালিকা থেকে 'অত্যাবশ্যকীয়'গুলিকে রেখে 'প্রয়োজনীয়'-গুলিকে ছাঁটাই করছেন। ফলে বাঁচার কামনা নিয়ে যাঁরা ঘরবাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, শহরে, গঞ্জে, স্টেশনে ভীড় করেছে—বাঁচাটা আর তাদের হচ্ছে না। আর পথে ঘাটে চলতে ফিরতে বার বার আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য :

এক ফালি নেকড়া পড়ে যে দুখিনী মা তাঁর একমাত্র শিশু সন্তানটির মুখে গত কয়েকদিন যাবৎ কিছু দিতে পারেননি বলে অশ্রুসজল নয়নে আমাদের কাছে ভিক্ষে চাইছিলেন, আজ তিনি পাথরের মতো নিশ্চল বসে আছেন। নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টি। কোলে পড়ে আছে তার একমাত্র নয়নের মণি, যার জন্যে আর কোনোদিন তাঁকে অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না…তাঁর নয়নের মণি আর কোনোদিন তাঁর কাছে খেতে চাইবে না…

'একমাত্র নারিকেল ডাঙার ডাঃ বি.সি. রায় শিশু হাসপাতালে মাসে শিশু মৃত্যুর হার একশ ছাড়িয়ে গেছে।' আগে যেখানে রোজ গড়ে ৮০০ রোগী আসতো, এখন সেখানে গড়ে ১২০০ রোগী আসছে। সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট সরোজ বসুর মতে শতকরা নব্বই জনের রোগ অপুষ্টি। হাসপাতালের ডেথ রেজিষ্টারের হিসাব এরকম :

| মৃত্যু | জানু: | ফেব্রু: | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | —আগষ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৩ | ৬০ | ৪১ | ৫৯ | ৪৯ | ৭৯ | ৮০ | |
| ১৯৭৪ | ৭২ | ৮১ | ৮৩ | ১১৬ | ১৩৭ | ১০৬ | ৭৭৩ |

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯. ৯. ৭৪]

শুধু কি শিশু? আবাল বৃদ্ধ বনিতা—ক্ষুধা তো কাউকে রেহাই দেয় না। একমাত্র কোচবিহার জেলাতেই ৬০ দিনে ২৫০ জনেরও বেশি লোক অনাহারে মারা গেছে (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৫. ৯. '৭৪)। আর গোটা রাজ্যে এই সংখ্যা কত তার সঠিক-বেঠিক কোনো সরকারী হিসাব এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি (পশ্চিমবাঙলায় কাউকে না খেয়ে মরতে দেবো না'—মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাই সম্ভবত এর কারণ)। কিন্তু সেটা যে কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই (যেমন, ১৯শে নভেম্বর লোকসভায় সমর গুহ বলেছেন 'পশ্চিমবঙ্গে কমপক্ষে দশ হাজার মানুষের অনাহার মৃত্যু হয়েছে' —সত্যযুগ, ২০. ১১. ৭৪)। কোথাও কোথাও তো এদের মৃতদেহ সৎকার করাটাই একটা সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে)। স্বয়ং ত্রাণমন্ত্রীর স্বীকৃতি অনুযায়ী রাজ্যের গ্রামীন জনসংখ্যার শতকরা ৩৫% অনাহারে আছে (অমৃত বাজার পত্রিকা, ১২. ৯ ৭৪)। আর বেসরকারী মতে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে রাজ্যের প্রায় অর্ধেক লোক (ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৫. ৯. ৭৪)। অর্থাৎ গোটা পশ্চিমবাঙলা জুড়েই আবার ১৯৪৩-র পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আর দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে আমরা কী দেখেছি? একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি মহকুমাতেই ৮ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে খুব কম করেও ৩ লক্ষের একমাত্র সহায় সরকারী সাহায্য (দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ১২. ৯. ৭৪)। জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেখানে কমপক্ষে ২,০০০ জন মারা গেছে (ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১৯. ১০. ৭৪)। বর্তমানে দিনে গড়ে ২০০ জন মারা যাচ্ছে (ঐ)। আর গোটা রাজ্যে ইতিমধ্যেই নাকি না খেতে পেয়ে ১৫,০০০ লোকের মৃত্যু হয়েছে (দি ষ্টেটস্‌ম্যান ৫. ১১. ৭৪)। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য না এলে আসামের এক তৃতীয়াংশ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীদুলালচন্দ্র বড়ুয়া আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন (আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ৩১. ৮. ৭৪)।

বিহারের খাদ্য পরিস্থিতিও আশংকাজনক বলে শোনা যাচ্ছে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪. ৯. ৭৪)। একমাত্র সাঁওতাল পরগণা জেলাতেইই ১০ লক্ষ মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন (দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ১৭. ৯. ৮৪)। ইতিমধ্যেই কতজনের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে জানা যায় নি। কারণ. অনাহারে কেউ মারা গেলে বি ডি ও-র চাকরী চলে যাবে—এই ফর্মানতো ১৯৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় থেকেই গোটা বিহারে বলবৎ আছে (ওয়েন্ডি ও এ্যালেন স্কার্ক, টাইগার অন রেইন—১৯৬৬-র বিহার দুর্ভিক্ষের বিবরণ, পৃ-১১)। তবুও ১২ই সেপ্টেম্বর

১ বীক্ষণ শারদ সংকলন ১৯৭৪ দেখুন।

পর্যন্ত রাচীতে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে অনাহারে ( দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ২৩. ৯ ৭৪ )। নিজের এবং শিশু সন্তানদের জন্তে খাবার জোগাড় করতে না পেরে সমস্তীপুরের এক কৃষক রমনী সপরিবারের আত্মহত্যার চেষ্টা করে নিজে মারা গেছেন ( আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯. ৮. ৭৪ )।

উড়িষ্যার অবস্থা আরও ভয়াবহ। গত তিরিশ বছরে উড়িষ্যাবাসীরা আর কখনও এরকম দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি ( দিনমান, ৬. ১০. ৭৪ )। ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে রাজ্যের মোট ২ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১ কোটিই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে ( অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৪. ৯. ৭৪ )। রাজ্যের মোট ৩৮২৪টি গ্রামের মধ্যে ২০০০টি এবং ৩১৪টি ব্লকের মধ্যে ২৭৩টি বর্তমানে দুর্ভিক্ষের কবলে (ঐ)। ঘরবাড়ী ছেড়ে মানুষ শহরের দিকে পালাতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপতীর মতে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মহামারীতে আক্রান্ত হবে এবং মারা যাবে ( অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৪ ৯. ৭৪ )।

সংবাদপত্র বা অনুরূপ অন্য কোনো সূত্র থেকে উত্তরপ্রদেশের সামগ্রিক অবস্থার কোনো ছবি না পাওয়া গেলেও জনসঙ্ঘ নেতা শ্রীমাধো প্রসাদ সিং-এর আশঙ্কা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগামী মাসগুলিতে সেখানেও হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যাবে। ইতিমধ্যেই নাকি সেখানেও গ্রামের মানুষরা শহরের দিকে পালাতে শুরু করেছেন ( দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ৭. ৯. ৭৪ )।

মধ্যপ্রদেশ থেকে খবর আসছে—সেখানকার অনাহারপীড়িত মানুষরা গাছের পাতা, বাকল, বিচি, মূল এবং মহুয়া, কোধা এবং আক্রি ইত্যাদি পশুখাদ্য খেতে শুরু করেছেন ( হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৭. ৯. ৭৪ )। আর যে ছত্রিশগড়কে 'মধ্যপ্রদেশের ধানের ভাণ্ডার' বলা হয়, তার মোট ১ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৮০ লক্ষই অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন ( দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ৩. ১০. ৭৪ )। ছত্রিশগড়ের মানুষদের দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা এর আগেও হয়েছে—১৮৯৬ এবং ১৯০০ সালে। কিন্তু 'বর্তমান দুর্ভিক্ষের প্রকাশ আরও ভয়াবহ' (ঐ, ২৪. ৯ ৭৪)। 'শতশত গ্রাম জনমানবশূন্য। পড়ে আছে শুধু শতছিন্ন নেকড়া পরিহিত কিছু অস্থিচর্মসার পুরুষ, নারী ও শিশু। খাদ্য ও কাজের সন্ধানে লক্ষ্যহীনভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার গ্রামবাসী' (ঐ)। অতিরিক্ত পরিমাণে খেসারি ডাল খাওয়ার ফলে ৩৭২ জন মানুষের পা দুরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে (ঐ)। ছত্রিশগড়ে মোট গ্রামের সংখ্যা ২৭,০০০। তার মধ্যে ৪০০০ থেকে ৫,০০০ গ্রামে পানীয় জলও পাওয়া যাচ্ছে না ( হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৭. ৯. ৭৪ )। একমাত্র ছত্রিশগড়েই ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬টি শস্যভাণ্ডার লুটের ঘটনা ঘটেছে ( দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ২৪. ৯. ৭৪ )। রাজ্য সরকারের 'শতসহস্র প্রহরা এড়িয়ে' ইতিমধ্যেই প্রায় ২ লক্ষ লোক উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার, উড়িষ্যার দূর দূর অঞ্চলে পালিয়ে গেছে ( ঐ, ২. ১০. ৭৪ )।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিদেও যোশী নিজমুখে বলছেন তাঁর রাজ্যের মোট ২৬টি জেলার মধ্যে ১০টিই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে ( ঐ, ৭. ৯. ৭৪ )।

গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীকে. বিশ্বনাথন্‌ সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে জানাচ্ছেন—রাজ্যের মোট ২০,০০০টি গ্রামের মধ্যে ১০,০০০টিতে ( জনসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ ) সরকার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ঘোষণা করার কথা ভাবছেন (ঐ)।

মহারাষ্ট্রের ৫৪,০০,০০০ ক্ষেতমজুর এবং ১৫,০০,০০০ গরীব কৃষক অনাহারে দিন যাপন করছেন। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির অবস্থা আরও ভয়াবহ ( ঐ, ১৫. ৮. ৭৪ )।

আর ধানে-গমে উদ্বৃত্ত, 'সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থান' হরিয়ানা? দুর্ভিক্ষের অপচ্ছায়া 'সদম্ভে তার পা ফেলেছে' সেখানেও। ক্ষেতমজুররা যে কোনো শর্তে কাজ পেতে রাজি কিন্তু পাচ্ছেন না—অনাহারে আছেন ( অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩. ৯. ৭৪ )।

এক কথায় গোটা দেশের আকাশ শকুনের কালো ডানায় ঢেকে গেছে।

এককালে আমাদের অনেকেরই আদি ভিটে, বর্তমানে সবচাইতে কাছের প্রতিবেশী-দেশ, নবগঠিত বাঙলাদেশের পরিস্থিতি?

"বাঙলাদেশের বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলির নিঃস্ব মানুষরা, গত কয়েক মাস ধরে যারা শেষহীন স্রোতের মতো ভারতের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, বর্তমানে যশোর জেলার সংলগ্ন হরিদাসপুর-বইড়া সীমান্তের চেকপোষ্টগুলিতে প্রহরারত বি এস এফ এবং পুলিশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কার্যত এক আশ্চর্য এবং বেদনাদায়ক লুকোচুরি খেলায় লিপ্ত হয়েছে।

"বাঙলাদেশের নিঃস্ব মানুষদের ভারতে অনধিকার প্রবেশ অনুমোদন না করার জন্য ভারত সরকারের স্থায়ী নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, যখন তারা তাদের ভয়াবহ দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করছে তখন তাদেরকে তাদের নিজ ভূমিতে ফেরৎ পাঠাতে গিয়ে বি এস এফ এবং রাজ্য পুলিশ উভয়ই প্রায়ই ভয়ানক অসুবিধা বোধ করছে। তাঁদের চোখ মুখ জুড়ে বিরাজ করছে এক চূড়ান্ত আতঙ্ক ও অসহায়ত্বের ভাব। যে-কোনো উপায়ে ভারতে প্রবেশ করার জন্য শত শত নিঃস্ব পুরুষ, নারী ও শিশুদের এই বারংবার এবং মরীয়া প্রচেষ্টা পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় যে তাদের কাছে এটা একটা বাঁচা-মরার প্রশ্ন।

“...গত তিন মাসে বি এস এফ এবং পুলিশ যথাক্রমে সজে “ছাড়পত্র” আছে এমন ২,০০০ ও ৫০০ বাঙলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে।

“কিন্তু যাদের কাছে এমনকি কোনো ‘ছাড়পত্র’ও নেই তারাও শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লুকিয়ে ভারতে ঢুকছে। এদের কাউকে কাউকে, যাদের সীমান্তে ধরা হয়েছিল এবং ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল, পুনরায় সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখা গেছে। কারণ তারা ভারতীয়—এই অজুহাত দেখিয়ে বাঙলাদেশের চেকপোস্টগুলিতে প্রহরারত বাঙলাদেশ রাইফেল বাহিনী তাদেরকে বাঙলাদেশে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করেছে।...

“হাজার হাজার অভুক্ত এবং নেকড়া পরিহিত পুরুষ নারী ও শিশু কোনো রকমে যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা কার্যত এক গভীর করুণা উদ্রেগকারী দৃশ্য।...... এঁদের বেশির ভাগই এসেছে বণ্যা পীড়িত বরিশাল ও ফরিদপুর জেলা থেকে। চাল, নুন, আটা এবং সর্ষের তেল ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রের দাম যেখানে পুরোপুরি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। চালের দাম সের প্রতি ৫.৫০ থেকে ৬ টাকা, সর্ষের তেল ৫০ টাকা, নুন ৬ টাকা আর একটা অত্যন্ত মামুলী শাড়ী বিক্রি হচ্ছে ৩৫ থেকে ৪০ টাকায়। বনগাঁ, বারাসাত, রাণাঘাট ও অন্যান্য রেল স্টেশনে তারা অস্থায়ী আস্তানা পেতেছে। তাদের কেউ কেউ কীভাবে তারা ভারতে চলে যাওয়ার জন্য এবং ‘সেখানে সরকার যে-সব রিলিফ ক্যাম্প খুলেছেন তার থেকে নিজেদেরটা জোগাড় করে নেওয়ার জন্য’ স্থানীয় ‘নেতাদের’ দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিল তা বর্ণনা করেছে” ( হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৩০. ৯. ৭৪ )। কারণ, ‘এমনকি ভীড়ে উপচে পড়া ঢাকার রেফিউজী ক্যাম্পগুলিতে বুভুক্ষ মানুষদের দেবার মতো পর্যাপ্ত রেশনও বাঙলাদেশে নেই’ ( টাইম, ১১. ১১. ৭৪ )। বাঙলাদেশের একজন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীইসলাম ১৩ই নভেম্বর রাত্রে ( নিখিল বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে ) নিজমুখে ঘোষণা করেছেন ‘যে খাদ্য সাহায্য কর্মসূচী কাজে পরিণত করার কাজ যদি ত্বরান্বিত করা না হয় তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর দেশের দশ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাবে। তিনি আরও বলেছেন যে গত সপ্তাহে রঙপুর এবং ময়মনসিংহ জেলায় কম করেও ১,০০,০০০ লোক মারা গেছে’ ( দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ১৪. ১১. ৭৩ )।

আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশের, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অন্য দেশগুলিতে—যে দেশগুলিকে আমাদেরই মতো ‘অনুন্নত’ বা ‘উন্নয়নশীল’ দেশ বলা হয়—ছবিটা কেমন?

আফ্রিকার দিকে তাকানো যাক।

ছোট বড় মোট ৩৯টি দেশ নিয়ে আফ্রিকা মহাদেশ। এরমধ্যে সাহারার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সাহেলীয় দেশ সুদান, চাড (Chad), নাইগার, নাইজেরিয়া, মালি, মাউরিতানিয়া, সেনেগাল, আপার ভোল্টা, গাম্বিয়া ইত্যাদি এবং ইথিওপিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাব্লিক, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, কেমেরুণ, ঘানা, ডাহোমে, গুয়েনা আর সাহারার পশ্চিমের দেশ আলজিরিয়া সহ ছোট-বড় প্রায় ১৯টি দেশই আজ কম-বেশি দুর্ভিক্ষের কবলে। সাহেলীয় দেশগুলির অবস্থাই সবচাইতে ভয়াবহ। ১৯৬৮ থেকে ধারাবাহিকভাবে সেখানে খরা চলছে। মাইলের পর মাইল আবাদি এবং বসবাসযোগ্য অঞ্চল মরু-ভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর তারই সাথে পাল্লা দিয়ে মরীয়া মানুষ উট, গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি পশুপাল নিয়ে ক্রমাগত দক্ষিণে চলে যাচ্ছে।” আতলান্তিক মান্থলি ( মে, ১৯৭৪ )-এ ক্লায়ের স্টারলিং লিখছেন—“[এ জন্য]” মানুষকে কী পরিমাণ পথ শুল্ক* দিতে হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কতখানি ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে তা সঠিক ভাবে বলার পক্ষে পরিসংখ্যাণ আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। সাহেলীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ রকম ক্ষতিগ্রস্থ মাউরিতানিয়ার

* সাহারার দক্ষিণ প্রান্তে শায়িত, মকরক্রান্তি রেখার উপরে চতুর্দশ ও অষ্টাদশ দ্রাঘিমারেখার মাঝখানে অবস্থিত, সাহারার প্রান্তরেখা জুড়ে পশ্চিমে আতলান্টিক মহাসমুদ্র থেকে পূর্বে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত—পশ্চিম আফ্রিকার মানচিত্রের বিস্তীর্ণ এই ভূখণ্ডটি সাহেল ( Sahel ) নামে পরিচিত। ছোট বড় অনেকগুলি দেশ নিয়ে এই সাহেল। দক্ষিণপ্রান্তে বছরে ৫৮ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয় ( জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ) আর উত্তরে অর্থাৎ সাহারার কাছাকাছি সাহেলে বৃষ্টিপাত একরকম হয়না বললেই চলে। বর্তমান লোকসংখ্যা ২,৫০,০০,০০০। তিন-চতুর্থাংশ কৃষিজীবী ( মূলত দক্ষিণ প্রান্তের বাসিন্দে। এরা জোয়ার এবং সোরগম ঘাসের চাষ করে )। বাকি এক-চতুর্থাংশের বাস উত্তর সাহেলে ( তাপমাত্রা ১২২০ ফা. হি. এবং একমাত্র শক্ত টামারিস্ক ও অ্যাকসিয়া গাছ, সাভানুনাহ ঘাস আর কাঁটার জঙ্গলই টিকে থাকতে পারে )—এরা যাযাবর। উট, ভেড়া ছাগল, গরু, গাধা ইত্যাদি পশুপালনই এদের জীবিকা। প্রতি বর্ষায় এরা পশুপাল নিয়ে উত্তরে চলে যায় আর গ্রীষ্মে কৃষিজীবীদের সাথে যুগ যুগান্ত থেকে চলে আসা চুক্তি অনুসারে দক্ষিণে ফেরে। যাযাবরদের পশুরা কৃষিজীবীদের জমিতে, ফসল কাটার পর পড়ে থাকা শস্যের গোড়াগুলি খায় এবং বিনিময়ে পশুরা তখন জমিতে যে মল ত্যাগ করে তা কৃষিজীবীদের জমিতে জৈবিক সার হিসাবে কাজ করে। —বীঃ সঃ দঃ

একমাত্র সেনেগাল নদী উপত্যাকা ছাড়া গত দু'বছরে কোনো ফসল ওঠেনি। 'আমরা একটা ভিক্ষার উপর নির্ভরশীল জাতি'—একজন আঞ্চলিক প্রশুর্বর বেদনার সাথে স্বীকার করেছেন। 'প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে চারজন ধ্বংস হয়ে গেছে।' চাডের (Chad) বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অর্ধেকই নাকি বালিতে পরিণত হয়েছে।... ..

"গেল শরতে দু'সপ্তাহ আমি পশ্চিম আফ্রিকার সাহেলে কাটিয়েছি। যেখানেই গেছি—দুঃখ-দুর্দশা প্রকট। বহু গ্রাম পরিত্যক্ত। এখনও মানুষ বসবাস করছে এমন সব বসত-এ (উপনিবেশ-এ), কৃষকরা আমাকে বলেছে যে রোপন করতে পারার আগেই তাদেরকে তাদের সমস্ত জোয়ার খেয়ে ফেলতে হয়েছে। এইসব গ্রামের চারদিক ঘিরে রয়েছে যাযাবর উদ্বাস্তু শিবিরগুলি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি শুধুমাত্র খড়ে-ঘেরা আস্তানা। শিবিরগুলির বাসিন্দেরা বেশিরভাগই নারী আর শিশু। পুরুষরা তাদের শেষ পশুগুলির সাথে—যেগুলিকে তাঁরা বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল, মারা গেছে। এই পশুপালই ছিল যাযাবরদের মাংস আর দুধ, ভারবাহী পশু, তাদের তাঁবুর জন্ত পশুচর্ম আর জামাকাপড়ের পশম, সন্তানদের জন্ত বিবাহের যৌতুক আর সম্পত্তির উইল। বর্তমানে এই পশুপালের ৯০% নিঃশেষ হয়ে গেছে।

"আমি যখন উত্তর মালিতে যাই তখন সেখানকার সামরিক সরকার উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে বিদেশী ত্রাণকর্মী ও পরিদর্শকদের ঢোকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু আমি শুনতে পাই ভয়ঙ্কর নোংরা পরিবেশে শিশুরা সেখানে একাকী বাস করছে এবং একটি তাঁবুকে কথা যেখানে সাতটি শিশু দিনের পর দিন তাঁদের মায়ের দেহের চারপাশে অবস্থান করেছে, তার 'ঘুম ভাঙার' অপেক্ষায়। গাও-র উত্তপ্ত বালির উপর যাযাবররা হাটুর উপর মাথা রেখে বসেছিল, এমনই দুর্বল যে সাহায্যের জন্ত একটা হাত পাতবার ক্ষমতাও নেই।" (রিডার ডাইজেস্ট, সেপ্টেম্বর, ৭৪-এ উদ্ধৃত)

অথচ এই সেহেলেরই ৩০০ মিটার নীচে প্রচুর পরিমাণে জল (Ground water) আছে এবং সাহেলীয় সরকারগুলির অনুরোধে বিদেশী বিশেষজ্ঞরা হাজার হাজার 'বোর-হোল' খুড়ে সাহেলকে প্রায় এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলেছেন। প্রচুর জলও উঠছে। কিন্তু সাহারার আগ্রাসী ক্ষুধাকে ঠেকাতে এর চাইতে বেশি আর কিছুই করা হয়নি, শুধুমাত্র ৬,২৫,০০ টন খাদ্য সাহায্য ছাড়া! "কিন্তু", ক্লায়ের লিখছেন "সবচাইতে যা তাদের বেশি দরকার তা হল ভূমি ব্যবস্থা, গাছ ও পশুখাদ্য এবং জল ব্যবস্থার জন্ত একটি পরিকল্পনা আর তার সাথে চাই তাকে কাজে পরিণত করার মতো রাজনৈতিক সাহসিকতা। উপযুক্ত পরিচালনা পেলে সাহেল ক্ষুধার্ত আফ্রিকার অর্ধেককে খাওয়াবার মতো পর্যাপ্ত গোমাংস উৎপন্ন করতে পারে।" অথচ সেই সাহেলেই আজ ১,০০,০০০ মানুষ ও ২,০০,০০০ গবাদিপশু অনাহারে শুকিয়ে মারা গেছে (ঐ)।

সাহেলের ঠিক পূর্বসীমানায় রয়েছে ইথিওপিয়া—'আফ্রিকার শস্যের গোলা' ইথিওপিয়া। (মৃত্যুর পরিসংখ্যাণ এখানে আরও ভয়াবহ—২,০০,০০০ (ট্রাইকন্টিনেন্টাল, ৯১, বর্ষ ৯, ১৯৭৪)

একমাত্র পূর্বব্রাজিল ছাড়া লাতিন আর কোথাও ক্ষুধা বর্তমানে দুর্ভিক্ষের চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ না করলেও, কিউবা বাদে গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়ে রয়েছে ক্ষুধা, 'অপুষ্টিজনিত' নানা রোগ ও মৃত্যুর চড়াছড়ি।

উপরের বিবরণ থেকে এটা পরিষ্কার যে তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই আজ দুর্ভিক্ষ হচ্ছে না। কিন্তু নীচের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই যে দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র আর ক্ষুধা গোটা তৃতীয় দুনিয়ার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নিত্যসঙ্গী। কারণ

### এক নজরে তৃতীয় দুনিয়ার দারিদ্র ও ক্ষুধার ছবি

● যেখানে দিনে একজন মানুষের সাধারণত ৩,000 ক্যালরী খাদ্য প্রয়োজন সেখানে বলিভিয়ার লোক পায় দিনে ১,২০০ কলম্বিয়ার লোক পায় ২,০০০ এবং ইকোয়েডরের লোক ২,৬০০ ক্যালরী।—সূত্র, K. Malin, How many the Earth will Feed? : p—৮।

● এই বাক্যটি পড়তে আপনার যতটুকু সময় লাগবে, ততক্ষণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে (মূলত তৃতীয় বিশ্বে) ১০০ জন মানুষ মারা যেতে পারেন।—সূত্র: ইকনমিক টাইমস্, নভেম্বর ৪।

● পৃথিবীতে বর্তমানে অপুষ্টি ও অনাহার পীড়িত মানুষের সংখ্যা ৭০ থেকে ৮০ কোটি।—সূত্র: ঐ।

● প্রতিদিন অপুষ্টিতে ৮,০০০০ মানুষ মারা যায়।—সূত্র: 'গ্রামনা', জুন ১২, ১৯৭৫, ট্রাইকন্টিনেন্টাল ৯১, বর্ষ. ১৯৭৪-এ উদ্ধৃত।

● প্রতিদিন পৃথিবীতে ২৭,০০০ শিশুর জন্ম হয়, তার মধ্যে ৭০০০ জন এক বছর বয়স হবার আগেই মারা যায়।—সূত্র: ঐ।

● প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে বলিভিয়াতে ২৭৭ জন মারা যায়, আর্জেন্টিনায় ৩৫৫ জন মারা যায়। আর ইরানে শতকরা ৮৫ ভাগ শিশু ১৫ বছর বয়স হবার আগেই মারা যায়।—সূত্র: মালিন, পৃ-৮।

● আফ্রিকায় প্রতি তিনজনে একজন শিশু পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই মারা যায়। ক্ষুধা ব্রাজিলের ৮,০,০০০০ শিশুর মধ্যে ৪০%

ভাগ শিশুর 'মাথায়' নানা রকম রোগের জন্ম দিয়েছে।—সূত্র : ট্রাইকন্টিনেন্টাল, ঐ।

● দক্ষিণ এশিয়ায় শতকরা নব্বই ভাগ শিশু ম্যালেরিয়ায় ভোগে।—সূত্র : মালিন, পৃ-৮।

● আমেরিকা ও কানাডাতে যেখানে মাথাপিছু বার্ষিক ভাগের পরিমাণ এক টন সেখানে ভারত, নাইজেরিয়া, কলম্বিয়া ইত্যাদি দরিদ্র দেশগুলিতে এই পরিমাণ ৪০০ পাউণ্ড মাত্র।—সূত্র : দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ৫. ৬. ৭৩।

● অনুন্নত দেশগুলিতে প্রায় ১৫,০০,০০০ পরিবারের মাথায় কোনো ছাত নেই।—সূত্র : মলিন, পৃ-৮।

● উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনুন্নত দেশগুলিতে মানুষের গড় আয়ু ২০ বছর কম।—ট্রাইকন্টিনেন্টাল, ঐ।

তৃতীয় দুনিয়ার প্রতিটি দেশেই বিরাজ করছে, কোনোমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অর্থনীতি, অর্থনীতি পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'সাবসিস্টেন্স ইকনমি'। অর্থাৎ মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও এই দেশগুলির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বাসস্থান—মানুষের জীবনের এই তিনটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের ন্যূনতমটুকুও সংগ্রহ করে উঠতে পারেন না। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় এই অর্থনীতিকেই আমরা বলি **দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য**। এরই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে এইসব দেশের বিরাট সংখ্যক শিশু জন্মলগ্নেই মৃত্যুর 'বিধিলিপি' নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। যে-মায়ের প্রয়োজনীয় খাবার তো দূরের কথা, দুবেলা ভরপেট নিম্নমানের খাবারও জোটে না তাঁর সন্তান মৃত অবস্থায়ই জন্মাবে কিম্বা ভূমিষ্ঠ হবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মা এবং নবজাতক উভয়েই একসঙ্গে মারা যাবে—এতে আর অবাক হবার কি আছে। আর ডারউইনের প্রকৃতি নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী গোড়ার দিকটায় যারা 'টি'কে যায়—অনাহার-অর্ধাহার কিম্বা অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়ার ফলে তাদের শরীরে ঘাটি গাড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অসাধ্য নানা রকমের সব রোগ-ব্যাধি। ফলে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে, এক সময় না এক সময়, অপরিণত বয়সে তারাও মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করে। হৃষ্টপুষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞরা এরই নাম দিয়েছেন-'অপুষ্টিজনিত রোগে মৃত্যু'। অর্থাৎ **দারিদ্র্য-অনাহার-রোগ-মৃত্যু** এই সরলরেখাই তৃতীয় দুনিয়ার মানুষের জীবন। চারদিকেই ছড়িয়ে আছে ক্ষুধা, ক্ষুধা আর ক্ষুধা—মৃত্যু মৃত্যু আর মৃত্যু। গোটা তৃতীয় দুনিয়াটাই যেন ক্ষুধা আর মৃত্যুর এক অন্তহীন মিছিল!

কিন্তু ক্ষুধাতো মানুষকে শুধু শরীরেই মারে না, শরীর মারার সাথে সাথে ক্ষুধা মানুষকে মনেও মারে। সমস্ত ধরণের প্রতিকূলতাকে জয় করার যে অদম্য আকাঙ্খা মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য, ক্ষুধা একটু একটু করে তা মানুষের কাছ থেকে হরণ করে নেয়। ক্ষুধা মানুষের আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়, আত্মসম্মানবোধকে ধ্বংস করে দেয়। ক্ষুধা মানুষকে পরাজয়বাদী করে তোলে। শরীরে মারার আগেই ক্ষুধা মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটায়। আর এরই অনিবার্য পরিণতি হিসাবে রোজকার খবরের কাগজে আমরা পড়ি—

**"বেকারীর জ্বালায় পুত্র হত্যার চেষ্টা : অবশেষে গ্রেপ্তার**

বোম্বাই, ১৫ই জানুয়ারী—একজন বেকার এবং অসুস্থ লোককে পুলিশ এখানে গ্রেপ্তার করেছে নিজের ছেলেকে খুন করতে যাওয়ার অপরাধে। সংসার চালাতে না পারার জ্বালায় সে এমন কাজ করতে গিয়েছিল।

যোশেফ এন্টনী ক্যালহিল নামে যক্ষা রোগাক্রান্ত ৪৬ বছরের এই লোকটি তার আট বছরের ছেলে জ্যাকবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেঁধে ফেলে এবং তার গলা চেপে ধরে। তারপর তার ঘাড়ের উপর একটা পাথর চাপিয়ে হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করে। যাই হোক, জ্যাকব বেঁচে যায়, কেননা হাতুড়ী শুধু পাথরটিকেই আঘাত করে।

এরপর যোশেফ ছুরি দিয়ে তলপেটে আঘাত করে। কিছুক্ষণ পরেই যোশেফের ভাই টমাস বাড়ি ফিরে জ্যাকবকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠায় এবং পুলিশকে খবর দেয়।

যোশেফ পুলিশের কাছে বলে যে বেকারত্ব, যক্ষা রোগ-ভোগ এবং সংসার চালানোর অক্ষমতায় সে জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে বলে সে জানায়।"

—সত্যযুগ, ১৬ই জানুয়ারী '৭৩

**"অভাবের তাড়নায় দশ টাকায় সন্তান বিক্রি**

বনগ্রাম (২৪ পরগণা), ২৮শে ফেব্রুয়ারী : এখানকার এক গ্রামে মাত্র দশ টাকায় আঠারো দিনের এক শিশু সন্তানকে বিক্রি করা হয়। গ্রামের কতিপয় যুবক জানতে পেরে হাট কালেকশান করে টাকাটা সংগ্রহ করে শিশুটিকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। এছাড়া শিশুটির জন্য সাবু-বার্লিরও ব্যবস্থা করে দেয়।

সুন্দরপুর অঞ্চলের বাগানগ্রাম গ্রামের শ্রীনরেন মল্লিকের বাড়ীতে এই কাণ্ড ঘটেছে। এর ক্ষেতমজুরের কাজ।

বর্তমানে অধিকাংশ দিন কাজ নেই। সেজন্য অনাহারে-অর্ধাহারে এদের দিন কাটছে। অভাবের জ্বালায় পড়ে মেয়ের সন্তানকে বিক্রি করেছিল বলে জানা গেল। ক্ষেত-মজুরের রোজ মাত্র দেড় টাকা কিন্তু চালের দাম ১ টাকা ৯১ পয়সা। আটা বা গম অমিল।"

—দৈনিক বসুমতী, ১লা মার্চ, ১৯৭৩।

উপরের দুটি উদাহরণের মধ্যেই মানুষের আত্মিক মৃত্যুর অনেকগুলি লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি —

ক্ষুধা শুধুমাত্র মানুষের আত্মসম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাসকেই নষ্ট করে দেয় না, ক্ষুধা মানুষের কাছ থেকে স্নেহ-মমতা ইত্যাদি হৃদয়-বৃত্তিগুলিকেও কেড়ে নেয়; ক্ষুধার তাড়নায় মাতাপিতা তাদের একমাত্র সন্তানকে বিক্রি করতে কুণ্ঠিত হয় না, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করে। ক্ষুধা মানুষের পরিবার ভেঙে দেয়—ক্ষুধার-তাড়নায় স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায়।

অর্থাৎ যে সামাজিক/অর্থনৈতিক কারণ, যে শোষক (তা সে গ্রামের জোতদার, জমিদার, মহাজনই হোক কিম্বা শহরের কারখানা মালিকই হোক) তাকে নিঃস্ব করেছে, অনাহারে রেখেছে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধার শিকার এই মানুষ একটু একটু করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং 'নিয়তির' হাতে নিজেকে সঁপে দেয়। আর আমরা দেখি—রোজ একটু একটু করে আমাদের দরজায় ভিখারীর সংখ্যা বাড়ছে, ফুটপাতের পরিবারগুলি সংখ্যায় বাড়ছে, কুকুরের সাথে পাল্লা দিয়ে "মানুষ" ডাস্টবিন থেকে "খাবার" কুড়িয়ে খাচ্ছে কিম্বা বনিময়ে অন্তত খেতে পাবে এই সান্ত্বনায় স্বামী কিম্বা পিতা স্বেচ্ছায় স্ত্রী বা কন্যাকে লম্পটের হাতে তুলে দিচ্ছে।

শারীরিক মৃত্যুর চাইতেও মানুষের এই আত্মিক মৃত্যু অনেক অনেক বেশি ভয়াবহ, অনেক অনেক বেশি বেদনাময়। কারণ আত্মিক মৃত্যুর পরে মানুষ আর মানুষ থাকে না, টিকে থাকে শুধু তার জৈবিক অস্তিত্ব, জীবজগতের নিরীহ সদস্যদের সাথে একমাত্র আকৃতি ছাড়া অন্যকোনো তফাৎ যার খুব একটা নেই।

দুর্ভিক্ষের সময় নতুন আর কি ঘটে?—কিছুই না। **দুর্ভিক্ষ এই দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র আর ক্ষুধার সবচেয়ে ভয়াবহ এবং ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র।** স্বাভাবিক সময়ে যা ধিকি ধিকি করে ঘটে, খরা, বন্যা ইত্যাদি 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' বা যুদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষে হঠাৎই যেন তা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে এবং একটা দুটো করে নয়, হাজারে হাজারে এসব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি, খবরের কাগজে পাতায় নয় একেবারে চোখের সামনে। ফলে, নিজেরা খিদে পেলে খেতে পাই এবং পড়াশুনা ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনও কোনো না কোনো ভাবে মেটাতে পারি বলে, অন্য সময় যা আমাদের চোখে পড়ে না বা চোখে পড়লেও তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না—দুর্ভিক্ষের সময় সেটাই আমাদের পীড়িত করে তোলে, আমাদের হৃদয়-বৃত্তিগুলি মোচড় দিয়ে ওঠে, আমাদের সৌন্দর্যপ্রীতি পীড়িত হয়, আমরা ভাবতে শুরু করি—কেন এই দুর্ভিক্ষ? কেন এই দুর্ভিক্ষ? কেন একদিকে হোটেল রেস্তোরাঁ কিম্বা বিয়ে বাড়ীতে খাবারের বন্যা বয়ে যায় অথচ অন্যদিকে যারা এই খাবার উৎপন্ন করে তারা খেতে পায় না, অনাহারে মারা যায়, কুকুরের সাথে কামড়াকামড়ি করে ডাস্টবিন থেকে "খাবার" কুড়িয়ে খায়?

আর এই প্রশ্নকে নিয়ে একটু নাড়া চাড়া করলেই আমরা দেখতে পাই—দুর্ভিক্ষ যে যন্ত্রনাদায়ক ঘটনাগুলিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে, আমাদের অন্নদাতাদের যে বেদনাদায়ক পরিণতিগুলি আমাদের অন্তরকে পীড়িত করছে, সেগুলির কোনোটাই সাময়িক চরিত্রের নয়; নানারূপে, নানাভাবে রোজই হাজারে এসব ঘটনা আমাদের দেশে ঘটছে।

● প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে প্রতি বছর ভারতে ৮৫,০০০ মহিলা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এদের মধ্যে যারা রোগ-ভোগে মারা যান তাদের শতকরা ৫৭ ভাগই মারা যান চিকিৎসার অভাবে। 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব পাবলিক ওপিনিয়ন'-এর মতে ভারতের ৩২৬,০০০,০০০ জন মানুষ (মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ) অপুষ্টিতে ভোগেন। —সূত্র: People' Cause, Vol. No. 8; Feb; 73।

● ভারতীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী ভারতে এক থেকে ছয় বছর বয়ক্রমের ১০০ লক্ষ শিশুর শতকরা ৫০ জন অপুষ্টিতে ভোগে। এই শতকরা পঞ্চাশ ভাগের মধ্যে অন্তত শতকরা ২৫ জন শিশুর মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে অথবা এরা যকৃত, পাচনতন্ত্র, হৃদ এবং চোখের রোগে ভুগবে। —অমৃতবাজার পত্রিকা, ২. ৬. ৭৩।

● স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে পাওয়া এক তথ্য অনুযায়ী মারাত্মক রকমের অপুষ্টির ফলে এই দেশে (ভারতে) প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ শিশু প্রাণ হারায়।—দি ষ্টেটস্‌ম্যান, ৭. ৮. ৭৩।

● ভারতে যক্ষা রোগীর সংখ্যা ৮০ লক্ষ — দি ষ্টেটসম্যান, ৯. ৮. ৭৩।

● এ বছর পৃথিবীতে মোট ৩০,০০০ লোক স্মল পক্সে মারা গেছে। এর মধ্যে বিহারে মারা গেছে ১৭,০০০ ( কেউ কেউ অবশ্য এই সংখ্যাটা ৩৬,০০০ হাজারের চাইতেও বেশি বলে দাবি করেন )। কার্যত পৃথিবীর প্রতি তিনটি স্মল পক্সের ঘটনার মধ্যে ২টি বিহারের। ইলাসট্রেটেড উইকলি, আগষ্ট ১১, ১৯৭৪।

অর্থাৎ আমাদের মাতৃভূমি দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র আর ক্ষুধার দেশ—দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষের দেশ। আর একটু ভাবনাচিন্তা করলে এটাও আমরা দেখতে পাই যে সমস্যাটা আমাদের মাতৃভূমির একলার নয়—সমস্যাটা তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি দেশের। অথচ পাশাপাশি আমরা দেখছি পশ্চিমের (আমেরিকা, ইওরোপ) উন্নত দেশগুলিতে তৃতীয় বিশ্বের মতো দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র বা ক্ষুধা কোনো সমস্যাই নেই। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি "প্রাকৃতিক" বিপর্যয়ও সেখানে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে না। দৃষ্টিকে আরও একটু প্রসারিত করলে আমরা এমন আরও কতগুলি দেশকে দেখতে পাই, যেগুলি ভৌগোলিকভাবে তৃতীয় দুনিয়ার পরিসীমার মধ্যে অবস্থিত হলেও তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চরিত্র ( যা একদিন কমবেশি আমাদের মতোই ছিল ) একেবারে আমূলে পাল্টে গেছে। এই দেশগুলি হ'ল চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম এবং কিউবা। কিছুদিন আগেও ভূগোলের পাঠ্য-বইয়ে এই দেশগুলিকে আমরা 'অশ্রু আর দুর্ভিক্ষের দেশ' ( Land of tears and famine ) বলেই জানতাম, কিন্তু বর্তমানে সেখানে অশ্রু বা দুর্ভিক্ষ কোনোটাই নেই।

অর্থাৎ ঘুরে ফিরে একটা সিদ্ধান্তেই উপনীত হই আমরা—যে ধরণের তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র আর ক্ষুধার কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, বর্তমানে তা শুধুমাত্র তৃতীয় দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু কেন ? কেন দারিদ্র আর ক্ষুধা আমাদের দেশে, যে-দেশের সম্পদ আর প্রাচুর্য একদিন সারা পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু ছিল, এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্য দেশগুলিতেই একমাত্র স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে ? তৃতীয় বিশ্বের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর মূলে দায়ী ? এটাকি তার জনসংখ্যা * ( অর্থাৎ আমাদের বাবা-মা'রা "শুয়োরের মতো" সন্তানের জন্ম দেন বলেই আমরা গরীব এবং খেতে পাই না ) ? এটা কি তার অধিবাসীদের পিছিয়ে পড়া মানসিকতা ( যেমন বলা হয় উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণে ভারতীয় কৃষকদের অনীহা ভারতের দারিদ্রের একটা কারণ ) ? এটা কি তাদের সামাজিক অনগ্রসরতা এবং কুসংস্কার ( ব্রিটিশ শাসকরা যেমন বলতো—জাতি-ভেদ প্রথা, গরুকে মা হিসাবে পূজা করা ইত্যাদি ভারতীয় জনগণের দারিদ্রের একটা কারণ ) ? এটা কি তৃতীয় বিশ্বের জনগণের আলস্য এবং উদ্যমের অভাব ( আমাদের দেশের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়—ভারতীয়রা গরীব কারণ তারা বেশি খাটতে পারে না, পশ্চিমের শীতপ্রধান দেশের মানুষের তুলনায় তারা অলস ) ? নাকি এটা তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতিনির্ধারিত কোনো বিশেষ বিধিলিপি ? নাকি অন্য কোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণ এর পিছনে কাজ করছে ?

এর কি কোনো প্রতিবিধান নেই ? যদি থেকে থাকে তো সেটা কী ? যাগ-যজ্ঞ-হোম ( যেমনটি অনেকে বিশ্বাস করেন ) ? পরিবার পরিকল্পনা ('সদাশয়' মার্কিন সরকারের সাহায্য ও পরামর্শে আমাদের মাতৃভূমি এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে যার ঢালাও প্রচার এবং প্রয়োগ চলছে—কোটি কোটি টাকা খরচ করে ) ? কেউটলাভের জন্য আরও কিছু কাল ধৈর্য ধরে কষ্ট করা ( প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশংকর দয়াল শর্মা যেমন সুখের মুখ দেখতে হলে অন্তত আরও ২০ বছর জাতিকে ধৈর্য ধরে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে উপদেশ দিয়েছেন ) ? নাকি অন্য কোনো পথ ? চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম, কিউবা ইত্যাদি দেশগুলিই বা কি করে 'কান্না আর দুর্ভিক্ষের' বিধিলিপি'কে খণ্ডন করলো ?

কিশোর-যুব-ছাত্রসহ প্রতিটি দেশপ্রেমিক মনেই আজ এই প্রশ্নগুলি আলোড়িত হচ্ছে।

ধারাবাহিক এই দারিদ্র, ক্ষুধা আর মৃত্যুর কারণ কোথায় লুকিয়ে আছে তা আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। সাথে সাথেই করতে হবে সেই পথেরও সন্ধান—যে-পথে অগ্রসর হলেই একমাত্র আমরা আমাদের মাতৃভূমি থেকে দারিদ্র, ক্ষুধা আর মৃত্যুকে চিরতরে নির্বাসন দিতে পারবো, আমাদের মাতৃভূমি এক সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে এই অন্বেষণেরই একটা চেষ্টা হয়েছে। স্বল্প সময় এবং অনভিজ্ঞতার জন্য স্বাভাবিকভাবেই এই অন্বেষণে অনেক সীমাবদ্ধতা এবং ফাঁক থেকে গেছে, অর্থাৎ, বলা যায়, অন্বেষণের কাজ আমরা শুরু করেছি মাত্র। পাঠক-পাঠিকা এবং আমাদের সবাইকার আন্তরিক অন্বেষণ ভবিষ্যতে অবশ্যই এই ফাঁকগুলি পূরণ করে দেবে—পথের সন্ধান যে আমাদের পেতেই হবে···

বিশেষ ক্রোড়পত্র/জ

---

* এ প্রসঙ্গে একটি বিস্তৃত আলোচনা ( 'অতি-জন সংখ্যার অলীক তত্ত্ব' ) এই রচনার শেষে আছে।—সঃ মঃ বীঃ

# ২. দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, দারিদ্র ও উপনিবেশবাদ

"সাধারণ দুর্দশার একমাত্র চূড়ান্তরকম প্রকোপবৃদ্ধি হিসাবেই" 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোশাল সায়েন্স' (Vol. VI, p. 162)-এ ভারতের দুর্ভিক্ষকে বর্ণনা করা হয়েছে ( কে. সি. ঘোষ, পৃ-৬৪ )।

পৃথিবীর বেশিরভাগ দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। আধুনিক যুগের দুর্ভিক্ষ দারিদ্র ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধার (chronic hunger) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে দুর্ভিক্ষ বলতে বোঝাত "আক্রান্ত অঞ্চলে খাদ্যের চরম অভাব এবং যখন এটা ঘটত ধনী দরিদ্র সকলেই একইভাবে এর শিকার হতো। আজকের দুর্ভিক্ষ বলতে বোঝায় "হঠাৎ এবং দ্রুত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যা খাদ্যবস্তুকে যে অনাহারে ভোগে সেই দরিদ্রের নাগালের বাইরে নিয়ে যায়" ( বি. এম. ভাটিয়া, 'ফেমিন ইন ইণ্ডিয়া' )। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীর সব জায়গায়ই দুর্ভিক্ষ হয়নি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অভাব ও দুর্ভিক্ষের চরিত্রেও প্রচুর অমিল দেখা যায়। "১০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ—এই ৮৫০ বছরের মধ্যে ইওরোপে মোটামুটি ৪৫০টি দুর্ভিক্ষের কথা জানা গেলও, ১৮৫০ এর পর ইওরোপ থেকে দুর্ভিক্ষ একরকম বিলুপ্ত হয়ে গেছে" ( সাউথ হার্ড—ঐ )। "এই নতুন পরিস্থিতিতে ( অর্থাৎ ১৯ শতকের পর থেকে—বীঃ সঃ দঃ) দুর্ভিক্ষ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় থাকলো না, দারিদ্র ও মৃত্যুর এক সামাজিক ( অর্থাৎ মনুষ্যসৃষ্ট—বীঃ সঃ দঃ ) ঘটনায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। ধনী দেশ কিম্বা এমনকি গরীব দেশের অপেক্ষাকৃত ধনী অংশটিকে এটি আর প্রভাবান্বিত করলো না, বরং অনুন্নত দেশগুলির—যেখানে জনসংখ্যার বেশিরভাগই এমনকি আজও অপুষ্টি এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধার এক স্তরে বাস করছে, একটি প্রাথমিক সমস্যায় পরিণত হ'ল। ফলে দারিদ্রের সাথে দুর্ভিক্ষের আত্মপ্রকাশের একটা সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপিত হল" ( বি, এম. ভাটিয়া, ঐ, পৃ-৭ )।

উপরের আলোচনা থেকে একটা সত্য খুব পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসছে—আজকের দিনে দুর্ভিক্ষ একমাত্র সেখানেই দেখা দেয় যেখানে একটি দুর্ভিক্ষপ্রবণ জনতা অর্থাৎ গরীব মানুষরা বাস করে, সাধারণ অবস্থাতেই যাদের খুব সামান্য খাদ্য জোটে এবং এর ফলে খরা, বন্যা অথবা অন্য যে কোনোরকম উপলক্ষ্যই সেখানে বিরাট আকারের বিপর্যয় ডেকে আনে। দ্বিতীয়ত আজকের দিনে দুর্ভিক্ষ কিছু দরিদ্র এবং অনুন্নত দেশেই সীমাবদ্ধ। এই সত্য থেকে সোজাসুজি একটা প্রশ্নেরই মুখোমুখি হই আমরা—ধনী দেশগুলির তুলনায় এইসব অনুন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক অবস্থাটা কি রকম?

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাৎসরিক প্রকাশনা 'দি ওয়ার্ল্ড ইকনমিক সার্ভে' থেকেই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো ধারণা পাওয়া যায়। এখানে প্রকাশিত ১৯৬৭ সালের তথ্যের উপর ভিত্তি করে জোস্যুয়া ডি কাস্ত্রো* একটি হিসাব দিয়েছেন— "সবচেয়ে ধনী ১৯টি দেশে বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ১৬% লোক বাস করে। কিন্তু বিশ্বের মোট আয়ের ৭০% তারাই ভোগ করে। এর বিপরীতে সবচেয়ে দরিদ্র ১৫টি দেশে, যেখানে পৃথিবীর ৫০% লোকের বাস, যেখানে বিশ্ব-আয়ের মোটে ১০% তাদের কাছে যায়।" 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র ১৯৭৩ সালের বাৎসরিক প্রকাশনার হিসাব অনুযায়ী ১৯৭১ সালে ১৫টি শিল্পোন্নত দেশে পৃথিবীর মোট আয়ের ৮০% চলে যায়। অর্থাৎ স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে ধনী দেশগুলি ক্রমশই আরও ধনী হয়ে উঠছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রকাশনায় পৃথিবীর দেশগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলি হ'ল—(ক) উন্নত দেশ, (খ) উন্নয়নশীল দেশ এবং (গ) কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা। উন্নত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তর আমেরিকা ( অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ), পশ্চিম ইওরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, সাইপ্রাস, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুর্কী। উন্নয়নশীল দেশ বলতে বোঝায় লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ( দঃ আফ্রিকা বাদে ) এবং এশিয়াকে ( চীন, সাইপ্রাস, জাপান, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম এবং তুর্কী বাদে )। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার দেশগুলির মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইওরোপের দেশগুলি, উত্তর ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া ও চীন। পরিসংখ্যান থেকে এইসব দেশের তুলনামূলক অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কি জানা যায়? উদাহরণ হিসাবে আমরা নীচে এইসব দেশের মাথাপিছু উৎপাদনের একটি তালিকা উপস্থিত করছি:

---

* ডি কাস্ত্রোর বিস্তারিত পরিচয় ৪-এ আছে—বীঃ সঃ দঃ

তালিকা নং-১ : ১৯৬৫ সালে মাথাপিছু মোট উৎপাদনের হিসাব ( ডলারে )

| দেশ | ১৯৬৫ | প্রতি বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ (ডলার) | |
|---|---|---|---|
| | | ১৯৬০-৬৫ | ১৯৫৫-৬০ |
| উন্নত দেশসমূহ | ১৭২৫ | ৫৯ | ৪৩ |
| উন্নয়নশীল দেশ | ১৫৭ | ৩ | ৩ |
| লাতিন আমেরিকা | ৩৭৬ | ৬ | ৬ |
| আফ্রিকা | ১২০ | ৩ | ২ |
| পশ্চিম এশিয়া | ৫৮১ | ১৬ | ১৩ |
| দঃ ও দঃ-পূঃ এশিয়া | ৯৬ | ১ | ১ |

[ সূত্র : 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক সার্ভে', ১৯৬৭, ইউ. এন. ও. প্রকাশনা ]

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ধনী ( অর্থাৎ উন্নত ) দেশগুলির মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ ( ১৭২৫ ডলার ) দরিদ্র ( অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলির গড় মাথাপিছু উৎপাদনের ( ১৫৭ ডলার ) চেয়ে ১০ গুণেরও বেশি। আমরা যদি গরীব দেশগুলির মধ্যেও সবচেয়ে গরীব দেশগুলির কথা অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কথা বিবেচনা করি ( যেখানে এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক বাস করে ), যার মধ্যে আমাদের দেশও পড়ে, তবে এই পার্থক্যটা দাঁড়াবে ১৭ গুণের চেয়েও বেশি। তালিকার ৩য় ও ৪র্থ স্তম্ভটি যদি খেয়াল করা যায়, তবে দেখা যাবে, যেখানে উন্নত দেশগুলিতে ১৯৬০ ৬৫—এই পাঁচ বছরে আগের পাঁচ বছরের ( ১৯৫৫ ৬০ ) তুলনায় মাথা পিছু আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬ ( ৫৯-৪৩ ) ডলার বেড়ে গেছে, সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ( একসাথে বিবেচনা করলে ) ঐ পরিমাণ এক জায়গাতেই ( ৩ ডলারে ) দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় উন্নত দেশগুলির সম্পদ বা আয়ের পরিমাণ শুধু যে বেশি তাই নয়, তা বেড়েও চলেছে অনেক দ্রুত হারে। অন্য কথায় এই দুই ধরণের দেশের মধ্যে ধনবৈষম্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এই ধনবৈষম্য বৃদ্ধির হার কি বিপুল তার আর একটি উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র নীচে রাখা হল :

তালিকা নং-২ : মাথাপিছু জাতীয় আয় ( ডলারে )

| | ১৯৫৮ | ১৯৬৩ | ১৯৭১ |
|---|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২১১৫ | ২৫৬০ | ৪১৩৫ |
| ভারত | ৬৫ | ৮০ | ৮০ |

[ সূত্র : এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, বুক অব দি ইয়ার ১৯৭৩ ]

তালিকাটি থেকে দেখা যাচ্ছে যেখানে ১৯৫৮ ও ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু জাতীয় আয় ভারতের তুলনায় প্রায় ৩২ গুণ বা তারও বেশি ছিল, ১৯৭১ সালে ঐ পার্থক্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ গুণে। উপরের দুটি তালিকাকে একসাথে দেখলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হ'ল দরিদ্র দেশগুলি ধনী দেশগুলির তুলনায় ১০, ২০ এমনকি ৫০ গুণের চেয়েও বেশি দরিদ্র এবং ভারত হচ্ছে এই দরিদ্র দেশগুলির মধ্যেও দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম ! কাজেই দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ও ব্যাধি এইসব দেশে একটা অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠবে—এতে আর অবাক হবার কি আছে ! ওয়েন্ডি এবং এ্যালান ১৯৬৯ সালে লিখেছিলেন, "অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, কূটনীতিবিদ ও লেখকদের এমন এক ভয় পেয়ে যাবার মতো দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা যায়, যারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ৭০ এর দশকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা জুড়ে এমন ধ্বংসাত্মক ও ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে যে তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। পরবর্তী বছরের ফসলকাটার মরশুমে বা মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে এই দুর্ভিক্ষ শেষ হবে না বরং দশকের পর দশক ধরে চলতে থাকবে। 'ক্ষুধা থেকে মুক্তি' অভিযানের প্রধান পরিচালক থমাস এম. ওয়েন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সাব-কমিটির সামনে জানান 'এই ধ্বংসলীলা এরকম একটা কিছু নয় যেটা ঘটতে পারে…গাণিতিক হিসাবের মতোই এটা একটা নিশ্চিত ব্যাপার" ( টাইগার অন দি রেইন—এ রিপোর্ট অন দি বিহার ফেমিন, পৃ-XIII )। ১৯৭৪ সালে কিথ রিচার্ডসন বলেছেন "আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে সংকট এখন শুধু বেড়েই চলবে এবং ফলে এই সম্ভাবনাও বাড়ছে যে সাহারার প্রান্তে সম্প্রতি যে 'মাত্র' লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে তার বদলে পরবর্তী বড় দুর্ভিক্ষগুলি নিযুত কোটি লোককে হত্যা করবে" ( দি গ্রোয়িং স্যাডো অব হাঙ্গার, ইমপ্রিন্ট, অক্টোবর '৭৪ )। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে ভালো খাদ্যোৎপাদন হয়েছে এরকম একটি বছর ১৯৭১ সালে সারা দুনিয়ার হিসাব ধরলে বছরে মাথাপিছু গড় খাদ্য পাবার কথা ৭২০ পাউণ্ড করে। কিন্তু এর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলি যেখানে গড়ে মাথাপিছু খাদ্য পেয়েছে ৪২০ পাউণ্ড, সেখানে উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ প্রায় ১ টন অর্থাৎ ৫ গুণ বেশি। আর তুলনাটা যদ আমরা শুধুমাত্র ভারতের সাথে করি তবে পার্থক্যটা হবে ৬ গুণ। অবশ্যই উন্নত দেশের মানুষরা প্রত্যেকে বছরে ১ টন অর্থাৎ দিনে ৩ কে. জি. করে খাদ্যশস্য খেতে পারে না। কার্যত এর মধ্যে মাত্র ১৫০ পাউণ্ড সরাসরি খাদ্য হিসাবে কাজে লাগানো হয়। বাদবাকীটাও খাদ্যের কাজেই লাগে, তবে অপ্রত্যক্ষভাবে। এগুলি পশুদের খাইয়ে দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি পাওয়া যায়। পশ্চিমের অধিবাসীরা যে আমাদের দেশের মানুষের তুলনায় সাধারণভাবে অনেক বেশি কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ও জীবনীশক্তিতে ভরপুর তার পিছনের কারণটা এইসব পরিসংখ্যান

থেকেই বেরিয়ে আসে- পশ্চিমের মানুষদের অধিকাংশই যেখানে নিয়মিত দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খেতে পায়, সেখানে অর্ধাহার ও অনাহারই আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রতিদিনের সাধারণ নিয়ম।

আমরা তৃতীয় দুনিয়ার মানুষরা কি অপরাধটা করেছি? এর জন্য কি দায়ী? আমাদের চামড়ার রঙ? আমাদের জলবায়ু? আমাদের "ক্রমবর্দ্ধমান লাখো লাখো" মানুষ? নাকি আমাদের "ভাগ্য"?

পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ এবং তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত বহু দেশের রাষ্ট্রীয় প্রবক্তারা নানা সময়ে এগুলিকেই এর কারণ হিসাবে খাড়া করেছেন এবং আজও করছেন। কিন্তু এইসব অঞ্চলেই দেশপ্রেমিক ও বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন বহু বুদ্ধিজীবী, যাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, এসব যুক্তিগুলিকে অত্যন্ত জোরালোভাবে খণ্ডন করেছেন। প্রধান ও সাধারণ কারণ হিসাবে তাঁরা একটি জিনিষকেই তুলে ধরেছেন, যদিও এরই সাথে সাথে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে আরও অনেকগুলি অপ্রধান কারণেরও ভূমিকা রয়েছে—"দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধাপীড়িত পৃথিবীর বিশাল বিশাল অঞ্চলগুলি সবই হচ্ছে ঔপনিবেশিক অঞ্চল। এগুলি আফ্রিকার দেশগুলির মতো রাজনৈতিক উপনিবেশও হতে পারে আবার চীন বা লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ অংশের মতো অর্থ নৈতিক উপনিবেশও হতে পারে। শেষোক্ত দেশগুলি অর্থ নৈতিক উপনিবেশ, কারণ এগুলিকে ইওরোপ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়।" জোস্থুয়া ডি কাস্ত্রো ১৯৪০ সালে তার বিখ্যাত বই 'জিওগ্রাফী অব হাঙ্গার'-এ এই কথা লিখেছিলেন। অবস্থাটা আজও একই রকম আছে। পার্থক্য শুধুমাত্র এটুকুই ঘটেছে যে চীন আজ আর অর্থ নৈতিক উপনিবেশ হয়ে নেই। একই বইয়ের অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "লাটিফাণ্ডিয়া ও এক-শস্য কেন্দ্রিক কৃষির মাধ্যমে অমানবিকভাবে উপনিবেশের সম্পদ শোষণ করে নেবার ফলেই প্রধানত ক্ষুধার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে উপনিবেশগুলির কৃষি-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় এবং শোষণকারী দেশগুলি তাদের উন্নত শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অত্যন্ত সস্তায় নিয়ে যেতে পারে।"

ডি কাস্ত্রো অত্যন্ত সঠিকভাবেই উপনিবেশবাদকে ক্ষুধার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু যে ঔপনিবেশিক শোষণ আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র ও ক্ষুধার রাজত্বে ঠেলে দিয়েছে, কাঁচা মাল লুণ্ঠন তার একমাত্র দিক নয়। এমনকি আজকের দিনে তা সবচেয়ে বড় দিক কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। একই রকম বা এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং অবশ্যই এর চেয়েও ভয়াবহ ও অমানবিক দিক হ'ল শ্রমশক্তি লুণ্ঠন। কারণ শ্রমশক্তি লুণ্ঠনের অর্থ হ'ল উপনিবেশের দেশের মানুষকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়ে তার বিনিময়ে অতি সামান্য পারিশ্রমিক দেওয়া, যা দিয়ে সে তার পরিশ্রমের ফলে ক্ষয়ে যাওয়া জীবনীশক্তির অতি অল্প অংশই পুনরুদ্ধার করতে পারবে এবং এইভাবে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগুবে।

### উপনিবেশবাদ কি কায়দায় এই লুণ্ঠনকার্য চালায়?

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কতগুলি জীবন্ত উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখবো পরিস্থিতি অনুযায়ী কায়দা নানা রকমের হতে পারে। কিন্তু ফলাফল সব জায়গাই এক—সংশ্লিষ্ট উপনিবেশটির জনসংখ্যাকে স্থায়ীভাবে অনাহারের সীমানায় রেখে দেওয়া। কারণ এই অবস্থায় থাকলে তখন যে কোনো পরিশ্রমিকে, তা সে যতো কমই হোক না কেন, তারা কঠোরতম পরিশ্রম করতে রাজি থাকবে। এবং কার্যত তাকে ঠিক সেটুকুই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, যা কোনো রকমে ঠিক টিঁকে থাকার জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ যে মজুরীটুকু না পেলে সে উপনিবেশ-বাদীদের স্বার্থে কাজ করার মতো শারীরিক ক্ষমতাটুকুও হারাবে। স্বভাবতই কোনো সাময়িক কারণে যদি এই আয়ের পরিমাণ সামান্য একটুও পড়ে যায়—ব্যাপক আকারে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এটা খুবই স্পষ্ট, আয়ের স্তর যদি এই রকম অস্বাভাবিক নীচু স্তরে আটকে রাখা না যেত অর্থাৎ যদি তা এইভাবে জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় না থাকত, তবে আয়ের সামান্য হেরফেরেই দুর্ভিক্ষ হতে পারতো না। অবশ্য উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে এই সাময়িক বিপর্যয়-গুলিও ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনেরই সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু তবুও আমাদের উপরোক্ত বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয় তবে দুর্ভিক্ষের মূল কারণ যে ঔপনিবেশিক শোষণের উপরোক্ত দীর্ঘস্থায়ী বৈশিষ্ট্য, সাময়িক কোনো বিপর্যয় নয় তা এই বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা গেল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ফলে যে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, তার ফলে ন্যূনতম মজুরীতে কাজ করতে প্রস্তুত যে এক বিশাল মজুত বেকার বাহিনী শ্রমশক্তি লুণ্ঠনের জন্য উপনিবেশবাদীদের অবশ্য প্রয়োজন, তাতে কিছুটা ঘাটতি দেখা যায়। কাজের তুলনায় ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা আগের মতো বেশি না হওয়ায়, কাজ করানোর জন্য একটু বেশি মজুরী দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আর তার অর্থ মুনাফায় পাহাড়ে টান পড়া। অর্থাৎ বেশি দুর্ভিক্ষ হওয়ার অর্থ (উপনিবেশবাদীদের দিক থেকে) যে রাজহাঁসটা সোনার ডিম পাড়বে, ডিম দেওয়ার ক্ষমতা নিঃশেষিত হওয়ার আগেই তাকে হত্যা করা। সেজন্যই বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে অর্থাৎ যখন থেকে শুধু কাঁচামাল লুঠ করে নিয়ে যাবার পরিবর্তে (ঊনবিংশ শতাব্দীতে

যেমন হতো ) পুঁজি বিনিয়োগ করে অর্থাৎ টাকা খাটিয়ে শস্তা শ্রম লুণ্ঠনটা উপনিবেশবাদীদের প্রধান কায়দা হয়ে উঠল। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। অর্থাৎ উপনিবেশবাদীরা নিজেদের স্বার্থেই একসাথে হঠাৎ অনেক লোকের মৃত্যুকে ঠেকানোর জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতে উপনিবেশগুলির মানুষদের অবস্থাটার কি কোনোরকম উন্নতি হয়েছে, কিম্বা দুর্ভিক্ষ মূলত যে সমস্যাকে অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ্যে টেনে আনে, সেই ক্ষুধার সমস্যাটার কি কোনো সমাধান হয়েছে? দেখা যাক এব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের কি মতামত।*.

FAO-র একজন ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনারেল লর্ড বয়েড ওর ( Lord Boyd Orr ) এ সম্পর্কে বলেছেন "দুর্ভিক্ষের সময় যে কোনো ধরণের খাবারের যে অভাব ঘটে সেটা চিরকালই মৃত্যুর একটা বড় কারণ হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু খাদ্য পেলেও, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তার পরিমাণ কম হওয়ায় অপুষ্টি থেকে ভুগছে এরকম লোকের সংখ্যার তুলনায় দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা কম। ক্ষুধাকে যদি এই অর্থে ব্যবহার করা যায় তবে যুদ্ধ-পূর্ব যুগের এক সবচেয়ে ভালো হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর ২/৩ মানুষই ক্ষুধার্ত। সাম্প্রতিক কালে এক আমেরিকান কমিটি এই সংখ্যাকে ৮৫%-এর মতো বড় বলে জানিয়েছে" ( 'জিওগ্রাফী অব হাঙ্গার'-এর ভূমিকা )। এর সাথে আমরা ডি কস্ত্রোর নিজের মন্তব্য যোগ করতে পারি—"অপুষ্টি অপ্রত্যক্ষভাবে তার কাজ করে যায়। সে শরীরকে এমন এক অক্ষম অবস্থায় নিয়ে যায় যে সেই অবস্থায় তার পক্ষে আর মারাত্মক কোনো ব্যাধির সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। সে জন্যই যে কোনো সংখ্যার বছরকে যদি একসাথে ধরা যায়, তবে দেখা যাবে যে ঐ সময়ের মধ্যে হঠাৎ ঘটা দুর্ভিক্ষের মতো লোক মারা গেছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়েছে ধারাবাহিক অপুষ্টি ও সবসময়ে বিরাজমান ক্ষুধা থেকে।"

অর্থাৎ এই হচ্ছে তাহ'লে দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশগুলির চিত্র—দুর্ভিক্ষ কোনো সময়ে থাকুক আর নাই থাকুক, ক্ষুধায় মৃত্যুর হাত থেকে তাদের নিস্তার নেই। এই ক্ষুধার চেহারা কত বীভৎস হতে পারে, কি তার অর্থ এবং কি কায়দায় ঔপনিবেশিক শাসন দুনিয়া জুড়ে এই অমানবিক দানবীয় ক্ষুধার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলো, তার কিছু জীবন্ত চিত্র এবারে আমরা উপস্থিত করবো। এই বিবরণগুলি সবই উদ্ধৃত হয়েছে জাসুয়া কাস্ত্রোর 'জিওগ্রাফী অব হাঙ্গার' বইটি থেকে।

## লাতিন আমেরিকার ক্ষুধার চিত্র

জনসংখ্যার দিক থেকে লাতিন আমেরিকা পৃথিবীর অত্যন্ত সৌভাগ্যবান অঞ্চলগুলির একটি। যেখানে পৃথিবীর বসবাসযোগ্য ভূমির ১৬% ভাগই এই মহাদেশের অংশ, যেখানে দুনিয়ার মাত্র ৬% লোক এখানে বাস করে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা? ১নং তালিকায় আমরা দেখেছি যে ১৯৬৫ সালে যেখানে উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু গড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৭২৬ ডলার, সেখানে লাতিন আমেরিকার ঐ পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৭৬ ডলার। ঐ তালিকা থেকে এও দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৫-৬০ সালে যেখানে ঐ গড় মাথাপিছু উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে ছিল ৪৩ ডলার, সেখানে লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে ঐ হারের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ ডলার। নীচের তালিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং লাতিন আমেরিকার দুটি প্রতিনিধিত্বমূলক দেশ ব্রাজিল ও মেক্সিকোর মাথাপিছু জাতীয় আয়ের কয়েক বছরের চিত্র উপস্থিত করা হ'ল।

তালিকা নং ৩ : **মাথাপিছু জাতীয় আয় ( ডলারে )**

| দেশ | ১৯৫৮ | ১৯৬৩ | ১৯৭১ |
|---|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২১১৫ | ২৫৬০ | ৪১৩৫ |
| ব্রাজিল | ১৪০ | ১৯০ | ২২০ |
| মেক্সিকো | ২৭০ | ৩৫০ | ৬৪০ |

"এইসব সামগ্রিক পরিসংখ্যানের চেয়েও লাতিন আমেরিকার জনসাধারণের জীবনধারণের মান, বিশেষত তাদের খাদ্য তালিকার ভয়াবহ চেহারা, তাদের দারিদ্রের সত্যিকারের অবস্থাটা আরও জীবন্তভাবে তুলে ধরে।" লেখক এরপর বলছেন "দক্ষিণ আমেরিকায় এমন একটি দেশও নেই যেখানকার মানুষরা ক্ষুধার হাত থেকে মুক্ত। সবাই সর্বনাশের শিকার।" তিনি আরও বলেছেন মহাদেশের ৩/৪ অংশে, যার মধ্যে পড়ে ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, চিলি, আর্জেন্টিনার উত্তর-পূর্ব, একেবারে দক্ষিণাংশ, প্যারাগুয়ের পশ্চিম অর্ধাংশ এবং ব্রাজিলের উত্তর অর্ধাংশ—"পুষ্টির অবস্থা চূড়ান্তরকম ত্রুটিপূর্ণ।" এখানকার লোকের মাত্র ২০০০ ক্যালোরী যুক্ত খাবার জোটে ( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালোরীর পরিমাণ ৩০০০ )। বছরে মাংস জোটে মাথাপিছু ৬৬ পাউণ্ড ( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩০ পাউণ্ড )। লেখক এরপরে একের পর এক বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্য তালিকার চিত্র উপস্থিত করেছেন—চিত্রটা অনেকটা এখানে ওখানে ছড়ানো ছেটানো মরুদ্যানসহ এক বিরাট মরুভূমির মতো। এরপরে তিনি সিদ্ধান্ত টেনেছেন—"এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্রই পুষ্টির অবস্থা অত্যন্ত গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ।" এরফলে এই অঞ্চলের মানুষ শরীরের দিক থেকে অনেক দুর্বল অবস্থায় রয়ে গেছে। মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর

উচ্চহার এবং ক্ষয়রোগ ও এই জাতীয় কয়েকটি ধরণের সংক্রামক ব্যাধি শেষবিচারে দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির ফলেই দেখা দেয়। এখানে সাধারণ মৃত্যুর হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণ।

কিভাবে এসবের জন্ম হয়েছে?

"দক্ষিণ আমেরিকার বর্তমান যে অনাহারের চিত্র সেটা এই মহাদেশের অতীত ইতিহাসেরই প্রত্যক্ষ ফল। এই ইতিহাস হ'ল বাণিজ্যের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শোষণের ইতিহাস, এটা পরপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক আবর্তের (Successive economic cycle) মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়েছে। এর ফলে মহাদেশের অর্থনৈতিক সংহতি ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। একের পর এক এসেছে সোনার আবর্ত, চিনির আবর্ত, দামী পাথরের, কফির, রবারের বা তেলের আবর্ত। প্রতিটি আবর্তের সময়-কাল জুড়ে দেখা গেছে যে একটা গোটা অঞ্চলকে, অন্য সমস্ত কিছুর কথা ভুলে গিয়ে, কেবল একটি জিনিষের উৎপাদন বা ব্যবহারের কাজে লাগানো হয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় হয়েছে এবং অঞ্চলের খাদ্য সরবরাহের সম্ভাবনা অবহেলিত হয়েছে।"

"ব্রাজিলের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একমাত্র ফসল হিসাব আখের চিনি উৎপাদন এ ধরণের একটি ভালো উদাহরণ। এই অঞ্চলটা একসময় অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক উর্বর ক্রান্তীয় অঞ্চলগুলির অন্যতম ছিল। আবহাওয়া ছিল কৃষিকার্যের উপযোগী এবং শুরুতে গোটা অঞ্চলটা অরণ্যে ঢাকা ছিল। বনে ছিল ফলের গাছের অফুরন্ত সমারোহ। আজ এখানে সমস্ত কিছু হজম করে ফেলার এবং ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতাসম্পন্ন চিনি-শিল্প, সমস্ত জমি সাফ করে ফেলে তাকে পুরোপুরি আখ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। এর ফলে এটা আজ এই মহাদেশের অন্যতম একটি ক্ষুধাপীড়িত অঞ্চল।"

"ঔপনিবেশিক কায়দায় জমিকে কাজে লাগানোর বিপদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত আর একটি ঘটনা হ'ল 'লাটিফান্ডিয়া' বা বৃহৎ কৃষি-সম্পত্তিগুলি। এগুলির লক্ষ্য হচ্ছে রপ্তানীর জন্য বাণিজ্যিক শস্যের (Cash crop) উৎপাদন। ৩৫ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট বুয়েনস্ এয়ার্স প্রদেশে মাত্র ৩২০টি পরিবার ৪০% জমির মালিক হয়ে বসে আছে। আর্জেন্টিনার আর একটি প্রদেশ, সান্তা ফি-তে ১৮৯টি এমন বিশাল কৃষি-সম্পত্তি আছে, যাদের জমির গড় পরিমাণ ৬২,০০০ একর। চিলিতে, দেশের কৃষি-উৎপাদনের বেশির ভাগটাই যেখান থেকে আসে, জনসংখ্যার ৮০% যেখানে বসবাস করে, সেই মধ্য-উপত্যকাঞ্চলে 'লাটিফান্ডিয়া'গুলি এখনও অপরিবর্তিতভাবে রয়ে গেছে।"

জনসংখ্যার উপর ক্ষুধার এই ব্যাপক রাজত্বের ফলাফল কি, তার একটি নাটকীয় উদাহরণ ডি কাস্ত্রো উপস্থিত করেছেন নীচের লাইনগুলিতে।

"জীকা টাটুকে লাতিন আমেরিকার নাটকের একটি প্রতীক চরিত্র হিসাবে ধরা যেতে পারে। পুষ্টির অভাবে কৃমির সংক্রমণ এবং ঘন ঘন ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এই অঞ্চলের ভেঙে-পড়া অপুষ্ট অধিবাসীদের মানসিক অবস্থা তার মধ্যদিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'জীকা যে-ভাবে দিনের পর দিন একটি জিনিষ খেয়ে যাচ্ছিলেন, সেটা দেখে একজন বিদেশী ব্যথীত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এখানে কি বীন জন্মায় না?'

—'না মশাই?'

—'ধান?'

—'না মশাই'

—'কোনো না কোনো ফল?'

—'না মশাই।'

দূরের দিকে তাকিয়ে এবং ধূমপানের নলটা টানার জন্য অথবা ঘুমের মধ্যে রাখা কোকো পাতাটিকে একবার উল্টে নেবার জন্য এক মুহূর্ত থেমে স্থানীয় অধিবাসীটি প্রতিটি প্রশ্নেরই একই উত্তর দিয়ে গেলেন—'না মশাই।'

"কিন্তু বিদেশীটির পক্ষে একথা কল্পনা করা খুবই শক্ত হয়ে উঠলো—এমন ভালোভাবে জলের ব্যবস্থা সম্পন্ন, এমন প্রচুর পরিমাণে গাছপালায় ঢাকা মাটি খাদ্য উৎপাদন করতে অক্ষম। তিনি আবার জোরের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন—'কিন্তু এই জিনিষগুলির চারা রোপন করে, এগুলি এখানে জন্মাতে পারে কিনা, সেটা কি আপনি দেখেছেন?'

"এই প্রশ্নে অধিবাসীটির চোখ দুটি যেন একটু ব্যাজাত্মকভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং এক ধরণের আশ্চর্যের সাথে তিনি বললেন—'আঃ! প্ল্যান্টাডো...ডা'। অর্থাৎ 'যদি আপনি চারা রোপন করেন তবে সেগুলি নিশ্চয়ই জন্মাবে।'"

লেখক বলছেন এই ঔদাসিন্যের কারণ জাতি বা আবহাওয়া নয়। এটা হ'ল দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করার অক্ষমতা ও উচ্চাশার অভাব। এই দুর্বল স্বাস্থ্য আবার ক্ষুধারই ধ্বংসাত্মক ফলাফল।

অবশ্য এটাই এর একমাত্র ফলাফল নয়। এর ফলে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রতিবাদ ও বিপ্লবের জন্ম হয়। লাতিন আমেরিকা বা তৃতীয় বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলের দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাসটাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

## মধ্য আমেরিকা

আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে মধ্য-আমেরিকার মানুষের জীবন-ধারণের মান সবচাইতে নীচু।

পানামা থেকে শুরু করে মেক্সিকো পর্যন্ত প্রসারিত মহাদেশীয় অঞ্চলে কেবলমাত্র শস্যনির্ভর এক অত্যন্ত অসম্পূর্ণ খাদ্যতালিকা দেখতে পাওয়া যাবে।

শস্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি খাদ্য। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। অন্যান্য আরও নানা ধরণের খাদ্যের সাথে সাথে গ্রহণ করলে শস্য একটি চমৎকার খাদ্য। কিন্তু প্রোটিন, খনিজ-লবণ ও ভিটামিনের একমাত্র উৎস হিসাবে যদি এটার ব্যবহার হয়, তবে আর তা শরীরকে উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে না।

আর এটাই হ'ল মধ্য-আমেরিকার খাদ্যের ক্ষেত্রে মূল অভাবের দিক। মহাদেশের মধ্যে এই অঞ্চলের খাদ্যের চেহারাটাই সবচেয়ে একঘেয়ে। শুধু শস্য দিয়ে তৈরী এই খাদ্যতালিকায় রয়েছে কেবলমাত্র ডাল, ভাত, গোলমরিচ, কয়েকটি ধরণের মূল এবং কফি ও চিনি। কয়েকটি অঞ্চলে এই একঘেয়েমি আরও ভয়াবহ। স্থানীয় অধিবাসীরা সেখানে শুধু রুটি বা মণ্ড হিসাবে শস্য খেয়ে থাকে। যেমন, কোনো অঞ্চলে খাদ্য হচ্ছে সকালে তিনটি রুটি, দুপুরে তিনটি রুটি ও রাত্রেও তিনটি রুটি। খাদ্যতালিকার এই সীমাবদ্ধ চেহারা খুব গুরুতর অপুষ্টির জন্ম দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর এবং সবচেয়ে ব্যাপক হ'ল প্রোটিনের অভাব। শ্রমিক ও কৃষকদের খাদ্যতালিকায় মাংস, দুধ, চীজ্ এবং ডিমের সম্পূর্ণ বা প্রায় অসম্পূর্ণ অনুপস্থিতিই প্রোটিনের এই অভাবের কারণ। যদি কৃষক একটি গরু বা কয়েকটি মুরগী পোষেও, তবু দুধ এবং ডিম সে অবশ্যম্ভাবীভাবেই শস্য এবং খাদ্য কেনার জন্য বিক্রি করে দেয়।

ভিটামিনের অভাব থেকে যে-সব রোগের জন্ম হয় তার মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক হ'ল পেলাগ্রা, বেরীবেরী এবং অপথালমিয়া। ভিটামিনের অভাব থেকেই এই রোগগুলি হয়। প্রয়োজনীয় খনিজ-পদার্থের ক্ষেত্রে লোহা ও আয়োডিনের অভাবই সবচেয়ে তীব্র। এই অভাব ব্যাপকভাবে, যথাক্রমে রক্তশূন্যতা ও গলগণ্ডের জন্ম দিয়েছে। মধ্য-আমেরিকার পর্বতাঞ্চলের সমগ্র জনসংখ্যাই এগুলির শিকার। এছাড়াও সালভাডর এবং আরও কয়েকটি অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে চূড়ান্তভাবে শক্তির অভাবও দেখা যায়। এরা দিনে গড়ে ১৫০০ ক্যালোরি যুক্ত খাদ্যের উপর বেঁচে থাকে।

পৃথিবীর যে-কটি জায়গায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে খাদ্যসংক্রান্ত অভাব দেখা যায়, এই অঞ্চল তাদের অন্যতম। ১০ বা ১২ বছর বয়স্ক বহু শিশুকেই ৪ বা ৫ বছরের বলে মনে হয়। শিশুদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পেলাগ্রা দেখা যায়। দরিদ্র মায়েরা নিজেরাই এতো কম খেতে পান যে তাদের শিশুদের পান করাবার মতো দুধ তাদের স্তনে নেই। এটাই এই রোগের প্রাদুর্ভাবের মূল কারণ। স্তন-দুগ্ধের বদলে শিশুদের খেতে হয় শস্য ও ডালের তরল মণ্ড এবং এর ফলে অতি দ্রুত পেলাগ্রার দাগগুলি দেখা যায়।

মধ্য-আমেরিকার লোকদের অনীহা, তাদের বহু পুরাতন ঔদাসীন্য ও উচ্চাশার অভাব—ধারাবাহিক এই ক্ষুধারই একটি মারাত্মক ফলাফল। কয়েকটি ধরণের ভিটামিনের অভাব ও এই অব্যাহত ক্ষুধার অস্তিত্ব প্রথমে ক্ষুধার অনুভূতিটাকেই ভোঁতা করে দেয়। এবং এরপর একজন স্থানীয় অধিবাসী যখন খাদ্যের অভাব হলেও শারীরিকভাবে আর ক্ষুধার অস্তিত্ব টের পায় না—তখন সে বেঁচে থাকার সংগ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণাটাই হারিয়ে ফেলেছে। এই প্রেরণা হ'ল খাবার ইচ্ছা।

এই ক্ষুধার্ত মানুষরা তখন আর সত্যিকারের ক্ষুধা হিসাবে কিছুই অনুভব করে না। যান্ত্রিকভাবে, যেন কর্তব্য করছে এইভাবেই তারা তখন খাবার খায়। সামান্য একটু খাবার—লঙ্কা দিয়ে একটা রুটি অথবা এক ঢোঁক মদ—এই ক্ষুধাপীড়িত অঞ্চলের একজন ব্যক্তিকে তৃপ্ত করে দেয়। এমনকি এত হাল্কা খাবারের জন্যও অধিবাসীটিকে কৃত্রিমভাবে তার খাবার ইচ্ছাটাকে জাগাতে হয়।

অতীতে স্থানীয় আদিবাসীরা (রেড ইণ্ডিয়ান) তাদের স্বভাবজাত প্রকৃতি অনুযায়ীই নানারকম অদ্ভুত ধরণের প্রাকৃতিক উৎস থেকে খাবার সংগ্রহ করতো। এরমধ্যে ছিল—সব ধরণের মাছ, ব্যাঙ, শামুক, পোকা-মাকড়, জলপাখী এবং আরও নানাধরণের জলজ-প্রাণী। এমনকি তারা হ্রদের উপর ভাসমান বিভিন্ন সামুদ্রিক শেওলাও সংগ্রহ করে খেত। এর ফল হয়েছিল এই যে—"স্থানীয় আদিবাসীদের কিছু কিছু গোষ্ঠী তাদের খাদ্যাভাসের মধ্যদিয়েই তাদের খাদ্য তালিকায় অন্তত একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছিল।"

স্পেনীয় উপনিবেশবাদীরা গোটা অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংহতিকে পুরো উল্টোপাল্টা করে দেয়। তাদের প্রথম সম্পদ আহরণের কায়দাটা ছিল পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক। এর প্রথম লক্ষ্য ছিল খনিগুলি এবং অন্য সমস্ত ধরণের উৎপাদনকেই এ পিছনে ঠেলে দেয়।

**সাংস্কৃতিক আক্রমণ :** স্পেনের চররা প্রথমে ইণ্ডিয়ানদের শেকলে বাঁধে এবং খনি, চিনিকল, নীল ও কফি বাগিচাগুলিতে ক্রীতদাসের মতো কাজ করতে বাধ্য করে। কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা ক্রমাগত এই পরাধী-

সত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। তারা প্রায়ই তাদের জমি ছেড়ে চলে যেতে থাকে এবং এইভাবে গোটা অর্থনীতিকেই বিপর্যস্ত করে দেয়।

প্রধানত দুটি জিনিষ এই অঞ্চলের খাদ্য সরবরাহকে বিপর্যস্ত করে দেয়। প্রথমত স্পেনীয় উপনিবেশবাদীরা বিরাট বিরাট জমি দখল করে ইণ্ডিয়ানদের তাড়িয়ে দেয়, যাতে তাদের মজুর হিসাবে পাওয়া যায়। কারণ তা নইলে তারা আসবে না। এমনকি একটু আগে যেমন বলা হয়েছে, সে-ভাবে শেকলেও বাঁধা হয়। কিন্তু উপনিবেশবাদীরা যে, সমস্ত জমিতেই কৃষিকাজ চালাতো তা নয়! বিরাট বিরাট অঞ্চলকে বছরের পর বছর পতিত ফেলে রাখা হয়েছিল। আর একটা জিনিষ যা স্থানীয় জনসাধারণকে ধ্বংস করে দেবার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তা হ'ল—প্রতিটি অঞ্চলকেই সম্পূর্ণভাবে কেবলমাত্র একটি জিনিষের উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা। কতগুলি অঞ্চল থেকে কেবল খনিজ সম্পদ আহরণ করা হয়েছে, অন্য কতগুলি অঞ্চল জুড়ে রয়েছে শুধু কফি বাগিচা, কতগুলি অঞ্চলে হয়েছে শুধু তামাকের চাষ। কোথাও বা শুধু কোকো। এই ধরণের বিশেষীকরণ এমন সব ধরণের ভারসাম্যহীন বিকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে যার প্রমাণ এখনও বহু দেশে পাওয়া যাবে। যেমন সালভাডরে উৎপন্ন হয় শুধু কফি, হন্দুরাসে শুধু কলা। এমন দেশ আরও অনেক আছে। এর ফলে, মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে যে ভারসাম্য থাকে, তা অত্যন্ত গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এটা এইসব অঞ্চলের জমি ও তার জীবন্ত উপাদানগুলিকে ধ্বংস করে দেয় এবং ফলে আদি অধিবাসীদের সংখ্যা কমতে থাকে।

এইভাবেই উপনিবেশবাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এইসব অঞ্চলের খাদ্য সরবরাহের উৎসগুলিকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

দক্ষিণ আমেরিকার মতো, এখানেও এইসব ঘটনাগুলিই এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামেরও জন্ম দেয়। "দক্ষিণ আমেরিকা আজও চূড়ান্ত-রকম সামাজিক অশান্তির আধার হয়ে আছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টির নির্মম জোয়াল ও তার জন্য দায়ী কারণগুলি থেকে মুক্তি পাবার জন্য অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চলছে।"

একমাত্র কিউবা নামক ছোট্ট একটি দেশ ছাড়া, সারা মধ্য-আমেরিকা জুড়েই আজ নানা নামে এসব কায়দায় উপনিবেশবাদের শোষণ অব্যাহত আছে। কিউবা ১৯৫৯ সালে সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করার পর সেখান থেকে এইসব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। মুক্তি অর্জনের আগে কিউবাকেও শুধু আখ চাষের কাজে লাগানো হতো।

## "অন্ধকার মহাদেশ" আফ্রিকা

আফ্রিকার কোনো অঞ্চলই ক্ষুধা থেকে মুক্ত নয়। এটা এমন এক মহাদেশ যার গোটাটাই ক্ষুধা থেকে ভুগছে। আর আফ্রিকার পশ্চাদপদতা ও অপেক্ষাকৃত গতিহীনতা এবং জনসংখ্যার অধিকাংশের নিস্তেজভাবের মূল কারণ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা ও অপুষ্টির মধ্যেই পাওয়া যাবে।

আয়তনে আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ হলেও সবচেয়ে কম লোকসংখ্যার মহাদেশগুলির অন্যতম। ১১,৫০০,০০০ কমিটারের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪ গুণ) এই মহাদেশটির জনসংখ্যা মাত্র ১৮০,০০০,০০০। কিন্তু এতো বিশাল আয়তন সত্ত্বেও তার এই স্বল্প লোকসংখ্যা ক্ষুধার মুঠি থেকে মুক্তি পায় নি।

এই অবস্থার কিছু কারণ প্রাকৃতিক—মহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা থেকেই এর উৎপত্তি। কিন্তু অন্য কারণগুলি সামাজিক—যেগুলিকে আফ্রিকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে আলাদা করা যায় না। এই জনসংখ্যার অধিকাংশই ইওরোপীয় উপনিবেশবাদের শিকার।

আফ্রিকা মহাদেশের অর্ধেকটা জুড়েই রয়েছে এমন দু'ধরণের অঞ্চল যা মানুষের বসবাসের উপযোগী নয়—ক্রান্তীয় অঞ্চলের মরুভূমি ও বিষুবরেখা অঞ্চলের জঙ্গল। প্রথম ক্ষেত্রে রয়েছে জলের অভাব আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জমির। সাভানা ও স্তেপে জমি উন্নততর কিন্তু বৃষ্টির অভাব আছে। উর্বর এবং যথেষ্ট পরিমাণ ভিজে অঞ্চল আছে মাত্র কয়েকটি, যেখানে উৎপাদন সত্যিই খুব ভালো।

আফ্রিকার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে জয় করা যেত। অন্তত সেগুলির তীব্রতা তো কমানো যেতোই। প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সাথে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীদের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগানো যেত। কিন্তু উল্টে ইওরোপীয় উপনিবেশবাদের উল্টোপাল্টা কাজকর্ম আফ্রিকার অসুবিধাগুলিকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এই মহাদেশ উপনিবেশিক লুণ্ঠনকারীদের অন্যতম বৃহৎ মৃগয়াক্ষেত্র ছিল। এরা তাদের স্বভাবগত অত্যাচার, বে-আইনী কার্যকলাপ ও অপরাধ—সমস্ত কিছুই, আত্মরক্ষার্থে অক্ষম স্থানীয় অধিবাসীদের উপর চালিয়েছে। এমনকি আজও, রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কয়েকটি দেশ ছাড়া, গোটা আফ্রিকাই রাজনীতিগত এবং অর্থনীতিগতভাবে ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

**মিশর:** ১৯০ লক্ষ অধিবাসীর ৬২% হ'ল 'ফেলাহিন'। অর্থাৎ নীলনদের তীরে বসবাসকারী সেইসব কৃষকরা যারা তাদের জলসেচ-

র জমির উৎপাদিত ফসলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। আগে
ি বছর নীলনদের বন্যা পলি বহন করে নিয়ে এসে তাদের জমির
র সেই পলির আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে তাকে উর্বরা করে যেত।
জমির উৎপাদিত ফসল এবং পার্শ্ববর্তী স্তেপ অঞ্চলের পশুপালন-
রী যাযাবরদের কাছে থেকে কেনা-বেচার মধ দিয়ে পাওয়া
ত খাদ্যদ্রব্য—এই দু'য়ে মিলিয়ে মিশরবাসীদের খাদ্যতালিকায়
টামুটি একটা ভারসাম্য থাকতো। মাঝে মাঝে, যে বছর নীলনদে
া হতো না, একমাত্র তখনই হঠাৎ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যেত।

কিন্তু মিশরের অর্থনীতিতে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপের পর থেকে এই
াম্য নষ্ট হয়ে গেছে। ১৯০২ সালে নীলনদের উপর বিখ্যাত
সোয়ান বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধ নীলনদের বন্যার উপর
াহেনে'র নির্ভরশীলতাকে কমিয়ে দেয় এবং তার জায়গায় শুরু
বহুমুখী ও জটিল ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের উপর নির্ভরশীলতার
এই নতুন নির্ভরশীলতা 'ফেলাহেনে'র সমগ্র জীবনধারাকে
বতিত করে দেয়। বন্যার সময় বন্যার জলে সেচের বদলে,
র মাধ্যমে সারা বছর ধরে সেচের ব্যবস্থা জমির উর্বতাকে
ভাবে কমিয়ে দেয়। কারণ প্রতি বছরের বন্যা আফ্রিকার
দেশ থেকে পলিমাটির যে অমূল্য উপহার নিয়ে এসে মিশরের
প্রাচীন কৃষিজমিগুলিতে যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করতো তা
য়ে যায়। ফলে আস্তে আস্তে মাটির উৎপাদনী ক্ষমতা নিঃশেষিত
থাকে।

ছাড়াও এই সেচপ্রাপ্ত জমির এক বিরাট অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-
পক্ষে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক পণ্যের—প্রধানত তুলা ও আখ—
দনের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হতে লাগলো। এটাও 'ফেলা-
পুষ্টির অভাবকে আরও তীব্র করে তুললো। আজ 'ফেলা'
মাঝে হওয়া দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু তার বদলে
হ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধার রাজত্বের নাগরিকত্ব। তার খাদ্য আজ
দনের তুলনায় শুধু যে কম ও একঘেয়ে তাই নয়, তার মধ্যে পুষ্টির
আবশ্যক কতগুলি উপাদানের তীব্র অভাব রয়েছে। আজ আর
র এতটা বাড়তি খাদ্য থাকে না যার বিনিময়ে সে অন্য অঞ্চল
অন্যান্য জিনিষ সংগ্রহ করতে পারে। তার শরীরের প্রয়োজন
ামান্য পরিমাণ গম বা চাল দিয়েই মেটাতে হয়। এর ফলে
াদ্যতালিকায় চূড়ান্তরকম ঘাটতি রয়েছে। প্রোটিন ও ভিটা-
অভাবই এরমধ্যে সবচাইতে গুরুতর। এটা বিশেষভাবে
ত হয় 'পেলাগ্রা' রোগটির ব্যাপক প্রাদুর্ভাব থেকে। এই
ামড়ার উপর লাল লাল ছোপ পড়ে। মাংস, দুধ ও ডিমের
থেকেই এই রোগের জন্ম হয়।

## কৃষ্ণ-আফ্রিকা

"সাহারার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে তথাকথিত কৃষ্ণ-আফ্রিকা, যেখানে নিগ্রোইড জনধারার (race লোকেরা কোনোমতে বেঁচে আছে। এদের মধ্যে আছে খাস নিগ্রোরা রয়েছে সুদানী, বান্টু ও নিগ্রিলোরা এবং হটেন্টট ও বুশম্যানরা। এর মধ্যে খাস নিগ্রোরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংখ্যায় সর্বাধিক।

খাস নিগ্রোদের ক্ষেত্রে দু'ধরণের পরিস্থিতির কথা মনে রাখতে হবে। একদিকে রয়েছে সেইসব নিগ্রোরা যারা তাদের নিজেদের স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে বাস করছে। অর্থাৎ বনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বা স্থানীয় গ্রামগুলিতে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে তারা বাস করছে। অন্যদিকে রয়েছে তারা, যারা ইওরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেছে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এরাই হল শ্রমিক। এরা শহরাঞ্চলে বসবাস করে এবং সাদা চামড়ার লোকেদের কাছ থেকে মজুরী পায়। এরমধ্যে আদিম নিগ্রোসমাজভুক্ত লোকেদের খাদ্যের অবস্থাই উন্নততর। এরা এখনও তাদের আদিবাসী সংগঠন এবং তার আদি ঐতিহ্য ও বহুমুখী কৃষিব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখেছে।

জঙ্গলের মধ্যে জায়গায় জায়গায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে নিগ্রোরা ছোট ছোট জায়গা পরিষ্কার করে এবং ঠিক বেঁচে থাকার উপযোগী খাদ্যোৎপাদনে সক্ষম চাষবাসের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ সাগুদানা জাতীয় জিনিষ, কলা, আলু ইত্যাদি এবং ভুট্টা, জোয়ার, ধান ইত্যাদি উদ্ভিদগুলের শস্যের চাষ করে। এইসব ফসল এবং তেলযুক্ত কয়েক-ধরণের বনজ ফল ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিষ দিয়ে নিগ্রোরা তাদের, প্রধানত নিরামিষ, খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করে। সাগুজাতীয় শস্যদানাই এই খাদ্যতালিকায় প্রধান খাদ্য। অর্ধেকেরও বেশি কর্ষিত জমিতে এর দানাশস্য ফলান হয়। এই খাদ্যতালিকা প্রাচুর্যে উপচে না পড়তে পারে, কিন্তু গুণগতভাবে এটার মধ্যে এমন কোনো বিশেষ ত্রুটি নেই যা থেকে প্রকৃত অপুষ্টির অবস্থার জন্ম হতে পারে। এটা ঠিকই যে চারণ-ভূমির অভাবে এবং গুরুতর রোগের প্রাদুর্ভাব থাকায়, এই অঞ্চলে পশুপালন করা হয় না, যার ফলে ভাল আমিষ জাতীয় (প্রোটিন) উপাদানের অভাব হওয়ার কথা। কিন্তু নিগ্রোরা বনের উপর নির্ভর করে যতটা পারে এই অভাব পূরণ করে নেবার চেষ্টা করে। এজন্য এখানে তারা শিকার করে এবং কোনোরকম বাছবিচার না করে জলহস্তী ও কুমীর থেকে শুরু করে সাপ, পিঁপড়ে ও অন্যান্য পোকা-মাকড় পর্যন্ত যা পায় তাই খায়। সাগুদানা জাতীয় জিনিষগুলিকে শুকিয়ে ছাতু করে নিয়ে খেলে তাতে ভিটামিন ও খনিজ-লবনের খুবই অভাব থাকে। কিন্তু এর কচি কচি ডাঁটা ও শিকড়গুলিকে কাঁচা

অবস্থায় স্যালাড করে খেলে এই অভাবটা অনেক কমে যায়। এছাড়াও জঙ্গলের নানা গাছ এবং তাল জাতীয় গাছের তেল থেকে প্রস্তুত আচার বা চাটনী থেকেও ভিটামিনের প্রচুর সরবরাহ পাওয়া যায়।

এই আদিম অর্থনীতি ক্রমাগত একই জমি একইভাবে ব্যবহারের মধ্যদিয়ে তার উর্বরতাকে নিঃশেষ করে ফেলতে থাকে। কাজেই কোনোক্রমেই বছরের পর বছর ধরে নিয়মিতভাবে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যসরবরাহের নিশ্চয়তা তাতে থাকে না। কিন্তু, যেহেতু বনভূমির আয়তন বিশাল এবং যেহেতু জনসংখ্যার ঘনত্ব কখনও খুব বেশি নয়, সেহেতু কিছুটা অনিশ্চিত এই ভারসাম্য ততদিন পর্যন্ত মোটামুটি সন্তোষজনকভাবেই রক্ষিত হচ্ছিল, যতদিন পর্যন্ত না সাদা চামড়ার উপনিবেশবাদীরা এসে এটাকে নষ্ট করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে যেসব অনুসন্ধানকারীরা এইসব আদিম গোষ্ঠীগুলির পুষ্টিসংক্রান্ত অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা সবাই এব্যাপারে একমত যে তাতে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী গুরুতর পুষ্টির অভাব বলতে যা বোঝা যায় সেরকম কিছু দেখা যায় নি।

বিগউড ও ট্রলি বেলজিয়ান কঙ্গোর খাদ্যপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে খাদ্যতালিকায় যদিও শক্তি যোগাতে পারে এরকম জিনিষের অভাব রয়েছে তবুও তাতে শরীরকে অপুষ্টির আক্রমণের হাত থেকে নিরাপদ রাখার মতো উপাদানের অভাব নেই। তাঁদের মতে ফলমূলাদি এবং সবুজ তরকারীর ব্যবহারই এর কারণ। তারা আরও বলেছেন উপনিবেশগুলির একান্ত নিজস্ব অন্য আরও কতগুলি খাদ্যও এই ধরণের নিরাপত্তামূলক উপাদানে ভরপুর এবং এগুলিও নিগ্রোদের অপুষ্টির লক্ষণ থেকে বাঁচিয়েছে। খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় এরকম পোকামাকড়গুলি এর একটা উদাহরণ। এটা থেকে এই কথাই বেরিয়ে আসে যে খাদ্যাভ্যাসের এই প্রাচীন রীতিগুলিকে পরিবর্তন না করাই উচিত। এগুলির কার্যকারিতা অনুকূল প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

"দুর্ভাগ্যক্রমে ইওরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার ফলে এই আদিম রীতিগুলিতে পরিবর্তন আসে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের উপর এর ফলাফল মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। প্রথম যে জিনিষটি এই খাদ্যরীতিতে পরিবর্তন আনে তা হ'ল রপ্তানীর জন্য ব্যাপকহারে কোকো, কফি, চিনি, কাঠবাদাম ইত্যাদি বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন। এর একটা ভালো উদাহরণ হল পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশ গাম্বিয়া। এখানে কাঠবাদাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যোৎপাদন পুরোপুরিভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। এই একক-ফসলের চাষ প্রবর্তন করার ফলে চাল ও অ[illegible] খাদ্যসামগ্রীর জন্য পুরোপুরি আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয় পুষ্টির অবস্থা যতো খারাপ হতে পারে ততো খারাপ। 'কমিটি নিউট্রিশনাল সিচুয়েশন ইন দি কলোনিয়াল এম্পায়ার' (ঔপনিবে[illegible] সাম্রাজ্যের পুষ্টি সংক্রান্ত পরিস্থিতির জন্য কমিটি) এক অনুসন্ধান কা[illegible] পর সিদ্ধান্ত করেন 'সাধারণভাবে খাদ্যতালিকার মধ্যে শর্করা জা[illegible] জিনিষ অত্যধিক পরিমাণে রয়েছে এবং শরীররক্ষার জন্য প্রয়োজ[illegible] জিনিষপত্রের (প্রাণীজ-চর্বি এবং আমিষ, খনিজ-লবন এবং ভিটামি[illegible] চূড়ান্ত অভাব রয়েছে। শিশুমৃত্যুর উচ্চহার (প্রতি হাজারে ৩৬[illegible] দাঁতের অসুখের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব এবং ভিটামিন এ ও ডি-এ[illegible] অভাব প্রায়ই দেখা যায় - এসবই অপুষ্টির অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ। [illegible] একটা লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় কৃষকদের শারীরিক ও মান[illegible] গতিহীনতা। নিঃসন্দেহে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবই, অন্তত অংশত, জন্য দায়ী।"

এই বানিজ্যিক ফসল উৎপাদন প্রথার ক্ষতিকর প্রভাব আঞ্চলিক খাদ্যোৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ন[illegible] জমির উপরিভাগ ক্ষয়ে গিয়ে, জমিও নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। সে[illegible] গালে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে, কাঠবাদাম চাষের ফলে। গৌর[illegible] বক্তব্য অনুযায়ী, "উত্তর সেনেগালের জমি... ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গে[illegible] এবং মধ্য সেনেগালের জমিও একইভাবে নষ্ট হতে চলেছে। কাঠবা[illegible] চাষের এই ক্ষতিকর প্রভাব সেনেগালের সীমানার বাইরেও প্রসা[illegible] হয়েছে। কারণ সেনেগালের জমি আংশিকভাবে সেইসব কৃষি-শ্রম[illegible] দের দিয়ে চাষ করানো হয়, যারা সামান্য কিছু কাঁচাপয়সা উপার্জে[illegible] জন্য প্রতি বছর পার্শ্ববর্তী সুদান থেকে চলে আসে। কিন্তু এর ফল [illegible] হয় যে—বর্ষার সময় সুদানে কাজ করার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া য[illegible] না। কাঠবাদামের ব্যাপক চাষ এই ধরণের ফাঁপানো সমৃদ্ধির [illegible] দিচ্ছে। এর ফলে সেনেগালের কৃষিব্যবস্থার ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যা[illegible] এবং সুদানের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

**যন্ত্র হিসাবে বাগিচা-শ্রমিকদের ব্যবহার:** "সস্তায় প্রচু[illegible] শ্রমশক্তির উপর নির্ভরশীল জমি ব্যবহারের ঔপনিবেশিক কা[illegible] এইসব সুদূর অঞ্চলে কতগুলি দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হয়ে প[illegible] নিগ্রোরা, যে ধরণের কাজ তাদের করতে বলা হয়, সাধারণভাবে তা[illegible] অত্যন্ত বিরোধী এবং তা ছাড়া সন্তোষজনক পরিমাণে কাজ কর[illegible] মতো যথেষ্ট স্বাস্থ্যবানও নয়। এই অসুবিধাগুলিকে কাটিয়ে ওঠার জ[illegible] এমন একটি ঔপনিবেশিক কাঠামো খাড়া করা হয়েছে যা স্থানীয় অধি[illegible] বাসীদের মজুরীর বিনিময়ে শ্রম করতে বাধ্য করবে এবং কিছুটা[illegible] পরিমাণে তার উৎপাদন করার ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেবে।

"ঔপনিবেশিক প্রশাসন অল্পদিনের মধ্যেই এটা বুঝতে পারে যে ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে হলে সর্বপ্রথম স্থানীয় অধিবাসীদের কিছুটা নিরাপত্তাবিধান ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই কাজটা প্রথমদিকে একেবারেই অবহেলা করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বেলজিয়ান কঙ্গোতে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ নাগাদ স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা এক চতুর্থাংশ কমে গিয়েছিল ঔপনিবেশটির গভর্ণর জেনারেল শ্রী এম লিপেনস্ ১৯২০ সালে লিখেছিলেন যে 'আমরা রবার ও হাতীর দাঁতের জন্য স্থানীয়দের অবহেলা করায় কঙ্গোর স্থানীয় অধিবাসীরা অবিশ্বাস্যরকম দ্রুতহারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে"।

"যেহেতু ঔপনিবেশিক যন্ত্রের এক অত্যাবশ্যক দাঁতাল চাকা হিসাবে নিগ্রো শ্রমিকদের প্রয়োজন, সেজন্য উপনিবেশের শ্রমশক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী নিগ্রোদের যথেষ্ট সংখ্যায় উৎপাদন করা প্রয়োজন। সেজন্য এক 'ভর-পেট-নীতি'র আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন। কিন্তু এই নীতি কার্যকর করার সময়, আগে যদি কোনো সদিচ্ছা থেকেও থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যায়। খনি, কারখানা বা বাগিচায় কর্মরত স্থানীয় শ্রমিকরা একপেট-ভর্তি ভাত বা সাগু জাতীয় শস্যদানা পেতে পারে। কিন্তু এই সব জিনিষ ঠেসে দেওয়ার ফলে, তার পুষ্টির সামগ্রিক অবস্থায় কোনো উন্নতির বদলে, তার যদি কোনো বিশেষ ধরণের অপুষ্টি থেকে থাকে, তাকেই আরও বাড়িয়ে তোলে।"

ইওরোপীয় উপনিবেশবাদীরা যখন স্থানীয় গ্রামে সাধারণত যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায় তার থেকে বেশি খাদ্যের প্রতিশ্রুতি নিগ্রোদের তুলে ধরে, সে তখন আসলে যেটা চেষ্টা করছে তা হ'ল, নিগ্রোদের সামনে লোভ দেখিয়ে টেনে এনে সেই পরিমাণ শক্তি তাদের যোগান দেওয়া যা সে উৎপাদনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে আবার ফিরে পাবার আশা রাখে। সে আসলে যা দিচ্ছে সেটা হল প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী, উন্নততর পুষ্টি নয়।

তথাকথিত 'ভর-পেট নীতি' নিরক্ষরেখাঞ্চলের নিগ্রোদের পুষ্টি সংক্রান্ত পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটিয়েছে। বিগউড এবং ট্রলি মন্তব্য করেছেন যে নিগ্রোরা উপনিবেশবাদীদের কাজে নিযুক্ত হবার পর তাদের মধ্যে আগের থেকে অনেক বেশি অপুষ্টির লক্ষণ দেখা গেছে। বিশেষ করে বেরীবেরীর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি করে দেখা গেছে। টাঙ্গানিকায় রিকেট, বেরীবেরী এবং স্কার্ভির অসংখ্য উদাহরণ দেখা গেছে। খনি রয়েছে এমন জেলাগুলিতে পুষ্টির অবস্থাটা বিশেষভাবে সংকটজনক। টাটকা খাবারের সাথে এইসব অঞ্চলের কার্যত কোনো পরিচিতি নেই। নাইজিরিয়া ও গোল্ডকোষ্টে পেলাগ্রা দেখা গেছে।

স্থানীয় শ্রমিক সংগ্রহের জন্য আরও এমন দুটি কায়দা গ্রহণ করা হয়, যা থেকে ঔপনিবেশিক নীতির সদ্বিবেচনার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। একটা হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে থাকা জমির পরিমাণ ভীষণভাবে কমিয়ে দেওয়া এবং অন্যটা হ'ল মুদ্রার মাধ্যমে কর দিতে বাধ্য করা। প্রথমটি, অর্থাৎ জমি সংরক্ষণ ব্যবস্থায় স্থানীয় অধিবাসীদের এমন ছোট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়, যে তা তাদের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে নিতান্তই অপর্যাপ্ত। এর ফলে তারা কাজের সন্ধানে সংরক্ষিত অঞ্চল ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয় যেমন ১৯৩৯ সালে, যেখানে কেনিয়ার ৩০ লক্ষ স্থানীয় অধিবাসীকে মাত্র ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তনসম্পন্ন সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে আটকে রাখা হয়, সেখানে ২১,০০০ সাদা চামড়ার লোকের (তাদের মধ্যে ১,৬০০ জন মালিক) জন্য ৪০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ জমি ছেড়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় ৬০,০০০ ইওরোপীয় ১৮৫,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ জমি ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু ১,৫০০,০০০ নিগ্রোকে মাত্র ১,৫,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ জমির মধ্যে ঠেসে রাখা হয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে মুদ্রায় কর দেওয়ার নীতিও নিগ্রোদের জীবিকা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকে বেঁধে দিয়েছে এবং ঔপনিবেশিক মজুরী-শ্রমের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। "এইসব পদ্ধতিতেও যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া না যায় তখন উপনিবেশবাদীরা কতগুলি অঞ্চলে আরও একটা ধাপ এগিয়ে যায় এবং এমন এক ধরণের শ্রম-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যার মধ্যে ক্রীতদাসত্বের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।"

দুর্ভিক্ষের সাথে দারিদ্র ও ক্ষুধার সম্পর্ক এবং তার কারণ সম্পর্কে উপরে যে চিত্র আমরা পেলাম তা থেকে এ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তগুলি করা যেতে পারে :

ক) সারা তৃতীয়বিশ্ব জুড়েই দীর্ঘস্থায়ী অনাহার ও অপুষ্টির যে অবস্থা রয়েছে, দুর্ভিক্ষ তারই একটি বিশেষ ও তীব্র রূপ মাত্র। এটা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র কোনো ঘটনা নয়। দীর্ঘস্থায়ী এই অনাহার ও অপুষ্টি দুর্ভিক্ষের চেয়ে কিছু কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। এই অনাহার ও অপুষ্টির জন্ম হয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র থেকে।

খ) উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন ও শোষণই এই ভয়াবহ দারিদ্রের কারণ।

গ) উপনিবেশবাদীরা বিভিন্ন মহাদেশ ও দেশে বিভিন্ন কায়দায় এই শোষণ চালায়। কিন্তু যে কায়দাতেই শোষণ চলুক না কেন, তার ফলাফল একই—দারিদ্র ও ক্ষুধা। অবশ্য বহুক্ষেত্রেই এইসব বিভিন্ন কায়দার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

বিশেষ ক্রোড়পত্র

# ৩. ভারতে দুর্ভিক্ষ—একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

যে কোনো বড় সামাজিক সমস্যার সমাধানে খুঁজতে হলে তার অতীত ইতিহাসের দিকে তাকানো প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষ, তৃতীয় দুনিয়ার অন্যদেশগুলির মতো আমাদের দেশেও এমনই একটি বড় এবং গুরুতর সামাজিক সমস্যা, যার সমাধান আমরা সবাই অত্যন্ত তীব্রভাবে চাইছি। কাজেই এক্ষেত্রেও আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষের অতীত ইতিহাসের দিকে আমাদের তাকাতে হবে অর্থাৎ কখন থেকে আমাদের দেশে এই যন্ত্রণাদায়ক সমস্যাটির আবির্ভাব হল এবং আবির্ভাবের পর থেকে কি কি পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে তা আজকের রূপ পেল -এই প্রশ্নগুলিকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হবে। নীচের আলোচনায় সেই চেষ্টাই করা হয়েছে।

**ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের আগে** 'স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারত দুর্ভিক্ষের ভোগ করছে।'' যন্ত্রণা কিন্তু ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের, বিশেষ করে রেলপথ নির্মানের আগে দুর্ভিক্ষ ''দেখা দিত বিচ্ছিন্ন, স্বল্প সংখ্যায় এবং নিতান্তই স্থানীয়ভাবে। বড় আকারের দুর্ভিক্ষ হতো প্রতি পঞ্চাশ বছরে একবার করে। একাদশ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ১৪ বার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এইগুলির প্রতিটিই ছিল এক একটি বিশেষ খরাপীড়িত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরের আগে কখনও সারা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয়নি। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে সাময়িকভাবে খাদ্যসরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং মজুত খাদ্য কমে যাওয়াই ঐ সময়ে দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিল। কাজেই সেই সব পরিস্থিতিতে দুর্ভিক্ষের আকস্মিক আবির্ভাবগুলিকে দেশব্যাপী খাদ্যাভাব হিসাবে ব্যাখ্যা করা চলে না।'' (বি. এম. ভাটিয়া, 'ইণ্ডিয়াজ ফুড প্রবেলম এ্যাণ্ড পলিসি সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেন্স')।

এই অবস্থাটি ব্রিটিশ-পূর্ব সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল—সবচেয়ে নীচে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামসমাজগুলি আর সবচেয়ে উপরে একটি স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকার। সেচের জন্য কৃত্রিম খাল ও পুকুর খনন এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণও সরকারের দায়িত্ব ছিল খরা ইত্যাদির সময় সরকার ত্রাণের ব্যবস্থা করতো। যেমন, অন্যতম একজন স্বৈরাচারী শাসক ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে ১৬৬১ সালে বিরাট আকারের একটি দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেব ত্রাণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন—

> ''ঔরঙ্গজেব ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রজাদের ত্রাণকার্যের দেখাশুনা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনাগুলির একটি ছিল বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য নিয়ে আসা।…সম্রাট তাঁর কোষাগার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং অকৃপণভাবে অর্থসাহায্য করেছিলেন। বিদেশ থেকে শস্য আমদানীর ব্যাপারে তিনি সর্বতোভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তারপর এই শস্য হয় কমদামে বিক্রি অথবা, যাদের কেনার কোনো ক্ষমতা নেই তাদের মধ্যে, খয়রাতী সাহায্য হিসাবে বিতরণ করেছিলেন। তিনি খুব দ্রুত চাষীদের খাজনা মকুব দেওয়ার প্রয়োজনটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং অন্যসব করের বোঝা থেকেও সাময়িকভাবে তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। স্থানীয় ভাষায় রচিত ইতিবৃত্তগুলি থেকে জানা যায় যে তাঁর কঠোর প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা পেয়েছিল এবং বহু প্রদেশ টিঁকে গিয়েছিল।''
>
> —রিপোর্ট অব পাস্ট ফেমিনস ইন দি নর্থ-ওয়েষ্ট প্রভিন্সেস্, গার্ডেলস্টোন, এলাহাবাদ ১৮৫৮; কে. সি. ঘোষের 'ফেমিনস্ ইন বেঙ্গল ১৭৭০-১৯৪৩'-এ উদ্ধৃত।

অর্থাৎ প্রাক-ব্রিটিশ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, শোষণ এবং দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও, একটা ভারসাম্য বজায় থাকতো এবং খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি পরবর্তীকালের মতো বিধ্বংসী রূপ নিতো না। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সাম্রাজ্যে বড় কোনো ধরণের পরিবর্তনের সময় বিবদমান সৈন্যবাহিনীর লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির ফলে সাধারণ মানুষ প্রভূত পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতো। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তখন এধরণের ঘটনাগুলি বেশি ঘটেছিল।

## লুণ্ঠনকারীদের আগমন

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের মধ্যদিয়ে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ব্রিটিশ লুণ্ঠনকারীদের আবির্ভাব ঘটে এবং ভারতের ইতিহাসে এমন এক অকল্পনীয় ক্ষুধা, দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষের অধ্যায় শুরু হয়, যা আগে কখনও দেখা যায় নি। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভেঙে পড়া মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভ করে এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ রাজমুকুট ভারতের শাসনভার গ্রহণ না কর পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবাধ

ভারতীয় সমাজের উপর বেপরোয়া এই লুণ্ঠনের ফলাফল কী হয়েছিল ?

সীমাহীন এই লুণ্ঠন এদেশের সমাজের ভারসাম্যটাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুর্দশা বয়ে আনে। মার্কস এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না, হিন্দুস্থানের উপর ব্রিটিশরা যে দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছে তা হিন্দুস্থানকে এর আগে যা সইতে হয়েছে তার থেকে মূলগতভাবে আলাদা এবং বহুগুণ তীব্র' (ঐ, পৃ-৮৭)। আর এই "মূলগতভাবে আলাদা ও বহুগুণ তীব্র" দুর্দশা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে (বাং ১১৭৬, ইং ১৭৬৯-৭০) আমাদের কাছে পরিচিত।

কীভাবে এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল ?

"১৭৬৯ এবং ১৭৭০ সালের মধ্যে ইংরেজরা সমস্ত চাল কিনে নিয়ে এবং একমাত্র অস্বাভাবিক চড়া দাম ছাড়া তা বিক্রি করতে অস্বীকার করে এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে" ( মার্কস ; কে. সি. ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত ) এবং "ইংরেজ ভদ্রলোকদের গোমস্তারা শুধু শস্যের উপরই একচেটিয়া দখলদারী কায়েম করেনি, তারা গরীব রায়তদের পরবর্তী চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বীজগুলি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য করে" ( অবার্স, ব্রিটিশ পাওয়ার ; কে. সি. ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত )।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শুধুমাত্র প্রথম মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষই নয়, ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হিসাবেও চিহ্নিত হয়ে আছে। এক কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। কিন্তু তবুও স্বৈরাচারী ঔরঙ্গজেব তাঁর আমলে দুর্ভিক্ষ রোধ করতে যতটুকু করেছিলেন, "সুসভ্য" ইংরেজরা এই দুর্ভিক্ষকে রোধ করতে ততটুকুও করেনি। অর্থাৎ ন্যূনতম পদক্ষেপ রাজস্ব মকুব করা তো দূরে থাক বরং **এই দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতেই তারা রাজস্বের নামে লুণ্ঠনের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়।** "প্রদেশের তিনভাগের একভাগ মানুষের জীবনহানি এবং তার ফল হিসাবে চাষের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ১৭৭১ সালে মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৭৬৮-র পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত ছিল যে, এই বিপুল বিপর্যয়ের যে ভয়াবহ ফলাফল তার সাথে সমতা রেখেই রাজস্বের পরিমাণও কমে যাবে। কিন্তু তা যে কমে নি তার কারণ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এটাকে তার আগেকার স্তরেই রাখা হয়েছিল" ( ওয়ারেন হেস্টিংস, ১৭৭২ সালের ২রা নভেম্বর 'পরিচালকদের সভায় প্রদত্ত রিপোর্ট - আর. পি. দত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ-১০৭ )

এইভাবে দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যুর অভূতপূর্ব বিভীষিকা ছড়ানোর মধ্য-দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা তাদের শাসন শুরু করল। আর তার পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যু যেন এদেশে একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। **একাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যেখানে ভারতবর্ষে মোট দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৪টি, সেখানে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫০—অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ৯৪ বছরে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা দাঁড়াল ২৩টি** ( সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' ; বীক্ষণ, বিশেষ শারদ সংকলন, ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য )। এর মধ্যে মাত্র ৩টিতে মৃত্যুর যে হিসাব পাওয়া যায় তা হল—১ কোটি ৬০ লক্ষ (ঐ)। অন্যগুলির কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি।

এইভাবে ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারত যখন দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর নিরঙ্কুশ অন্ধকারময় এক রাজত্বে ডুবছে তখন তারই মূল্যে অন্যদিকে অর্থাৎ ব্রিটেনে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জায়গায় শুরু হল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। ইতিহাসে এই যুগ শিল্পবিপ্লবের যুগ (১৭৬০-১৮৩০) নামে পরিচিত। এই শিল্পবিপ্লব ব্রিটেনে যে নতুন শোষক শ্রেণীটির জন্ম দিল সেই শিল্পপুঁজিপতি শ্রেণী বা কলকারখানার মালিকরা তাদের নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই বাণিজ্যিক পুঁজিপতি অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকদের স্থান অধিকার করল। এ পর্যন্ত অতিরিক্ত উঁচুহারে রাজস্ব আদায় এবং অতিরিক্ত কমদামে ভারতে উৎপাদিত কৃষিজাতদ্রব্য ও স্থানীয় কারু-জীবীদের তৈরী নানা শিল্পদ্রব্য কিনে নিয়ে চড়া দামে তা ব্রিটেনে রপ্তানী করাই ছিল বণিক সংগঠন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লুঠের কায়দা। শিল্পপুঁজিপতিদের আমলে রাজস্ব আদায় তো অব্যাহত রইল ঠিকই কিন্তু 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' 'রায়তারী ব্যবস্থা' ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে যথাক্রমে স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘমেয়াদীভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। খাদ্য রপ্তানীও অব্যাহত রইল। কিন্তু লুঠের প্রধান কায়দা হয়ে দাঁড়াল ভারতকে ইংলণ্ডে উৎপাদিত বিপুল শিল্পজাত দ্রব্য (সুতা, সুতী-বস্ত্র, রেশম ও পশমবস্ত্র, লোহা ও কাঁচের জিনিষপত্র, কাগজ, জুতো ইত্যাদি) চড়া মুনাফায় বিক্রি করার বাজার হিসাবে ব্যবহার করা এবং ভারত থেকে তাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (পশুচর্ম, তেল, পাট, তুলা ইত্যাদি ) অত্যন্ত কমদামে নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ শিল্পপুঁজির আমলে কোম্পানীর আমলের সরকারী কর্মচারীদের রাজস্বের নামে বেপরোয়া লুঠ-তরাজ, ঘুষ, দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেল এবং দেশজুড়ে অপাতভাবে এক নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত

হল। কারণ ঐ রকম অরাজকতা চলতে থাকলে শিল্পপুঁজির বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক কায়দায় শোষণ আদৌ সম্ভব নয়। ১৭৮৬ সালে যখন বাণিজ্যিক-পুঁজিপতিদের প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর প্রতিনিধির জায়গায় পার্লামেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড কর্ণওয়ালিশকে ভারতের গভর্নর জেনারেল করে পাঠায় তখন থেকেই এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। এবং ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যখন ব্রিটেনের রানী কোম্পানীকে পুরোপুরি ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর নিজের হাতে শাসন ক্ষমতা নেন তখন এই প্রক্রিয়া শেষ হয়।

কিন্তু এই আপাত নিয়ম-শৃংখলা ও 'সুসভ্য' শাসন কী কোম্পানীর রাজত্বের তুলনায় ভারতবাসীর জীবনে অধিকতর নিরাপত্তা নিয়ে এল? আদৌ তা নয়। বরং তা ভারতীয় সমাজকে আরও গভীরতর বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিল। শুধু লুণ্ঠনের কায়দাটা আগের তুলনায় আরও অপ্রত্যক্ষ হয়ে যাওয়ায় তাকে খুঁজে পাওয়া আরও মুস্কিল হয়ে গেল।

কীভাবে এই নতুন কায়দার শোষণ ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল?

ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য যত বেশি বেশি করে ভারতীয় বাজারে ঢুকতে শুরু করলো, তত বেশি বেশি করে ভারতীয় কুটীরশিল্প ধ্বংস হতে শুরু করল। মূলত দুভাবে ভারতীয় কুটিরশিল্পের এই ধ্বংসসাধন হয়েছিল। প্রথমত তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের দাম কম হওয়ায় দেশীয় বাজারে কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ভীষণভাবে কমে গেল। বাড়তে লাগল শুধু সেইসব ব্যবসায়ীর সংখ্যা যাদের কাজ ছিল ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রি করা। ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে দেশীয় বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত লোকের ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে "ধাতুশিল্পীর সংখ্যা কমে যাওয়া এবং সাথে সাথে ধাতুব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হল ইওরোপ থেকে আমদানীকৃত কলাইকরা ও অ্যালুমিনিয়ামের জিনিষপত্র দেশজ পেতল ও তামার বাসনপত্রের স্থান দখল করেছে" (আর. পি. দত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ-১২১)। ব্রিটিশ শাসকদেরই অন্য একটি দলিলে (ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া, ১৯০৭, ভলুম ৮, পৃ-১৪৫) বলা হয়েছে "আমদানীকৃত সস্তা লোহা ও ইস্পাত দেশীয় লোহ-নিষ্কাশন শিল্পকে মুছে দিয়েছে" (ঐ)। ব্রিটিশরা তাদের উন্নততর বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে (যার ফলে বৃহদায়তন শিল্প দ্রব্যের দাম সাধারণভাবে কুটীরশিল্পের চাইতে কম হয়) কীভাবে ভারতীয় কুটীরশিল্পের উপর আঘাত হানতে পেরেছিল এগুলি তারই উদাহরণ। এটা ছিল গোটা প্রক্রিয়াটির একটি দিক। দ্বিতীয় যে কায়দায় ব্রিটিশ শিল্পপুঁজি ভারতীয় কুটীরশিল্পকে ধ্বংস করে দেয় তা হল—শাসন ক্ষমতার ব্যবহার করে তারা বৈদেশিক বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিনিষেধমূলক আইন প্রনয়ন করে একদিকে ভারতীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজারকে রুদ্ধ করে দেয় এবং অন্যদিকে ভারতীয় বাজারে বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ব্রিটিশ পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। যেমন ১৮৪০ সালের এক পার্লামেন্টারী তদন্ত রিপোর্টে এটা বলা হয়েছিল যে, যেখানে ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানীকৃত সুতী ও রেশম দ্রব্যের উপর ৩½% এবং পশম দ্রব্যের উপর ২% শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল সেখানে ভারত থেকে ব্রিটেনে আমদানীকৃত সুতী দ্রব্যের উপর ১০%, রেশম দ্রব্যের উপর ২০% ও পশম দ্রব্যের উপর ৩০% শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল' (ঐ, পৃ-১১৮)। এই একমুখী বাণিজ্যের ফলাফল হয়েছিল—ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানী কৃত শিল্পদ্রব্যের ভয়াবহ পরিমান বৃদ্ধি এবং ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানীকৃত শিল্পদ্রব্যের ভয়াবহ পরিমান হ্রাস। যেমন—

তালিকা নং ৩ ভারতে আমদানীকৃত ও ভারত থেকে রপ্তানীকৃত বস্ত্রের মূল্য (পাউণ্ডে)

| বছর | আমদানী | রপ্তানী |
|---|---|---|
| ১৮১৫ | ২৬,০০০ | ১,৩০০,০০০ |
| ১৮৩২ | ৪০০,০০০ | ১০০,০০০ |

[সূত্র: রজনীপাম দত্ত, পৃ-১১৯]

কুটীরশিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে কী হল?

গ্রাম ও শহরের লাখ লাখ কুটীরশিল্পীরা (তাঁতি, কামার, কুমোর ইত্যাদি) তাদের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি থেকে উৎখাত হয়ে পড়লেন। "ঢাকা, মুর্শিদাবাদ (যাকে ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ 'লণ্ডনের মতো বড়, জনবহুল এবং সমৃদ্ধ শহর' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন), সুরাট ইত্যাদি প্রাচীন জনবহুল শিল্পকেন্দ্রিক শহরগুলি কয়েক বছরের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল।...১৮৪০ সালে পার্লামেণ্টারী তদন্ত কমিটির কাছে স্যার চার্লস ট্রেভিলিয়ান জানান 'ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ৩০,০০০ বা ৪০,০০০ এ নেমে এসেছে। জঙ্গল ও ম্যালেরিয়া শহরকে দ্রুত গ্রাস করে ফেলছে'..." (ঐ, পৃ-১২০)। কুটীরশিল্প ধ্বংস করে দিয়ে তার জায়গায় ব্রিটিশরা তো আর কোনো নতুন শিল্প গড়ে তোলে নি, সুতরাং বৃত্তিচ্যুত কুটীরশিল্পীদের এই বিশাল বাহিনী জীবিকার তাগিদে ভীড় করলেন কৃষিতে। ফলে কৃষি-জমির উপর অত্যধিক চাপ বেড়ে গেল। স্বভাবতই তা ভারতীয়

জনসাধারণের (প্রধানত কৃষকদের) দারিদ্র্যকে, যা ইতিমধ্যেই তীব্র হয়ে উঠেছিল, আরও ভয়াবহ করে তুললো। এবং এইভাবেই শিল্প-পুঁজির আশীর্বাদে ভারতীয় সমাজে দুর্ভিক্ষের একটা বাড়তি কারণ যোগ হল। এইভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি গোটা ব্রিটিশ ভারতেরই ছবি। যেমন ১৮৯১ ও ১৯২১ সালের মধ্যে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত ৬১% থেকে ৭৩%-এ দাঁড়ায় (ঐ, পৃ-১২২)।

ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজির এই ভারত দখল অভিযানেরই আর একটি দিক হল তাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিয়ে যাওয়া এবং তারই প্রয়োজনে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমিয়ে ভারতের কৃষিজমিতে ব্যাপকহারে বাণিজ্যিক ফসলের, বিশেষ করে তুলা ও পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। কত দ্রুত ও বিপুল হারে এই লুণ্ঠন চলেছিল নীচের তালিকাতে আমরা তা দেখতে পাবো।

তালিকা নং ৪ ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানীকৃত কাঁচামালের মূল্য

| | কাঁচা তুলা | পাট |
|---|---|---|
| ১৮৪৯ | ১৭ লক্ষ পাউণ্ড | ৬৮ হাজার পাউণ্ড |
| ১৯১৪ | ২২০ ,, ,, | ৮৬ লক্ষ পাউণ্ড |

[সূত্র : ঐ, পৃ-১২৪]

স্বভাবতই এটা খাদ্যাভাবের একটা নতুন কারণ হিসাবে দুর্ভিক্ষের পটভূমি সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এছাড়াও যেখানে যেখানে সরাসরি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে এইসব বাণিজ্যিক ফসলের (চা, কফি বাগিচা ইত্যাদি) চাষ হতে থাকলো সেখানে সেখানে বাগিচা শ্রমিকরা প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হল*। এই কাঁচামাল রপ্তানীর সাথে সাথে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে চালু হওয়া খাদ্যশস্য রপ্তানীও বেড়ে চললো।

তালিকা নং ৫ : ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানীকৃত খাদ্যশস্যের (প্রধানত চাল ও গম) মূল্য (পাউণ্ডে)

| বছর | ১৮৪৯ | ১৮৫৯ | ১৮৭৭ | ১৯০১ | ১৯১৪ |
|---|---|---|---|---|---|
| মূল্য | ৮৫৮,০০০ | ৩,৮০০,০০০ | ৭.৯০০,০০০ | ৯,৩০০,০০০ | ১৯,৩০০,০০০ |

[সূত্র : ঐ, পৃ-১২৪]

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির এই পুরাণো কারণটিও অব্যাহতভাবে বেড়ে চললো।

এইভাবে ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির বেপরোয়া আক্রমণে একদিকে শহরগুলি শ্মশানে পরিণত হল এবং অন্যদিকে "কৃষি ও কুটীরশিল্পের ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভারতীয় গ্রামীন অর্থনীতি তার মরণাঘাত পেল" অর্থাৎ, ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মার্টিন মন্টেগোমারীর ভাষায়, ভারতবর্ষ "ব্রিটেনের কৃষি খামারে" পরিণত হল (ঐ, পৃ/ ১২০-১২২)।

এই প্রক্রিয়ার ভয়াবহ পরিণতি হিসাবে, একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের বক্তব্য অনুযায়ী, 'উনবিংশ শতকের শেষ ৫০ বছরে দুর্ভিক্ষ ও সংকট আগের ১০০ বছরের তুলনায় সংখ্যায় ৪ গুণ এবং ব্যাপকতায় ৪ গুণ বেড়ে গেল" (উইলিয়াম ডিগবি, প্রসপারাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, ১৯০১; উদ্ধৃত, ঐ, ১২৫)। এবং ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ৯৪ বছরে অর্থাৎ কোম্পানীর আমলে যেখানে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ২৩টি, সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৪-১৯০১) দুর্ভিক্ষের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৮টি এবং সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী এতে মৃতের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ২৫ হাজার (সুপ্রকাশ রায়, পৃ/১৭৫-১৭৮)।

ভারতবর্ষের "ব্রিটেনের কৃষি খামারে" রূপান্তরই যে এর মূল কারণ, স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত একটি দুর্ভিক্ষ কমিশনের (১৮৭৮) রিপোর্টেও তা স্বীকার করা হয়েছে :

"ভারতীয় দুর্ভিক্ষের সর্বনাশা ফলাফলের একটি অন্যতম বড় কারণ এবং কার্যকরী ত্রাণ ব্যবস্থার পথে একটি বড় বাধা হল বিপুল জনসংখ্যার সরাসরি কৃষি নির্ভরতা এবং অন্য কোনো শিল্পের অভাব যা থেকে জনসংখ্যার একটা মোটামুটি অংশ তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।" আর. পি. দত্ত পৃ-১২৫)

১৮৫০ সালে সমগ্র এই প্রক্রিয়াটিতে আরও একটি মাধ্যম যুক্ত হয়েছিল—রেলপথ। প্রবর্তনের পর থেকে রেলপথ যতো বেশি করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলকে তার জালে জড়াতে থাকলো যতো বেশি বেশি করে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ভেঙে গিয়ে বিরাট এক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাঁধা পড়তে থাকলো তারা এবং রেলপথ ভারত থেকে কাঁচামাল লুঠ করে নিয়ে যাওয়া ও ভারতের কোণে কোণে ব্রিটিশ পণ্য ছড়িয়ে দেবার হাতিয়ার হয়ে উঠল। রেলের সাথে সাথে খাদ্য নিয়ে কাটকাবাজীও ব্যাপক হয়ে উঠতে লাগল। অর্থাৎ জন্মের পর থেকে রেলপথ ভারবর্ষ ও তার মানুষদের লুণ্ঠনের হাতিয়ার

* মুলুক রাজ আনন্দের বিখ্যাত উপন্যাস 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'-তে চাবাগিচা শ্রমিকদের এই ক্রীতদাস জীবনের ভয়াবহ বর্ণনা আছে।

হিসাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে তীব্রতর করে তুলেছিল।*

### বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ-ভারত

বিংশ শতাব্দী শুরু হবার সাথে সাথে পরিস্থিতিতে একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। একমাত্র ১৯৪৩ এর বাঙালার দুর্ভিক্ষ বা ১৩৫০ এর মন্বন্তর (যাতে ৩৫ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন) ছাড়া, অষ্টাদশ কিম্বা উনবিংশ শতকের সাথে তুলনীয় কোনো দুর্ভিক্ষ এই শতাব্দীর ব্রিটিশ ভারতে হয় নি। সংকটের সময় দুর্ভিক্ষের উপক্রম হলেই ত্রাণের তোড়জোড় শুরু হয়ে যেত। দুর্ভিক্ষ, অভাব খরা ইত্যাদির সংজ্ঞা নিরূপন করে আইন পাশ হতো, সরকারের দায়িত্বও তাতে নির্দিষ্ট করা থাকতো। বেসরকারী ত্রাণসংস্থাগুলিও আগের চাইতে অনেক সুসংগঠিত হয়ে উঠেছিল। ত্রাণের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবার কাজেও রেলের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

এসব থেকে এটা মনে হতে পারে যে, সাধারণ মানুষের অবস্থার বুঝি কিছুটা উন্নতি হয়েছিল এই সময়। কিন্তু তা হওয়া তো দূরের কথা তাদের অবস্থাটা যে বরং উনবিংশ শতকের মতোই, এমনকি তার চাইতেও খারাপ হয়ে পড়েছিল, নীচের তথ্যগুলিই তার প্রমাণ :

"ভারতীয়দের গড় আয় এমন যে তা দিয়ে কাঁটায় কাঁটায় জনসংখ্যার প্রতি তিন জনের মধ্যে ঠিক দু'জন মানুষ তিন বেলা খেতে পারে অথবা তাদের সবাই তিন বেলার জায়গায় দু'বেলা খেতে পারে, এই শর্তে যে তারা নগ্ন থাকতে প্রস্তুত থাকবে, সারা বছর গৃহহীন হয়ে থাকবে, কোনো আমোদ-প্রমোদ বা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ থাকবে না এবং শুধুমাত্র খাবার ছাড়া আর কিছু চাইবে না, আর তাও সবচেয়ে নীচু মানের, সবচেয়ে মোটা, সবচেয়ে অপুষ্টিকর খাবার।" (সাহ ও খাম্‌বাটা, 'দি ওয়েলথ্ এ্যাণ্ড ট্যাক্সেবল কেপাসিটি অব ইণ্ডিয়া', ১৯২৪, পৃ-২৫৩ ; আর পি দত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ-৩৫)

১৯২৬ সালে ব্রিটিশ সরকার নিয়োজিত 'রয়াল কমিশন অন এগ্রিকালচারে'র সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কুনুরের পাস্তুর ইন্সটিট্যুটের লেঃ কর্ণেল আর ম্যাকহ্যারিসন জানান—'ভারতবর্ষের মানুষ যেসব অক্ষমতা থেকে ভুগছে অপুষ্টি সম্ভবত তার মধ্যে প্রধান।...অপুষ্টিই ভারতে ব্যাধির সবচেয়ে সুদূর প্রসারী কারণ।" (আর. পি. দত্ত, পৃ-৩৭)

১৯৩৩ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর স্যার জন মেগা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক রিপোর্টে নিম্নোক্ত হিসাব দেন :

তালিকা নং ৬ **পুষ্টির তালিকা** (জনসংখ্যার শতকরা হিসাব)

| | পর্যাপ্ত পুষ্টি | অপুষ্টি | ভয়াবহ অপুষ্টি |
|---|---|---|---|
| ভারত | ৩৯ | ৪১ | ২০ |
| বাংলা | ২২ | ৪৭ | ৩১ |

অর্থাৎ তাঁর হিসাব অনুযায়ী ৬১% ভারতীয় এবং ৭৮% বাঙালী অপুষ্টির শিকার। তিনি আরও বলেন, "ব্যাধি ভারতবর্ষে ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে" এবং "ক্রমাগত ও রীতিমত দ্রুত বেড়ে চলেছে।" (আর. পি. দত্ত, পৃ/৩৬-৩৭)

ভয়াবহ এই দারিদ্র ও অপুষ্টির ফলাফল কী হয়েছিল ?

একজন ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ভেরা অ্যানেষ্টি লিখেছেন : ১৯২৬ সালের মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ২৬·৭ জন। এর মধ্যে ২০·৫ জনেরই মৃত্যুর কারণ কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ, 'জ্বর', আমাশা, উদরাময়—যার সবগুলিই 'দারিদ্রজনিত ব্যাধি', এই একটি শিরোনামাভুক্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।" (আর. পি. দত্ত, পৃ-৩৪)

এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, তখন একদিকে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর সংখ্যা কমে গিয়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে জনসংখ্যার এক বৃহত্তর অংশ দারিদ্র সীমার আরও নীচে নেমে গিয়েছিল এবং মৃত্যু দুর্ভিক্ষের বদলে, অপুষ্টি, অর্ধাহার, ব্যাধি ইত্যাদির ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের মতো, অল্প সময়ের মধ্যে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে অনেক লোক নয়—সারা বছরই গোটা দেশ জুড়ে মৃত্যুর মহড়া ; দুর্ভিক্ষের সোরগোল নয় তার চেয়েও ভয়াবহ দারিদ্র-অপুষ্টি-অর্ধাহার ব্যাধি-মৃত্যুর নীরব যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া।

দারিদ্র এতো ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল কি করে ?

কারণ সাম্রাজ্যবাদী লুন্ঠনের পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কী পরিমাণ লুন্ঠন বেড়েছিল তা পাওয়া যাবে এই হিসাব থেকে যে, যেখানে ১৮৫৮ সালে ইংলণ্ডের রাণী ভারতের শাসন ভার গ্রহণের আগের ৭৫ বছরে মোট ১·৫০ কোটি পাউণ্ড সম্পদ ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে চলে গিয়েছিল, সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) আগের ২০ বছর ধরে প্রতি বছর

* বীক্ষণ ২ বর্ষ, ৩ সংকলনে প্রকাশিত 'সাম্প্রতিক রেলধর্মঘট ও ভারতীয় রেলের ইতিকথা' রচনাটিতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

১·৩৫ কোটি থেকে ১·৫০ কোটি পাউণ্ড সম্পদ ভারত থেকে ব্রিটেনে চলে যায়। এই অবস্থায় দারিদ্র্য আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা কেন কমে গেল, সেটা বুঝতে হলে, বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪) থেকে লুণ্ঠনের কায়দায় যে পরিবর্তন এল, সেটা আমাদের বুঝতে হবে।

কোম্পানীর আমল থেকে প্রধানত যে যে রূপে ভারত থেকে সম্পদ ব্রিটেনে চলে যেত সেগুলি হল:

১) 'হোমচার্জ' ( Home Charge )—ভারতবাসীর কাছ থেকে নানাভাবে যে রাজস্ব আদায় করা হতো, তারই একটা বড় অংশ ভারত যে ব্রিটেনের অধীন তার নিদর্শন স্বরূপ, প্রতিবছর বৃটেনে যেত। একেই বলা হতো 'হোমচার্জ'—সহজ কথায় যাকে আমরা সেলামী বলতে পারি;

২) আমদানীর তুলনায় অতিরিক্ত রপ্তানী ( Excess of export over import )—অর্থাৎ অনেক কম মূল্যের জিনিষ বৃটেন থেকে ভারতে আমদানী করে, তার বদলে অনেক বেশি মূল্যের জিনিষ ভারত থেকে বৃটেনে রপ্তানী করা বা নিয়ে যাওয়া। একে আমরা সহজ কথায় বানিজ্যিক লুণ্ঠন বলতে পারি।

কোম্পানীর আমল শেষ হবার পর এগুলি তো বন্ধ হয়ই নি, বরং উত্তরোত্তর এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বিংশ শতাব্দীতে তা আগেকার সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল—

তালিকা নং ৭ : লুণ্ঠনের ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণ ( লক্ষ পাউণ্ডে )

| বছর | ১৮৫১ | ১৯০১ | ১৯১৩-১৪ | ১৯৩৩-৩৪ |
|---|---|---|---|---|
| হোমচার্জ | ২৫ | ১৭৩ | ১৯৪ | ২৭৫ |
| আমদানী তুলনায় অতিরিক্ত রপ্তানীর পরিমাণ | ৩৩ | ১১০ | ১৪২ | ৬৯৭ |

( সূত্র : আর. পি. দত্ত, পৃ-১৩১ )

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৮৫১ থেকে ১৯৩৩-৩৪ এর মধ্যে হোমচার্জের পরিমাণ ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল অর্থাৎ ভারতবাসীর উপর রাজস্বের বোঝা উত্তরোত্তর এবং দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বানিজ্যিক লুণ্ঠনের পরিমাণ বৃদ্ধি ঐ একই সময়ের ব্যবধানে আরও বেশি—১৮৫১ থেকে ১৯৩৩-৩৪ এর মধ্যে ২১ গুণ। বানিজ্যিক লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিমাণ বৃদ্ধিই সব নয়, কোম্পানীর আমলের শেষ দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই লুণ্ঠনের রূপেও যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল তা আমরা আগেই দেখেছি।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই হোমচার্জ ও বাণিজ্যিক লুণ্ঠনের সাথে আর একটা নতুন কায়দা যোগ হল। এই নতুন কায়দা হল, এ পর্যন্ত যেমন ভারত থেকে লুণ্ঠিত অর্থ কেবল বৃটেনস্থ শিল্প বাণিজ্যেই খাটান হতো, এখন তার একটা বিরাট অংশ আবার বৃটেন থেকে ভারতে রপ্তানী করে অর্থাৎ ভারতেই ফিরিয়ে এনে, ভারতেই শিল্প-বাণিজ্যে খাটানো শুরু হল। ব্রিটিশ মালিকানায় বড় বড় চা ও কফি বাগিচা, খনি ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠল। এইসব পুঁজির বৃটিশ মালিকরা তখন এই খাটানো টাকার উপর সুদ ও মুনাফা হিসাবে কোটি কোটি টাকা ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যেতে শুরু করলো। অবশ্য এই কায়দায় শোষণ সাধারণভাবে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই, প্রধানত রেলপথ পত্তনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। বৃটিশ কোম্পানীগুলির সাথে তখন ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক সরকারের চুক্তি হয়েছিল যে কোম্পানীগুলি রেলপথ তৈরীর কাজে যে পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ করবে, তার উপর তারা ৫% হারে সুদ পাবে। এই সুদের টাকা স্বভাবতই ভারতবাসীর কাছ থেকে লুণ্ঠন করেই আদায় করা হতো ( আর. পি. ডি, পৃ-১৩৬ )। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হলেও, এটা তখন লুঠের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই কায়দাই প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে, যদিও প্রথম দুটি কায়দার পরিমাণও অব্যাহত থাকে এবং বেড়ে চলে। কি উপায়ে কি পরিমাণ সম্পদ এই সময় ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া হতো তার একটা চিত্র নীচে রাখা হল :

**১৯৪৫ সালে প্রকাশিত বাৎসরিক লুণ্ঠনের চিত্র**

| | |
|---|---|
| ৬-৭-৮% বৃটিশ সুদের হারে ৬৭ কোটি পাউণ্ড বিনিয়োগের উপর মোট সুদ ... ... | ৪ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড |
| হোমচার্জ ... ... | ৩ ,, ৩০ ,, ,, |
| বাণিজ্য ... ... | ৩ ,, × ,, |
| জাহাজী পরিবহন ... ... | ২ ,, × ,, |
| ভারতে কর্মরত বৃটিশদের পাঠান অর্থ ... | ৬০ ,, ,, |
| মোট ... | ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড |

( হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, কলকাতা, জুলাই ৫, ১৯৪৫ ; আর. পি. দত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ-১৪৫ )

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগের উপর সুদই এককভাবে লুঠের বৃহত্তম রূপ। টাকা খাটিয়ে সুদ ও মুনাফার মাধ্যমে

লুণ্ঠনের এই কায়দার নাম হল **লগ্নীপুঁজির লুণ্ঠন**। পুঁজি যতক্ষণ অর্থের রূপে থাকে ততক্ষণ তাকে বলে লগ্নীপুঁজি। আর যখন তা কাঁচামাল, যন্ত্র ইত্যাদির রূপ নেয় তখন তাকে বলে শিল্পপুঁজি। লগ্নীপুঁজি শিল্পপুঁজির রূপ না নিলে তা থেকে মুনাফা হবে না। কিন্তু অন্যদিকে লগ্নীপুঁজি না থাকলে শিল্পপুঁজিও সংগ্রহ করা যাবে না। শিল্প-বিপ্লবের প্রথম যুগে এই লগ্নীপুঁজি মূলত ব্রিটেনেই শিল্পপুঁজি হিসাবে খাটতো এবং তারই প্রয়োজন অনুসারে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে বাণিজ্যিক লুণ্ঠন চালাতো। কিন্তু শিল্প পুঁজির লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে এত বিপুল পরিমান অর্থ ব্রিটেনে জমা হতে লাগলো যে সেই অর্থকে সবচেয়ে লাভজনকভাবে খাটাতে হলে সাম্রাজ্যবাদী দেশটিই যথেষ্ট নয়, কাজেই সেগুলির একাংশকে তখন উপনিবেশগুলিতে সবচেয়ে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের জন্য পাঠানো হতে লাগলো এবং লুণ্ঠনের সীমা আগের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে লগ্নীপুঁজির মাধ্যমে লুণ্ঠনই এই যুগের পুঁজিবাদের ( অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের ) প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠলো। সেজন্যই সাম্রাজ্যবাদের এই যুগকে বলা হয় **লগ্নীপুঁজির যুগ**।

এখন পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করতে হলে কি কি দরকার? দরকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশক্তির অর্থাৎ মানুষের। শিল্পপুঁজির আমলে ভারত থেকে প্রধানত যেটা লুণ্ঠন করা হতো সেটা হল কৃষিজ, বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের ব্যবহার্য পণ্যে রূপান্তরিত করার জন্য যে শ্রমশক্তি প্রয়োজন ছিল, সেটা তখন সরবরাহ করতো ব্রিটেনের শ্রমজীবী মানুষ। অবশ্য এই কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদনকারী ভারতীয়দের শ্রমশক্তিও এই প্রক্রিয়ায় যে লুণ্ঠিত হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা হতো প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করতে গিয়ে। সরাসরি বা সচেতনভাবে শ্রমশক্তি লুণ্ঠন করাটা তখন সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু লগ্নীপুঁজির আমলে যেহেতু শুধু ভারত থেকে জিনিষ নিয়ে যাওয়া নয়, ভারতেই শিল্পজাত জিনিষ উৎপাদন করাটাও ( শিল্প, বাগিচা, খনি ইত্যাদির মাধ্যমে) তার লক্ষ্য হয়ে উঠলো, সেহেতু তার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তিও লুণ্ঠনের অন্যতম বড় উৎস হয়ে উঠলো। এই লুঠ যাতে আরও ভালোভাবে করা যায়, অর্থাৎ নিম্নতম মজুরীতে বিশাল সংখ্যক শ্রমিকের অব্যাহত সরবরাহ থাকে—এটা সুনিশ্চিত করাটা তখন লগ্নীপুঁজির একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে উঠলো। আর সেই প্রয়োজন থেকে দুর্ভিক্ষের মতো অল্প সময়ে বহুলোকের হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনা রোধ করাটা তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো। কাজেই সেই অনুযায়ী নানা ব্যবস্থাও নেওয়া শুরু হল। সাধারণভাবে যে কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের লগ্নীপুঁজিরই অবাধে শ্রমশক্তি লুণ্ঠনের স্বার্থে দুর্ভিক্ষ রোধ করটা কেন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে এ সম্পর্কে আমরা এই পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে ( পৃ/ট-ঠ ) আলোচনা করেছি। এখানেও সেই একই কারণ প্রযোজ্য। এটাই হল বিংশ শতকের ব্রিটিশ-ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য এবং একই সাথে, সাধারণভাবে, দুর্ভিক্ষের সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ।

প্রসঙ্গত, লগ্নীপুঁজির আমলে ভারতবর্ষ দ্রুত শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সেরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং তাদের লাভের প্রয়োজনে সীমিত সংখ্যক শিল্পছাড়া, প্রতিপদে সত্যিকারের শিল্পায়নকে বাধা দেওয়াটাই ব্রিটিশের নীতি ছিল। কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

### ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় কৃষক

এতক্ষণ আমরা মূলত ভারতীয় জনতার উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন, লুণ্ঠনের নানান কায়দা এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেছি। আলোচনায় আমরা দেখেছি, লুণ্ঠনের কায়দা যতো বদলেছে, লুণ্ঠনের মাত্রা ততো তীব্র হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের দুঃখের বোঝাও ক্রমশ ততো ভারী হয়েছে। এই দুঃখের বোঝা যাদের উপর সবচাইতে ভারী হয়ে নেমেছিল তারা হলেন কৃষক এবং তারাই দু'শ বছরের ব্রিটিশ রাজত্বে, এমনকি আজও ভারতীয় দুর্ভিক্ষের মূল শিকার। এবারে আমরা সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন কী প্রক্রিয়ায় ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা এবং কৃষকদের জীবনে সর্বনাশের বন্যা ডেকে এনে, তাঁদেরকে দুর্ভিক্ষের প্রান্ত সীমায় ঠেলে দিয়েছে তা দেখবো। প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে এই রকম :

**জমির উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ** অর্থাৎ কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি : ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি, কোম্পানীর আমল থেকে, বিশেষ করে শিল্পপুঁজির অনুপ্রবেশের পর ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনকরা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয় কুটীরশিল্পকে ধ্বংস করে এবং কুটীরশিল্পীরা বিপুল সংখ্যায় জীবিকার সন্ধানে কৃষিতে ভীড় করে। এর ফলে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে, জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সর্বোপরি আয়ের সমস্ত বিকল্প উৎসগুলিই বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি কীভাবে দুর্ভিক্ষের পটভূমি রচনায় সাহায্য করেছিল উপরের আলোচনাতেই তা আমরা দেখেছি।

---

* পুঁজিবাদের শিল্পপুঁজির যুগ থেকে লগ্নীপুঁজির যুগে প্রবেশের সমগ্র প্রক্রিয়াটি আরও জটিল। বোঝার সুবিধার জন্য এখানে একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—বীঃ সঃ দঃ।

**ক্রমবর্দ্ধমান হারে বাণিজ্যিক শস্যের চাষ :** কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সমগ্র রাজত্বকাল জুড়ে (শিল্পপুঁজির অনুপ্রবেশের পর থেকে) তাদের বিটেনস্থ শিল্পের প্রয়োজনে কীভাবে খাদ্য শস্যের তুলনায় বাণিজ্যিক শস্যের চাষের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে এবং তারই সাথে সাথে খাদ্যশস্য রপ্তানী করে এদেশের খাদ্যপরিস্থিতির ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয় এবং কৃষকের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে তাও আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি।

**সেচব্যবস্থা ও জমি পুনরুদ্ধারে সুপরিকল্পিত অবহেলা :** একজন বৃটিশ পর্যবেক্ষক লিখেছেন, "জাতির সেবা ও মঙ্গলের জন্য হিন্দু অথবা মুসলমান সরকারগুলি যেসব সড়ক, পুকুর ও খাল তৈরী করেছিল সেগুলিকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে, আর বর্তমানে সেচব্যবস্থার অভাব দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে" (জি. টমসন, ১৯৩৮; আর. পি. দত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃ-২১৩)। কোম্পানীর আমল থেকেই এই পর্বের শুরু এবং বৃটিশ রাজত্বের সমগ্র কাল জুড়ে কখনও এগুলির উন্নতি বিধানের জন্যে সত্যিকারে কোনো প্রচেষ্টা আর হয়নি। যেমন, ১৯০০ সাল পর্যন্ত বৃটিশ বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় রেলব্যবস্থার পিছনে যেখানে সরকারী রাজস্ব থেকে ২২.৫ কোটি পাউণ্ড খরচ করা হয়েছিল, সেখানে কৃষির জন্য অত্যাবশ্যক খাল খননের কাজে খরচ করা হয়েছিল মাত্র ২.৫ কোটি পাউণ্ড (আর. পি. দত্ত, পৃ-২১৩)। বিখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম উইলকক্স লিখেছিলেন—"প্রাচীন সেচব্যবস্থার ব্যবহার ও উন্নতিসাধনের জন্য শুধু যে কিছু করা হয়নি তাই নয়, বরং পরবর্তীকালে রেলপথের জন্য নির্মিত পাথরের দেওয়াল, স্তম্ভ ইত্যাদির সাহায্যে তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। পলি বহনকারী গঙ্গার প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে কোনো কোনো অঞ্চল বন্ধ্যা এবং অনুর্বর হয়ে গেছে; ত্রুটিপূর্ণ নিকাশন ব্যবস্থার ফলে অন্যগুলিতে অতিরিক্ত পরিমাণে জল জমে থাকছে, যার থেকে অবিশ্যম্ভাবীভাবে জন্ম হচ্ছে ম্যালেরিয়ার। গঙ্গার মোহনায় ভাঙনকে—যা প্রতিবছর গ্রামের পর গ্রাম, জঙ্গল এবং আবাদি জমি ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ঠেকাবার জন্য বাঁধ নির্মানের কোনো প্রচেষ্টাও করা হয় নি" (ঐ, পৃ-২১৫)। আর এসবের ফলাফল কি হয়েছিল? স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট অব বৃটিশ ইণ্ডিয়ার এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৩৯-৪০ সালে দেশের কর্ষণ যোগ্য মোট জমির (৩৫.৫ কোটি একর) মধ্যে মাত্র ৫৯% জমিতে শস্য রোপন করা হয়েছিল, ১৩.২% জমিতে চাষ করা হয়েছিল কিন্তু বীজ বপন করা হয়নি এবং ২৭.৩% জমি সম্পূর্ণ অকর্ষিত পড়েছিল (ঐ, পৃ-২১১)। উন্নততর দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষের শস্য উৎপাদনের হার, এমনিতেই যা কম ছিল, এর ফলে আরও দ্রুত-হারে কমতে থাকে—

**ধানের একর প্রতি গড় উৎপাদন (পাউণ্ডে)**

[একজন বৃটিশ কর্মচারী ডব্লু. বার্ণসের দেওয়া হিসাব]

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯১৪-১৫ থেকে | ১৯১৮-১৯ | — | ৯৮২ |
| ১৯২৬-২৭ ,, | ১৯৩০-৩১ | — | ৮৫১ |
| ১৯৩১-৩২ ,, | ১৯৩৫-৩৬ | — | ৮২৯ |
| ১৯৩৮-৩৯ | | — | ৭২৮ |

[ঐ, পৃ-২১৭]

**নতুন ভূমিব্যবস্থার প্রবর্তন :** বৃটিশ রাজত্বের আগে পর্যন্ত, কয়েক হাজার বছর ধরে ভারতীয় গ্রামীন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষি ও কুটীরশিল্প ভিত্তিক অসংখ্য ছোট বড় গ্রামসমাজ (village cmmunity), যাদের প্রত্যেকটি ছিল একাধারে স্বয়ংসম্পূর্ণ (অর্থাৎ, গ্রামের সমস্ত ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামেই তৈরী হতো) ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বৃটিশরা তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করে এতে দুটি মৌলিক পরিবর্তন অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন লুঠের কায়দা প্রবর্তন করে, যা সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এই মৌলিক পরিবর্তনের একটি হল ভারতীয় গ্রামসমাজগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা ভেঙে দিয়ে তাদেরকে একটি কেন্দ্রীয় ও ঐক্যবদ্ধ বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত বাজার-ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা; যেখানে একদিকে তাদের বৃটিশ নির্মিত পণ্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে আর অন্যদিকে যেখানে তাদের কৃষিজাত দ্রব্যাদিও বেচতে হবে। সহজ কথায় এটাকেই আমরা বলি ভারত বৃটিশ পণ্যদ্রব্য কেনার ও ভারতীয় কাঁচামাল বেচার বাজার হয়ে উঠল। এই পরিবর্তন কি বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠনের দরজা খুলে দিল তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি। এই লুণ্ঠনকে বলা হয় পুঁজির লুণ্ঠন। এটা এমন এক কায়দায় শোষণ যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে কার্যত অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু একই সাথে তারা ভারতীয় সমাজের প্রচলিত শোষণের যে প্রাচীন রূপ অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব সংগ্রহকেও অব্যাহত রাখল এবং বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। পুঁজির শোষণের স্বার্থে এবং এই উচ্চহারে রাজস্ব সংগ্রহের স্বার্থে তারা দ্বিতীয় যে মৌলিক পরিবর্তনটি আনল তা হচ্ছে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন। এই পরিবর্তনই ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিকে স্থায়ীভাবে এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিল, যেখানে ক্রমশ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হওয়াটাই হয়ে দাঁড়াল ভারতীয় কৃষকদের অধিকাংশের সুনিশ্চিত বিধিলিপি। বৃটিশ-পূর্ব ভারতে ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল এই রকম :

"গ্রাম সমাজগুলিই ভারতবর্ষে জমির মালিক ছিল। জমি কখনও রাজার সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হতো না" এবং "কৃষক ছাড়া আর কারুর উপরে জমির মালিকানা বর্তানোর কোনো ধারণাই প্রচলিত

।হত না। (রাধা কমল মুখার্জী: 'ল্যাণ্ড প্রবলেমস্ ইন ইণ্ডিয়া'; ঐ পৃ-২২৩)। উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের উপরই রাজস্বের পরিমাণ (১/৬ থেকে ১/৩ অংশ) নির্ভর করতে এবং গ্রামসমাজগুলি যৌথভাবে তা (ফসল দিয়ে, মুদ্রা দিয়ে নয়) রাজাকে দিত। করের পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, যে-বছর ফসল হতো না সে বছর (খুব অত্যাচারী রাজা না হলে) কর দেওয়ারও কোনো প্রশ্ন উঠত না এবং কৃষকের হাত থেকে জমি চলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও তাই ছিল না। অর্থাৎ বৃটিশ-পূর্ব ভূমিব্যবস্থায় শোষণ চললেও, এই ব্যবস্থার মধ্যেই তার কতগুলি স্বাভাবিক ও ন্যূনতম সীমা বেঁধে দেওয়া ছিল। কৃষকের ক্ষমতা-অক্ষমতা নিরপেক্ষভাবে সেখানে শোষণ চলতে পারতো না।

কিন্তু ইংরেজরা এই ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন করে এমন এক ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তন করলো যেখানে আইনসঙ্গতভাবেই কৃষকের উপর সীমাহীন শোষণ চালান যায়। এই ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

১) **ভূমি রাজস্বের চরিত্রে পরিবর্তন:** উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের পরিবর্তে জমির পরিমাণের উপরই নির্ভর করে রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করা হল এবং তা দিতে হবে ফসল দিয়ে নয় অর্থ দিয়ে। অর্থাৎ কোনো বছর ফসল হোক চাই না হোক সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে দিতেই হবে।

২) **জমির মালিকানা সত্ত্বের পরিবর্তন:** যৌথ মালিকানা ভেঙে দিয়ে কৃষক-অকৃষক নির্বিশেষে বিভিন্ন ব্যক্তির উপর জমি ভোগ দখলের সত্ত্ব দিয়ে দেওয়া হল। রাজস্ব ধার্য করা হল এইসব সত্ত্বাধিকারীদের উপর।

৩) **নতুন ভূমি আইনের প্রবর্তন:** উপরোক্ত দুটি পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে এক নতুন ভূমি আইন ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে একদিকে সত্ত্বাধিকারীরা নির্দিষ্ট খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে সত্ত্বচ্যুত করার অধিকার সরকারের রইল, অন্যদিকে সত্ত্বাধিকারীরাও ইচ্ছামত খাজনা বা ফসলের অংশ ধার্য করে যে কাউকে তার জমিতে নিয়োগ করা বা উৎখাত করার অধিকার পেল। একই সাথে ইচ্ছামত সুদে টাকা ধার দেওয়া, দেনা শোধ করতে না পারলে জমি দখলে করে নেওয়া, জমি বন্ধক নেওয়া, জমি কেনা-বেচা করা এসবই আইনসঙ্গত করা হল। অর্থাৎ এক কথায় এই আইনে জমির সত্ত্বাধিকারের জন্যে কৃষিকাজের সাথে সম্পর্ক থাকার কোনো প্রয়োজন রইল না। যারই টাকা আছে, তারই জন্য একাধিক কায়দায় জমির উপর দখলিসত্ত্ব কায়েমের পথ করে দেওয়া হল। অন্যদিকে টাকা নেই এমন কৃষকের টাকাওয়ালা সত্ত্বাধিকারীদের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় রইল না এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিত্তবান সত্ত্বাধিকারীদের পিছনে এসে দাঁড়াবার জন্য সদাই প্রস্তুত হয়ে রইল।

এই ভূমিব্যবস্থার ফলাফল কি হল? সংক্ষেপে বলতে গেলে এই ব্যবস্থা জন্ম দিল কৃষি কাজের সাথে সম্পর্কহীন বিভিন্ন রূপ ও প্রকরণে বিভক্ত (জমিদার, জোতদার, সুদখোর-মহাজন ইত্যাদি) এক পরগাছা শ্রেণীর, যাদের উপর কৃষকরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। তাদের এক বিরাট অংশকে ব্রিটিশ সরকারই সরাসরি জন্ম দিয়েছিল। যেমন চিরস্থায়ী (বাংলা, বিহার ও উত্তর মাদ্রাজ) ও অস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চলে (ইউ. পি., বাংলা, মধ্য প্রদেশ, বোম্বে, পাঞ্জাব) প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেওয়ার শর্তে জমিদার নামক পরগাছা শ্রেণীটিকে বৃটিশ সরকার সরাসরি কৃষকদের প্রভু হিসাবে বসিয়ে দিয়েছিল। এইসব অঞ্চলের কৃষকরা জমিদারের কাছে খাজনা দিত, বৃটিশ সরকারকে নয়। অন্যান্য কয়েকটি ধরণের পরগাছারা (জোতদার, মহাজন) সরাসরি বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে সত্ত্ব না পেলেও, তারা ছিল এই ভূমিব্যবস্থারই অবিশ্যম্ভাবী ফল। জমিদারী ব্যবস্থা ছাড়াও বৃটিশরা রায়তারী ব্যবস্থা (মাদ্রাজ, বোম্বে, বেরার, সিন্ধু, আসাম) নামক আর এক ধরণের ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে সত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল কৃষকদেরই। সত্ত্বাধিকারী এইসব কৃষকদের বলা হত 'রায়ত' অর্থাৎ এইসব অঞ্চলে শুরুর দিকে কৃষকরা সরাসরি সরকারকেই খাজনা দিত। দু'য়ের মাঝখানে অন্য কেউ ছিল না। কিন্তু এই দুই ধরণের ব্যবস্থাতেই যথাক্রমে খাজনা ও রাজস্বের হার এত অস্বাভাবিক রকম চড়া ছিল যে, কৃষকদের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন মিটিয়ে তা দেওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ জমিদারের লেঠেল বা সরকারের পেয়াদা এসে সরাসরি তাকে "আইনসঙ্গত"ভাবেই উৎখাত করবে। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে তাকে ছুটতে হতো মহাজন নামক আর এক পরগাছার কাছে। এদের কাছ থেকে নেওয়া অস্বাভাবিক রকম চড়া সুদে ধার তার পক্ষে কোনো দিনই শোধ করা সম্ভব হত না। এক বছরের ঋণের দায় মেটাতে গিয়ে পরের বছর আরও ঋণ করতে হতো। এবং এইভাবেই খাজনা—ঋণ—ঋণশোধ—ঋণ এই দুষ্টচক্রে পড়ে তার জমি বন্ধক পড়তে লাগলো। জীবিকার ন্যূনতম অবলম্বনটুকুও রইল না। কৃষক পরিণত হতে লাগলো সম্পূর্ণ

ভূমিহীন কৃষকে। তারই জমিতে সে তার নতুন মনিবের হয়ে ভয়াবহরকম নিম্ন মজুরীতে ক্ষেতমজুর হিসাবে কিম্বা ৪০%, ৫০% ফসল দিয়ে দেওয়ার শর্তে ভাগচাষী হিসাবে খাটতে শুরু করে। জমির উপর কোনোরকম স্বত্বহীন ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও দেখা যায় নি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জীবিকার ন্যূনতম সম্বলহীন এই ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। যেমন, ১৯২১ ও ১৯৩১ সালে এই ধরনের পরিবারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২·১৭ কোটি ও ৩·৩৫ কোটি।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জমির "বন্ধন" থেকে "মুক্ত" এইসব ক্ষেতমজুরদের এক বিরাট অংশ ঋণের দায়ে কার্যত পুরুষানুক্রমে নানা নামের, নানা ধরণের ভয়াবহ ব্যক্তিগত ভূমিদাসত্ব বা ক্রীতদাসত্বে বাঁধা পড়তেন। অর্থাৎ গবাদি পশুর মতোই এঁরাও জমিদার-মহাজনদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হতেন। এঁদের দিয়ে বিনা মজুরীতে তখন আর শুধু চাষের কাজই নয়; প্রভু পরিবারের ঘর-গৃহস্থালীর সমস্ত ধরনের 'সেবাই' করিয়ে নেওয়া হতো (যেমন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর 'হুবলা' এবং 'কোলিস', দক্ষিণ-পশ্চিম মাদ্রাজের 'পুলিয়া' ও 'হোলিয়া', বিহারের 'কামিয়া' ইত্যাদি—রাধা কমল মুখার্জী, ল্যাণ্ড প্রব্লেমস্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃ-২৪১)। এমনকি জমি কেনা-বেচা বা হাত বদলের সাথে সাথে সেই ভূসম্পত্তির অংশ হিসেবেই এরা এক প্রভুর মালিকানা থেকে আর এক প্রভুর মালিকানায় গিয়ে পড়ত (ঐ)

মুদ্রায় রাজস্ব দেবার প্রথা এই প্রক্রিয়াকেই আরও ত্বরান্বিত করলো। নির্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে না পারলে হয় জমির উপর থেকে স্বত্ব চলে যাবে, না হয় মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রেখে ঋণ করতে হবে। কাজেই ফসল ওঠার সাথে সাথেই, কৃষককে তার ফসল নিয়ে ছুটতে হতো বাজারে এবং ফসল ওঠার মরশুমে চাহিদার চাইতে যোগান বেশি হওয়ায়, স্বাভাবিকভাবেই তখন ফসলের দাম অত্যন্ত পড়ে যেত, আর মহাজন মজুতদার ও খাদ্য ব্যবসায়ীরা (যাদের হাতে প্রচুর টাকা মজুত থাকে) তার সুযোগ নিয়ে বেশির ভাগ ফসল কিনে নিয়ে গুদামজাত করত। এরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে, বছরের অন্য সময় এই পরগাছা শ্রেণী বাজারে খাদ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অত্যন্ত চড়া দামে এই ফসল আবার কৃষক এবং জনসাধারণের অন্য অংশের কাছে বেচত। ফলে মুদ্রায় খাজনা দেবার এই প্রক্রিয়ায় কৃষককে একই জিনিষের জন্য দুবার (একবার বিক্রেতা হিসাবে এবং অন্যবার ক্রেতা হিসাবে) লুণ্ঠিত হতে হতো। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, জমিদার, জোতদার, মহাজন ইত্যাদি পরগাছা শ্রেণী এবং খাদ্য নিয়ে চোরাকারবারী, মজুতদারী ইত্যাদি পাপচক্রের জন্ম হতে পেরেছিল ব্রিটিশসৃষ্ট এই ভূমি ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থারই কল্যাণে, অন্য কোনোভাবে এটা সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্য ভারত থেকে রপ্তানীর (অর্থাৎ লুণ্ঠিত কাঁচামালের) প্রধান উপকরণ হওয়ার ফলে, সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববাজারের সংকটের জন্য যখনই জিনিষপত্রের দাম দ্রুত হারে পড়ে গেছে তখন তারও নিষ্ঠুরতম শিকার হয়ে পড়েছেন ভারতীয় কৃষকরা। যেমন, ১৯১৮-২৯ থেকে ১৯২৯-৩০ এই সময়ে এই ধরনের এক বিশ্বব্যাপী সংকটের ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যমান (আগের তুলনায়) অর্ধেক হয়ে যায় (আর. পি. দত্ত পৃ-১৫৮)। স্বভাবতই কৃষকদের আয়ও সেই অনুপাতেই কমে যায়। কিন্তু সেজন্য সরকার, জমিদার বা মহাজনকে দেয় ভূমিরাজস্ব, খাজনা বা সুদের হার কমান হয়নি। এর ফলাফল কি হতে পারে তা সকলেই অনুমেয়।

সুতরাং ব্রিটিশ ভারতে কৃষকদের (অর্থাৎ যাঁরা ক্ষেতমজুর হয়ে পড়েননি) কি অবস্থার মধ্যে আমরা দেখছি? জমির উপর ক্রমাগত চাপবৃদ্ধির ফলে বেশিরভাগ কৃষকের ভাগ্যে জুটেছে অতি অল্প এক টুকরো জমি। সেচ ও সারের অভাবে সে জমির উৎপাদনী ক্ষমতা ভয়াবহরকম কম। কাজেই হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে সে-জমি থেকে যে ফসল উৎপাদিত হয়, তা দিয়ে সারা বছরের খাওয়া-পড়ার খরচই চলে না। যেমন, ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশনের মতে খরচ চালাবার জন্য পরিবার পিছু জমির ন্যূনতম পরিমাণ হওয়া উচিত পাঁচ একর। কিন্তু ঐ কমিশনের তদন্ত থেকে দেখা গিয়েছিল, বাঙলার তিন চতুর্থাংশ কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ ছিল পাঁচ একরের নীচে (ঐ, পৃ-২৪৪)। অথচ তার এই ক্ষুদ্র অন্নেই ভাগ বসাচ্ছে (১) সরকারী ভূমিরাজস্ব ও ব্যবহার্য জিনিষের (যেমন, লবন) উপর কর, (২) জমিদার বা জোতদারের খাজনা বা ফসলের অংশ, (৩) মহাজনের সুদ এবং (৪) মজুতদার ও মুনাফাবাজদের মুনাফা। আর এগুলির সবই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কৃষক ছাড়া জনসাধারণের অন্য কোনো অংশের উপরেই এতগুলি শোষণের বোঝা একসঙ্গে ছিল না। সুতরাং এতগুলি হাঙরের ক্রমবর্দ্ধমান লোভের ক্ষুধা মেটানোর পরে কৃষকের ভাগ্যে কী পড়ে থাকতে পারে? ১৯৩০ এর দশকে মাদ্রাজের নেরুর নামক একটি গ্রামে তদন্ত শেষে দেখা গিয়েছিল ঐ গ্রামে অধিবাসীদের চাষের খরচ-খরচা বাদ দিয়ে গড় মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের (৩৮ টাকা) দুই তৃতীয়াংশ চলে যেত এইসব হাঙরদের পেটে। বাকী পড়ে থাকত মাথাপিছু ১৩ টাকা (ঐ, পৃ-২৫৬) অর্থাৎ দৈনিক মাথাপিছু আর আজকের মুদ্রার হিসাবে ৪ পয়সা।

এই ভয়াবহ অল্প আয় নিয়ে দুর্ভিক্ষের প্রান্তসীমায় বাস করাটা যে ভারতীয় কৃষকদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্যের কি

আছে? প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ-ভারতে ভারতবাসীর ক্ষুধা, অপুষ্টি ও ব্যাধির যে-ভয়াবহ চিত্র আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, তা মূলত ভারতীয় কৃষকদেরই চিত্র।

এই প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকার অর্থাৎ সর্বোচ্চ শোষক ও তার শোষণের শিকার ভারতীয় কৃষক সমাজের মাঝখানে এই যে এক বিরাট দেশীয় পরগাছা শ্রেণীর জন্ম সেই সরকার নিজে থেকেই দিয়েছিল, তার পেছনের গূঢ় অভিসন্ধিটা সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। অভিসন্ধিটা কি? কোনো বিদেশী শাসন বা শোষণই সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে আমদানী-করা লোকের সাহায্যে চলতে পারে না, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো বিশাল আয়তন ও জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশে তো নয়ই। বিজেতা দেশের এজন্যই বিজিত দেশের মধ্যেই এমন একটি শ্রেণীর প্রয়োজন যারা বিদেশী শাষকদের মিত্র হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ তারা বিদেশী শাসকদের হয়ে লুন্ঠন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বের একটা বড় অংশ নিজেরাই বহন করবে। স্বভাবতই লুন্ঠনের একটা অংশ পেলে তবেই তারা একাজ করতে রাজী থাকবে। দেশীয় সহযোগী ও বিশ্বাসঘাতকদের দিয়ে এই ভূমিকা পালন করাবার জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুপরিকল্পিতভাবে এই পরগাছাদের জন্ম দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের পরম অনুগত জমিদার-মহাজনরূপী এই পরগাছারাই ছিল এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান সামাজিক ভিত্তি। কৃষকদের সামনে প্রত্যক্ষ শোষক হিসাবে এরা উপস্থিত থাকায় বহু সময়েই কৃষকদের ক্রোধ প্রধানত এদের ওপরেই গিয়ে পড়ত। ফলে আসল শোষক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তা অনেক বেশি সুরক্ষিত থাকত।

জমির আসল উৎপাদকের যেখানে এরকম ভয়াবহ অবস্থা, সেখানে উৎপাদন বাড়াবার কোনো ক্ষমতা যে তাদের থাকতে পারে না সেটা বোঝা খুবই সহজ। আবার সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যদি তারা উৎপাদন বাড়ায়ও, তবে সেই অতিরিক্ত উৎপাদন চলে যাবে নানা রঙের হাঙরদের লোভের ভাণ্ডারে। কাজেই উৎপাদন বাড়াবার কোনো ইচ্ছাও তার থাকতে পারে না। অন্যদিকে, জমির ফসলের সিংহভাগ যারা লুঠে নিচ্ছিল সেইসব পরগাছারা যেহেতু, কিছুমাত্র উদ্যোগ না নিয়েই, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে শুধু কৃষকদের ফসল আরও বেশি বেশি করে নানা কায়দায় কেটে নিয়ে, তাদের আয় বাড়িয়ে যেতে পারছিল, সেহেতু তাদেরও কৃষিকাজের উন্নতির জন্য কোনরকম মাথাব্যথা ছিল না। তাদের আয়ের বিরাট অংশ তারা সরাসরি ভোগ-সুখে ব্যয় করতো, এবং আর একটা বিরাট অংশ সুদের কারবার, জমি ও ফসল নিয়ে ফাটকাবাজী ইত্যাদি সহজ ও আরও নিশ্চিত অর্থাগমের এমন সব কাজে খাটাত, যা থেকে কৃষির কোনো উন্নতি হতে পারে না। আর অন্যদিকে খোদ ব্রিটিশ সরকার যে, কৃষির উন্নতি করার বদলে সরাসরি নানা কায়দায় তার ধ্বংসসাধনের পথ পরিষ্কার করছিল, সে তো আমরা আগেই দেখেছি। এর সম্মিলিত ফল এই হল যে একর প্রতি উৎপাদনের হার দ্রুত হারে কমতে শুরু করলো (যার চিত্র আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি) এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সর্বনিম্ন হারে ফসল উৎপাদনের দেশে পরিণত হল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্যোৎপাদন তাল রাখতে পারলো না। উৎপাদিত খাদ্যের মাথাপিছু গড় বার্ষিক পরিমাণ কমতে কমতে ১৮৯৪-৯৬ থেকে ১৯৩৭-৪৩ সালের মধ্যে ৫৮৭ পাউণ্ড থেকে ৩৭৯ পাউণ্ডে এসে দাঁড়াল (ফেমিন ইন ইণ্ডিয়া, বি. এম. ভাটিয়া)। ভারতবর্ষ থেকে আগে শুধু খাদ্য রপ্তানী হতো; ক্রমশই তার চেয়েও বেশি হারে খাদ্য আমদানী (প্রধানত বার্মা থেকে) হতে শুরু করলো। ১৯২১-২৫ সালে খাদ্যের মোট রপ্তানীর চেয়ে আমদানীর পরিমাণ ১.৬ লক্ষ টন বেশি ছিল। ১৯৩৬-৪০ সালে এই অতিরিক্ত পরিমাণ এসে দাঁড়াল ১৩৮ লক্ষ টনে (ঐ)। অর্থাৎ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় আভ্যন্তরীণ খাদ্য সরবরাহ ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো। উৎপাদন বাড়াবার জন্য চেষ্টা করার বদলে বাইরে থেকে বেশি বেশি করে খাদ্য আমদানী করে কোনক্রমে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাটাই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়াল। এই সংকটজনক অবস্থাটা খাদ্য পরিস্থিতির স্বাভাবিক চরিত্র হিসাবে দেখা দিল। এই অবস্থায় কোনো আকস্মিক দুর্বিপাকে যদি স্বাভাবিক সরবরাহে সামান্য একটু ঘাটতিও পড়ে যায় বলে সংবাদ রটে যায় তবে সাথে সাথেই খাদ্য-ব্যবসায়ীদের সুযোগ হয়ে যায়, খাদ্যের বিরাট এক অংশকে সাময়িকভাবে মজুত করে ফেলে, বাজারে ঐ সাময়িক ঘাটতির চেয়ে অনেক বেশি ঘাটতি অর্থাৎ কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার। এর ফলে বাজার জুড়েই যে অভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়, তার ফলে ক্রেতাদের মধ্যে খাদ্য কিনে রাখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এই সুযোগে তখন গুদামজাত খাদ্য চড়া দামে বাজারে ছেড়ে খাদ্য-ব্যবসায়ীরা অস্বাভাবিক উচ্চহারে মুনাফা লুটতে থাকে। স্বভাবতই যাদের আয় যতো কম তারা ততো বেশি করে এই সংকটের শিকার হয়ে পড়ে। এবং দাম যদি একটা সীমা অতিক্রম করে যায় তবে এর ফলেই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হতে পারে।

ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯৪৩ এর (বাং, ১৩৫০) দুর্ভিক্ষে। এটাই ছিল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। জাপান বার্মা আক্রমণ করায় সেখান থেকে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে সরকার সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে ব্যাপক হারে খাদ্য শস্য ক্রয় করে মজুত করতে শুরু করে।

ফলে বাজারে যে অভাবের হাওয়া ওঠে তার সুযোগ নিয়ে মজুতদাররা আরও ব্যাপকতর কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এবং খাদ্যশস্যের দাম হঠাৎ হু হু করে বাড়তে থাকে। যেমন, কলকাতায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে যেখানে চালের মণ ছিল ৬ টাকা সেখানে তার পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে মণ প্রতি চালের মূল্য দাঁড়ায় নভেঃ, '৪২—১১ টাকা, ফেব্রুঃ-এপ্রিল '৪৩—২৪ টাকা, মে—৩০ টাকা, জুলাই—৩৫ টাকা, অক্টোঃ—৪০ টাকা এবং মফঃস্বলে ৫০ থেকে ১০০ টাকা (আর. পি. ডি, পৃ-২৬৩)। স্বাভাবতই এই দাম সাধারণ মানুষের, বিশেষত কৃষক ও গ্রামীন কুটীরশিল্পীদের নাগালের বাইরে চলে যায়। ফলে হঠাৎ তাঁরা লাখে লাখে অনাহারে মরতে থাকেন। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। এই দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী ৩৫ লক্ষ ও সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৫ লক্ষ; দুর্ভিক্ষ পরবর্তী মহামারীতে আরও অন্তত ১০ লক্ষ লোক মারা যান (ইণ্ডিয়া-ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, চার্লস বেটেলহেম)। প্রায় ব্যাতিক্রমহীনভাবেই এরা সবাই ছিলেন কৃষক অথবা গ্রামীন কুটীরশিল্পী। অথচ বাঙলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় মোট ঘাটতির পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ সপ্তাহের খাদ্য। আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই যদি কৃষকদের উপর করের বোঝা কমিয়ে এবং সেচ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করা যেত এবং খাদ্যশস্যের মূল্যমান বেঁধে দিয়ে এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা যেত, তবে এই সামান্য পরিমাণ ঘাটতির এমন মর্মন্তুদ পরিণতি হতে পারতো না। এর বদলে প্রথমে কোনোরকম সংকটের কথাই অস্বীকার করা হল। তারপর জোতদার-মজুতদারদের উপর সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঘন ঘন হুঙ্কারধ্বনি ছাড়া শুরু হল। কিন্তু কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা তাঁদের বিরুদ্ধে নেওয়া হল না। অবশেষে বহুপরে যখন মৃত্যুর মিছিল তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে তখন বাধ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হল এবং কিছু কিছু প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হল। কিন্তু ততদিনে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে।

'৪৩এর দুর্ভিক্ষে খাদ্য-ব্যবসায়ী তথা মজুতদার ও কালোবাজারীদের যে একটা বিরাট ভূমিকা ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই দুর্ভিক্ষ থেকে তারা ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা লুটেছিল (ঐ, পৃ-২৬৩)। কিন্তু তারা এই সুযোগ পেয়েছিল কি করে? বা, অন্য কথায়, দেশের মধ্যে পর্যাপ্ত খাদ্যোৎপাদন হলে এই সুযোগ তারা পেতো কি? অন্যদিকে কৃষকদের অবস্থা আগে থেকেই এত শোচনীয় না হয়ে থাকলে লাখে লাখে এভাবে মৃত্যু হতে পারত কি? অর্থাৎ এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার অনুসৃত খাদ্য তথা কৃষিনীতি। মজুতদারী, কালোবাজারী সেই নীতিরই অবিশ্যম্ভাবী ফল, মূল কারণ নয়।

## ব্রিটিশ-ভারতের শিল্পব্যবস্থা

ব্রিটিশ-ভারতের কৃষিব্যবস্থা ও কৃষিনীতিরই পরিপূরক ছিল তার শিল্পব্যবস্থা ও শিল্পনীতি। এই নীতির একটি দিকের কথা ইতিমধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি। সেটা হল কুটীরশিল্প ভিত্তিক ভারতীয় শিল্পব্যবস্থার ধ্বংসসাধন। কিন্তু এই ধ্বংসের ক্ষতিকর প্রভাব মুছে গিয়ে, আগের তুলনায় আরও বহুগুণ সমৃদ্ধিশালী ভারত গড়ে উঠতে পারতো যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটীরশিল্পের জায়গায় ব্যাপকভাবে স্বনির্ভর আধুনিক শিল্পায়ন প্রবর্তন করা হতো। খোদ ব্রিটেন সহ সারা ইওরোপে দ্রুত হারে যে ব্যাপক আধুনিক শিল্পায়ন (যার অপর নাম 'শিল্পবিপ্লব') নতুন সমৃদ্ধির দ্বার খুলে দিয়েছিল তার জন্ম হয়েছিল সেখানকার কুটীরশিল্পের ধ্বংসাবশেষের উপরেই। প্রাকৃতিক সম্পদ (কৃষিজ, বনজ, খনিজ) ও শ্রমশক্তির যে বিশাল মজুত ভাণ্ডার ভারতবর্ষের ভিতরেই ছিল এবং তার বিপুল জনসংখ্যা যে বিরাট বাজার সৃষ্টি করেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষেও এই ব্যাপক শিল্পায়নের পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্রিটিশের নীতির লক্ষ্য ছিল (১) ভারতীয় মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠাকে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে বাধা দেওয়া, অর্থাৎ একদিকে ভারতীয় পুঁজির বিপুল অংশকে শিল্পের নামে বিভিন্ন অনুৎপাদক খাতে বইয়ে দেওয়া (যেমন ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য ও খাদ্য শস্যের ব্যবসা, জমি কেনা-বেচা, মহাজনী ইত্যাদি) ও অন্যদিকে গোটা শিল্পব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব প্রধানত ব্রিটিশ পুঁজির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ (যেখানে প্রত্যক্ষ মালিকানায় ভারতীয় পুঁজিপতিরা রয়েছে) নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আটকে রাখা, (২) সেইসব খাতেই ব্রিটিশ পুঁজি বা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত পুঁজির বিনিয়োগকে সীমাবদ্ধ রাখা যেটা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ পুঁজিকে প্রচুর মুনাফার সুযোগ এনে দেবে এবং অন্যদিকে যেগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপূরক।

মূল লক্ষ্যের এই কাঠামোর মধ্যেই অবশ্য শিল্প সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে পরিস্থিতির চাপে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে (১৯১৪) পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি ছিল ভারতবর্ষে কোনো ধরনের মালিকানাতেই আধুনিক শিল্প না হতে দেওয়া। ঐ পর্যন্ত ব্রিটিশ মূলধনের ৯৭%নিয়োজিত ছিল রেল, ট্রাম, বাগিচা (চা, কফি, রবার) এবং সরকারী ও মিউনিসিপাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অ-শিল্পীয় খাতে (আর. পি. দত্ত, পৃ-১৪৩)।

অর্থাৎ সেইসব খাতে যেগুলি ভারতীয় বাজার ও কাঁচামাল দখলের জন্ত প্রয়োজন। এই সময় পর্যন্ত অতি অল্প সংখ্যায় ভারতীয় ও ব্রিটিশ মালিকানায় যথাক্রমে বস্ত্র ও পাটশিল্প গড়ে ওঠে। এর পরবর্তীকালে বিশেষত প্রথম (১৯১৪-১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে (১৯৩৯-৪৫) কেন্দ্র করে সীমিতভাবে শিল্পায়নের নীতি নেওয়া হয়। এর ফলে ভারতীয় ও ব্রিটিশ কোম্পানীগুলির মালিকানায় আরও বেশি সংখ্যায় কিছু কিছু শিল্প (পাট, বস্ত্র সীমিতভাবে লৌহ ও ইস্পাত ইত্যাদি) গড়ে ওঠে।

কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে—

(১) প্রধানত সেইসব শিল্পগুলিতেই বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যেগুলি যুদ্ধের প্রয়োজনেই ভারতবর্ষে স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন, ১৯৪৪ সালে লণ্ডন গেজেটে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার শিল্পনীতি সম্পর্কে লেখা হয় যে, ব্রিটিশ বাণিজ্যিক বোর্ডের একজন প্রতিনিধি মি. গাই. লোকক "মনে করেন যুদ্ধের জন্ত আবশ্যক নয় এমন কোনো ধরনের উৎপাদনের প্রসারে অল্পই চেষ্টা করা হয়নি" (ঐ, পৃ-১৭৭)। এছাড়াও খুব দ্রুত প্রচুর মুনাফা এনে দিতে পারে এরকম শিল্পও অগ্রাধিকার পেয়েছিল। কিন্তু যে শিল্পগুলি এই দুই ধরনের একটির মধ্যেও পড়ে না, অথচ সামগ্রিকভাবে দেশে সুষম শিল্পায়নের দিক থেকে যেগুলির জরুরী প্রয়োজন ছিল, সেগুলির বিকাশ সুপরিকল্পিতভাবে অবহেলিত বা সরাসরি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেই মৌলিক শিল্পগুলি (লৌহ, ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, মৌলিক রসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি) অন্তান্ত শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদন করাটাই যার কাজ। অথচ এগুলিই যে-কোনো দেশে শিল্পব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এগুলির অনুপস্থিতি বা নামমাত্র উপস্থিতির ফলে শিল্পব্যবস্থা তার নিজের জোরে এগিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। তার বিকাশ ভারসাম্যহীন ও একপেশে হয়ে পড়েছিল।

(২) সেইসব ক্ষেত্রেও এমনিতেই দুর্বল ভারতীয় পুঁজিপতিদেরকে, তাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, যা তাদের বিকাশকে ব্যহত করে।

(৩) দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থায় (অর্থাৎ যেখান থেকে টাকা ধার না করলে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়) প্রধানত ব্রিটিশদের (ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক কোম্পানী) আধিপত্য থাকায় তারা ভারতীয় শিল্পগুলির উপরও বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে এবং সেখানকার মুনাফায় ভাগ বসাতে সক্ষম হয়।

(৪) ভারতীয় শিল্পগুলিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কারিগরি বিদ্যা আমদানী করার জন্ত ব্রিটিশ শিল্পের উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো।

(৫) সামগ্রিকভাবে ভারতে স্থাপিত আধুনিক শিল্পের বিকাশের পরিমাণ দেশের আয়তন, লোকসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় অতি সামান্তই ছিল। শিল্প শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিলেন ছোট ছোট হস্তশিল্প বা গৃহশিল্পের অন্তর্গত। যেমন, ১৯২২ সালের একটি হিসাব অনুযায়ী দেশে মোট ২ কোটি শিল্প-শ্রমিকের মধ্যে ১ কোটি ৭৪ লক্ষই ছিলেন হস্তশিল্প বা গৃহশিল্পের অন্তর্গত। বাদবাকি ২৬ লক্ষের মধ্যে ১০ লক্ষ ছিলেন বাগিচাশিল্পের অন্তর্গত। আধুনিক শিল্পের অন্তর্গত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ লক্ষ (ঐ, পৃ-১৪৬) অর্থাৎ দেশের মোট কর্মরত জনসংখ্যার (১৪৬ কোটি) ০.৯০% মাত্র। অন্তদিকে আর একটা মজার (?, জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে ব্রিটিশ ভারতে ঘোষিতভাবে শিল্পায়নের নীতি যে সময় নেওয়া হয়, সে সময়কালের মধ্যে আগের তুলনায় মোট জনসংখ্যা ও কর্মরত জনসংখ্যা বেড়ে চললেও শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা আগের থেকে আরও কমে আসে। যেমন ১৯১১ থেকে ১৯৩১—এই ২০ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা ৩১.৫ কোটি থেকে ৩৫.৩ কোটিতে ওঠে, কর্মরত জনসংখ্যা ১৪.৯ কোটি থেকে ১৫.৪ কোটিতে ওঠে। কিন্তু এই সময়ের সমস্ত ধরণের শিল্প-শ্রমিকের মোট সংখ্যা ১.৭৫ কোটি থেকে ১.৫৩ কোটিতে দাঁড়ায় (ঐ, পৃ-১৬১)। এর অর্থটা কী? শিল্পায়নের সত্যিকারের অগ্রগতি হলে তো এর উল্টোটাই হওয়ার কথা। এর কারণ কুটীরশিল্পের ধ্বংসসাধন প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলছিল কিন্তু সে তুলনায় আধুনিক শিল্প বিকাশের হার ছিল অনেক কম। অর্থাৎ ব্রিটিশ শিল্পনীতি সামগ্রিকভাবে ভারতে শিল্পায়নের বদলে ক্রমবর্দ্ধমান হারে অ-শিল্পায়নের জন্ম দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে শিল্প মালিকানার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজির কৌশলে আরও একটি পরিবর্তন হয়। তা হচ্ছে এর আগে তারা সাধারণভাবে ভারতীয় মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠার যে বিরোধিতা করে আসছিল তা পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ ও ভারতীয় কোম্পানীগুলির যৌথ মালিকানায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার নামে সরাসরি ভারতীয় শিল্পগুলিতে অনুপ্রবেশ করে, অর্থাৎ এগুলিকে আরও সরাসরি ব্রিটিশ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা দেখছি ব্রিটিশ ভারতের তথাকথিত শিল্পায়নের নীতি কার্যকরী হওয়ার পরও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আধুনিক শিল্পের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। একজন মার্কিন অধ্যাপক ডি এইচ. বুচাননের বক্তব্য অনুযায়ী (১৯৩৪) দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২% আধুনিক শিল্পের সাথে যুক্ত ছিল (ঐ,)। আর এই শিল্পায়নও ছিল আভ্যন্তরীণভাবে ভারসাম্যহীন ও একপেশে। অর্থাৎ ব্রিটিশ নীতি ভারতীয় সমাজে শিল্প বিকাশের যে সম্ভাবনা ছিল, তাকে রুদ্ধ করে দিল। এর জন্ত আর

একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা ছিল বিদেশের ওপর নির্ভরশীল, স্ব-নির্ভর নয়।

এই অবরুদ্ধ, ভারসাম্যহীন ও পরনির্ভর শিল্পব্যবস্থার কারণ ছিল এই যে শিল্প ও তার আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডের জন্য যে পুঁজি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন, তার সবই ছিল সরকারী বা বে-সরকারী-ভাবে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে। এই নিয়ন্ত্রণ যা ভারতীয় শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটাই অন্যদিকে তার বিকাশের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ - নির্ভরতা—নিয়ন্ত্রণ. এই দুষ্টচক্রে পড়ে ভারতীয় শিল্প ক্রমশই বেশি বেশি করে তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছিল।

অবরুদ্ধ ও পরনির্ভর এই শিল্পায়ন ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল? এই শিল্পায়ন যে দেশের সমৃদ্ধি বাড়ানোর বদলে আরও ব্যাপকভাবে দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদকে বৈদেশিক লুণ্ঠনের শিকার করে তুললো, সে তো এই শিল্পের পরনির্ভর চরিত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই লুণ্ঠনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল শিল্পকেন্দ্রগুলিতে গড়ে ওঠা চূড়ান্তরকম অস্বাস্থ্যকর ও ভয়াবহ দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি বিশাল বিশাল শ্রমিক বস্তীগুলি। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যে-কৃষিব্যবস্থা কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদের চূড়ান্ত দুর্দশার মুখে ঠেলে দিচ্ছিল সেটা যাতে অব্যাহতভাবে চলতে পারে, অবরুদ্ধ শিল্পব্যবস্থা তারই স্থায়ী শর্ত সৃষ্টি করলো। কারণ এরই ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভয়াবহরকম পশ্চাদপদ কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকা ছাড়া, অন্য কোনো বিকল্প কর্মসংস্থান রইল না। শিল্পে স্ব-নির্ভর ও বিপুল অগ্রগতি হলে তারই চাপে কৃষিতেও উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণ হতে পারতো (ট্রাক্টর, সার, বীজ ইত্যাদি)। তার ফলে উৎপাদনও বহুগুণ বেড়ে যেতো এবং নতুন কায়দায় উৎপাদন করতে গিয়ে পরগাছা-নিয়ন্ত্রিত ভূমি সম্পর্কের কাঠামোতেও পারবর্তন আসতো। অন্যদিকে অবাধ শিল্পবিকাশের আবহাওয়া থাকলে কৃষি-ক্ষেত্র থেকে জন্ম নেওয়া যে পুঁজি সম্পূর্ণ অনুৎপাদক কার্যকলাপে নিযুক্ত হচ্ছিল, তারও অনেকখানি শিল্প ও আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের কাজে ব্যায়িত হতো। কারণ শেষ বিচারে আধুনিক শিল্প ও কৃষিতে বিনিয়োগ অনেক বেশি মুনাফার জন্ম দেয়। এ সমস্ত কিছু স্বভাবতই সামগ্রিকভাবে জাতির জীবনে যে সমৃদ্ধির জন্ম দিতো তাতে ভয়াবহ দারিদ্র্য আর থাকতে পারতো না। কিন্তু ব্যাহত ও পরনির্ভর শিল্প-ব্যবস্থা কৃষির এই পরিবর্তনের পথে এক বিরাট বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল।

সাথে সাথে এও মনে রাখতে হবে যে, দেশের পশ্চাদপদ কৃষিব্যবস্থাটা নিজেই ব্যাপক শিল্পায়নের পথে একটা বিরাট বাধা হিসাবে কাজ করছিল। কারণ দেশের এত বিরাট অংশ এত নীচু ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হওয়ার ফলে, শিল্পজাতদ্রব্য কেনার লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়ে দাঁড়াল। আর, শিল্পজাত দ্রব্য কেনার লোক না থাকলে শিল্প বাড়বে কি করে? অন্যদিকে পশ্চাদপদ ভূমিসম্পর্কের ফলে কৃষি থেকে যে মুনাফা হচ্ছিল তা গিয়ে পড়ছিল এমন এক শ্রেণীর পরগাছাদের হাতে, যাদের শ্রেণীগত চরিত্রের কারণেই শিল্পবিকাশের জন্য যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, যে সীমিত পরিমাণ ঝুঁকি নিতে হয় (বাজারী অর্থনীতিতে যে কোনো কারখানা স্থাপন করলেই তার উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রি না হওয়ার ব্যাপারে সব সময়েই কিছুটা ঝুঁকি নিতে হয়) তার কোনোটাই তাদের ছিল না। তার বদলে বিনা পরিশ্রমে, বিনা ঝুঁকিতে জমি ও খাদ্য শস্য নিয়ে কেনা-বেচার সহজ ও নিশ্চিত পদ্ধতিই তাদের পছন্দ ছিল। এজন্য এই ব্যবস্থাকে অটুট রাখার জন্য তারাও ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম সহযোগী ছিল।

সুতরাং আমরা দেখছি কৃষি ও শিল্পের অনগ্রসরতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ভূমিকা নিয়ে ভারতকে সামগ্রিকভাবে পশ্চাদপদ কৃষি নির্ভর একটি দেশে পরিণত করেছে। এবং এরই ফলে জন্ম হতে পেরেছে ভয়াবহ দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ।

ব্রিটিশ ভারতের দুর্ভিক্ষের উৎস ও তার চরিত্র সম্পর্কিত এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পথ-পরিক্রমা আমরা এখানেই শেষ করছি। এই আলোচনা থেকে আমরা এ সম্পর্কে কয়েকটা মূল সিদ্ধান্তে আসতে পারি বলে মনে হয়—

১। প্রাক ব্রিটিশ যুগে আকস্মিক কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ভিক্ষের সাথে সম্পর্কহীন কোনো সামাজিক বিপর্যয়ের ফলে চূড়ান্ত অর্থে খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ-ভারতের দুর্ভিক্ষগুলি সাধারণত প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিপর্যয়কে উপলক্ষ্য করে করে দেখা দিলেও, সেগুলি ছিল মূলত মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। সে জন্যেই বিপর্যস্ত অঞ্চলেও অর্থ থাকলেই অনায়াসেই দুর্ভিক্ষের হাত এড়ান সম্ভব ছিল; একমাত্র তারাই এর শিকার হত যাদের অর্থ থাকতো না।

২। প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে সরকার ও ভারতীয়দের একটি ক্ষুদ্র অংশ কর্তৃক মজুতদারী, মুনাফাখোরী ও জনসাধারণকে খাদ্য সরবরাহ করতে সরকারের অস্বীকৃতিই দুর্ভিক্ষের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল।

৩। কিন্তু সাময়িক এই কারনটি যে দেখা দিতে পারতো তার পিছনে ছিল দীর্ঘস্থায়ী দুটি কারণ :

ক) দেশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে খাদ্যের ঘাটতি। ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়ার দিকে এই ঘাটতির কারণ ছিল একাধারে খাদ্যোৎপাদনের ক্রমাবনতি ও ভারত থেকে খাদ্য বাইরে চালান করা। কিন্তু পরবর্তীকালে খাদ্যোৎপাদনের দ্রুত অবনতিই প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে খাদ্য সরবরাহ আমদানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তা পরিস্থিতিকে আরও সংকটজনক করে তোলে।

খ. ভারতীয়দের ক্রমবর্দ্ধমান ভয়াবহ দারিদ্র। এদের মধ্যে আবার দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। তারাই ছিলেন দুর্ভিক্ষের মূল শিকার।

৪। এই ভয়াবহ দারিদ্রের ফলে অনাহার ও অপুষ্টি এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া ব্যাধি এবং মৃত্যু (অর্থাৎ যা দিয়ে দুর্ভিক্ষকে চেনা যায়) ভারতীয় কৃষকদের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। আর দুর্ভিক্ষ হয়ে দাঁড়াল সাধারণভাবে ভয়াবহ দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থারই সাময়িক এবং চূড়ান্তরকম ভয়াবহ প্রকাশ মাত্র। সে জন্যই দুর্ভিক্ষের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল মূলত ভারতীয় জনসাধারণের, বিশেষত তার কৃষকদের দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্রের সমস্যা, কোনো একটা বিচ্ছিন্ন আলাদা সমস্যা নয়। তাদের নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ যখন দুর্ভিক্ষের সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে কিছু সীমিত উদ্যোগ নিয়েছিল, তখনও এই দারিদ্রের সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল।

৫। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার জোরে ভারতীয় সমাজের উপর যে শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল, তা-ই ছিল এই দারিদ্রের মূল কারণ। এই ব্যবস্থার চরিত্রই এমন ছিল যে, একদিকে তা ধারাবাহিকভাবে দেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদগুলিকে ক্রমবর্দ্ধমান হারে বৈদেশিক লুটেরা ও তাদের দেশীয় তাঁবেদারদের লুণ্ঠন ও শোষণের শিকার করে তুলছিল এবং অন্যদিকে তা দেশের কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে, সেগুলিকে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। দারিদ্র ছিল শোষণ ও অবরুদ্ধ বিকাশের এই যুগ্ম প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই যুগ্ম প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল সেগুলি হল:

ক) দেশের শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়াগুলির এবং আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা।

খ) ভূমি সম্পর্কের চরিত্র। এই চরিত্র এই রকম ছিল যে জমি ও ফসলের মালিকানা স্বত্ব ক্রমবর্দ্ধমান হারে এমন একটি দেশীয় শ্রেণীর (জমিদার, মহাজন, খাদ্য-ব্যবসায়ী ইত্যাদি) হাতে গিয়ে পড়ছিল যারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে কোনোরকম উদ্যোগ না নিয়ে বা বিনিয়োগ না করেই (ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও কৃষিজাত দ্রব্যের দরের ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যদিয়ে) কৃষি থেকে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করতে পারত। অন্যদিকে সত্যিকারের কৃষকদেরই কৃষি উৎপাদনের সমস্ত ঝুঁকি ও খরচ বহন করতে হলেও, ক্রমাগত তারা জমির উপর অধিকার হারাচ্ছিল।

এই দুটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং তারা ছিল পরস্পরের পরিপূরক, একই সূত্রে গাঁথা। এই ঐক্যসূত্রটির জন্ম হতে পেরেছিল দেশজোড়া একটি অখণ্ড জাতীয় বাজার ও কেন্দ্রবদ্ধ মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে, যে বাজার ও মুদ্রা ব্যবস্থা আবার সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববাজার ও মুদ্রাব্যবস্থারই অংশ ছিল। এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ বাজার ও মুদ্রা ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছিল তা সম্ভব হতো না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরেই ভারতীয় অর্থনীতিতে এই বৈশিষ্ট্য দুটি প্রবর্তন করেছিল। একবার প্রবর্তিত হবার পরে এই বৈশিষ্ট্যগুলিই ভারতবর্ষের মানুষদের দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষকে জয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল। এই বাধাগুলিকে সমূলে উৎপাটিত না করে, অন্য কোনোভাবে দারিদ্র্য বা দুর্ভিক্ষের সমস্যার সমাধানের কথা বলার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় পাগলামী বা নির্ভেজাল শয়তানী।

## আজকের ভারত

স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক, দেশ ও বিদেশের বহু বিদ্বজ্জনের রচনা, রেডিও ও খবরের কাগজ এবং সর্বোপরি প্রতিবছর বিপুল সমারোহের মধ্যদিয়ে আমরা জানতে পারি—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি—ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রও বটে। এর প্রমাণ হিসাবে আমরা দেখছি দেশের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্তরে দেশের সর্বোচ্চ পরিচালক রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে থানার দারোগা পর্যন্ত কোথাও কোনো বিদেশী নেই, সবাই ভারতীয়। দেশের লোকের ভোটপত্রের মাধ্যমে ভারতীয়দের নিয়েই প্রতি পাঁচ বছর অন্তর (আজকাল অবশ্য আরও ঘন ঘন) দেশের সরকার গঠিত হয়। অর্থনৈতিক স্তরে দেশের কৃষি ও শিল্পের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য একের পর এক রচিত হয়েছে পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলি। সরকারী উদ্যোগে কৃষির উন্নতির জন্য "সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প", "সমবায় প্রথা", "সবুজ-বিপ্লব", শিল্পের ভিত্তি রচনার জন্য পাঁচ পাঁচটি ভারী ইস্পাত ও যন্ত্র

নির্মাণ কারখানা এবং আরও বড় বড় শিল্প—এগুলির সাথেও আমরা পরিচিত। এসব কিছুর মাধ্যমে সরকার প্রকাশ্যেই দারিদ্র নির্মূল করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন, "সমাজতন্ত্র"কে তাদের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। যে কেউ আশা করবে এরপরে ব্রিটিশ ভারতের দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার দুঃস্বপ্নের হাত থেকে ভারতবাসী মুক্তি পাবেন। কিন্তু কার্যত আমরা কী দেখছি? প্রতিবছরই দেশের কোনো না কোনো অংশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ব্রিটিশ সরকারের মতো আমাদের "প্রজাতান্ত্রিক" সরকারও এর দায়িত্ব বন্যা, খরা এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের উপর চাপাচ্ছেন, যদিও এগুলির কোনোটার বিরুদ্ধেই কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। 'জাতীয় পুষ্টি সংস্থা, হায়দ্রাবাদ' প্রকাশিত পুষ্টির এক মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মহীশূর, তামিলনাদ, কেরল ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র চূড়ান্ত অপুষ্টি থেকে ভুগছে। মাঝামাঝি ধরনের অপুষ্টির অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে কাশ্মীর, রাজস্থান, উত্তর মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা। মৃদু অপুষ্টির মধ্যে রয়েছে একমাত্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও নেফা। অর্থাৎ দেশের কোনো অংশই অপুষ্টির হাত থেকে মুক্ত নয় এবং জনসংখ্যার ৯৬% চূড়ান্ত বা মাঝামাঝি অপুষ্টি থেকে ভুগছে। প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ শিশু মারাত্মক রকমের অপুষ্টির ফলে প্রাণ হারায়। ভয়াবহ এই অপুষ্টির কারণ?—সেই বৃটিশ আমলের পুরাতন সামাজিক ব্যাধি, অর্থাৎ দারিদ্র। ভারতবর্ষের ৪২ কোটি গ্রামীন জনসংখ্যার (মোট জনসংখ্যার ৭০% এর উপর) মধ্যে ৭০% দারিদ্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম মানেরও নীচে বাস করেন। শহরাঞ্চলের ৫০% এই অবস্থার মধ্যে আছেন (ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, ১০.৮.৭১)। সরকারী সংজ্ঞা অনুযায়ী এই নিম্নতম মান হল ১৯৬০-'৬১ সালের মূল্যমান অনুযায়ী মাথাপিছু ২৭ টাকা (অর্থাৎ দৈনিক ৬৭ পয়সা) আয় (স্টেটসম্যান, ১.৬.৭২)। একটি বৃহৎ সংবাদপত্রের (স্টেটসম্যান) একজন নিয়মিত লেখক ও অর্থনীতিবিদের বক্তব্য অনুযায়ী, "দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি (অর্থাৎ জনসংখ্যার তুলনায় মাথাপিছু খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ—বীঃ সঃ দঃ) ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ ৭০ বছরের চেয়ে খুব একটা আলাদা নয়" (বি. এম. ভাটিয়া—ইণ্ডিয়াস ফুড প্রবলেম, পৃ-২১৯)। সুতরাং দেশের বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনে দারিদ্র—ক্ষুধা—অপুষ্টি—মৃত্যু এই চক্রের কোনো অবসান হচ্ছে না। এর কারণ কী? এই প্রশ্নের সুসম্পূর্ণ উত্তরের জন্য আমাদের তীব্র অনুসন্ধান চালাতে হবে। কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসাবে যেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরানো দরকার তা হল ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে দুটি মূল বৈশিষ্ট্যকে আমরা ভারতীয় জনসাধারণের অসহনীয় দারিদ্রের মূল কারণ হিসাবে দেখেছিলাম, সেদুটি অপসারিত হয়েছে কি? অর্থাৎ শিল্প, কৃষি ও সামগ্রিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ব্যাপারে বিদেশের উপর (অর্থাৎ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী বা উন্নত দেশগুলির উপর) অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা (আর নির্ভরশীলতা অর্থই নিয়ন্ত্রণ) এবং পরগাছাকেন্দ্রিক ভূমিসম্পর্ক ও পশ্চাদপদ কৃষি অর্থনীতির কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি?

সরকারী প্রচার থেকে আপাতভাবে মনে হবে, এই দুটি পরিবর্তনই সাধিত হয়েছে। গত ২৭ বছর ধরে "স্বনির্ভরতা", "সমাজতন্ত্র" ও "ভূমি সংস্কার" এই তিনটি শব্দই পবিত্র শপথ-বাক্যের মতো বারে বারেই উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু কার্যত কী দেখা যাচ্ছে?

একথা ঠিকই যে আনুষ্ঠিকভাবে আজ দেশীয় সরকারের পরিচালনাধীন অর্থনৈতিক দপ্তর ও কেন্দ্রিয় পরিকল্পনা কমিশনই দেশের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করে ও সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে বড় বড় আধুনিক শিল্পগুলির প্রত্যক্ষ পরিচালনাতে রয়েছে সরকার বা দেশীয় বড় বড় পুঁজিপতিরাই (টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া ইত্যাদি), যাদের জন্ম ব্রিটিশ আমলেই হয়েছিল। দেশীয় বড় পুঁজিপতিদের মুনাফার পরিমাণও গত তিন দশকে বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু যদি দেখা যায় সামগ্রিকভাবে এই দেশীয় পরিচালনাধীন অর্থনীতিকেই ব্রিটিশ আমলের চেয়েও ক্রমাগত বেশি বেশি হারে বৈদেশিক ঋণের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে এবং সেই ঋণের চেয়ে বহুগুণ বেশি পরিমাণ সুদে-আসলে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, তবে সেই অর্থনীতিতে কি বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ কমে গেছে বলে ধরা হবে? মহাজনের কাছে দেনার বোঝা যতো ভারী হয়ে ওঠে, খাতক কি ততো তার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়? স্কুলের একজন নীচু ক্লাসের ছাত্রও এর উত্তর জানে। বৈদেশিক ঋণ ও পুঁজির ক্রমবর্ধমান বোঝার প্রমাণস্বরূপ আমরা নীচে কিছু অসম্পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করছি। প্রসঙ্গত উল্লেযোগ্য বৈদেশিক পুঁজির বা ঋণের আধুনিক নাম "বৈদেশিক সহায়তা"।

● প্রথম তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যায়িত অর্থের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা পরিমাণ ছিল এই রকম: প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৫)—১৪% (১২৬.৬০ কোটি টাকা), দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬০)—১৯% ৮৯০.২৫ কোটি টাকা), তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৫)—৩৫% (২০২৭.১০ কোটি টাকা)। পাশাপাশি ঐসব বছরে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য ধার করতে হয় তার মূল্য হল যথাক্রমে ৫.১০ কোটি টাকা, ৫৪৫.০৬ কোটি টাকা ও ৮৫৩.২২ কোটি টাকা (চার্লস বেটেলহেম, ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট,

পৃ/ ২৮৮-২৯২ )। এই "সহায়তার"র একটি ক্ষুদ্র অংশ অবশ্য অনুদান হিসাবে দেওয়া। অর্থাৎ সেগুলিকে ফেরৎ দিতে হবে না। বাকী অংশটিকে সুদে আসলে ফেরৎ দিতে হবে। অর্থাৎ এই অংশটাই ঋণ। ব্রিটিশ শাসনের অল্প কিছু পরেই ( জুন, ১৯৪৮ ) এই ধরনের বৈদেশিক ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা (ঐ, পৃ - ৩১০)। সেটা বাড়তে বাড়তে ১৯৭৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৮,৩৫১ কোটি টাকায় ( হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৫।১২।৭৯। ) অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬ গুণেরও বেশি। প্রথম দিকে এই ঋণের বেশিরভাগ অংশটাই বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ করা হতো। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার শেষ দিক থেকেই সরকারী খাতে বিনিয়োগ করা ঋণের পরিমাণ বেসরকারী খাতকে ছাড়িয়ে চলে যায়।

● ঋণদাতা দেশগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ আগেকার ব্রিটেনের জায়গা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পশ্চিমের ও পূবের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও তাদের নিয়ে গঠিত ( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি সংস্থা—যেমন, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক (WB), ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (IDA), ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন (IBRD)। তাছাড়াও রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র-জোটের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি। খাদ্য ঋণ এসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পি. এল-৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী। চুক্তির বিভিন্নতা অনুযায়ী ঋণের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন কায়দায় শোধ করতে হবে। যেমন, ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমান ছিল ৮০১১ ৫১ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ দিতে হবে ৫৭৭৯·৯২ কোটি টাকা, পণ্যরপ্তানীর মাধ্যমে শোধ দিতে হবে ৪৬১·০১ কোটি টাকা ( প্রধানত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে ), ভারতীয় মুদ্রায় শোধ দিতে হবে ১৭৭০·৫৮ কোটি টাকা ( সরকারী ঋণ, পি. এল. ৪০০ চুক্তি ইত্যাদি নিয়ে )।

ঋণের সুদ হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ প্রতিবছর ভারত থেকে চলে যায় তার নমুনা—

১৯৬৮-৬৯ সালে — ১৩৯ কোটি টাকা
১৯৬৯-৭৯ „ — ১৪৪ „ „
১৯৭০-৭১ „ — ১৬০ „ „
১৯৭১-৭২ „ — ১৮০ „ „
১৯৭২-৭৩ „ — ১৮৮ „ „
—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ৫।১২।৭৩

● এইসব ঋণগুলি কোথায় যায়? একাংশ যায় বেসরকারী শিল্পে ও আর একাংশ সরকারের পরিচালনাধীন ( শিল্প, কৃষি ও সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ) সাধারণ উন্নয়নমূলক প্রকল্প ( রেল, জলসেচ, বিদ্যুৎ. রাস্তাঘাট, বন্দর, সি. এম. ডি এ. ইত্যাদি নগর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ইত্যাদি ) ও শিল্পে ( প্রধানত ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মানের কারখানা ইত্যাদি ভারী শিল্প )। আধুনিক সরকারী ও বেসরকারী এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বা উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেই যাতে কোনো না কোনোভাবে বৈদেশিক ঋণের কোনো ভূমিকা নেই।

● বেসরকারী খাতের শিল্পের ক্ষেত্রে "বিদেশী পুঁজি ভারতীয় পুঁজির কাছে খুব বেশি জায়গা হারিয়েছে বলে মনে হয় না" ( চার্লস বেটেলহেম, পৃ- ৬০ )। এবং তার ভূমিকা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। যেমন প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতে মোট নিয়োজিত পুঁজির মধ্যে বিদেশী পুঁজির শতকরা হার ছিল এই রকম: ১ম পরিকল্পনা—১৩·২% ( ৪৫ কোটি টাকা ), ২য় পরিকল্পনা—২৩·৫% ( ২৫০ কোটি টাকা ), ৩য় পরিকল্পনা—২৪% ( ৩০০ কোটি টাকা )। প্রধানত ভারতীয় এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের মধ্যে 'সহযোগিতা'মূলক চুক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির" ( ঐ, পৃ-৩১২ ) মধ্যদিয়ে এই পুঁজির পরিমাণ বেড়েছে। পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় হলেও তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, এই সংখ্যা থেকে যা বোঝা যায় তার চেয়ে বেশি" ( ঐ, পৃ-২১৪ )। কারণ ভারতীয় পুঁজিপতিরা কোন পরিস্থিতিতে এই চুক্তিগুলিতে গেছে? "ভারতীয় পুঁজিপতিরা এই ধরনের চুক্তিতে গেছে কারণ তারা বিদেশী পেটেন্টগুলির ব্যবহার করতে চায়...। যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের চুক্তিতে গেছে তারা, অন্যভাবে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমদানী করতে পারতো না" ( ঐ, পৃ-৩১২ )। এই সব আমদানীকৃত জিনিষগুলি কি? প্রধানত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, অর্ধপ্রস্তুত জিনিষ ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে উন্নততর কারিগরি বিদ্যা! এগুলির একটা ছাড়াও শিল্প চলবে না। কাজেই অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োগ করেও বিদেশী পুঁজি ভারতীয় পুঁজির উপর আধিপত্য করে এবং বিদেশী পুঁজির সাথে "সংশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বশ্যতা স্বীকার" ( ঐ, পৃ-২৬৪ )। বিদেশী পুঁজি যেখানে বিনিয়োগ করা হয় সেখান থেকে, আর্থিক ঋণের সুদ ছাড়াও শিল্পের মুনাফা, কারিগরিবিদ্যা ধার করার জন্য ভাড়া ইত্যাদি বাবদও বহু অর্থ প্রতি বছর বিদেশে চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন বছরে কত অর্থ এইভাবে বাইরে চলে গেছে তার একটি হিসাব নিচে দেওয়া হল:

| সাল | কোটি টাকা | সাল | কোটি টাকা |
| --- | --- | --- | --- |
| ১৯৫৬-৫৭ | ১৩.৮ | '৬২-৬৩ | ৩৮.২ |
| '৫৭-৫৮ | ১৩.৫ | '৬৩-৬৪ | ৩৬.২ |
| '৫৮-৫৯ | ১৪ | '৬৪-৬৫ | ৪৪.৯ |
| '৫৯-৬০ | ১৯.৩ | '৬৫-৬৬ | ৪৪.৭ |
| '৬০-৬১ | ২৪.৩ | '৬৬-৬৭ | ৬২.৬ |
| '৬১-৬২ | ৩৪ | '৭১-৭২ | ২০০ |

[ সূত্র : ফ্রন্টিয়ার, ৩০ জুন, ৭৩ ]

● আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল বেসরকারী বিদেশী ঋণের বৃদ্ধির একটি বড় অংশ বাইরে থেকে সম্পদ আমদানী করার ফলে হয়নি। ভারতবর্ষ থেকে অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমশক্তি শোষণ করে বিদেশী পুঁজি যে মুনাফা করেছে তারই এক অংশ আবার বিনিয়োগ করার ফলেই এই বৃদ্ধি ঘটেছে। মুনাফার আর একটি অংশ এবং প্রাথমিক পুঁজির আর এক অংশ যে-দেশ থেকে সেগুলি এসেছিল সেখানেই ফিরে চলে যায়। অর্থাৎ এখানে আমরা এমন একটি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছি যেখানে বিদেশী ঋণ নিজে থেকেই নিজেকে বাড়িয়ে চলেছে" (ঐ, পৃ-৩১০)। যেমন, "১৯৫৩ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে বেসরকারী খাতে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে প্রায় ১৮০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদেশী উৎস ছিল IBRD (৭২.৩ কোটি টাকা)। বিদেশী বিনিয়োগের বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই হতে পেরেছে, বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারত থেকে যে মুনাফা করেছে তারই একাংশ ভারতে পুনর্বিনিয়োগ করায় (৪১.২ কোটি)। সম্পূর্ণ নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ অতি সামান্য। মাত্র ১৩.১ কোটি টাকা। ভুললে চলবে না যে আরও অনেক বেশি পরিমাণ পুঁজি (৪০.৮ কোটি) ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং মুনাফা হিসাবে বাইরে গেছে ১৩৪ কোটি টাকা" (ঐ, পৃ-৩১১)।

▭ আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি বৈদেশিক ঋণের বেশির ভাগ অংশকেই বৈদেশিক মুদ্রাতেই, সুদে আসলে, ফেরত দিতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছরই এই ঋণের কিছু কিছু অংশ ফেরত দিতে হবে। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা আসবে কোথা থেকে? বিদেশে নিজের দেশের পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমেই একমাত্র নতুন বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি বৈদেশিক ঋণের একটা অংশকে পণ্য দিয়ে শোধ করার চুক্তি হয়েছে। কাজেই ভারতীয় পণ্যের একাংশ এই ভাবেই বাইরে চলে যায়, অর্থাৎ তা থেকে কোনো নতুন বৈদেশিক মুদ্রা আসে না। বাকি অংশ দিয়ে, ভারত যতো মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যের পণ্য তাকে আমদানী করতে হয়। কাজেই এই বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করার বদলে, তার বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে এবং তার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। যেমন, ১৯৫৬-৫৭ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ যেখানে ছিল ৩১২.৩ কোটি টাকা সেখানে ১৯৬২-৬৩'র পর থেকে এই পরিমাণ সব সময়েই ৪০০ কোটি টাকার উপরে গিয়ে দাঁড়ায় (ঐ, পৃ-৩০৮)। কাজেই বৈদেশিক ঋণের যে অংশ বিদেশী মুদ্রায় পাওয়া যাচ্ছে, তার বিরাট অংশই চলে যাচ্ছে এই বিদেশী ঋণ শোধ করতে। যেমন, ১৯৭০-৭১ সালে ভারত মোট ৭৬৯ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পেয়েছিল। এর মধ্যে ৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছিল আগেকার ঋণের দায় শোধ করতে (অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০।১।৭২)। সুতরাং প্রয়োজন হচ্ছে আরও ঋণের। অর্থাৎ ঋণের দায় শোধ করতে গিয়ে ঋণের ফাঁস গলায় আরও শক্ত করে চেপে বসছে। এই সুযোগ নিয়ে "ভারতের বিদেশী ঋণদাতাদের কেউ কেউ তার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাগুলিকে কমিয়ে দেবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করছে" (চার্লস বেটেলহেম, পৃ-৩১৩)। কারণ? দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নমূলক খাতে বিনিয়োগ করলে তা থেকে দ্রুত মুনাফা আসে না।

কারণ, ভারত থেকে রপ্তানী করা জিনিষপত্র হচ্ছে প্রধানত কৃষিজ কাঁচামাল বা কৃষিজ কাঁচামাল থেকে তৈরী করা দ্রব্য (প্রধানত চা, পাট ও কাপড়) যার চাহিদা-মূল্য অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক সীমিত এবং যে ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। এর বদলে ভারতকে আমদানী করতে হয় প্রধানত ভারতীয় শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও বিশেষ ধরনের শিল্পীয় কাঁচামাল (বিশেষ ধরনের ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি) যার মূল্য অনেক বেশি এবং যেগুলিকে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়। এগুলিকে আমদানী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্যই, যাতে ভারতের বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসে এবং এইসব দ্রব্যের জন্য দেয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করাটা ঋণ নেওয়ার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরিণামে আমরা দেখছি বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা কমার বদলে এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে, ভারতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিই বিদেশী "প্রভুদের" হুকুমে বাতিল হতে চলেছে।

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর হতে হলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিল্পীয় কাঁচামাল দেশের মধ্যেই তৈরী হওয়া দরকার। [illegible] যে কয়েকটি ভারী শিল্প।

কারখানা, রাঁচি, ভূপাল, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি

পাতি তৈরীর কারখানা) তৈরী হয়েছে তা আজও প্রয়োজনের অতি সামান্য অংশ মেটাতে পারে। "ভারতবর্ষ এখনও এইসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত

বেশি রকমভাবে বিদেশী সহায়তার উপর নির্ভরশীল। এর ফলে তার শিল্প বিকাশের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে" (ঐ, পৃ-২৫২)। অন্যদিকে এইসব ভারী শিল্পগুলি বৈদেশিক "সহযোগিতায়" তৈরী হওয়ায় (যেমন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বৃটিশদের 'সহযোগিতায়' রাউড়কেল্লা পঃ জার্মানীর 'সহযোগিতায়', ভিলাই ও বোকারো রাশিয়ার 'সহযোগিতায়' ইত্যাদি) এগুলি নিজেরাই বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ ও শোষণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সাথে সাথেই ব্যাপক জনসাধারণের জন্ত ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলির বিকাশ অন্ত শিল্পগুলির চেয়েও ধীর গতিতে হয়েছে। অথচ অন্যদিকে ভারতীয় শিল্পায়নের আর একটি দিক এক হচ্ছে "বেশ কিছু সংখ্যক এমন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি সেগুলির উৎপাদিত ভোগ্যদ্রব্যের কোন অর্থ নৈতিক গুরুত্ব নেই এবং সেগুলি শুধু অপেক্ষাকৃত বিত্তবান শ্রেণীগুলির কাজে লাগে। এগুলি প্রায়ই অর্দ্ধপ্রস্তুত জিনিষপত্র আমদানী করে থাকে। এই ধরনের শিল্পের অনেকগুলিই বিদেশী পুঁজির সহায়তা নিয়ে স্থাপিত হয়েছে ...এই ধরনের শিল্পের বিকাশ অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ এগুলি আমদানীর প্রয়োজন বাড়িয়ে দেয়।...প্রায়ই চুক্তির ফলে নতুন শিল্পগুলি তাদের বিদেশী সহযোগিতাকারীদের কাছ থেকে আমদানী করতে বাধ্য হয়, যার ফলে স্বদেশে উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়।...এর ফলে এক ধরনের 'নকল-শিল্পোন্নয়নের' জন্ম হয়। আসল শিল্পোন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে আসে এবং তা বন্ধও হয়ে যেতে পারে" (ঐ, পৃ-২৫৩)।

অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সম্পূর্ণভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে এবং "শিল্প উৎপাদন এমনভাবে এবং এমন পরিস্থিতিতে ঘেড়েছে যে,শুধু বর্তমান উৎপাদনের স্তর অব্যাহত রাখতে হলেই ভারত তার অর্থ নৈতিক দায়দায়িত্বগুলি মেটানোর পরে তার রপ্তানীর মাধ্যমে যা দিতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানী করতে হবে (ঐ, পৃ-৩৪৩)।

▭ বিদেশী পুঁজি সরাসরি ভারতের কৃষিক্ষেত্রেও ঢুকে পড়েছে। প্রধানত রাসায়নিক সার, ট্রাক্টর তৈরীর কারখানা ইত্যাদি কৃষিশিল্প স্থাপনের মধ্যদিয়েই এই অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই ধরনের সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিটি শিল্পই বিদেশী 'সহযোগিতায়' তৈরী হয়েছে ('ভারতের সবুজ বিপ্লব, একটি মার্কসীয় মূল্যায়ণ')।

▭ খাদ্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়া থেকেই ক্রমবর্দ্ধমাণ হারে বিদেশের, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানী করা খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই খাদ্যঋণ 'পি. এল. ৪৮০' ঋণ নামে পরিচিত। আমদানীকৃত খাদ্যের পরিমাণ ১৯৫৫ সালে ১৪ লক্ষ টন থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালে এক কোটি টনে এসে দাঁড়িয়েছিল (ঐ, পৃ-১৭৭)। '৫৬-৬৫ এই সময়ের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অর্থাৎ রেশনের (প্রধানত শহরে) শতকরা ৮২.৬% এসেছিল এই আমদানী করা খাদ্য থেকে (বি. এম. ভাটিয়া)। মাঝখানে তথাকথিত "সবুজ বিপ্লবে"র ফলে সাময়িকভাবে গমের উৎপাদন কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৭০-৭১ সালে পি. এল. ৪৮০ অনুযায়ী গম আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই আবার, খাদ্য আমদানী শুরু হয়েছে। স্বভাবতই খাদ্যের উপর এই বৈদেশিক নির্ভরতার মূল কারণ ভারতের খাদ্যোৎপাদন দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। অর্থাৎ তার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। কৃষির ব্যাপারে বিদেশী "সহযোগিতা" সেই খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু চমকদার ভেল্কি দেখিয়ে ("সবুজ বিপ্লবের" মাধ্যমে—যা এসেছিল বিদেশ থেকে আমদানী করা ও বিদেশী "সহযোগিতায়" ভারতে প্রতিষ্ঠিত কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদিত রাসায়নিক সার, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ ইত্যাদির মাধ্যমে—'সবুজ বিপ্লব' দ্রষ্টব্য) অন্তর্ধান করেছে। এই 'সহযোগিতা'র দায় সুদে আসলে ভারতবাসীকে দীর্ঘদিন ধরে শোধ করতে হবে। অন্যদিকে আবার খাদ্য আমদানীর জন্যেও বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে।

বৈদেশিক "সহযোগিতা"র এই নিতান্ত খণ্ডিত অসম্পূর্ণ চরিত্র-চিত্রন আমরা এখানেই শেষ করছি। সম্পূর্ণ চিত্রটি এর চেয়েও অনেক জটিল। এই জটিলতার মূল কারণ আজকের দিনে বিদেশী পুঁজি আর আগেকার মতো গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে স্বনামে খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না। নানা সূক্ষ্ম ও জটিল কৌশলে যতখানি সম্ভব ভারতীয়দের জামা গায়ে দিয়ে সে তার শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অসম্পূর্ণ চিত্র থেকেই এটুকু পরিষ্কার হয়ে আসে—ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে ব্রিটিশ আমলের তুলনায় বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ও নিয়ন্ত্রণ বহুগুণ বেড়েছে। ঋণ—ঋণশোধ—ঋণ এবং নির্ভরতা—নিয়ন্ত্রণ—নির্ভরতা এই দুষ্টচক্রে পড়ে ভারতবর্ষ ক্রমশই আরও বেশি বেশি করে এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে দেশের প্রাকৃতিক ও শ্রমসম্পদ আরও অনেক নিবিড় ও ব্যাপকভাবে বৈদেশিক লুণ্ঠনের শিকার হচ্ছে এবং অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজ, জাতীয় স্বার্থের বদলে বিদেশী স্বার্থের উপযোগী করে পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ তার বিকাশের সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিদেশী "সহায়তা"র উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ভারত সরকার ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের ক্ষমতা নেই (যদিও শেষোক্তরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা কামাচ্ছে) বিদেশী পুঁজির বিরোধিতা করে কৃষি, শিল্প ও জাতীয় অর্থনীতির

সর্বাঙ্গীন বিকাশের কোনো উদ্যোগ নেয়। "বিদেশী সরকারি ভাণ্ডার থেকে ক্রমবর্দ্ধমাণ হারে সাহায্য নেওয়ার ফলে ভারতবর্ষ তার অর্থনৈতিক নীতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলির ব্যাপারে বিদেশী শক্তিগুলির সাথে অলিখিত চুক্তিতে আসতে বাধ্য হচ্ছে" ( চার্লস বেটেলহেম, পৃ-২৬৪ )। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি আজ প্রধানত বিদেশের অদৃশ্য ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে।

ঘটনাগতভাবে আমরা দেখছি, শিল্পায়নের কিছু চমকপ্রদ কার্যক্রম নেওয়ার পরও এবং কিছু কিছু শিল্প গড়ে ওঠা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ভারতের মতো আজকের ভারতেও আধুনিক শিল্প দেশের অর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে রয়েছে। দেশের কর্মরত জনসংখ্যার মাত্র ৪% (৮০ লক্ষ) আধুনিক শিল্পের সাথে যুক্ত। সেই শিল্পও ভারসাম্যহীন এবং জাতির সামগ্রিক স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অন্যদিকে ৭০% কর্মরত মানুষই (১৩.১১ কোটি) রয়েছেন কৃষির সাথে যুক্ত। অর্থাৎ ভারত মূলত একটি কৃষিনির্ভর দেশ হয়েই রয়েছে। অথচ কৃষির ক্ষেত্রেও বহু বাগাড়ম্বরপূর্ণ পরিকল্পনা নেওয়া সত্ত্বেও তার উৎপাদন, বিশেষত খাদ্যোৎপাদন আদৌ দেশের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। উভয় ক্ষেত্রেই আপাতভাবে এই সংকটজনক অবস্থা কাটাবার জন্যই বৈদেশিক "সহায্যে'র আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই "সাহায্য" সেই সংকট তো কাটায়ইনি বরং তাদের বিকাশকে আরও ব্যাহত করেছে এবং স্থায়ীভাবে বিদেশের উপর নির্ভ..তা অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি প্রস্তুত করেছে।

সামগ্রিকভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল এই অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ভারতের কৃষিক্ষেত্রের ভিতরের চেহারাটা কি? আপাতভাবে ব্রিটিশ ভারতের প্রচলিত ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে সারা দেশ জুড়েই অসংখ্য ভূমিসংস্কার আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে পুরোনো কায়দার জমিদার আর নেই। রাষ্ট্রই এখন ভূমিরাজস্বের সংগ্রাহক। একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কত পরিমাণ জমি রাখতে পারে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কৃষক যাতে তার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, সার, বীজ ইত্যাদি সহজে সংগ্রহ করে উন্নত প্রথায় চাষ করতে পারে, খাদ্যশস্যের ন্যায্যমূল্য পায় এবং তাকে যেন গ্রামীন মহাজন, খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করতে না হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারী উদ্যোগে "সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প", 'কৃষি সমবায়', "বাজার সমবায়" "সমবায় ব্যাঙ্ক", ইত্যাদি নানা ধরনের প্রকল্প প্রচুর বাজনাবাদ্যি সহকারে প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এর ফলে কি হয়েছে? আসল মালিকানা স্বত্ব ও নানাধরনের পরগাছাকেন্দ্রিক কৃষি ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি? এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে :

"সম্পত্তির সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্কের কোনো আমূল পরিবর্তন আসে নি বরং তা এখনও কৃষির বিকাশকে ব্যাহত করছে। এখনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবস্থাটা হচ্ছে, যারা জমি চাষ করে তাদের চাষের উন্নতি, বিকাশ বা তাতে বিনিয়োগ করার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। কারণ এ থেকে জমির মালিক অথবা ঋণদাতাদেরই লাভ হবে। কৃষকরা এখনও গভীরভাবে ঋণের মধ্যে ডুবে আছে এবং কৃষকের আয় যত বাড়ে ঋণদাতারা তত বেশি দাবি করে।

"গ্রামীন ঋণদান ব্যবস্থায় এখনও পেশাদারী মহাজনদের আধিপত্য চলছে। তারা অত্যধিক উঁচু হারে সুদ দাবি করে। এই হার অর্থনীতির আধুনিক শিল্পীয় খাতে চালু হারের তুলনায় সম্পূর্ণভাবে মাত্রাবহির্ভূত। মহাজনদের স্থানীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার জোরেই তারা এই হার অব্যাহত রাখছে। সমবায়ের বিকাশ এখনও এই পর্যায়ে যায় নি যে,তা এই একচেটিয়া ব্যবস্থা ভেঙে দিতে পারে। সুদের হার এইরকম উঁচু হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিনিয়োগের এক বিরাট অংশ অ-লাভজনক হয়ে পড়ে ..

"দামের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করে। যদি উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাতে দাম বেশি পড়ে যায় তবে এই ধরনের প্রচেষ্টা আর্থিক ধ্বংসকে ডেকে আনতে পারে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা, যাদের হাতেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কৃষকদের ঠিক এই ধরনের একটি ফলাফলের কথা বলেই ভয় দেখায়। মূল্যমানের অনিশ্চয়তা এবং তার ফলে দ্রুত লাভের সুযোগ উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টার চেয়ে ব্যবসাদারী কার্যকলাপকেই অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে, বিশেষ করে ধনী কৃষকদের কাছে, যারা তাদের সঞ্চয় পণ্য গুদামজাত করার কাজে লাগায়। কৃষির দ্রুত বিকাশের জন্য মূল্যমানের অধিকতর নিশ্চয়তা প্রয়োজন।…

"উৎপাদককে যদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ফসল বিক্রি করে দিতে হয় তবে তার দিক থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা 'গড় বাজার দর নয়', সেটা হচ্ছে ফসল কাটার পড়েই, এমনকি তার আগেই সে আসলে কি দাম পাচ্ছে। এই আসল দাম বাজার দরের চেয়ে শতকরা ১০ বা ২০ ভাগ কম হতে পারে" ( ঐ, পৃ-২১৮-২৩২ )।

এ সম্পর্কে শাসক দলের একজন প্রাক্তন কেন্দ্রিয় মন্ত্রী শ্রী কে. ডি. মালব্য আরও খোলাখুলি বলেছেন—

"ভূমি সংক্রান্ত আইন, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সমবায়… ইত্যাদির কার্যকরীতা সম্পর্কে গত দশ বছরে যে অসংখ্য সরকারী ও

বেসরকারী অনুসন্ধান চালান হয়েছে সেগুলি বিতর্কাতীতভাবে দেখিয়ে যে গ্রামীন জনসংখ্যার উচ্চ স্তরটিই প্রধানত এগুলির দ্বারা উপকৃত হয়েছে, গ্রামীন জনসাধারণ নয়।

"এই সর্বোচ্চ স্তরের ভূস্বামীরাই গ্রামাঞ্চলের আধিপত্যকারী শ্রেণী। এরা হল পুরোনো জমিদার, তালুকদার, মালগুজার ইত্যাদি, যারা এখনও বিশাল বিশাল…জমির মালিক হয়ে আছে এবং যে জমিগুলি তাদের ব্যক্তিগতভাবে চাষ করার কথা; রায়তারী অঞ্চলের বড় বড় ভূস্বামী ও কৃষকদের সবচেয়ে উপরের স্তরটি, যারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আসলে জমিতে নিজেরা কাজ করে না বরং বে-আইনী-ভাবে জমি ভাড়া দিয়ে, হাড়ভাঙা খাজনা আদায় করে এবং কৃষি শ্রমিকদের শোষণ করে পুরানো জমিভিত্তিক পরগাছাদের মতোই বিশাল পরিমাণ অ-উপার্জিত অর্থ হস্তগত করে। এরা সবাই প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে শহরে, বাণিজ্যিক ও মহাজনী পুঁজির সাথে যুক্ত। এদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে কৃষিজমির অর্ধেকের চেয়েও বেশি অংশের উপর এদের মালিকানা স্বত্ব। অন্যদিকে আসল কৃষকদের ৮০% চেয়েও বেশি অংশের হাতে রয়েছে ১৫% চেয়েও কম কৃষিজমি।

"এইসব বড় ভূস্বামীরাই সমবায় সমিতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, পঞ্চায়েত ও স্থানীয় সমিতির উপর আধিপত্য করে। এবং এরাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও অন্যান্য সরকারী ব্যবস্থাগুলির থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পায়।

"গত এক দশকে পরিচালিত অসংখ্য গ্রামীন সমীক্ষাগুলি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে কৃষি-সংস্কার কার্যকরী করতে গিয়ে— যারা চাষ করে তাদের হাতে জমি দেওয়া—এই মৌলিক লক্ষ্যটি অর্জন করা যায়নি। সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের একটি দিকে অর্থ-নৈতিক শক্তির কেন্দ্রিভবন (জমি, গবাদি পশু, চাষের যন্ত্রপাতি, মূলধন ইত্যাদি রূপে) ও অন্যদিকে দারিদ্র - এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে। গ্রামীন জনসংখ্যার শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ মোট জমির প্রায় অর্ধেক অংশের মালিক। অন্যদিকে শতকরা ৪০ ভাগের হয় কোনো জমি নেই, নয় দু'একরের চেয়েও কম জমি রয়েছে, যার অর্থ তারা এক আশারচিহ্নহীন দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে।"
(সোসালিস্ট কংগ্রেসম্যান, ১।৫।৬৪ ; ঐ, পৃ-২৩১ এ উদ্ধৃত)

এই হচ্ছে তা'হলে অবস্থা। সরকারী পরিকল্পনার ফলে ভূমি সম্পর্কের বহিরঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আগে ছিল না এরকম কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার জন্ম হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু এসবই কৃষি ব্যবস্থার পরগাছাকেন্দ্রিক চরিত্রকে পাল্টে দেওয়ার বদলে, তাকেই আরও শক্তিশালী করেছে। আইন-কানুন ও প্রকল্পের ঘোষিত উদ্দেশ্যের ফলাফল ঠিক উল্টো হতে পারল কি করে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় আমরা এখানে যাবো না। কিন্তু এই ফলাফল যে একটা সত্য তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা দেখি জমি থেকে উৎখাত হওয়ার, অর্থাৎ কৃষকদের ক্রমাগত নিঃস্ব হওয়ার প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত আছে। যেমন, সরকারী লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী ১৯৫১ সালে যেখানে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ছিল ২·৭৫ কোটি সেখানে ১৯৬১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩·১৪ কোটিতে। অর্থাৎ ১০ বছরে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি ঋণের জালে জড়িয়ে ভূমিদাসত্ব প্রথাও অবাহতভাবে চলছে। যেমন,

"পালামৌ জেলার বাঁকা এলাকার ১৪ জন সুদখোরের বাড়িতে ১০০ জনের মত মজুরকে আজও বিনা মজুরীতে বেগার খাটতে হচ্ছে। বিহারের দায়িত্বশীল ও জনপ্রিয় সংবাদ সাপ্তাহিক 'রাঁচি এক্সপ্রেসের' সর্বশেষ সংখ্যায় এই মর্মে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।...

"একজন ১৫সের শস্য—আটা বা চাল ধার নিয়ে এক সুদখোরের বাড়িতে বিনা মজুরীতে ৩৫ বছর বেগার খেটেছে। তার ছেলেও সে বাড়িতে বেগার খাটছে। আরেকজন শ্রমিক ১৭৫ টাকা ধার নিয়ে গত ১২ বছর হল এক বাড়িতে বেগার খাটছে। আরেকজন ৯১ টাকা ধার নিয়ে গত ২০ বছর বেগার খাটছে। অন্য আরেকজন ১০৪ টাকা ধার নিয়ে গত ১৬ বছর বেগার খেটে চলেছে।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা ১২।৭।৭৩)

সুতরাং আমরা দেখছি রাজনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রে অনেক পরি-বর্তন হলেও ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল দুটি বৈশিষ্ট্য—বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ বা বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা এবং পরগাছা-কেন্দ্রিক ভূমিব্যবস্থা—আজও অব্যাহত আছে। যদিও বাইরের চেহারার দিক থেকে দুইয়ের বেলাতেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে এক দিকে বৈদেশিক ও দেশীয় শোষণের মধ্যদিয়ে ও অন্যদিকে দুর্বল অর্থনৈতিক বিকাশ রুদ্ধ করে দিয়ে ক্রম-বর্দ্ধমান হারে ভয়াবহ দারিদ্রের জন্ম দেয় এবং এইভাবে দুর্ভিক্ষের পটভূমি সৃষ্টি করে (আক্ষরিক অর্থে সব সময় দুর্ভিক্ষ হোক আর নাই হোক) তাও আমরা ব্রিটিশ ভারতের আলোচনাতেই দেখেছি। স্বভাবতই এখানেও মূলত সেই একই প্রক্রিয়াটিই যে চলছে তার প্রমাণ হিসাবে আজকের ভারতের বৈদেশিক ও দেশীয় শোষণ এবং অবরুদ্ধ ও ভারসাম্যহীন বিকাশের সংক্ষিপ্ত চিত্রও আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি।

কাজেই দুর্ভিক্ষের কারণ ও উৎসগুলি ব্রিটিশ ভারতের মতোই আজও একইরকম আছে। বন্যা, খরা, কালোবাজারী, মজুতদারী ইত্যাদি, অর্থাৎ যেগুলিকে কারণ হিসাবে উপস্থিত করা হয় সেগুলি উপলক্ষ্য এবং আশু কারণ মাত্র। সামগ্রিক অর্থনৈতিক পটভূমিটি না থাকলে এই কারণগুলির কোনো ভূমিকাই থাকতো না। এমনকি, এই কারণগুলির জন্ম হতো না। কাজেই দুর্ভিক্ষের সমস্যার স্থায়ী সমাধান, দারিদ্র্যের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের অর্থ একই সাথে বৈদেশিক ও দেশীয় শোষণের অবসান এবং জাতীয় অর্থনীতির অবরুদ্ধ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া। আর তা দিতে গেলে চাই বিদেশী নিয়ন্ত্রণ ও পরগাছাকেন্দ্রিক ভূমিব্যবস্থার অবসান। অর্থাৎ এমন এক বিশাল বিকল্পব্যবস্থার প্রবর্তন যেখানে এই দুইয়েরই কোনো ভূমিকা থাকবে না। দেশের প্রাকৃতিক ও শ্রম সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেশের মানুষেরই থাকবে। অন্যদিকে পরগাছাবৃত্তির কোনো সুযোগই সেখানে থাকবে না। উৎপাদনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে ও বৃদ্ধিতে যাদের অবদান থাকবে তারাই উৎপাদিত সম্পদ ভোগ করতে পারবে। এছাড়া অন্য কোনো সংক্ষিপ্ত বিকল্প নেই। কিন্তু কি করে হবে এই কাজ? কোথায় বাধা? স্বভাবতই যারা এই ব্যবস্থা থেকে সুবিধা ভোগ করছে তারাই এই পরিবর্তনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কারা তারা? আমাদের উপরের আলোচনা থেকেই বেরিয়ে আসছে তারা হল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, তাদের সহযোগী ও নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের বড় বড় পুঁজিপতি (যারা বিপুল মুনাফা কামালেও দেশের প্রকৃত শিল্পোন্নয়নে অক্ষম বলে নিজেদের প্রমাণ করেছে) ও ভূমিব্যবস্থার পরগাছারা। ঘটনা প্রমাণ করছে আমাদের দেশের রাষ্ট্র ও সরকার এই শক্তিগুলিরই স্বার্থ রক্ষা করছে এবং তাদের প্রকৃত ভূমিকা আড়াল করার চেষ্টা করছে। কি করে এই বাধা অপসারিত হবে? সেই পথ সন্ধানই আজ আমাদের পরমতম কর্তব্য। বর্তমান ব্যবস্থার প্রবর্তনের শুরু থেকেই অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের গোড়া থেকেই আজ পর্যন্ত বহু ভারতীয় দেশপ্রেমিক আকুলভাবে এই পথ সন্ধান করেছেন ও করছেন। এই ব্যবস্থার যাঁরা নিষ্ঠুরতম শিকার—সেই অগণিত শ্রমজীবী মানুষ সচেতন বা অসচেতনভাবে এই বাধাগুলি সরানোর কাজে সরাসরি আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে এই ব্যবস্থার সুবিধাভোগী ও রক্ষকদের হাতে হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছেন। তবুও যে আজও পর্যন্ত এই প্রার্থিত পরিবর্তনের সূচনা হয়নি তার মূল কারণ সঠিক পথের পূর্ণসন্ধান সম্ভবত এখনও আমরা পাই নি। কিন্তু সামগ্রিক পরিবর্তনের এই পথ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। আমাদের দেশের বিগত দিনের ইতিহাস প্রমাণ করছে যে এছাড়া দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার নিষ্ঠুর মুঠি থেকে চিরতরে মুক্ত হবার আর কোনো বিকল্প নেই।

---

**টীকা:** বৃটিশ ভারতের কৃষিব্যবস্থা প্রসঙ্গে আমরা সরাসরি বৃটিশ প্রশাসনাধীন অঞ্চলগুলির কথা বলেছি। এছাড়াও আর, এক ধরনের অঞ্চল ছিল যেগুলিকে আশ্রিত করদ রাজ্য বলা হত। এইসব জায়গায় প্রাক্-বৃটিশ রাজা-মহারাজারাই বৃটিশের কাছে বশ্যতা স্বীকারের শর্তে বৃটিশ রাজমুকুটের পরিচালনাধীনে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে শাসন চালাবার সীমিত ক্ষমতা উপভোগ করত। এইসব জায়গাগুলির ভূমিসম্পর্কের চরিত্র মূলগতভাবে অন্য অঞ্চলের মতোই, অর্থাৎ পরগাছা ভিত্তিক ছিল, যদিও রূপের দিক থেকে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। বৃটিশ শাসনের অবসানের পর (অর্থাৎ ১৯৪৭ এর ১৪ই আগষ্টের পর) এগুলিকে ভেঙে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রবদ্ধ প্রশাসনের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

**রচনাটিতে (ভারতে দুর্ভিক্ষ: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা) ব্যবহৃত সূত্র সম্পর্কে:**

এক ॥ রজনী পাম দত্ত (আর. পি. ডি); 'ইণ্ডিয়া টুডে' (মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭০): ১৯৪০ সালে বইটি গ্রেট ব্রিটেন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সময় ভারতবর্ষে বইটি নিষিদ্ধ ছিল। শ্রীদত্ত সমসাময়িক অর্থনীতি, রাজনীতি ও ইতিহাসের উপর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ছিলেন। ইনি গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টিরও অন্যতম নেতা ছিলেন। অল্পকিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন।

দুই ॥ বি, এম. ভাটিয়া; (ক) 'ফেমিনস্ ইন ইণ্ডিয়া' (এশিয়া পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৬৩), (খ) 'ইণ্ডিয়াস ফুড প্রব্লেম এণ্ড পলিসি সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' (সোমাইয়া পাব্লিশিং হাউস, বোম্বে, ১৯৭১): প্রথম বইটি ডক্টরেট উপাধির জন্য জমা দেওয়া লেখকের গবেষণাপত্র। শ্রীভাটিয়া বিভিন্ন সুপরিচিত পত্রপত্রিকার (যেমন, দি ষ্টেটসম্যান, কলকাতা) নিয়মিত অর্থ নৈতিক ভাষ্যকার।

তিন ॥ কালীচরণ ঘোষ; 'ফেমিনস্ ইন বেঙ্গল ১৭৭০-১৯৪৩' (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৪): শ্রীঘোষ কলকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের একজন ভূতপূর্ব সুপারিণটেণ্ডেন্ট।

চার ॥ "ভারতের সবুজ বিপ্লব" (লালতারা প্রকাশনী; ১৫০ মুক্তরাম বাবু ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭, ১৯৭৪): এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির রচয়িতা একদল সমীক্ষা-কর্মী। পুস্তিকাটিতে 'সবুজ বিপ্লবে' বিভিন্ন শিল্পোন্নত বৈদেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা ও 'সবুজ বিপ্লবে'র সামগ্রিক চরিত্র ও ফলাফল সম্পর্কে তথ্য নির্ভর আলোচনা করা হয়েছে।

পাঁচ ॥ চার্লস বেটেলহেম; 'ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' Macgibbon & Kee, Londan, 1968 লেখক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফরাসী অর্থনীতিবিদ। ইতি ভারতবর্ষেসরেজমীন তদন্তের ভিত্তিতে এই পুস্তকটি রচনা করেছেন।

# ৪. "ক্ষুধা"র বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধের একটি কাহিনী

●[ নীচের রচনাটি জোসুয়া ডি কাস্ত্রোর লেখা 'দি ব্লাক বুক অব হাঙ্গার' বইটি থেকে নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল উন্নতির যুগেও যে ক্ষুধা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জীবনকে শুষে নিচ্ছে—দুর্বল সেই আদিম শত্রুর শক্তির উৎসটি কোথায়, কারা বাঁচিয়ে রেখেছে একে, এর ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য—এক কথায়, ক্ষুধার সমস্যার একটি সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পৃথিবীর যে কয়জন ( অল্প সংখ্যক ) ব্যক্তি করেছেন, ব্রাজিলের বিজ্ঞানী ডি কাস্ত্রোকে ( জন্ম—১৯০৮ সাল ) তাঁদের অন্যতম নায়ক বলা চলে। ১৯৭০ সাল অবধি তিনি রিও ডি জেনারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিউম্যান জিওগ্রাফি' বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫২ সালে তাঁর লেখা 'দি জিওগ্রাফি অব হাঙ্গার' বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'ক্ষুধা সম্পর্কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিশেষজ্ঞ' হিসাবে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হন। এই বইটি ছিল ক্ষুধার ওপর বিশ্বের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা-গ্রন্থ। এতে তিনি দুনিয়াব্যাপী ক্ষুধার সমস্যাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে, এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে দারিদ্র ও ক্ষুধার মূল কারণ হল ঔপনিবেশিক শোষণ। সেই সাথে এও তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, মানবজাতির এই বিভৎস শত্রুটিকে চিরতরে পরাস্ত করা সম্ভব। যে সব নয়া মালথুসপন্থীরা 'প্রমাণ' করতে চায় যে ক্ষুধা অবশ্যম্ভাবী এবং এর বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই—তাদের এই 'তত্ত্ব' অসার, যুক্তিহীন এবং অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে ডি কাস্ত্রোর লেখা এই বইটিতে। দু'দশক ধরে ডি কাস্ত্রো ক্ষুধার বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছেন, তারই ফলশ্রুতি হল 'দি ব্লাক বুক অব হাঙ্গার'।

১৯৫২ থেকে '৫৬ সাল পর্যন্ত ডি কাস্ত্রো জাতিপুঞ্জের (UNO) 'ফুড এণ্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন' (FAO) বিভাগের কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন। পরে তিনি এই পদ থেকে ইস্তফা দেন। কারণ, তাঁর নিজের কথায়, "FAO সমস্যাটার মর্মবস্তুতে না গিয়ে শুধু এর বাইরের দিকটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চায়। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করার মতো সৎ সাহস তার নেই বলে সমস্যা সমাধান করার দিকে সে এগোতেও চায় না।"

১৯৫৭ সালের জানুয়ারীতে তিনি ফাদার জোসেফ লেব্রে, অ্যাবে পিয়ের, Raymon Scheyven, লুইস মায়ার, কুও-মো-জো, পল মার্টিন, লর্ড বয়েড অর, টাইবর মেণ্ডে, আলবার্ট ৎসুইৎসার, ম্যাক্স ফাবিচ, রেনে দুমঁ প্রভৃতি পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও মানবতাবাদীদের নিয়ে ASCOFAM ( ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন ফর দি স্ট্রাগল এগেনস্ট হাঙ্গার ) নামে একটি সংগঠন করেন। ASCOFAM ও তার সংশ্লিষ্ট শাখা-সংগঠন IRAM, I''FED ও ICD—পৃথিবীর মানুষকে এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

বীঃ সঃ দঃ ]●

শত শত বছর ধরে ক্ষুধার যে প্রেত চীনের সুবিশাল অঞ্চলকে আতংকিত করে রেখেছিল, তার অধিবাসীদের রক্ত শুষে দুর্বল করে রেখেছিল—তাকে আজ নতুন চীন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছে। এই ঘটনা—মহাকাশ বিজয় বা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপনের মতোই যুগান্তকারী এবং বিস্ময়কর একটি ঘটনা। চীনের বুকে আজকে যা ঘটছে তা কয়েকটি দিক থেকে সম্ভবত ওপরের ঘটনাগুলোর চাইতেও বেশি উল্লেখযোগ্য।

'স্পুটনিক'গুলোর ( চীনের কিছু নির্বাচিত অঞ্চল যেখানে কৃষির নব উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয় ) সাফল্য, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশের সাক্ষর—এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা অপ্রত্যাশীত কিছু নয়। বরং যা অভাবিত, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবং গোটা বিশ্বের প্রচলিত ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে যা সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন তা হল, দুর্ভিক্ষের দেশ, মহামারীর আবাসভূমি বলে সারা দুনিয়া যাকে জেনে এসেছে, সেই চীন কিভাবে এই আলৌকিক ঘটনা সম্ভব করলো ?

কে না জানে, পৃথিবীর সব চাইতে জনবহুল দেশ চীনকে ৭০ কোটি মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে হয় ? কে না জানে, চীনের ভূখণ্ড চিরদিন বন্যা-খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে এসেছে—যে দুর্যোগ কোটি কোটি মানুষের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে বার বার ? বিশৃংখলা ও অনগ্রসর অর্থনীতির মধ্যে কি চীন চিরদিন আটকা ছিল না ? তাহলে কি করে এটা বিশ্বাস করা সম্ভব যে, কোনো অলৌকিক শক্তির সাহায্য ছাড়াই চীন তার অতীতের বিশৃংখল অবস্থার থেকে সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ; ছুঁড়ে ফেলেছে সেই ক্ষুধার জোয়াল যা এতোদিন ধরে তার কাঁধে চেপে বসেছিল ? এটাই হল সেই বিস্ময়কর ঘটনা যা বিগত ১৮ বছরের মধ্যে চীনের বুকে ঘটেছে। পশ্চিমী দুনিয়া যা কল্পনাও করতে পারেনি, তাকেই সম্ভব করে তুলেছে চীন। এবং সেই সাথে সাথে প্রমাণ করেছে, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক বিকাশ সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়ার তত্ত্ব এবং ধ্যানধারনাগুলো কতখানি ভ্রান্ত ও অবাস্তব।

ক্ষুধার ওপর এই বিজয়, নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পাতায় একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা। যে সমস্ত বাস্তব উপাদান এই ঘটনাকে সম্ভব করে তুললো সেগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা এমন কিছু মূল্যবান শিক্ষা পেতে পারি যার প্রয়োগের দ্বারা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে ( যাঁদের 'অনুন্নত দেশগুলোর' অধিবাসী বলা হয় ) ক্ষুধার কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

পৃথিবীর আর কোনো দেশেই ক্ষুধা এতো কঠোরভাবে মানব-গোষ্ঠীর আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি, যতটা চীনে করতে পেরেছিল। চীনের গোষ্ঠীগত প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক বিধি-বিধান বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়—নিরন্তর খাদ্যাভাব এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম প্রাচীন চীনে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে তার সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মগুলোর ওপর কি বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। এটাও সত্যি যে পৃথিবীর আর কোনো অংশেই মাটির বুক থেকে খাবার ছিনিয়ে আনতে মানুষকে এতো বেশি বিরুদ্ধ-শক্তির মোকাবিলা করতে হয় নি। জমি ও জলবায়ুর সাথে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা যা ত্রুটিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থারই ফলশ্রুতি—এই দুটো প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধেই চীনের মানুষকে লড়াই করতে হয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে প্রাকৃতিক কারণগুলো যেমন, কৃষিউপযোগী জমির স্বল্পতা, জলের অনুপযুক্ত বণ্টন, খরা এবং বন্যা চীনের বুকে ক্ষুধার রাজত্বকে স্থায়ীভাবে কায়েম করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলোকে প্রধান কারণ বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলোই ছিল এরজন্য মুখ্যত দায়ী।

আমার লেখা 'দি জিওগ্রাফি অব হাঙ্গার' বইটিতে আমি এই কথাটার ওপর জোর দিয়েছি যে, তথাকথিত জমির অপ্রাচুর্য এবং খরা-বন্যার ধ্বংসাত্মক প্রভাব, আসলে প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার অনুপযুক্ত প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অকর্মণ্যতাকেই প্রকাশ করে। এক দিকে যেমন চীনের ধারাবাহিক দুর্ভিক্ষ সামন্ততন্ত্র এবং কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিরই ফলশ্রুতি, অন্যদিকে আবার, পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে তার সংস্পর্শ অবস্থার উন্নতি করাতো দূরের কথা—তাকে আরো শোচনীয় করে তুলেছিল। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ আফিম-যুদ্ধ ( Opium-War ) ও নানকিং-সন্ধির পরবর্তীকালে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ চীনের আভ্যন্তরীণ কলহগুলোকে উৎসাহ দিতে শুরু করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করে। সাথে সাথে তারা চীনের স্বাধীন শিল্পবিকাশের পথটি রুদ্ধ করে দেয় যার ফলস্বরূপ, জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। প্রাক-বিপ্লব চীনের ধারাবাহিক দুর্ভিক্ষের এটাই হল অন্যতম কারণ। সত্যি কথা বলতে কি, উপনিবেশবাদের অমানবিক অর্থনৈতিক শোষণ-পদ্ধতিই ছিল চীনের অর্থনৈতিক বিশৃংখলা এবং ক্ষুধার মূল কারণ যা বিপ্লবের পূর্ববর্তী কালে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে চীনের বুকে রাজত্ব করেছে।

স্থায়ী এবং নিরন্তর ক্ষুধার ( একঘেয়ে অথচ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়—এ ধরনের খাদ্যাভাবের ফলশ্রুতি ) থেকে শুরু করে—দুর্ভিক্ষের তীব্র ক্ষুধা অর্থাৎ মানুষকে যত বিভিন্ন ধরনের ক্ষুধার কবলে নিক্ষেপ করা সম্ভব, চীনের জনগণকে তার সব ক'টিই সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিটি প্রকারের বিপুলায়তন তথ্য এই বক্তব্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

পুষ্টির ঘাটতি অর্থাৎ শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগানোর মতো উপাদানের অভাব—দেশের প্রতিটি অংশে, প্রতিটি ভৌগলিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটা সাধারণ ঘটনা ছিল।

উষ্ণ এবং আর্দ্র দক্ষিণ চীনে, যেখানে চাল উৎপন্ন হতো, দুর্ভিক্ষ সেখানেও যেমন ব্যাপক ছিল ঠিক তেমনিই ব্যাপক ছিল শুকনো ও ঠাণ্ডা উত্তর চীনে যেখানে জন্মাতো গম, মিলেট, সরগাম ও সোয়া। এছাড়াও, চীনের এই দুটো অঞ্চলকে আর একটি বিশেষ ধরনের ক্ষুধার কবলে স্থায়ীভাবে বাস করতে হতো—মানব শরীরের এই প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুধাটি হল : প্রয়োজনীয় পৌষ্টিক পদার্থের, বিশেষত প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের অভাব।

নিরবচ্ছিন্ন ক্ষুধার যে ভয়াবহ পরিস্থিতি চীনা জনগণের সাংগঠনিক ও সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে ভারী পাথরের মতো চেপে বসেছিল সেটাই শেষপর্যন্ত হয়ে উঠলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিদ্রোহ এবং জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণের এক বিপুল উৎস। নবজাগ্রত এই জাতীয়তাবোধের উচ্চতম আকাংখা ছিল, দেশীয় অর্থনীতির স্বাধীনতা এবং ক্ষুধার কবল থেকে মুক্তি।

ক্ষুধা যে সামাজিক অবিচারেরই ফলশ্রুতি—এই বাস্তবতার সম্মিলিত উপলব্ধিই চীনা জনগণকে সমাজবিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে দৃঢ় সংকল্প ও সাহস জুগিয়েছে। যে ক্ষুধাকে পশ্চিমী শক্তিরা চীনের মাটিতে নিজেদের সহযোগী শক্তি হিসেবে এতোদিন মদৎ জুগিয়ে এসেছিল, সেই ক্ষুধাই সহসা তাদের ভয়ংকর শত্রুতে পরিণত হল। ক্ষুধাই ছিল—চীনা গণমুক্তিফৌজের মহান রিক্রুটিং অফিসার (Recruiting Officer)। বিপুল পরিমাণ খাজনার বিনিময়ে যে উপোসী কৃষকরা বৃহৎ জমিদারদের কাছ থেকে জমি চাষ করার অনুমতি পেতো তারাই গড়ে তুলেছিল মাও ৎসে তুং-এর পার্টিজান বাহিনী ( যা রচনা করেছিল চীনা গণমুক্তিফৌজের দুই-তৃতীয়াংশ )। মাও ৎসে তুং এই

সামাজিক সত্যটিকে সঠিকভাবে দেখতে পেরেছিলেন। আর তাই, তিনি বিপ্লবের সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে কৃষকদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রশ্নটিকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছিলেন। তখনকার চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাই কৃষকদের এই ভূমিকাটিকে সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ক্ষুধার নিগড়ে বাঁধা কৃষকদের কাছে জমির মালিকানা পুনর্বন্টন করে তাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মাও সে তুং।

বস্তুত, বিপ্লবের শুরু থেকেই বৃহৎ জমিদারদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বন্টন করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের বিজয়লাভ এবং চীনা জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণার পর সরকার প্রথম যে কার্যসূচীটি হাতে নিলেন তা হল কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি করা, যাতে চীনা জনগণ ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। যে কৌশল, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও উদ্দীপনার সাথে চীনে এই কৃষিবিপ্লবের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তা আশাতীত সাফল্য লাভ করে।

১৯৪৯ সালে চীনের খাদ্য-শস্যের উৎপাদন মাত্রা ভীষণভাবে কমে গিয়ে ১১ কোটি টনে দাঁড়িয়েছিল। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের আগে এর পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টন। জাপানের সাথে যুদ্ধ এবং কুয়্যো মিংটাং সরকারের অপদার্থতাই কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ ছিল।

নতুন সরকারের প্রবর্তিত কৃষিব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল সংস্কার নিয়ে এসে উৎপাদনমাত্রাকে দ্রুত বাড়িয়ে তুললো। ১৯৫২ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ১৬·৩ কোটি টন, '৫৬ সালে ১৮ কোটি টন এবং '৫৭ সালে ২০ কোটি টন - অর্থাৎ মাত্র সাত বছরের মধ্যে চীন তার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দু'গুণ বাড়িয়ে তুললো। এই ক'বছরে চীনের গড় উৎপাদন-বৃদ্ধির হার ছিল, প্রতি বছরে শতকরা ৮ ভাগ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর কাছে এটা ছিল একটা দারুণ বিস্ময়, কারণ তারা সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও উৎপাদনবৃদ্ধির হারকে ৩% এর ওপরে তুলতে পারেনি।

এতেই শেষ নয় - চীনের মানুষরা যাকে 'গ্রেট লীপ' (Great Leap) বলে অভিহিত করে থাকে, কৃষিউৎপাদনের ক্ষেত্রে সেই বিস্ময়কর সাফল্য সংঘটিত হল ১৯৫৮ সালে। মাত্র এক বছরের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলো শতকরা ৩৫ ভাগ। এই বিস্ময়কর উৎপাদনবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস পাওয়া (উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার ফলে যা সম্ভব হয়েছিল) চীনের জনসাধারণের পৌষ্টিক মানকে বহু গুণ উন্নত করে। ১৯৫৭ সালে চীন দেখে এসে আমার এই প্রত্যয় হয়েছিল, পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলোতে বিপজ্জনক সংখ্যায় খাদ্যাভাবের যে সনাতন ঘটনাগুলো দেখতে পাই তা অত্যন্ত—সে রকম একটিও ঘটনা চীনে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

অতীতে চীনের শিশুদের মধ্যে স্থায়ী ক্ষুধার লক্ষণগুলো, যেমন রোগা-অপুষ্ট শরীর, চোখ-মুখের অসুখ, চামড়া মোটা হয়ে যাওয়া, মাড়ী থেকে রক্ত পড়া, হাড়ের বিকৃতি ইত্যাদি—এতো বেশি বেশি করে চোখে পড়তো যে এগুলোকে একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। চীনে এরকম শিশুরা এখন দুর্লভ বললেই চলে।

বিখ্যাত পুষ্টিবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক লি চিংহান (Li ching-han) তাঁর সংগৃহিত যে তথ্যগুলো আমার হাতে তুলে দিয়েছেন সেগুলো আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের চাইতেও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। চীন জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার আগে ও পরের সময়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েছিলেন। অধ্যাপক লি'র তথ্যগুলোকে আমি সমস্ত সন্দেহের উর্দ্ধে বলে ধরতে পারি, কারণ প্রথমের দিকে তিনি বিপ্লবের বিরোধিতা করে বহু বছর ধরে আমেরিকাতে 'ফ্রাঙ্কলিন লি' এই নামে বসবাস করেছিলেন এবং পরে FAO'র (Food and Agriculture Organisation—UNO) হয়ে কাজ করেছিলেন।

চীনে সমাজতন্ত্র কায়েম হবার পর কৃষকের দৈনিক খাদ্যতালিকায় যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন অধ্যাপক লি লক্ষ্য করে ছিলেন তা তাঁকে রীতিমতো বিস্মিত করেছিল। বিপ্লবের আগে কৃষকের খাদ্যের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগই ছিল—মিলেট, সরগাম (Sorghum) বা কায়োলিং (Kaoling)-এর মতো শক্ত শস্য। বাকি ৫% ভাগ কোনো রকম টেনেটুনে পূরণ করা হতো চাল দিয়ে। শীতকালে খাবার বসতে মূলত ছিল আলু আর চা। বহু কৃষক পরিবার চা কিনতে না পেরে, গরম জল দিয়ে চায়ের কাজ চালাতো। শাকসব্জি ছিল রীতিমতো একটা বিলাসিতা। মাংসকে এর চাইতেও বড় রকমের একটা দুর্লভ বিলাসিতা বলে মনে করা হতো। একমাত্র বসন্তোৎসব, মধ্য-শরতের উৎসব এবং ড্রাগন উৎসবের মতো বছরের বড় বড় উৎসবের দিনগুলোতেই কৃষকরা মাংস খাবার কথা ভাবতে পারতো। লবনের চড়া দামের জন্য অনেকেই এর থেকে বঞ্চিত থাকতো।

আজ চীনের সাধারণ খাদ্য-তালিকায় শুধু যে শস্যেরই পরিমাণ বেড়েছে তা নয়, পুরো খাদ্যব্যবস্থার মধ্যেই একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন এসে গেছে: এখন সাধারণ খাদ্যের শতকরা ৬০ ভাগই হল নরম শস্য (Soft Cereals) যেমন চাল, গম ইত্যাদি এবং বাকি শতকরা

[ চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

# অতি-জনসংখ্যার অলীক তত্ত্ব

**—প্রনব রায়**

● [ সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনকে চিরস্থায়ী করার বিবিধ কায়দার মধ্যে একটি হ'ল—ফলটাকে কারণ বলে প্রচার করা। ইংরেজ-শাসনের কথাই ধরা যাক। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণই ভারতের বুকে নিয়ে এসেছিল চিরস্থায়ী দারিদ্র, অনাহার, দুর্ভিক্ষ...অথচ তারাই আবার প্রচার করতো—'ভারতের দারিদ্রই' হ'ল এই বিপর্যয়গুলির একমাত্র কারণ (ব্রিটিশরা নয়!)। অর্থাৎ ভারতের দারিদ্রটা যেন প্রকৃতিগত একটা ব্যাপার! অবশ্য কথাটাকে তারা এতো স্থূলভাবে বলতো না, কারণ প্রাকৃতিকভাবে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে) ভারত যদি দরিদ্র হতো তাহলে ব্রিটিশরা যে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এ দেশে আসতো না সেটা বোকারাও বোঝে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের 'ভারত দরদী' তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীরা কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে, ভারতীয় দারিদ্রের পুরো দায়টা চাপাতো এদেশের পিছিয়ে থাকা সমাজব্যবস্থা, জনগণের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অতি জনসংখ্যা ইত্যাদির ওপর। এই অপপ্রচারের দুটো মুখ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, ভারতীয় দারিদ্রের মূল কারণ যে ব্রিটিশরা—এই সত্যটাকে গোপন রাখা। এবং দ্বিতীয়ত, 'জাতীয় উন্নতির অন্তরায়' হিসেবে প্রকারান্তরে, জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ দরিদ্র কৃষকদের দায়ী করে ব্রিটিশ-শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কৃষক-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা।

'৪৭-এর পর এই জাতীয় প্রচারের ওপর 'ব্রিটিশ' ছাপটা না থাকলেও এর মর্মবস্তুটা একই আছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক শাসনের অবসানের পরেও যখন সেই বহু বিজ্ঞাপিত 'রামরাজ্যটি' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলো না—দারিদ্র পীড়িত জনসাধারণের ধূমায়িত অসন্তোষ বিদ্রোহের মাধ্যমে যখন জাতীয় দৈন্য ও দারিদ্রের মূল কারণটিকে একটি রক্তাক্ত সামাজিক প্রশ্নের ভাষা দিল, তখন ভারতীয় শাসনব্যবস্থার নতুন কর্ণধাররা সেই পুরনো ব্রিটিশ অপপ্রচারকেই তোড়জোড় করে বাজারে নামালেন। জাতীয়নেতা, সরকারী প্রসাদপুষ্ট পত্রপত্রিকা, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী—সবাই তারস্বরে ভারতীয় দারিদ্রকে 'ব্যাখ্যা' করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। এই মিথ্যা প্রচারের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আংশিকভাবে হলেও সফল যে হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এই অপব্যাখ্যার শিকার—আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরাট একটা অংশ সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন, 'ব্যাপক দরিদ্র জনসাধারণই তাঁদের দারিদ্রের জন্য দায়ী'!

'স্বাধীন' ভারতের দারিদ্রের কারণ হিসেবে, বিশ্লেষণের পরিবর্তে যে অর্থহীন ব্যাখ্যা সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে, আপেক্ষিক গুরুত্বের দিক থেকে তাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হ'ল: সামাজিক অনগ্রসরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার (বস্তুগত উৎপাদন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাব, জাতি-ভেদ, গো-ভক্তি, স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্ন, নারী সমস্যা ইত্যাদি) এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আমরা দু'একটি কথা বলতে চাই।

'ভারতীয় দারিদ্রের ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই ঘটনাগুলিকেই যখন 'দারিদ্রের কারণ' বলে ঘোষণা করা হয় তখন ব্যাপারটা 'ঘোড়ার আগে গাড়ীকে জুড়ে দেবার মতো' হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা—অনুন্নত অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসাধারণের বঞ্চিত থাকারই ফলশ্রুতি; এর উল্টোটা নয়। জনগণের নিরক্ষরতার জন্য সেই সরকারেরই ধিক্কার পাওয়া উচিত, যে সরকার তার জনসাধারণকে অজ্ঞতার মধ্যে বেঁধে রেখেছে। শিক্ষার অধিকার থেকে যাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, নিন্দার বোঝাটা অবশ্যই তাদের প্রাপ্য হতে পারে না! মূল সমস্যাটা হ'ল সামাজিক-অর্থনৈতিক। আর সাংস্কৃতিক সমস্যাটা এই মূল সমস্যারই ওপর নির্ভরশীল।

যতক্ষণ পর্যন্ত দারিদ্রকে অপসারিত না করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাস্থ্য বা সমাজ উন্নয়নের ওপর যতো বক্তৃতাই দেওয়া হোক না কেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতাকে কাটিয়ে ওঠা যাবে না।"
(আর. পি. দত্ত, পৃ—৫০)

ব্রিটিশ-আমলের সাথে তুলনা করলেই ওপরের বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার হবে। ভারতীয় দারিদ্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রিটিশ-প্রভুরাও ভারতীয় জনগণের ব্যাপকতম অংশ অর্থাৎ কৃষকদের মধ্যে অনগ্রসরতা, অশিক্ষা...ইত্যাদিকেই দায়ী করতো। কিন্তু সমস্ত মানবিক অধিকার থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করেছিল কারা? কারা তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল? কারা আমাদের সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থানুকূল করে, তার অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাবনা ধ্বংস করেছিল? কারা আমাদের দেশকে লুঠ করে আমাদের দেশীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে রেখেছিল? তারা কি আমাদের দেশের কৃষকরা; নাকি কোটি কোটি কৃষককে যারা দুর্ভিক্ষ ও অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল—সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ?

আজকের সরকার যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের প্রতিধ্বনি তোলেন, তখন 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক' সরকারের চরিত্র সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তুললে তাঁকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যায় ভূষিত করা যায় কি?

ভারতীয় দারিদ্র্যকে ব্যাখ্যা করার দ্বিতীয় অস্ত্রটি হ'ল—'অতিজনসংখ্যার তত্ত্ব'। সরকারের পক্ষে এটিই হ'ল সবচাইতে নির্ভরযোগ্য, বহু পরীক্ষিত, জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার মোক্ষম দাওয়াই। শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, পুঁজিবাদি দুনিয়া এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সমস্ত অনুন্নত দেশগুলিতেই এই 'অতি-জনসংখ্যার' তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সব চাইতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বলেই এই অপব্যাখ্যাটি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের এতোবেশি বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তাই, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ছদ্মবেশধারী 'অতি জনসংখ্যার' এই অলীক তত্ত্বটির মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য, সত্যতা এবং ভারতের মতো অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য—এই প্রশ্নগুলিকে বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই আমরা নীচের প্রবন্ধটি প্রকাশ করলাম।—সঃ মঃ বীঃ ]●

ভারতীয় দারিদ্র্যকে 'এক কোপে' ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের 'জাতীয় নেতারা' 'অতিজনসংখ্যার ব্রহ্মাস্ত্রটি' প্রয়োগ করে থাকেন। ঘটনাটা শুধুমাত্র আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। গোটা পুঁজিবাদি দুনিয়া এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে ঐতিহাসিকভাবে বৃত্ত এই মালথুসীয় তত্ত্বটিকে সযত্নে লালন-পালন ও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই ভুয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির জন্মভূমি পুঁজিবাদি দেশ হলেও এর বর্তমান ভূমিকা, মুখ্যত অনুন্নত দেশগুলোকে কেন্দ্র করেই। বরং বলা চলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনগ্রসর দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার হাতিয়ার হিসেবে এই তত্ত্বটিকে প্রচার, প্রসার ও পুষ্ট করা হচ্ছে। তাই 'অতি-জনসংখ্যা'র বহু বিজ্ঞাপিত তত্ত্বটিকে আন্তর্জাতিক পটভূমিকাতেই বিচার করা দরকার। আলোচনার দৈর্ঘ কমানোর জন্য আমরা, বর্তমান পুঁজিবাদি দুনিয়ার নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষকে -দুই দুনিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নিলাম।

### কোন প্রয়োজন থেকে এই 'তত্ত্ব' এসেছিলি ?

'অতি জনসংখ্যার' ( ওভার পপুলেশন ) অবাস্তব তত্ত্বটি আমদানি করেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও পুরোহিত রেভারেণ্ড টমাস রবার্ট মালথুস (১৭৬৬—১৮৩৪)। এর মূল কথাটা ছিল : জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী গাণিতিক প্রগতিতে (Arithmatical Progression— যেমন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬...এই রকম অনুপাতে ) বাড়ে ; কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় জ্যামিতিক প্রগতিতে (Geometrical Progression—যেমন, ১, ২, ৪, ৮, ১৬...এই অনুপাতে)। অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যা খাদ্য সামগ্রির-উৎপাদনের তুলনায় বহুগুন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।

এই 'তত্ত্ব' থেকে মালথুস সিদ্ধান্ত করেন : জনসংখ্যা ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রির মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে চলছে এবং চলবেও। এটি একটি শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়ম।

কি সর্বনাশ! তাহলে 'জ্যামিতিক শিশুদের' আক্রমণ থেকে বাঁচার কোনো পথই কি খোলা নেই? আছে—একটিই মাত্র উপায় রয়েছে যা দিয়ে মানব সমাজ অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং পুরোহিত সাহেবের মতে তা হ'ল—'নৈতিক সংযম' পালন করা অর্থাৎ সাদা কথায় 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' করা।

প্রতিটি আবিষ্কারের ( তা সে সঠিক বা ভুয়া যাই হোক না কেন ) পিছনেই একটি প্রয়োজনবোধ লুকিয়ে থাকে। তাহলে কোন প্রয়োজন বোধ থেকে এই তত্ত্বটির আবিষ্কার করেছিলেন মালথুস? এর উত্তরটা পেতে হতে হলে, তাঁর সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দিকে ফিরে তাকাতে হবে।

'শিল্প বিপ্লবের (১৭৬০—১৮৩২) ওই সময়টাতে বৃটেনের পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। সুতরাং শাসকশ্রেণী ( পুঁজিপতি শ্রেণী ) এমন একটা আদর্শগত হাতিয়ারের ( তত্ত্বের ) প্রয়োজন বোধ করছিল যা দিয়ে তারা পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে পারে এবং পুঁজিবাদি শোষণের যথার্থতার সপক্ষে সাফাই গাইতে পারে। এই শ্রেণী-প্রয়োজনবোধ থেকেই মালথুসীয় 'অতিজনসংখ্যা-তত্ত্বে'র উৎপত্তি।" ( মালিন, পৃ-১০ )

এই 'তত্ত্ব'টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কারণ "স্বয়ং মালথুসই স্বীকার করেছেন ( তাঁর মূল বইটির মুখবন্ধে ) তাঁর আবিষ্কারের উদ্দেশ্য হল, 'ফরাসী বিপ্লব ও তৎকালীন প্রগতিবাদী তত্ত্বগুলোর বিরোধিতা করা' (আর, পি, দত্ত, পৃ ৪৭)। মালথুসের কিছু কিছু বক্তব্য পড়লে সন্দেহের অবকাশ থাকে না -শ্রমিকশ্রেণীর ওপর কি প্রচণ্ড ঘৃণা ও দানবীয় জিঘাংসা নিয়ে তিনি তাঁর তত্ত্বটি সৃষ্টি ( আবিষ্কার নয় ) করেছিলেন। একজন শ্রমিক চাকরী হারালে তিনি মনে করতেন—তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনটাই ফুরিয়ে গেছে। "প্রকৃতির বিশাল ভোজসভায় তার জন্য কোনো

জানবই শূন্য পুড়ে নেই। প্রকৃতি তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বলছে এবং এই আদেশটাকে কাজে পরিণত করতে সে বিলম্ব করে না" (মালিন, পৃ—১০-১১)। এতেই শেষ নয়; মালথুস এই কাজ-টাকে এগিয়ে রাখার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন এইভাবে, "আমাদের উচিত, প্রকৃতির এই মৃত্যুদানের কাজটাতে সাহায্য করা··· যদি আমরা বারবার ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ না দেখতে চাই তাহলে আমাদের উচিৎ হবে, অন্য ধরণের ধ্বংসকে উৎসাহ দেওয়া...। গরীবদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে উপদেশ দেবার বদলে, তারা যাতে এর বিপরীত অভ্যাস-গুলোকে রপ্ত করে সেদিকে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের উচিত—শহরগুলোর রাস্তা আরো সংকীর্ণ করা, ঘরগুলোর আয়তন আরো কমানো যাতে লোকে গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হয়, এবং প্লেগকে ফিরিয়ে আনার সব রকম ব্যবস্থা করা। গ্রামাঞ্চলের দিকে (যেখানে দরিদ্র কৃষকরা থাকে), আমাদের উচিত—পচা জলে থাকা জলাশয়ের কাছে গ্রামগুলো বসানো; বিশেষ করে আমাদের উচিত—অস্বাস্থ্যকর জায়গাগুলোতে যাতে বসতি গড়ে ওঠে, তার চেষ্টা করা। কিন্তু সর্বোপরি যা আমাদের করা উচিত তা হ'ল—সব চাইতে শক্তি-শালী ও ধ্বংসাত্মক রোগগুলোর প্রতিষেধক ওষুধ-পত্রগুলোর ব্যবহার না হতে দেওয়া···" (মালিন, পৃ-১১)।

বলাই বাহুল্য, মালথুসের এই 'সামাজিক বিধানগুলো' শ্রেণী-নির্বিশেষে প্রযোজ্য নয়। একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্দেশ্যেই এগুলো রচিত হয়েছে; সেই শ্রেণী হ'ল মালথুসের শ্রেণীশত্রু—সর্বহারা শ্রেণী· তাঁর তত্ত্বের রাজনৈতিক অভিসন্ধি মালথুস নীচের বক্তব্যটিতে আরো বেশি স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর ধারণা শ্রমিক-শ্রেণী যদি এই 'তত্ত্ব'টিকে গ্রহণ করে তাহলে "তারা অনেকবেশি ধৈর্যের সাথে নিজেদের দুরবস্থাকে মেনে নিতে পারবে; তাদের দারিদ্র্যের জন্য সরকার ও সমাজের উচ্চবিত্তদের প্রতি যে অসন্তোষ ও ঘৃণা তারা পোষণ করে তার মাত্রাও অনেক কমে যাবে; তাদের মধ্যে অবাধ্যতা ও বিশৃংখলার মনোভাবও হ্রাস পাবে" (মালিন, পৃ-১১)।

প্রগতি-বিরোধী এই তত্ত্বটি, প্রয়োজন-মুহূর্তে শাসকশ্রেণীর হাতে জুগিয়ে দেবার জন্য ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা মালথুসকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছিল। "এবং এই তত্ত্বটিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে তারা আক্রমণ চালিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর ওপর। ১৮৩৪ সালে মালথুসের একটি প্রস্তাব অনুসারে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছিল তথাকথিত Poor Law Amendment Act, যার সাহায্যে মিউনিসিপাল কাউন্সিল এর তরফ থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে দেওয়া সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কুখ্যাত 'ওয়ার্ক হাউস'*-এর" (মালিন, পৃ-১১)।

মালথুসের 'তত্ত্ব' কিন্তু বেশি দিন বাঁচতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা একে কঠিন আঘাত হেনেছিল। সেই সময়ে সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধি জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে এতো বেশি পিছনে ফেলে গিয়েছিল যে মালথুসীয় 'তত্ত্বে'র শূন্যগর্ভতা কোনো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হয়নি। যে নবজাত ধনতন্ত্র মালথুসীয় 'তত্ত্বে'র জন্ম দিয়েছিল, তারই স্বর্ণযুগে মৃত্যু ঘটলো এই অসার তত্ত্বের।

কিন্তু এই মৃত্যু সাময়িক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ধন-তান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব আগের চাইতে আরো বেশি তীব্রতর হওয়াতে সাম্রাজ্যবাদীরা এই দ্বন্দ্বকে আড়াল করার জন্য নতুন নতুন উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা চালাতে লাগলো। এই বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে, শেষপর্যন্ত যেটিকে তারা অন্যতম নির্ভরযোগ্য উপায় বলে গ্রহণ করেছে তা আর কিছুই নয়—ইতিহাসের ডাষ্টবিনে নিক্ষিপ্ত, ১৮'শ শতাব্দীর মৃত মালথুসীয় অতিজনসংখ্যার অলীক তত্ত্ব। এই পচা-গলা 'তত্ত্ব'টিকেই তারা অসেমেজে বিজ্ঞানের মোড়ক পরিয়ে ঘটা করে ময়দানে নামিয়েছে। এই 'তত্ত্ব'টি সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কতো প্রিয় তার একটা বড় প্রমাণ হ'ল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ৫০ বছরের মধ্যে মালথুসীয় চরিত্রের যে পরিমাণ বই-পত্র লেখা হয়েছে তা তার আগের ১৫০ বছরের তুলনায়ও অনেকগুন বেশি। নয়া মালথুসবাদিরা, অর্থাৎ বর্তমানের মালথুসপন্থীরা আবার জোর গলায় সোরগোল তুলেছে—'অতিজনসংখ্যাই' নাকি সমস্ত রকমের সামাজিক দুর্দশার কারণ। আসুন এবার শোনা যাক এই অবাস্তব তত্ত্বের নয়া ফেরিওয়ালারা কি বলছেন।

**মালথুসীয় তত্ত্বের নয়া-প্রবক্তারা যা বলেন**

অতিজনসংখ্যার 'কোরাসে' প্রধান গায়কের ভূমিকায় যাঁরা গলা মিলিয়েছেন (এবং মেলাচ্ছেন) তাঁরা পেশার দিক থেকে বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এক। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সেরা সেরা বিজ্ঞানী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, ধর্ম-যাজক, শিল্পী, সাহিত্যিক··· এক কথায়, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সমস্ত 'খ্যাতনামা' প্রতিনিধিরা (এর থেকে উল্টোভাবে এটাও প্রমাণিত হয়—শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সেই সব ব্যক্তিরাই 'খ্যাতনামা' হন যাঁরা শাসকবর্গের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করেন)। খুবই স্বাভাবিক; কারণ তত্ত্ব যেখানে

---

* এই বীভৎস 'ওয়ার্ক হাউস'গুলোর বর্ণনা চার্লস ডিকেন্স-এর লেখা 'অলিভার টুইস্ট' বইটিতে পাওয়া যাবে। —লেখক

দুর্বল, সেক্ষেত্রে প্রচারকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং জন-পরিচিতি এমন হওয়া দরকার যাতে তাঁর কথা 'ধারে' না হলেও অন্তত 'ভারে' কেটে যায়।

নয়া-মালথুসবাদীদের পক্ষ থেকে মঞ্চে প্রথমে আসছেন—ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের **জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক রেমণ্ড বি. কাউলেস**। ডাঃ কাউলেস-এর মতে, "অতিজনসংখ্যার এই সংকট শুধু আমেরিকার ওপরই নয়, সারা মানবজাতির ওপর তার অশুভ ডানা মেলে আছে" (হানসেন, পৃ-১০)। ১৯৬০ সালের ২রা জানুয়ারী আমেরিকার প্রায় সব কটি পত্র-পত্রিকাতে কাউলেসের এই বক্তব্য ছাপা হয়েছিল। কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানী কাউলেস এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন, তবে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথেই তিনি ঘোষণা করেছেন: "প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসাবে একটিই মাত্র সিদ্ধান্তে আমি আসতে পারছি এবং তা হ'ল, প্রাণী-জগৎ (wild-life) ও স্বয়ং মানব জাতিকে এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার মতো কোনো পথই আর খোলা নেই" (হানসেন, পৃ-১০)।

পরিষ্কার বোঝা গেল না অধ্যাপক কাউলেস কি বোঝাতে চাইছেন: 'জ্যামিতিক মানুষ' 'গানিতিক' যা কিছু আছে সব কিছু খেয়ে নেবে এবং পরে দুর্ভিক্ষে পড়ে মারা যাবে; নাকি 'জ্যামিতিক মানুষ' এবং সমানভাবেই 'জ্যামিতিক' প্রাণী-জগতের মধ্যে 'গানিতিক' খাদ্য দখল করার মরণপণ হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে! কিন্তু তাঁর দেওয়া 'শেষ দৃশ্যের' ইঙ্গিতটা যথেষ্ট (হতাশাব্যঞ্জক হলেও) পরিষ্কার: শূন্য বন্ধ্যা পৃথিবীর বুকে অগুনতি মানুষ আর আরশোলা কাড়াকাড়ি করছে—খাবারের শেষ টুকরোটা দখল করার জন্য!

'জ্যামিতিক-গানিতিক' এই জটিল ব্যাপারটা সাধারণের পক্ষে বোঝা বেশ কষ্টকর! তাই কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের **পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ব্রাডলি** সরলভঙ্গিতে জনসাধারণকে এই সংকটটি বোঝাবার গুরুদায়িত্বটি নিয়েছেন। ব্রাডলির কথাগুলো শোনা যাক:

"এই শতাব্দীর মাঝামাঝি বিশ্বের মোট জনসংখ্যার (প্রায় ২০০০,০০০,০০০) কথা চিন্তা করুন। তারপর, জনসংখ্যা বর্তমানে দ্বিগুণ হারে বাড়ছে (প্রতি ৫০ বছরে)—এটা খেয়াল রেখে ভবিষ্যতের দিকে তাকান। কি দেখছেন? ২,০০০ সালে এই জনসংখ্যার পরিমাণ হবে ৪,০০০,০০০,০০০; ২০৫০ সালে—৮,০০০,০০০,০০০··· দশ শতাব্দী পেরোবার আগেই আমাদের বংশধরদের প্রতিবেশীর সংখ্যা দাঁড়াবে ২,০০০,০০০,০০০,০০০তে—বা দক্ষিণ মেরু, সাহারা মরুভূমি ও মাউণ্ট এভারেস্টকে ধরলেও সারা পৃথিবীর মোট স্থল-ভাগের ক্ষেত্রফল যত বর্গফুট, তাকেও বেশ কিছুটা ছাড়িয়ে যাবে" (হানসেন, পৃ—৫-৬)।

ব্যাপারটা সত্যিই চিন্তা করার মতো। প্রতি বর্গফুটে ২,০০০,০০০ মানুষের থাকাটা খুব আরামের হবে না! তাহলে? – থাক, সমস্যা সমাধানের কথাটা নয়া মালথুসপন্থীরা 'শেষদৃশ্যে' নিজের মুখেই বলবেন। আপাতত তাঁদের 'গৌরচন্দ্রিকাটা'ই শোনা যাক।

আচ্ছা, বাড়তি মানুষগুলোকে মহাকাশযানে করে গ্রহান্তরে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? হ্যাঁ, ব্রাডলি সে কথাও চিন্তা করেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে, তাঁর গণনা অনুযায়ী—এই প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়!

অ্যাটম বোমা ফেলে··· ? ও রকম একটা উপায়ের কথা 'মানব-দরদী' বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন বৈকি! যেমন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবরসায়নের **অধ্যাপক জন টি এডসাল** (John T Edsall)-এর কথাই ধরুন: "একটা বিশ্বব্যাপী পারমানবিক যুদ্ধ মুহূর্তের মধ্যেই মানবজাতির এই বিরাট সমস্যাটাকে সমাধান করে দিতে পারে বটে···" কিন্তু এডসাল হতে খুব সন্তুষ্ট নন; বিরসভাবে তিনি মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু কোনো প্রকৃতিস্থ মানুষই এরকম জঘন্য সমাধানকে স্বাগত জানাবে না!" তাঁর মতে, রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলোই যতো নষ্টের গোড়া। মৃত্যুর হার কমিয়ে সেগুলো "আসলে মানুষের দুর্গতির মোট যোগফলকে বাড়িয়ে তুলছে।" আপনি যতই যুক্তি দিন এডসালকে তাঁর ধারণা থেকে বিচলিত করতে পারবেন না—খাবার যতই থাকুক না কেন, ভবিষ্যতে তারাই সব থেকে বেশি সুখে থাকবে যারা মায়ের জঠর থেকে কোনোদিন ভূমিষ্ঠ হবে না!

"না হয় ধরাই যাক, দশ বা কুড়ি হাজার কোটি মানুষের খাবার ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু তাহলেও কি আমরা এরকম একটা পৃথিবী চাইবো? আমি বিশ্বাস করি, মানুষের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য দরকার—খোলামেলা জায়গা, অবারিত প্রকৃতি এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক মূল্যবান জিনিষ যা অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশেই পাওয়া সম্ভব" (হানসেন, পৃ-৭)।

প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের আপাতত রেহাই দিয়ে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষ অথবা পুচ্ছ)-ধারী **অর্থনীতিবিদরা** কি বলেন শোনা যাক। এঁদের বক্তব্য, সাংবাদিক লরেন্স কার্টিস সারসংক্ষেপ করে বলেছেন:

"আজকের দুনিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা ভিন্নমত হলেও একটা বিষয় রয়েছে যাতে তাঁরা প্রায় একমত। এই বিষয়টি হ'ল—অতিজনসংখ্যাই অর্থনৈতিক প্রগতির সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক···" (হানসেন, পৃ-৯)।

কিন্তু 'আগন্তু এবং ভবিষ্যতের অনাগত শিশুরাই প্রগতির একমাত্র অন্তরায়'—এতো বড়ো একটা 'জটিল তত্ত্ব' সাধারণ মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করা নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার; হাজার হোক, শিশুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মনোবৃত্তি সাধারণ মানুষের সহজাত নয় তো! তাই যাতে তাঁরা 'অতিজনসংখ্যার মারাত্মক সংকটটিকে' 'উপযুক্ত গুরুত্ব' দিয়ে ভাবতে বাধ্য হন তার জন্ত 'উৎকৃষ্ট আংগিকে রচিত' একটি ইস্তাহার হাগ্‌ মুর ফাণ্ড ( Hugh More Fuud ) থেকে সাধারণের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হয়েছিল; ইস্তাহারের নামটিও ছিল চমৎকার—"দি পপুলেশন বোম্ব", যা এক নজরেই দর্শককে কৌতুহলী করে তুলবে:

"পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত। মরিয়া হয়ে ক্রমশই তারা বেশি বেশি করে কমিউনিস্ট প্রচারের খপ্পরে গিয়ে পড়ছে আমেরিকার ট্যাক্সদাতারা গোটা পৃথিবীকে খাওয়াতে পারেন না। দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়াবার মতো, যতোই আমাদের সদিচ্ছা থাকুক না কেন, শুধু ডলার দিয়ে এই সমস্যা সমাধান হবার নয়

"হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের মতো সমান বিপজ্জনক এই জনসংখ্যা-বোমার বিস্ফোরণ আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। প্রগতি অথবা ধ্বংস, যুদ্ধ অথবা শান্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বোমাটির প্রভাব প্রথমটির চাইতে কোনো অংশেই কম নয়।

"কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকেই বাড়ছে। আর এই বোমার পলতেতে ইতিমধ্যেই আগুন দেওয়া হয়ে গেছে এবং তা জ্বলছেও। প্রতি দিনই গ্রহে যোগ হচ্ছে ১৩৫ ০০০ মানুষ।

"নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। প্রতি মুহূর্তে বিপদ রেখা শেষ সীমার দিকে এগুচ্ছে। আমাদের এবং আমাদের শিশুদের জৈবিক অস্তিত্ব আপাতত বিপন্ন না হলেও আমাদের জীবনধারা আজ এক ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন .." (হানসেন, পৃ-৮)।

ভবিষ্যতের অনাগত ( যদিও 'অবশ্যম্ভাবী' ) বিপদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, বর্তমানের অবস্থাটাই কি যথেষ্ট 'শোচনীয়' নয়? পরের বক্তার মুখেই সেটা শুনুন :

"ক্ষুধার্ত মানুষের ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকালেই বর্তমানের জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিনামটাকে দেখতে পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তেই গোটা মানবজাতির অর্দ্ধেক অংশ ক্ষুধার্ত রয়েছে। তিরিশ বছর আগে দুনিয়া জোড়া মন্দার মধ্যেও একজন মানুষ যে পরিমাণ খাবার পেতো, এখন তার থেকেও কম পাচ্ছে। প্রতিদিনের মতো আজকেও কয়েক হাজার মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাবে।

"কিন্তু যে হাজার কয়েক মানুষ খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে, একদিক থেকে তাদের ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ, যে লক্ষ লক্ষ শিশু মারা না গিয়ে অপুষ্টিতে ভুগছে তারা, মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ, তাদের যন্ত্রণাময় জীবনের বোঝাটাকে ধুঁকতে ধুঁকতে বইবার জন্তই শুধু বেঁচে থাকছে। শারীরিকভাবে তারা বিকৃত, মানসিকভাবে পঙ্গু।

"জন্মের চার বছরের মধ্যেই মানব মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের শতকরা ৯০ ভাগ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। দেহবিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাতে পুষ্টির অভাব ঘটলে মস্তিষ্ক গঠনের ওপর ভয়ানক প্রভাব পড়ে। পুষ্টির সামান্ত অভাবেতেই স্বাভাবিক মানসিক ক্ষমতার শতকরা ২৫ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়, যে ক্ষমতার এমনকি শতকরা ১০ ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হলেই মানুষের কর্মক্ষমতা সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়।

"বিশেষ করে মর্মস্পর্শী ব্যাপারটা হ'ল, এই শিশুরা যখন বয়স্ক হয় তখন তারাও আবার তাদের নিজেদের পরিবারে একই হতাশাময় জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।"

মানব-দরদী এই বক্তাটিকে চিনতে পারছেন? মানব জাতি ও শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে 'চিন্তায় আকুল' এই ব্যক্তিটি হলেন—ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সভাপতি, মার্কিনী একচেটিয়া পুঁজির চৌকস দালাল, ভিয়েতনামে নারী-শিশু নির্বিশেষে গণহত্যার একজন সক্রিয় সংগঠক—রবার্ট এস ম্যাকনামারা ( ১৯৭৪ )।

কিন্তু এতো গেল 'ভূমিকা'। এই ভণ্ড মানবদরদীটির আসল অভিসন্ধিটা কি? সেটা তাঁকেই বলতে দেওয়া যাক:

"যদি এই বিস্ফোরক পরিস্থিতির সমাধান হিসেবে গণ-অনাহার এবং রাজনৈতিক-বিশৃংখলা আমরা না চাই, তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর জন্ত তিনটি মাত্র রাস্তা আমাদের সামনে খোলা থাকে।

"প্রথমটি হ'ল, মৃত্যুর হার বাড়ানো। বলাই বাহুল্য, এই পথটির সপক্ষে কেউই মত দেবেন না।

"দ্বিতীয় উপায়টি হ'ল: বাড়তি জনসংখ্যাকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু ব্যাপকভাবে এটিকে কাজে পরিণত করা সম্ভব নয়।
"সুতরাং একমাত্র উপায়···

জন্মের হার কমানো"। ( ঐ )

"পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যা-সীমিত করণই হ'ল পৃথিবীতে সত্যিকারের শান্তি আনার একমাত্র উপায়। জনসংখ্যা কম হলে যুদ্ধও কম হবে। অল্প জনসংখ্যার অর্থ হ'ল—অধিকতর শান্তি।" ( মার্গারেট সেঙ্গার, হানসেন, পৃ-৯ )

পরিবার পরিকল্পনা, নির্বীজকরণ, যৌনশিক্ষা ইত্যাদি 'জন কল্যান মূলক' প্রকল্পগুলোর এই হ'ল পটভূমি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বহু বিশ্বস্ত সেবকই এগুলোর কার্যকরীতার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। বিবর্তনবাদের আবিষ্কর্তা বিখ্যাত ডারুইনের নাতি, এযুগের একজন প্রথম সারির তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার চার্লস ডারুইনের কথাই ধরা যাক (এঁর জন-বিরোধী চরিত্রের একটি জলন্ত প্রমাণ একটু পরেই আমরা পাবো)। ইনি অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন—বাস্তব ক্ষেত্রে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে মূল সমস্যার ধারে কাছেও যাওয়া সম্ভব নয়। একটি সাক্ষাৎকারে জনৈক প্রশ্নকর্তা 'পারমানবিক যুদ্ধ—এই সমস্যার সমাধানে কতখানি সাহায্য করতে পারে' তাঁকে প্রশ্ন করলে, ডারুইনের নাতি জবাব দিয়েছিলেন, "...তবুও গোটা সমস্যাটার সমাধান হবে না। ওতে হবেটা কি—দশ কোটি মানুষ মারা যাবে? কিন্তু তিন বছর পরেই তো আবো দশ কোটি মানুষ আসছে! তার মানে, বুঝতেই পারছেন—প্রতি তিন বছরে একটা করে ওই রকম যুদ্ধ লাগাতে হয়। আর সে ব্যাপারটাও অঙ্কের মতো নিখুঁতভাবে করা দরকার" (হানসেন, পৃ-১৩)। তাঁর মতে, একটিই মাত্র রাস্তা খোলা রয়েছে—"গোটা মানবজাতিটাকে যদি ধ্বংস করে ফেলা যায় তাহলে জনসংখ্যার সমস্যাও আর থাকবে না।"

বিজ্ঞানী চার্লস ডারুইন এতো নৈরাশ্যপীড়িত হবার আগে পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল আয়ুব খানের সাথে একবার এ বিষয়ে কথা বলে দেখলে পারতেন! 'টাইম' পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, আয়ুব নাকি একদিন "দীর্ঘ-নিশ্বাস" ফেলে সখেদে বলেছিলেন, "আমাদের জনসংখ্যা যদি এভাবে বাড়তে থাকে, তবে অল্প-দিনের মধ্যেই আর খাবার জুটবে না। বাধ্য হয়ে তখন সবাইকে নরখাদক হতে হবে" (ঐ, পৃ-১৩)।

আয়ুব সাহেবকে ধন্যবাদ; এই পর্বত প্রমাণ সমস্যার এমন যে একটি 'সরল সমাধান' রয়েছে, তা তাবৎ 'বাঘা বাঘা' বিজ্ঞানীদেরও মাথায় আসেনি!

## সাম্রাজ্যবাদের 'জনসংখ্য-নিয়ন্ত্রণ' কি ও কেন

যে সমস্ত প্রার্থী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার জন্য ময়দানে নামেন, তাঁদের একটা প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে হয় - জন্ম-নিরোধ সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত কি? জন্মনিরোধের ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ এবং মার্কিনী তহবিলের বদান্যতায় বাকি দুনিয়াকে এই নিরোধক ব্যবস্থাগুলো দিয়ে সাহায্য করার সম্পর্কে তিনি কি ভাবছেন? কায়দাটি চমৎকার—'মহামান্য হবু প্রেসিডেন্টকেও' মাজপুনীর তত্ত্বটি ফেরি করতে হবে! কারণ মার্কিনী শাসকবর্গ জানে এই জনপ্রিয় 'হিরো'টি যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের থলিখানা কাঁধে ঝোলান তাহলে 'ক্রেতার' অভাব হবে না।

সবচাইতে মজার ব্যাপারটা হ'ল—'জন্মনিয়ন্ত্রনের' প্রশ্নে সব প্রার্থীরাই 'এক গলা, এক রা' হয়ে যান (অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে একে অন্যকে পর্যুদস্ত করার জন্য ভোটারকে পরস্পরের গায়ে যত কাদা ছোঁড়াছুড়ি করুন না কেন)! শুধু তাই নয়; ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এই প্রশ্নটাতে তাঁরা হঠাৎ 'উদার' হয়ে যান। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

"বৈদেশিক সহায়তার' প্রশ্নটিকে খুঁটিয়ে দেখবার জন্য মেজর জেনারেল উইলিয়াম ড্র্যাপারের নেতৃত্বে যে প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটি ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে অনুন্নত দেশগুলোতে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' করার জন্য মার্কিন সাহায্য দেওয়ার কথা সুপারিশ করে। এরকম একটা 'অধার্মিক' কাজে জনসাধারণের অর্থ-ব্যয় করাটাকে রোমান ক্যাথলিক বিশপরা প্রচণ্ড নিন্দা করেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিজেও ছিলেন ক্যাথলিক। কিন্তু অন্যান্য অ-ক্যাথলিক নেতাদের মতো ক্যাথলিক কেনেডিও প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি" (ঐ, ৬)। (ধর্মকে কোথায় প্রশ্রয় দিতে হয় আর কোথায় বা বিসর্জন দিতে হয়—শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তা ভালোভাবেই জানেন!)। কিন্তু ভিয়েতনাম-যুদ্ধের অন্যতম নায়ক প্রেসিডেন্ট কেনেডি অনুন্নত দেশগুলোর 'কল্যান কামনায়' কেন এতোখানি বিচলিত হয়ে পড়লেন, যাতে তাঁকে শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকেও বিসর্জন দিতে হ'ল? কারণটা ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জোসেফ জে. স্পেংলার-এর মুখেই শুনুন:

> "আমি যেটাতে ভয় পাচ্ছি তা হ'ল, এই দেশগুলো—যেমন ভারতের কথাই ধরা যাক, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে যদি কার্যকরীভাবে কিছু করতে না পারে তবে অচিরেই সর্বনাশ দেখা দেবে। বিশাল এই জনসংখ্যা সুখী জীবন কামনা করলেও বাস্তবে তা পাবে না। তখন কি করবে তারা? তারা তখন কমিউনিষ্টদের দলে গিয়ে যোগ দেবে...ভারতের ক্ষেত্রে আশু বিপদটা হ'ল এই যে সেখানে জনসংখ্যা যে দ্রুতহারে বাড়ছে, তার সাথে—সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক উৎপাদন তাল রাখতে সক্ষম নয়। এর ফলে, অনেকেই সরকারের ওপর আস্থা হারাবে এবং কমিউনিষ্টদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে..." (ঐ, পৃ ৯-১০)।

অর্থাৎ 'গোটা পৃথিবীর সমস্যা' 'মানবজাতির সংকট' ইত্যাদি গালভরা নাম দিয়ে যে হৈ-চৈ ফেলা হচ্ছে তার গূঢ় রহস্যটি রাজনৈতিক। এ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদের 'মনের কথাটি' আর একটু পরিষ্কারভাবে শোনা যাক। এবারে বক্তার ভূমিকায় আসছেন মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ (এবং শিশু-বিরোধী যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও প্রচারক) ডাঃ অ্যালেন গাট্‌ম্যাচার :

"সমান্তরাল অর্থনৈতিক বিকাশ ছাড়া বেপরওয়া জনসংখ্যাবৃদ্ধি, ক্রমশই জীবনযাত্রার মানকে নামিয়ে দিতে থাকে। ফলে, দেখা দেয় দারিদ্র, ক্ষুধা এবং এর থেকেই জন্ম নেয় রাজনৈতিক অস্থিরতা।

"আজকে, এই ধরণের রাজনৈতিক অস্থিরতাই অনিবার্যভাবে জনতাকে যে কোনো 'ইজম'-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে—তা সে কমিউনিজম, ফ্যাসিজম বা প্যান-আরবিজম যাই হোক না কেন..." (ঐ, পৃ-৯)। (ডাঃ অ্যালেন কমিউনিজমের সাথে বাকি দুটোকে এক লাইনে রেখে সাম্রাজ্যবাদের আসল আতংকটাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। কৌশলটা মন্দ নয়!)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ভয়টা আসলে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন থেকেই আসছে। ঘরে বাইরে দু-দিকেই আজ সাম্রাজ্যবাদকে সংকটের মুখোমুখী হতে হচ্ছে। আর ওই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই তারা ধুয়া তুলেছে—'জনসংখ্যা বৃদ্ধি গোটা মানবজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে, তাই তাকে এই মুহূর্তে রোধা দরকার।' এই সংকট সামলে উঠতে সাম্রাজ্যবাদ কতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছে তা আমরা নীচে দেখতে পাবো।

ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ইংকে আমেরিকান ইকনমিক্স অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি অধিবেশনে প্রস্তাব রেখেছিলেন- "অনুন্নত দেশগুলোর উচিৎ, পুরস্কারের মাধ্যমে বিবাহিত দম্পতিদের জন্মনিরোধ করতে উৎসাহিত করা" (ঐ, পৃ-১০)। কিন্তু মুশ্‌কিলটা হ'ল, অনুন্নত দেশগুলোর 'গরীব সরকার' অতটা আর্থিক দায় কি নিতে পারবে? "ঠিক আছে", আমেরিকান কংগ্রেস জানালো. "ব্যয়ভারের দায়িত্বটা আমরাই নেব।" "জনসাধারণের অর্থে গড়া মার্কিন তহবিল থেকে কোটি কোটি ডলার দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান ভয়ংকর নার্ভ গ্যাস, H-বোমা, অ্যাটমিক সিপ্‌বোট ইত্যাদি 'জনকল্যাণকর' কর্মসূচীকে উৎসাহিত করেছে তারাই অনুন্নত দেশগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যকারী করার 'গুরু দায়িত্ব' সানন্দে বহন করছে" (ঐ)।

সুতরাং মহা উৎসাহের সাথে অনুন্নত দেশগুলোতে 'জন্ম-নিরোধ যজ্ঞ' শুরু হয়ে গেল। আমাদের জাতীয় নেতারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন—'গ্রামে গ্রামে ভেসেক্টমি ক্যাম্প খোলা হোক', 'পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সাহায্য নিন',.. রেডিওতে প্রতি ৫ মিনিট অন্তর ঘোষণা হতে লাগলো—'দো য়্যা তিন বচ্চে, ব্যস্...' 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার', '১৫ পয়সায় তিনটি' (একমাত্র এই জিনিসটিরই দাম কমেছে).। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এমনকি স্থির করে ফেললেন—সরকারী কর্মচারীরা যদি 'নির্বীজীকৃত' (Sterilized) হয়ে সময়টার 'সদব্যবহার' করতে চান' তাহলে তাঁদের ৬ দিন ছুটি মঞ্জুর করা হবে। গ্রামের দিকে, ছয় পয়সার লোভ দেখিয়ে (—দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে) অথবা প্রয়োজন হলে বলপূর্বক ধরে এনে অজ্ঞ মানুষদের 'গণভাবে' অপারেশ টেবিলে শোয়ানো হতে লাগল। নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকাতেই বেরিয়েছিল "প্রতিটি লোককে নির্বীজ হতে রাজী করানোর জন্য মাদ্রাজের সমাজসেবকদের ২ টাকা করে 'বোনাস' দেওয়া হচ্ছে। টাকার লোভে তাঁরা অপারেশনের উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা না করেই লোকজনদের ধরে ধরে এনে নির্বীজ করে দিচ্ছেন" (১৬ই জানুয়ারী, '৭০; হানসেন, পৃ-১১)

লক্ষ্যণীয় ব্যাপারটা হ'ল, গণভাবে নির্বীজকরণের ব্যাপারটা শুধুমাত্র অনুন্নত দেশগুলোতেই করা হচ্ছে—'জনসংখ্যাবৃদ্ধির' মূল প্রচার দপ্তর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে নয়।

পুঁজিবাদী দেশগুলোতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-কর্মসূচীর লক্ষ্য হলেন —শ্রমিকশ্রেণী। আমেরিকার দিকেই তাকিয়ে দেখা যাক।

নয়া মালথুসপন্থী পেণ্ডেল্-এর মতে, "একমাত্র তাদেরই বিয়ে করার অধিকার দেওয়া উচিত যারা মাসে ১০০ ডলারের বেশি রোজগার করে" (মালিন, পৃ ১৩)। চার্লস ডারুইন কথাটাকে আরো খোলাখুলি বলেছিলেন, 'আমি এমন একটা ট্যাক্স পদ্ধতি চাই—যাতে যে যত ধনি, সে এতবেশি বাচ্চার জন্ম দিতে আকর্ষণবোধ করবে' (হানসেন, পৃ-১২)। সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে, দারিদ্র আর 'জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন' এ দুটোর মধ্যে একটা গানিতিক সম্পর্ক রয়েছে। একটা আরেকটার সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক (Inversely Proportional)। আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিগ্রোরা সব থেকে দারিদ্র বলে, তাদের ক্ষেত্রেই সব থেকে বেশি জোর দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনটা মার্কিন সরকার অনুভব করছেন। মার্কিন সরকারের 'অতিজনসংখ্যাতত্ত্বের' অন্যতম প্রচারক চার্লস ডারুইন (যাঁর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি) US News and World Report এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করেই

ঘোষণা করেছিলেন, "বর্তমানের আন্তর্বিপদটা হ'ল প্রচণ্ড হারে যে কঙ্কাল শিশুরা জন্মাচ্ছে তাদের নিয়েই" (ঐ, পৃ-১২)।

### অতিজনসংখ্যার তত্ত্ব'—কতখানি বৈজ্ঞানিক?

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত মালথুসীয় 'অতিজনসংখ্যার তত্ত্ব'কে সুখ্যাত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছি। যেহেতু এর প্রচারকরা একে একটি 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' বলে ঘোষণা করে থাকেন এবং মালথুস নিজেও দাবি করেছিলেন—তাঁর এই তত্ত্বটি একটি 'শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়ম', তাই আমরা এখন আলোচনা করে দেখবো—এর মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক বস্তু' কতখানি রয়েছে।

কোনো একটা তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক কিনা তা যাচাই করার একটা অন্যতম উপায় হ'ল, সেই তত্ত্বটিকে বাস্তব তথ্যগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখা। অবশ্য, বাস্তব তথ্যগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই যে একটা তত্ত্ব নিজেকে 'শতকরা একশো ভাগ বৈজ্ঞানিক' বা 'প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়ম' বলে দাবি করতে পারে, তা নয়, (তার সাথে আরো কতকগুলো পূর্বশর্ত পালন করতে হবে); অন্তত যে তত্ত্ব-আবিষ্কর্তার মধ্যে ন্যূনতম বিজ্ঞানী সত্তা ও মানসিকতা রয়েছে তিনি সেরকম উদ্ভট দাবি করেনও না। যাই হোক, আপাতত আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটাতে না গিয়ে, তথ্যের নিরিখেই পরীক্ষা করে দেখি—মালথুসীয় তত্ত্ব বাস্তবের সাথে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ।

মালথুস তাঁর তত্ত্বের ওপর সব চাইতে বেশি অংকের বাজি যেখানে ধরতে পারতেন, সেই রকম একটা 'আদর্শ সামাজিক পরিবেশের' (মালথুসের দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী) কথা ধরেই আমাদের পরীক্ষার কাজটা শুরু করা যাক। পরীক্ষা-ক্ষেত্র—বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ! দারিদ্র্য, বিশাল জনসংখ্যা, অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা ..সবই রয়েছে—মালথুসীয় তত্ত্বের পক্ষে এর চাইতে 'চমৎকার' জায়গা আর হয় না! অধ্যাপক পি. জে. টমাস ১৯০০-১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যাবৃদ্ধি, উৎপাদনবৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তার সারসংক্ষেপ আমরা নীচে তুলে ধরছি। এখন শোনা যাক অধ্যাপক টমাস কি বলেন:

"১৯০০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৯% কিন্তু খাদ্যবস্তু এবং কাঁচা মালের উৎপাদন বাড়ে প্রায় ৩০% আর শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১৮৯%! ..জনসংখ্যার বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়নি। বাস্তব ঘটনার পরিসংখ্যান, 'জনসংখ্যা উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে—' এই আতঙ্ককে সমর্থন করছে না।"
(আর. পি. দত্ত, পৃঃ ৫৩-৫৪)

মালথুস সাহেবের দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রিয় 'তত্ত্বের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ঘাঁটিটাও 'বিশ্বাসঘাতকতা' করলো। সুতরাং, যে সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনে তিনি তাঁর 'বিখ্যাত তত্ত্বটি' 'ছেড়ে' ছিলেন সেখানে যে এর পরিনাম কি হবে, তা সহজেই অনুমেয়। নয়া মালথুসপন্থীদের প্রধান ঘাঁটি মার্কিন মুলুককেই আসরে নামানো যাক। 'অতিজনসংখ্যার' প্রচারটা এখানেই সব থেকে বেশি; আর প্রচার-কৌশল, প্রয়োগ-পদ্ধতি ইত্যাদিও এখান থেকেই বেরোয়? তাই 'নয়া মালথুসীয় তত্ত্বের' ভিত্তিটা এখানে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার।

১৯৫৯ সালের ৪ঠা অক্টোবরের নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত 'কেমিক্যাল রেভল্যুশন অন দি ফার্ম' প্রবন্ধে উইলিয়াম বেরী কার্লং লিখেছিলেন, 'কোনো জাতি তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাবার জোগাতে সক্ষম হবে না'—বলে যে মালথুসীয় ভীতি ছিল, এই বিপ্লব (রসায়নিক) তাকে চিরতরে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে" (হ্যানসেন, পৃ-১৭)। কার্লং এরপরে লিখছেন:

"টমাস মালথুস যখন ১৭৯৮ সালে তাঁর শুকনো হতাশার তত্ত্বটি প্রথম উচ্চারণ করেন তখন আমেরিকার জনসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ এবং খাদ্যের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। আজ এর জনসংখ্যা ১৭৭০ লক্ষ আর খাদ্যের পরিমাণ অতীতের মতোই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ বেশী রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে—যদিও সাম্প্রতিক কালে দুটো যুদ্ধের সময় খাদ্যের চাহিদা অস্বাভাবিক রকমের বেশি ছিল, যদিও গত ২০ বছরে ১,৮০০,০০০টি ফার্ম অন্তর্হিত হয়েছে, যদিও প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ অবাদি জমি পরিণত হচ্ছে বড় রাস্তা, বাসস্থান বা কারখানায়" (ঐ, পৃ-১৮)! কার্লং-এর রিপোর্ট, মালথুসীয় তত্ত্বের পক্ষে একটি সাংঘাতিক 'বোমা'ই বলতে হবে!

মালথুসের মতে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে গড়ে আর খাদ্য-উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক প্রগতিতে। আর কার্লং-এর তথ্য অনুযায়ী বেরিয়ে আসছে, ১৭৯৮ সাল থেকে—যুদ্ধ, ফার্মের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং লক্ষ লক্ষ একর ফসলী জমি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, আমেরিকায় খাদ্য-উৎপাদন বেড়েছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির বহুগুন বেশি হারে!

এবারে কার্লং যা বলছেন, তা মালথুসীয় গাণিতিক প্রগতির' পক্ষে হৃদয়বিদারক' একটি তথ্য:

"১৮৫০ সালের সময় ৪ জন কৃষক ৫ জনের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন করতে পারতো। ১৯৪০ সালে একজন কৃষক বা উৎপাদন করতো তা অনায়াসে ১০ জনকে খাওয়াতে পারে। আর আজকে

একজন কৃষক যে পরিমাণ খাদ্য ও তুলো উৎপাদন করে, তা ২৯ জনের প্রয়োজনের তুলনায়ও যথেষ্ট” (ঐ, পৃ-১৮)।

উৎপাদনের এই বৃদ্ধিকে নয়া-মালথুসপন্থীরা কি নামে অভিহিত করবেন?—গাণিতিক প্রগতি? তা হলে তো গাণিতিক প্রগতির সজ্ঞাটাই পাল্টে দিতে হয়!

বর্দ্ধিত জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য উৎপাদন কি পরিমাণে বেড়েছে এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে—সেটা এবারে শুনুন:

“১৯১৮ সাল থেকে আজ অবধি মোট যে পরিমাণ জমি বছরে চাষ করা তার মধ্যে গত বছরের (১৯৫৯) পরিমাণ ছিল সব চাইতে কম। তা সত্ত্বেও, গত বছরের মোট খাদ্যউৎপাদন পূর্ব্বতন রেকর্ডকে ১১% ছাড়িয়ে গেছে। গম ও শস্যের উৎপাদন এতো বেশি হয়েছে যে তা দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছে” (ঐ, পৃ-১৯)।

সুতরাং ‘বিস্ফোরণটা’ জনসংখ্যার নয়, অতি উৎপাদিত খাদ্যের! অনাগত শিশুরা নয়, অতি উৎপাদিত খাদ্যবস্তুই আমেরিকার ব্যবসায়ীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে!

‘অতি জনসংখ্যা তত্ত্বের’ প্রচার কেন্দ্রের এই হ’ল ভেতরের চেহারা। সুতরাং মালথুসীয় তত্ত্বের ‘অনিবার্যতা’ নিয়ে যারা দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ ফেলছে, কোটি কোটি ডলার খরচ করে (নিজেদের বাড়তি খাদ্য, সাহায্য হিসেবে দিয়ে নয়; তা হলে অনুন্নত দেশগুলোতে চড়া দামে খাদ্যশস্য বিক্রী করা যাবে না যে!) অনুন্নত দেশগুলোর দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ‘গণ-নির্বীজকরণ’-কর্মসূচী নিয়েছে—তাদের দুরভিসন্ধিটি এখন জলের মতো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে!

**উপসংহার**

উপরের আলোচনাতে আমরা দেখেছি—সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী যে সমস্ত নয়া মালথুসপন্থীরা ‘মানবজাতির অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের’ দোহাই পেড়ে ‘জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের’ দাওয়াই বাতলান, তাঁদের উদ্দেশ্য মুখ্যত দুটি:

(১) নিজেদের দেশের সমাজব্যবস্থাকে স্থায়ী ও সুরক্ষিত করার জন্য বিপ্লবী মেহনতী মানুষের সংখ্যা সীমিত করা—অর্থাৎ পুঁজিপতিদের প্রয়োজনের বেশি, শ্রমিক শ্রেণী যাতে বাড়তে না পারে।

এবং

(২) তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে, যেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যথেষ্ট মজবুত নয় অথচ, যার সুবাদে সাম্রাজ্যবাদ অঢেল লুটের সুযোগ পাচ্ছে—সেখানে জনসংখ্যাকে আয়ত্তাধীন রাখা। কারণ তারা ভালোভাবেই জানে, ক্ষুধা এবং ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ বিপ্লবের জন্ম দেয়।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দুর্দশাপীড়িত ব্যাপক জনসাধারণ যুক্ত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিপুল উন্নতি দেখে পাছে কমিউনিষ্ট আদর্শে প্রভাবিত হয়ে যায়, তাই স্বভাবতই নয়া-মালথুসপন্থীদের ক্রোধ ও ঘৃণা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর ওপর গিয়ে পড়ছে। ‘চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানবজাতির সর্বনাশ নিয়ে আসছে’ (কথাটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য! চীনের জনগণকে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলো খাবার জোগাচ্ছে, এমন কথা সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর দালালও বলতে লজ্জা পাবে!) সেই আটপৌড়ে সনাতন শ্লোগান তুলে এঁদেরই একজন—উইলিয়াম ভোগ্ট (Willam Vogt) নির্লজ্জের মতো ঘোষণা করেছেন, “চীনে একটা বড় রকমের দুর্ভিক্ষ, শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, মানবজাতির স্বার্থে অপরিহার্যও বটে” (মালিন, পৃ-১৩)।

শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণ করে সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি যথেষ্ট সফল করা সম্ভব নয় বলে, নয়া মালথুসপন্থীরা মহামারি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য সমগোত্রীয় পন্থার কথাও ভাবছেন! ফরাসী মালথুসপন্থী Paul Reboux-এর কাছে যুদ্ধই ‘বেশি পছন্দসই’। তাঁর মতে, এটাই হ’ল জনসংখ্যা কমানোর ‘সবচাইতে কার্যকরী পন্থা’। শুধু তাই নয়, মানবজাতির প্রতি তাঁর ‘মমত্ববোধ’ অনুযায়ী, “এই যুদ্ধের নির্মমতা বাড়তি জনসংখ্যার সাথে সমানুপাতিক হওয়া উচিত”। (ঐ)

আর একজন মালথুসপন্থী—কিঙ্সলে ডেভিস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আয়োজন করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁর ‘ইচ্ছে,’ “এতে পারমানবিক ও জীবাণু অস্ত্র (Biological Weapon)—দুটোই নির্বিচারে ব্যবহার করা হোক।” “এটা যদি করা যায়,” তা’ হলে কিঙ্সলে ‘প্রতিশ্রুতি’ দিচ্ছেন, “এরপর যে হারে মানুষের সুখসাচ্ছন্দ্য বাড়বে তা কল্পনারও বাইরে” (ঐ)।

কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোতে যাঁদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত ‘প্রতিষেধকের’ কথা ভাবা হচ্ছে, ‘অতি-জনসংখ্যা তত্ত্বের’ সেই ‘জনগণ’ কারা? কিউবার বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৫৩ সালে তাঁর নিজের দেশ কিউবা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এর উত্তরটা দিয়েছিলেন:

“জনগণ বলতে আমরা জাতির সেই ধনী রক্ষণশীল অংশটির কথা বলি না, যারা যে কোনো শোষণের রাজত্ব থেকে নিজেদের সুবিধাটুকু তুলতে ব্যস্ত, নিজেদের সাচ্ছন্দ্য ভিক্ষা করতে যারা যে কোনো স্বেচ্ছাচারী শাসকের পায়ের গোড়ায় নতজানু হতে দ্বিধাবোধ করে না…

“সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে যখন আমরা জনগণের কথা বলি তখন আমরা সেই ৬ লক্ষ কিউবার অধিবাসীদের কথাই বলি, যারা বেকার, যারা সুযোগের সন্ধানে বাইরে না গিয়ে তাদের মাতৃভূমিতেই মেহনত করে সৎভাবে বেঁচে থাকতে চায়…

"আমরা সেই ৫ লক্ষ যুবকদের কথা বলি, যারা দুঃস্থ কুটিরগুলোতে থাকে, যারা বছরে চারমাসের বেশি কাজ জোটাতে না পেরে সপরিবারে উপোষ দিয়ে থাকে, নিজেদের বলতে যাদের এক ইঞ্চিও জমি নেই...

"জনগণ বলতে আমরা সেই ৪ লক্ষ শিল্প শ্রমিকদের কথা বলি, যাদের অবসরগ্রহণকালীন প্রাপ্য টাকা চুরি করে নেওয়া হয়েছে, সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে যারা বঞ্চিত, যাদের বাসস্থান বলতে একটিমাত্র ভাড়াকরা কুঠরীকেই বোঝায়, যাদের মাইনে মালিকের হাত থেকে মহাজনের হাতে চলে যায়, যাদের ভবিষ্যৎ—মজুরী এবং ছাঁটাই দিয়ে ভাগ করা, যাদের জীবন হ'ল অন্তহীন শ্রম এবং যাদের বিশ্রামের একমাত্র স্থান হ'ল—কবর।

"জনগণ বলতে আমরা সেই এক লক্ষ ভাগচাষীর কথা বলি, যারা এমন একটা জমিতে শ্রম ঢেলে বাঁচে এবং যারা বায় তাদের নয়, যারা সামন্তযুগের ভূমিদাসদের মতো ফসলের বিরাট একটা অংশ মালিককে দিয়ে জমিটুকু চাষ করার অধিকার পায়, যারা তাদের শ্রম-সিক্ত জমিটুকুকে না পারে ভালোবাসতে, না পারে উন্নত করতে বা একটা লেবুর গাছ পুঁতে সুন্দর করে তুলতে...কারণ তারা জানে না কখন গ্রামরক্ষীদের সাথে মালিক এসে তাদের জমি ছেড়ে চলে যেতে বলবে।

"জনগণ বলতে আমরা সেই ৩০,০০০ নিঃস্বার্থ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের কথা বলি যাঁদের কাজ আমাদের বংশধরদের সুস্থ, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য, অথচ যাঁরা—না পান তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা না পান একটা সাচ্ছন্দ্যময় জীবন...

"জনগণ বলতে, আমরা সেই ঋণ-জর্জরিত ২০,০০০ ছোট ব্যবসায়ীকে বুঝিয়ে থাকি, যারা অর্থনৈতিক সংকটের চাপে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং সরকারী কর্মচারীরা যাদের শেষ প্রাণশক্তিটুকুও শুষে নিচ্ছে।

"জনগণ বলতে আমরা সেই ১০ হাজার তরুণদের কথা বলি যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক, শিল্পী · যারা সংগ্রাম করার মানসিকতা এবং অফুরন্ত আশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে আবিষ্কার করে—এমন একটা কানাগলিতে এসে পড়েছে যেখানে আবেদন-নিবেদনের সবক'টা দরজাই বন্ধ ...

"এরাই হ'ল আমার জনগণ; আমি যখন জনগণ কথাটা উচ্চারণ করি তখন এদের কথাই বোঝাই—যারা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার শিকার। আর তাই, হিম্মতের সাথে লড়তে সক্ষম!"

### গ্রন্থপঞ্জী


1. How many the Earth will Feed ?—K. Malin
2. The "Population"—How the Socialists View it —Joseph Hansen
3. India Today—R. P. Dutt
4. The American Review, Autumn '1974

# আমাদের দুর্ভিক্ষ ত্রাণ অভিযানের অভিজ্ঞতা

—মেডিকেল স্টুডেন্ট্‌স রিলিফ কমিটি

●[ গত পুজোর ছুটিতে কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বাঁকুড়া জেলার একটি অত্যন্ত পশ্চাদপদ ও দুর্গত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ত্রাণ অভিযানে গিয়েছিলেন। কোনো সরকারী বা বেসরকারী ত্রাণ সংস্থার অধীনে **স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নয়, সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে সতন্ত্রভাবেই** তারা এই অভিযানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। সরকারী বেসরকারী অন্যান্য ত্রাণকার্যের সাথে তাদের এই অভিযানের মৌলিক পার্থক্য হ'ল দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্যের প্রশ্নে। "করুণার 'উচ্চ' পাদপীঠ থেকে" দুর্গত মানুষদের কাছে নিজেদেরকে "ত্রাতার" ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে তারা এই ত্রাণ অভিযানে যান নি, **"ঋণীর বিনম্রভঙ্গী থেকে" সেবা করার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী দুর্গত মানুষদের কাছে তাঁদের জমে থাকা ঋণ পরিশোধের একটি প্রচেষ্টা হিসাবেই তারা এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন।** সেবাকার্যের সাথে সাথে তাঁদের আরও লক্ষ্য ছিল 'দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করা ও তথ্যসংগ্রহ করা', জনসাধারণ ও তাদের 'নিজেদের মধ্যেকার ব্যবধানের প্রাচীরকে ভাঙতে শেখা' এবং 'উদ্দেশ্যহীনতার শিকার ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি বলিষ্ঠ নতুন উদ্দেশ্যকে মূর্ত করে তোলা।' অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের দিক থেকে এই ত্রাণ অভিযান ছিল মূলত একটি **শিক্ষা কর্মসূচী**। নীচের রিপোর্টটি, এই ত্রাণ অভিযান কর্মসূচী তাঁদেরকে যে বিপুল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে তারই একটি সাধারণ বিবরণ শুধুমাত্র ডাক্তারী ছাত্ররাই নয়, আমাদের মনে হয়, দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি ছাত্র ও যুবসংগঠন যতো ব্যাপকভাবে এই ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেন ততোই ভালো।—সঃ মঃ বীঃ ]●

**পটভূমি**

সাম্প্রতিক কালে আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ও অপেক্ষাকৃত নবীন চিকিৎসকদের অনেকের মধ্যেই চিকিৎসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি নতুন চেতনা ও নীতিবোধের জন্ম হচ্ছে এবং বিকাশলাভ করছে। এই নীতিবোধের মূল কথাটা হ'ল জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা তাঁদের পেশার মাধ্যমে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করুন, তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু তাঁদের মূল দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত মানুষের সেবা করা। অর্থাৎ সেই সব মানুষদের সেবা করা, যাঁরা দেশের অধিকাংশ অথচ অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করানোর সাধ্য যাঁদের নেই। অবশ্য আপাতভাবে এই মূল্যবোধ নতুন কিছু নয়। দুর্গত মানুষদের সেবা করাই যে চিকিৎসকদের কর্তব্য এই ধরণের বিমূর্ত নীতিকথা অনেক দিন ধরেই প্রচলিত আছে। তবে পুরানো সেবার আদর্শের সাথে এই নতুন সেবার আদর্শের পার্থক্য হচ্ছে, এই আদর্শ দাবি করে—চিকিৎসককে এখানে নিজেকে ভাই, বন্ধু বা সন্তানের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, "ত্রাতার" ভূমিকায় নয়। করুণার 'উচ্চ' পাদপীঠ থেকে নয়, ঋণীর বিনম্র ভঙ্গীতে তাকে দুর্গত মানুষের কাছে যেতে হবে। ঋণীর ভঙ্গীতে কারণ আমাদের শিক্ষার বিপুল ব্যয়ের অধিকাংশই আসে এই কোটি কোটি জনতার কাছ থেকে; তাঁদের ক্ষুধা, মৃত্যু ও অশ্রুর মূল্যেই আমরা বেঁচে আছি। যে প্রক্রিয়ায় তাঁদের সৃষ্ট সম্পদের ফল আমরা ভোগ করছি তা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু ঋণ শোধের জন্য প্রচেষ্টা চালানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই নতুন উপলব্ধির আলোয় "করুণা" একটা অপমানজনক শব্দ মাত্র, শ্রদ্ধাবিনম্র ভালোবাসাই একমাত্র সঠিক মনোভাব। এই নীতিবোধ যেহেতু একটি সামাজিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তিহীন আবেগের উপর নয়, সেহেতু এর আবেদন অনেক বেশি শক্তিশালী। নিজের বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাশক্তির সাথে প্রতারণা না করে একে এড়ান সম্ভব নয়। এই নীতিবোধের আলোয় আমাদের কাছে মানুষের সেবা করার অর্থও নতুন চেহারা নিচ্ছে, দায়িত্ববোধের সীমারেখাও ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি—চিকিৎসকের দায়িত্ব শুধু রোগীকে ওষুধ ও পথ্যের তালিকা দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সেগুলি যাতে তাঁরা পেতে পারেন তার পথ সন্ধান করা; শুধু রোগনির্ণয় করা নয়, রোগের জন্ম হ'ল কি করে তারও খোঁজ করা; শুধু রোগ নিরাময় করা নয়, রোগের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করা। আর সাথে সাথে এও

আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এই নতুন দায়িত্ববোধ পালনের জন্য বইয়ের পাতা এবং শব-ব্যবচ্ছেদই যথেষ্ট নয়, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য-পীড়িত কোটি কোটি মানুষের জীবনের পাঠশালা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। চিকিৎসক এবং সহায়সম্বলহীন রোগীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা কৃত্রিম প্রাচীরকে ভেঙে ফেলার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সম্প্রতি, খুব ক্ষীণভাবে হলেও, এই ধরণের প্রচেষ্টার প্রথম স্বাক্ষর দেখা গিয়েছিল, কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া, ডাক্তার ও ডাক্তারীছাত্রদের মিলিত আন্দোলনে, যখন তাঁরা শুধু নিজেদের জন্যই নয়, দুঃস্থ সহায়সম্বলহীন রোগীদের জন্যও প্রকাশ্য রাজপথে নেমে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে আরও দীর্ঘ মেয়াদী চরিত্রের নানা প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। যেমন, একাধিক মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কলকাতার বিভিন্ন বস্তী-অঞ্চলে চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে নিয়মিত সেখানকার মানুষদের সাধ্যমত সেবার মধ্য দিয়ে তাঁদের সমস্যাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ এই নতুন নীতিবোধ আরও দৃঢ় হচ্ছে এবং বিস্তৃতি লাভ করছে। আমাদের 'দুর্ভিক্ষ ত্রাণ অভিযানে'র এই হ'ল পটভূমি। **নবলব্ধ চেতনা ও তাকে কাজে রূপ দেবার এই নিরন্তর প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতাতেই এই অভিযান ও তার বিবরণকে দেখতে হবে।** তা না হ'লে এর সঠিক তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আমরা বুঝতে পারব না।

অভিযানের প্রস্তুতিপর্বে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রাণবন্ত বিতর্ক চলে, তাতেও এই নতুন চেতনার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। যেমন প্রশ্ন উঠেছিল—আমাদের এই সীমিত সাধ্যের মধ্যে আমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের কতটুকু আর সাহায্য করতে পারি? এই সামান্য সাহায্য নিয়ে গিয়ে কি লাভ? আমাদের দেশেতো মাঝেমাঝেই দুর্ভিক্ষ হচ্ছে আর ত্রাণকার্য করার জন্য অনেক সরকারী ও বে-সরকারী সংস্থা উদ্যোগও নিচ্ছে। কিন্তু তাতে কি দুর্ভিক্ষ রোধ করা যাচ্ছে? আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষতো সারা বছরই ক্ষুধা ও মৃত্যুর মধ্যে বাস করছেন। দুর্ভিক্ষের সময় তার পরিমাণটা বেড়ে যায় এইমাত্র। ত্রাণকার্য করে কি এই মানুষদের বাঁচানো যাবে? তা যদি যায়, তবে সারা বছরই আমাদের একের পর এক ত্রাণকার্য চালিয়ে যাওয়া উচিত। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে এই ধরণের ত্রাণকার্য হাতে নেওয়া, সময় ও শ্রমের অপচয় মাত্র। এই সময় ও শ্রম—বরং দুর্ভিক্ষকে কি করে চিরতরে রোধ করা যায় সেই পথ খুঁজে বার করার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। আলোচনায় আমরা একমত হয়েছিলাম—আমাদের ত্রাণকার্যের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের খুব বেশি উপকার করতে পারবো, এরকম কোনো মোহ নিয়ে আমরা যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি প্রধানত আমাদের নিজেদের উপকারের জন্যই। দুর্ভিক্ষকে রোধ করার জন্য মনোগত বাসনা বা বইপত্র থেকে কিছু বিমূর্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ট নয়। দুর্ভিক্ষের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচিতি ছাড়া এইসব অভিলাষ বা তত্ত্ব (যদি আমাদের থাকেও) কোনো কাজে লাগবে না। একদিকে সেইসব তত্ত্বের কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, আমরা বুঝতে পারব না। অন্যদিকে সেইসব ইচ্ছা বা তত্ত্বকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনীয় মানসিকতাও আমরা অর্জন করতে পারব না। শুধু ভাবনাচিন্তা বা নিজেদের দাবি দাওয়ার জন্য আন্দোলন করে, আত্মকেন্দ্রিকতার নিগড়কে ভাঙা যায় না। জনতার গভীর বেদনার সময় সাধ্যমত তাঁদের দুঃখের বোঝা লাঘব করার চেষ্টাটা এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হবার একটি অন্যতম শক্তিশালী উপায়। এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে ছাত্রসমাজের সাথে, বিশেষভাবে চিকিৎসক সমাজের সাথে জনতার ব্যবধানের প্রাচীরগুলিকে আমরা ভেঙে ফেলার দিকে এগুতে পারবো। সারা বছর ধরে এ' ধরণের প্রচেষ্টা যেখানে যতটুকু চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, আমাদের নিশ্চয়ই চালানো উচিত। কিন্তু সাথে সাথে এটাও খেয়াল রাখা দরকার, সারা বছরের দুঃখ-দারিদ্র্যের সাথে দুর্ভিক্ষের অবস্থার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। সাধারণ অবস্থায় অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ তার মানবিকবোধগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের অবস্থায় হঠাৎ একটা অল্প সময়-সীমার মধ্যে সেগুলির অবলুপ্তি ঘটে। গ্রামের যে কিষাণী মা অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও পেটের খিদে চেপে রেখে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেন তিনিই দুর্ভিক্ষের সময় সন্তানের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করে খান স্নেহময় পিতা তাঁর সন্তান ও স্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে পালান। আর মৃত্যুও তখন, কিছুটা ব্যাতিক্রমমূলক বিচ্ছিন্ন ঘটনার বদলে, একটা সাধারণ নিয়ম হয়ে ওঠে। কাজেই এই বিশেষ অবস্থাটা বোঝার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বেদনার এই বিপুল বিস্ফোরণের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলে, আমাদের চেতনায় পরিবর্তনেও তা অনেক শক্তিশালী ভূমিকা নিতে পারে। অন্যদিকে যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর কাছে আজও, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা, নতুন নীতিবোধের বার্তা পৌঁছায় নি এই ধরণের ত্রাণ অভিযানের মানবিক আবেদন তাঁদেরকে সেই নীতিবোধের পতাকাতলে সমবেত করতে সাহায্য করবে। কারণ দুর্ভিক্ষের এই আপাতভাবে হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিপর্যয়মূলক চেহারাটা, সুখ-দুঃখের প্রতি সাধারণভাবে উদাসীন ব্যক্তিকেও নাড়া দেয়। সুতরাং আলোচনা থেকে ত্রাণকার্য ছাড়াও, এই ত্রাণ অভিযানের তিনটি উদ্দেশ্য বেরিয়ে এসেছিল—

(১) দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করা ও তথ্য সংগ্রহ করা,

(২) জনসাধারণ ও আমাদের নিজেদের মধ্যেকার ব্যবধানের প্রাচীরকে ভাঙতে শেখা, এবং

(৩) উদ্দেশ্যহীনতার শিকার ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি বলিষ্ঠ নতুন উদ্দেশ্যকে মূর্তভাবে তুলে ধরা।

### প্রস্তুতিপর্ব

এই কার্যক্রম গ্রহণ করতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। পুজোর ছুটির অল্প কিছুদিন আগে কাজটা শুরু করায়, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ছাত্রছাত্রীকে কাজের জন্য পাওয়া গেল। অনেক আলোচনার পর ডেন্টাল কলেজসহ কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই সংস্থা—'মেডিকেল স্টুডেন্টস্ রিলিফ কমিটি' তৈরী করা হ'ল। এই সংস্থার তরফ থেকেই এরপর কাজ শুরু হ'ল। প্রস্তুতিপর্বে আমাদের মূল কাজ ছিল দু'টি। একটি হ'ল ত্রাণকার্যের সামগ্রী সংগ্রহ করা। অপরটি হ'ল ত্রাণকার্যের স্থান নির্বাচন ও ত্রাণকার্য সংগঠিত করার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী নানা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা। এই দুটি কাজের ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ আমরা নীচে রাখছি।

### সংগ্রহ অভিযান

আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকা যোগাড় করা আর তার সাথে সাথে, সম্ভব হলে, ওষুধ। কলেজ বন্ধের মুখে কাজটা শুরু করায় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এগিয়ে এলেও, প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যাটা হ'ল অত্যন্ত কম। একই কারণে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি টাকাপয়সা উঠলো না। কলেজ, হাসপাতালের শিক্ষক, চিকিৎসক ও হাউসস্টাফরা—প্রায় সবাই টাকা আর ওষুধ দিয়ে আমাদের সাহায্য করলেন।

অন্যান্য সাধারণ কলেজগুলো থেকে অর্থসংগ্রহের জন্যে আমরা প্ল্যাকার্ড আর টিনের কৌটো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে 'লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ'। যা আশা করা হয়েছিল, তার থেকে অনেক কম সংগ্রহ হ'ল। এলাম 'গোয়েঙ্কা কলেজে'। গেটে সভা করে টাকা তোলার অনুরোধ ছাত্রসংসদের তরফ থেকে নাকচ করে দেওয়া হ'ল। কারণ বুঝলাম না। এরপর অবশ্য ছাত্রসংসদের একজন সভ্যের সহযোগিতাতেই ক্লাশে ক্লাশে গিয়ে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে টাকাপয়সা সংগ্রহ হ'ল। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল এই কলেজের শিক্ষকদের কাছে গিয়ে। তাঁরা জানালেন যৌথভাবে দুর্ভিক্ষের জন্যে 'ত্রাণ তহবিলে' তাঁরা কিছু দিয়েছেন, তাছাড়া অধ্যাপক সংস্থাগুলোর পরামর্শ ব্যতীত তাঁদের পক্ষে কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি যদি কাজটাকে ঠিক বলে মনে করেন, তার পরেও কি আপনি নিজের থেকে কিছুই সাহায্য করতে পারেন না? স্পষ্ট উত্তর এল—"না"।

প্রেসিডেন্সী কলেজ। গেটের বাইরে রাস্তার ওপরে প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান* দিতে দিতে অর্থসংগ্রহ শুরু হ'ল। হঠাৎ কলেজের ভেতর থেকে একজন (দেখে মনে হ'ল ছাত্র) মারমুখো হয়ে ছুটে এলেন—"এটা রাজনৈতিক ব্যাপার।" "আমরা টাকা তুলে রাজ্যপালের ত্রাণ তহবিলে দিয়েছি—আর প্রয়োজন নেই।" "কলেজের পরিস্থিতি ভাল নয়—স্লোগান দিলে কলেজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হবে"—ইত্যাদি ইত্যাদি এবং শেষে "এখানে স্লোগান দেওয়া বা কালেকশন করা চলবে না।"

কলেজগুলো থেকে অর্থসংগ্রহের এখানেই আমাদের ইতি।

এরপর ছোটখাটো বক্তৃতা আর স্লোগান দিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে "বক্স কালেকশন"—অনেকেই মাথায় হাত ঠেকিয়ে সরে দাঁড়ালেন। কয়েকজন এও জিজ্ঞাসা করলেন—খেটে খাইনা কেন; আবার অনেকেই টাকা পয়সা দিলেন। সবশেষে আমরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে লিফলেট দিয়ে বিল বই-এ চাঁদা তুললাম।

সবমিলিয়ে পঁচিশ-তিরিশজন ছাত্রছাত্রীর সাত-আটদিনের সমস্ত ধরণের চেষ্টার ফলাফল দাঁড়াল তিন হাজার টাকা আর কিছু ওষুধ।

### যোগাযোগ

কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন শিক্ষক ও ডাক্তারদের মারফৎ আমরা সমস্ত ধরণের বে-সরকারী ত্রাণসংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলাম—যদি তাঁরা আমাদের কিছু সাহায্য করেন। এদের মধ্যে আছে মাদার টেরেসা, রেডক্রশ, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, লায়নস ক্লাব, রোটারি ক্লাব, সি. এন. এস. এ.। সব জায়গা থেকেই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হ'ল। এঁদের কেউই নিজেদের পরিচালিত ত্রাণকেন্দ্রের বাইরে অন্য কোনো নতুন ত্রাণকেন্দ্রে সাহায্য করতে রাজী হলেন না। তবে এরমধ্যে আই. এম. এ. এবং রেডক্রশ তাঁদের বাঁকুড়া শাখায় চিঠি দিয়ে দিলেন, যদি তাঁরা স্থানীয়ভাবে কিছু সাহায্য করতে পারেন।

অনুমোদনপত্র দিয়ে সাহায্য করলেন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ ও নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ-

---

* আমাদের স্লোগান ছিল—'মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষকে রোধ করো', 'গ্রাম বাঙলার দুর্দিনে গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়ান', 'মেডিকেল স্টুডেন্টস্ রিলিফ কমিটি জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। —মেঃ স্টুঃ রিঃ কঃ।

মশাই। এগুলো নিয়ে আমরা গেলাম 'ডিন অব মেডিকেল ফ্যাকাল্টি', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীঅজিত বসুর কাছে। ইনি প্রথমে আশংকা প্রকাশ করলেন যে আমরা এম. বি. বি. এস "পরীক্ষা পেছানোর জন্য" এসব করছি এবং জানালেন ডাক্তারীছাত্রদের উপর তিনি বীতশ্রদ্ধ। তাদের উনি কোনো-রকম সাহায্য করতে রাজী নন; তবে পরে উনি দুটো চিঠি দিলেন, একটা সাধারণভাবে আর অন্যটা ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায়কে। গেলাম মহাকরণে। চিরকুট লিখে ঘন্টা কয়েক বসে থাকার পর ত্রাণমন্ত্রীর বদলে দেখা করলেন ঐ মন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারী। জানা-লাম—আমরা আমাদের সংগ্রহ নিয়ে সরকারী কোনো লঙ্গরখানায় কাজ করতে চাই। উত্তর এল—ওনার কিছুই করবার নেই, এমনকি অনুমোদনপত্রও দিতে পারবেন না। উনিই পাঠালেন ত্রাণমন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারীর কাছে। উনিও সাহায্য করতে অপারগ। বললেন—চব্বিশ পরগণার জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে।

বাইশে অক্টোবর আমরা গেলাম জেলাশাসকের কাছে। ওনাকে না পেয়ে, দেখা করলাম অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁর জেলার ভেতরে হলে যানবাহন দিয়ে সাহায্য করবেন। আর সস্তায় খাদ্যশস্য পেতে হলে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ইনি আমাদের সুন্দরবনের সাগরদ্বীপে যাবার প্রস্তাব দিলেন। সাগরদ্বীপে যাবার প্রস্তাবে আমরা নারাজ হলাম। কারণ ওখানে কোনো লঙ্গরখানা নেই, আমাদের স্বল্পসংগ্রহ নিয়ে নতুন কোনো লঙ্গরখানা আমরা চালাতে পারবো না; এছাড়া সাগরদ্বীপে যেতে হলে দেরী হয়ে যাবে। ছুটলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘের অফিসে। সংঘ আমাদের সবরকম সাহায্য করতে রাজী হলেন। আমরা ঠিক করলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত বাঁকুড়ার চারটে ত্রাণকেন্দ্রের যে কোনো একটাতে যাব। ফিরে গেলাম চব্বিশপরগণার অতিরিক্ত জেলা-শাসকের কাছে। জানালাম—আমরা বাঁকুড়া যাচ্ছি। উনি বাঁকুড়ার জেলাশাসককে একটা চিঠি লিখে দিলেন, আমাদের সাহায্য করার জন্য।

**অভিযান**

বাঁকুড়া। দুর্গাপূজার নবমীর দিন আমরা গিয়ে উঠলাম ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমে। বাঁকুড়াতে সংঘের তত্ত্বাবধানে চারটে লঙ্গরখানা চলছে। এর মধ্যে দুটো কিছুটা দুর্গম জায়গায়—একটা শালতোড়ায় অন্যটা ভেদুয়াশোলে... একটা শালতোড়ায় অন্যটা ভেথরীতে। সংঘের স্বামিজীর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম আমরা ভেথরীতে যাব, কারণ সেখানে কোনো রকম চিকিৎসা-সাহায্য পৌঁছাচ্ছে না। অন্যদিকে এটাও আমরা ঠিক করলাম, যে আমরা শুকনো চাল দেব কারণ একত্রিশে অক্টোবর সরকারের তরফ থেকে লঙ্গরখানা বন্ধ করে দেওয়া হ[চ্ছে।] আমরা রান্না করে খাওয়ালে, সে ক'দিনের বরাদ্দ গম, সব্জী ইত্য[াদি] যা বাঁচবে, সেগুলো ওখানকার মানুষরা পাবে না—ফেরৎ চলে যা[বে।] অতঃপর আমাদের সমস্যা দাঁড়াল সমস্ত চাল কেনা ও সেগুলো বয়ে ভেথরীতে নিয়ে যাওয়া। বাঁকুড়া থেকে ভেথ[রীর] দূরত্ব কুড়ি-বাইশ মাইল। বাসরাস্তা মাইল সাতেক দূর দিয়ে [চলে] গেছে। ভেথরীর দেড়মাইল আগে দুটো ছোট ছোট নদী পড়ে। ট্রাক যায় নদীর এপার পর্যন্ত। ওপার থেকে গরুর গাড়ী। একম[াত্র] জীপেই শেষপর্যন্ত যাওয়া যায়।

রেডক্রশের বাঁকুড়া শাখা আমাদের কোনো সাহায্য কর[তে] পারলেন না। আই. এম. এ.-র সঙ্গে যোগাযোগই করা গেল না। ফো[ন] করলাম জেলাশাসককে। চব্বিশপরগণার অতিরিক্ত জেলাশাসকে[র] চিঠির কথা উল্লেখ করার আগেই উনি জানিয়ে দিলেন বে-সরকা[রী] কোনো সংস্থাকে গাড়ী দেওয়া যায় না। আর সস্তায় খাবারদাবার[ও] বিশেষত চাল পাওয়া যাবে না।

ভাড়ায় ট্রাকের খোঁজে বেরুলাম। যোগাযোগ হ'ল বাঁকু[ড়া] চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির কয়েকজনের সঙ্গে। অনুমোদন-পত্রগুলো দেখানোর পর পৌঁছে গেলাম একখানা অতি আধুনিক শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে! বসেছিলেন বিষ্ণুলাল বাজুরিয়া—সেক্রেটারি চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ, এবং আরো কয়েকজন, আলোচনা করছিলেন—তাঁদের গাড়ীগুলোর আসন কি দিয়ে মুড়লে তা আরো আরামদায়ক হবে। অনুমোদনপত্রগুলো দেখানোর পর সম্পাদকমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—চা, না কোকোকোলা? চা আসার ফাঁকে জানালেন, তাঁরা উনচল্লিশখানা লঙ্গরখানা খুলে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষকে 'চেক' করেছেন। এখন আর খাবারের অভাব নেই। বিষ্ণুবাবু আরো বললেন যে বিনি পয়সায় ট্রাক পাওয়া যাবে না। ভাড়া করতে হবে, তবে কিছুটা সস্তা উনি করে দেবেন।

রাস্তায় নেমে পড়লাম। চোখে পড়ল—সরকারী জীপগাড়ীতে ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে প্রতিমা দর্শনে বেরিয়েছে!

বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বাঁকুড়ার প্রধান মেডিকেল অফিসারের (সি. এম. ও) সঙ্গে। ইনি সঙ্গে সঙ্গেই সবরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এনার মারফৎ আমরা পেলাম মালপত্র বওয়ার জন্য একটা ট্রেলার সহ দুটো জীপ। কোন না করেই এবার সোজা চলে গেলাম জেলাশাসকের কাছে, হাতে চব্বিশপরগণার অতিরিক্ত জেলাশাসকের চিঠি। আমরা ভেথরী যাচ্ছি শুনে বললেন—ঐ অঞ্চলটা দুর্গম আর দুঃস্থ। উনি নিজেও ঐ

জায়গায় কখনও যাননি। আর আমরাও ওখানে গিয়ে ভুল করব, (কারণ আমাদের খুব অসুবিধে, কষ্ট ইত্যাদি হবে)। আগে জানালে উনি বাংলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিতেন…। আরও জানালেন যে একত্রিশে অক্টোবরের পর আর এ সঙ্কট থাকবে না।

আমরা জানালাম—অসুবিধে হবে জেনেই আমরা এসেছি আর সবচেয়ে দুঃস্থ অঞ্চলেই আমরা যেতে চাই। তিনি যদি একটা জীপের বন্দোবস্ত করে দেন তাহ'লে ভালো হয়। জেলাশাসক আমাদের একটা ট্রেলারসহ জীপ দিলেন। পেট্রোল খরচা আমাদের দিতে হ'ল। খোলাবাজার থেকেই আমরা দশ কুইন্টাল নতুন চাল কিনলাম। তেখরীর দিকে রওনা দিলাম দশমীর দিন।

তেখরী। ছোট-বড় গোটা পঁয়ত্রিশ গ্রাম নিয়ে তেখরী অঞ্চল। এটা ছাতনা ব্লকের অন্তর্গত। আমরা গিয়ে উঠলাম ভগবানপুর হাই স্কুলে। ছোট স্কুল—চারপাশে খোলা মাঠ। দূরে দূরে গোল হয়ে গ্রামগুলো ঘিরে আছে।

আসবার সময় চোখে পড়েছিল চারপাশের ক্ষেতে প্রচুর ধান হয়েছে। অনেক ক্ষেতেই ধান কাটা শুরু হয়েছে। লোকদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থাটা এখানে কেটে গেছে। অর্থাৎ তেখরীর যে ছবি আমরা দেখেছি সেটা দুর্ভিক্ষের নয়, দুর্ভিক্ষের ভেতর দিয়ে সবে পার হয়ে এসেছে এরকম একটা অবস্থার।

পৌঁছানোর সাথে সাথেই ছুটে আসলেন গ্রামপঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ, অঞ্চলপ্রধান ইত্যাদিরা। প্রাথমিক কথাবার্তা হবার পর আমরা জানালাম যে আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালাবো আর সাথে সাথে চিকিৎসাও করবো।

পরেরদিন সকালবেলা থেকেই আমরা কাজ শুরু করে দিলাম। দু'জন লঙ্গরখানায় থেকে গেলাম। আর বাকি ষোলজন চারটে দলে ভাগ হয়ে, এক একটা গ্রামে চলে গেলাম। রোগী দেখার সাথে সাথে জানবার চেষ্টা করলাম—তাঁদের সাধারণত কী ধরণের অসুখ হয়, তাঁরা কী খান, কী ধরণের কাজ করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম, কীভাবে এই অর্থনৈতিক অবস্থায় তাঁরা এসে পৌঁছেছেন; বোঝবার চেষ্টা করলাম রোগগুলোর সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো সম্পর্ক আছে কি না, থাকলে সেটা কীরকম।

গ্রামের সমস্ত মানুষের কাছেই আমরা খোলাখুলিভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেলাম। বাদসাধলেন গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা আর মণ্ডলেরা। এঁদের কাছে আমরা সঠিক উত্তর পেলাম না। পঞ্চায়েত অধ্যক্ষ, অঞ্চলপ্রধান ইত্যাদিরা বার বার প্রশ্ন করলেন—কেন আমরা এগুলো জানতে চাইছি। পরিষ্কারভাবে সমস্ত বোঝানোর পরেও গ্রামে গিয়ে গরীবচাষী, দিনমজুর ইত্যাদিদের কাছে জানতে পারলাম যে তাঁদের শাসানো হয়েছে—আমাদের প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দিলে, তাঁদের ধার দেওয়া হবে না, মাঠে কাজ দেওয়া হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক সমস্ত রকম শাসানির পরেও গ্রামের অধিকাংশ মানুষই আমাদের তথ্য সংগ্রহের কাজে সবরকম সাহায্য করেছিলেন।*

গ্রাম থেকে ফিরতে ফিরতে বিকেল প্রায় চারটে। কোনো কোনো দিন আরও পরে। চান-খাওয়া করেই ক্লিনিক খুলে বসলাম। ক্লিনিকের কাজে যাদের প্রয়োজন হ'ল না, তারা আবার চলে গেলাম গ্রামে। গ্রামের মানুষদের সাথে গল্প-গুজব সেরে ফিরতে ফিরতে রাত নটা। খাওয়া সেরে আলোচনা—সারাদিন কী করলাম, পরের দিন কী করব। তারপর নিজের নিজের গ্রামের কথাবার্তা আর অভিজ্ঞতার রিপোর্ট লেখা।

## লঙ্গরখানার ডায়েরী

তেখরী অঞ্চলের লঙ্গরখানার ব্যয়ভার চালাচ্ছে সরকার। তবে তত্ত্বাবধানে আছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ইংরাজী 'এল্' অক্ষরের মতো ছোট্ট একখানা স্কুলবাড়ী। পাকা মেঝের দুখানা ঘর। বড় ঘরটায় দুজন 'মহারাজ' থাকেন। ওখানেই ওনারা বিগ্রহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যে আরতি হয়। একটা কুয়োর পাশে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় একখানা ত্রিপল টাঙানো—ওখানে বিরাট বিরাট দুটো উনুনে চারজন ঠাকুর ভোরবেলা থেকে ঘাঁটা রাঁধতে শুরু করেন। ঘাঁটাটা হচ্ছে আধভাঙা গমের খিচুড়ি। পাঁচশো জনের রান্নার ওতে থাকার কথা ৮০ কে. জি. গম, ৩০ কে. জি. ডাল আর ৪০ কে. জি. কুমড়ো বা আলু (আমরা থাকাকালীন আলু দেওয়া হোত)। কার্যত পরিমাণটা কত দেওয়া হতো, সেটা মেপে দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। তবে কুয়োর জল যে বেশ প্রচুর পরিমাণে থাকতো সেটা বুঝতাম (গমের খিচুড়ি জিনিষটা সহজপাচ্য নয় বলেই বোধহয়)। বস্তুত, থালায় দিলে শুধুই জলের মধ্যে দলা দলা পাকানো গম ভেসে বেড়াতে চোখে পড়ত। 'হলুদ' বস্তুটার গুণে ঘাঁটার রঙটা কিন্তু চালের খিচুড়ির মতোই হতো।

ঘাঁটা দেওয়া শুরু হয় বেলা সাড়ে এগারোটা-বারোটা থেকে আর তার জন্ম ধুলোর উপর, মহারাজের ছাতার তলায় টানা দালের পেছনে

---

* গ্রামগুলো থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি সেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

মানুষের সারি পড়ে যায় সকাল ন'টা থেকেই। ভেবরী অঞ্চলের গোটা পঁয়ত্রিশ গ্রামের মাত্র পাঁচশো জন লোককে কার্ড দেওয়া হয়েছে। মহারাজের কাছে শুনলাম প্রথম প্রথম কার্ড নেই এমন প্রচুর লোকের ভীড় হতো। রোজই ফিরিয়ে দেবার পর তাঁরা এখন আর আসেন না।

বারো তের বছরের একটা বোবা মেয়ে খুব সকালেই চলে আসে—ওর কার্ড নেই। সামনের একটা গাছের চারদিকে গণ্ডী কাটা থাকে—একটা পাত্র নিয়ে তার মধ্যে বসে ও তারস্বরে দাঁত খিঁচিয়ে চেঁচাতে চেষ্টা করে—শুধু চিঁচিঁ আওয়াজ বেরোয়। একটা অসহায় ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো চোখ দুটো তার ঠেলে বেরিয়ে আসে। কার্ড ছাড়াই ও এক 'ডাবা'* খাঁটা পায়। পাতে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে সপ্ সপ্ আওয়াজ তুলে শেষ করে দেয়।

লাইন বেড়ে চলে। বেশিরভাগই বাচ্চা ছেলেমেয়ে, গায়ে এক-ফালি কাপড় ছাড়া কিছুই নেই—অনেকেই একেবারে উলঙ্গ। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবতীও আছেন, ছোট বাচ্চা কোলে 'মা'-রা এসেছেন; সমর্থ জোয়ানের সংখ্যা কম। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তাঁরা কাজের খোঁজে বেরিয়েছেন।

বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জায়গা নিয়ে ভীষণ ঝগড়া করে—অশ্রাব্য গালাগালিও দেয়। এরা কোনোদিন স্কুল-পাঠশালায় পড়ার সুযোগ পায়নি। রোগা কঙ্কালসার চেহারা, চুপসে যাওয়া মুখ, পেটটা মোটা, লালচে সোনালী রুক্ষ চুল—কারও বা চুলে জটা পড়ে গেছে। প্রায় কারোরই সকাল থেকে কিছু জোটেনি, খাঁটা পাবার পর ভাইবোন সবাই মিলে ভাগ করে খাবে। ঘণ্টা তিনেক রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকার পর যখন দেড় 'ডাবা' খাঁটা পায়, তখন মুখে ফুটে ওঠে ক্লান্ত, মলিন, কিছুটা বিজয়ীর হাসি।

খাঁটা দেবার এখনও দেরী আছে। আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওঁদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেবার চেষ্টায় নামলাম। প্রথমে ওঁরা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে আস্তে আস্তে অনেক কিছু বলে গেলেন—অতীতের কথা, গ্রামের কথা, অভাব-অভিযোগের কথা।

চল্লিশ বছরের দাসী গড়াই-এর একটা কার্ড আছে। আগে ছিলেন জাবেদার। স্বামী শঙ্কর গড়াই গ্রাম থেকে খড় কিনে বাঁকুড়ায় বিক্রি করতেন, ধার দেনা করে একটা গাড়ী*, [illegible] বছর দশেক আগে সাপে কাটায় স্বামী মারা যান। [illegible] ধারতেন তারা গাড়ী নিয়ে নিল। ছোট ছোট দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে এলেন শাঁওনাদা গ্রামে। ক্ষেতে দিনমজুরের কাজ [illegible], ছেলেটা মাঝে মাঝে রাখালের কাজ পায়। এ বছর কারুরই কাজ জুটছে না। বছর তিনেক আগে ঘর পড়ে গেছে। আর করা হয়নি।

চল্লিশ বছরে কালীপদর বাড়ীতে লোক আছে বারো জন। কার্ড একটাই। কালীপদ আর ওর ভাই দিনমজুর। দিন দুপাই ধান আর একবেলার খাবার একজনের মজুরী। ইদানীং কাজ নেই।

বাদল চন্দ্র মুনিষ চার ক্লাস পর্যন্ত পড়েছেন। ওনাদের বাড়ীতে লোক আছে চার জন, জমি আছে দু-আড়াই বিঘে। বিঘে প্রতি দেড় "নাপ"** করে ধান হয়। বীজের জন্য রেখে ছ মাস মতো খাওয়া চলে। তারপর দিনমজুরের কাজ। এখন লঙ্গরখানাই ভরসা।

শতছিন্ন কাপড় পরা কয়েকজন মহিলা এসেছেন শাঁওনদা গ্রাম থেকে। কারোর বাড়ীতেই কিছু রান্না হয়নি, লঙ্গরখানার খাঁটাই তাই একমাত্র সম্বল। দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁদের কি অবস্থা গেছে জানতে চাইলে বললেন—"ও। সে কি দিন গেছে গো দিদি, দিনের পর দিন না খেয়ে কাটিয়েছি।" আর বার বার বলেছেন, "আমাদের বড় কষ্ট গো দিদি, তোমরা আমাদের জন্য কিছু করে দাও।"

বাহান্ন বছর বয়স্ক "কমল"-এর বাড়ী কেন্দ্রগাড়ারে। বাবা গাঁয়ে স্কুল করে খেতেন। পাঁচভাই এর মধ্যে দুভাই কুমোরের কাজ শিখে নেয়। কুমোরের কাজের সাথে সাথে বাগাল-এর কাজ করে। ওরা আস্তে আস্তে একটা গাড়ী করেছিল। পাঁচভাই পনেরো-কুড়ি বিঘে জমি ভাগচাষ করতো। একে একে সবাই মারা গেছে। গাড়ী দেনার দায়ে বিকিয়ে গেছে। মহাজন সনাতন মাষ্টারের কাছে এখনও টাকায় মাসে এক আনা সুদে, তিন কুড়ি টাকা ধারেন। কাজ নেই। বাড়ীতে সাতজন আছে কিন্তু কার্ড একখানা। 'মজুরী খেয়ে' বসে আছেন অর্থাৎ ধান কাটা শুরু হলে বিনা মজুরীতে খাটতে হবে।

বৃদ্ধা পারুল রায়ের আগে সব ছিল। স্বামী ছিল। পাঁচজন জোয়ান ছেলে ছিল, কিছু জমিজমাও ছিল। স্বামী মারা যাবার পর

---

* ডাবা হচ্ছে বড় সাইজের হাতা।

* গাড়ী হচ্ছে গরুর গাড়ী।

** এক নাপ হল প্রায় সাড়ে তিন মন।